শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

গৃহস্থ

মাসিক পত্র।

তৃতীয় খণ্ড।

(সন ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক হইতে ১৩১৯ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত

ইণ্ডিয়া প্রেস।

প্রিণ্টার—শ্রীলালমোহন মল্লিক।

২৪ নং মিড়িল রোড, ইটালি, কলিকাতা।

সূচীপত্র

গৃহস্থের পরিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ

India Press, Calcutta.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতনধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প-বিজ্ঞানাদি-প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

তৃতীয় খণ্ড।

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।
सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥

নববর্ষে মঙ্গলাচরণ।

ॐ

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्य्यमा ।
शं न-इन्द्रो-बृहस्पतिः । शं नो-विष्णुरुरुक्रमः ।
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि ।
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।
॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ॥

ওঁ শ্রীমৎসদ্গুরবে নমঃ।

গুরো, পরাৎপর জগৎ-ঈশ্বর তুমি হে ভাস্কর জগৎ জীবন,
তুমি মুখ্য-প্রাণ, মঙ্গল-নিধান, কর জ্যোতি দান এই আকিঞ্চন।
তুমি হে বরুণ কত তব গুণ বর্ণিতে কে পারে এ বিশ্ব মাঝারে?
হইয়া অপান করি'ছ কল্যাণ করহ মঙ্গল যাচি হে তোমারে।
চক্ষুরূপে আর অর্য্যমা তোমার নাম বিশ্বমাঝে জানে সর্ব্বজন,
হ'য়ে কৃপাময় হও হে সদয় মঙ্গল বিধান কর হে এখন।

বল রূপী হ'য়ে   বাহু যুগে র'য়ে   ইন্দ্র নামে তুমি   আশ্রয় সবার,
দেহ দেহ বল   করহ মঙ্গল   ওহে আখণ্ডল   মিনতি তোমায়।
তুমি বৃহস্পতি   দাও শুদ্ধা মতি   অগতির গতি   তোমা সম নাই,
কর হে মঙ্গল   দেহ বুদ্ধি-বল   বাক্য সুবিমল   সদা আমি চাই।
বিষ্ণু উরুক্রম   তুমি দেহে মম   পদ-যুগে বল   তোমার কৃপায়,
করহ মঙ্গল   কর হে সবল   যেতে যেন পারি   তব রাঙ্গা পায়।
তুমি ব্রহ্মরূপ   ব্রহ্মাণ্ডের ভূপ   অতীব অনুপ   মহিমা তোমার,
তব পদে তাত   করি প্রণিপাত   করহ পূরণ   আশা মো-সবার।
বায়ুরূপে তুমি   আচ্ছাদিয়া ভূমি   আছ দয়াময়   ধরে জীব-প্রাণ,
ব্রহ্মরূপ হ'য়ে   আছ বিশ্ব লয়ে   নতি করি পদে   করি স্তুতি-গান।
তুমিই প্রত্যক্ষ   ব্রহ্ম করি' লক্ষ্য   ব্রহ্ম সুপ্রত্যক্ষ   বলিব তোমারে,
ঋত-বর্ম্ম তুমি   সত্য-দেব তুমি   বলিব এ কথা   তা'রে পা'ব যা'রে।
দেব, রক্ষা কর,   আধি-ব্যাধি হর   সত্যতত্ত্ব-সরে   ডুবাও সবায়,
যে চায় তোমায়   সে পায় তোমায়   নাথ দয়াময়   সদা তা'রে পায়।
সর্ব্বদেবময়   সর্ব্ব-তত্ত্বময়   পবিত্র প্রণব   স্বরূপ তোমার,
দাও দেব শান্তি,   শান্তি শান্তি শান্তি   ওম্,—যাক ঘুচে   মনের বিকার।

শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

নব-বর্ষে

শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণায়, অনুগ্রাহক-গ্রাহক-পাঠক-লেখক-পৃষ্ঠপোষক-গণের সঙ্গে বিজয়ার প্রণাম ও বিজয়ালিঙ্গন-পূর্ব্বক, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে গৃহস্থ তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করিল। সে, দুই-বৎসর-কাল যথাশক্তি, সকলের সেবা করিতে ত্রুটি করে নাই। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অজ্ঞতাবশতঃ কোনও দিন কাহারও চরণে কোনও বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকে, তবে গললগ্নীকৃতবাসে, সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। সকলে পূর্ব্বের মত তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন—ত্রুটি দেখিলে, উপদেশ-দ্বারা সংশোধন করিবেন—এবং যাহাতে সে নিরন্তর তাঁহাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, তৎপক্ষে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিবেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, তাহার কলেবর ঈষৎ বাড়িয়াছে, সেজন্য তাহার শক্তিও আর একটু বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইক্ষণে সে তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগুলি শ্রীগুরুদেবের চরণ-কমলে অর্পণ করিয়া

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তপরমাত্মস্বরূপকম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগদ্গুরুম্॥"

বলিয়া, সেই পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক, নববর্ষের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। আপনারা সকলে তাহার সহায় হউন—তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলুন—

"ইতঃপরং তচ্চরণারবিন্দয়োঃ স্মৃতিঃ সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে
তন্নামসঙ্কীর্ত্তনমেব বাণী করোতু, মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্
কথামৃতং পাতু, করদ্বয়ং তে পাদারবিন্দার্চ্চনমেব কুর্য্যাৎ
শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্ ॥"

বড় ইচ্ছা করে শিশু গৃহস্থটিকে মনের সাধে সাজাইতে। বিশ্বেশ্বর শ্রীগুরুদেব জানেন সে সাধ পূরিবে কি না।

অনেক গ্রাহক, জ্যোতিষ-প্রসঙ্গের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের জন্য এবার এরূপ আয়োজন করিলাম, যাহাতে তাঁহাদের জ্যোতিষ-আলোচনার আর ব্যাঘাত না হয়। তা'র পর তাঁ'র ইচ্ছা।

গণেশ্বর।

গণপতি মূরতি আজি, হেরি যে হৃদয় মাঝে।
সিদ্ধি দিতে বুঝিরে মাতা, সিদ্ধিদাতা রূপে রাজে ॥

কিবা সিন্দুর বরণ লম্বোদর গজানন
ভালে শোভে ত্রিলোচন, চরণে নূপুর বাজে ॥

তনু স্থূল খর্ব্বাকার রক্তানুলেপন আর
সুরক্ত বসনে কিবা সে বর শরীর সাজে ॥

সর্ব্বশক্তি কমলোপরি বসি' বীরাসন করি'
আলো করে শকল শশী বসি'য়ে ললাট মাঝে ॥

মাণিক্য মুকুটোপেত রত্নাভরণ-ভূষিত
সিদ্ধি দিতে নিয়ত রত আগে পূজা সকল কাজে ॥

বিশাল শুণ্ডাগ্র বাসে বীজাপুর পুলকে হাঁসে
চারি করে নিজ রদন ইষ্ট পাশাঙ্কুশ সাজে ॥

মদ-বারিতে গাল দুটি সিক্ত সদা সৌরভে জুটি
ভ্রমর ভ্রমরী মাতি বসন্ত-বাহার ভাঁজে ॥

তাড়াইতে ভ্রমর দলে বিশাল শ্রবণ চলে
তালে তালে যেন রে গানে, কানে করতাল বাজে ॥

বক্রতুণ্ড মহোদর এক-দন্ত লম্বোদর
সেবা কর সে বিকট ধূম্রবর্ণ বিঘ্নরাজে ॥

বিশাল সে শুণ্ড ধরি বোধানন্দ যাবে তরি
বিঘ্ন কুল রহিবে চেয়ে ভবাব্ধি পড়িবে লাজে ॥

ত্যাগের মূর্ত্তি

একটি জননী, সন্তানকে বুকে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, যেন পুত্রস্নেহে পাগলিনী। তিনি শিল্প-কার্য্য জানেন, কবিতা রচনা করিতে পারেন, নানাবিধ পুস্তক পাঠে সমর্থা। কিন্তু তাঁহার সব সুখ স্বচ্ছন্দতা, আমোদ প্রমোদ, বা শিল্পাদির চর্চ্চা—তিনি আনন্দের সহিত ত্যাগ করিয়াছেন। একমাত্র অপত্যস্নেহ সব উচ্চ ভাবগুলিকে দাবিয়া অন্তরে বিহার করিতেছে। কিসে সন্তান বড় হয়, ভাল হয়, সুন্দর হয়, তিনি সদা তাহাই ভাবিতেছেন।

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এক অসাধারণ পণ্ডিত, কোনও নিম্ন-পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার অসামান্য অধিকার। তিনি প্লেটোর ন্যায় দার্শনিক, নিউটনের ন্যায় গণিতজ্ঞ, র‍্যাফেলের তুল্য চিত্রকর, সেক্ষপিয়রের মত কবি। কিন্তু নিরক্ষর ও নিরাশ্রয়, পতিত ও অজ্ঞান সহস্র সহস্র শিশুর কথা যেমন তাঁহার মনে হইল, অমনি করুণায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল! তিনি দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গণিতের সূক্ষ্মবিচার, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবোধ, প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চচিন্তা ও উচ্চভাব বিসর্জ্জন করিলেন এবং অতি ক্ষুদ্র ও দীনের ন্যায় শিশুদিগকে ক খ শিখাইতে নিযুক্ত হইলেন!! অসহায় শিশুগণের স্মৃতি ও তৎপ্রতি দয়া তাঁহাকে ছোট করিয়া ফেলিল, সীমাবদ্ধ করিল।

প্রভূত শক্তিশালী, লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা এক সম্রাট, তাঁহার ইন্দ্রতুল্য সুখ-সম্পদ ত্যাগ করিয়া এক পূতিগন্ধময় কুষ্ঠ-কুটিরে বাস করিতেছেন! তাঁহার মলিন বেশ—দীনভাব—অশ্রুপূর্ণ নয়ন! কুষ্ঠরোগীদিগের যাতনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে। তাহাদের অসহায় অবস্থা ও করুণ ক্রন্দন তাঁহার অন্তরে শেলবিদ্ধ করিয়াছে। তাই তিনি রাজ্যসুখ তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়াছেন! তাই রোগীদিগকে বুকে ধরিয়া স্বহস্তে ক্ষত ধৌত করিতেছেন, ঔষধ দিতেছেন!! তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যদবধি ইহারা রোগমুক্ত না হয়, তদবধি তিনি নড়িবেন না, সেবা-ব্রত হইয়া কুটিরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবেন! একমাত্র করুণাই এখন তাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে এবং ইহারই পেষণে তাঁহার রাজ-ভাব মূর্চ্ছিত, স্তম্ভিত, মৃত!

নৈমিষারণ্যে শুভ্রকেশ শুভ্রবসন দীর্ঘকায় এক মহাপুরুষ, ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়ন-যুগল হইতে জলধারা বহিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন "হায়, জীবের দুঃখমোচন হইল কৈ? জীবহিতার্থে বেদের বিভাগ করিলাম, উপনিষদ-সমুদ্র মন্থন করিলাম, ব্রহ্মসূত্র লিখিলাম, মহাভারত লিখিলাম। কিন্তু জীব তো শান্তি পাইল না। কি হইবে? কিরূপে অজ্ঞান জীবকুল দুঃখ সাগর হইতে ত্রাণ পাইবে?" এই যে মহাত্মা বিরলে বসিয়া জীবের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন, ইনি কে? ইনি একজন নির্ম্মাণকায়, জীবন্মুক্ত। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ইনি নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন, গোলোকের

নিত্য সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু অসহায় জীবের দুঃখ-স্মৃতি তাঁহার বিমল চিত্তপটে উদিত হইল, ভূলোকের হাহাকার সপ্তলোক ভেদ করিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থলে আসিয়া আঘাত করিল। তিনি সিহরিয়া উঠিলেন। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আর কি স্থির থাকিতে পারেন? হেলায়, স্বচ্ছন্দে, মোক্ষ-সুখ পায়ে ঠেলিয়া ধরাতলে নামিয়া আসিলেন এবং আপনাকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ করিয়া জীবসেবায় নিরত হইলেন! স্মৃতি ও করুণাই অসীমকে সসীম করিল, মুক্ত পুরুষকে বদ্ধ করিল।

এই সকরুণ স্মৃতির নামই **মায়া**। মহাপ্রলয়ের অবসানে এই মায়াই ভগবানের অন্তরে আবির্ভূত হয়। এই স্মৃতিময়ী করুণাই বিশ্বের আদি কারণ; এই জন্যই ইহার নাম আদ্যাশক্তি জগজ্জননী, বিশ্বপ্রসবিনী। যদি নির্গুণ ব্রহ্মের অন্তরে এই করুণাময়ী স্মৃতি না জাগিত, তাহা হইলে এই বিশ্বের আবির্ভাব হইত কি? বিশ্বটা কি? তাঁহার ভাবনা, বা চিন্তা, বা কল্পনা মাত্র। তিনি যতক্ষণ ভাবিতেছেন, ততক্ষণই বিশ্ব আছে। (ইহার প্রমাণ এই যে আমরা যতক্ষণ যে বিষয়টি ভাবি, ততক্ষণই সেই বিষয়টি থাকে, সেই বিষয়টির অনুভূতি হয়। ভাবনা না থাকিলে বিষয়টিও থাকে না।) এই ভাবনা বা স্মৃতির নামই মায়া। এই স্মৃতিদ্বারা ভগবান আপনাকে ক্ষুদ্র ও সীমাবিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই, বিশ্ব আছে, জীব আছে। এই করুণাময়ী স্মৃতি তাঁহার নির্গুণ পরম ভাবকে দাবিয়া, পদ-দলিত করিয়া, যতক্ষণ প্রাধান্য বা আধিপত্য করে, ততক্ষণই জগৎ, ততক্ষণই জীব। **মহামায়া শিবকে জড় ও নিস্পন্দ করিয়া বুকের উপর নৃত্য করিতেছেন বলিয়াই ব্রহ্মাণ্ড আছে।** ইহাই বিরাট ত্যাগের বিরাট মূর্ত্তি!

জগতের যেখানে যত ত্যাগের মূর্ত্তি আছে, সমস্তই এই বিরাট মূর্ত্তির ছায়া। ঐ দেখ বুদ্ধদেবে সেই মূর্ত্তি—যীশু খ্রীষ্টে সেই মূর্ত্তি—গৌরাঙ্গে সেই মূর্ত্তি! ঐ দেখ নির্ব্বাণ-মুক্তিকে পায়ে ঠেলিয়া—করুণাময়ী মা কেমন প্রকটা, কেমন জাজ্বল্যমানা! বাছাদের জন্য কতই কাতরা, উলঙ্গিনী, পাগলিনী!! সর্ব্বত্রই শিবের বক্ষে মহামায়ার বিহার, উচ্চ অবস্থাকে দাবিয়া সসীম ও ক্ষুদ্র অবস্থা স্বীকার করা, স্মৃতিময়ী করুণার পদতলে আপনাকে নিঃক্ষেপ করা,—বলি দেওয়া। ভগবানই প্রথমে আপনাকে মায়ার চরণে বলি দিয়াছেন। এই বলির উপরই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যত কাল মহামায়ার নৃত্য, তত কাল জগৎ। যেমন নৃত্য থামিবে, অমনি জগৎ-রূপ কল্পনারও অবসান হইবে,—মৃত শিব জীবন পাইবে। তখন আর কিছুই থাকিবে না,—"শিবঃ এব কেবলঃ"।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী B.A.

———

দেব কৃপা।

কেন প্রভো! তুমি এত ভালবাস
আমি পারি না বুঝিতে পারি না,
তোমার গভীর প্রেমের হে দেব!
আমি পাই না যে সীমা পাই না।

মহাপাপী আমি, জেনেও হে স্বামি!
কেন অকাতরে কৃপা নিরন্তর?
করুণা তোমার, হেরিয়া অপার,
বিস্ময়ে পুলকে শিহরে অন্তর।

যে আলো, কিরণ, বায়ু, শস্য, জল
রক্ষিছে সতত সাধুর জীবন,
তারাই যে হায় হলেও বা পাপী
আমারেও পালে করিয়া যতন।

প্রাণ-মন-লোভা, প্রকৃতির শোভা,
আমারো হৃদয়ে ঢালে প্রীতি-ধারা,
হেরি তব ঠাঁই, ভেদাভেদ নাই,
পাপী মহাজন সমতুল তারা।

হে করুণাময়! দয়া প্রেম তব
লভিয়াও আহা! সতত লভিয়া,
প্রতিদান হায়, পাপ-কালি শুধু,
দিয়েছি কেবলি নিরত আনিয়া।

তাই, আরো প্রাণ চাহে ভগবান!
ধরেনি এখনো মহা অনটন্
পূতধারা ঢালি, ধুয়ে পাপ-কালি,
তব কাজে রত কর এ জীবন।

শিশির-রচয়িত্রী

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়।

ভারতের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞানাদি পাশ্চাত্য রীতিতে যথোচিত প্রচারোদ্দেশ্যে বারাণসী ধামে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। পরাবিদ্যা সমিতির সভাপতি শ্রীমতী আনি বেশান্ত মহোদয়া, মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় এবং ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় স্বতন্ত্র ভাবে এই জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তিনটী স্বতন্ত্র হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না; এমন কি তিনটার প্রয়োজনই নাই বলিয়া বোধ হয়। এজন্য সকলের সমবেত চেষ্টায়, যাহাতে একটি হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার জন্য সকলে মিলিয়া যত্ন করিলে ভাল হয়। উদ্যোগকারীগণের মধ্যে প্রথম দুই জনের সমবেত চেষ্টার অভিপ্রায় আছে এরূপ শুনা যাইতেছে। মহামণ্ডল সে চেষ্টায় যোগ দিলে আরও ভাল হয়। শুনা যাইতেছে, শ্রীমতী বেশান্ত মহোদয়া বিলাতে এরূপ আশা পাইয়াছেন যে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলেই ভারত-সম্রাটের অভিষেকোৎসব সময়েই উহার কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে। পণ্ডিত মালব্যও প্রাণপণে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। অনেক স্থানে সভা করিয়া এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। সম্প্রতি ২০এ ভাদ্র কলিকাতায় এক সভা হইয়াছিল। সভাস্থলেই পাঁচলক্ষ-মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আমরা এক খানি

বাঙ্গালা অনুষ্ঠান পত্র পাইয়াছি, তাহা অবিকল নিম্নে উদ্‌দৃত করিলাম।

"গবর্ণমেণ্টের উদার শিক্ষানীতির প্রভাবে আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রচার হইয়াছে, তাহার ফলে আমরা নানাবিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছি যে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির কতকগুলি অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, এবং তাহা বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের সাহায্যে আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণ নিবারণ করিতে অসমর্থ। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় এবং তত্ত্বাবধানে নূতন একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে।

শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, কোনও ব্যক্তিকে যথার্থরূপে শিক্ষিত করিতে হইলে তাহার নৈসর্গিক কর্ম্ম ও চিন্তা-প্রণালীগুলি, তাহার সুপরিচিত ভাব ও পদার্থসমূহ, এবং তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও ধারণা সমষ্টির যথোচিত সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ব্যক্তির ন্যায় সমাজের শিক্ষাপদ্ধতিও এইরূপে জাতীয় চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সমাজের সকল বিষয়ে সিদ্ধি ও পরিপূর্ণতা লাভ হয়।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির ফলে জাতীয় চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব সৃষ্ট হইয়া থাকে। সভ্যতার এই সকল উপাদান বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। সুতরাং কোন জাতির জন্য প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও দর্শন, তাহার স্বতন্ত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞান, এবং তাহার ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য যে শিক্ষাপদ্ধতি এক জাতির পক্ষে মঙ্গলপ্রদ ও সুফলপ্রসূ, অন্য জাতির পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক এবং হানিকরও হইতে পারে। কোনও এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বহুজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতির জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ যে অন্যান্য সমাজ হইতে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর জাতীয় চরিত্র কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাচক্রের অভ্যন্তরে বিকাশ লাভ করিয়া ধর্ম্মে, সাহিত্যে, দর্শনে সভ্যতার যে কয়েকটি অঙ্গের পুষ্টিসাধন করিয়াছে তাহা অন্য কোনও জাতির স্বাভাবিক উৎকর্ষ ও সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণরূপেই পৃথক। সুতরাং বলা বাহুল্য, মানব সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য জাতির জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন, হিন্দুজাতির জন্য সেরূপ শিক্ষানীতি অবলম্বন করিলে তাহার স্বাভাবিক চরিত্রের পুষ্টি-বিধানে সহায়তা করা হয় না। এইজন্য হিন্দুকে যথার্থ ও কার্য্যকরিরূপে শিক্ষিত করিতে হইলে হিন্দুজগতে ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যে সমুদয় সত্য আবিষ্কৃত এবং জীবনে উপলব্ধ হইয়াছে সেই সমুদয় ভাব ও শক্তিপুঞ্জের কেন্দ্রস্বরূপ একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন করিতে হইবে।

হিন্দুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এই বিশ্ব-বিদ্যালয় হিন্দু সমাজের উপযোগী সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জগতে এবং বিভিন্ন যুগে অন্যান্য দেশে যে সভ্যতা ও উৎকর্ষ বিকাশ-লাভ করিয়াছে তাহা উপেক্ষিত হইবে না। হিন্দুর বিশ্ব-বিদ্যালয় মানবজাতির জ্ঞান এবং বিশ্ব-সভ্যতার অমূল্য সত্যগুলি আলোচনা করিবার জন্যও ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু হিন্দু সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা সাধন করিয়া সামঞ্জস্য, পার্থক্য অথবা ঐক্য আবিষ্কারই উদ্দেশ্য থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত বাস্তব জগতকে বিবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিয়া, প্রকৃতিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়া, বিশ্বের সুধীমণ্ডলী যে সমুদয় নূতন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা

করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সমুদায় বিদ্যা যাহাতে হিন্দু ছাত্রগণ পঠদ্দশার প্রারম্ভ হইতেই আয়ত্ত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই অভিনব বিজ্ঞানগুলি হিন্দু সমাজে অধিকার বিস্তার করিতে না পারিলে হিন্দুর জীবন অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং আধুনিক জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করিতে অসমর্থ হইবে।

অধিকন্তু, হিন্দুগণ যাহাতে আধুনিক কালের জীবন-সংগ্রামোপযোগী উপকরণ সমূহ আহরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, এই বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ধনাগমের উপায় সমূহ যাহাতে পঠদ্দশার প্রারম্ভ হইতেই ছাত্রগণের অধিকৃত হয় তৎপ্রতি হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দৃষ্টি থাকিবে। অন্ন-সংস্থানের নূতন উপায় উদ্ভাবিত না হইলে এবং ছাত্রগণ উপায় সমূহ বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে হিন্দুর স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি ক্রমশঃ হীনতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে এবং হিন্দু জাতি অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব—হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও পুষ্টি বিধান—

(ক) হিন্দুর স্বভাবানুরূপ উৎকর্ষ বিধানের নিমিত্ত (১) হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা (২) হিন্দু সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের আলোচনা (খ) আধুনিক জগতের ভাব ও শক্তি সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজকে জীবন্ত ও বিবিধ উপায়ে পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত—(১) প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা হইতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা (২) প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা হইতেই ব্যবহারিক (শিল্প প্রভৃতি) বিদ্যার আলোচনা।

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থার প্রার্থনা করা হইবে—

(ক) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ও ভাইস্-রয় মহোদয় ইহার তত্ত্বাবধায়ক এবং চ্যান্সলার ও পরিরক্ষক থাকিবেন।

(খ) সকল বিষয়েই হিন্দু কর্তৃপক্ষগণ নিয়ন্তা ও পরিচালক থাকিবেন।

(গ) হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী নগরীতে প্রধান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

প্রয়োজন—সম্প্রতি এক কোটি (১০,০০০,০০০) টাকা। তন্মধ্যে ৫,০০০,০০০, (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা দিল্লী দরবারের পূর্ব্বেই **বেঙ্গল ব্যাঙ্কে** জমা দিতে হইবে। ভারত সম্রাট্ এ দেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে, তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে আমরা হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় দান-স্বরূপ লাভ করিতে পারিব আশা আছে। অতএব হে হিন্দুসমাজ, এই সুযোগ ব্যবহার করিবার জন্য প্রাণপণে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করুন। প্রত্যেকে পথ-প্রদর্শক হইয়া অন্যের উৎসাহ প্রদান করুন। সমস্ত সাহায্য জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত **কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের** নিকট পাঠাইতে হইবে।"

আশা হয়, কেহই এ বিষয়ে যথাসাধ্য উদ্যোগী হইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

সময়ের ফের।

(সংসারের একটি নিত্য ঘটনা।)

দিনে দিনে একি হ'ল ধর্ম্ম গেল রসাতল কলির প্রভাবে ভূমণ্ডলে।
ভাল ক'রলে মন্দ হয় সময়ের ফেরে, হায়! আরও কত আছে বা কপালে

সময়ের ফেরে সবই হয়। যে হিন্দুজাতির ধর্ম্মই প্রাণ—সেই হিন্দুজাতি আজ অর্থের চিন্তায় ধর্ম্মকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। উপকারের প্রতিদান নাই, আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল-চিন্তা নাই, কেবল নিজের—নিজের ভোগবিলাসের, আর নিজের ও নিজের স্ত্রী পুত্রগণের মাত্র উদরপূরণের চিন্তায় দিনরাত বিভোর। নিঃস্বার্থ ভাব দূরে পলায়ন করিয়াছে, মনুষ্যত্ব চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্বার্থ আর পশুভাব, আজ প্রবল-প্রতাপে বিরাজ করিতেছে।

যে দিকে দেখ, সেই দিকেই কেবল স্বার্থ—স্বার্থ—স্বার্থ—সমস্ত জগৎটা যেন স্বার্থময় হইয়া পড়িয়াছে। রাজা—প্রজা, গুরু—শিষ্য, পিতা—পুত্র, প্রভু—ভৃত্য, ভ্রাতা—ভগ্নী, আত্মীয়—স্বজন, বন্ধু—বান্ধব যেখানে দেখ, সেই খানেই এই ভাব। নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য কেহ কাহারও সর্ব্বনাশ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় 'সবই সময়ের ফের'!!

সময়ের ফেরে মানুষের মতি গতি কিরূপ ফিরিয়া যায়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সত্য ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামসদয় ও রামবিজয় দুই ভ্রাতা। রামসদয় বড় ও রামবিজয় কনিষ্ঠ। সকলে তাঁহাদিগকে সদয় বাবু ও বিজয় বাবু বলিয়া ডাকিত, আমরাও সুবিধার জন্য তাহাই বলিব। সদয় বাবু পিতার প্রথম সন্তান, বিজয়ের অপেক্ষা তিনি প্রায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সে বড় ছিলেন, সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে স্বভাবতঃ বিশেষ প্রীতি ও ভালবাসার ভাব জন্মিয়াছিল। সদয় বাবু বিজয়কে যেমন অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, বিজয়ও তেমনি তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

সদয় বাবু অতিশয় বুদ্ধিমান ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন, কিছুদিন নানা স্থানে চাকুরী করার পর আর তাঁহার গোলামী-পেসা ভাল লাগিল না। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং প্রখর বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে সত্বরেই একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিজয় এতদিন স্থানান্তরে থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছিল। পড়া শেষ করিয়া এখন সে বাড়ী আসিয়াছে।—ইচ্ছা যে কোথাও একটা চাকরীর যোগাড় হইলে তথায় যাইয়া চাকরী করিবে। একদিন একটা চাকরীর সংবাদ পাইয়া বিজয় তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, একটা চাকরী খালির সংবাদ পাইয়াছি, চেষ্টা করিব কি?"

সদয় বাবু বলিলেন, "দেখ বিজয়, আমরা দুটি মাত্র ভাই, এক জায়গায় থাকিলেই ভাল হয় না ?—তার পর দেখ, আমার এই-ব্যবসা ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে আমি একলা আর সব দেখিয়া উঠিতে পারি না, লোক রাখিলেও তাহারা চুরি করিয়া অনেক ক্ষতি করে। তুমি যদি চাকরী না করিয়া আমার কাছে থাক, তবে আমি এই ব্যবসা আরও বিস্তার করিতে পারি। তাহাতে যাহা আয় হইবে তাহা তোমার চাকরী অপেক্ষা কোন মতে কম হইবে না। তবে কেন বৃথা দূর দেশে পড়িয়া কষ্ট পাইবে ?"

দাদার কথাটা বিজয়ের মন্দ লাগিল না বরং যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইল। সে সরল ভাবে দাদার কথা শিরোধার্য্য করিল।

এই রূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল। সদয় বাবুর ব্যবসার দিন দিন বিস্তার ও উন্নতি হইতে লাগিল। দুই ভাইয়ে সম্পূর্ণ একতার সহিত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

চিরদিন কখনও সমান যায় না। সুখ দুঃখ যেমন চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করে মানুষের মনও তেমনি একরকম থাকে না। মনই সকল কর্ম্মের চালক, আর সুখ দুঃখ সেই কর্ম্মের ফল, সুতরাং মনের পরিবর্ত্তন না হইলে সুখ দুঃখাদি অবস্থার পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

সদয় বাবুর সুখের সময় ফুরাইয়া আসিতে-ছিল, সুতরাং তাঁহার মনেরও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কারণ-ভিন্ন কার্য্য হয় না, অতএব তাঁহার এই পরিবর্ত্তনেরও অবশ্য একটা কারণ ছিল। অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতুটা ইহার মূল কারণ হইলেও সেটা পরোক্ষ, ফলতঃ ইহার প্রত্যক্ষ কারণও একটা ছিল। সেটা সেই স্বার্থ, জগৎসুদ্ধ লোক যাহাতে ভুলিয়া, মোহান্ধ হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে ও পরস্পর ঠোকাঠেকি খাইয়া পতিত হইতেছে—সময়ের ফেরে সদয় বাবুর মনে সেই ভীষণ স্বার্থ-ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছে, অথবা কেহ জাগাইয়া দিয়াছে।

লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিবামাত্র যেমন ম্লান হইয়া যায়, ধর্ম্মের সংসারে অধর্ম্ম প্রবেশ করিলেও তেমনি নিস্তেজ ও মলিন হইয়া যায়। ক্রমে সদয় বাবুর সুখের সংসারে কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া তাঁহাকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। সংসার মধ্যে আর তেমন প্রীতি বা সদ্ভাব দেখা যায় না, সকলেই যেন কাহার প্রতি বিরক্ত!

বিজয়ের অধিকাংশ সময় দোকানেই কাটিত, কেবল আহারের সময় মাত্র একবার বাড়ী যাইত। আর রাত্রে সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া যখন বাড়ী যাইত তখন সকলেই নিদ্রিত হইত, কেবল তাহার স্ত্রী তাহাকে খাওয়াইবার জন্য জাগিয়া থাকিত মাত্র। সুতরাং পরিবার মধ্যে এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার তাহার সময়ই হইত না। তবে তাহার স্ত্রীর নিকট কখন কখন দুএক কথা শুনিতে পাইত বটে কিন্তু বিজয় সেটা স্ত্রীলোক গণের স্বভাবসুলভ স্বার্থপরতা মনে করিয়াই নিশ্চিন্ত হইত।

মধ্যে একবার বিজয়ের শরীর অসুস্থ হওয়াতে কয়েকদিন সে একেবারেই বাড়ীতে যায় নাই, কিন্তু কেহই তাহার কোন খোঁজ করিল না। কেন সে বাড়ী আসে না তাহার কি হইয়াছে বা সে কিছু খাইল কি না, কেহ একবার তাহাকে একথা জিজ্ঞাসাও করিল না। তখন বিজয়ের মনে একটা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল, ভাবিল একি হইল ?

দোকানের সমস্ত ভারই বিজয়ের উপর ছিল। আয় ব্যয়, হিসাব পত্র, টাকাকড়ি সবই বিজয়ের হাতে থাকিত। একদিন সদয় বাবুর কিছু টাকার আবশ্যক হওয়ায় বিজয়ের নিকট চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন তাহার হাতে টাকা না থাকায় দিতে পারে নাই। ফলতঃ এরূপ হইয়া থাকে, এবং হওয়া অসম্ভবও নহে, সকল সময় কিছু হাতে টাকা মজুত থাকে না। কিন্তু সদয় বাবু সেদিন কি মনে ভাবিলেন—কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, বিরক্ত ভাবে উঠিয়া গেলেন। বিজয়, দাদার ভাব ততটা লক্ষ্য করিল না, আপন কাজ করিতে লাগিল, কেবল মনে করিল যে আজ টাকা না দিতে পারায় দাদা কিছু রাগ করিয়াছেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে, একদিন সন্ধ্যার পর বিজয় সমস্ত দিনের আয় ব্যয়ের হিসাব করিতেছিল, এমন সময় সদয় বাবু আসিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিজয়, টাকা কড়িতো সব তোমার কাছেই থাকে, কিন্তু আমি চাহিলেই বল নাই, তবে টাকা সব কি হয়, বলিতে পার?"

দাদার রুক্ষস্বর ও এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া বিজয় চমকিয়া উঠিল, ভাবিল একি?—তাহার শিবতুল্য দাদার মুখে তো সে কখন রূঢ়কথা শুনে নাই, কখন তো সে তাঁহাকে এরূপ রুক্ষস্বরে কথা কহিতেও দেখে নাই! তবে একি হইল?—ভাবিল অবশ্য ইহার ভিতর কিছু অর্থ আছে।

দুঃখে, রাগে, অভিমানে তাহার মন ভাঙ্গিয়া গেল, সে আর তখন ভালমন্দ বিচার করিতে না পারিয়া—যে দাদাকে সে এতকাল পিতৃ-তুল্য জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছে, যাহার সম্মুখে কখন সে একটি বড় কথা বলিতে সাহস করে নাই—আজ মনের আবেগে সে বলিয়া ফেলিল—"টাকা সমস্ত আমি খাইয়া ফেলি।" সদয় বাবু আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

নির্ম্মল আকাশে যে কাল মেঘখানি উঠিয়াছিল, ক্রমে তাহা আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। গভীর গর্জ্জন ও বজ্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বজ্রপাতেই বিজয়ের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়াছে—আর সে সহ্য করিতে পারিল না।

বিজয় এতদিন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়া যে ব্যবসায়ের উন্নতি করিল, তাহার ফল কি এই হইল?—সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন ভাবে নাই যে দাদা তাহার পর হইতে পারেন বা সে পরের কার্য্য করিতেছে। লোকে অনেক সময় বলিত, "বিজয়, তুমি যে এই প্রাণ দিয়া দিবারাত্র খাটিতেছ, এ কাহার জন্য, ইহাতে কি তোমার নিজের কোন স্বার্থ আছে?—আজ যদি তোমার দাদা তোমাকে তাড়াইয়া দেন, তবে কাল তুমি কোথায় যাইবে বা কি খাইবে?"—বিজয় এ সকল কথা কানেই তুলিত না, বরং যাহারা এ কথা বলিত, সে তাহাদিগকে অতি নীচ প্রকৃতির লোক মনে করিত। ভাবিত দাদা কি আবার কখন পর হইতে পারে?

এতদিনে বিজয়ের চক্ষু ফুটিল। সে যখন দেখিল যে তাহার এই এতদিনের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের ফল অবিশ্বাসে পরিণত হইল, তখন আর সে তাহা সহ্য করিতে পারিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,

আর এখানে থাকিব না, যেখানে হোক্ একটা চাকরী যোগাড় করিয়া চলিয়া যাইব। গোপনে চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং ভগবানের কৃপায় অল্পদিন মধ্যে একটি সামান্য বেতনের চাকরীর যোগাড় হইল। হিসাব পত্র বুঝাইয়া দিয়া বিজয় চাকরী করিতে চলিয়া গেল।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। সদয় বাবুরা দুই ভাইয়ে সদ্ভাবের সহিত এক-যোগে কার্য্য করিয়া ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি করিতেছেন, এবং উভয়ে মনের সুখে দিনযাপন করিতেছেন, ইহা তাহাদের প্রাণে সহ্য হইল না। তাহারা নানারূপ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া সদয় বাবুর সরল মনটিকে পাক্ড়াও করিল এবং তাহার কানে এমন যাদু-মন্ত্র ফুঁকিয়া দিল যে তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। মন্ত্রের ভেল্কিতে চারিদিকে কেবল প্রবঞ্চনা দেখিতে লাগিলেন, মন অবিশ্বাসে ভরিয়া গেল, ভীষণ স্বার্থ জাগিয়া উঠিল, ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আর রহিল না। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া এত স্নেহের, এত ভালবাসার ভাইকেও অবিশ্বাস করিলেন, কঠিন বাক্যবাণে তাহার হৃদয় ব্যথিত করিলেন, সরল প্রাণ ভাই তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, জ্যেষ্ঠের কোপানলে একেবারে ভস্মীভূত হইবার ভয়ে আস্তে আস্তে প্রাণটা লইয়া সরিয়া পড়িল।

আগুন একবার জ্বলিলে আর সহজে নিভে না। যাহাদের পরামর্শে ও উত্তেজনায় সদয় বাবু এই কার্য্য করিলেন, আগুন ক্রমে তাহাদের দিকেও ধাবিত হইল এবং এক এক করিয়া তাহাদেরও দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে স্বয়ং কর্ত্তাকেও আক্রমণ করিল এবং অল্পকাল মধ্যে তাঁহাকেও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

বিজয় চলিয়া যাওয়ার পর, ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় সদয় বাবুর একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন, সুতরাং গুরুর দ্রব্যকে আত্মবৎ জ্ঞানে তিনি যথাসাধ্য আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। এদিকে সদয় বাবুও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

দুঃখের সময় না হইলে শত্রু মিত্র বুঝা যায় না। সদয় বাবুর যখন দুঃখের সময় আসিল তখন ঘটনা পরম্পরায় ক্রমে সকলকেই চিনিতে পারিলেন। তখন তাঁহার পূর্ব্ব-জ্ঞান ও স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে লাগিল—যেন এত দিন কোন ঐন্দ্রজালিক মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এখন কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা আর তাঁহার নিকট গোপন রহিল না। নিজের অন্যায় কার্য্যের জন্য তিনি তখন নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং বিজয়কে ফিরিয়া আসিবার জন্য বারম্বার পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ভাঙ্গা মন আর যোড়া লাগে না। বিজয়ের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিল মনটা একবার ভাঙ্গিয়া দুই খানা হইয়াছে, যোড়া দিতে গিয়া যদি আবার ভাঙ্গে, তবে হয়তো অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যাইবে, তদপেক্ষা এই অর্দ্ধভগ্ন মনটা লইয়া তফাতে থাকাই ভাল, অন্ততঃ অস্তিত্বটাও তো থাকিবে।

বিজয় আসিল না। সদয় বাবু কতক

মনের ক্ষোভে, কতক পীড়ার দায়ে এবং কতকটা ব্যবসায়ের বিশৃঙ্খলতা হেতু, বিষয় কার্য্য সমস্ত উঠাইয়া দিলেন ও বায়ু পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে মধুপুর গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, হঠাৎ রোগ বৃদ্ধি হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে কনিষ্ঠকে দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময়ে ভয়ানক পীড়া হওয়ায় কনিষ্ঠও উপস্থিত হইতে পারিল না। শেষ দেখা আর হইল না।

* * *

জগদীশ্বরের কৃপায় বিজয় এখন বেস্ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। তাহার সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং বিশেষ ভাবনা চিন্তা বা অর্থের অনটনও তাহার ছিল না, এক রকম বেস্ সুখেই দিন কাটাইতেছিল। অতিশয় কঠিন পীড়া হওয়ায় বিজয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যে দিন সবে মাত্র পথ্য করিয়াছে, সেই দিনই জ্যেষ্ঠের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল, মাটিতে পড়িয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সকলে অনেক বুঝাইবার পর কিঞ্চিৎ শান্ত হইল ও তৎক্ষণাৎ দশ দিনের ছুটি লইয়া বাটি রওনা হইল।

ওদিকে সদয় বাবুর স্ত্রী তাঁহার ছোট ছোট পুত্র-কন্যাগুলিকে লইয়া বাটিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। সদয় বাবু বহুতর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন করিবার ভার কেহ গ্রহণ না করিলে, তাহাদের দিন চলা কঠিন।

ভগবান লীলাময়। তাঁহার লীলা কে বুঝিতে পারে?—ইহাদিগকে গলায় গাথিবেন বলিয়াই বুঝি তিনি বিজয়কে সন্তানাদি দিয়া বিব্রত করেন নাই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই যিনি মাতৃস্তনে তাহার আহারের যোগাড় করিয়া রাখেন, ইহাদের প্রতিপালনের জন্যও অবশ্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিজয় তাহাদিগকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিয়া সকলকে লইয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিল, এবং সেই ছোট ছোট বালকবালিকাগুলিকে নিজ সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। বিজয়ের পুত্রকন্যার অভাব মিটিয়া গেল, আর তাহারাও ক্রমে পিতৃহীন হওয়ার দুঃখ ভুলিয়া গেল।

সদয় বাবু অতি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র ও ন্যায়-পরায়ণ লোক জগতে বিরল। কিন্তু সময়ের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এ হেন ব্যক্তিরও মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল। কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে একবার প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কি করিতেছি? সময় আমাকে বাধ্য করিয়া করাইতেছে—আমি সবই বুঝি, কিন্তু বুঝিয়াও অবুঝ হইয়াছি—**সকলই সময়ের ফের।**"

সমাপ্ত।

জনৈক ভুক্তভোগী।

মা।

কালীমূর্ত্তি।

কালীরূপে মা কাল-কামিনী কালাভ্র প্রভা হরে।
কালী কালী বলরে মন হের মনে,নয়ন ভরে॥
চিতাঙ্গারাস্থি মুণ্ডালী মণ্ডিত কাল কাননে
শবরূপ শঙ্করোরসি সমাসীনা মা বীরাসনে
কল্পতরুর তলে কিবা মণি-পীঠোপরে॥
ভূত প্রেত প্রেতিনী যত নাচে খেলে চারিপাশে
কভু বা চীৎকারে ঘোরে ফাটায় গগন অট্টহাসে
শিবাগণ সঙ্গীতের সনে রাগিণী ধরে॥
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজে
দিতেছেন অভয় বর উর্দ্ধাধো দক্ষিণ ভুজে
সাধকের সাধের সুধা ঝরে পয়োধরে॥
মুণ্ডমালা গলে দোলে ঝরিছে রুধির তায়
রক্তমাখা কর-কাঞ্চী কটীদেশে কি শোভা পায়
ভয়ঙ্করা স্নেহভরা হাসে অধরে॥
আসব-রুধির-পানে লক লক রসনা
সৃক্কণে রুধির ধারা কড় কড় দশনা
ত্রিলোচনা বাল শশী ভালে শোভা করে॥
রতন খচিত কত বিবিধ ভূষণ গায়
রতন মুকুট শিরে রতন নূপুর পায়
কর্ণে শব দোলে গলে ফণী ফণা ধরে॥
আলু থালু চাঁচর চুল তায় শোভে মুকুতা ফুল
দেশ ছাড়া জ্যোতিতে বসন যথা যম নামে।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত মুনি ঋষি সকলে যুটে
করুণা কামনা করি দাঁড়াইয়া কর পুটে
বোধানন্দের হৃদি-দ্বীপে চিন্তামণি-পুরে॥

আবাহন।

বড় মা বাসনা রচিবারে গাথা,
করিবারে মা তোর মহিমা গান।
লোকে যা পড়িবে আনন্দে মজিবে,
মা মা মা মা রবে ধরিবে তান॥
কিন্তু মা যে আমি উঠিতে পারি না,
নড়িতে চড়িতে বসিতে জানি না
মা মা বুলি মুখে তাও যে ফোটে না,
হৃদে বিঁধে দিলি বাসনা-বাণ॥
বাসনা-রূপিণী তুই মা শবাসনা,
জাগিলি হৃদয়ে জাগিল বাসনা
পুরাতে তা তবে তোরি তো ভাবনা
গেয়ে দেনা দেখি দু চারি গান॥
লোকে ভাল বলে গরবে ফাটিব,
গাবে সবে শুনি হরষে নাচিব
মা বোলে ডাকিবে—ডাকিব—শুনিব,
মা নাম বিনা না শুনিবে কান॥
যদি ঘৃণা করে হাঁসিয়া উড়ায়,
বুঝিব মানুষ নাহিক ধরায়
পশুরাও ডাকে ওমা ওমা রবে,
নাহি মা তাদের পশুরও প্রাণ॥
আপনার ভাবে আপনি গাহিব,
হাঁসিব কাঁদিব কভু বা নাচিব
বোধানন্দনাথে দিলে গো মা সাধে,
মরুতে মা নামে নাচিবে বাণ॥

গ্রহণ।

রবি শশী তোর মা নয়ন চিরকাল জানি।
রাহু তাকে করে মা গ্রাস কিসে তা মানি॥
কেবা রাহু কেউ না জানে কতই কথা কয় মা কানে
যে যা বলে বলুক ছলে তাতে কি হানি॥
বেদ তন্ত্র জ্ঞাত নন অন্ধ যত দরশন
বিজ্ঞানের অজ্ঞাত মা তোর চরণ দুখানি॥
কাম ভস্মে কাঁদে রতি সদয়া তাই ভগবতী
অনঙ্গে করেন সাঙ্গ সাথে শূলপাণি।
ধূর্জ্জটীর জটাজালে চঞ্চু ঢাকে কালে কালে
বুঝে দেখ বোধানন্দের নিগূঢ় বাণী॥

মা'য়ের উক্তি।

তোরা আমায় ভালবাসিস্?—তোদের দুখিনী জননী ব'লে আমায় কি সদাই মনে পড়ে? আমার কোটি কোটি সন্তানের জন্য আমি অহর্নিশ পাগলিনী, তাই কি তোরা আমায় ভালবাসিস? যখন সকলেই নিদ্রা যায়, শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করে, আমার চোকে ঘুম নাই, আমি তোদের শয্যাপার্শ্বে বসে চৌকি দিই আর তোদের সুন্দর মুখ বার বার দেখি, তাই কি আমায় ভালবাসিস? দুঃখ দারিদ্র্যের দিনে যখন সকল আত্মীয় বান্ধব তোদের ত্যাগ করে তখন আমিই কেবল (হতভাগিনী) অলক্ষ্যে কাঁদি আর তোদের অন্তরে আশা ও বল দিই, তাই কি তোরা আমায় ভালবাসিস? সুখ সম্পদের সময় যখন তোরা আনন্দে ভাসমান থাকিস্ তোদের দুঃখিনী জননীর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাস, তখন আমি অলক্ষ্যে তোদের আনন্দে আনন্দিতা হই আর ভাবি, হায় কবে তোরা নিত্য বস্তুতে এইরূপ আনন্দ পাইবি! তাই কি তোরা আমায় ভালবাসিস্?

যারা আমায় ভালবাসে, আমার কাজ ক'রতে প্রস্তুত, তাদের উপর মাঝে মাঝে আমি এক আধটি ছোট ছোট কাজের ভার দিই। এই কাজ গুলি কি, শুনিবি? আমার দুগ্ধপোষ্য শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ। মনে রাখিবি, যে আমায় ভালবাসে, আমার সেবা করতে চায়, তাকে আমি খাটাই। সে যদি আনন্দে আমার এই অব্যক্ত নিদেশ পালন করে, তবেই ভাল, সে ক্রমে উপযুক্ত ছেলে হয়, তার উপর ক্রমে বড় বড় কাজের ভার দিই। আর যদি সে অবহেলা করে, তবেই বুঝি সে এখনও শিশু, আমার কাজ করবার যোগ্যতা তার এখনও হয় নাই।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী B.A.

প্রিয়তমা।

ফুল্ল আনন খানি　　হেরিলেই অনুমানি
গগনের পূর্ণশশী যেন।
মধু-মাখা হাসি-রাশি　জ্যোৎস্নাসম পরকাশি।
হৃদাকাশ আলো ক'রে হেন।
চিন্তারূপ অন্ধকার　　সেখানে থাকে না আর
অন্তর, সুধায় ভ'রে যায়,
ধরা মাঝে হেন আর　নাহি দেখি চমৎকার
কত ভাব প্রাণে আনে হায়!

বিশ্বপ্রেম শিখাবার　　গ্রন্থখানি চমৎকার
প্রেমময় দিয়েছেন মোরে,
এ রতন হৃদে ল'য়ে　　রব সদা বদ্ধ হ'য়ে
প্রেমময়-প্রেমময়-ডোরে।
আমারে সর্ব্বস্ব-দিয়ে,　আছে যথা মোরে নিয়ে
প্রিয়তমা হ'য়েছে আমার,
আমিও তোমারে, হরি,　দিবে প্রাণ মন ধরি'
সেইমত হইব তোমার।

— শ্রীরজনিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

গয়াক্ষেত্রে গৌরচন্দ্র।*

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"
(শ্রীলশ্রীরূপ গোস্বামী)

"কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস হৃদয় করে সরস সে রস-প্রকাশ নাহি ছিল এ ধরায়;
বিতরিতে সেই রস হৈয়া কৃপা-পরবশ অবতীর্ণ কলিযুগে ধরি গৌর-কায়।
পুরট-সুবর্ণ, হায়, যেইমত শোভা পায় রাশি রাশি একস্থানে একত্রে রাখিলে,
সে শোভা গঞ্জিয়া মরি দেহ-কান্তি ধরি' হরি, নিজ-ভক্তি-ধন আনি, জগজনে দিলে।
শ্রীশচীর গর্ভ-সিন্ধু তাহে গোরা পূর্ণ-ইন্দু করুণা-কৌমুদীরাশি করিয়া প্রকাশ,
লোকশিক্ষা তরে আসি' কলুষ-তিমির নাশি' করিলেন পাপী-জনে চরণের দাস।
সেই গোরা কৃপাময়, প্রকাশিয়া এ সময় সকলের হৃদয়-কন্দর-মাঝে, মরি;
নাশিবে দুরন্ত ধ্বান্ত একান্ত কমলা-কান্ত বলাইয়া সর্ব্বজনে মুখে হরি হরি।"

সূচনা।

শ্রীভগবান, লোকশিক্ষা, ধর্ম্ম-সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই সকল কার্য্যের জন্য প্রায়শঃ তাঁহাকে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইতে হয় না। অংশাবতার হইলেই চলে,—শক্ত্যাবেশ অবতার দ্বারাই অধিকাংশ কার্য্য সাধিত হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ-অবতার আর গুণ অবতার।
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন গুণাবতার গণি।
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু ব্যাস মুনি।"

পূর্ণ-অবতার এই সমুদায় হইতে স্বতন্ত্র। তিনি অবতারী। তাঁহা হইতেই সকল অবতার। তাই ভগবান শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে আমরা নিত্যধামে নিত্যসেবারত প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামী, সিদ্ধান্তবাচস্পতি সঙ্কলিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ভাগবত শ্রেষ্ঠ শ্রীল কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত শ্রীমৎ চৈতন্যচরিতামৃত ও তাহার অমৃতপ্রবাহভাষ্য বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এবং আমাদের প্রতিবেশী চৈতন্যচরণন্যস্তমানস শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রচারিত (Index to the Atlas of Sree Gauranga Bharat-Bhumi.) হইতে যথেচ্ছ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

"মৎস্য কূর্ম্ম আদি দেখ যত অবতার,
কেহ অংশ কেহ কলা জানিবে তাঁহার।
কৃষ্ণচন্দ্র জানিবে সাক্ষাৎ ভগবান,
অবতীর্ণ হৈয়াছিলা ইথে নাহি আন।
ইন্দ্রশত্রু, যুগে যুগে জগতে যখন,
দেয় পীড়া; আসি রক্ষা করেন তখন।"

অবতারগণের কার্য্য ভূভার-হরণ, সাধুগণের সংরক্ষণ এবং দুরাচারগণের দমন। যখন জগতে এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হয়, তখন তিনি, কখনও অংশাবতার হইয়া, কখনও বা শক্ত্যাবেশ-অবতার হইয়া তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

"হে ভারত, মলিনতা ঘটে ধর্ম্মে যে সময়,
অবতীর্ণ হই যবে অধর্ম্ম প্রবল হয়।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন তরে যুগে যুগে অবতরি'
সাধু-পরিত্রাণ আর দুষ্কৃত-বিনাশ করি।

যখন, যেরূপ প্রয়োজন ঘটে, তিনি তখন তদনুরূপ অংশাদি অবতার হইয়া থাকেন। তিনিই অবতার বটেন—কিন্তু সেই অবতার তিনি নহেন। অবতার তাঁহা হইতে—এ বিশ্বের সকলি তাঁহা হইতে—কিন্তু সব তিনি নন। তিনি পূর্ণ—কিন্তু এ সবে অনুভাবে বীজরূপে সব শক্তি থাকিলেও—প্রয়োজনীয় শক্তিগুলিরই বিকাশ আছে, তাহাও পূর্ণ বিকাশ নহে—প্রয়োজনানুরূপ বিকাশ মাত্র। কথাটি—বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলাম না। প্রাণ যতটুকু অনুভব করিতেছে—সেটুকু বেশ পরিষ্কার অনুভব নয় বলিয়াই বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। যিনি পারিয়াছেন, তাঁহার বাক্য উদ্ধার করিয়া বিশদ করিলাম—

"কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ॥
অংশ-শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি'॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ॥
চিৎশক্তি, স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্যা নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী।

এখন বোধ হয় বুঝা গেল। "সূত্রে মণিগণা ইব" সমস্তই তাঁহাতে আছে, তাই "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" আর "যথাকাশ-স্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্"। সেই-রূপ "ন চাহং তেষবস্থিতঃ।" ঘট জলপূর্ণ হ'য়ে সমুদ্রের মধ্যে আছে, কিন্তু সমুদ্র ঘটের

মধ্যে নাই—ঘটের মধ্যে আছে সমুদ্রের জল!

এখন প্রশ্ন এই শ্রীগৌরচন্দ্র এই সকল অবতারের কোনও অবতার কি না? অনেকেরই মনের ধারণা তিনি ভক্তমাত্র! মনের বলিলাম, কেন না কাহারও প্রাণের এরূপ ধারণা হইতেই পারে না। প্রাণ চিরদিনই প্রাণনাথকে চিনে। কিন্তু এ জগতে এমন জীব অনেক আছে, যাহাদের প্রাণের সঙ্গে কোন কারবার নাই। তাহারা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার লইয়াই বিব্রত। তাহাদের চক্ষে আপাততঃ সত্য-তত্ত্ব আবরিত থাকিবেই। এরূপ লোকে বলে, তোমরা শ্রীগৌরচন্দ্রকে যদি একান্তই অবতার বলিতে চাও তবে তোমাদের স্বত্রানুসারে বড় জোর শক্ত্যাবেশ অবতার বলিতে পার। তাহাদের সে সন্দেহ দূর করা আমার মত লোকের কর্ম্ম নয়। প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম জানিবার একমাত্র উপায় আছে। মর্ত্ত্যধামে চিরপ্রকট-চৈতন্যস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের কৃপাই সেই উপায়। যদি তাঁহারা ভক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা হইলেও আমরা তাঁহাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়াই মনে করিব। কারণ এবার তাঁ'র আসা ভক্তরূপেই বটে। এবারে তাঁহার অবতার হইবার সাধারণ কারণ তিনি নিজে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর মুখে বলিতেছেন—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া ভরাব ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥"

নিজে তুমি কাহার ভক্ত হইবে নাথ?—তোমার এ কষ্ট সহিবার প্রয়োজন কি?—আছে। নিশ্চয়ই আছে। নহিলে তুমি তোমার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিবে কেন—

"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।"

তুমি কর; তাই জগৎ করে। তুমি তোমার ভক্তগণকে লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে বল। তাঁহারা যে কার্য্য করেন, তদ্দর্শনে ইতর সাধারণ জনগণ সেই পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। তোমার ভক্তগণের চক্ষের সম্মুখে তুমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছ—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

তোমার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কে আছে? তাই সময়ে সময়ে তোমায় নিজে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য আসিতে হয়। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রভৃতি চব্বিশজন যদি তোমায় দেখিয়া সেই পথে যায়, তবেই রক্ষা। না যায় যদি—তবে তাহাদের কষ্টের অবধি থাকে না।

কিরূপে সংসারী হইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছ, আর তোমার সেই কাজ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

"বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশসম্ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেম-নাম-প্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে॥"

তুমি বাল্যে বাল্য-চাপল্যের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাণে, বিদ্যার জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা চাই তাহা দেখাইয়াছ।

লোকে শিশুগণকে, তোমার সে ব্যাকুলতার চিত্র দেখাইয়া প্রথম বয়সে তাহাদিগকে তেমনি ব্যাকুল করিতে চায় না কেন?—তোমার মত বাল্যক্রীড়া করিতে তাহাদিগকে শেখায় না কেন? জন্মান্তরের কর্ম্মফল

তাহারা এ জন্মে ভোগ করে করুক; কিন্তু যাহার ফল চির-মধুর, এ জন্মে তাহাদিগকে এমন নূতন কর্ম্ম করিতে শেখায় না কেন? — **সন্দেশের** প্রয়োজন বুঝায় না কেন? বুঝায় না কেন—**যথার্থ সন্দেশ** কি?—নৃত্য গীত হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া—তাহাদের অতৃপ্ত লালসার সাহায্যে তাহাদিগকে নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে কেন?—হায়! তাহারা বুঝে না কেন?— **গোপনই পাপ! পাপই গোপন**। যাহা স্বতঃ প্রকাশিত থাকে, তাহা পুণ্য বই পাপ হইতে পারে না। মলা থাকিলেও সহজেই যায়। শিশুগণকে এ পথে চালিত না করিলে, তাঁহারা **প্রেম** জানিবে না। কামের কিঙ্কর হইয়া কষ্ট পাইবে। সংযম—ব্রহ্মচর্য্য যাহার নাই, সে কোনও দিন **প্রেম** চিনিতে পারে না।

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর স্বর্ণ যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥"

গৌরচন্দ্র এবার জগৎকে শিখাইতে আসিয়াছেন "কি করিয়া কি করিতে হয়।" তাই দেখাইতেছেন সংসারে শুধু আমোদের তরঙ্গে গা ভাসাইলে চলে না—অন্য অনেক কর্ত্তব্য আছে—যাঁহারা আগে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য আছে—যাঁহারা পরে আসিবেন তাঁহাদের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা আগে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাহা দেখাইবার জন্যই তাঁহার গয়াক্ষেত্রে গমন। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর বলিতেছেন –

"এই মত লোকশিক্ষা তরে বিশ্বম্ভর।
গয়া করিবারে যা'ব —করিলা অন্তর॥
পিতৃ-পিণ্ড দান দিব গয়াশিরোপরি।
গদাধর আদিবিষ্ণু পদে নমস্করি॥"

গয়া-যাত্রা।

শকাব্দা ১৪৩০, আশ্বিন মাস। শরৎ কাল। আকাশ পরিষ্কার—পথঘাট পরিষ্কার। চারিদিক শস্য-শাদ্বলে সুশোভিত। দেখিলে মনে হয়, যেন প্রশান্ত হরিৎ-সিন্ধু মৃদুল-বায়ু-তাড়িত হইয়া ঈষদুন্নত ঊর্ম্মিমালায় শোভিত হইয়াছে। তীর্থ ভ্রমণে—প্রবাস-গমনে—এমনই সময়ই উপযুক্ত বটে।

গৌরচন্দ্র ত্রয়োবিংশতি বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। সংসারে নবপ্রবিষ্ট নবীন যুবকগণ, সচরাচর এমন বয়সে আমোদ আহ্লাদেই সময় অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন। এরূপ বয়সে তীর্থ-গমনের কথা সচরাচর কাহারও মনে উদিত হয় না। গৌরচন্দ্র ভাবিলেন, জীবের জানা উচিত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কদাচও কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। মানবের প্রধান কর্ত্তব্য পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করা। গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান এই সমুদায় কর্ত্তব্যের অন্যতম। তাই তিনি গয়াযাত্রার জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিলেন। এতদ্ব্যতীত এই গয়াযাত্রায় তাঁহার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা—

"আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে।"

এই ভক্তি আচরণের পূর্ব্বে, তাঁহাকে সাধন-পথে যাইতে হইবে—যথারীতি শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিতে হইবে। সাধন-পথে প্রবেশ

করিতে হইলে যে মানবের শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন—এ কথাটিও তাঁহাকে শিখাইতে হইবে। আরও শিখাইতে হইবে যে, শ্রীগুরুচরণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অন্বেষণে গমন করিতে হয়। লৌল্য ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভম্
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতম্
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।"

"এই নরদেহ-ক্ষেত্র সকল ফলের ভূমি
তাই আদ্য বলি এরে কয়,
সুলভ এ দেহ এবে সুদুর্লভ কিন্তু ইহা
এই তত্ত্ব যেন মনে রয়।
সুকল্পিত নৌকা এটি ভবসিন্ধু উত্তরণে
গুরুদেব ইথে কর্ণধার।
মোর কৃপা-বায়ু পেলে সুখে চ'লে এ তরণী
সংসার-সমুদ্র হয় পার।
হেন নৌকা, কর্ণধার, সুলভ পাইয়ে যেবা
নাহি করে, চেষ্টা যেতে পারে,
ধিক তারে শতবার অধিক কি কব আর
"আত্মঘাতী" বলি যে তাহারে॥"

যদি বল, সেই ভবসাগরের কর্ণধারকে পাই কোথা?—ভয় কি ভাই? তিনি তোমার অন্তরেই চৈত্ত্য-গুরুরূপে রহিয়াছেন—আর বাহিরেও তিনি তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া কোল পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।—তুমি একবার ব্যাকুল হইয়া চাহিলেই পাইবে। আর তোমাকে আকুল দেখিলেই তিনি আসিয়া বাহিরে দেখা দিবেন। লৌল্য বই তাঁহাকে পাইবার অন্য মূল্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভের তিনি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি লৌল্যমেকলম্
জন্মকোটিসুকৃতৈন লভ্যতে॥"

"কোটি জন্ম তপ-জপ সুকৃতি নিচয়,
করিলেও সেই ধন লব্ধ নাহি হয়,
লৌল্য বই যে ধনের অন্য মূল্য নাই
পাও যদি কোনো খানে কিনিও তাহাই।
সেই ধন মতি এক পরম সুন্দর
কৃষ্ণভক্তিরসে মাখা বাহির-অন্তর।"

সেই কৃষ্ণ-ভক্তিরস-ভাবিতা-মতি যে কেবল শ্রীগুরুকৃপা দ্বারাই লব্ধ হইতে পারে এবং লৌল্যই যে তাহার একমাত্র মূল্য, ইহা দেখাইবার আয়োজন, এই গয়াযাত্রা। সে লৌল্য যে কিরূপ তাহা শ্রীগৌরচন্দ্র ভাল-রূপেই জীবকে দেখাইয়াছেন। যত্ন কর ভাই, যদি সে লৌল্যের কণামাত্রও পাও কৃতার্থ হইবে।

শ্রীগৌরচন্দ্র লোক-শিক্ষার্থে গয়া-ধামে চলিলেন। ব্যাসাবতার শ্রীমদ্বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

"শাস্ত্র-বিধি-মত শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া॥"

তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ-কার্য্য যে অবশ্য কর্ত্তব্য—তাহাই শিখাইবার জন্য তাঁহার এই শ্রাদ্ধ-কার্য্য।

এখন এই শাস্ত্র-বিধি কি তাহা বলিতেছি। যাত্রার শুভদিন স্থির হইলে, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে একাহারী হবিষ্যাশী হইয়া সংযত থাকিবে। পর-দিন প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক, ইষ্ট পূজায় এবং জপাদিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া উপবাসী থাকিবে। পরে যাত্রার দিন প্রাতঃকৃত্য ও ইষ্ট-পূজার পর—মস্তক মুণ্ডন

পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া পঞ্চবার নিজগ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শুভযাত্রা করিবে।

শ্রীগৌরচন্দ্রও শুভক্ষণে—

"জননীর আজ্ঞা লই মহাহয মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে॥
সর্ব্ব-দেশ গ্রাম করি পুণ্য-তীর্থ-ময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়॥"

(ব্যাসাবতার-বৃন্দাবন)

"হরিদাস ঠাকুর, পণ্ডিত গদাধর।
গোপীনাথ, মুরারি, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর॥
জগদানন্দ, গোবিন্দ, আচার্য্যরত্ন সঙ্গে।
গয়া-যাত্রা করিলেন, নবদ্বীপ-খণ্ডে॥"

(জয়ানন্দ)

তিনি জননীর চরণে বিদায় লইয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে অনেক লোক চলিল—কেহ শিষ্য—কেহ সখা—কেহ গুরুজন। ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া—

"অনেক সেবক সঙ্গে　　হাস পরিহাস রঙ্গে
ইন্দ্রানী-নৈহাটী করি বামে।
অজয়নদী পার হয়্যা　　আলকোণা ডাহিনে থুএয়া
উত্তরিলা তিলপুরগ্রামে॥"

(জয়ানন্দ)

আহা! শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পথে, গয়াভিমুখে গিয়াছিলেন সেই পথ দেখিতে ইচ্ছা করে—মন বলে, সেই পথের ধূলায় একবার গড়াগড়ি দিতে পারিলে, আর কিছুর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সে পথ কোথায়? অজয় আছে জানি, অজয়ের তীরে ইন্দ্রানী পরগণায় নয়াহাটগ্রাম আছে শুনিয়াছি। সেই বার ঘাট তের হাটের দেশের কথা আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানিতেন। যখন বৃদ্ধ কাশীরাম বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেন, তখন সকলেই জানিত—

"তের হাট, বার ঘাট, তিন চণ্ডী তিনাশ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রানীতে ঘর॥"

এখন বৃদ্ধ কাশীরামের আর সে আদর* আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই ইন্দ্রানীর একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

ইন্দ্রানী পরগণা বৰ্দ্ধমানে। এখানে মণ্ডল হাট প্রভৃতি ত্রয়োদশটি হাটভাগান্ত গ্রাম এবং গঙ্গার ধারে ধারে বারদোয়ারীর ঘাট প্রভৃতি বারটি ঘাট আছে। এই ইন্দ্রানী পরগণাস্থিত ব্রাহ্মণী নদীতীরে সিঙ্গি-গ্রামে প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ-পর্ব্ব ভাষা পদ্য মহাভারতের রচয়িতা কায়স্থ-কুলোদ্ভব কাশীরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজিও তাহার ভিটায় "কেশে পুকুর" তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। মহাপ্রভু এই ইন্দ্রানীর নৈহাটী (বোধ করি নয়া হাট) বামে রাখিয়া অজয় নদী তীরে গমন করিলেন, এবং অজয় পার হইয়া আলকোণা গ্রামের নিকট দিয়া তিলপুরে উপনীত হইলেন। আলকোণা, তিল পুর আজিও আছে কি? সে অঞ্চলের লোকে বলিতে পারেন। আমরা জানি না। আমি ত কখন খুঁজি নাই, সুতরাং জানি না। আজিও হয়ত ঐ সকল গ্রাম ঐ নামেই পরিচিত আছে—নতুবা অনন্ত কালের কবলে লীন হইয়াছে।

তিনি নিজজন সঙ্গে চলিতেছেন। কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, প্রকৃতির শোভা দর্শনে তিনি

* কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের আদর আবার বাড়িতেছে। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি ক্রমে আবার বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।—গৃহস্থ-সম্পাদক।

বিভোর আছেন। কিন্তু পথের লোকে তাঁহাকে দেখিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া—একদৃষ্টে তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী উপভোগ করিতে করিতে উন্মত্তবৎ হইতেছে।

শ্রীল জয়ানন্দ বলিতেছেন—

"শিক্ষাগুরু ভগবান গয়া করিবারে জান
চরণারবিন্দ পরকাশ।
পদরজে অনায়াসে নিরবধি অভিলাষে
কেবল মুনীন্দ্র সহায় ॥
ডাহিনে বামে রাউতড়া একতালা গৌড়পাড়া
বাহিয়া কানাক্ষির নাটশালে।
গড়িপা পর্ব্বত তলে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে
তপত শিকতা রবিজ্বালে ॥"

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু ক্রমে গড়িপা পর্ব্বতের কাছে উপণীত হইল। এই পর্ব্বতটি এখন গুড়পা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ফল্গুতীর্থ হইতে ২৮ মাইল দূরে—আরণ্য প্রদেশে অবস্থিত। এ পর্ব্বতে অনেক ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি আজিও আছে। গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে, এই গুড়পা সন্নিধিতে গুরুপা ষ্টেসন। হাওড়া হইতে ইহার দূরতা ২৬৫ মাইল। মহাপ্রভু এই পর্ব্বত পরিদর্শনপূর্ব্বক বহু পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে মগধে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর—প্রভুর এই ভ্রমণ বিহার অতি সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন,
সে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন।
বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জড় ধায় উভরড়ে;
পশু-পাখী-ধায় সব নেত্রে অশ্রু ঝরে।
কুল বধূ-ধায়-যেন কুল ত্যাগ করি,
সভে বোলে হের-দেখ ব্রজের শ্রীহরি।
ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ,
উন্মত্ত করিলা প্রভু ভ্রমি সর্ব্ব-দেশ।
সর্ব্বপথে এই মতে সর্ব্ব-লোকে ধায়
সর্ব্ব লোকে প্রেমরস সায়রে ভাসায়।"

আহা, গোরাচাঁদের সে অপরূপ রূপ-মাধুরী একবার যাহার চক্ষে পড়িয়াছে সে কি আর জন্মে সে রূপ ভুলিতে পারে?—তাহার জীবন-মন ঐ পদে চিরদিনের জন্য বিক্রীত হইবেই। তাঁহার শ্রীমুখের মধুর বাণী, যাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে—সে জন্মের মত তাঁহার জন্য পাগল হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে শ্রীগৌরচন্দ্র দেখিলেন—

"কুরঙ্গ-কুরঙ্গী কেলি করে এক মেলি।"

শ্রীল লোচনদাস।

সেই দৃশ্য দর্শনে গোরা বিকল হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"লোভ মোহ কাম-ক্রোধে মত্ত পশুগণ,
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ব্ব-জন।
কৃষ্ণ-জ্ঞান নাহি মাত্র পশুর শরীরে,
মনুষ্য না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তারে।"

শ্রীল লোচনদাস।

এইরূপ কথা প্রসঙ্গে শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরচন্দ্র চিরানদীর তীরে উপনীত হইলেন। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"চির-চন্দনয়োর্মধ্যে মন্দারনাম পর্ব্বতঃ।
তস্যারোহণমাত্রেন নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
মন্দারশিখরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা তু মধুসূদনম্।
কামধেনুমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

চিরা আর চন্দনা নামে দুইটি নদীর মাঝে মন্দার পর্ব্বত। এই পর্ব্বত আজিও বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু এখন বঙ্গের যাত্রীরা রেলপথে গয়ায় গমন করেন। অধিকাংশেরই আর

শ্রীমন্দারে শ্রীমধুসূদনের সঙ্গে সাক্ষাতের অবসর হয় না। এই পর্ব্বতটি **মন্দর** নামেও অভিহিত।

উত্তর অক্ষাংশাদি ২৪°-৫০′—২৮″ এবং গ্রীণীচ হইতে পূর্ব্ব দেশান্তরাংশাদি ৮৭°-৪′-৯″ সন্ধিতে অবস্থিত। এই পর্ব্বতটির চারিধার বেষ্টন করিয়া একটি সর্পমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই পরম পবিত্র তীর্থ, ভাগলপুরের নিকটে অবস্থিত। এখানে, এখনও একটি নগরের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবাদ এই, তাহাতে পূর্ব্বে বাহান্নটি বাজার, তিপ্পান্নটি গলি ও অষ্টাশীটি পুষ্করণী ছিল। পর্ব্বতের গায়ে ও নিকটে আজিও অনেকগুলি পুষ্করণী আছে। তত্রত্য একটি ভগ্ন অট্টালিকায় লব্ধ শিলালিপি পাঠে জানা যায় ২৭৭ বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গমন করেন তখন ঐ নগরেরই কোনও শ্রীমধুসূদন-পূজক বিপ্রের গৃহে অতিথি হইয়া থাকিবেন। উক্ত পুষ্করণী গুলির একটির নাম **পাপ-হারিণী**। এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। আর একটির নাম সীতাকুণ্ড। ইহার দৈর্ঘ্য এক শত ফুট ও প্রস্থ প্রায় পঞ্চাশ ফুট। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস সময়ে শ্রীমতী সীতাদেবীর সঙ্গে এখানে কিয়দ্দিন বাস করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে আপর শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে সেই সকল লুপ্ত তীর্থের মহিমা প্রচারিত করিলেন।

সাময়িক সংবাদ সঙ্কলন ও সমালোচনা

গ্রহসংবাদ।—শরৎকালে আকাশ আবার নির্ম্মল হইতেছে। আকাশ পর্য্যবেক্ষণের এই উপযুক্ত সময়। চন্দ্র ৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতির এবং ২০এ কার্ত্তিক শনির সন্নিহিত হইবেন। ৩০এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রি দুইটার সময় চন্দ্র শুক্রের উপর দিয়া যাইবেন। ৪ঠা অগ্রহায়ণ পুনরায় চন্দ্র বৃহস্পতির সন্নিহিত হইবেন।

ভক্তনির্য্যাণ।—গত ১৯এ আশ্বিন শুক্রবার শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে, লাঙ্গলবেড়িয়া নিবাসী, গৌরগতপ্রাণ শ্রীমৎ অঘোর নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই মর্ত্ত্যধামে নশ্বর দেহরক্ষা করিয়া, সিদ্ধদেহে নিত্যবৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি এতদঞ্চলের শ্রীবৈষ্ণবগণের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বিরহে তাঁহার অসংখ্য শিষ্য প্রশিষ্য মণ্ডলী আজ শোকে মুহ্যমান।

নিশিও (Nitschewo)।—শ্রী ১৮৬২ অব্দে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে অবস্থান সময়ে জগদ্বিখ্যাত প্রিন্স বিস্মার্ক (তখন তাঁহার নাম ছিল কৌণ্ট বন বিস্মার্ক) ঐ নগর হইতে একশত বর্ষ্ট (প্রায় তেত্রিশ ক্রোশ) দূরে শিকার করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু তিনি পথভ্রান্ত হইয়া অনেক ঘুরিয়া এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হন। তথায় একজন কৃষকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে স্বীয় গন্তব্য স্থানের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে "বেশী দূর নয় কুড়ি বর্ষ্ট হইবে।" তিনি

তাহাকে সেখানে পৌঁছিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। সে একখানা শ্লেজ (Sledge) ও তুইটা শীর্ণ ঘোটক আনিয়া, তাঁহাকে তাহাতে চড়াইল। তিনি বলিলেন "শীঘ্র নিয়ে যেতে পারিবে?" সে উত্তর করিল, "নিশিও (Nitschewo)" (এই শব্দের অর্থ, নিশ্চয়, কিছু না, কিছু ভাবনা নাই, ইত্যাদি)। কিয়ৎক্ষণ পরে বিস্মার্ক দেখিলেন বড়ই ধীরে চলিয়াছে। তখন তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন "ও তুটা ঘোড়া না ইঁতুর ছানা?" চালক বলিল "নিশিও" এই বলিয়া সে সবলে কশাঘাত করিল। তখন ঘোড়া তুটা এরূপ ছুটিল যে শ্লেজ উল্‌টিয়া পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিস্মার্ক বলিলেন "তুমি কি পাগল?" চালক বলিল "নিশিও!" বিস্মার্ক বলিলেন "উলটিয়া যাইবে যে?" চালক বলিল "নিশিও"। তাহাই হইল। গাড়ী উলটিয়া বিস্মার্ক পড়িয়া গেলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল তিনি উঠিয়া সেই শ্লেজ হইতে এক খণ্ড লৌহ ভাঙ্গিয়া লইয়া সেই চালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। বলিলেন "বর্ব্বর্‌ মূর্খ" তখনও সে অম্লান বদনে বলিল "নিশিও।" বিস্মার্কের আর তাঁহাকে প্রহার করা হইল না, তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। পরে সেই লোহখণ্ডে একটা অঙ্গুরী প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতে লিখাইলেন (**Nitschewo**)।

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি।—শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত স্তোত্র-কাব্য। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা পাঠক। শ্রীল দাস গোস্বামীর কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠহার করিয়া নিরন্তর বলুন—

> হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন
> বক্ত্রারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
> যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ারা-
> ত্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়-সেবনীয়।"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্রসিকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া গান করুন—

> "হা নাথ গোবিন্দ! গোকুলের সুধাকর
> কৃপাদৃষ্টিপাত কিছু কর আমাপর।"

অনুবাদটি মাধুর্য্যময়ী কুসুমাঞ্জলিরই অনুরূপ হইয়াছে।

শ্রীষট্‌পদ।

প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন।—পরলোকগত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা দেশে কেন, ভারতের সর্ব্বত্রই পরিচিত। তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্‌ ও সুচিকিৎসক বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ছিল না বলিলেই হয়। লোকান্তরিত কবিরাজ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটী মর্ম্মর প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটী কোন্‌ স্থানে স্থাপিত হইবে, তাহা এতদিন স্থির হয় নাই। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি—এই মূর্ত্তিটি বিডন উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থাপিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। স্থান-নির্ব্বাচন যে সুন্দর হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরলোকগত কবিরাজ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই মর্ম্মর-প্রস্তরমূর্ত্তিই কি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল? তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশের লোক কি আর কিছুই করিতে পারিলেন না?

(সুলভ সমাচার)

ভূমিকা।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গের প্রথমাংশে সাধারণ-ভাবে জন্মপত্র প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। যে অভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধ এই ভাবে সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমি নিজে যে ভাবে ঐ অংশ আয়ত্ত করিয়াছিলাম, তাহা আমার দৈনন্দিন লিপি হইতে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, আমি যেরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, অন্য কেহ চেষ্টা করিলে, সে পথে গিয়া সেইরূপ সফলকাম হইবেন সন্দেহ নাই। ঠিক তাহাই হইয়াছে। গৃহস্থের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে কখনও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের অনেকেই এই প্রসঙ্গের অনুসরণ করিয়া, সাধারণ জন্মপত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া আমি আমার সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিয়াছি।

অতঃপর প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সমাপ্ত করিব মনে করিয়া, দ্বিতীয় অংশ তদনুরূপভাবে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যে সকল পাঠক পাঠিকা জ্যোতিষপ্রসঙ্গের সাহায্যে জ্যোতিষ-শিক্ষা করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা আপনাদের সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ বিস্তারের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, "ঐরূপে লিখিত হইলে, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর, প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় লেখা যায়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়। একবিধ প্রশ্নের স্বতন্ত্রভাবে উত্তর দিতে হয় না, অথচ প্রসঙ্গক্রমে উত্তরটি যথোচিত বিস্তৃত ভাবেই লেখা যায়।" সে কথা অযথার্থ নয়।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন আমি যে প্রণালীতে ধীরে ধীরে এই শাস্ত্রের যতটুকু আয়ত্ত করিয়াছি, ইহা সেই ভাবেই যেন লিপিবদ্ধ করি। তাহা করা সম্ভব নয়, কারণ আমার দৈনন্দিন লিপিতে প্রতিদিন, আমার অধীত বিষয়ের শিক্ষা-প্রণালী যথাযথ লিখিত নাই। তার পর অনেক বিষয়ের সূক্ষ্ম রহস্য, প্রথম শিক্ষার বহু পরে পাইয়াছি, সেই সকল রহস্য, যথাস্থানে দিলেই ভাল হইবে; অর্থাৎ যখন যে বিষয়ের অবতারণা করা হইবে, সেই বিষয়ে আমি যতটুকু জ্ঞান এতদ্দিনে লাভ করিতে পারিয়াছি সেই টুকু এক স্থানে দেওয়াই উচিত মনে করি।

আমি শুভক্ষণেই শ্রীগুরুচরণে জ্যোতিষ-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া গিয়াছিলাম। সেই শুভা-রম্ভের ফলে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও অনুসন্ধিৎসার হ্রাস হয় নাই; সুতরাং কাহারও নিকট কিছু নূতন পাইলে আজিও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করি। সেই শিক্ষার ফল অবশ্যই আমার পাঠক-গণ পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইবেন।

আমি গত ১২৯৯ সন হইতে কিছুকাল পূজ্যপাদ জ্যোতিষাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত

বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীচরণোপান্তে বসিয়া, বিস্তৃত জন্মপত্র প্রস্তুত-প্রণালী—কোষ্ঠীর বিচার-প্রণালী, এবং প্রশ্ন-শাস্ত্র প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াছিলাম। আজি তিনি এ জগতে নাই, কিন্তু তাঁহার অপার কৃপা আমায় জন্ম-জন্মান্তরেও ত্যাগ করিবে না। পরে আমার দ্বিতীয় জ্যোতিষাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের শ্রীচরণোপান্তে বসিয়া শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ইহাঁরা দুই জনে আমায় প্রত্যক্ষভাবে জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিখাইয়াছিলেন। আর উত্তরপশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী একজন তদ্দেশীয় পণ্ডিতের নিকট কয়েকদিন বৃহৎ পারাশরী সম্বন্ধে কিছু বাচনিক উপদেশ পাইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত পরোক্ষভাবে ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথের কাগজ পত্রগুলি, এবং পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষাচার্য্য এলেন লিও, র‍্যাফেল, জ্যাডকিল, সেফেরিয়েল, লিলি, সিমোনাইট প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থ সমূহও আমায় অনেক রহস্য শিখাইয়াছে; সুতরাং তাঁহারাও যে আমার গুরুস্থানীয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত ঢাকা কলেজের প্রবীণ গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম্, এ, মহাশয়, সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের অগ্রজ মহাশয় এবং পরম প্রিয়তম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দাদামহাশয় আমার পাশ্চাত্য জ্যোতির্গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। অবশেষে সম্প্রতি দাদা মহাশয়ের কৃপায় জ্যোতিস্তত্ত্বপারঙ্গত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশ্বর জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণ দর্শনের অধিকারী হইয়া, তাঁহার আজীবন-যত্নার্জ্জিত-জ্ঞানরাশিতে পূর্ণ তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি কাগজ-পত্র পাইয়াছি। এই সমুদায় বিষয় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রসঙ্গে যথাস্থানে প্রকাশ করিব। যাহাতে সহজে সাধারণে বুঝিতে পারেন এরূপ ভাবেই লিখিতে চেষ্টা করিব। তার পর তাঁহার ইচ্ছা।

পাঠক পাঠিকাগণের শেষ অনুরোধ জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ এরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়, যেন বর্ষ-শেষে একস্থানে আনিয়া বাঁধাইতে পারা যায়। কেন না, কোষ্ঠী প্রস্তুত সময়ে অভীষ্ট অংশ বাহির করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। একত্রে থাকিলে সে অসুবিধা ঘটিবে না। তাহাদের এ অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তাহারও সুব্যবস্থা করিলাম। তবে যাহা আগে বাহির হইয়াছে তাহা অবশ্যই সেই সকল স্থান হইতে খুঁজিয়া লইতে হইবে। তাহার আর অন্য ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গের সুসমাপ্তি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। যিনি সকলের সকল কার্য্যের কর্ত্তা, তিনি যেমন করাইবেন তেমনি হইবে।

শকাব্দা ১৮৩৩ }
১৫ই আশ্বিন }

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

শ্রীগুরু-চরণে

সন ১২৯৯ সাল, ১৭ই মাঘ, রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় গুরুদেব বলিলেন, "বৎস, এস শুভমুহূর্ত্তে তোমার জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যায়ন আরম্ভ করি। জ্যোতিষ শিখিতে হ'লে যতটুকু গণিত জানা প্রয়োজন, তা তুমি অবশ্যই জান, এখন দেখ দেখি, এই পঞ্জিকা খানির এই পৃষ্ঠায় যা যা লেখা আছে, তা সমুদায় বুঝতে পার কি না?" এই বলিয়া আগামী ১৩০০ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ৭৮ পৃষ্ঠা খুলিয়া দিলেন।

আমি প্রথমেই দেখিলাম, **বৈশাখ প্রদং ৫১।৪৪** ও নিম্নে **মহাবিষুব সংক্রান্তিঃ**। তন্নিম্নে "অত্র শেষার্দ্ধ রাত্রি সংক্রমণে পর দিবসীয়াদ্য যামদ্বয়ং পুণ্যং। চরগণে সংক্রমণাৎ মহোদরীয়ং।" প্রথমাবৃত্তির পর কিছুই বুঝিলাম না। একটু ভাবিলাম—এক বার গুরুদেবের চরণের দিকে চাহিলাম—তারপর খুলিয়া দেখিলাম বর্ত্তমান বর্ষের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকাখানির চৈত্রের ৩০এ বাম পার্শ্বের স্তম্ভে রবি ৫১ দণ্ড ৪৪ পল পরে অশ্বিনী নক্ষত্রে যাইবেন, তারপর ৩১এ চৈত্র সংক্রান্তি সেই দিন চড়ক পূজা প্রভৃতি হইবে। মনে মনে ভাবিলাম হয়ত প্রদং প্রবৃত্তি দণ্ডাদির সংক্ষেপ, কিন্তু তা হ'লে প্র দং স্বতন্ত্র হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক সন্দেহ দূর করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম—"বৈশাখের প্রবৃত্তি দণ্ডাদি ৫১ দণ্ড ৪৪ পল কি?

গুরুদেব। "বুঝেছ।"

আমি। "কিছুই না। বরং কোন দিন যে সকল কথা ভাবি নি সেই সকল সন্দেহ আজ মনে উদয় হ'য়েছে।"

গুরু। "একে একে বল।"

আমি। "যদি ৩০এ মঙ্গলবার রাত্রি ৫১ একান্ন দণ্ড ৪৪ চুয়াল্লিশ পলের সময় সংক্রান্তি হ'য়ে বৈশাখ প্রবৃত্তি হ'লো, তবে আবার ৩১এ এলো কোথা থেকে?"

গুরু। সূর্য্য একরাশি থেকে অন্য রাশিতে যে সময় গমন করেন, তার পূর্ব্বের ষোল দণ্ড আর পরের ষোল দণ্ড পুণ্যকাল, অর্থাৎ এই বত্রিশ দণ্ড মধ্যেই সংক্রান্তির কৃত্য করা উচিত; যথা—

> "সংক্রান্তিকালাদুভয়ত্র নাড়িকাঃ
> পুণ্যা মতাঃ ষোড়শ ষোড়শোষ্ণগোঃ।
> নিশীথতোঽর্ব্বাগপরত্র সংক্রমে
> পূর্ব্বাপরাহান্তিমপুণ্যভাগয়োঃ॥"

কিন্তু রাত্রিতে সংক্রমণ হ'লে, সময়ে সময়ে ঐ পুণ্যকাল এত অল্পই দিবস মধ্যে পড়বে যে তাহার মধ্যে সংক্রান্তি-কৃত্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ঐ শ্লোকের শেষ চরণে বল্লেন "নিশীথতোঽর্ব্বাগপরত্র সংক্রমে পূর্ব্বাপরাহান্তিমপুণ্যভাগয়োঃ" অর্থাৎ মধ্যরাত্রের পূর্ব্বে সংক্রমণ হ'লে পূর্ব্বদিনের শেষার্দ্ধ এবং পরে হইলে পর দিনের পূর্ব্বার্দ্ধ পুণ্যকাল হ'বে। এখানে ৫১ দণ্ড ৪৪ পলের পর সংক্রমণ হওয়ায় পরদিনের পূর্ব্বার্দ্ধে সংক্রান্তি

কৃত্য হ'বে, তা'ই ৩১এ চৈত্র সংক্রান্তি লিখ্‌তে হ'য়েছে। বস্তুতঃ ও দিনটা এ বৎসরেরই, সেই জন্য দেখ এ বৎসরের পঞ্জিকায় ৩১এ চৈত্র হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে।" এই বলিয়া পঞ্জিকার পর-পৃষ্ঠা দেখাইলেন। দেখিলাম ৮০ পৃষ্ঠায় ৩১এ চৈত্র আছে বটে।

আমি। "মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে বা পশ্চাতে হ'লে ত এই ব্যবস্থা। ঠিক মধ্য রাত্রেও ত সংক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়।"

গুরু। "তারও ব্যবস্থা আছে—

"পূর্ণে নিশীথে যদি সংক্রমঃ স্যাৎ
দিনদ্বয়ং পুণ্যমথোদয়াস্তাৎ।
পূর্ব্বং পরস্তাদ্‌যদি যাম্যসৌম্যা-
য়নে দিনে পূর্ব্বপরে তু পুণ্যে॥"

অর্থাৎ ঠিক মধ্যরাত্রিতে সংক্রমণ হ'লে দু'দিনই পুণ্যকাল হ'বে। সেরূপ ক্ষেত্রেও পরের দিনটি পূর্ব্বমাসের অধিক দিন ব'লে লেখা হ'বে। শেষ চরণদ্বয়ে সংক্রান্তি সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ লিখ্‌চেন্— "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কর্কট-সংক্রান্তি হ'লে পূর্ব্বদিন এবং সূর্য্যাস্তের পরে মকর-সংক্রান্তি হ'লে পরদিন পুণ্যকাল হ'বে। এ সকল স্মৃতির কথা, এতে আমাদের প্রয়োজন নাই। একান্ত জান্‌বার দরকার থাকে সংক্রান্তি গণনা শিক্ষার পর ঐ সকল কোরো।

আমি। "তবে মহাবিষুব মহোদরী এখন থাকবে?"

গুরু। "সংক্রান্তি কটা জান ত?"

আমি। "যখন রাশির সংখ্যা বারটা তখন সংক্রান্তিও বারটা।"

গুরু। "তার মধ্যে দু'টিতে দিনরাত্রি সমান হয় অর্থাৎ ঐ দু'টিতে সূর্য্য ক্রান্তি-বিষুবৎ-ছেদ-বিন্দুতে আগমন করেন। আর দু'টির একটিতে দিনের চরম বৃদ্ধি, আর একটিতে রাত্রির চরম বৃদ্ধি, অর্থাৎ এই দু'টির একটিতে উত্তরায়ণ গতি ও আর একটি দক্ষিণায়ন গতি শেষ হয়। অবশ্য বুঝ্‌তে পারচো প্রথম দু'টির একটি মেষ-সংক্রান্তি, আর একটি তুলা-সংক্রান্তি, এবং শেষ দু'টির আর একটি মকর-সংক্রান্তি আর একটি কর্কট-সংক্রান্তি।"

আমি। "কৈ পারচি? এই ৩১এ ৩০এর কোনও দিনই ত দিন রাত্রি সমান নয়?"

গুরু। "অয়ন-বশে আজি ঐ ক্রান্তি-বিষুবৎ-ছেদ-বিন্দু-অতিক্রম দিনের কালান্তর ঘটেছে।"

আমি। "আরো গোলমাল হ'য়ে গেল যে?"

গুরু। "এই যে পৃথিবী, এটি যে বর্ত্তুলাকার একথাটা অবশ্য জান?"

আমি। "সে ত ইংরাজী মত।"

গুরু। "আমাদের আর্য্য শাস্ত্রেরও মতও তাই। শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

"মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্॥"

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে, শূন্যে ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবী আছে। ভূ-গোল বলাতেই পৃথিবীর বর্ত্তুলত্ব স্বীকৃত হ'য়েছে এবং শূন্যে আছে বলাতেই পৃথিবীর দশ দিকেই যে আকাশ তাহাও বলা হ'য়েছে। তার পর শূন্যে থাকে কিরূপে এ কথার মীমাংসা শ্লোকের শেষ চরণদ্বয়ে আছে। ব্রহ্মের ধারণাত্মিকা পরাশক্তিই এই পৃথিবীর অবলম্বন।"

আমি। "কিন্তু পৃথিবী সৌর-জগতের কেন্দ্র হয় কি রূপে?"

গুরু। সৌর-জগতের ত বলেন নাই।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের। এই পৃথিবীর দশদিকেই যদি অনন্ত আকাশ হয়, তবে পৃথিবীকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলায় কিছুই দোষ হয় নাই। এ ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সৌর-জগৎ আছে। সেই অনন্ত সৌর জগতেরও একটি কেন্দ্র আছে। সে সকল কথা বরং আর একদিন হ'বে। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কথাই হোক। এই বর্ত্তুলাকারের মধ্যে একটি গোলাকার রেখা কল্পনা কোরে যদি এটিকে সমান দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, তা'হ'লে সে দু'টিকে দু'টি ভূগোলার্দ্ধ বলা যেতে পারে।"

আমি। "পাশ্চাত্য ভূগোল শাস্ত্রে দুই প্রকার ভাগের কথা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ।"

গুরু। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের বিভাগটি স্থির-বিভাগ। কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিম গোলার্দ্ধের ভাগটা স্বেচ্ছাধীন। আমাদের আপাততঃ পূর্ব্ব পশ্চিম গোলার্দ্ধ নিয়ে কোনও বিশেষ প্রয়োজন নাই; আপাততঃ এই টুকু জানা দরকার, যে, যে গোল-রেখা-দ্বারা, পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ভাগ করা যায় তাহার নাম বিষুবৎ-রেখা।"

আমি। "ইংরাজীতে যা'রে ইকোয়েটার বলে?"

গুরু। "হ'তে পারে। এই বিষুবতের সম-সূত্রে, গগনতলে যে একটি গোলাকার রেখা কল্পনা করা হয়, তা'র নাম খ-বিষুবৎ।"

আমি। "তা'কে ইংরাজীতে ইকুইনকস্থাল বলে।"

গুরু। "ও কথাটির অর্থ কি?"

আমি "যে রেখায় দিবারাত্রি সমান।"

গুরু। "হাঁ ঐ রেখার উপর সূর্য্য আসিলেই দিন-রাত্রি সমান হয়। এখন সূর্য্যের গতির কথা একবার ভাব।"

আমি। "সূর্য্যের ত গতি নাই?"

গুরু। "গতি আছে ব'লে প্রতীয়মান হ'চ্চে ত? গণনা ক'রে এই ইংরাজী পাঁজিতেও লেখা হ'য়েছে।" এই বলিয়া একখানি বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা দিলেন। বল্লেন এতেও যখন সূর্য্যের স্থান প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন লেখা হ'লো, তখন সূর্য্যের ঐ প্রতীয়মান গতি ধ'রেই যে তোমার পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও গণনা হয়, তা'তে কোনও সন্দেহ নাই।"

আমি। "পৃথিবীর গতিবশেই সূর্য্যের গতি অনুভূত হয়।"

গুরু। "তা হোক। এখন সূর্য্য কোন দিকে ওঠে দেখেছ কি?"

আমি। "সূর্য্য যে পূর্ব্ব দিকে ওঠে, তা সকলেই জানে।"

গুরু। "সকলেই শুনেছে। কিন্তু সূর্য্যোদয় দেখা, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাল, তুমি যদি দেখে থাক, তা'হ'লে অবশ্যই দেখেছ সূর্য্য প্রত্যহ একস্থানে উঠেন না, এবং একস্থানে অস্তও যান না। সূর্য্য (শুধু সূর্য্য কেন চন্দ্রাদি সকল গ্রহই) বিষুব-বৃত্ত পার হ'য়ে, কিছুদিন দক্ষিণে যান; দক্ষিণ গমনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে আবার উত্তর দিকে আস্‌তে থাকেন, ক্রমে আবার বিষুবৎ পার হ'য়ে উত্তরে কিছু দূর যান; উত্তরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাওয়া হ'লে আবার দক্ষিণগামী হ'য়ে বিষুবৎ পার হ'য়ে দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় উপনীত হন। এইরূপে নিরন্তর উত্তর হইতে দক্ষিণ আবার দক্ষিণ হইতে উত্তর গতায়াত করিতেছেন। উত্তরের শেষ সীমা

কর্কট-ক্রান্তি ; দক্ষিণের শেষ সীমা মকর-ক্রান্তি। বিষুবৎ অতিক্রমের সময় দু'টিই দু'টি বিষুবৎ-সংক্রম কাল, তন্মধ্যে সূর্য্যের মেষ-সংক্রমণের নাম মহাবিষুব সংক্রান্তি আর তুলা-সংক্রমণের নাম জল-বিষুবসংক্রান্তি। এই তুলা-সংক্রমণ কাল হ'তে ৮৬ সৌরদিন অন্তর যে কাল তাহার নাম ষড়শীতিমুখ। সুতরাং দ্ব্যাত্মক রাশি চারিটির সংক্রমণ সময়ই ষড়শীতি সংক্রান্তি। তুলা চর-রাশি। ইহার পরিমাণ ৩০ অংশ, বৃশ্চিকের ৩০ অংশ স্থির-রাশি এবং ধনুর ষড়্বিংশ অংশে ৮৬ পূর্ণ হয় সুতরাং উহাই একটি ষড়শীতি-মুখ, তারপর ঐ ধনুর ৪, মকরের ৩০ কুম্ভের ৩০ ও মীনের ২২ অংশে আর একটি ষড়শীতিমুখ, তারপর মীনের ৮, মেষের ৩০, বৃষের ৩০ ও মিথুনের ১৮ অংশে আর একটি ষড়শীতিমুখ, এবং মিথুনের ১২, কর্কটের ৩০, সিংহের ৩০ এবং কন্যার ১৪ অংশে চতুর্থ ষড়শীতিমুখ। যথা শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে—

"তুলাদি ষড়শীত্যহ্নাং ষড়শীতিমুখং ক্রমাৎ।
তচ্চতুষ্টয়মেব স্যাদ্দিস্বভাবেষু রাশিষু ॥
ষড়্বিংশে ধনুষো ভাগে দ্বাবিংশে নিমিষস্য চ।
মিথুনাষ্টাদশে ভাগে কন্যায়াস্তু চতুর্দ্দশ ॥"

এইরূপে ষড়শীতি-মুখ নির্ণয় করা হ'লে সমস্ত রাশি চক্রের (৮৬ × ৪ = ৩৪৪) ৩৬০ অংশ পূর্ণ হ'বার আরও ষোল অংশ বাকী থাকে, এই ষোড়শ অংশ পুণ্যতম। যথা শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে—

"ততঃ শেষাণি কন্যায়া যান্যহানি তু ষোড়শ।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥"

এতদ্ব্যতীত সংক্রান্তির বিষ্ণুপদী সংজ্ঞা। এই বার একটি সূত্রে এই সংক্রান্তি কয়টির নির্দ্দেশ করছি। স্মরণ ক'রে রাখলে কোনটি কোন সংক্রান্তি তা মনে রাখা সহজ হ'বে।

"ষড়শীত্যাননং চাপনৃযুক্কন্যাঝষে ভবেৎ।
তুলাজৌ বিষুবং বিষ্ণুপদং সিংহালিগোঘটে ॥
সৌম্যযাম্যায়নঞ্চৈব মকরে কর্কটে ক্রমাৎ ॥"

অর্থাৎ ধনু, মিথুন, কন্যা ও মীনে ষড়শীতি, তুলা ও মেষে বিষুবদ্দ্বয় এবং সিংহ, বৃশ্চিক, বৃষ ও কুম্ভে বিষ্ণুপদ-চতুষ্টয়। আর মকর রাশিতে উত্তরায়ণ এবং কর্কট রাশিতে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হইয়া থাকে।"

আমি উদ্ধৃত বাক্যগুলি লিখিয়া লইয়া, বলিলাম "আমার কিন্তু অনেক জিজ্ঞাস্য আছে।"

গুরু। "একে একে জিজ্ঞাসা কর।"

আমি। "আপনি যা বল্লেন, তা'তে বুঝ্-লাম যে দু'দিন সূর্য্য বিষুবদ্রেখা পার হন, সে দু'দিন দিন রাত্রি সমান হ'বে। সুতরাং চৈত্র ও আশ্বিনের সংক্রান্তির দিন, দিন ও রাত্রি সমান হওয়া উচিত, কিন্তু, তা ত হয় না। এই দেখুন ১৩০০ সালের ৩১এ আশ্বিন, দিবা ২৮। ৪৭। ৪০, রাত্রি ৩১। ১২। ২০।"

গুরু। "যে সময় অয়ন শূন্য ছিল, সে সময় ঐ সংক্রান্তি দু'টিতেই দিন রাত্রি সমান হ'তো। তার পর, এখন ঐ দিন সরে গেছে।"

আমি। "অয়ন শূন্য কি?"

গুরু। "আগামী দিনে ঐ কথার এবং তোমার আর যা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তা'র উত্তর দেওয়া যা'বে। আজ তোমার পূর্ব্ব-জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিই।

আমি। "কোন জিজ্ঞাস্য?"

গুরু। "মহোদরী।"

আমি। "বলুন।"

গুরু। "সাতাইস্‌টি নক্ষত্রের নাম জান ত?"

আমি। "জানি—১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতী, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা, ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ২৭ রেবতী।

গুরু। কারিকাটা কণ্ঠস্থ নাই কি?—থাকা ভাল—

"অশ্বিনী ভরণীচৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষং তথৈবাদ্রা তথা চোক্তা পুনর্ব্বসুঃ॥
পুষ্যাশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনী।
হস্তাচিত্রা তথা স্বাতি বিশাখা চানুরাধিকা॥
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা প্রোক্তা পূর্ব্বাষাঢ়া তথোত্তরা।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ শতভিষা কথিতা পুনঃ॥
পূর্ব্বভাদ্রোত্তরাভাদ্রে রেবতী চ ভ-সংজ্ঞকাঃ।"

আমি লিখিয়া লইলাম। তার পর তিনি বলিলেন "ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বাত্রয়, মঘা ও ভরণী এই পাঁচটি উগ্রগণ। উত্তরাত্রয় ও রোহিণী ধ্রুবগণ। স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা চরগণ! পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তা লঘুগণ। চিত্রা, অনুরাধা মৃগশিরা ও রেবতী মৃদুগণ। অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা তীক্ষ্ণগণ। কৃত্তিকা ও বিশাখা মিশ্রগণ। এই সম্বন্ধে কারিকা—

"উগ্রাঃ পূর্ব্বমঘান্তকা ধ্রুবগণস্ত্রীণ্যুত্তরাণি স্বভূঃ
বাতাদিত্য হরিত্রয়ং চরগণঃ পুষ্যাশ্বিহস্তালঘুঃ।
চিত্রামিত্রমৃগান্ত্যভং মৃদুগণস্তীক্ষ্ণোঽহিরুদ্রেন্দ্রযুক্
মিশ্রোঽগ্নিঃ সবিশাখভঃ শুভকরাঃ সর্ব্বেস্বকৃত্যেগণাঃ।"

আমি এই শ্লোকটিও লিখিয়া লইয়া বলিলাম, "ঠিক বুঝ্‌তে পারচি না।"

গুরু। এ কারিকাটিতে অনেক নক্ষত্রের পরিবর্ত্তে তাহাদের অধিদেবতার নাম দেওয়া আছে। পঞ্জিকাতে ঐ দেবতাদের নাম দেওয়া আছে। এই দেখ।" এই বলিয়া ঐ পঞ্জিকার ১৫ পৃষ্ঠা খুলিয়া দিলেন। দেখিলাম "অশ্বিযমদহন" ইত্যাদি। তার পর বলিলেন, "আমি অধিদেবতাদের নামের একটি কারিকা বল্‌চি লিখে নাও, পঞ্জিকার নামগুলির সঙ্গে মিলিয়ে অর্থ করে নিও। এটি মনে করে রাখা সহজ হবে।"

"নাসত্যান্তকবহ্নিধাতৃশশভৃৎ রুদ্রাদিতীজ্যোরগা।
ঋক্ষেশাঃ পিতরো ভগোঽর্য্যমরবী ত্বষ্টা সমীরঃ ক্রমাৎ
শক্রাগ্নী খলু মিত্র-ইন্দ্রনিঋর্তী ক্ষীরাণি বিশ্বো বিধিঃ
গোবিন্দো বসুতোয়পাজচরণাহিব্রধ্নপূষাভিধাঃ।"

এখন একটু চেষ্টা কর্‌লেই—নক্ষত্রগণের উগ্রাদিগণ নির্ণয় কর্‌তে পার্‌বে।

উগ্রগণ নক্ষত্রে রবিবারে সংক্রান্তি হ'লে সে সে সংক্রান্তিকে ঘোরা বলে। সোমবারে লঘুগণে সংক্রান্তি। মঙ্গলবারে চর নক্ষত্রে মহোদরী। দেখ ১২৯৯ সালে ৩০এ চৈত্র মঙ্গলবার চর নক্ষত্র ধনিষ্ঠা, তাই এটিকে মহোদরী বলা হ'য়েছে। বুধবারে মৃদুনক্ষত্রে মন্দাকিনী। গুরুবারে স্থির-নক্ষত্রে মন্দা। শুক্রবারে মিশ্র-নক্ষত্রে মিশ্রা। শনিবারে তীক্ষ্ণগণে, রাক্ষসী। বারের মিলন না হইলেও ঐ নক্ষত্রেই ঐরূপ নাম হয়। ঐ সকল নাম দ্বারা বর্ষ ও মাসের ফল নির্ণয় হয়, সে সব কথা পরে আলোচনা করা যা'বে। আজ এই পর্য্যন্তই থাক।"

আমি। "আপনার ইচ্ছা।"

গুরু। "আজকের অধীত বিষয়গুলি বেশ ক'রে আলোচনা করলে, তবে মনে থাকবে। পঞ্জিকাটা বোঝা হ'লে, তার পর অন্যান্য দুরূহ কথা আরম্ভ করবো। দেখ, বৎস, তুমি কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা করবে, কিন্তু কয়েকটি কথা স্মরণ ক'রে রেখে দিও। কোষ্ঠীতে গ্রহ-সংস্থান, জন্মান্তরীণ কর্ম্মের প্রকাশক, এবং সেই কর্ম্মফলের নির্দ্দেশক। তা ব'লে এমন মনে ক'রো না, যে কোষ্ঠীর নির্দ্দেশ অখণ্ডণীয়। নিশ্চয় জেনো কর্ম্মফল—কর্ম্মের দ্বারাই নাশ করা যায়। সেই সকল কর্ম্ম কি, তা পরে বলবো। কিন্তু একথাটি মনে গেঁথে রেখে দিও—বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী জান্‌তে পারা, বৃষ্টিতে ভেজবার জন্য নয়, কিন্তু উপায় দ্বারা সেই বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য। যে দেশে এসেছো—এই অজানা দেশে, কবে? কোথায়? কি কারণে? কোন্ বিপদ আস্‌বে? তাই জেনে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই কোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। আরও একটা মহা উদ্দেশ্য আছে। সে কথাটা আমরা এখন ভুলে গিচি। কোষ্ঠী-নির্দ্দেশ করবে কোন্ কোন্ সদসৎ প্রবৃত্তির বীজ জাতকের অন্তরে আছে, তাই জেনে, শিশুকাল হ'তে তা'রে ব্রহ্মচর্য্য পথে চালিত ক'রে সত্তের পুষ্টি ও অসত্তের নাশ সাধনের চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য?"

আমি। "তাঁর যা' ইচ্ছা তাই ত হ'বে?"

গুরু। সে কথা ঠিক হ'লেও—তোমার আমার জন্য নয়। যত দিন পীড়া হ'লে চিকিৎসকের অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন বুঝ্‌বো—অধিক কি আহারের জন্য আকুল হ'য়ে ঘুরবো, তত দিন ও কথা বলবার অধিকার নাই। ঐ যে ওধারে ঐ জমিটুকু রয়েছে—ওতে কয়েকটা গাছ দিয়েছি, ওগুলার গোড়া পরিষ্কার ক'রে দিতে হ'বে—জলের দরকার হ'লে এনে দিতে হ'বে, লতাগুলির জন্য মাচান ক'রে দিতে হ'বে, এ সকল না ক'রে যদি ভগবানের মনে যা আছে তা'ই হ'বে ব'লে ব'সে থাকি, তা হ'লে যা হ'বার তা আর বলে দিতে হ'বে না। পক্ষান্তরে দেখ, আমার ঐ ফুলের গাছটি প্রচুর বর্ষণ ব্যতীত মাটিতে শিকড় নিতে পারবে না, তাই উপায় বিশেষ দ্বারা যখন্ বুঝলাম, আজ রাত্রি-শেষে প্রচুর বর্ষণ হ'বে, তখনি স্থির করলাম আজ অপরাহ্নে ওটি পুত্‌তে হ'বে। এই দেখ, তুমি আস্‌বার অল্প পূর্ব্বে ওটিকে এনে ওখানে পুতেছি, এখন ওখানে রৌদ্র নাই, রাত্রে শিশির সিক্ত হ'বে, শেষ রাত্রে বৃষ্টি হ'বে, তা'র পর কাল যা'তে মধ্যাহ্নে রৌদ্র না পায়, তা'র ব্যবস্থা ক'রে দিলেই ওটা বেঁচে যা'বে। বাবা, ভগবানের মনে যা আছে হ'বে ব'লে চুপ ক'রে ব'সে থাকার নাম, তাঁ'র উপর নির্ভর করা নয়—তা'র নাম আলস্য—আর কাপুরুষতা। এসেছ তাঁ'র কাজ ক'রতে, যা কিছু কর্ত্তব্য সামনে আসে, ক'রে যাও—প্রাণপণে ক'রে যাও—কি ফল হ'বে ভেবো না—লাভ লোকসানের কথা খতিও না—তোমার ভার করবার—প্রাণপণে কর—তার পর "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।" যদি নিষ্ফল হও, তখন ব'লো তাঁ'র ইচ্ছা নয় তাই হ'লো না।"

আমি। "বৃষ্টি হ'বে কিরূপে জান্‌লেন।"

গুরু। "সব কি এখনি বুঝ্‌তে পারবে?—ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রশৈলের শিখরে উঠ্‌তে হ'বে।"

পুত্র উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুরাংস্তস্থা গত্বা সা মন্দিরং শুভা।
উবাচ কুশলং পৃষ্টা ধর্ম্মং ভর্ত্তুস্তথাত্মনঃ। ৫৪ ॥
কচ্চিন্নন্দসি কল্যাণি স্বভর্ত্তুঃ সুখদায়িনী।
কচ্চিচ্চাখিলদেবেভ্যো মন্যসে হ্যধিকং পতিম্ ॥ ৫৫ ॥
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণাদেব ময়া প্রাপ্তং মহৎফলম্।
সর্ব্বকামফলাবাপ্তিঃ পত্যুঃ শুশ্রূষণাৎ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥
পঞ্চর্ণানি মনুষ্যেণ সাধ্বি দেয়ানি সর্ব্বদা।
তথাত্মবর্ণধর্ম্মেণ কর্ত্তব্যো ধনসঞ্চয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রাপ্তশ্চার্থস্তথা পাত্রে বিনিযোজ্যো বিধানতঃ।
সত্যার্জবতপোদানদয়াযুক্তো ভবেৎ সদা ॥ ৫৮ ॥
ক্রিয়া চ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টা রাগদ্বেষবিবর্জিতা।
কর্ত্তব্যাহরহঃ শ্রদ্ধাপুরস্কারেণ শক্তিতঃ ॥ ৫৯ ॥

পুত্র বলিলেন—"পিতা, করহ শ্রবণ ;
দেবগণে এইরূপ বলিয়া বচন,
শুভময়ী অনসূয়া, চলিলা ত্বরায়,
সেই গৃহে পতিব্রতা আছিলা যথায়।
আশীষ করিয়া তাঁ'রে জিজ্ঞাসে তখন ;
স্বামীর—নিজের—ধর্ম্ম-কুশল কেমন ? ৫৪ ॥
বলিলেন অনসূয়া "আছ ত কুশলে ?
কল্যাণি, আছ ত সুখে স্বামিসেবা ফলে ?
যতেক দেবতা আছে ত্রিদিব-ভবনে,
স্বামীরে সবার বড় ভাব ত গো মনে ? ৫৫ ॥
স্বামীর চরণ-সেবা করি' নিরন্তর,
মহাফল পেয়েছি গো আমি শুভতর।
যে নারী সতত রত পতির সেবায়—
সফল কামনা তা'র সর্ব্বফল পায়। ৫৬ ॥

শুন, সাধ্বি, এই ভবে মানবনিচয়,
পঞ্চবিধ ঋণে বদ্ধ জানিহ নিশ্চয়।
প্রতিদিন সেই ঋণ শুধিবার তরে
আছয়ে কর্ত্তব্য এই জগত ভিতরে।
নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্ম-করিয়া আশ্রয়
সেই হেতু করে নরে ধনের সঞ্চয়। ৫৭ ॥
ধর্ম্মপথে থাকি' করি' অর্থের অর্জন
বিহিত বিধানে পাত্রে করিবে অর্পণ।
সত্য, সরলতা, তপ, দান, দয়া আর—
এ সব সদ্‌গুণে ভরিবেন হৃদাগার। ৫৮ ॥
রাগ-দ্বেষ-শূন্য হ'য়ে শাস্ত্র অনুসারে
করিবেন কর্ম্ম সদা বিহিত প্রকারে।
যথাশক্তি, প্রতি দিন এরূপে নিশ্চয়,
শ্রদ্ধা যোগে কার্য্য করা উপযুক্ত হয়। ৫৯ ॥

স্বজাতিবিহিতানেবং লোকান্ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
ক্লেশেন মহতা সাধ্বি প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ ॥ ৬০ ॥
স্ত্রিয়শ্চৈবং সমস্তস্য নরৈর্দুঃখার্জিতস্য বৈ।
পুণ্যস্যার্দ্ধাপহারিণ্যঃ পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥ ৬১ ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং নাপ্যুপোষিতম্।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষয়ৈবৈতা লোকানিষ্ঠান্ জয়ন্তি হি ॥ ৬২ ॥
তস্মাৎ সাধ্বি মহাভাগে পতিশুশ্রূষণং প্রতি।
ত্বয়া মতিঃ সদা কার্য্যা যতো ভর্ত্তা পরা গতিঃ ॥ ৬৩ ॥
যদ্দেবেভ্যো যচ্চ পিত্রাদিকেভ্যঃ
কুর্য্যাদ্ভর্ত্তাভ্যর্চ্চনং সৎক্রিয়াঞ্চ।
তস্যার্দ্ধং বৈ কেবলানন্যচিত্তা
নারী ভুঙ্‌ক্তে ভর্তৃশুশ্রূষয়ৈব ॥ ৬৪ ॥

পুত্র উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিপূজ্য তদাদরাৎ।
প্রত্যুবাচাত্রিপত্নীং তামনসূয়ামিদং বচঃ ॥ ৬৫ ॥

স্বজাতি-বিহিত কর্ম্ম করিয়া সাধন,
বহুক্লেশে পুণ্য-লোক পায় নরগণ।
শুন, সাধ্বি, এইরূপে পুণ্য-কর্ম্ম-ফলে,
প্রাজাপত্য আদি লোক পায় ত সকলে। ৬০ ॥
নারী কিন্তু, কেবল স্বামীর সেবা করি',
সে সব পুণ্যার্দ্ধ পায়—যায় সুখে তরি'।
নরগণ করে কষ্টে যে পুণ্য অর্জ্জন,
পতি-পদে মতি রাখি' পায় নারিগণ। ৬১ ॥
নারীর নাহিক অন্য যজ্ঞ আচরণ,
শ্রাদ্ধ, উপবাস আর কর্ম্ম অগণন।
পাতিব্রত্য মহাবল নারীর নিশ্চয়—
পতি-শুশ্রূষায়—তাঁ'র সর্ব্ব পুণ্য হয়।
পতির চরণে—মতি রাখিয়া রমণী,
মহাপুণ্য-লোক চয় পায় ত অমনি। ৬২ ॥
শুন, মহাভাগে, সাধ্বি, বচন আমার,
পতি শুশ্রূষায় মন রাখ আপনার।
পতি গতি রমণীর এই ত সংসারে
কায়মনে নিরন্তর সেবা কর তাঁ'রে। ৬৩ ॥
স্বামী নিরন্তর হ'য়ে ক্রিয়াপর
পিতৃদেব আদি করিয়া অর্চ্চন,
যেই পুণ্য পায় পতি-শুশ্রূষায়
তা'র অর্দ্ধ ভাগ পায় নারিগণ। ৬৪॥
পুত্র বলে, শুন পিতা অতীব অপূর্ব্ব কথা,
অনসূয়া-মুখে শুনি' এ হেন বচন।
ব্রাহ্মণী আদরে তাঁ'রে পূজা করি' নিজাগারে
বসিবার তরে তবে দিলেন আসন।
অত্রির বনিতা সতী অনসূয়া গুণবতী,
তুষ্ট হ'য়ে করিলেন আসন গ্রহণ,
পরে সেই বিপ্রনারী চরণে প্রণাম করি,
বলিতে লাগিলা তাঁ'রে মধুর বচন। ৬৫॥

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি দৈবস্যাপ্যবলোকতঃ।
যন্মে প্রকৃতি কল্যাণি শ্রদ্ধাং বর্দ্ধয়সে পুনঃ॥ ৬৬॥
জানাম্যেতন্ন নারীণাং কশ্চিৎ পতিসমা গতিঃ।
তৎপ্রীতিশ্চোপকারায় ইহলোকে পরত্র চ॥ ৬৭॥
পতিপ্রসাদাদিহ চ প্রেত্যচৈব যশস্বিনী।
নারী সুখমবাপ্নোতি নার্য্যা ভর্ত্তা হি দৈবতম্॥ ৬৮॥
সা ত্বং ব্রূহি মহাভাগে প্রাপ্তায়া মম মন্দিরম্।
আর্য্যায়াঃ কিং নু কর্ত্তব্যং ময়ার্য্যেণাপি বা শুভে॥ ৬৯॥

অনসূয়োবাচ।

এতে দেবাঃ সহেন্দ্রেণ মামুপাগম্য দুঃখিতাঃ।
তদ্বাক্যাপাস্ত-সৎকর্ম্ম-দিননক্ত-নিরূপণাঃ॥ ৭০॥

ব্রাহ্মণী বলিলা তাঁ'য়, "ধন্য, প্রণমিয়া পায়
ধন্য আমি, পেয়ে আজি তব দরশন,
দেবতার কৃপা এই ইহাতে সন্দেহ নেই
শুনিলাম তব মুখে অমৃত-বচন।
স্বামী রমণীর গতি স্বর্গ মোক্ষ সবি পতি
এই কথা তুমি, দেবি, বলি এ প্রকারে,
বাড়াইলে শ্রদ্ধা মোর ঘুচা'লে মনের ঘোর
বাঁধিলে গো পদে তাঁ'র সুদৃঢ় আমারে।
জানি আমি সুনিশ্চয়, পতি মোর সর্ব্বময়,
রমণীর পতি বিনা নাহি অন্য গতি;
তাঁ'র প্রীতিকর যাহা নিরন্তর করি তাহা
ইহলোকে সুখ, অন্তে ঘটিবে সদ্গতি।৬৭॥
জানি ইহা সুনিশ্চয় পতি যা'রে তুষ্ট রয়,
ইহ-পরকালে যশ ঘটে ভাগ্যে তা'র।
সুখে তা'র কাটে কাল না ঘটে কোন জঞ্জাল
পতিই দেবতা ভবে, জানিয়াছি সার।৬৮॥
কিন্তু শুভে, মহাভাগে, জিজ্ঞাসি তোমার আগে
কোন্ পুণ্যে পেনু তোমা মন্দিরে আমার,
আমার, স্বামীর মোর, ভাগ্যের নাহিক ওর,
কিবা আজ্ঞা পালন করিব আপনার?৬৯
অনসূয়া বলে, সাধ্বি, করহ শ্রবণ
তব বাক্যে, অস্তগত রয়েছে তপন;
দিবারাত্রি ভেদাভেদ হইয়াছে দূর,
সে হেতু জগতে কষ্ট ঘটেছে প্রচুর;
কালজ্ঞানাভাবে সর্ব্ব-সৎকর্ম্ম এখন
লুপ্ত আছে ভবে, সতি, কর দরশন।
সেই হেতু দেবগণ, ইন্দ্রে সঙ্গে ল'য়ে
গিয়েছিলা মোর পাশে সুদুঃখিত হ'য়ে। ৭০॥

যাচন্তেঽহর্নিশাসংস্থাং যথাবদবিখণ্ডিতাম্।
অহন্তদর্থমায়াতা শৃণু চৈতদ্বচো মম ॥ ৭১ ॥
দিনাভাবাৎ সমস্তানামভাবো যাগকর্ম্মণাম্।
তদভাবাৎ সুরাঃ পুষ্টিং নোপযান্তি তপস্বিনি ॥ ৭২ ॥
অহ্নশ্চৈবসমুচ্ছেদাদুচ্ছেদঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
তদুচ্ছেদাদনাবৃষ্ট্যা জগদুচ্ছেদমেষ্যতি ॥ ৭৩ ॥
তত্ত্বমিচ্ছসি ধৈর্য্যেণ জগদুর্দ্ধর্ত্তুমাপদঃ।
প্রসীদ সাধ্বি লোকানাং পূর্ব্ববৎ বর্ত্ততাং রবিঃ ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

মাণ্ডব্যেন মহাভাগে শপ্তো ভর্ত্তা মমেশ্বরঃ।
সূর্য্যোদয়ে বিনাশং ত্বং প্রাপ্স্যসীত্যতিমন্যুনা ॥ ৭৫ ॥

অনসূয়োবাচ।

যদি তে রোচতে ভদ্রে ততস্তদ্বচনাদহম্।
করোমি পূর্ব্ববদ্দেহং ভর্ত্তারং বচনাত্তব ॥ ৭৬ ॥

বলিলা আমারে সবে, করিতে যতন
যা'তে দিবা নিশা হয় পূর্ব্বের মতন।
এই কথা শুনি' আমি নিকটে তোমার
আসিয়াছি সাধিবারে কার্য্য দেবতার।
এবে তব পাশে মোর এই নিবেদন,
বাক্য মোর মন দিয়ে কর গো শ্রবণ। ৭১ ॥
দিনের অভাবে যাগযজ্ঞ নাহি আর;
যজ্ঞাভাবে পুষ্টি নাহি হয় দেবতার। ৭২ ॥
শুন, তপস্বিনি, দিন লুপ্ত আছে বলি
লুপ্ত হ'য়ে গেছে, দেখ করম সকলি।
যজ্ঞাদি কর্ম্মের লোপে অধর্ম্ম উদয়
তা'র ফলে অনাবৃষ্টি, সৃষ্টি নাশ হয়। ৭৩ ॥

জগতের এ বিপদ করি দরশন
যদি কষ্ট নাশিবারে হয় তব মন,
তবে, সাধ্বি, দয়া করি' জগতের প্রতি,
বল, পুনরায় যেন উঠে দিনপতি। ৭৪ ॥
ব্রাহ্মণী বলেন, দেবি, করহ শ্রবণ
মাণ্ডব্যের শাপ আছে অতীব ভীষণ—
দিয়াছেন শাপ তিনি পতিরে আমার
উদিলে তপন প্রাণ যা'বে গো তাঁহার। ৭৫ ॥
বলিলেন অনসূয়া, শুনহ বচন
তব ইচ্ছা হ'লে, আমি করিব যেমন।
সূর্য্যোদয়ে পতি তব ত্যজিলে জীবন,
আমি তাঁরে করিব গো পূর্ব্বের মতন। ৭৬ ॥

ময়াপি সর্ব্বথা স্ত্রীণাং মাহাত্ম্যং বরবর্ণিনী।
পতিব্রতানামারাধ্যমিতি সংমানয়ামি তে ॥ ৭৭ ॥

পুত্র উবাচ।

তথেত্যুক্তে তথা সূর্য্যমাজুহাব তপস্বিনী।
অনসূয়ার্ঘ্যমুদ্যম্য দশরাত্রে তদা নিশি ॥ ৭৮ ॥
ততো বিবস্বান্ ভগবান্ ফুল্লপদ্মারুণাকৃতিঃ।
শৈলাধিরাজমুদয়মারুরোহোরুমণ্ডলঃ ॥ ৭৯ ॥
সমনন্তরমেবাস্যা ভর্ত্তা প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত।
পপাত চ মহীপৃষ্ঠে পতন্তং জগৃহে চ সা ॥ ৮০ ॥

অনসূয়োবাচ।

ন বিষাদস্ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যঃ পশ্য মে বলম্।
পতি-শুশ্রূষয়াবাপ্তং তপসঃ কিং চিরেণ মে ॥ ৮১ ॥
যথা ভর্ত্তৃসমং নান্যমপশ্যং পুরুষং ক্বচিৎ।
রূপতঃ শীলতো বুদ্ধ্যা বাঙ্মাধুর্য্যাদিভূষণৈঃ ॥ ৮২ ॥

পতিব্রতা রমণীর মহিমার তরে
এসেছি পূজিতে তোমা তোমার গোচরে।৭৭ ॥
পুত্র বলে শুন পিতা অপূর্ব্ব কথন,
"তাই হোক" বলিলেন ব্রাহ্মণী যেমন,
অনসূয়া সূর্য্য-অর্ঘ গ্রহণ করিয়া,
আসিলা বাহিরে সূর্য্য-পূজন লাগিয়া।
দশ দিন ক্রমাগত নাহি ছিল দিন
সুদীর্ঘ রজনী ছিল আলোক-বিহীন।৭৮ ॥
এবে পুনঃ পূর্ব্বাকাশে আসে দিবাকর,
প্রফুল্ল-কমল সম রক্ত-দেহ-ধর।
অখণ্ডমণ্ডলাকারে আকাশের গায়,
উদয়-অচল-শিরে আসি' শোভা পায়। ৭৯ ॥

তপন-উদয়-মাত্র সেই ত ব্রাহ্মণ
প্রাণ-হীন হ'য়ে পড়ে ভূতলে তখন।
তখনি সত্বরে আসি' সাধ্বী পত্নী তাঁ'র,
যতনে ধরিলা তাঁ'রে কোলে আপনার। ৮০॥
অনসূয়া বলে 'ভদ্রে, না কর রোদন,
এবে মোর তপোবল কর দরশন।
পতির চরণ-সেবা তপ রমণীর
এর তুল্য নাহি তপ জানিয়াছি স্থির।
সেই তপোবলে আজি অসাধ্য-সাধন
করিব এখনি আমি, কর দরশন। ৮১ ॥
রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বুদ্ধি-বাক্যে আর
কেহ তুল্য নাহি ভবে স্বামীর আমার।৮২ ॥

তেন সত্যেন বিপ্রোঽয়ং ব্যাধিমুক্তঃ পুনর্যুবা।
প্রাপ্তোঽনুজীবিতং ভার্য্যাসহায়ঃ শরদাং শতম্ ॥ ৮৩ ॥
যথা ভর্ত্তৃসমং নান্যমহং পশ্যামি দৈবতম্।
তেন সত্যেন বিপ্রোঽয়ং পুনর্জীবত্বনাময়ঃ ॥ ৮৪ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা ভর্ত্তুরারাধনং প্রতি।
যথা মমোদ্যমো নিত্যং তথায়ং জীবতাদ্দ্বিজঃ ॥ ৮৫ ॥

পুত্র উবাচ।

ততো বিপ্রঃ সমুত্তস্থৌ ব্যাধিমুক্তঃ পুনর্যুবা।
স্বভাভির্ভাসয়ন্ বেশ্ম বৃন্দারক ইবাজরঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে পতিব্রতামাহাত্ম্যাখ্যো ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

এই জ্ঞান হয় যদি প্রাণের আমার
নিশ্চয় পাইবে প্রাণ ব্রাহ্মণ এবার।
সেই সত্য জ্ঞান ফলে—আজি পুনরায়
হইবে এ বিপ্র, দেখ, ব্যাধিমুক্ত-কায়।
পুনরায় যুবা হ'য়ে শত বর্ষ কাল
পত্নী সনে সুখে ভবে কাটাইবে কাল। ৮৩ ॥
চিরদিন যদি আমি পতিরে আমার
দেবতার শ্রেষ্ঠ জানি মনে আপনার।
তবে সেই সত্য-জ্ঞান-ফলেতে এখন
রোগমুক্ত হ'য়ে বিপ্র পাইবে জীবন। ৮৪ ॥
কায়-মনো-বাক্যে যদি হ'য়ে অচঞ্চল,
সেবা করে থাকি, পতি-চরণ-কমল,
সেই ফলে আজি এই দ্বিজ পুনরায়
অবশ্য পাইবে প্রাণ, কি সন্দেহ তা'য়? ৮৫ ॥
পুত্র বলে "ঘটে তবে অদ্ভুত ঘটন;
তখনি উঠিল বিপ্র পাইয়া জীবন,
হইল সুন্দর যুবা ব্যাধিমুক্ত-কায়
দেবতা-সমান ভাতি ভাতে সর্ব্ব গায়।
গৃহ হ'লো উজলিত দেহের কিরণে
অজর সুন্দর দেহ জিনি' দেবগণে। ৮৬ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে, পিতাপুত্রসম্বাদে পতিব্রতা-মাহাত্ম্য নামক ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

পুত্র উবাচ ।

ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্দেববাদ্যানি সস্বনুঃ ।
লেভিরে চ মুদং দেবা অনসূয়ামথাব্রুবন্ ॥ ১ ॥

দেবা উচুঃ ।

বরং বৃণীষ্ব কল্যাণি দেবকার্য্যং মহৎ কৃতম্ ।
ত্বয়া যস্মাত্ততো দেবা বরদাস্তে তপস্বিনি ॥ ২ ॥
আদিত্যোদয়সম্ভাবাৎ বরং বরয় সুব্রতে ॥ ৩ ॥

অনসূয়োবাচ ।

যদি দেবাঃ প্রসন্না মে পিতামহপুরোগমাঃ ।
বরদা বরযোগ্যা চ যদ্যহং ভবতাং মতা ॥ ৪ ॥
তদ্ যাতু মম পুত্রত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
যোগঞ্চ প্রাপ্নুয়াং ভর্ত্তৃসহিতা ক্লেশমুক্তয়ে ॥ ৫ ॥

পুত্র বলে, শুন পিতা অপূর্ব্ব কথন,
সেই ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি হইল পতন ।
দেবের দুন্দুভি বাজে সুমধুর স্বনে
আনন্দ পাইল প্রাণে সর্ব্বদেবগণে ।
তবে দেবগণ আসি, অনসূয়া পাশ
বলিলেন মিলি' সবে হ'য়ে পূর্ণ-আশ । ১ ॥
লহ বর, হে কল্যাণি, যেবা মনে লয়
করেছ মহৎ কার্য্য দেবের নিশ্চয় ।
তপস্বিনি, সেই হেতু যত দেবগণ
অবশ্য তোমার বাঞ্ছা করিবে পূরণ । ২ ॥

আদিত্যের উদয়ে ভাতিল ত্রিভুবন ।
যেবা ইচ্ছা, বর, দেবি, করহ গ্রহণ । ৩ ॥
বলিলেন অনসূয়া "শুন দেবগণ,
পিতামহ সনে সবে প্রসন্ন যখন,
যদি মোরে দিতে বর, আসিলা হেথায়,
বরদানযোগ্যা যদি ভাবিলে আমায় । ৪ ॥
তবে একমাত্র বর এই আমি চাই
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবে যেন পুত্ররূপে পাই ।
স্বামী সনে আমি, যেন যোগযুক্ত র'য়ে
মুক্ত হই, সংসারের ক্লেশমুক্ত হ'য়ে । ৫ ॥

পুত্র উবাচ।

এবমস্ত্বিতি দেবাস্তাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
উক্ত্বা জগ্মুর্যথান্যায়মনুমান্য তপস্বিনীম্ ॥ ৬ ॥
ততঃ কালে বহুতিথে দ্বিতীয়ো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
স্বভার্য্যাং ভগবানত্রিরনসূয়ামপশ্যত ॥ ৭ ॥
ঋতুস্নাতাং সুচার্ব্বাঙ্গীং লোভনীয়তমাকৃতিম্।
সকামমনসা ভেজে স মুনিস্তামনিন্দিতাম্ ॥ ৮ ॥
তস্যাভিপশ্যতস্তাং তু বিকারো যোভ্যজায়ত। *
তমেবোবাহ পবনস্তির্য্যগূর্দ্ধ্বং চ বেগবান ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মরূপঞ্চ শুক্লাভং পতমানং সমন্ততঃ।
সোমরূপং রজোরূপং দিশস্তং জগৃহুর্দশ ॥ ১০ ॥
স সোমো মানসো জজ্ঞে তস্যামত্রেঃ প্রজাপতেঃ।
পুত্রঃ সমস্তসত্ত্বানামায়ুরাধার এব চ ॥ ১১ ॥
তুষ্টেন বিষ্ণুনা জজ্ঞে দত্তাত্রেয়ো মহাত্মনা।
স্বশরীরাৎ সমুৎপন্নঃ সত্ত্বোদ্রিক্তো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১২ ॥

পুত্র বলে "শুন পিতা, অপূর্ব্ব কথন
"তাই হ'বে" বলিলেন তাঁ'রে দেবগণ,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আর যত দেবগণ
তপস্বিনী সে দেবীর করিলা পূজন।
বরদানে তুষ্টা তাঁ'রে করিয়া সকলে,
আপন আপন স্থানে গেলা তবে চ'লে। ৬ ॥
তা'র পরে, ক্রমে কেটে গেল বহু দিন,
অনসূয়া-ভাগ্যে তবে ঘটিল সুদিন।
ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র অত্রি তপোধন
একদিন, শুভক্ষণে করিলা দর্শন, ৭ ॥
ভার্য্যা তাঁ'র অনসূয়া ঋতু-স্নাতা হ'য়ে
আসি'ছেন তাঁ'র পাশে সুবেশে সাজিয়ে,
সুচারু দেহের সেই শোভা চমৎকার
দেখিয়া মনেতে তাঁ'র হইল বিকার।
ভজিলেন মনে মনে, বায়ু তেজ তাঁ'র
বহিলেন উর্দ্ধেতে তির্য্যক্-ভাবে আর। ৮-৯ ॥
সেই তেজে হৈল তবে চন্দ্রের জনন,
ব্রহ্মরূপ, শুক্লবর্ণ, উজ্জ্বল-বরণ।
দশদিক আলো করি'—জগৎ-আশ্রয়
রজোরূপী চন্দ্র তবে প্রকাশিত হয়। ১০ ॥
অত্রির মানসে জন্ম হইল তাঁহার
সেই পুত্র সর্ব্ব-তত্ত্ব-আয়ুর-আধার। ১১ ॥
পরিতুষ্ট বিষ্ণু, নিজে, সত্ত্বের আধার
অংশে হৈলা দত্তাত্রেয়—তনয় তাঁহার। ১২ ॥

---

* তস্যাতিধ্যায়তস্তাস্ত বিকারো যোঽভ্যজায়ত। ইতি পাঠান্তরং।

দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ সোঽনসূয়াস্তনং পপৌ ।
বিষ্ণুরেবাবতীর্ণোঽসৌ দ্বিতীয়োঽত্রেঃ সুতোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
সপ্তাহাৎ প্রচ্যুতো মাতুরুদরাৎ কুপিতো যতঃ ।
হৈহয়েন্দ্রমুপাবৃত্তমপরাধ্যন্তমুদ্ধতম্ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বাত্রৌ কুপিতঃ সদ্যো দগ্ধুকামং স হৈহয়ম্ ।
গর্ভাবাস-মহায়াস-দুঃখামর্ষ-সমন্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
দুর্ব্বাসাস্তমসাযুক্তো রুদ্রাংশঃ সোঽভ্যজায়ত ।
ইতি পুত্রত্রয়ং তস্যা জজ্ঞে ব্রহ্মেশবৈষ্ণবম্ ॥ ১৬ ॥
সোমো ব্রহ্মাভবৎ বিষ্ণুর্দত্তাত্রেয়োঽভ্যজায়ত ।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করো জজ্ঞে বরদানাদ্দিবৌকসাম্ ॥ ১৭ ॥
সোমঃ স্বরশ্মিভিঃ শীতৈর্বীরুধৌষধি মানবান্ ।
আপ্যায়য়ন্ সদা স্বর্গে বর্ত্ততে স প্রজাপতিঃ ॥ ১৮ ॥
দত্তাত্রেয়ঃ প্রজাঃ পাতি দুষ্টদৈত্যনিবর্হনাৎ ।
শিষ্টানুগ্রহকৃদ্‌যোগী জ্ঞেয়শ্চাংশঃ স বৈষ্ণবঃ ॥ ১৯ ॥

দত্তাত্রেয় হৈল নাম, অত্রির তনয়
দ্বিতীয় নন্দন হ'য়ে হইলা উদয় ।
অনসূয়া ক্রোড়ে শিশু, অতি সুলক্ষণ,
স্তন পান করি' তাঁ'র তুষ্ট কৈলা মন । ১৩ ॥
হৈহয়গণের রাজা কুপিত-হইয়া,
অপমান করেছিল অত্রিরে আসিয়া,
সেই অপমানে হ'য়ে কুপিত-হৃদয়—
সপ্তদিন মাত্র, গর্ভে থাকি' দয়াময়,
হৈহয়ের পাপরাশি দগ্ধ করিবারে
জন্মিলেন ধরাধামে মানুষ-আকারে ।১৪-১৫॥
তমোরূপী রুদ্র-অংশে তৃতীয় তনয়
দুর্ব্বাসা নামেতে, আসি' হইলা উদয় ।
এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর
তিন পুত্র হৈল তাঁ'র জন-মনোহর । ১৬ ॥
ব্রহ্মা সোমরূপে আসি' লভিলা জনম,
বিষ্ণু দত্তাত্রেয় হৈলা জন-মনোরম ।
শঙ্কর দুর্ব্বাসারূপে হইলা উদয়,
দেবতার বরে এই শুভ-ভাগ্যোদয় । ১৭ ॥
সোমের শীতল রশ্মি প্রাণের বর্দ্ধন
করি', রক্ষা করে বৃক্ষৌষধিনরগণ ।
সেই প্রজাপতি স্বর্গে করি' অবস্থান,
করিলেন আপ্যায়িত সকলের প্রাণ । ১৮ ॥
বিষ্ণুতেজে বলী দত্তাত্রেয় মহাবল
সতত শাসিত করি, দুষ্ট দৈত্যদল,
শিষ্ট জনগণে সদা করিয়া রক্ষণ
করি'ছেন নিরন্তর প্রজার পালন । ১৯ ॥

নির্দহত্যবমন্তারং দুর্ব্বাসা ভগবানজঃ।
রৌদ্রং ভাবং সমাশ্রিত্য দৃঙ্মনোবাগ্ভিরুদ্ধতঃ ॥ ২০ ॥

সোমত্বং ভগবানত্রিঃ পুনশ্চক্রে প্রজাপতিঃ।
দত্তাত্রেয়োঽপি বিষয়ান্ যোগস্থো বুভুজে হরিঃ ॥ ২১ ॥

দুর্ব্বাসা পিতরং ত্যক্ত্বা মাতরঞ্চোত্তমং ব্রতম্।
উন্মত্তাখ্যং সমাশ্রিত্য পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ ২২ ॥

মুনিপুত্রবৃতো যোগী দত্তাত্রেয়োঽপ্যসঙ্গিতাম্।
অভীপ্সমানঃ সরসি নিমমজ্জ চিরং বিভুঃ ॥ ২৩ ॥

তথাপি তং মহাত্মানমতীবপ্রিয়দর্শনম্।
তত্যজুর্ন কুমারাস্তে সরসস্তীরসংশ্রয়াঃ ॥ ২৪ ॥

দিব্যে বর্ষশতে পূর্ণে যদা তে ন ত্যজন্তি তম্।
তৎ প্রীত্যা সরসস্তীরং সর্বে মুনিকুমারকাঃ ॥ ২৫ ॥

দুর্ব্বাসা শঙ্কর অংশে লভিয়া জনন,
নিরন্তর ধরাধামে করেন ভ্রমণ,
অপমানকারী জনে নির্দহন করি'
বাক্য-মন-নয়নেতে রুদ্র-ভাব ধরি'। ২০ ॥
অত্রিবংশে জন্ম লভি' দেব প্রজাপতি,
চন্দ্ররূপে পুনরায় হৈলা প্রজা-পতি।
দত্তাত্রেয়রূপে হরি, যোগস্থ রহিয়া
ভুঞ্জিলা বিষয়-সুখ নিঃসঙ্গ হইয়া। ২১ ॥
পিতা মাতা ছাড়িয়া দুর্ব্বাসা তপোধন,
উন্মত্তাখ্য মহাব্রত করিয়া ধারণ,
ভ্রমিতে লাগিলা সদা এই ভূমণ্ডলে,
অপরাধী জনে সদা দহি' ক্রোধানলে। ২২ ॥
হইলেন শ্রেষ্ঠ যোগী দত্তাত্রেয় ধীর,
রহিলেন যোগযুক্ত, সংসারেতে স্থির।
অসঙ্গ হইয়া তাঁ'র থাকিতে বাসনা,
কিন্তু মুনিপুত্রগণ তাঁহারে ছাড়ে না।
তা'দের বাসনা সদা কাছে কাছে রায়,
যোগের নিগূঢ় যত তত্ত্ব শিখে লয়।
তাহাদের সঙ্গ করিবারে পরিহার
দত্তাত্রেয় মনে মনে করিয়া বিচার,
রহিলেন সরোবর-জলে মগ্ন হ'য়ে,
এরূপে অনেক কাল গেল ত কাটিয়ে। ২৩ ॥
সেই প্রিয়দর্শন মহাত্মা যোগিবরে
মুনিকুমারেরা তবু ত্যাগ নাহি করে।
তাঁ'র সঙ্গ আশে সবে সেই সরো-তীরে
রহিল বসিয়া তাঁ'রে মগ্ন হেরি নীরে। ২৪ ॥
দিব্যবর্ষ শত গেল তবু যোগিবর
রহিলেন জলমগ্ন,—না ত্যজিলা সর।
মুনিপুত্রগণ রহে তাঁহার আশায়
সরোতীর ছাড়ি' তা'রা কোথাও না যায়।২৫॥

ততো দিব্যাম্বরধরাং সুরূপাং সুনিতম্বিনীম্।
নারীমাদায় কল্যাণীমুত্তার জলান্মুনিঃ ॥ ২৬ ॥
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্ যদ্যেতে পরিত্যক্ষন্তি মামিতি।
মুনিপুত্রাস্ততোঽসঙ্গী স্থাস্যামীতি বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৭ ॥
তথাপি তং মুনিসুতা ন ত্যজন্তি যদা মুনিম্।
ততঃ সহ তয়া নার্য্যা মদ্যপানমথাকরোৎ ॥ ২৮ ॥
সুরাপানরতং তে ন সভার্য্যং তত্যজুস্ততঃ।
গীতবাদ্যাদিবনিতাভোগসংসর্গদূষিতং।
মন্যমানা মহাত্মানং তয়া সহ বহিষ্ক্রিয়ং ॥ ২৯ ॥
নাবাপ দোষং যোগীশো বারুণীং স পিবন্নপি।
অন্তাবসায়িবেশ্মান্তর্মাতরিশ্বা স্পৃশন্নিব ॥ ৩০ ॥
সুরাং পিবন্ সপত্নীকস্তপস্তেপে স যোগবিৎ।
যোগীশ্বরশ্চিন্ত্যমানো যোগীভির্মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে দত্তাত্রেয়মহিমাকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

তাহা দেখি' দত্তাত্রেয় মহাযোগিবর,
বাহিরিলা সর ছাড়ি প্রফুল্ল-অন্তর,
দিব্যাম্বরধরা এক সুরূপা কামিনী
সঙ্গে করি' সরঃ হ'তে আসিলা আপনি ।২৬॥
মনের বাসনা, যবে দেখিবে আমায়
নারী সঙ্গে মত্ত আছি আনন্দে ক্রীড়ায়,
ঘৃণা করি' মোরে সবে যাইবে ছাড়িয়া,
থাকিব তখন আমি নিঃসঙ্গ হইয়া। ২৭ ॥
তথাপি তাঁহারে সেই মুনিসুতগণ,
না ছাড়ি' নিকটে সবে আসিল যখন,
তবে সেই নারী সঙ্গে মহাযোগিবর
হইলেন মদ্যপানে রত অতঃপর। ২৮ ॥
নারী সনে সুরাপানে রত হেরি' তাঁ'রে,
মুনিসুতগণ তবু ছাড়িতে না পারে।
গীত, বাদ্য, নারী সহ সংসর্গ তাঁহার,
এতেও তা'দের মনে না হৈল বিকার।
ভাবে সবে এ সবে ইঁহার দোষ নাই,
আসক্তি-বিহীন ইনি আছেন সদাই। ২৯ ॥
চণ্ডালের গৃহে বায়ু করিলে গমন,
স্পর্শদোষে অপবিত্র না হয় কখন;
সেইরূপ যোগীশ্বর সুরাপান করি'
রহিলেন দোষহীন দিব্য-দেহ ধরি'। ৩০ ॥
নারী সনে সুরাপানে থাকিয়া নিয়ত
যোগ-যুক্ত মুক্ত-সঙ্গ ছিলেন সতত।
এই সে কারণে যত মুক্তির ভিখারী
যোগিগণ নিরন্তর চিন্তা করে তাঁরি। ৩১ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে পিতা-পুত্র-সংবাদে দত্তাত্রেয়-মহিমা-কথন নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।

কস্যচিত্ত্বথকালস্য কার্ত্তবীর্য্যার্জুনো বলী।
কৃতবীর্য্যে দিবং যাতে মন্ত্রিভিঃ সপুরোহিতৈঃ।
পৌরৈশ্চাত্মাভিষেকার্থং সমাহূতো ব্রবীদিদম্ ॥ ১

নাহং রাজ্যং করিষ্যামি মন্ত্রিণো নরকোত্তরম্।
যদর্থং গৃহ্যতে শুল্কং তদনিষ্পাদয়ন্ বৃথা ॥ ২ ॥

পণ্যানাং দ্বাদশং ভাগং ভূপালায় বণিগ্‌জনাঃ।
দত্ত্বার্থরক্ষিভির্মার্গে রক্ষিতো যাতি দস্যুতঃ ॥ ৩ ॥

পুত্র বলে, পিতা, করহ শ্রবণ,
কথা অতি মনোহর;
এই রূপে গত হ'লে বহু কাল;
যেবা ঘটে তা'র পর—
কৃতবীর্য্য রাজা ত্যজিয়া নশ্বর
দেহ, রাজ্য, ধন আর
গেলা দেবলোকে ভুঞ্জিবারে যত
পুণ্যপুঞ্জ আপনার।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে পুত্র তাঁ'র;
তাঁ'রে যত মন্ত্রিগণ
পুরোহিত আর যত পৌরগণ
আসি' করে সম্ভাষণ।
অভিষেক তাঁ'র করিবার তরে
উৎসুক হইয়া অতি
চা'ন করিবারে যোগ্য আয়োজন;
বলিলেন মহীপতি। ১ ॥

নিতে রাজ্য-ভার বাসনা আমার
বিন্দুমাত্র মনে নাই,
কারণ তাহার কহিতেছি সার
শুনহ সকলে তাই।
রাজা হ'লে পর, নিতে হয় কর
প্রজার পালন তরে,
ত্রুটি হ'লে তায় ঘটে বড় দায়
যায় নরক ভিতরে। ২ ॥
বণিক সকলে অর্থের বদলে
পণ্যের দ্বাদশ অংশ,
দেয় ত রাজারে শান্তি পাইবারে
করিবারে দস্যু ধ্বংস।
শান্তি-পূর্ণ পথ পূর্ণ মনোরথ
হইবারে সদা চায়,
যদি রক্ষিবারে না পারি সবারে
মহাপাপ হ'বে তায়। ৩ ॥

গোপাশ্চ ঘৃততক্রাদেঃ ষড়্ভাগঞ্চ কৃষীবলাঃ।
দত্বান্যদ্ভুভুজে দদ্যুর্যদি ভাগং ততোঽধিকম্ ॥ ৪ ॥

পণ্যাদীনামশেষাণাং বণিজো গৃহ্নতস্ততঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তবিনাশায় তদ্রাজ্ঞশ্চৌরধর্ম্মিণঃ ॥ ৫ ॥

অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব সাধনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬ ॥

বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমর্থিভ্যঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥ ৭ ॥

যদ্যন্যৈঃ পাল্যতে লোকস্তদ্বৃত্ত্যন্তরসংশ্রিতঃ।
গৃহ্নতো বলিষড়্ভাগং নৃপতের্নরকো ধ্রুবম্ ॥ ৮ ॥

যত গোপগণ করি' আগমন
ঘৃত তক্র আদি হ'তে,
ষড়্ভাগ প্রদান করিবে আমায়
নিরাপদেতে রহিতে।
কৃষীবলগণ করিয়া যতন
শস্যের ষড়্ভাগ দেয়,
অধিক অর্পণ করে যদি কেহ,
রাজা যদি তাহা লয়,
চৌর্য্য বই আর তা'রে কি বলিব
তা'র ফলে সুনিশ্চয়
ঘটিবে নরক— অশেষ যাতনা
ভাগ্যেতে নাহি সংশয়।
চৌরধর্ম্মী সেই রাজার নিশ্চয়
ইষ্টাপূর্ত্ত সমুদায়,
বিনষ্ট হইবে, এই ঘোর পাপে
কি সন্দেহ আছে তা'য় ? ৪—৫।

অগ্নিহোত্র, তপ, সত্যের পালন,
বেদের সাধন আর,
অতিথি-সৎকার বৈশ্বদেব আর
ইষ্ট-কার্য্য এই সার। ৬ ॥
বাপী, কূপ আর তড়াগ নির্ম্মাণ
দেবতার আয়তন,
অন্নাদির দান সদা অর্থীজনে,
পূর্ত্ত বলিয়া গণন। ৭ ॥
ষড়্ভাগ গ্রহণ করি' নরপতি
প্রজা রক্ষিবারে নারে
অন্যের আশ্রয় প্রজা যদি লয়
রক্ষণ-পালন তরে—
তবে সেই রাজা সেই মহাপাপে
কষ্ট পায় সুনিশ্চয়,
অনন্ত নরক ভাগ্যে তা'র লেখা
নাহিক তাহে সংশয়। ৮ ॥

নিরূপিতমিদং রাজ্ঞঃ পূর্ব্বৈ রক্ষণবেতনম্।
অরক্ষংশ্চোরতশ্চৌর্য্যং তদ্ধনং নৃপতের্ভবেৎ ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্‌যদি তপস্তপ্ত্বা প্রাপ্তো যোগিত্বমীপ্সিতম্।
ভুবঃ পালনসামর্থ্যযুক্ত একো মহীপতিঃ ॥ ১০ ॥
পৃথিব্যামস্ত্রভৃন্নাদ্যাপ্যহমেবর্দ্ধিসংযুতঃ।
ততো ভবিষ্যে নাত্মানং করিষ্যে পাপভাগিনম্ ॥ ১১ ॥

পুত্র উবাচ।

তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা মন্ত্রিমধ্যস্থিতোঽব্রবীৎ।
গর্গোনাম মহাবুদ্ধির্মুনিভূপং বয়োঽতিগঃ ॥ ১২ ॥
যদ্যেবং কর্ত্তুকামস্ত্বং রাজ্যং সম্যক্ প্রশাসিতুম্।
ততঃ শৃণুষ্ব মে বাক্যং কুরুষ্ব চ নৃপাত্মজ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বে ঋষিগণ কৈলা নিরূপণ
প্রজারক্ষণ-বেতন,
ষড়্‌ভাগ লইয়ে তৎপর হইয়ে
রাজা করিবে রক্ষণ।
যদি নিয়ে কর না হয় তৎপর
অথবা অক্ষম হয়,
চোর হ'তে যদি না পারে রক্ষিতে
চোর নিজে সুনিশ্চয়। ৯ ॥
এই হেতু আমি করিয়াছি মনে
করি' তপ-আচরণ,
যোগীত্ব লভিব পারি য'দি আমি,
করিতে প্রজা-রক্ষণ,
ভুবন-পালনে সামর্থ্য আমার
হয় যদি তপোফলে,
একচ্ছত্র হ'য়ে পারি যদি আমি
শাসিবারে ভূমণ্ডলে। ১০ ॥
পৃথিবীতে যদি আমার সমান
শস্ত্রবলী নাহি রয়,
হেন ঋদ্ধিবল ঘটে যদি মোর
তবে আমি সুনিশ্চয়,
ল'ব রাজ্য-ভার, নহে রাজ্য ছার
ইথে মোর কাজ নাই,
পাপভাগী হ'য়ে রাজ্য-ভার ল'য়ে
রাজা হ'তে নাহি চাই। ১১ ॥
পুত্র বলে, পিতা, করহ শ্রবণ,
শুনিয়া তাঁহার বাণী,
অযৌক্তিক নয় এ বাক্য নিশ্চয়,
সকলে মনেতে মানি'
করিতে উপায় বলেন তাঁহার,
গর্গ নামে তপোধন,
বয়োবৃদ্ধ আর জ্ঞানবৃদ্ধ তিনি,
বুদ্ধে অতি বিচক্ষণ। ১২ ॥
শুন নৃপাত্মজ, মনের বাসনা
যদি তব এই মত,
যোগবলে যদি চাও রক্ষিবারে
রাজ্য আর প্রজা যত,
তবে এক যুক্তি আছে সুনিশ্চয়
শুনহ মম বচন,
মনেতে বিচারি' কর্ত্তব্য বুঝিলে,
করিও তাহা পালন। ১৩ ॥

দত্তাত্রেয়ং মহাত্মানং সহ্যদ্রোণীকৃতাশ্রমম্ ।
তমারাধয় ভূপাল পাতি যো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৪ ॥

যোগযুক্ত মহাত্মানং সর্ব্বত্রসমদর্শিনম্ ।
বিষ্ণোরংশং জগদ্ধাতুরবতীর্ণং ধরাতলে ॥ ১৫ ॥

যমারাধ্য সহস্রাক্ষঃ প্রাপ্তবান্ পদমাত্মনঃ ।
হৃতং দুরাত্মভির্দৈত্যৈর্জঘান চ দিতেঃ সুতান্ ॥ ১৬ ॥

ভক্ত্যা তু কৃপয়াবিষ্টং ত্বং তোষয়িতুমর্হসি ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

কথমারাধিতো দেবৈর্দত্তাত্রেয়ঃ প্রতাপবান্ ।
কথং বাপহৃতং দৈত্যৈরিন্দ্রত্বং প্রাপ বাসব ॥ ১৮ ॥

দত্তাত্রেয় নামে　　মহাযোগীবর
　　মহাত্মা অতি নিশ্চয়,
সহ্য-গিরিবরে　　আশ্রম করিয়া,
　　করিয়া যোগ-আশ্রয়,
আছেন এখন,　　করহ গমন
　　তাঁ'র পাশে নররায়,
ভুবন-পালক　　সেই যোগিবর
　　সন্তুষ্ট কর তাঁহায় । ১৪ ॥
বিষ্ণুর অংশেতে　　জনম তাঁহার
　　মহাত্মা সে তপোধন,
সর্ব্বজীবে আছে　　সম-দৃষ্টি তাঁ'র
　　সদা যোগযুক্ত মন । ১৫ ॥
যাঁ'রে আরাধিয়া　　সহস্র-লোচন
　　নাশি' দিতি-সুতগণে,
দৈত্য-অপহৃত　　নিজ ইন্দ্রপদ
　　পাইলেন জিনি' রণে ; ১৬ ॥
সেই যোগিবরে　　যদি ভক্তি-ভরে
　　করিয়া তুমি পূজন
পার তুষিবারে ;　　কৃপানিধি তিনি,
　　হইবে বাঞ্ছা পূরণ । ১৭ ॥
এই কথা শুনি'　　অর্জ্জুন তখনি
　　জিজ্ঞাসিলা মুনিবরে,
বলহ আমায়,　　দৈত্যেরা কি রূপে,
　　জিনিল ইন্দ্রে সমরে ?
কি রূপে বা পরে　　ইন্দ্র, ঋষিবরে
　　করিলেন আরাধন ?
কি রূপে বা পুনঃ　　কৃপায় তাঁহার
　　মানস হ'লো পূরণ ? ১৮ ॥

গর্গ উবাচ।

দৈত্যানাং দেবতানাঞ্চ যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
দৈত্যানামীশ্বরে জম্ভে দেবানাঞ্চ শচীপতৌ ॥ ১৯ ॥

তেষান্তু যুদ্ধমানানাং দিব্যং সম্বৎসরো গতঃ।
ততো দেবাঃ পরাভূতা দৈত্যা বিজয়িনোঽভবন্ ॥ ২০

বিপ্রচিত্তি*মুখৈর্দেবা দানবৈস্তে পরাজিতাঃ।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥ ২১ ॥

বৃহস্পতিমুপাগম্য দৈত্যসৈন্যবধেপ্সবঃ।
অমন্ত্রয়ত সহিতা বালখিল্যৈঃ† মহর্ষিভিঃ ॥ ২২ ॥

গর্গ বলে, রায়, শুন সমুদায়,
বলিব তোমার পাশ,
সে অপূর্ব্ব কথা, অতি পুণ্য গাথা
শুনিলে পূরিবে আশ।
দৈব দৈত্যে রণ অতি সুদারুণ
হইয়াছিল ঘটন,
দৈত্যের ঈশ্বর জম্ভ বীরবর
করেছিল ঘোর রণ,
দেবেন্দ্র বাসব, ল'য়ে দেব সব,
যুঝিলেন তা'র সনে। ১৯।
দিব্য-সম্বৎসর যুঝি' ঘোরতর
গেল দৈত্যসনে রণে।
শেষে দেবগণ পরাজিত হ'য়ে
করিলেন পলায়ন,
দৈত্যগণ তবে জয়ী হ'য়ে সবে
নিল স্বর্গ-সিংহাসন। ২০ ॥

যত দেবগণ, বিপ্রচিত্তি * আদি
দৈত্যগণ সনে রণে,
হ'য়ে পরাজিত হইয়া লজ্জিত
কৈল মন পলায়নে।
শক্রজয়ে সবে হইয়া অক্ষম
নিরুৎসাহ হৈল অতি। ২১।
পলায়ন করি' আসিয়া মিলিল
যথা গুরু বৃহস্পতি।
দৈত্য-সৈন্য-নাশে বাসনা সবার
যুঝিতে সামর্থ্য নাই,
কি উপায়ে হ'বে স্বর্গের উদ্ধার
মনেতে ভাবেন তাই।
বালখিল্য † আদি মুনিগণ সনে
মিলিত হইয়া সবে,
করেন মন্ত্রণা দৈত্য জিনিবার
আবার পশি' আহবে। ২২ ॥

* কশ্যপের পুত্র। দনুর গর্ভসম্ভূত, মহাবল দানব।

† ব্রহ্মার শরীর-লোমজ ষষ্টিসহস্র ঋষি। ইহাদের দেহ পরিমাণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত।
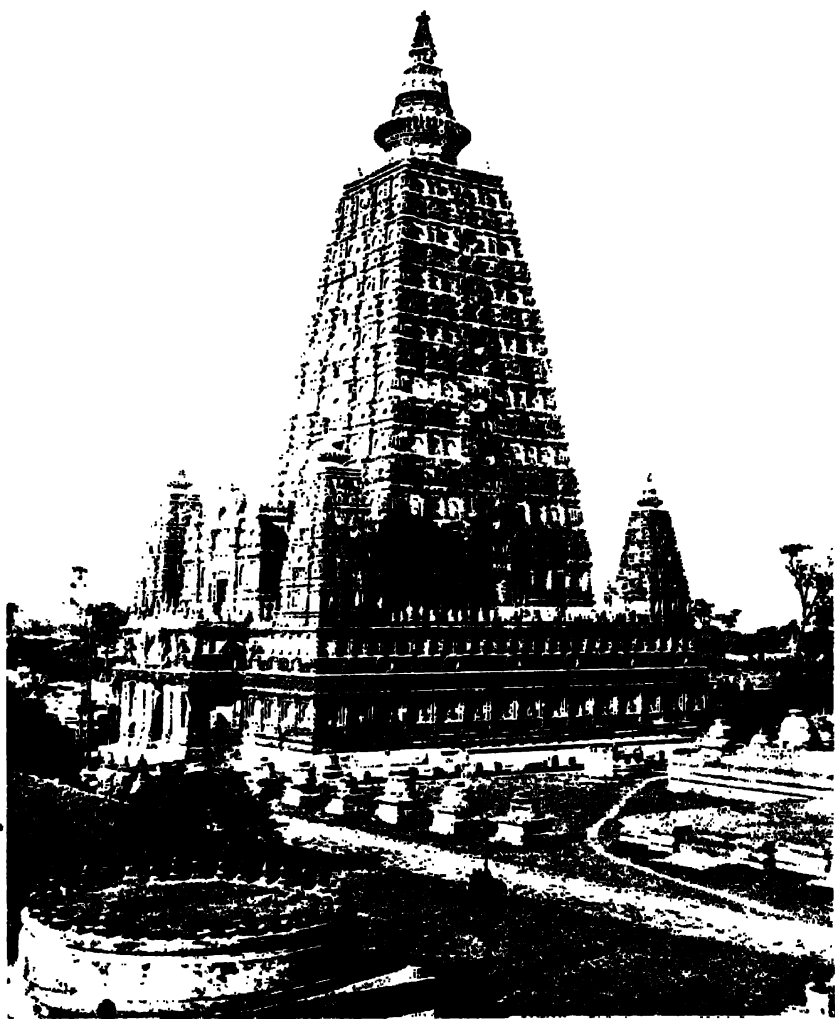
বোধগয়া (বুদ্ধগয়া)।

(গয়াক্ষেত্রে গৌরচন্দ্র)

India Press, Calcutta.

জগন্মূর্ত্তি ।

জগত তোমাতে, তুমি মা জগতে, তুমি ছাড়া কোথা কি আছে আর ?
তুমি মা সকল, তোমারি সকল, তুমি আমি সেটা মায়া তোমার ॥

তুমি মা মায়াতে এ বিশ্বরূপিণী, অণুতে অণুতে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, অবস্থা-ত্রিতয়, তোমারি ত্রিবেশ জেনেছি সার ॥

মহাকাল যিনি নিত্য নির্ব্বিকার, পদতলে তব শবেরি আকার,
শবাসনা তাই খ্যাতি মা তোমার, নাচিছ সতত হৃদয়ে তাঁর ॥

দশ দিক তব পরিধেয় বাস, দিগম্বরী নাম জগতে প্রকাশ,
কিন্তু দিগম্বরী বলে যারা তারা মহিমার তব ধারে না ধার ॥

অচিন্ত্য অনন্ত বিরাট আকার, স্বপ্রকাশ সদা সর্ব্ব মূলাধার,
বিবসনা তাই করি মা বিচার ঢাকিবে কে তোরে শকতি কার ॥

ঐ যে অমিত অনন্ত গগন, মুক্তকেশজাল শিরে সুশোভন,
অচল সচল গ্রহতারাদল মুণ্ডমালা গলে দুলিছে হার ॥

প্রকৃতির শোভা মুখে মধু-হাস, ঘোর ঝঞ্ঝা-বায়ু সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
জিহ্বা লকলক চপলা ঝলক বজ্রনাদে কভু ছাড় হুহুঙ্কার ॥

উল্কাপিণ্ড যত ছুটিছে গগনে, রক্তবিন্দু-ধারা বহিছে বদনে,
গিরি রোমগণ, বারিদ-বর্ষণ—পয়োধরে ঝরে সুধার ধার ॥

শশাঙ্ক তপন আর হুতাশন, সুশোভিত ভাল ভালে ত্রিলোচন,
ইন্দ্র-ধনু-রেখা শশাঙ্কের লেখা, শোভিতেছে কিবা মাঝেতে তার ॥

শত শত আমি হোয়ে গো মা তুমি, ব্যাপিয়া রোয়েছ এ জগত-ভূমি
দেব দৈত্য যক্ষ নর নাগ রক্ষ, পশু পক্ষী মীন কীটাদি আর ॥

তুমি যদি আমি শুনি শাস্ত্র মুখে, আমি-যত তবে কেন থাকে দুখে ?
মায়া মোহ আর দম্ভ অহঙ্কার, এ সকল মা গো কাহারা কার ॥

মহামায়ার মায়া বুঝিতে কে পারে, কুণ্ডলিনীরূপে সুপ্তা মূলাধারে,
চেতন তো নাই, বহিতেছে তাই, বোধানন্দনাথ দুখেরি ভার ॥

শ্রীবোধানন্দনাথ ।

সাম্যস্থাপন।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত, পদ, হৃদ্‌পিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, অস্থি, রক্ত, স্নায়ু, শিরা, প্রভৃতি অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়াই আমাদের দেহ। এক প্রাণই এই অঙ্গগুলিকে সদা চলাইতেছে, ফিরাইতেছে, কাজ করাইতেছে। উদ্দেশ্য সমগ্র দেহটির রক্ষা। প্রত্যেক অঙ্গের এক একটি স্বতন্ত্র জীবন ও পৃথক চৈতন্য আছে। ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকও কতকটা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই জীবন ও চৈতন্য সমগ্র দেহের জীবন হইতেই উদ্ভূত, দেহের জীবনেই ইহাদের জীবন, দেহের চৈতন্যেই ইহারা চৈতন্যবান্।

অঙ্গমাত্রের এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, যেমন দন্তের কাজ চর্ব্বণ, যকৃতের কাজ পিত্ত নিঃসারণ ইত্যাদি। যতক্ষণ অঙ্গগুলি স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য যথাযথ পালন করিয়া যায়, ততক্ষণই দেহের সাম্যাবস্থা থাকে। এই সাম্যাবস্থার নাম স্বাস্থ্য ও সুখ। কিন্তু যদি কোনও অঙ্গ স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করে বা অক্ষম হয়, অমনি একটা বৈষম্য ঘটে। এই বৈষম্য দেহরক্ষার বিরোধী। ইহার নাম অসুস্থতা (disorder)।

বৈষম্য উপস্থিত হইবামাত্র প্রাণ সাম্যস্থাপন করিতে উৎকট চেষ্টা করে। এই উৎকট চেষ্টার নামই দৈহিক যাতনা। ইহা আমাদের প্রীতিকর না হইলেও অশেষ কল্যাণকর সন্দেহ নাই, কারণ ইহাই দেহে সাম্যাবস্থা পুনরানয়ন করে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। **একটি অঙ্গের কর্ম্মফলে সকল অঙ্গই** লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যকৃৎ উত্তমরূপে স্বীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে, সে যে কেবল নিজে লাভবান্ তাহা নহে, সমগ্র দেহটি (অর্থাৎ সকল অঙ্গই) ঐ লাভের অংশ পায়। হৃদ্‌পিণ্ড যথেচ্ছাচারী হইলে সে নিজেও মজে, অপরকে ও মজায়। ইহার কারণ এই যে সকলেই এক—একই দেহের অংশ।

এই ব্রহ্মাণ্ড একটি বিরাট দেহ। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানব, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মনু, প্রজাপতি, চন্দ্র, সূর্য্য, ভূধর, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য জীবই এই দেহের অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আত্মা বা ভগবানই ইহার প্রাণ। ভগবানই জীবগণকে চালাইতেছেন, কর্ম্ম করাইতেছেন। উদ্দেশ্য সৃষ্টিরক্ষা ও ক্রমোন্নতি। জীবমাত্রেরই পৃথক চৈতন্য ও জীবন আছে, কিন্তু ইহা আমা হইতেই উদ্ভূত। তাঁহার জীবনেই আমাদের জীবন, তাঁহার চৈতন্যেই আমরা চৈতন্যযুক্ত,—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

প্রত্যেক জীবের নিরূপিত কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্যের নাম যজ্ঞ। এই কর্ত্তব্য বা যজ্ঞ যথাযথ পালিত হইলেই বিরাট দেহে সাম্য থাকে। যদি কেহ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন না করে, অমনি একটা বৈষম্য উপস্থিত হয়। এই বৈষম্যই ক্রমোন্নতির শত্রু, জগতের উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ। ইহারই নাম পাপ।

যেমন বৈষম্য আইসে, অমনি বিরাট প্রাণ বিশ্ব-হিতার্থে সাম্যস্থাপনে অগ্রসর হন। এই সাম্যস্থাপনের চেষ্টার নাম জীবের ক্লেশ বা

কর্ম্মফল। ইহা আপাততঃ কষ্টকর হইলেও অশেষ মঙ্গলদায়ক, কারণ ইহাই ক্রমোন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করে। ইহা সম্পূর্ণ অনিবার্য্য। ঘাত হইলে প্রতিঘাত হইবেই হইবে, ক্রিয়া হইলে প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

যেমন একটি অঙ্গের কর্ম্মফল সকল অঙ্গই ভোগ করে, সেইরূপ একটি জীবের পাপে সকল জীবই কষ্ট পায়, একটি জীবের পুণ্যে সকল জীবই সুখ পায়। সম্রাট নিরোর নিষ্ঠুরতা ও হিংসায় জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত, বুদ্ধদেবের দয়া ও ত্যাগে জগৎ লাভবান। কারণ, ব্যক্তিগত পুণ্যেই জগতের সমষ্টি পুণ্য বাড়িয়া যায়, ব্যক্তিগত পাপেই সমষ্টি পাপ বৃদ্ধি পায়।

সমষ্টি পুণ্যের ফল জগতের সুখ, সমষ্টিপাপের ফল দুঃখ। সভ্যতা, উন্নতি, জ্ঞান, ঐক্য, মৈত্রী, স্বাস্থ্য ও ধনধান্যাদি উৎপাদন করিয়া সমষ্টি পুণ্য ব্যয়িত হয়। আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দারিদ্র্য, যুদ্ধবিগ্রহ, অজ্ঞান, ও জাতীয় বিদ্বেষাদি দ্বারাই সমষ্টি পাপের ক্ষয় হয়। কিন্তু পাপ যখন এরূপ বাড়িয়া উঠে যে উক্ত উপায়ে ইহার সমগ্র ক্ষয় হয় না, কতকটা সঞ্চিত থাকিয়া ক্রমোন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়, তখন প্রাণ হইতে এক অসাধারণ শক্তি-স্রোত নামিয়া আইসে ও সাম্যস্থাপন করে। এই শক্তি-স্রোতের নাম মহাপুরুষ ও অবতার। সঞ্চিত হলাহল যখন জগৎকে গ্রাস করিতে বসে, তখন মহাদেব ব্যতীত আর কা'র সাধ্য যে সে বিষ পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে পারে?

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, B. A.

উইল।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

"Oft *expectation* fails, and most oft there
Where most it promises."

SHAKESPERE.

আমার জীবনের গোটাকয়েক দিনের কথা বলিব। আমি তখন বালক। আমার বয়স সবে পনর বৎসর। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমাদের আদি-নিবাস কান্যকুব্জ হইলেও, আমার স্বর্গীয় পিতামহদেব ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, বৈশ্যবৃত্তি স্বীকার পূর্ব্বক গুজরাটের অন্তর্গত পুরবন্দর নামক স্থানে বাস করেন। সেখানেই আমার পিতৃদেবের জন্ম। আমার পিতা শ্রীযুক্ত রামকিষণ উপাধ্যায়, তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতৃদেব যদিও বাণিজ্য-ব্যাপারে সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেই ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতি হয়, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদের সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে ঋণ শোধ করিতে হইয়াছিল। তখন আমার সবে মাত্র উপনয়ন হইয়াছে, আর আমার ভগিনীটির বয়স চারিবৎসর মাত্র। পিতৃদেব ধনহীন হইয়া পরিচিত জনগণের মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। আমাকে রাজকোটে স্বীয় গুরু শ্রীযুক্ত চতুর্ভুজ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য রাখিয়া দিলেন, এবং আমার মাতা আর ঐ ভগিনীটিকে, তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনীর নিকট রাখিয়া স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন।

পূর্ণ এক বৎসর পরে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি ত্রিবাঙ্কুর-রাজের অধীনে সৈনিকপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার মাতা ও ভগিনীকে লইবার জন্য সংবাদ আসিল। মাতা গেলেন। ভগিনীটি পিসিমার কাছেই রহিয়া গেল।

পিসিমা বিধবা, নিঃসন্তান—বাস-বাটিটি বই অন্য সম্পত্তি কিছুই ছিল না। কিন্তু বাল্যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন, শিল্পশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এইজন্য স্বামীর মৃত্যুর পর কয়েকটি ব্রাহ্মণ-বালিকার শিক্ষাদান ভার লইয়া, তাহাদের অভিভাবকগণের প্রদত্ত সাহায্যে কোনও রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। পুরবন্দর, মাধবপুর, ভবনগর প্রভৃতি স্থানে আমাদের যে সকল আত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদের পাঁচটি বালিকা তাঁহার বাটিতেই থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। তদ্ব্যতীত রাজকোটের পাঁচ ছয়টি বালিকা প্রত্যহ তাঁহার বাটিতে আসিয়া শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীটিও সেই সঙ্গে থাকিয়া গেল। আমি মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া আসিতাম। এইরূপে দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাটিয়া গেল। পিতা ত্রিবাঙ্কুরেই রহিলেন।

যাঁহার যত্নে পিতামহদেব জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গুজরাটে আসিয়াছিলেন, সেই বামদেব মিশ্র মহাশয় এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি ব্যবসায়দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, এক্ষণে পুরবন্দর সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। তিনি পিতামহদেবের ভগিনীপতি। তাঁহার একটি অপুত্রা বিধবা কন্যা বই আর কোনও সন্তান নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার ব্যবসায় চালাইতেছেন। তিনি ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, যে উইলে, আমার এই বাড়ীখানি ও আর কিছু সম্পত্তি রামকিষণ উপাধ্যায়কে দিয়া যাইব। তদনুসারে তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দিতে ভুলিও না। পিতা মহাশয়ও এ কথা শুনিয়াছিলেন। তখন তিনি ত্রিবাঙ্কুরে। বৃদ্ধ তাঁহাকে আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ চিঠি লিখিবার কয়েকদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন, তাঁহার ভ্রাতা এবং তাঁহাদের উকীল, উইলের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনও সন্ধান পাইলেন না। বৃদ্ধের ভ্রাতা লিখিলেন, আপনি চলিয়া আসুন, যদিও উইল পাওয়া যাইতেছে না, আমি আপনার যাহাতে স্বচ্ছন্দে চলে, এরূপ সুব্যবস্থা করিব। কিন্তু পিতৃদেব উত্তর দিলেন, যদি উইল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন আছি এমনি থাকিব, এরূপেও স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিবে। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন উইল না পাওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমি ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিলাম। সে বলিল "উইল বাড়ীতেই আছে, খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। চল আমরা সেখানে গিয়া খুঁজিয়া দেখি।" পিসিমা বলিলেন "কেন মিছা কর্ম্মভোগ করিবে। বোধ হয় উইলে অনেক সম্পত্তি তোমাদিগকে দিবার কথা ছিল, সেই জন্য তাহারা উইল লুকাইয়াছে।"

আমার উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "এমন হইতে পারে না। তাহাদের ত টাকার কমি নাই, তোমরাও ত তা'দের পর নও। তুমি তোমার পিসিকে লেখ, তোমরা সেখানে একবার যাইতে চাও, দেখ না তা'রা কি বলে।"

চিঠি লিখিলাম। উত্তর আসিল, "কবে আসিবে লিখিও। বুধবার বা বৃহস্পতিবার হইলে ভাল হয়। ঐ দুই দিনের যে দিন সুবিধা হয়, লিখিও। যদি লোক জন থাকিত, কাহাকেও আনিতে পাঠাইতাম। কিন্তু এখানে আমি আর রুক্মা দাসী বই আর কেহই নাই। তোমার ত পনর ষোল বৎসর বয়স হইয়াছে। রাজকোট ষ্টেসন থেকে সকালের ট্রেণে বাহির হইলে বিকালে আসিয়া পৌঁছিতে পারিবে। যে দিন আসিবে লিখিও, সে দিন আমি লোক সঙ্গে ষ্টেসনে থাকিব।"

উত্তর দিলাম "বৃহস্পতিবার যাইব।"

পরদিন সোমবার। উপাধ্যায় বলিলেন "বুধবারে যাও। দিন ভাল। আমিও ঐ দিন কাশীযাত্রা করিব, সুতরাং তোমাদের টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে পারিব। আজ তোমার পিসিমাকে আবার চিঠি লেখ, তিনি কাল পা'বেন, সুতরাং বুধবার বিকালে তোমাদের দু'জনকে নিতে আসিবেন।"

আমি চিঠি লিখিয়া ভগ্নিকে সে কথা বলিতে চলিলাম।

উইল পা'বার আশা কিছুই নাই। তবু একবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আনন্দ-কানন।

"This our life, exempt from public haunt,
Finds tongues in trees, books in running brooks,
Sermons in stones, and good in every thing."

SHAKESPERE.

বুধবার প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় রাজকোট ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী মন্থর গমনে চলিল। গাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠে আমি আর আমার ভগিনী। আমার বুক দুরদুর করিতেছে। এক এক বার মনে হইতেছে উইল পাইব কি? আবার ভাবিতেছি, দূর হোক! ও দুরাশায় কাজ কি? সে ত পাওয়া যায়ই নাই—এর পর যে আবার পাওয়া যাইবে

তাহার আশা কি?—দূর হৌক দুশ্চিন্তা; যাচ্চি পুরবন্দর দেখিতে; দু'দিন থাকিয়া দেখিয়া আসিব। আমি ত এখন বড় হইয়া'ছি—অনায়াসে উপার্জ্জন করিয়া ভগ্নি আর পিসিমাকে পালন করিতে পারিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি, দেখিলাম, ভগ্নিটি গাড়ীর কোণে ঠেস্ দিয়া ঘুমাইতেছে। হঠাৎ একটা ধাক্কা—গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে থামিল। ধাক্কায় রমা চমকাইয়া উঠিল, বোধ হয় তাহার মাথায় লাগিয়াছিল। জন পাঁচ ছয় লোক কতকগুলা পুঁটলী লইয়া উঠিল। তার পর আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে আর এক ধাক্কা, আবার গাড়ী থামিল। এবার আর কেহ উঠিল না আবার গাড়ী চলিল, এবার প্রায় এক ঘণ্টা অতি দ্রুত-বেগে চলিল—এইরূপ কখন দ্রুত কখন মৃদুগমনে চলিয়া গাড়ী ১২টার সময় একটা ষ্টেসনে থামিল; সেখানে সকল আরোহী নামিয়া গেল, আবার আমরা দু'জন হইলাম। এবার গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে আমি রমাকে বলিলাম "রমা, এইবার খাবার খেয়ে নাও; বেলাও হ'য়েছে গাড়ীতেও আর কেহ নাই।" এই বলিয়া, সঙ্গে কতকগুলি ফল মূল ছিল সে গুলি দুইজনে আহার করিলাম। এবার গাড়ী অনেকক্ষণ চলিয়া—একটি ষ্টেসনে আসিল। তখন বেলা বোধ হয় তিনটা হইয়া থাকিবে। আমারও একটু তন্দ্রার আবেশ হইয়াছিল, থামিবার ধাক্কায় চমকিয়া উঠিলাম। রমা বলিল, "দাদা, মাথায় বড় লেগেছে, এরা কি একটু আস্তে গাড়ী থামা'তে পারে না?" এমন সময় দু'টি বৃদ্ধ, আমাদের প্রকোষ্ঠে উঠিলেন। আমি আমার ভগিনীর পাশে উঠিয়া বসিলাম। তাঁহারা দু'জন আমাদের সম্মুখের আসনে বসিলেন।

বৃদ্ধ দুইটি গাড়ীতে উঠিয়া দেশী ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমাদের অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে এ অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণগত একটু পার্থক্য আছে সুতরাং তাঁহাদের সকল কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একবার আমার পিতার নাম শুনিলাম। বলিলাম, "মহাশয় আপনি কে? আপনি কোন রামকিষণ উপাধ্যায়ের কথা বলিতেছেন?"

একজন বৃদ্ধ বলিলেন "আমি পুরবন্দরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্বর্গীয় হরকিষণ উপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র রামকিষণ উপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি। আপনি কে?—তাঁ'কে চিনেন কি?"

আমি বলিলাম "আমি তাঁ'রই পুত্র। আমার নাম শ্রীবালকিষণ উপাধ্যায়।"

বৃদ্ধ। "আপনি এখন কোথায় থাকেন? আপনার পিতৃদেবই বা কোথায়? আহা, বাল্যকালে তাঁ'র সঙ্গে একত্রে পড়্‌তাম!"

আমি। "পিতৃদেব এখন ত্রিবাঙ্কুর রাজ-সরকারে কর্ম্ম কর্‌চেন। আমি রাজকোটে আমাদের কুলগুরু মহাশয়ের আশ্রমে শাস্ত্র-পাঠে ব্যাপৃত আছি। এটি আমার সহোদরা রাজকোটে পিসিমার কাছে থাকেন। আমরা একবার মিশ্রমহাশয়ের বাগান-বাটি দেখিতে যাইতেছি।"

বৃদ্ধ। "আহা! বড় দুঃখের বিষয়! বাটিটি ত আজ আপনাদেরই হইবার কথা। আমার বাড়ীও মিশ্রমহাশয়ের বাগান-বাড়ীর কাছে। আধক্রোশ দূর হ'বে। আমরা সামান্য কৃষক। চাষবাসই আমাদের উপজীবিকা। আমাদের আয় নিতান্ত অল্প হ'লেও, আমরা বেশ সচ্ছন্দে

থাকি। সহর কেবল লোক-সমুদ্র, পল্লিগ্রাম বড় শান্তিপূর্ণ। যাচ্ছেন—দেখে বড় তৃপ্ত হ'বেন। আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত বল্‌লেও হয়। মাতা বসুমতী আমাদের জন্য ফল শস্য উৎপাদন করেন। আমরা যথাশক্তি তাঁ'র সেবা ক'রে, মাঠের শস্য আর নদীর জলে জীবন ধারণ পূর্ব্বক, প্রকৃতির শোভা দেখে প্রাণ শীতল করি। আমার পিতা, আপনার পিতামহদেবের নিকট চাকরী কর্‌তেন। আপনারা সম্বাদ দিয়ে আস্‌চেন ত? মিশ্রমহাশয়ের আনন্দ-কানন ষ্টেসন থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ হ'বে। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো।"

আমি। "পিসিমাকে খবর দিয়েছি।"

বৃদ্ধ। "তিনি তা'হ'লে হরদয়ালের গাড়ী খানা নিয়ে নিজেই ষ্টেসনে আস্‌বেন সন্দেহ নাই। আমি আজ বাড়ী যাবো না। ষ্টেসনের কাছে আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। তা'রা কে কেমন আছে সম্বাদ নিয়ে কাল যা'ব।" বলিতে বলিতে গাড়ী থামিল। আমরা নামিলাম। কিন্তু কৈ কেউ ত নাই! এখন যাই কোথায়? সঙ্গে একটা টিনের বাক্স তা'তেই আমাদের বস্ত্রাদি। সেটা ঘাড়ে ক'রে আমি দু' তিন ক্রোশ হয়ত যেতে পারি, কিন্তু পথ ত জানি না, আর আমি পারিলেই বা কি হ'বে—রমা ত কোনও মতে এত পথ যেতে পারিবে না। এখন উপায় কি—সংবাদ পেয়েও আমাদের নিতে এলেন না? এ ত বড় অন্যায়!"

কিন্তু সে কথা এখন ভাবিয়া ফল কি? সন্ধ্যা হইয়াছে। ষ্টেসনে একখানা মাত্র গাড়ী আছে, তাহাতে একজন কুলি মাল বোঝাই করিতেছে। আর দ্বিতীয় গাড়ী নাই—লোকও নাই।

এমন সময় সেই বৃদ্ধটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদের দুইজনকে দেখিয়া বলিলেন—"একি? কেউ আসে নি? তবে আপনারা যা'বেন কোথায়?"

এমন সময় সেই কুলিটি আর একটা মোট লইয়া আসিল। বৃদ্ধটি তখন তাহাকে বলিলেন "ভজনলাল!"

ভজনলাল মোটটা গাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ। "ভজনলাল, আমাদের ও অঞ্চলের মাল আছে?"

ভজন। "আজ্ঞে হাঁ, আজ হরদয়ালবাবুর অনেক মাল আছে। তা' ছাড়া ডাক-ঘরের ব্যাগ আছে।

বৃদ্ধ। "তা বেশ হ'য়েছে। তুমি এঁদের দু'জনকে নিয়ে যাও। এঁরা মিশ্রমহাশয়ের আত্মীয়। তাঁ'র আনন্দ-কাননে যা'বেন। এঁদের বেশী জিনিস নাই শুধু এই ছোট বাক্সটি। বৃষ্টি আস্‌চে, ছইয়ের ভিতর একটু জায়গা ক'রে দাও। ইনি উপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র!"

ভজন। "আহা! আসুন আসুন।" এই বলিয়া কয়েকটা মোট সরাইয়া তাহার মাঝখানে আমাদের বস্‌বার জন্য দুইখানা চট পাতিয়া দিল। আমরা এই নবপরিচিত বৃদ্ধ বন্ধুটির কৃপায় ঘোর বিপদে নিস্তার পাইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন "আমার যদি আজ বাড়ি যা'বার কথা থাক্‌তো, তা' হ'লে আমার গাড়ী আস্‌তো। তা' হ'লে আপনাদের কোনও কষ্টই হ'তো না। এ মালের গাড়ীতে যেতে কষ্ট হ'বে। এথেকে আপনাদের মনে রাখা উচিত, দূরদেশে যা'বার সময়, যা'র কাছে যা'বেন, তার পত্রের উত্তর না পেয়ে কখনও

যা'বেন না। হয় ত আপনাদের পত্র এখনও তাঁ'দের কাছে পৌছে নাই। এখানে ডাকের বন্দোবস্ত ভাল নয়। মিশ্র মহাশয়ের আনন্দ-কাননের পর আরও একক্রোশ পূর্ব্বদিকে ডাকঘর। আজ ডাকের থলেতে যে চিঠি আছে, তার মধ্যে আনন্দ-কাননের জন্য যদি কোনও চিঠি থাকে, সে চিঠি শেষ রাত্রে ডাক ঘরে পৌছিবে। সকালে নটা দশটার সময় সে চিঠি নিয়ে বুড়া ডাক-পেয়াদা বাড়ীতে এসে খাওয়া দাওয়া ক'রে, নাগাৎ সন্ধ্যা সেই চিঠি বিলি করবে। যদি ওদিকে বেশী চিঠি না থাকে, কাল না দিয়ে পরশু সকালে ডাক ঘরে যা'বার সময় দিয়ে যা'বে। যাই হউক, এত কষ্ট নিস্ফল হ'বে না। আমাদের দেশের শোভা দেখে সব কষ্ট ভুলে যা'বেন। এখানে দেখে শেখ্‌বার অনেক জিনিস আছে। এখন আসি, প্রণাম।" বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

আমি ভজনলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওঁর নাম কি?"

ভজন। "শিউশরণলাল! উনি একজন জমিদার।"

আমি। "উনি বল্লেন কৃষক!"

ভজন। "হাঁ কৃষক বটে। কিন্তু আমি ওঁর জমিতে বাস করি কিনা? তাই বল্লাম জমিদার। অনেক জমি জমা আছে। নিজের চাষই বেশী। প্রজা দশবার জন মাত্র। তাই উনি আপনাকে কৃষক বলেন। ওঁর লোকজন অনেক—নিজে হাতে কিছু কর্ত্তে হয় না—চারিটি ছেলে আছে, তা'রাই চাষবাস দেখে, খাজনাপত্র আদায় করে। চাষে যা ফসল হয় তা'র যা রাখবার রাখে। বাকী বিক্রি কর্‌বার জন্য পুরবন্দরে নিয়ে যায়।" এই বলিয়া সে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল। ওদিকে মেঘ ডাকিল—জল পড়িল—ঝড় হাঁকিল—আমরা দুটিতে মোটের মাঝ-খানে। রমাকে বলিলাম, রমা, আমার উরুতে মাথা দিয়ে একটু শোও।" সে শুইল। আমি মোট ঠেস দিয়া, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া, আনন্দ-কাননে আগমনের আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রায় বারটা। সমস্ত দিবা রাত্রি একরূপ অনাহারেই কাটিয়াছে। কে জানিত বল পথ এমন দুর্গম? কে জানিত বল, পিসিমা আমাদের চিঠি পাইবেন না! কে জানিত বল, হঠাৎ বন্ধু লাভ হইবে এবং তাঁহার কৃপায় অকূলে কূল পাইব? শিউ-শরণলালের শরণ-লাভ না হইলে আজ কি উপায় হইত? এই সব ভাবিতেছি। রমা ঘুমাইতেছে।

এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইল। বসিয়া থাকা কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। তখন একবার জিজ্ঞাসা করিলাম "ভজনলাল, আর কত দূর?"

ভজন। "আর বেশী দূর নয়। গ্রামে এসেছি। ঐ মোড়টার পরেই, একটু আগে বাগানের ফটক। আমি আগে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে, তার পর হরদয়ালবাবুর দোকানে যা'ব।" এই বলিয়া সে গাড়ী হইতে নামিল, এবং গাড়ীর সম্মুখে যে লণ্টন জ্বলিতেছিল, সেটি লইয়া চলিয়া গেল।

আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, নিবিড় অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না। একটু পরে ভজনলাল আসিয়া আবার গাড়ীতে উঠিল।

আমি জিজ্ঞাসিলাম "কোথায় গিয়েছিলে?"

ভজন। "আপনাদের বাগানের ফটকটা খুলে রেখে এলাম।" এই বলিয়া আবার

গাড়ী চালাইতে লাগিল। এইবারে আবার আমার বুক দুরদুর করিতে লাগিল; আমি রমাকে ডাকিলাম "রমা, ওঠ, এসেছি।"

রমা ঘুমের ব্যাঘাত হওয়াতে বলিল "আঃ!"

গাড়ী থামিল—আবার ভজনলাল লণ্ঠনটি লইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে শুনিতে পাইলাম, সে দ্বারে ধাক্কা দিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে, দেখিলাম একটি বৃদ্ধা আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে আলো লইয়া একজন বৃদ্ধা দাসী।

বৃদ্ধা। "ভজনলাল, তুমি এত রাত্রে ডাকাডাকি করচো কেন?"

ভজন। "মা, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে তোমার এখানে এসেছে।"

বৃদ্ধা। "ছেলে, মেয়ে? আমার রামকিষণ ভাইয়ের ছেলে মেয়ে? তা'দের ত বৃহস্পতি-বার আস্‌বার কথা! আজ বুধবার না? কেমন, রুক্মা, আমার কি ভুল হ'য়েছে?"

আমি গাড়ীর ভিতর হ'তে বল্লাম, "না পিসি-মা, আপনার ভুল নয়! আপনার চিঠি পেয়ে, তা'র পর, আবার বুধবার দিন ঠিক ক'রে চিঠি লিখেছিলাম। সে চিঠি বোধ হয় আপনি পান নাই।"

পিসি-মা আমার কথা শুনিয়া গাড়ীর কাছে আসিলেন, রুক্মা আসিল, ভজনলাল আসিল। তা'রা দুজনে আলো ধরিল, আমরা নামিলাম। ভজনলাল আমাদের বাক্সটি নামাইয়া দিয়া গাড়ী ঘুরাইল।

পিসি-মা বলিলেন "কিছু বক্‌সিস্‌ নিয়ে যাও ভজনলাল!"

ভজন। "আজ থাক্‌, কাল এসে প্রসাদ পাবো।" এই বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

আমরা আনন্দ-কাননে আসি-লাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীদুর্গা।

আজি রে আবার মায়ের আমার এ কোন মূরতি দেখিতে পাই।
শ্রীদুর্গা-রূপে কি জাগিলেন মাতা, মরি কি শোভার তুলনা নাই।

সিংহোপরে মার দেখি অবস্থান চারি করে শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ব্বাণ
একি দৈত্য বধে রণে অভিযান, দেবের দুর্গতি নাশিতে ভাই॥

কিবা মরকত-বরণ বিমল, কোটী-রবি-শশীসম সে উজ্জ্বল,
অধরে বাঁধুলি করপদ তল, সুরক্ত কমলে তুলনা নাই॥

চন্দনে মাখান জবা পদোপরে, রতন-মুকুটে রবি-প্রভা হরে,
কপাল-ফলকে শশাঙ্ক স-কল, ত্রিলোচন মাঝে ল'য়েছে ঠাঁই।

পৃষ্ঠদেশে মার একা বেণী দোলে, গলদেশে ফণী ফণা ধরি' ঢোলে,
চরণে নূপুর রুণু রুণু বোলে, বাজিছে মধুর শুনিতে পাই।

সুচারু রক্তিম কিবা সে বসন, শোভা পায় গায় কত না ভূষণ,
রহে না দুর্গতি স্মরিলে চরণ, দুর্গা দুর্গা মারে বলি রে তাই।

বোধানন্দনাথ বলে, দেবগণ, করযোড়ে সবে দূরে কি কারণ?
থাক দূরে, ল'য়ে জবার্ঘ্য-চন্দন পদোপরে দিতে আমি তো যাই।

অমরাবতী-কটক

উড়িষ্যার মধ্যে পুরী-রাজের সম্মান অতুলনীয়। লোকে তাঁহাকে নর-নারায়ণ বলিয় থাকে। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীন রাজা আছেন। এই অধীন রাজাগণ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া পূরী-রাজের বিস্তীর্ণ রাজ্যকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা 'গড়জাত' ও 'কিল্লাজাত' পুরীরাজের বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় উল্লিখিত অধীন রাজাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া চিরপ্রথানুসারে স্বহস্তে মহারাজের সেবা করিয়া থাকেন, এবং যিনি যে কার্য্য পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে তদনুযায়ী-উপাধি-খেলাত দেওয়া আছে ও তাঁহারা সেই রাজদণ্ড নামে অদ্যাবধি খ্যাত আছেন। যথা, যিনি মহারাজকে দর্পণ দেখান, তিনি কিল্লা-দর্পণ-রাজ বলিয়া খ্যাত।

কিল্লা-দর্পণ রাজ্যটি আধুনিক কটক সহরের অতি নিকটে। এই রাজ্যের মধ্যে বহুতর পর্ব্বতশ্রেণী ও পুরাতন কীর্ত্তি সমূহ বিদ্যমান আছে। মহাভারতোল্লিখিত বিরাট রাজের গোশালা, কীচক-ভূমি ইত্যাদি অনেক দেখিবার স্থানও আছে। অদ্য 'অমরাবতী-কটক' নামে একটি স্থানের বিষয় মাত্র আমরা উল্লেখ করিব।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলের বৈরি নামক একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনের নিকট একটি নাতিক্ষুদ্র পর্ব্বতের তলদেশে অমরাবতী-কটক নামে একটি স্থান আছে। একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, তাহাকে লোকে ভাণ্ডারি-পোখর বলে। এই পুষ্করিণীর পাড়ের উপর সামান্য একটু মাটি খুঁড়িলেই অভ্র পাওয়া যায়। অভ্রের ছোট ছোট অনেক কুচি বা টুকরা পাড়ের চারিদিকে মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়া আছে। স্থানীয় মালিরা বিবাহের টোপর, ফানস্, ঝাড় ইত্যাদি করিবার জন্য এই স্থান হইতে অভ্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। ইহার ভিতর অভ্রের খনি আছে কি না তাহা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহ অনুসন্ধান করেন নাই।

এই অট্টালিকাসম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বহু পূর্ব্বকালে এই স্থানে বসুকল্প নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র পদ্মলোচন। পুত্রের জন্ম হইলে, জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া বলেন যে এই পুত্র বিবাহ করিয়া যে দিন স্ত্রীর সহিত প্রথম এক গৃহে বাস করিবে, সেই দিন সে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবে। বসুকল্প ইহা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং কি উপায়ে পুত্রকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবনা চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে পর্ব্বতের উপরিভাগে এক পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার মধ্য স্থলে এক দেউল প্রস্তুত করিবেন ও বিবাহের পর সেই দেউল মধ্যে পুত্র ও পুত্রবধুকে প্রথম দিন বাস করিতে দিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুত্র রক্ষা পাইবে—দেউলের চতুর্দ্দিকে অগাধ জল থাকায় ব্যাঘ্র কোনমতেই তথায় প্রবেশ

করিতে পারিবে না। কিন্তু হায়! বিধি-লিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

পুত্রের বিবাহ মহা সমারোহে হইয়া গেল। নববধূ ঘরে আসিলে যথারীতি আনন্দ উৎসবের পর, সেই জলবেষ্টিত নবগৃহে মহা-আনন্দে নবদম্পতি প্রবেশ করিলেন। নববধূ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "আজ এই আনন্দের দিনে, বাস-ভবন ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে এই পর্ব্বতমধ্যে অতি নিভৃত স্থানে, এই জলবেষ্টিত দেউলে বাস করিতে আদেশ হইল কেন?"

পদ্মলোচন প্রিয়তমার এই প্রশ্ন শুনিয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত চিত্তে তাঁহাদিগের এই নিভৃত বাসের কারণ সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। তৎশ্রবণে বধু বলিল, "নাথ, আমি কখন ব্যাঘ্র দেখি নাই, অতএব ব্যাঘ্রের আকার কি রূপ, তাহা অঙ্কিত করিয়া আমাকে দেখাও।"

পদ্মলোচন চিত্র-বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রিয়তমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তৎক্ষণাৎ একটি ব্যাঘ্রের চিত্র অঙ্কিত করিলেন, কিন্তু ব্যস্ততা নিবন্ধন তাহার চক্ষু দু'টি আঁকিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বধু চিত্র দেখিয়া বড়ই প্রীতা হইলেন, পরন্তু বলিলেন, "নাথ, চিত্রটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু ইহার চক্ষু অঙ্কিত না হওয়ায় ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।" পদ্মলোচন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাঘের চোখ দু'টি আঁকিয়া দিলেন।

"হাঁ—এইবার ঠিক হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন জীবন্ত বাঘ দাঁড়াইয়া আছে' —বধু আনন্দিত চিত্তে এই কথা কয়টি বলিবা মাত্র, বাঘ সত্য সত্যই জীবিত হইয়া পদ্মলোচনকে আক্রমণ করিল ও তদ্দণ্ডেই তাহাকে নিহত করিল। নববধূ ভয়বিহ্বলা হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল। রাজাও স্বয়ং আসিয়া সমস্ত দেখিলেন ও শুনিলেন।

রাজভবনে ক্রন্দনের রোল উঠিল। রাজা তখন শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "অহো! আমি কি মূর্খ? আমি বিধাতার উপরেও বিধান চালাইতে গিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।"—এই বলিয়া শোকাতুর রাজা ও রাণী গৃহত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। সেই অবধি এই অট্টালিকায় আর কেহ বাস করে নাই। ক্রমে ভগ্ন হইয়া এখন চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট আছে।

পর্ব্বতের উপরে যেখানে পুষ্করিণী ও দেউল নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানে অতিশয় জঙ্গল ও ব্যাঘ্রাদির বাসভূমি হওয়ায়, এখন আর কেহ যাইতে সাহস করে না। কিন্তু লোকে বলে যে তথায় এখনও সেই দেউলের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান।

যখন এই বিশ্বের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, প্রকৃতির মহান্ সৌন্দর্য্য অবলোকনে, মানবহৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হয় "এই বিশ্ব কাহার সৃষ্ট? এই নগনদীচিত্রিতা বৈচিত্র্যময়ী বিশ্ব কে মনুষ্যের সম্ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?" এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে অদ্ভূত ও অলৌকিক তত্ত্বনিচয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কোনও দেশে কোন কালে হয় নাই এবং হইবে না। আধুনিক জড়বিজ্ঞান বহুদিনের বহু চেষ্টায় যে সব সত্যের আভাস মাত্র পাইতেছে, তাহা ফলপত্রভোজী, বল্কলধারী, বৃক্ষতলচারী মহাপুরুষগণ, যখন পৃথিবীর সমগ্র স্থান অসভ্য ও অনাচারী জাতিতে পূর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তখন জগতের হিতের জন্য, মানবকে আপন বিনষ্ট-জন্মসত্ব পুনরুদ্ধারের পথ প্রদর্শনের জন্য, জীবলোকে প্রচার করিয়াছেন। এই সত্যানুসন্ধানের ফলে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতির সৃষ্টি। এই সত্যানুসন্ধানের ফলে তাঁহারা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই ;—

"একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।"

একমাত্র সদ্বস্তু সেই আদিপুরুষ বিশ্বস্রষ্টা,—ঋষিরা তাঁহাকেই বহু বলেন। সেই এক হইতেই এই বহু আকারময় বিশ্বের বিকাশ। "অহং বহু স্যাম্" এই সিদ্ধ-সঙ্কল্প এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যময় বিশ্ববিকাশের হেতু।

এই বিচিত্রতার স্রষ্টার নিকট কি রূপে যাওয়া যায়?—এই তত্ত্বের মীমাংসায় তাঁহারা তিনটি পথ নির্ণয় করেন। প্রথম জ্ঞান, দ্বিতীয় কর্ম্ম ও তৃতীয় ভক্তি। জ্ঞানী চিত্তবৃত্তি বাহ্যব্যাপার হইতে অপসৃত করিয়া, অন্তর্মুখী হয়েন, এই রূপে সংসারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া আত্মমধ্যস্থ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। ভক্ত যেরূপ সেব্য ও সেবক ভাব লইয়া ভগবদারাধনা করেন, জ্ঞানীর সে মার্গ নয়। জ্ঞানীর "সোঽহং" মার্গ। আমি সেই ব্রহ্ম। আত্মপূজায় ভগবানের পূজা হয়। কর্ম্মী কর্ম্মের দ্বারা ভগবান লাভ করেন। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তর্বায়ু পরিশুদ্ধ করিয়া, সম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা, সুষুম্নাপথে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ছয়টি চক্র অর্থাৎ পথ ভেদ করিয়া সহস্রার-মস্তিষ্ক-বিন্দুতে পরমাত্মরূপী ভগবানের স্থানে উপনীত হইয়া সমাধি লাভ করেন। অথবা বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া কেবল সাধনের দ্বারা—নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন।

উপরোক্ত দুইটি মার্গ ব্যতীত আর একটি মার্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভক্তিমার্গ। তাহাই অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভক্তির সংজ্ঞা ভক্তিশাস্ত্রে আছে—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরে পরা অনুরাগের নাম ভক্তি

পরমহংসদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মাতার সন্তানের উপর স্নেহ ও সতীর পতির প্রতি প্রণয়, এই

তিন টান একত্রিত করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারিলে তবে তাঁহাকে লাভ করা যায়।"

বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন," এই তিনটি ভক্তি বৃদ্ধির উপায়।

ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইলে সাধক প্রথমে গুরূপদিষ্ট পথে নাম জপ করিবেন। জপের ফল স্থিরীকরণ। সংসারে সহস্র ব্যাপারে উৎক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করিয়া, এক বস্তুতে স্থির করিতে হইলে, সেই বস্তুর গুণকীর্ত্তন, ও রূপ-ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ করিলে ক্রমশঃ নাম ও রূপ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়। নামে ক্রমে রুচি জন্মে। ভগবানের নাম আর তিক্ত বোধ হয় না। মধুর—অতি সুমধুর সেই নাম ক্রমে হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায়—এবং ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হৃদয়াকাশে সেই জ্যোতির্ম্ময় মনোমোহন রূপ উদ্ভাসিত হয়। তখন সাধক, হৃদয়মধ্যে সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত রূপ-ভাতি মনোনয়নে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। তখন জগৎ ত ভুল হয়ই, নিজ দেহ যে এত প্রিয়তম বস্তু, তাহাও ভুল হইয়া যায়। তখন সাধক সেই নাম-রস পান করিতে করিতে, এরূপ এক অপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হন যে তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" যেখানে তিনি যান, যে দিকে তিনি নয়ন ফিরান, সেই দিকেই প্রিয়তমের প্রাণারাম মূর্ত্তি প্রকাশিত দেখিতে পান। তখন তাঁহার আনন্দের আর অবধি থাকে না। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমুদায়ই সেই প্রাণারামের হৃদয়মুগ্ধকারী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ বলিয়া অনুমিত হয়। তখন সমুদায়ই আপনার দেহ-প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম হইয়া পড়ে। স্বার্থ, আর হৃদয়ে স্থান পায় না। আপনার প্রিয়তম বোধে সমস্ত বিশ্বকে তিনি ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। তখন দোকানদারী আর থাকে না। তখন "দয়াময়, আমি কিছুই চাহি না। ধন, মান, জীবন, প্রভূত্ব কিছুই চাহি না, নাথ, কেবল অহরহঃ তোমায় দেখিব। তোমার সেই মনোমোহনরূপে, আমার সমক্ষে দাঁড়াও, আমি একবার দেখি, চক্ষুর অন্তরাল হইও না।" বলিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। এই যে ভালবাসা ইহা প্রতিদান চাহে না। ইহা কামগন্ধহীন নির্ম্মল প্রেম।

চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী-পাদ লিখিয়াছেন।

> "কাম আর প্রেমে হয় বহুত অন্তর।
> কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"
> "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
> কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

কোন মহাপুরুষ এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন "ঘৃত পরমান্ন অতি উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তাহা যদি ভক্ষণ করিয়াই গলদেশে অঙ্গুলি দানে উদ্গীরণ করা যায়, সেই পদার্থই নির্গত হইবে, তবে তাহার সহিত ক্লেদ প্রভৃতি কতকগুলি অতি ঘৃণ্য পদার্থ মিশ্রিত হইবে। শুদ্ধা নিষ্কাম ভগবৎ-প্রেম সেইরূপ পবিত্র ঘৃত পরমান্ন ও কাম তাহার উদ্গার।" প্রেম আত্মারামের রমণ, কাম পাশববৃত্তি চরিতার্থের উপকরণ। আমাকে অর্থ দাও, মান দাও, তবে তোমায় ভালবাসিব, সে ত বেশ্যার কামময় ভালবাসা, তাহাতে পবিত্রতা কোথা? অকামত্ব কোথা? সতী পতির জন্য সহাস্য-আননে চিতানলে দেহত্যাগ করিতেন। কি শক্তির দ্বারা পঞ্চভূতের স্বভাব বিমুখ করিয়া—অনলের

জ্বালাকে চন্দনের স্নিগ্ধতায় পরিণত করিয়া, সতী হাসিতে হাসিতে পতির দেহ অঙ্কে লইয়া দেহত্যাগ করিতেন? সেই প্রেমশক্তি,—নিঃস্বার্থ কামগন্ধহীন ঐশী জ্যোতিতে ভাস্বর সেই প্রেম, তাঁহাকে স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে শিখাইত। প্রেম দুর্ব্বল প্রাণকে সবল করে, কারণ প্রেমে আত্ম-দেহজ্ঞান—আত্মসুখেচ্ছা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। ভয় দূর করিয়া দেয়। কোন রমণী যদি পথে যাইতে যাইতে কুকুরদ্বারা আক্রান্তা হন, তাহা হইলে ভয়ে অভিভূতা হইয়া তিনি হয় ত মূর্চ্ছিতা হইবেন। কিন্তু যদি সেই কুকুর তাঁহার হৃদয়ধন সন্তানকে আক্রমণ করে, তখন সেই রমণীর ভয়ের স্থান কোথায় রহিবে? তিনি কি ভয়ে পলায়ন করিবেন? কখনই না। তখন সেই অবলা অকুতোভয়ে প্রেমের ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিতা হইয়া কুকুরের সম্মুখীন হইবেন ও প্রয়োজন হইলে নিজের প্রাণ দিয়াও সন্তানকে রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই। প্রেমের উদয় হইলে, মনুষ্যের স্বাভাবিক ঐশীতেজ হৃদয়ে বিকাশিত হয় ও সেই তেজে মানবের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা, স্বার্থ, হিংসা প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। মানব-প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া, এই ধরা-ধামেই এই পাঞ্চভৌতিক দেহে দেবভাবের আবির্ভাব হয়। মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব আসে।

সকাম ভক্তি লইয়া সাধনা করিতে বসিলে ক্রমশঃ ভগবৎ-কৃপায় নিষ্কামত্ব আপনিই আসে। বিমাতার অবমাননা অসহ্য হওয়াতে পিতার রাজপদ অপেক্ষা উচ্চতর পদবীর আকাঙ্খায় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় বনমধ্যে তপস্যায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সাধনের ধন সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন ধ্রুব সে সব কথা ভুলিয়া বলিলেন-

"স্থানাভিকামস্তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং দৃষ্টবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্, কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"

"শ্রেষ্ঠস্থান-লাভ-বাসনা লইয়া
তপস্যা করিনু ঘোর ;
কিন্তু এবে নাথ, হেরিয়া তোমারে
ঘুচেছে মনের ঘোর।
দেব-মুনি-ইন্দ্র তব গূঢ় তত্ত্ব
বুঝিতে না পারে কভু,
সেই তুমি, এবে, সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার,
সম্মুখে এসেছ, প্রভু।
খুঁজিলাম কাচ, দিব্য রত্ন পেনু,
আর কিবা, ভবে চাই ?
কৃতার্থ হ'য়েছি আজি আমি নাথ,
কেনো বরে কাজ নাই।"

প্রেমানন্দ।

তখন কুবেরের ঐশ্বর্য্যও বালকের নিকট তুচ্ছ তৃণতুল্য, সে আর কি বর চাহিবে?

ভোগ ভগবান-লাভের উপায় নয়। ভোগে ভক্তির বৃদ্ধি হয় না। ত্যাগ ব্যতীত ভগবানের সন্নিহিত হওয়া যায় না। ত্যাগ মনুষ্যের মহত্ববিকাশক নিঃস্বার্থতা।

কোন ভক্ত, এক সময়ে ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবকে "গীতা" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "দশ বার গীতা গীতা বলিলে যা, হয়।" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ "গীতা গীতা" বলিতে বলিতে "তাগী তাগী" অর্থাৎ ত্যাগী হইয়া দাঁড়ায়। যে

ত্যাগী, তাহারই যথার্থ গীতার অর্থবোধ হইয়াছে।

ভালবাসার অন্যতম নাম ত্যাগ। আমি প্রিয়জনের জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, সেই পরিমাণ ভালবাসা তাহার উপর আমার আছে। আমরা অহরহঃ স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গের জন্য কত স্বার্থ ত্যাগ করি, কিন্তু ভগবানের জন্য কি ত্যাগ করি? ভগবানের জন্য—ভগবানের নামকীর্ত্তনের জন্য—পূজার জন্য, কখনও কি কোন আনন্দসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়? যিনি আমাদের জন্য সব ত্যাগ করিয়াছেন, এক বস্তু ব্যতীত যিনি আমাদের ভোগের জন্য সব স্তরে স্তরে এই বিশ্বমাঝে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার জন্য আমরা কোন্ ভোগ ছাড়িয়াছি? কেবল বাসনার দাস হইয়া স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া চলিয়াছি।

তিনি সব দিয়াছেন, কেবলমাত্র একটি বস্তু তাঁহার গ্রাহ্য। সেটি শুদ্ধা ভক্তি বা প্রেম। তুমি "হরি" বলিয়া একবার ডাকিলেই তিনি তোমার নিকটে আইসেন। কিন্তু কৈ? তুমি ত তাঁহাকে দেখিবার জন্য, একটিবারও ডাক না। ডাক বটে, কিন্তু ধন চাই, মান চাই, যশ চাই, এইরূপ সহস্র কামনাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে ডাক, সে ডাকা যদি প্রাণের সঙ্গে হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ধন, মান, যশ প্রভৃতি দিয়াই তোমায় পরিতুষ্ট করেন। কিন্তু যে ডাকে, কিন্তু কেন ডাকে জানে না—না ডাকিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া ডাকে—তা'রই সম্মুখে তিনি মোহন বেশে দাঁড়াইয়া, তাহার প্রাণে তৃপ্তি দান করেন। তাই বলি, একবার সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া, প্রাণ খুলিয়া "হরি" বল দেখি ভাই, কেমন তিনি দূরে থাকিতে পারেন। ও ভাই, সে যে আত্মীয় হ'তেও পরমাত্মীয়—সে যে প্রাণের প্রাণ—জীবনের অবলম্বন। সেই হৃদয়-ধনকে পা'বার লালসা হৃদয়ে লইয়া—আদর করিয়া হৃদয়াসন পরিমার্জ্জিত করিয়া, তাঁ'কে ডাক, হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইবে। তখন তিনি সেই ভক্তিপূত হৃদয়াসনে আসিয়া দাঁড়াইবেন—ভাইরে, লৌল্য বই কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্য উপায়নাই—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র মৌল্যমপি লৌল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

বৈষ্ণবকবিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয়কে সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কারণ সর্প যেমন কাহাকেও একবার বদ্ধ করিলে কাটিয়া না ফেলিলে সে বন্ধন কিছুতেই সে ছাড়ে না। একবার যদি সেই প্রেমময়ের প্রেমময় ক্রোড়ে যাইতে পার তবে চিরদিনের মত সেই শান্তিময়ের প্রাণারামদায়ী ক্রোড়ে স্থান পাইবে। আর বিচ্যুত হইতে হইবে না।

এই ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, বর্ত্তমান কলিযুগে গোপীজনবল্লভ স্বয়ং গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষীণশক্তি কলিজীবকে দেখাইয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহাগ্রন্থে বৃন্দাবনের যে নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্রজ-যুবতীগণে প্রেমসাধনার কথা, গূঢ় ভাবে বর্ণিত ছিল। সে সাধনার কথা সাধারণ মানবে জানিত না। আজ চারিশত বৎসরের কথা, নবদ্বীপধামে মিশ্র শ্রীজগন্নাথদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তিনি! সেই লীলা, সেই নিষ্কাম প্রেম, সেই আত্মসুখ-

বিসর্জ্জন, সেই প্রিয়সুখতাৎপর্য্য, সেই নিঃস্বার্থতা, জগতের সমক্ষে দেখাইয়াছেন। সে প্রেমের মহাবন্যায় আচণ্ডাল সকলে পরিপ্লাবিত হইয়া ধন্য হইয়াছে। সে প্রিয়জনের অদর্শনে কাতরতা, পলকে প্রলয়জ্ঞান, আর কি রূপে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের বুদ্ধিগোচর হইবে. তাই দয়াময় "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত" হইয়া অনর্পিত বস্তু শ্রীরাধার প্রেমের পসরা জগতকে দান করিতে আসিয়াছিলেন। মধুর ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া জগতের পাপী, তাপী, দস্যু, তস্কর সকলকেই অযাচিত ভাবে দান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ ধন্য করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তের প্রহারে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রোত বহিতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই। পরন্তু বাহুদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া অত্যাচারীকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য প্রভু নিত্যানন্দ দৌড়িয়াছেন, এ দৃশ্য দেখিলে, চিন্তা করিলে, মুহূর্ত্তমধ্যে মানুষ মুক্ত হইয়া যায়. মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব আসে। সেই দুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাই হিংসার পরিবর্ত্তে অযাচিত প্রেম পাইয়া গলিয়া গেল। নিতাইচাঁদের প্রেমবর্ষণে আজ কঠিন পাষাণ দ্রবীভূত হইল। জগাই মাধাই পরিত্রাণ পাইল।

প্রেম যে কি পদার্থ, এই অনর্পিত বস্তু যে কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাই লোককে শিখাইবার জন্য, আজ দয়াময় গোপীজন বল্লভ, রাধাভাব লইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার বস্তু তিনি স্বয়ং না বুঝাইলে কে বুঝিবে? যে প্রেমবলে গোপীগণ বলিয়াছিলেন

"পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।"

সে প্রেমের কি সীমা আছে?

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে।"

নিধুবাবুর এই টপ্পার মধ্যে যে ভাব, গোপীদেরও সেই প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে "*Love for love's sake*" বলিয়াছেন। এই নিষ্কাম প্রেম ভগবদ্দত্ত, ইহা মনুষ্যলোকে অতি বিরল। তাই শিখাইবার জন্য চৈতন্যদেবের আগমন ও তাঁহার চারিশত বৎসর পরে আমাদের অতি নিকটে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীপাদ পরমহংস দেব রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়।

যখন এইরূপ তীব্র প্রেম প্রাণে উদিত হয়, তখন আর কিছু জ্ঞান থাকে না. তখন ভক্ত দেখে ভক্তি, ভক্ত. ভগবান,--জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সব এক,—সবই সেই চিৎস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিকাশ। তখন ভক্ত শান্ত হয় ও বিশ্বময় প্রাণারামের হৃদয়ানন্দদায়ী মনোহর রূপ দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

নির্ভর।

কৃষক চাতকে বলে, সুধাই হে পাখি
কেমনে সলিল পাও জলদেরে ডাকি?
দারুণ নিদাঘ কালে বাঁচ বা কি করে,
বরষায়ও মরিতেছি দেখ তুনী ধরে।

চাতক বলিছে জানি করিতে নির্ভর,
সেই সে আমার সব জানি কে অপর;
তব বাহু বল আছে, আছে কত তুনী,
আমার আছেন ভাই কেবল যে তিনি।

অনিলবাবুর অদ্ভুত গল্প।

অনিলবাবু বলিলেন "এক দিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি কি?" তিনি একটু সুমধুর হাসিয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি স্থির হইয়া বসিলাম। তখন তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন "তুমি একটি ভেক।" সেই কথা শুনিবামাত্র আমার মনোমধ্যে অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আমার মনে হইল, আমি প্রকৃতই একটি ব্যাঙ। আমার ছোট ছোট চারিখানি পা দেখিতে পাইলাম, এবং থপ্ থপ্ করিয়া লাফাইয়া, একটি ক্ষুদ্র গর্ত্তে প্রবেশ করিলাম। দিনের বেলায় বাহিরে আসিতে ভয় হয়, পাছে পাখিরা ঠুকরাইয়া মারে। সন্ধ্যা হইলে বাহির হইয়া পোকা-মাকড় ধরিয়া খাই। কাহারো পায়ের শব্দ শুনিলে ভয়ে কাঁপিয়া মরি ও গর্ত্তের ভিতর গিয়া লুকাই। গর্ত্তটি ও তাহার আশে পাশে দশ বার হাত জমিই, আমার জগৎ; আমার জ্ঞান ঐ টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল।

আবার একি? আমার বোধ হইল, আমি একটি বাঘ,—বড় বড় নখ, ধারাল শক্ত দাঁত, গায়ে ছাপ্ ছাপ্ দাগ ও বৃহৎ লেজ! ওঃ! আমার কি অসাধারণ শক্তি! কি ভীষণ রক্ত-পিপাসা!! মানুষ-খাবার লোভটাই খুব বেশী ছিল, কিন্তু ভয়ে লোকালয়ে বড় একটা যাইতাম না, বনের মধ্যে থাকিয়া পশুমাংসেই উদর-পূর্ত্তি করিতে লাগিলাম। তখন ক্রোধ হিংসা ও লোভই আমার একমাত্র প্রবৃত্তি—জীবহত্যা, আহার, নিদ্রা ও মৈথুনই একমাত্র কার্য্য।

এইরূপে দিন কাটিতেছে, এমন সময় আমার আর এক ভাবান্তর আসিল,—আমি একটি ঋষি হইলাম। এখন আমি ক্ষুদ্র বা সঙ্কীর্ণ নহি। আমার মনে হইল, আমি যেন সব ব্যাপিয়া আছি, যেন জীবমাত্র আমার অঙ্গ বা অংশ, আমার একান্ত নিজের জিনিস। তা'দের সদাই কোলে বা বুকে তুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইল। তা'দের অজ্ঞাতা ও দুঃখ দেখিয়া হৃদয় এক অপূর্ব্ব করুণায় ডুবিয়া গেল। যখন শিশু একটা মাটির পুতুলের জন্য প্রাণপাত করিতে বসে, তখন স্নেহময়ী মা'য়ের মনে যে অবস্থা হয়; যখন কোন রোগী বিকারের খেয়ালে কল্পিত রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া সুখ-দুঃখ বোধ করে (কখন হয় ত সিংহাসনে চড়িয়া রাজা হইয়া অতুল আনন্দ পায়, আবার কখনো হয় ত কল্পিত আগুনে 'পুড়িয়া গেলুম পুড়িয়া গেলুম' শব্দে চীৎকার করে) তখন তাহার পার্শ্বস্থ দয়ালু ও সহৃদয় বৈদ্যের অন্তরে যে ভাব উদিত হয়; এই অলীক সংসারে মানুষের নিত্য হাহাকার ও উল্লাস স্মরণ করিয়া, আমার মনেও কতকটা সেই ভাবের উদয় হইল।

এই ভাবে বহুকাল কাটিল। তার পর আমি যে আরও কত কি হইলাম, সংখ্যা করা যায় না। বানর, পাখী, সাপ, মাছি—কত সাজেই সাজিলাম। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে যখন যে অবস্থায় ছিলাম, আমার জ্ঞান ঠিক তদনুরূপ সীমাবিশিষ্টই ছিল।

শেষ হরিণরূপে যখন আমি এক ব্যাধের

তীক্ষ্ণ শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছটফট করিতেছিলাম, গুরুদেব ডাকিলেন "অনিল"। পলকের মধ্যে আমার সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিল। আমি আবার অনিল হইলাম। দেখিলাম, সেই আমি, সেই ঘর, সেই গুরুদেব সম্মুখে উপবিষ্ট। সম্মুখের দেয়ালে একটি ঘড়ী ছিল। চাহিয়া দেখিলাম দুই মিনিট মাত্র অতীত হইয়াছে, দুই মিনিটের মধ্যেই আমি শত শত জন্মের অভিনয় করিয়াছি। কিন্তু যদিও পরিচিত সকল দ্রব্যই দেখিতে পাইতেছিলাম তথাপি সংশয় হইতে লাগিল, এ গুলি বাস্তব না অলীক? আমি জাগ্রত না সুপ্ত? তখন গুরুদেবকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রভো, এটাও কি স্বপ্ন?" গুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, এটাও স্বপ্ন! কিন্তু এই স্বপ্নটাকেই আমরা এখন বাস্তব মনে করিতেছি। এখন একটু বুঝিতে পারিলে কি? তুমি যেমন ভেক নহ, বাঘ নহ, ঋষি, পক্ষী, সর্প, হরিণ—কিছুই নহ, সেইরূপ তুমি অনিল মুখুজ্যেও নহ। সে গুলো যেমন ভ্রম—স্বপ্ন; এটাও সেইরূপ।" আমি বলিলাম "এটা ঠিক অনুভব করতে না পারলেও, যুক্তি ও বিচারের দ্বারা যেন বুঝ্‌লাম, কিন্তু তা'তে কি হ'ল? 'আমি কি' তা তো বুঝ্‌লাম না।" তিনি ধীরে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ, একটি মাত্র বস্তু আছেন। তিনি আত্মা। আর কিছুই নাই। আর সবই অলীক, মিথ্যা, স্বপ্ন। তত্ত্বমসি —সেই আত্মাই তুমি, কারণ সেই আত্মাই সব।"

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী B. A.

প্রার্থনা।

প্রাণের যাতনা, কেন মা বুঝ না
কেন মা অন্তর সদাই কাঁদে?
জানি মা সংসার, অকূল পাথার
কেন মা তবুও পড়ি গো ফাঁদে?
জানি গো জননি, হিমাদ্রি নন্দিনি,
দুস্তরে নিস্তার কর মা ভবে।
অপার মহিমা না আছে মা সীমা,
ব্যাকুল তবু মা কাঁদিয়া সবে॥
নশ্বর জীবনে তব পদ বিনে
না হেরি উপায় অসুর-নাশিনি।
তবুও কেন মা, বিফল কামনা
তনয়ে তার মা শিব-সীমন্তিনি॥
শুনেছি মা তারা, তুমি দুঃখ-হরা
কাতরে করুণা কর মা দান।
কাঁদি দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসি
কেন মা ধরেছ কঠিন প্রাণ?
নাহি অন্য সাধ, যেন অবসাদ
যায় মা হৃদয়-কলুষ-রাশি।
মরম বেদনা বারেক বুঝ মা
বিরাজ অন্তরে আঁধার নাশি॥

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

জগদ্ধাত্রী।

দেখ দেখ রে দেখ নয়নে নগেন্দ্র-বালিকারে।
দানব-দলনী দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী মারে ॥

সিংহোপরে ত্রিলোচনী আসিলেন মা ধরাতলে,
নরনারী যেখানে যত হেরিতে হরষে চলে,
চন্দনে চর্চ্চিত জবা দিতে পদোপরে ॥

কিবা বালার্ক-বরণী, নাগযজ্ঞোপবীতিনী,
পৃষ্ঠেতে লম্বিত বেণী ভবগেহিনী —

চারি করে শোভিছে কিবা শঙ্খ-চাপ-চক্র-বাণ,
করুণা বরষি হাসি সাধক সকলে চান,
ব্রহ্মা-নারদাদি সবে সেবিছেন তাঁরে ।

কিবা ষোড়শী রূপসী, ভালে শোভে খণ্ড-শশী
প্রফুল্ল কমলে বসি রক্ত-বাসসী—

রতন-খচিত কত বিবিধ ভূষণ গায়,
রতন-মুকুট শিরে, রতন-নূপুর পায়,
বোধানন্দে রেখে মা পায় অভয় দে তারে

প্রতিজ্ঞা ও সত্য-রক্ষা।

(শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী লিখিত)

মহাভারতে নাকি লেখা আছে, অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, যে কেহ তাঁ'র কিম্বা তাঁ'র গাণ্ডীব ধনুকের নিন্দা কোর্বে, তিনি হয় তা'র মস্তক ছেদন কোর্বেন, না হয় নিজের মাথাটা টক্ কো'রে কেটে ফেল্‌বেন। কথাটা আমার শোনা কথা, কেন না দুর্ভাগ্যক্রমে মহাভারতটি আমার পড়া নেই। ওর মাঝে থেকে কেবল সাত শ শ্লোক পোড়িচি, তা'তে ও রকম কোনো কথা নেই।

তুমি আমিও ভাই, অনেক সময় ঐ রকম কিম্ভূতকিমাকার প্রতিজ্ঞা কোরে থাকি। কিন্তু ও রকম প্রতিজ্ঞা না করাই উচিত। যদি কখন অহঙ্কারবশে ও রকম কোনো প্রতিজ্ঞা হঠাৎ হোয়ে পড়ে, তা' চিরজীবন পালন কোর্ত্তে আমি বাধ্য কি না?

মনে কর, আমিই অর্জ্জুন, আমি ঐ রকম প্রতিজ্ঞা কোরিচি। তুমি, এক ব্যক্তি বিপন্ন হোয়ে আমার কাছে এলে, আমি তোমায় যদি রক্ষা কোর্ত্তে না পারি, আর তুমি মনোদুঃখে বোলে ফেলো "ধিক্ তোমাকে, ধিক তোমার বাহুবলে, ধিক তোমার ধনুক-ধারণে।" তা'হোলে সেই ক্ষণে তোমার কিম্বা নিজের মাথাটা কেটে ফেলা উচিত কি না?"

আমার বোধ হয়, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুগণ জোর কোরে আমার মুখ দে যে কথাগুলো বলায়, তা আমি পালন কোর্ত্তে কোনো কালেই বাধ্য নই।

প্রতিজ্ঞা কর্বার প্রয়োজন হোলে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণেশের অনুমতি নিয়ে, রক্ষা কোর্বার বল চেয়ে নিয়ে কোত্তে হয় এবং সেই সত্য আজীবন রক্ষা কোত্তে প্রাণপণে যত্ন কোত্তে হয়। শত্রুদের যে প্রতিজ্ঞা, তা আমি বা তিনি রক্ষা কোর্বেন কেন?

অতএব আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য—কাহারও নিকট কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হ'বার পূর্ব্বে, বেশ কোরে ভেবে দেখা—যে, যা অঙ্গীকার কোচ্চি, তা পালন কর্বার বাস্তবিক ইচ্ছা আছে কি না?—আর ইচ্ছা থাকলেও পালন কর্বার শক্তি আছে কি না? বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞা কালে, সেটা রাখা উচিত।

গয়াক্ষেত্রে গৌরচন্দ্র

(২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

মন্দারে।

মন্দারের মহিমা পুরাণে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। শ্রীবরাহপুরাণে লিখিত আছে—

"জাহ্নব্যা দক্ষিণে কূলে বিন্ধ্যপৃষ্ঠসমাশ্রিতম্।
মন্দারেতি চ বিখ্যাতং সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্ ॥"

মন্দার জাহ্নবীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত ভাগলপুরের দক্ষিণস্থিত বিন্ধ্যাচলের একটি শৃঙ্গ। গড়িপার পর্ব্বতমালাও বিন্ধ্যের পূর্ব্বাংশ। রাজগৃহের পর্ব্বতমালাও বিন্ধ্যের অংশ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"মন্থানং মন্দরং কৃত্বা তথা নেত্রঞ্চ বাসুকীম্"

সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল। তখন আদিকূর্ম্মরূপী শ্রীভগবান এই শ্রীমন্দারকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন; তিনিই অগ্রণী হইয়া সেই মন্থানরজ্জুরূপী বাসুকীকে ধারণ করিয়াছিলেন আবার যখন সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন তিনিই মোহিনী-মূর্ত্তিতে সুধাবণ্টনের ভার লইয়াছিলেন। মন্দার তাঁহার বড়ই প্রিয় স্থান; তাই তিনি ধরণীকে এই তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবার সময় বলিয়াছিলেন—

"স্থানং মে পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তানাং সুখাবহম্।"
"এই স্থান, অতি গুহ্য শুনহ অবনি,
আমার ভক্তের ইহা, সর্ব্বসুখ-খনি।"

পুরাকালে এই মন্দারে অনেক তীর্থ প্রকট ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা প্রায়শঃ লুপ্ত।

মধুদৈত্যনিসূদন শ্রীমধুসূদন পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিতেন। এখন তিনি ভাগলপুর জেলার বাঁকা-বিভাগস্থিত বংশী নামক গ্রামে নূতন মন্দির মধ্যেই নিত্যসেবিত হইয়া থাকেন। অদূরস্থিত পুষ্পিতলতাগুল্মাদি পরিশোভিত শ্রীমন্দার, এখন শ্রীমধুসূদনের প্রাচীন মন্দিরটি মস্তকে ধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। প্রতিবৎসর মকর-সংক্রমণ-দিনে "শ্রীমধুসূদন, বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যার বহু দিগ্দেশাগত ভক্তগণের দর্শন-পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য বংশী হইতে কুঞ্জর-পৃষ্ঠে, রজত-সিংহাসনে মন্দারক্ষেত্রে শুভাগমন করেন ও শৈল-নিম্নে প্রস্তরনির্ম্মিত মঞ্চে ঐ দিন প্রহরৈক কালের জন্য বিরাজ করেন। অধুনা ইহাই শ্রীমন্দারে মধুসূদন। তাঁহার এ শুভাগমন বেলা তৃতীয় প্রহরের পর হইয়া থাকে।" * এই সময়ে প্রায় ত্রিসপ্তাহব্যাপী মেলা হইয়া থাকে—পাপহারিণীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিতে মানব-সমুদ্র শ্রীমধুসূদন-নাম-কল্লোলে কল্লোলিত হইতে থাকে।

* শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠা।

মন্দার-গাত্রে অনেক শ্রীমূর্ত্তি খোদিত আছেন; তন্মধ্যে শ্রীনরসিংহমূর্ত্তিই প্রধান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্গিগণের সঙ্গে চিরা নদীতে যথাবিধি স্নানদানাদি সম্পন্ন করিলেন। যথা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"সেই দেশে চিরা নামে আছে এক নদী,
স্নানদান কৈলা তথা যে আছিল বিধি।
দেবপূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে,
মন্দারে উঠিলা মধুসূদনে দেখিতে।"

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দার দর্শন করেন, তখন শ্রীমধুসূদন মন্দার-শিখরস্থিত শ্রীমন্দিরেই অবস্থান করিতেন। তাঁহার আবির্ভাবের বহু পরে, দুর্বৃত্ত কালাপাহাড়ের উপদ্রবে, শ্রীমধুসূদনকে স্থানান্তরিত হইতে হইয়াছিল। কালাপাহাড় এখানে উপনীত হইলে শ্রীমধুসূদন সীতাকুণ্ডে মগ্ন হইয়া, অন্তঃসলিলপথে কাজরাণী হ্রদে গমনপূর্ব্বক স্বীয় পূজককে প্রত্যাদেশ করেন। পূজক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বাটিতে আনয়ন করেন। সেই অবধি তিনি বংশী গ্রামে। এখানে তাঁহার নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়া, তথায় নিত্য-সেবার সুব্যবস্থা হইয়াছে।

মহাপ্রভু সঙ্গী সঙ্গে সানন্দে মন্দারশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীমধুসূদনকে দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিহিত পূজাদি করিলেন।

ব্যাসাবতার শ্রীমদ্বৃন্দাবন বলিতেছেন—

"দেখিয়া মন্দার-মধুসূদন তথায়,
ভ্রমিলেক সকল পর্ব্বত স্বলীলায়।"

তিনি যে আর কি কি দেখিয়াছিলেন, তাহা ইহার পর কোথাও লেখা নাই, কিন্তু অবশ্যই পাপহারিণীকে দেখিয়াছিলেন এবং সঙ্গিগণকে বলিয়াছিলেন "এই পাপহারিণী পরম পবিত্র হ্রদ। পদ্মযোনি যখন এই মন্দারে যজ্ঞ করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করেন, সেই সময়ে ঐ আহুতি হইতে একটি গুবাক তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া এই হ্রদে পতিত হয়। সেই পবিত্র গুবাক সংস্পর্শে এই হ্রদের অশেষ পাপ নাশ করিবার শক্তি হইয়াছে। কাঞ্চীপুরের একজন রাজা দুঃসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, বহু চিকিৎসার পর, কোনও সাধুর পরামর্শে এই পাপহারিণীতে স্নান করিয়া ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব এস আমরা সকলে ইহার পবিত্র সলিলে স্নান করি।" এই বলিয়া যেন পাপহারিণীর পাপীস্পর্শজনিত অঙ্গকালিমা নাশ করিবার জন্য তথায় স্নানদানাদি করিয়াছিলেন।

নরনারিগণ, যাঁহারা শ্রীমধুসূদন-দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অনিমিষলোচনে সেই গোরাচাঁদের, সুধাকর-বিনিন্দিত সুন্দর বদনকমল বিহ্বল হইয়া দেখিতেছিলেন আর সেই কমলনিঃসৃত সুধাধারা শ্রবণপুটে পান করিতেছিলেন। সেই সকল নরনারীর ভাগ্যের তুলনা নাই। আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঘরে গিয়া শ্রীমদ্বাসুদেব ঘোষের মত ভাবিয়াছিলেন—

নিরমল গৌরতনু কষিত কাঞ্চন জনু
হেরইতে পড়ি গেলু ভোর।
ভাও ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর।"

তারপর, তিনি কিয়দ্দুর গমনপূর্ব্বক সীতাকুণ্ড দর্শন করিয়া বলিলেন "এই দেখ, সীতাকুণ্ড,ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শ্রীমতী সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই পরম পবিত্র কুণ্ড দর্শনে পাপ সদ্য ভস্মীভূত হইয়া যায়।"

এইরূপে, সকল স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে

মন্দার পাদমূলস্থিত নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূজকের গৃহে অতিথি হইলেন। শ্রীমৎ লোচনদাস বলিতেছেন—

দেবতা দেখিয়া প্রভু নামিলা সত্বর,
পর্ব্বত নিকটে বাসা ব্রাহ্মণের ঘর।"

সকলেই জানে দেশ-ভেদে আচারের ভেদ বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। তথাপি লোকে, যদি কাহারও স্বীয় আচারের বিরোধী আচার দেখে, তাহা হইলে, তাহাকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। শ্রীমৎলোচনদাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"হেন কালে বিশ্বম্ভর সঙ্গী বিপ্রগণ,
সে দেশের বিপ্র দেখি দোষে তার মন।
দেশ-আচরণ তারা করে যথাবিধি,
দেখিয়া ব্রাহ্মণে আর নাহি বিপ্রবুদ্ধি।
ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর,
প্রকাশিতে দ্বিজভক্তি করিলা অন্তর॥"

যাঁহার চির-দিনের প্রতিজ্ঞা—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তিনি যদি কৃপা করিয়া স্বীয় অনুচরের অন্তরের সন্দেহ-কণ্টক উৎপাটিত না করিবেন, তবে আর কে করিবে? সুতরাং সেই কপট-মানুষ তাঁহার মানুষদেহে কপটে জ্বরের প্রকাশ করিলেন। সকলেই মনে করিলেন শ্রমজনিত জ্বর। সঙ্গে কবিরাজ—পর্ব্বতে ওষধি সুলভ—নগরের বিপণীতেও সকল দ্রব্যই সুখলভ্য। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কিছুই হইল না। চিকিৎসক হারিল—ঔষধ হারিল—পরিচর্য্যাকারিগণ হারিলেন—কিন্তু রোগ হারিল না—জ্বর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে—

"বলিলা ঠাকুর—শুন শুন সর্ব্বজন
দেব-পিতৃ-কার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি কারণ।
না জানি কি মোর দোষে—কিম্বা সঙ্গি-দোষে
শ্রেয়ঃ কার্য্যে বিঘ্ন হয় বড় অসন্তোষে।
সর্ব্ব-বিঘ্ন-নিবারণ আছয়ে উপায়,
বিপ্রপাদোদক মোরে দেহ ত জুয়ায়।
বিপ্রপাদোদক খাইলে সর্ব্বপাপ হরে,
এখনে ঘুচিবে জ্বর—কি করিতে পারে।"

শ্রীমৎ লোচনদাস।

কিন্তু তাঁহাকে পাদোদক দিবে কে?—সঙ্গের বিপ্রগণ সকলেই তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন বলিয়া জানেন—তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখরেরও তাঁহার প্রতি সেই ভাব—আবার সকলেরই মনে হইতেছে, এ দেশের ব্রাহ্মণগুলা আচারভ্রষ্ট—ইহাদের পাদোদকেই বা কি হইবে?—যখন সঙ্গিগণের এই অবস্থা, তখন বিশ্বম্ভর কি করিলেন?—

"সেই খানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ;
আপনে উঠিয়া তাঁর পাখালে চরণ।
বিপ্রপাদোদক পান কৈলা বিশ্বম্ভর,
প্রকাশিলা দ্বিজভক্তি—পলাইল জ্বর।"

শ্রীমৎ লোচনদাস।

তখন সকলের হৃদয়ের সংশয় গেল। যে বিপ্র মনে মনে অধিক ঘৃণা করিয়াছিলেন, তিনি কাতর হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণোপান্তে পতিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন "প্রভো, এই অধমের দোষেই আপনার এত কষ্ট।" শুনিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র হাসিলেন, বলিলেন—

"ইহারা পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর,
এ সকল ত্যজ্য নহে না ভাবিহ দূর।

কৃষ্ণ না ভজিলে, দ্বিজ নহে কদাচিৎ,
পুরাণে প্রমাণ আছে এই শিক্ষা-নীত।"

যৎ লোচনদাস

আপনারা সকলেই জানেন—
"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।"
"হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল যে জন,
দ্বিজ হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই শাস্ত্রের বচন।"
ইঁহারা ব্রাহ্মণ এবং হরিভক্তিপরায়ণ, ইহাঁদের তুল্য পবিত্র আর কে ?"

এই বলিয়া, মন্দার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন

ওহে দয়াময়।

ওহে দয়াময়, করুণা-নিধান,
বারেক ফিরিয়া চাও হে।
আর কত জ্বালা, কোমল পরাণ,
বুকে ধরি রবে বল হে ॥

তুমি দয়াময়, জগত কারণ,
সর্ব্ব জীবে প্রভো, তোমার আভায
তোমারি আদেশে মানব-জীবন,
তুমিই হতেছ হতাশের আশ।

সম্পদে বিপদে তোমারই নাম,
মানব-বদনে শুনিতে পাই।
আর যত জীব ধরেছে পরাণ,
কই ত তাদের সে বোধ নাই ॥

অই যে হাসিছে চাঁদিনী যামিনি,
অই যে উঠিছে সুললিত তান,
সরোবরে অই ফুল্ল কুমুদিনী,
ওদের আছে কি সেই বোধ জ্ঞান ?

দিয়াছ মানবে জ্ঞান, অভিলাষ,
জগতে রেখেছ প্রধান করিয়া।
সকলি সম্মুখে রেখেছ প্রকাশ,
কেবলি আপনি আছ হে ধাঁধিয়া।

থাক থাক বিভো, যেমন হে আছ,
ক্ষতি তাতে নাই অই রূপে থাক।
অবলা পরাণ দেখিবে তথাচ,
সেই সুরধাম যতই সে ঢাক ॥

অবলা—সরলা, কুটিলা সে নয়,
ভয় ভক্তি প্রেমে প্রাণ তার গড়া।
অসহ অগ্নি সহিয়া গো রয়,
তার বেলা হৃদি এমনই কড়া।

ধরম করম সংসার সমাজ,
যা কিছু বল হে রমণী আধার।
কার হৃদে করে শকতি বিরাজ,
রমণী নাহি গো গৃহেতে যার ॥

তাই বলি বিভো, করুণানিধান,
বারেক ফিরিয়া চাও হে।
আর কত জ্বালা রমণী-পরাণ,
বুকে ধরি রবে বল হে ॥

আর যে নারি গো দেখিতে নয়নে,
সেই স্নেহ-লতা ধূলা ধূসরিত।
প্রতি নিশিদিন না জানি পরাণে,
কি জ্বালা কঠোর আছে প্রজ্বলিত ॥

নিজ গুণে সব হৃদয় কন্দরে
সহিছে গো বটে ধরণীর প্রায়।
তাতেই আমার পরাণ মাঝারে
কে যেন আগুন জ্বালায়ে দেয় ॥

আমি আছি বেঁচে অই লতা চেয়ে,
অই লতা মোর হৃদি-প্রাণ-মন।
অই নাম গেয়ে বাঁচিয়াছি ভবে,
অই গো আমার বিবেক সাধন।

তাই বলি ওহে, করুণানিধান,
বারেক ফিরিয়া চাও হে।
সবে কত জ্বালা, অবলা-পরাণ,
বুকে ধরি রবে বল হে॥

শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

অকৃতজ্ঞতা

এক দিন কয়েকটি যুবা এক স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন; আমি ঘটনা-চক্রে সেই স্থানে উপনীত হইলাম। আমি কয়েকদিন আর্থিক অসচ্ছলতায় বড়ই বিব্রত আছি। ইতঃপূর্ব্বে অর্থের চেষ্টায় অনেক ঘুরিয়া নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। এখনও সকল বিষয়ে "ভগবান যা করেন" বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে শিখি নাই, কাজেই প্রয়োজনের সঙ্গে চেষ্টাটা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমার বন্ধুগণ বলেন "তাঁ'র যা ইচ্ছা তাই হ'বে।" আমার মন বলে "তা' সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু চেষ্টা চাই বই কি?—কাজ ত তাঁ'র। কিন্তু এ কাজগুলি তিনি আমার হাতে দিয়াছেন। তাঁ'র দাসদাসীগুলিকে, যত্নে রক্ষা করবার জন্যই ত তিনি আমার হাতে দিয়াছেন? আমি নিশ্চেষ্ট থেকে এদের কষ্টের গৌণ-কারণ হ'ব কেন?" ফল কথা, আজও আমার একটু কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে। সে টুকু যত দিন না যা'বে তত দিন নির্ভর আসবে না। ও জন্যেও একটু চেষ্টা করি। যখন চেষ্টায় বিফলকাম হই, তখন মনে মনে বলি "প্রাণপণে চেষ্টা ত করলাম, তোমার ইচ্ছা নয় তাই হ'লো না? কি করবো?"

প্রাণে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য একট ব্যাকুলতা ছিল; কিন্তু সেটা কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা না থাকিলে কি হইবে? প্রাণ নিজের ব্যাকুলতাটুকু প্রকাশ করিয়া ফেলিল। আমার অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়া বাহির হইল "হরি হে!" সুতরাং আমার মনের অবস্থাটা আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না।

একজন যুবা আর একজন যুবাকে বলিলেন, "ভাই, হিন্দুজাতটা কেমন অকৃতজ্ঞ দেখ? ভগবান, যা দিয়েছেন তা'র জন্য তা'রা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর্ত্তে জানে না। কেবল বলবে "এস হে, দেখা দাও হে! এটা দাও হে, ওটা দাও হে!" এ বিষয়ে ইংরাজেরা ভাল। তাঁদের prayer-গুলি কেমন কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ!—আমি আমার প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রাণ, এ অনুযোগটা কি যথার্থ?" প্রাণ, বলিল "ছি! অমন ভাব মনেও এনো না! প্রাণনাথের জন্য ব্যাকুলতা বই আর আমাদের কিছুই কর্ত্তব্য নাই! এই যে তুমি এত ঘুরে এলে, কেন ভেবে দেখ দেখি?—তিনি আজকের সকল অভাবই ত পুরিয়ে দিয়েছেন! সকল দিনের সকল অভাবও পুরিয়েছেন। আজ যে অভাব মনে করে, অর্থের চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলে সেটাও যদি যথার্থ অভাব হয়,

পূরিয়ে দিবেন। তবে যে বেরিয়েছিলে, তা'র কারণ কি?—কারণ কি এই নয়—যে তাঁ'র গচ্ছিত জীব-কয়টির কতকগুলি অভাবের কথা তোমার মনে উদয় হ'য়ে তোমায় ব্যাকুল ক'রেছিল? তুমি তা'দের যত্নে রাখ্‌বে ব'লে, তিনি তা'দিগকে তোমার হাতে দিয়েছেন। তোমার মনে হ'য়েছে তা'দের যথোচিত যত্ন হ'চ্চে না। তাই, তাদের অভাব দূর করবার চেষ্টায় বেরিয়েছিলে।" আমি প্রাণকে ব'ল্লাম "যা ব'ল্লে ঠিক! কিন্তু তিনি ত চিরদিন আমার সকল অভাব পুরিয়ে আস্‌চেন, কৈ একটি দিনও ত তাঁ'রে তা'র জন্য ধন্যবাদ দিই নাই?" প্রাণ বলিল "মুখে বল নাই বটে, কিন্তু আমি কি চিরদিন তাঁ'র চরণের দাসী নই? তিনি যে আমাকে চিরদিন আদরে তাঁ'র বক্ষে ধ'রে রেখেছেন। অনাদি কাল থেকে যে আমি তাঁ'র চরণে বাঁধা, তা'কি জান না?—তাই ত তাঁ'র নাম প্রাণনাথ। তাঁ'র এই প্রেমের প্রতিদানে কি "প্রাণনাথ, thank you বল্লেই যথেষ্ট হ'ল?" তাঁ'র কাছে কি কিছু চাইতে হয়,—তিনি না চাইতেই সব দেন—তা'র বদলে আমাকে তাঁ'র চরণতলে পৌছে দিতে হয়, বলতে হয় " আমার এই প্রাণ-রাধাকে নিয়ে একবার দ্বাদশদলে যুগল হ'য়ে দাঁড়াও, আমরা দেখি।" তাইতেই আমারও সুখ, তোমাদেরও সুখ, তাঁরও সুখ। তোমরা আট জন নিজ নিজ সঙ্গিনীগণের সঙ্গে ত ভাই, আমায় নিয়ে, তাঁ'র সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যই এখানে এসেছ। সে নিষ্ঠুর সব দিচ্চে, কেবল দেখা দিচ্চে না! লুকোচুরী খেলায় তা'র ভারি আমোদ!" আমি বলিলাম "তুমি ধান ভান্তে মহীপালের গান আন্‌চো কেন?—আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কি উচিত নয়?" তা'র উত্তর দিলে কৈ?" প্রাণ হাসিয়া মাথা নাড়িল— বলিল "সে যে আমার! কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর্‌তে হয় পরকৃত-উপকারের জন্য। সে প্রাণের প্রাণ, তা'রে শুধু প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে হয়। তা'কে কিছু বল্‌তে হয় না, তা'র কাছে কিছু চাইতে হয় না। কেবল তা'রে সর্ব্বস্ব সঁ'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়।" আমি বলিলাম "দেখ্‌তে পেলাম না ব'লে কাঁদ্‌তে হ'বে কি?" প্রাণ বলিল "নিশ্চয়ই! রোদনের জলে হৃদয়ের মলা ধৌত ক'রে, প্রেমের আসন পাত্‌লে, সে ত কাছেই আছে—বস্‌বার জায়গা পেলেই বস্‌বে। তুমি পরের কথায় কান দিও না; যেমন চলেছ চল—"কাঁদ, আর হরি হরি বল।" চেষ্টা ক'রে এ কাজটি কর্‌তে হ'বে। এই হরি বলার শক্তি যে কত তা দেখ্‌তে পা'বে... আর সব আপনা আপনিই হ'য়ে যা'বে।"

অকিঞ্চন।

প্রশ্ন ও উত্তর।

আমাদের একজন পাঠিকা লিখিয়াছেন—

"মহাশয়, * * * যখন অনেক বড় বড় লেখকের বইয়ে দেখিতে পাই 'স্বর্ণ' 'কর্ণ' প্রভৃতি শব্দ হইতে উৎপন্ন "সোণা' 'কাণ' প্রভৃতি শব্দ মূর্দ্ধণ্য ণ দিয়া লেখা, তখন আপনারা যে দন্ত্য ন কেন দেন বুঝিতে পারি না। আবার 'একটী' প্রভৃতি শব্দের 'টী' ও আপনারা হ্রস্ব লিখিতেছেন। এ দুয়ের কোনটা ঠিক?"

উত্তর। আমরা ইহার কৈফিয়ৎ গত বৎসরের গৃহস্থের ২৭ পৃষ্ঠার টীকায় দিয়াছি। আমাদের গুরূপদেশ "নিমিত্তাভাবে নৈমিত্তিকস্যাভাবঃ।" যখন "সোনা" "কান" প্রভৃতি শব্দ গুলিতে মূর্দ্ধণ্য ণ-কারের হেতু র নাই তখন আর মূর্দ্ধণ্য 'ণ' লিখিবারও প্রয়োজন নাই। ঐ শব্দগুলি যখন প্রাদেশিক, তখন মূর্দ্ধণ্য লিখিলে যে ভুল হয় এ কথা বলিতে পারি না। আর 'টি' বর্ণ টা যখন হ্রস্বই উচ্চারিত হয়, তখন হ্রস্বই লেখা ভাল বলিয়া মনে করি। দীর্ঘ 'টী' যে ভুল এ কথাও বলিতে পারি না। লেখা লেখকের ইচ্ছাধীন।

গৃহস্থের অনেক পাঠক পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"নানক-চরিতে, সায়ন বৃহস্পতি ৪।৩।৫১ হইতে নিরয়ণ স্ফুট ৩।১৭।২৫ কেমন করিয়া হয়?"

উত্তর। এই সায়ন স্ফুট পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে সাধিত, সুতরাং চিত্রা-নক্ষত্রের সমসূত্রে মীন রাশিতে যে বিন্দু-নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই নিরয়ণ মেষারম্ভ-বিন্দু কল্পনা করিয়া পাশ্চাত্য মতে ৫০.২৩৫৬ বিকলা বার্ষিক অয়ন স্বীকার পূর্ব্বক লেখক ১৬ অংশ ২৬ কলা অয়নাংশ স্বীকার করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে গণনা করিলে, ১৪ অংশ ৩৩ কলা অয়নাংশ হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা স্বীকার্য্য নহে। ভিন্ন ভিন্ন মতে গ্রহলগ্নাদি-স্পষ্ট ও অয়নাংশাদি নির্ণয়-প্রণালী **জ্যোতিষ প্রসঙ্গে** যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

অকাল।

আজ সকালে অকাল হয়েছে।
অকালেতে জলে ভরা জলদ উঠেছে॥

চাঁদখানা প'ড়েছে ঢাকা, একটুকুও যায় না দেখা,
চপলার চমকানি দেখে (আমার) প্রাণটা কেঁপেছে।

জল দিয়েছি প্রাণের আশায়, এখুনি বাজ পড়্‌বে মাথায়,
প্রাণটা রাখা হ'বে গো দায়, (আমার) প্রাণ তা জেনেছে॥

সুবাতাস বয় যদি জোরে তবেই ত মেঘ যা'বে স'রে
তা হ'লেই প্রাণ থাকবে, নৈলে (আমার) প্রাণ ত গিয়েছে॥

শ্রীবি—

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

ভারতে সম্রাট।—আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট ভারতে আসিতেছেন। ভারতের বড় আনন্দের দিন। বহুদিন পরে ভারতের **রাজরাজেশ্বর** আবার ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ-সিংহাসনে আসীন হইয়া, রাজসূয় সম্পন্ন করিতেছেন। গত ১১ই নবেম্বর, তিনি বিলাত হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সেই শুভাগমন-সমারোহ, সকল সংবাদ পত্রেই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং সে সকল কথা আর আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। ২রা ডিসেম্বর তিনি বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলে সেখানে মহা সমারোহ হইয়াছে। তথা হইতে তিনি যাত্রা করিয়া ৭ই দিল্লিতে উপনীত হইবেন। ১২ই রাজসূয়োৎসব। ৩০এ তিনি কলিকাতায় আসিবেন। এখানেও কয়েক দিন মহা মহোৎসব হইবে। কিরূপ আয়োজন হইতেছে, তাহা সকল সম্বাদ পত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার আগমনে সাগরাম্বরা ভারতমাতা আজ আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিতেছেন। আমাদের প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করি এমন ভাষা নাই।

গ্রহ সংবাদ। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা, গগন-পর্য্যবেক্ষণ করেন, অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে কেবলমাত্র আমাদের জ্যোতিসপ্রসঙ্গ সাহায্যে প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহারা বোধ হয়, জড়-চক্ষু-দৃশ্য গ্রহ-গুলির কোনটি কোথায় আছে, দেখিতেছেন। এই ক্ষণে মঙ্গল বৃষে, এবং শনৈশ্চর মেষে আছেন। উভয়ই বক্রগামী অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছেন। যাঁহারা আজিও ঐ দুই গ্রহকে চিনেন না, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই চিনিতে পারিবেন। লোকে যে তারাগুচ্ছটিকে "সাতভেয়ে" বলে, এবং ইংরাজীতে যাহার নাম Pleiades, সেই কৃত্তিকা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে উজ্জল রক্তাভঃ নক্ষত্রটি আজ কাল সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বাকাশে দেখা যাইতেছে, সেইটিই মঙ্গল, আর ঐ মঙ্গল হইতে নৈঋ‍ত কোণের দিকে অতি অল্প দূরেই ঈষৎ নীলাভ যে অনুজ্জল নক্ষত্রটি দেখা যাইতেছে, সেইটিই **শনি**। ২১এ অগ্রহায়ণ মঙ্গল আবার কৃত্তিকার সমসূত্রে আসিবেন। ১৮ই অগ্রহায়ণ এবং ১৫ই পৌষ চন্দ্র, শনির সন্নিহিত হইবেন, এবং ১৯এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলের উপর দিয়া যাইবেন; এতদ্ব্যতীত ৩০এ অগ্রহায়ণ শুক্রের, ২রা পৌষ চন্দ্র, বৃহস্পতির, ৫ই বুধের এবং ৭ই বরুণ (Uranus)-এর সন্নিহিত

হইবেন। এখন বুধ ক্রমেই সূর্য্য-রশ্মিতে অদৃশ্য হইতেছেন। আগামী ৯ই পৌষ সূর্য্যের সহিত সমসূত্র হইবেন। বৃহস্পতি সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছেন; অচিরেই প্রভাত-তারারূপে দৃষ্ট হইতে থাকিবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, যে;—পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকাগুলির পর - ১২। **চিত্রময় জগৎ** নামক একখানি হিন্দী মাসিক পত্র পাইতেছি। এই পত্রখানি পুনা, চিত্রশালা ষ্টীম প্রেস্ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এখানির দ্বিবিধ সংস্করণ আছে। সাধারণ কাগজে মুদ্রিত পত্রের বার্ষিক মূল্য সওয়া তিন টাকা এবং আর্টপেপারে মুদ্রিত সংস্করণের বার্ষিক মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা। ইহাতে মহাজন বচনমালা (মহাত্মাওঁকে বচন) অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, পড়িলে তৃপ্তি বোধ হয়। প্রতিমাসে অনেক সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি থাকে। বিষয়ের নির্ব্বাচন তদুপযোগী। আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন। এতদ্ব্যতীত ১৩। **রত্নাকর** নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রও পাইতেছি, এখানি আসানসোল হইতে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এফ, টি, এস কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ৯ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধর্ম্ম' প্রবন্ধটি পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম।

শিক্ষা সোপান। (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ)—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। পুস্তক তিন খানি শিক্ষা বিভাগে আদৃত হইয়াছে। মূল্য যথাক্রমে এক, দেড় ও দুই আনা। পুস্তকের ছাপা ও ছবিগুলি সুন্দর। বিষয় নির্ব্বাচন শিশু-হৃদয়ের উপযোগী। প্রথম ভাগখানি, বর্ণযোজনা শিক্ষা হইলেই শিশুগণ বুঝিতে পারে এরূপ সরল ভাষায় লেখা। যে সকল বালকের বিদ্যালয়ে এ পুস্তক পাঠ্য নয়, তাহাদিগকে ঘরে পড়িতে দিলে, তাহারা নিজে নিজে পড়িলেও বিশেষ উপকৃত এবং পুলকিত হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম কায়স্থ।—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত দেব বর্ম্মা সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রহ্মকয়োদ্ভূত ব্রহ্ম-কায়স্থগণের উৎপত্তি, সংস্কার ও দ্বিজত্বাদি বিষয় অতি যোগ্যতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গীয় কায়স্থগণের বুঝিবার ও ভাবিবার অনেক কথা আছে। আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

সপ্তম এডোয়ার্ডের স্বর্গারোহণ। (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত। সুকবি জ্যোতিষী মহাশয় স্বর্গীয় ভারত-সম্রাটের স্বর্গারোহণব্যাপার স্মরণে এই শোকগীতিকাব্য খানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সপ্ত স্বর্গে বিভক্ত এবং আবেগময়ী গীতিপূর্ণ। গ্রন্থশেষে নবীনসম্রাটের স্বপ্ন দর্শনটি বড়ই সুন্দর। তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন স্বর্গগত সম্রাট তাঁহাকে বহু উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তাহা হইতে একটু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। স্বর্গগত সম্রাট স্বীয় পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া নবীন সম্রাটকে বলিতেছেন—

"তোমার দর্শনে তিনি পাবেন সান্ত্বনা।
তাঁহার শক্তির কথা কখন ভুল না॥
তিনি মম এক মাত্র ছায়া এ ভূতলে।
ক্লান্ত হ'লে রাজ-কার্য্যে কিম্বা মনঃক্লেশে।
ঐ ছায়া তলে তুমি বোসো রাজবেশে॥"

গ্রন্থখানির প্রারম্ভে সাতটি সর্গের সার ইংরাজী ভাষায় সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েক খানি সুন্দর হাফটোন ছবি আছে।

বনতুলসী।—ইহা শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, প্রণীত, একখানি ক্ষুদ্রকায় অতি মধুর কবিতাকুসুমগুচ্ছ। কবিতাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু বড় মধুর। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠায় তাহার একটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ সেটি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধাষ্টক। -শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত। এই গ্রন্থ খানিতে (১) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি, (২) আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা সমালোচনা (৩) ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার, (৪) কালিদাসের কাহিনী, (৫) কাদম্বরীর উপাদান, (৬) পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ, (৭) ফকির শাহ জালাল এবং (৮) সুখ ও দুঃখ, এই আটটি প্রবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধগুলিই সুলিখিত। গ্রন্থকার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বলিতেছেন—

ইংরাজ আমাদের রাজা; শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কাজ-কর্ম্ম প্রায় অধিকাংশ স্থলে রাজভাষাতেই সম্পাদন করিতে হয়; এবং রাজপুরুষগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে হইলে, উত্তমরূপে রাজভাষা লিখনের ও কথনের অভ্যাস করাও আবশ্যক; আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের ভাষাটারও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা রাখা কি সঙ্গত নহে? শিক্ষিত ব্যক্তিগণই যখন দেশের মুখপাত্র, তাঁহারা যদি মাতৃভাষার পরিচর্য্যা না করেন, তবে ইহা আর কাহার নিকট আশ্রয় লাভ করিবে? বিশেষতঃ তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে ইদানীন্তনকালে যাঁহারা বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ইংরাজী ভাষায় বিশেষ কৃতী এবং অনেকেই রাজপুরুষগণের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। কাব্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র, সাধারণ সাহিত্যে ভূদেব, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ প্রভৃতির কথা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ফলতঃ, ঐ যে মাতৃভাষানুশীলনে ঔদাস্য, উহা দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক মহতী জড়তার পরিসূচক ভাব মাত্র।"

গ্রন্থকার, এ কথা লিখিয়াছিলেন ১৩০২ সালে। ১৩১৮ সালে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে ঔদাস্যভাব অনেকটা ঘুচিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। লেখকের অভাব ক্রমেই ঘুচিতেছে বটে কিন্তু যাঁহারা সাধারণ পাঠাগারের সহিত বিশেষ সম্পর্কযুক্ত, তাঁহারা সকলেই জানেন, পাঠকের অভাব আজিও ঘুচে নাই। পাঠকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে যে কত দিন লাগিবে তাহা কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয় প্রবন্ধ আরও আগে রচিত, কিন্তু তাহাতে তিনি যে অভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা আজিও প্রায় তেমনই আছে। তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি ভট্টিকাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন। চতুর্থ প্রবন্ধে বঙ্গদেশ প্রচলিত কালিদাস সম্বন্ধীয় উপকথাগুলির অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। পঞ্চম প্রবন্ধে কাদম্বরীর উপাখ্যান ভাগের প্রথমাংশ যে বৃহৎ কথা হইতে সঙ্কলিত, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ প্রবন্ধে কামাখ্যাপীঠের আবিষ্কার-রহস্যাদি তদ্দেশীয় ইতিহাসের সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে। সপ্তম প্রবন্ধে ফকির শাহ জালালের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে এই প্রবন্ধে শাহ জালালের দরগার একটি ছবি আছে। অষ্টম প্রবন্ধে সুখ দুঃখের রহস্য আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, এবং সকলেই

যে ইহা পাঠে প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করি।

সাধু চেষ্টা। বোম্বাই সহরের দেশ-বিখ্যাত হিন্দু মিঃ কে, এস, জাসাওয়ালা সম্প্রতি ভারতে গো-হত্যা নিবারণ করিবার প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন-পত্র সম্রাটের নিকট দাখিল করিবার জন্য, ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। গো-জাতি এ দেশের কি কি উপকার করিয়া থাকে তাহা বুঝাইবার জন্য গো-জাতির প্রত্যেক ব্যবহারের এক একটি ছবিও ঐ আবেদনের সঙ্গে প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, এদেশের গোখাদকদিগের জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে টিনপূর্ণ গোমাংস আনয়ন করা কর্ত্তব্য। এই মহাত্মা, আলোচ্য গো-হত্যার বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারীর গোচরীভূত করিবার জন্য, গত ৭ই নবেম্বর বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, একজন ইংরাজ একজন পার্সি, এক জন মুসলমান ও দুই জন হিন্দু দ্বারা গঠিত এক ডেপুটেসন ষ্টেট সেক্রেটারীর সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন। রত্নাকর।

ভগিনী নিবেদিতা।—পরলোকগতা ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভারতীয় নারীসমাজের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যে সমস্ত পুস্তক আছে এবং তাঁহার লিখিত যে সমস্ত পুস্তক এখনও প্রকাশিত হয় নাই, বেলুড় মঠের অধ্যক্ষগণ সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই পুস্তকগুলির আয় ভগিনী নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত হইবে। আমাদের বিশ্বাস, ভগিনী নিবেদিতার উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিবেন। (সুলভ সমাচার)

হেয়ার স্কুল। আমরা অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, কলিকাতার হেয়ার স্কুল এখন যে স্থানে আছে সেখানে আর থাকিবে না। সম্প্রতি স্থির হইয়া গিয়াছে যে, হেয়ার স্কুল ভবানীপুরে যাইবে। ভবানীপুরে লণ্ডন মিসনারি কলেজের সম্মুখে যে বস্তি আছে, তাহা উঠাইয়া দিয়া, ঐ স্থানে হেয়ার স্কুলের গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ঐ স্থানে প্রায় সাড়ে সাত বিঘা জমি এই স্কুলের জন্য গৃহীত হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য কত দিনে আরম্ভ হইবে, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। কলিকাতা সহরটা যখন ভবানীপুর কালীঘাট বালিগঞ্জের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে এবং অনেকেই ঐ দিকে বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন; তখন ভবানীপুর অঞ্চলে একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

(সুলভ সমাচার)

চিকিৎসকের সমাদর।—প্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রায় শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু বাহাদুর মহামহিম ভারত-সম্রাট মহোদয়ের এ দেশে অবস্থানকালে তাঁহার চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। ডাক্তার বসু মহাশয় গত শনিবারে দিল্লী গিয়াছেন। তিনি দিল্লীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নেপালে গমন করিবেন। নেপালের যেখানে সম্রাট মহোদয় অবস্থান করিবেন সেখানকার স্বাস্থ্য

সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা পরিদর্শন করিয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া, তিনি বোম্বাইয়ে গমন করিবেন। সেখান হইতে তিনি বরাবর সম্রাট মহোদয়ের সঙ্গে থাকিবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের কার্য্যে ভারত-সম্রাট মহোদয় প্রীতি লাভ করিবেন। (সুলভ সমাচার)

নূতন হ্রদ। গত বৎসরে, উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা দেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি নূতন হ্রদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই হ্রদটি তিন শত পঁচাত্তর মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে দেড়শত মাইলেরও অধিক। ভগবানের রাজ্যে এখনও কত কি অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে কে বলিতে পারে?

পুস্তকের যত্ন। আমরা পুস্তকের যত্ন জানি না। জানিলেও, সময় ও অর্থাভাবে যথোচিত যত্ন করিতে পারি না। অথচ আমাদের অনেকেরই পুস্তক কিনিবার ও পড়িবার সখ আছে। পুস্তক কিরূপে যত্ন করিলে সুরক্ষিত হয়, জানা সকলেরই প্রয়োজন। পুস্তক নিয়ত ব্যবহৃত হইলে নষ্ট হয় না, কিন্তু ব্যবহার না করিয়া, বহুমূল্য গ্লাসকেস মধ্যেও আবদ্ধ রাখিলে অচিরেই নষ্ট হয়। সকল পুস্তক পড়িবার অবসর না হইলেও, গ্ল্যাস কেস মধ্যগত পুস্তক সপ্তাহে একবার ঝাড়া উচিত। ঝাড়িবার জন্য নরম কাপড় (cheese cloth) বা রেশমী ঝাড়ন ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক পুস্তক উত্তমরূপে মুছিবার পর উহা ঝাড়িয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যদি খোলা সেল্‌ফে বই থাকে, তবে প্রত্যহ উত্তমরূপে ঝাড়া প্রয়োজন। বইগুলি সেল্‌ফে নিতান্ত ঘনভাবে, বা আল্‌গা ভাবে রাখা উচিত নয়। ঘনভাবে রাখিলে মলাট ঘর্ষণে নষ্ট হইবে। আল্‌গা ভাবে রাখিলে মলাট বাঁকিয়া যাইবে। তবেই দেখুন, অল্পবিত্ত লোকের পুস্তকের সখ এক রকম বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নয়। নিজের অধিকারে পুস্তকের সংখ্যা যত অল্প হয় ততই সুবিধা। কোনও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পত্র হইতে, পাঠক পাঠিকাগণের জন্য এই টুকু সংগ্রহ করা গেল।

কালীর লেখা।—কালী দিয়া লিখিবার প্রথা কত দিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে জানি না। কিন্তু অদ্যাবধি যত লিখিত পত্র পুস্তকাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৯০০ অব্দের পুরাতন লেখা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বার্লিনের বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডাঃ বাহুদ মহোদয় (Dr. A. S. C. Vahuda) বলেন, সম্প্রতি অধ্যাপক রিজ্‌নার, সদলে, সমরিয়া দেশে, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া, ভূ-খনন করিতে করিতে কতকগুলি মৃন্ময় ফলক (tablet) পাইয়াছেন, সেগুলি প্রাচীন মিসরের কাল-কালীর দ্বারা লিখিত নানা বিবরণ পূর্ণ। ঐ গুলি আসীরীয় ভূপতি মহাত্মা আহবের সময়ের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, কারণ উহার একখানি নৃপতি আহবের নিকট প্রেরিত একখানি পত্র ও আর একখানি তাঁহার রাজভবনের দ্রব্যাদির তালিকা দৃষ্ট হইয়াছে।

মুষ্টিযোগ।

অম্লপিত্ত।—১। ইহাতে "রুই-পিত্ত" বড় উপকারী। খুব বড় রোহিত মৎস্যের পিত্তের মধ্যে কতকগুলি আলো চাউল দিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে, ঐ পিত্তরস সেই চাউলে ক্রমে শোষিত হয়। কয়েক দিন ঐ পিত্তটা ঝুলাইয়া রাখিলেই উহা শুখাইয়া যায়। এই আতপ চাউলকেই "রুই-পিত্ত" বা "রুই-পিত্ত-চাউল" বলে। এই চাউল সাত দিন এক রতি মাত্রায় জল দিয়া খাইলে, অম্ল-পিত্ত সারে। খাইবার সুবিধার জন্য ইহা অন্য চাউলের সহিত মিশাইয়া খাইতে পারা যায়।—(পী)

২। অম্লপিত্তের বুক-জালা বল্‌কা দুগ্ধ পানে উপশম হয়।—(প)

৩। নিমের ছাল পাতা ফুল ও ফল চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বীজতাড়কের বীচির চূর্ণের সহিত মিসাইবে। এবং সমপরিমাণ যবের ছাতু ও দ্বিগুণ চিনির সহিত প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করিবে, সেবনের, পর যত টুকু ইচ্ছা শীতল জল পান করিবে। ঔষুধের পূর্ণ মাত্রা ৵ আনা সুতরাং চিনিও যবের ছাতুর সহিত মিলাইলে আধ তোলা হইবে। অবস্থা বুঝিয়া ন্যূন মাত্রাও দেওয়া যায়।—(পী)

৪। গুলঞ্চ, নিমছাল, পলতা, আমলকী হরীতকী ও বহেড়া এই ছয় দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত দুই তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধেক সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহরের মধ্যে, অপরার্দ্ধ সূর্য্যাস্তের দণ্ডখানেক পূর্ব্বে সেবন করিবে।—(প)

৫। কুমড়ার ক্ষার উপযুক্তমাত্রায় শুণ্ঠি চূর্ণ ও জল সহ সেবন করিলে অম্লজনিত বুক জালা ভাল হয়।—(প)

৬। হাঁসের ডিমের খোলা ভস্ম ১ ভাগ যোয়ান ২ ভাগ, তেঁতুলের খোলা ভস্ম ১ ভাগ, সাজীমাটী অর্দ্ধ ভাগ, আমলা চূর্ণ ২ ভাগ মিশাইয়া শীতল জলের সহিত আহারের পর সেবন করিবে। পূর্ণ মাত্রা চারি আনা ওজন।—(অ)

৭। ফুলখড়ি চূর্ণ ১০ রতি মাত্রায় সেবনে উপকার হয়। (অ)

৮। হরীতকী, বহেড়া, আমলা, ও নাল্‌তে ভিজা জল সমপরিমাণ চূণের জলের সঙ্গে পান করিলে উপকার হয়।—(প)

৯। শ্বেতচন্দন ও মাখন মিসাইয়া এক তোলা আন্দাজ কয়েক দিন প্রাতে খাইলে ভাল হয়।—(পী)

১০। কাঁচা হরিদ্রা, পটোল পত্র, আদা ও কাঁচা আমলকী সমপরিমাণ লইয়া তাহার রস দুই তোলা ও তাহাতে পেঁপের আটা মিসাইয়া সেবন করাইবে। পেঁপের আটা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।—(অ)

১১। আধ ছটাক জলে ৫ ফোঁটা নাইট্রো মিউরিয়েটিক এসিড্ ডাইলিউটেড মিসাইয়া প্রত্যহ ৩ বার সেবনে ভাল হয়।—(প)

১২। লবঙ্গ ১, আমলকী ২, ছোলা ৩ ও মিছরী ৪ ভাগ মিসাইয়া ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছটাক খানেক জল সেবনে ভাল হয়। (পী)

১৩। প্রাবল্যের সময় বল্‌কা দুগ্ধে চূণের জল দিয়া খাইলে উপসম হয়।—(জে)

বৃহস্পতিপ্রমুখ গ্রহত্রয় হইতে যথাক্রমে পিতামহ, পতি এবং পুত্রের বিচার করিবে অর্থাৎ বৃহস্পতি পিতামহকারক, শুক্র স্বামীকারক এবং শনি পুত্রকারক গ্রহ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি পরাশর কেবল বৃহস্পতি হইতেই পুত্র, স্বামী এবং পিতামহের বিচার করিতে বলিয়াছেন। যথা—

"বুধান্মাতুলবন্ধূ চ মাতৃতুল্যানপি দ্বিজ।
গুরুণাত্র চ বিজ্ঞেয়াঃ পুত্র-স্বামী-পিতামহাঃ॥"

পত্নীপিতরৌ শ্বশুরৌ মাতামহা ইত্যন্তেবাসিনঃ॥২২॥

(অন্তেবাসিনঃ) তয়োরিতি শেষঃ গুর্ব্বগ্রে পঠিতত্বাৎ শুক্রাৎ (পত্ন্যাদীনাং) বিচারঃ কার্য্যঃ ॥ ২২ ॥

বার ক্রমে বৃহস্পতির পরস্থিত গ্রহ শুক্র হইতে পত্নী, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং মাতামহের বিচার করিতে হয় ॥ ২২ ॥

পরাশর বলিতেছেন—

"স্বভার্য্যা মাতৃপিতরৌ তথা মাতামহী দ্বিজ।
ভৃগুদ্বারা বিজানীয়াদেতেষাং শুক্রঃ কারকঃ ॥ ২২ ॥

উল্লিখিত কয়েকটি সূত্রে গ্রহগণের স্থির-কারকত্ব লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে গ্রহগণের অন্য প্রকার কারকত্বগুলি লিখিত হইতেছে।

কালাত্মা চ দিবানাথো মনঃ কুমুদবান্ধবঃ।
সত্বং কুজো বিজানীয়াদ্ বুধো বাণীপ্রদায়কঃ ॥
দেবেজ্যো জ্ঞানসুখদো ভৃগুর্বীয্যস্য কারকঃ।
বিচার্য্যতামিদং সর্ব্বং ছায়াসূনুশ্চ দুঃখদঃ ॥ ক ॥

রাজানৌ ভানুহিমগূ নেতা জ্ঞেয়ো ধরাত্মজঃ।
বুধো রাজকুমারশ্চ সচিবৌ গুরুভার্গবৌ ॥
প্রেষ্যকো রবিপুত্রশ্চ সেনা স্বর্ভানুপুচ্ছকৌ।
এবং ক্রমেণ বৈ বিপ্র সূর্য্যাদীনি বিচিন্তয়েৎ ॥ খ ॥

রক্তশ্যামো দিবাধীশো গৌরগাত্রো নিশাকরঃ।
রক্তগৌরো ধরাপুত্রো দূর্ব্বাশ্যামো বুধস্তথা ॥

গৌরগাত্রো গুরুর্জ্ঞেয়ঃ শুক্রঃ শ্যামস্তথৈব চ।
কৃষ্ণদেহো রবেঃ সূনু জ্ঞায়তে দ্বিজসত্তমঃ ॥ গ ॥

সূর্য্যেন্দু-জীবাঃ সত্ত্বাখ্যা জ্ঞ-শুক্রৌ চ রজোগুণৌ।
স্বর্ভানু-ভৌম-রবিজাস্তমোগুণময়া স্মৃতা ॥ ঘ ॥

শ্লেষ্মাণৌ ভৃগুচন্দ্রৌ চ পবনৌ রাহুসূর্য্যজৌ।
পিত্তাধিকৌ কুজার্কৌ চ সমধাতু জ্ঞ-জীবকৌ ॥ ঙ ॥

অস্থিরক্তস্তথা মজ্জা ত্বক্‌চর্ম্মবীর্য্যস্নায়বঃ।
তাসামীশাঃ ক্রমেণোক্তা জ্ঞেয়াঃ সূর্য্যাদয়ো দ্বিজ ॥ চ ॥

অগ্নি-ভূমি-নভ-স্তোয় বায়বঃ ক্রমতো দ্বিজ।
ভৌমাদীনাং গ্রহাণাঞ্চ তত্ত্বাশ্চামী প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ছ ॥

ভানোঃ কটুর্ভূমিসুতস্য তিক্তং সোমস্য তাবল্লবণং বিদন্ত।
মিশ্রীকৃতং বস্তু সুরেজ্যভৃগ্বোর্মাধুর্য্যমম্লঞ্চ শনেঃ কষায়ঃ ॥ জ ॥

রবিঃ কবিঃ কুজো রাহুঃ শনিশ্চন্দ্রো বুধো গুরুঃ।
ক্রমাদষ্টৌ গ্রহাশ্চৈতে পূর্ব্বাদষ্টদিগীশ্বরাঃ ॥ ঝ ॥

শিরঃপ্রদেশে বদনে দিনেশো, বক্ষঃস্থলে চাপি গলে কলাবান্
পৃষ্ঠোদরে ভূতনয়ঃ প্রভুত্বং করোতি সৌম্যশ্চরণে চ পাণৌ।
কটিপ্রদেশে জঘনে চ জীবঃ কবিস্তু গুহ্যস্থল-মুষ্কযুগ্মে
জানূরুদেশে নলিনীশসূনুশ্চারেণ বা জন্মনি চিন্তনীয়ং ॥ ঞ ॥

মধুপিঙ্গলদৃক্ সূর্য্যশ্চতুরস্র শুচির্দ্বিজ।
পিত্তপ্রকৃতিকো ধীমান্ পুমানল্পকচো হি সঃ ॥
বহুবাতকফঃ প্রাজ্ঞ চন্দ্রো বৃত্ততনু দ্বিজ।
শুভদৃক্ মধুবাক্যশ্চ চঞ্চলো মদনাতুরঃ ॥
ক্রূরো রক্তারুণো ভৌমশ্চপলোদারমূর্ত্তিকঃ।
পিত্তপ্রকৃতিকঃ ক্রোধী কৃশমধ্যতনুর্দ্বিজ ॥

বপুশ্রেষ্ঠঃ ক্লিষ্টবাক্ চ হ্যতিহাস্যরুচির্বুধঃ ।
পিত্তবান্ কফবান্ বিপ্র মারুতপ্রকৃতিস্তথা ॥
বৃহদ্গাত্রো গুরুশ্চৈব পিঙ্গলো মূর্দ্ধজেক্ষণঃ ।
কফপ্রকৃতিকো ধীমান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥
সুখী কান্তবপুঃ শ্রেষ্ঠঃ সুলোচনো ভৃগোঃ সুতঃ ।
কাব্যকর্ত্তা কফাধিক্যানিলাত্মা বক্রমূর্দ্ধজঃ ॥
কৃশদীর্ঘতনুঃ শৌরিঃ পিঙ্গদৃষ্ট্যনিলাত্মকঃ ।
স্থূলদন্তোলসৎ পঙ্গুঃ খররোমকচো দ্বিজঃ ॥
ধূম্রাকারো নীলতনু বনস্থোঽপি ভয়ঙ্করঃ ।
বাতপ্রকৃতিকো ধীমান্ স্বর্ভানুপ্রতিমঃ শিখী ॥ ট ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষামি বিশেষান্ ভাবকারকান ।
জনুর্লগ্নঞ্চ বিদ্যাদ্বৈ আত্মাকারক এব চ ॥
ধনভাবং বিজিনীয়াদ্দার-কারকমেব চ ॥
একাদশে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তৃতীয়ে তু কনিষ্ঠকঃ ॥
সুতে সুতং বিজানীয়াত্তথা সপ্তমভাবতঃ ।
সুতস্থানে গ্রহস্তিষ্ঠেৎ সোঽপি কারক উচ্যতে ॥ ঠ

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি স্থিরাণি কারকাণি চ ।
সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণঞ্চ বীর্য্যবান্ কারকো ভবেৎ ॥
বীর্য্যবান্ জায়তে বিপ্র জন্মনি রবিশুক্রয়োঃ ।
স পিতৃকারকো জ্ঞেয়ো নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম ॥
চন্দ্রারয়োশ্চ বলবান্ মাতৃকারক উচ্যতে ।
ভৌমাদ্ বিজানীয়াচ্ছ্যালো ভগিনীদার-ভ্রাতৃকৌ ॥
বুধান্মাতুলবন্ধূ চ মাতৃতুল্যানপি দ্বিজ ।
গুরুণাত্র চ বিজ্ঞেয়াঃ পুত্র-স্বামী-পিতামহাঃ ॥
স্বভার্য্যা মাতৃ-পিতরৌ তথা মাতামহী দ্বিজ ।
ভার্গবেন বিজানীয়াদেতেষাং শুক্রঃ কারকঃ ॥

অর্য্যম্নঃ পুণ্যভে তাত ইন্দোর্মাতা চতুর্থতঃ।
কুজাৎ তৃতীয়তো ভ্রাতা মাতুলো রিপুভাৎ বুধাৎ॥
দেবেজ্যাৎ পঞ্চমাৎ পুত্রো ভার্গবাৎ সপ্তমাৎ স্ত্রিয়ঃ।
মন্দাদষ্টমতো মৃত্যুরিত্থং তাতাদিকারকাঃ॥ ড॥

সূর্য্যাদাত্ম-পিতৃ-স্বভাব নিরুজঃ শক্তিশ্রিয়ৌ চিন্তয়েৎ
চেতো-বুদ্ধি-নৃপপ্রসাদ-জননী-সম্পৎকরশ্চন্দ্রমাঃ॥
সত্বং রোগ-গুণানুজাবনি-সুতান্ জ্ঞাতিং ধরাসূনুনা
বিদ্যা-বন্ধু-বিবেক-মাতুল-সুহৃৎ-বাক্কর্ম্মকৃদ্ বোধনঃ॥
প্রজ্ঞা-বিত্ত-শরীর-পুষ্টি-তনয়-জ্ঞানানি বাগীশ্বরাৎ
পত্নী-বাহন-ভূষণানি মদনব্যাপারসৌখ্যং ভৃগোঃ।
আয়ুর্জীবন-মৃত্যুকারণ-বিপৎ-সম্পৎ-প্রদাতা শনিঃ
সর্পেনৈব পিতামহন্তু শিখিনা মাতামহং চিন্তয়েৎ॥ ঢ॥

মেষবৃশ্চিকয়োর্ভৌমো ভার্গবো গোতুলাধিপঃ।
যুবতী-যুগ্ময়োশ্চান্দ্রিশ্চন্দ্রমা কর্কটেশ্বরঃ॥
স্যান্মীন-ধন্বিনো জীবো মন্দো মকরকুম্ভয়োঃ।
সিংহস্যাধিপতিঃ সূর্য্যঃ কথিতো গণকোত্তমৈঃ॥ ণ॥

অত্রেদমবধার্য্যং। লগ্নাষ্টমকারকো ভৌমঃ। ধনদারকারকঃ শুক্রঃ। শত্রু-সোদরকারকো বুধঃ। মাতৃকারকশ্চন্দ্রঃ। পুত্রকারকো রবিঃ। ভাগ্য-ব্যয়কারকো জীবঃ। কর্ম্মলাভয়োর্মন্দঃ। এবং গ্রহাঃ কারকা ভবন্তি॥ ত॥

সূর্য্যো গুরুঃ কুজঃ সোমো গুরুর্ভৌমঃ সিতঃ শনিঃ।
গুরুশ্চন্দ্রসুতো জীবো মন্দশ্চ ভাবকারকাঃ॥ থ॥

দ্যুমণিরমরমন্ত্রী ভূসূতঃ সোমসৌম্যৌ,
গুরুরবিতনয়ারৌ ভার্গবো ভানুপুত্রঃ।
দিনকরদিতিজেজ্যো, জীব-ভানু-জ্ঞ-মন্দাঃ
সুরগুরুরিন-সূনুঃ, কারকাঃ স্যুর্বিলগ্নাৎ॥ দ॥

রাজ্য-বিদ্রুম-রক্তবস্ত্র-মাণিক্য-রাজ-বন-পর্ব্বত-ক্ষেত্র-পিতৃকারকো রবিঃ। মাতৃ-মনঃ-পুষ্টি-গন্ধ-রসেক্ষু-গোধূমক্ষারক-দ্বিজ-শক্তিকার্য্য-শস্য-রজতাদিকারকশ্চন্দ্রঃ। সত্ত্ব-সদ্ম-ভূমি-পুত্র-শীল-চৌর্য্য-রোগ-ব্রণ-ভ্রাতৃ-পরাক্রমাগ্নি-সাহস-রাজশত্রুকারকঃ কুজঃ। জ্যোতির্ব্বিদ্যা-মাতুল-গণিত-কাব্য-নর্ত্তন-বৈদ্য-হাস-ভী-শ্রী-শিল্পবিদ্যাদিকারকো বুধঃ। স্বকর্ম্ম-যজন দেব-ব্রাহ্মণ-ধন-গৃহ-কাঞ্চন-বস্ত্র-পুত্র-মিত্রান্দোলিকা-যানাদিকারকো গুরুঃ। কলত্র-কার্ম্মুক-সুখ-গীত-শাস্ত্র-কাব্য-পুষ্প-সুকুমার-যৌবনাভরণ-রজত-যান-গর্ব্ব-লোক-মৌক্তিক-বিভব-কবিতাদিকারকঃ শুক্রঃ। মহিষ-হয়-গজ-তৈল-বস্ত্র-ভৃঙ্গার-প্রয়াণ-সর্প-রাজ্য-দারু-চায়ুধ-গৃহ-যুদ্ধ-সঞ্চার-শূদ্র নীলমণি-বিঘ্ন-কেশ-শল্য-শূল-রোগ-দাস দাসী-জনায়ুষ্যকারকঃ শনিঃ। প্রয়াণ-সময়-সর্প-রাত্রি-সকলগুপ্তার্থ-দ্যূতকারকো রাহুঃ। ব্রণরোগ-চর্ম্মার্ত্তি-শূল-স্ফুট-ক্ষুধার্ত্তিকারকঃ কেতুঃ॥ ধ॥

স্বর্ক্ষ-মূলত্রিকোণগাঃ কণ্টকেষু যাবত আশ্রিতাঃ।
সর্ব্ব এব তে অন্যোন্যকারকাঃ কর্ম্মগস্তু তেষাং বিশেষতঃ॥
কর্কটোদয়গতে যথোড়ুপে স্বোচ্চগাঃ কুজযমার্কসূরয়ঃ।
কারকা নিগদিতাঃ পরস্পরং লগ্নগস্য সকলোঽম্বরাম্বুগঃ॥
স্বত্রিকোণোচ্চগে হেতুরন্যোন্যং যদি কর্ম্মগঃ।
সুহৃৎ তদ্গুণসম্পন্নঃ কারকশ্চাপি স স্মৃতঃ॥ ন।

মন্দোঽজ্যায়ান্ গ্রহেষু॥ ২৩॥

রব্যাদি সপ্ত গ্রহেষু (মন্দঃ) শনিগ্রহঃ (অজ্যায়ান্) দুর্ব্বলঃ। ২৩॥

রব্যাদি সপ্তগ্রহের মধ্যে শনি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। ২৩॥

দুই তিন বা ততোঽধিক গ্রহের অংশাদি সাম্যে, কারক নির্ণয়ার্থ বর্ত্তমান সূত্রে নভশ্চর-গণের নৈসর্গিক বল সূচিত হইয়াছে মাত্র; বল পরিমাণের কোন উল্লেখ নাই। সূত্র পর্য্যালোচনায় রবি হইতে গ্রহগণ যথাক্রমে পর পর দুর্ব্বল বিচার সিদ্ধ হইলেও, বাস্তবিক তাহা নহে। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে—"ষষ্টিরেকাদিগুণিতা সপ্তাপ্তাঃ স্যান্নিসর্গজং। মন্দার-জ্ঞোজ্যশুক্রেন্দুসূর্য্যানাং ক্রমতো বলং॥" অর্থাৎ ৬০-কে ১।২ ইত্যাদি সাতটি অঙ্ক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গুণ করিয়া, সাত দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফল দ্বারা যথাক্রমে শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রচন্দ্র এবং রবির নিসর্গ-বল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬০-কে ৭ দিয়া ভাগ দিলে ৮।৩৪।১৭

হয় এবং উহাই শনির নিসর্গ-বল। উক্ত বলের দ্বিগুণ মঙ্গলের, ত্রিগুণ বুধের ইত্যাদি ক্রমে সপ্তগুণ অর্থাৎ ৬০ কলা রবির পূর্ণ বল। পারাশরী হোরায় ভগ্নাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পূর্ণাঙ্কে বল পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"এবং চেষ্টাবলং প্রোক্তং নিসর্গজমথো শৃণু।
ষষ্টিরেকেনবঃ সপ্তদশ ষড়্‌বিংশতিস্ততঃ।
চতুস্ত্রিংশৎ ত্রিবেদাঙ্কাঃ সূর্য্যাদীনাং নিসর্গজাঃ॥"

অর্থাৎ রবির ৬০ চন্দ্রের ৫১ মঙ্গলের ১৭ বুধের ২৬ গুরুর ৩৪ শুক্রের ৪৩ এবং শনির ৯ কলা নিসর্গ-বল। ২৩॥

প্রাচীবৃত্তির্বিষমভেষু॥ ২৪॥ পরাবৃত্ত্যোত্তরেষু॥ ২৫॥

(বিষমভেষু) মেষমিথুনাদি বিষমরাশিষু (প্রাচীবৃত্তিঃ) মেষবৃষাদি-রীত্যা ক্রমগণনা স্যাৎ। বিষমাৎ (উত্তরেষু) বৃষকর্কটাদি সমরাশিষু (পরাবৃত্ত্যা) ব্যুৎক্রমেণ বৃষমেষাদিরীত্যা কার্য্যা ইত্যর্থঃ। ২৪-২৫॥

মেষ-বৃষাদি-ক্রমে ওজরাশির ক্রম গণনা এবং বৃষ-মেষাদি-ক্রমে যুগ্মরাশির ব্যুৎক্রম গণনা হইয়া থাকে॥ ২৪-২৫॥

চরস্থিরাদি উপদেশসূত্রোক্ত প্রায় সমস্তই রাশি-দশা। বর্ত্তমান সূত্রদ্বয়ে পশ্চাল্লিখিত সেই সমস্ত রাশি-দশার গণনা-ক্রম লিখিত হইয়াছে। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ এবং কুম্ভ এই ছয়টি রাশিকে ওজ বা বিষম এবং অপর ছয়টিকে যুগ্ম বা সম-রাশি কহা যায়। মেষাদি ওজ-রাশির দশাদি নির্ণয় স্থলে মেষ-বৃষ ইত্যাদি ক্রমে ক্রম-গণনা এবং বৃষাদি সম-রাশির দশাদি নির্ণয় স্থলে বৃষ-মেষাদি ক্রমে ব্যুৎক্রম অর্থাৎ বিপরীত গণনা হইবে। এই সূত্রদ্বয় হইতে ভাবাদি গণনারও ক্রম-ব্যুৎক্রম সূচিত হইল। অর্থাৎ বিষম রাশি লগ্ন হইলে মেষ তনু-ভাব, বৃষ ধনভাব, মিথুন সহজভাব ইত্যাদিক্রমে ক্রমগণনা হইবে কিন্তু সম রাশি বৃষ লগ্ন হইলে, বৃষ তনুভাব, মেষ ধনভাব, মীন সহজভাব, ইত্যাদি ব্যুৎক্রমে ভাব নির্ণয় কার্য্য। দশান্তর্দ্দশাদি লিখন প্রণালীতেও উক্ত রূপ অনুলোম বিলোমে ভাবেরই অনুগমন করিবে। কোন বিশেষ বিধি না থাকিলে, বর্ত্তমান গ্রন্থে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম গ্রাহ্য। ২৪-২৫॥

ন ক্বচিৎ॥ ২৬॥

(ক্বচিৎ) বক্ষ্যমাণ চরদশানির্ণয়ে সর্ব্বত্রৈব ওজরাশিষু ক্রমগণনা তথা সমরাশিষু ব্যুৎক্রমগণনা (ন) স্যাদিতি॥ ২৬॥

কোন কোন স্থলে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ চরদশার নির্ণয় সময়ে ওজ এবং যুগ্ম রাশির যথাক্রমে ক্রম ও ব্যুৎক্রম গণনা হয় না॥ ২৬॥

"ন ক্বচিৎ" বলিয়াই সূত্রকার এ স্থলে নিস্তব্ধ; সুতরাং কোন্ কোন্ রাশিতে সূত্রোক্ত ক্রম ও ব্যুৎক্রম গণনার ব্যতিক্রম ঘটিবে তাহাই এক্ষণে গ্রন্থান্তরাদি হইতে বিচার্য্য। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ স্বকৃত টীকায় বলিয়াছেন—"মেষাদিভিস্ত্রিভির্জ্ঞেয়ং পদমোজপদে ক্রমাৎ। দশাব্দানয়নে কার্য্যা গণনা ব্যুৎক্রমাৎ সমে॥" অর্থাৎ মেষাদি তিন তিন রাশিতে এক একটি পদ হইয়া থাকে। সুতরাং রাশিচক্র, মেষ, কর্ক, তুলা এবং মৃগাদি ক্রমে চারিটি পদে বিভক্ত হইল। উক্ত পদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে পদের দুই দিকে ওজ এবং মধ্যে সম-রাশি তাহাকে ওজ-পদ এবং যাহার দুই দিকে সম এবং মধ্যে ওজ-রাশি, তাহাকে সম-পদ কহে। ভ-চক্রে মেষাদি ও তুলাদি তিন তিনটি রাশি ওজ-পদ এবং কর্ক ও মকরাদি পদদ্বয় সম-পদ শব্দে বাচ্য। ওজ-পদের অন্তর্গত সমরাশি বৃষ ও বৃশ্চিককে ওজ-কূট এবং সমপদের মধ্যগত ওজরাশিদ্বয় সিংহ ও কুম্ভকে সম-কূট শব্দে জ্ঞাতব্য। পশ্চাল্লিখিত চর-দশানয়নে ওজরাশির ক্রম গণনা না হইয়া ওজ-পদের এবং যুগ্মরাশির ব্যুৎক্রম গণনা না হইয়া যুগ্ম-পদের ব্যুৎক্রম গণনা হইবে। বৃদ্ধ-কারিকাতেও লিখিত আছে—"ক্রমাদ্ বৃষে বৃশ্চিকে চ ব্যুৎক্রমাৎ কুম্ভ-সিংহয়োঃ।" সুতরাং সিংহ ও কুম্ভ রাশি ওজ হইলেও তাহাদের ব্যুৎক্রম-গণনা এবং বৃষ ও বৃশ্চিক সম হইলেও ক্রম-গণনা স্থির নির্দ্দিষ্ট হইল।

বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদের দ্বাবিংশতিতম সূত্রে দৃগ্দশানয়ন-স্থলে—"মাতৃধর্ম্ময়োঃ সামান্যং বিপরীতমোজকূটয়োঃ" বলিয়া গ্রন্থকার নিজেই উক্ত মত প্রকাশ পূর্ব্বক উপস্থিত সূত্রের অর্থ-সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন। চর-দশা ভিন্ন অন্যান্য দশায় পদানুসারে ক্রম ও ব্যুৎক্রম গণনা হইবে না, ইহাই জানাইবার জন্য মূলে "প্রাচীবৃত্তিবিষম পদে" ইত্যাদি রূপ লিখিত হয় নাই। গ্রন্থ মধ্যে পদ শব্দের অন্যরূপ ব্যবহার উহার অন্যতম কারণ॥ ২৬॥

নাথান্তাঃ সমাঃ প্রায়েণ॥ ২৭॥

অত্র চরদশানয়নে (সমাঃ) দশাবর্ষাদয়ঃ (প্রায়েণ) সামান্যতঃ (নাথান্তাঃ) তত্তদ্রাশীনাং স্বামীপর্য্যন্তাঃ গ্রাহ্যাঃ। ২৭।

কোন রাশি হইতে তদধিপতি যে কয় রাশি দূরে অবস্থিত, প্রায়ই সেই কয় বৎসর তদ্রাশির দশা-মান। ২৭॥

গ্রহগণের অবস্থিতির অনিয়তত্ব হেতু, রাশিদিগের দশা-মানের স্থিরতা না থাকায় এই রাশি-দশা চর-দশা নামে অভিহিত। এই চরদশা সম্বন্ধে বৃদ্ধ-কারিকায় লিখিত আছে যে "তস্মাত্তদীশপর্য্যন্তং সংখ্যামত্র দশাং বিদুঃ। বর্ষ দ্বাদশকং তত্র নচেদেকং বিনির্দ্দিশেদিতি।" অর্থাৎ কোন রাশি হইতে তদধিপতি ওজ বা যুগ্ম পদানুসারে ক্রম বা ব্যুৎক্রম গণনায় যত রাশি অন্তর, সাধারণতঃ তত বৎসর সেই রাশির দশাকাল। রাশি সস্বামিক থাকিলে তাহার দশা-মান দ্বাদশ বৎসর, নহিলে যথাক্রমে প্রতি রাশি এক এক বর্ষ গণনা করিবে। যেমন ওজপদস্থ তুলা-দশায়, শুক্র মকরে থাকিলে ৩ বৎসর, মেষে থাকিলে ৬ বৎসর, সিংহে

থাকিলে ১০ বৎসর এবং তুলায় থাকিলে ১২ বৎসর মাত্র দশা-মান জ্ঞাতব্য। তদ্রূপ যুগ্ম-পদস্থ কুম্ভরাশি-দশায়, শনি তুলায় থাকিলে ৪ বৎসর, মিথুনে থাকিলে ৮ বৎসর, এবং মীনে থাকিলে ১১ বৎসর মাত্র। ইত্যাদিরূপ সর্ব্বত্র দশা-বর্ষের পরিমাণ নিরূপণ কর্ত্তব্য। উক্তরূপে আনীত দশা-মানের সংস্কারসাপেক্ষত্ব এবং সাধারণ শাস্ত্র হইতে বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির স্বামী বৈষম্য থাকায় মূলে সূত্রমধ্যে "প্রায়েণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রচলিত বৃহৎ পারাশরী হোরায় এই সূত্রার্থ পরিস্ফুট লিখিত আছে। যথা—

"ওজর্ক্ষানাং ক্রমাদ্বিপ্র সমানাং ব্যৎক্রমাৎ পুনঃ।
নাথান্তেন সমা জ্ঞেয়া নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম॥
মেষো বৃষোহথ মিথুনস্তুলালিশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ।
এতেষামোজসংজ্ঞা স্যাদব্দানাং গণনাক্রমাৎ॥
কর্কসিংহশ্চ কন্যা চ নক্র-কুম্ভ-ঝষা দ্বিজ।
এতেষাং সমসংজ্ঞা স্যাদ্ বর্ষাণাং ব্যৎক্রমাত্তথা॥
স্বর্ক্ষসংস্থিতখেটস্য বর্ষাণি দ্বাদশৈবহি।
ধনস্থে চৈক বর্ষং তু তৃতীয়ে হায়নদ্বয়মিত্যাদয়ঃ॥"

এ স্থলে ধন-তৃতীয়াদি শব্দে ক্রম-ব্যৎক্রম-ক্রমে, দ্বিতীয় তৃতীয়াদি রাশি বুঝিতে হইবে। ভাবস্ফুটে কখন কখন এক রাশিতে দুই ভাব এবং অন্য রাশি, ভাবশূন্য থাকায় ভাব অর্থ সমুচিত নহে।

জাতকশাস্ত্রে রাশিদিগের অধিপতি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"কুজ-শুক্র-বুধেন্দ্বর্কসৌম্যশুক্রাবনীভুবাং।
জীবার্কিভানুজেজ্যানাং ক্ষেত্রাণি-স্যুরজাদয়ঃ॥"

কুজ-শুক্রাদি ক্রমে সপ্তগ্রহ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি। প্রত্যেক রাশিরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট অধিপতি আছে; কিন্তু চরদশানয়নে বৃশ্চিক এবং কুম্ভ রাশি দ্বিস্বামিক। কুজ এবং কেতু-গ্রহ বৃশ্চিকের এবং শনি ও রাহু গ্রহ কুম্ভ-রাশির একযোগে অধিপতি। যথা পারাশরীয়ে-

"বৃশ্চিকাধিপতী দ্বৌ চ কুজকেতূ দ্বিজোত্তম।
স্বর্ভানুপঙ্গু কুম্ভস্য পতী দ্বৌ চিন্তয়েৎ দ্বিজ॥"

উক্ত প্রমাণানুসারে সিদ্ধ হইল যে বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির যথাক্রমে কুজকেতু এবং শনি-রাহু দুইটি করিয়া অধিপতি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য অধিপতি দ্বয়ের মধ্যে কোন গ্রহটিকে অবলম্বন করিয়া বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির দশামান নিরূপণ করিতে হইবে?

এই দ্বিনাথত্ব-সম্বন্ধে উক্ত পারাশরী হোরাতেই লিখিত আছে; যে—

বৃহস্পতিরুবাচ।

দত্তাত্রেয়ং মহাভাগমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্‌।
বিকৃতাচরণং ভক্ত্যা সন্তোষয়িতুমর্হথ ॥ ২৩ ॥
স বো দৈত্যবিনাশায় বরদো দাস্যতে বরম্‌।
ততো হনিষ্যথ সুরাঃ সহিতান্‌ দৈত্যদানবান্‌ ॥ ২৪
হন্তুং শক্তানসন্দেহো দত্তাত্রেয়প্রসাদতঃ ॥ ২৫ ॥

গর্গ উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তদা জগ্মুর্দত্তাত্রেয়াশ্রমং সুরাঃ।
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং ক্ষান্তং লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্‌ ॥ ২৬।

বৃহস্পতি তবে বলেন বচন,
"শুন দেব পুরন্দর,
শুন দেবগণ, আছে যুক্তি এক
উপায় অতি সুন্দর।
দত্তাত্রেয় নাম অত্রির নন্দন
মহাভাগ তপোধন,
যোগযুক্ত হ'য়ে নারী সঙ্গে ল'য়ে
হ'য়ে বিকৃতাচরণ,
লোক-সঙ্গ হ'তে দূরে থাকিবারে
করেন হেন আচার,
যাও ভক্তি-ভরে পূজহ তাঁহারে,
সন্তোষ করহ তাঁ'র। ২৩ ॥
তিনি দিলে বর, হে দেব-ঈশ্বর,
দৈত্যগণে নাশিবার
শক্তি হ'বে তব কহিনু নিশ্চয়
সন্দেহ নাহিক তা'র।

নিশ্চয় তা'হলে পারিবে নাশিতে
দৈত্যে দানবের সনে;
অতএব যাও শরণ তাঁহার
লও ভক্তিযুত মনে। ২৪ ॥
দত্তাত্রেয় সেই মহাযোগীবর
যদি হন কৃপাময়,
হইবে সমর্থ দৈত্য জিনিবারে
নাহিক তাহে সংশয়" ॥ ২৫ ॥
গর্গ বলে, রায়, করহ শ্রবণ
"বৃহস্পতি-বাক্য শুনি
দেবগণ সনে দেব আখণ্ডল,
চলিলা যথায় মুনি;
আশ্রমে প্রবেশি' করে দরশন
লক্ষ্মী সনে যোগীবর,
ক্ষমাশীল অতি সেই মহামতি
সদা প্রফুল্ল-অন্তর। ২৬ ॥

উদ্গীয়মানং গন্ধর্ব্বৈঃ সুরাপানরতং মুনিম্ ।
তে তস্য গত্বা প্রণতিং চক্রুঃ সর্ব্বার্থ-সাধনীম্ ॥২৭॥
ভক্ত্যা তস্যোপজহ্রুশ্চ মদ্যং যচ্চ সুরাদিকম্ ।
চক্রুঃ স্তবং স্ততো দত্ত্বা ভক্ষ্যভোজ্যস্রকাদিকম্ ॥ ২৮ ॥
তিষ্ঠন্তমনুতিষ্ঠন্তি যান্তং যান্তি দিবৌকসঃ ।
আরাধয়ামাসুরধঃ স্থিতাস্তিষ্ঠন্তমাসনে ॥ ২৯ ॥
স প্রাহ দেবান্ প্রণতান্ দত্তাত্রেয়ঃ কিমিষ্যতে ।
মত্তো ভবদ্ভির্যেনেয়ং শুশ্রূষা ক্রিয়তে মম ॥ ৩০ ॥

দেবা উচুঃ ।

দানবৈর্মুনিশার্দূল জম্ভাদ্যৈর্ভূর্ভুবাদিকম্ ।
হৃতং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য ক্রতুভাগাশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ৩১ ॥

সুরা পানে রত সেই মুনিবর ;
গন্ধর্ব্বে গাইছে গান ;
শুনি' সেই গান হাস্য-মুখ সদা,
সদা আনন্দিত প্রাণ।
সর্ব্বার্থ-সাধন হয় যাঁ'র পায়
তাঁ'র পায় দেবগণ,
সত্বর হইয়া সকলে আসিয়া
পড়ে ভক্তিযুত মন। ২৭ ॥
সুরাদি আনিয়া যতনে তাঁহার
পদে দিল উপহার,
করে সবে স্তব সম্মুখে রাখিয়া
ভোজ্য, ভক্ষ্য, মাল্য আর। ২৮ ॥
দাঁড়ান যখন সেই মুনিবর,
দাঁড়ান সকলে তবে,
চলিলে কোথাও যান পিছে তাঁ'র
সদা সুখে দেব সবে।
বসিলে আসনে, ভূমিতে সকলে
বসেন সম্মুখে তাঁ'র,
অনুগত হ'য়ে এরূপে যতনে
সেবিলা তাঁ'রে অপার। ২৯ ॥
তবে, তুষ্ট হ'য়ে দত্তাত্রেয় যোগী
প্রণত দেবতা প্রতি,
সুধা সম ভাষে জিজ্ঞাসিলা সবে
হইয়া প্রসন্ন অতি।
"ওহে, দেবগণ, বল কি কারণ
সেবি'ছ যতনে মোরে ?
কিবা অভিলাষ পুরাইব এবে ?
বলহ মম গোচরে"। ৩০ ॥
বলে দেবগণ— "শুন, মুনিবর,
জম্ভ-আদি দৈত্যগণ,
প্রবল হইয়া সবারে জিনিয়া
করি'ছে বহু পীড়ন।
ভূ-ভুব-স্বরগ তিন লোক এবে
হ'য়েছে—অধীন তা'র,
যজ্ঞ-ভাগ লোপ হ'য়েছে সবার
কষ্টের নাহিক পার। ৩১ ॥

তদ্বধে কুরু বুদ্ধিং ত্বং পরিত্রাণায় নোঽনঘ।
ত্বৎপ্রসাদাদভীপ্স্যামঃ পুনঃ প্রাপ্তুং ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ৩২

দত্তাত্রেয় উবাচ।

মদ্যাসক্তোঽহমুচ্ছিষ্টো ন চৈবাহং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কথমিচ্ছথ মত্তোঽপি দেবাঃ শত্রুপরাভবম্ ॥ ৩৩ ॥

দেবা উচুঃ।

অনঘস্ত্বং জগন্নাথ ন লেপস্তব বিদ্যতে।
বিদ্যাক্ষালনশুদ্ধান্তর্নিবিষ্টজ্ঞানদীধিতে ॥ ৩৪ ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

সত্যমেতৎ সুরা বিদ্যা মমাস্তি সমদর্শিনঃ।
অস্যাস্তু যোষিতঃ সঙ্গাৎ অহমুচ্ছিষ্টতাং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

নিষ্পাপ-হৃদয় তুমি মুনিবর,
ক্ষমতা অপার তব,
কর পরিত্রাণ, বধিয়া তাহারে,
রক্ষা কর এই ভব।
বাসনা অন্তরে প্রসাদে তোমার
পা'ব স্বর্গ-পুনরায়,
পা'ব যজ্ঞ-ভাগ হ'বে দুঃখ দূর
সুখী হ'ব সবে তা'য়।" ৩২ ॥

কহে দত্তাত্রেয়— "শুন দেবগণ,
মদ্যাসক্ত আমি অতি,
অশুচি হইয়া আছি চিরদিন,
সদাচারে নাহি মতি।
নহি জিতেন্দ্রিয় দেখি'ছ নয়নে,
তবে ব'ল কি কারণে?
এসেছ সকলে নিকটে আমার,
শত্রু-জয় আশা মনে?" ৩৩ ॥

বলে দেবগণ— "ওহে জগন্নাথ,
লিপ্ত কভু নহ তুমি,
নিষ্পাপ-হৃদয় তুমি নিরন্তর
পবিত্র করি'ছ ভূমি।
বিদ্যা-তরঙ্গিণী- নীরেতে তোমার
ক্ষালিত সদা অন্তর,
জ্ঞান-সূর্য্য-করে বিভাসিত হ'য়ে
রহিয়াছে নিরন্তর।" ৩৪ ॥

কহে দত্তাত্রেয়— "কহিলে যে কথা
কিছু মিথ্যা নহে তা'র;
জ্ঞান আছে মোর সমদর্শী আমি
পেয়েছি বিদ্যার পার;
কিন্তু এক দোষে সব নষ্ট মোর
হের সবে বিদ্যমান,
এই নারী সঙ্গে মজি' রসরঙ্গে
অশুচি আমার প্রাণ। ৩৫ ॥

স্ত্রী-সম্ভোগো হি দোষায় সাতত্যেনোপসেবিতঃ ॥ ৩৬
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ পুনর্বচনমব্রুবন্ ॥ ৩৭ ॥

দেবা উচুঃ।

অনঘেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ জগন্মাতা ন দুষ্যতি।
যা সা বিদ্যা তব বিভো সর্ব্বজ্ঞস্য হৃদিস্থিতা ॥ ৩৮ ॥
যথাংশুমালা সূর্য্যস্য দ্বিজ-চণ্ডাল-সঙ্গিনী।
ন দুষ্যতি জগন্নাথ তথেয়ং বরবর্ণিনী ॥ ৩৯ ॥

গর্গ উবাচ।

এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দত্তাত্রেয়োঽব্রবীদিদম্।
প্রহস্য ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ যদ্যেতদ্ভবতাং মতম্ ॥ ৪০ ॥

স্ত্রী-সঙ্গে সতত যেই জন রত
হ'ত বল বুদ্ধি তা'র,
অশেষ দোষের আকর রমণী
মনে জানি' আমি সার।" ৩৬ ॥
দত্তাত্রেয় মুখে হেন বাক্য শুনি
মিলি' সব দেবগণ,
করযুগ জুড়ি' বলে পুনরায়
বিনয় নম্র বচন। ৩৭ ॥
বলে দেবগণ,— "হে দ্বিজসত্তম,
পাপশূন্যা এ রমণী,
জগন্মাতা ইনি, এঁরে স্পর্শ করি'
পবিত্রা এই ধরণী।
হে বিভো, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানের আধার,
যে বিদ্যা তব হৃদয়ে,
সেই বিদ্যা কভু অশুচি না হ'য়
জেনেছি নিশ্চিত হ'য়ে। ৩৮ ॥

সূর্য্যের কিরণ ব্রাহ্মণে চণ্ডালে
সমরূপে স্পর্শ ক'রে,
কিন্তু কভু তা'য় অপবিত্র নয়,
জানে ত সবে অন্তরে;
হে জগত-নাথ, এ বরবর্ণিনী
জগন্মাতা সুনিশ্চয়,
অপবিত্র কভু না হ'ন কখন,
নাহিক ইথে সংশয়।"৩৯ ॥
গর্গ বলে,—"রাজা কর, অবধান,
দেবের বচন শুনি,'
দত্তাত্রেয় তবে বলিলা হাসিয়া
দেবগণে এই বাণী—
"যদি তোমাদের মনের বাসনা
সুনিশ্চয় এই হয়,
তবে যেই মত বলি করিবারে,
কর সবে এ সময়। ৪০ ॥

তদাহূয়াসুরান্সর্ব্বান্ যুদ্ধায় সুরসত্তমাঃ ।
ইহানয়ত মদ্দৃষ্টিগোচরং মা বিলম্বতাম্ ॥ ৪১ ॥
মদ্দৃষ্টিপাতহুতভুক্-প্রক্ষীণবলতেজসঃ ।
যেন নাশমশেষাস্তে প্রযান্তি মম দর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

গর্গ উবাচ ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবৈর্দৈত্যা মহাবলাঃ ।
আহবায় সমাহূতা জগ্মুর্দেবগণাশ্রমম্ ॥ ৪৩ ॥
তে হন্যমানা দৈতেয়ৈর্দেবাঃ সর্ব্বে ভয়াতুরা ।
দত্তাত্রেয়াশ্রমং জগ্মুঃ সমস্তাঃ শরণার্থিনঃ ॥ ৪৪ ॥
তমেব বিবিশুর্দৈত্যাঃ কালয়ন্তো দিবৌকসঃ ।
দদৃশুস্তং মহাত্মানং দত্তাত্রেয়ং মদালসম্ ॥ ৪৫ ॥
বামপার্শ্বস্থিতামিষ্টামশেষ জগতঃ শুভাম্ ।
ভার্য্যাঞ্চাস্য সুচার্ব্বঙ্গীং লক্ষ্মীমিন্দুনিভাননাম্ ॥ ৪৬ ॥

সুরশ্রেষ্ঠগণ করহ গমন
প্রের দূত ত্বরা করি'
অসুরগণেরে কর আমন্ত্রন
যুঝিবারে অস্ত্রধরি'।
বিলম্ব না করি' আনহ সবারে
নয়ন-গোচরে মম,
পুরাইব আশা কহিনু নিশ্চয়
নাশিব মনের তমঃ । ৪১ ॥
নয়ন-অনলে, নিশ্চয় তা'দের
বল-তেজ নাশ হ'বে,
আমার গোচরে আসিবে যখনি
জীবন ত্যেজিবে সবে" । ৪২ ॥
গর্গ বলে,—"রাজা, করহ শ্রবণ,
দত্তাত্রেয় বাণী শুনি',
সমর-কারণে দিতিসুতগণে
আহ্বান করে তখনি।

দেবের আহ্বানে যত দৈত্যগণ
রণসজ্জা ত্বরা, করি'
দেবগণ যথা, সেই ত আশ্রমে
আসে নানা অস্ত্র ধরি' । ৪৩ ॥
দৈত্যগণ শরে হ'য়ে জর জর
দেবগণ পেয়ে ভয়,
দত্তাত্রেয়াশ্রমে যায় পলাইয়া
হইতে তবে নির্ভয় । ৪৪ ॥
দেবগণ-পিছে ধায় দৈত্যগণ,
করিবারে পরাজিত,
যথা দত্তাত্রেয় মদালস বসি'
হৈল তথা উপনীত । ৪৫ ॥
বাম পাশে তাঁ'র, শোভার আধার
কমলা কমলমুখী,
যাঁহার কৃপায় জগতের জীব
ইষ্ট-লাভে সদা সুখী । ৪৬ ॥

নীলোৎপলাভনয়নাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
সুদতীং মধুরাভাষাং সর্ব্বযোষিদ্গুণৈর্যুতাম্ ॥ ৪৭ ॥
দৃষ্ট্বাগ্রতস্তদা দৈত্যাঃ সাভিলাষমনোভবাঃ।
ন শেকু-রুদ্ধতা দৈত্যা মনসা বোঢ়ুমাতুরাঃ ॥ ৪৮ ॥
ত্যক্ত্বা দেবান্ স্ত্রিয়ং তাং তু হর্ত্তুকামা হতৌজসঃ।
প্রেরিতাস্তেন পাপেন হ্যাসক্তাস্তে ততোঽব্রুবন্ ॥ ৪৯ ॥
স্ত্রীরত্নমেতৎ ত্রৈলোক্যসারং চেদ্বিবিতিতং ভবেৎ।
কৃতকৃত্যাস্ততঃ সর্ব্বে ইতি নো ভাবিতং মনঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বে সমুৎক্ষিপ্য শিবিকায়াং স্বরার্দ্দনাঃ।
আরোপ্য স্বামধিষ্ঠানং নয়াম ইতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৫১ ॥

গর্গ উবাচ।

সানুরাগাস্ততস্তে তু মুনেরন্তিকমাগমন্।
তস্য তাং যোষিতং সাধ্বীং সমুৎক্ষিপ্য স্মরাতুরাঃ ॥ ৫২ ॥

নীলোৎপল জিনি' নয়নযুগল
পীন-শ্রোণী-পয়োধর,
হেরি দৈত্যগণ, ব্যাকুলিত মন
হৃদে বাজে স্মরশর।
জিনি সুধাধারা বহে বাক্য-ধারা
কমল-বদন হ'তে,
পশি' শ্রুতিপুটে প্রমত্ত করিল
নহে স্থির কোন মতে। ৪৭-৪৮ ॥
ত্যজি' দেবগণে, সে নারী হরিতে
বাসনা করিল মনে,
কামে, পাপ আসি' বল-বুদ্ধি নাশি'
ব্যস্ত ক'রে প্রতি জনে।
বলে পরস্পর,— "শুন বন্ধুগণ,
এ নারী নারীর সার,
ত্রিলোকে এমন, দেখিনি কখন
রমণী শোভা-আধার।
এরে যদি মোরা নিয়ে যেতে পারি'
সফল হ'বে জীবন,
করি' বহু শ্রম এসেছি এখানে
পা'ব অনুরূপ ধন।
কৃতকৃত্য মোরা হইব তা'হ'লে
সন্দেহ তাহাতে নাই,
বুঝিতেছি মনে পেলে নারী-ধনে
আর কিছু নাহি চাই। ৪৯-৫০ ॥
বিলম্বেতে আর নাহি প্রয়োজন
শিবিকা সংগ্রহ কর,
এ নারী-রতনে লহ রে যতনে
পুরীতে হ'য়ে তৎপর"। ৫১ ॥
গর্গ বলে—"রায় করহ শ্রবণ
এরূপ বিচারি' মনে,
অনুরাগ ভরে, পশিল সকলে
সেই ত মুনি-সদনে।
স্মরাতুর হ'য়ে জ্ঞান-হীন সবে
না ভাবিল ফলাফল;

শিবিকায়াং সমারোপ্য সহিতা দৈত্যদানবাঃ ।
শিরঃসু শিবিকাং কৃত্বা স্বস্থানাভিমুখা যযুঃ ॥ ৫৩ ॥
দত্তাত্রেয়স্তদা দেবান্ বিহস্যেদমথাব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা চ হন্ত দৈত্যানাং এষা লক্ষ্মীঃ শিরোগতা ॥ ৫৪ ॥
সপ্তস্থানান্যতিক্রম্য নবমন্যমুপেষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

দেবা ঊচুঃ ।

কথয়স্ব জগন্নাথ কেষু স্থানেষ্ববস্থিতা ।
পুরুষস্য ফলং কিম্বা প্রযচ্ছত্যথ নশ্যতি ॥ ৫৬ ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ

নৃণাং পাদস্থিতা লক্ষ্মী-র্নিলয়ং সংপ্রযচ্ছতি ।
সক্থ্নোশ্চ সংস্থিতা বস্ত্রং রত্নং নানাবিধং বসু ॥ ৫৭ ॥

সাধ্বী সে নারীরে তুলে শিবিকায়
সকলে করিয়া বল ।
সকলে মিলিয়া মস্তকে লইল
শিবিকা যতন করি'
দত্তাত্রেয়-পত্নী সেই শিবিকায়
লয়ে যায় সবে হরি' । ৫২-৫৩ ॥
সহাস্য বদনে দত্তাত্রেয় তবে
বলিলেন দেবগণে,—
"হের দেবগণ, শিরোগতা এবে
লক্ষ্মী যা'ন দৈত্য সনে । ৫৪ ॥
সপ্তস্থান এবে করি' অতিক্রম,
উঠেছেন শিরোপরে,
নিশ্চয় কমলা,— সতত চঞ্চলা—
যা'বেন অপর ঘরে ।
দৈত্য-গৃহে আর স্থান নাহি তাঁ'র
কহিলাম সুনিশ্চয়,
ত্যজি' দৈত্যগণে নিশ্চয় এক্ষণে
করিবেন অন্যাশ্রয়" । ৫৫ ॥
দেবগণ বলে,— "ওহে জগন্নাথ,
বলহ করি' বিস্তার,
কোন স্থানে লক্ষ্মী থাকি' পুরুষের
কি আশা পুরান তা'র" । ৫৬ ॥
তবে দেবগণে, দত্তাত্রেয় মুনি
বলিলেন প্রীতি ভরে,—
"শুন দেবগণ, লক্ষ্মী যথা থাকি'
যেই ফল দেন নরে ।
পদে থাকি' লক্ষ্মী নিলয় প্রদান
করেন ভকত জনে,
সক্থিতে থাকিয়া বস্ত্র আর ধন
দেন তিনি ফুল্লমনে । ৫৭ ॥

কলত্রদা গুহ্যসংস্থা ক্রোড়স্থাপত্যদায়িনী।
মনোরথান্ পূরয়তি পুরুষাণাং হৃদিস্থিতা ॥ ৫৮ ॥
লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীবতাং শ্রেষ্ঠা কণ্ঠস্থা কণ্ঠভূষণম্।
অভীষ্টবন্ধুদারৈশ্চ তথাশ্লেষং প্রবাসিভিঃ ॥ ৫৯ ॥
মৃষ্টান্নং বাক্যলাবণ্যমাজ্ঞামবিতথাং তথা।
মুখস্থিতা কবিত্বঞ্চ যচ্ছত্যুদধিসম্ভবা ॥ ৬০ ॥
শিরোগতা সংত্যজতি ততোঽন্যং যাতি চাশ্রয়ম্।
সেঽয়ং শিরোগতা দৈত্যান্‌পরিত্যজতি সাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥
প্রগৃহ্যাস্ত্রাং নিবধ্যন্তাং তস্মাদেতে সুরারয়ঃ।
ন ভেতব্যং ভৃশং ত্বেতে ময়া নিস্তেজসঃ কৃতাঃ ॥ ৬২ ॥

গুহ্যে অবস্থিতি করিয়া কমলা
কলত্র করেন দান।
অপত্য-সম্প্রাপ্তি ঘটে, যবে তাঁ'র
ক্রোড়ে হয় অবস্থান।
হৃদয়ে থাকিলে সকল কামনা
করেন তিনি পূরণ,
হৃদয়ই তাঁহার উপযুক্ত স্থান
জানিবে, এই কারণ। ৫৮ ॥
লক্ষ্মীবান জন লক্ষ্মীরে যখন
কণ্ঠেতে রাখিতে পারে,
কণ্ঠভূষা লাভ হয় তা'র তবে
কহিনু ইহা তোমারে,—
প্রবাসী জনের ইষ্ট-বন্ধু আর
দারা লাভ তবে হয়,
তা'দের সহিত মিলিত হইয়া
সতত সুখেতে রয়। ৫৯ ॥
শুদ্ধ অন্ন আর শুদ্ধ-বাক্য লাভ,
লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়
যখন কমলা মুখে অবস্থিতা
হয় বহু সুখোদয়।
মানবের তবে আজ্ঞা শুনে সবে
কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হয়,
বাক্যেতে তাহার বাড়য়ে মাধুরী
কহিলাম সুনিশ্চয়। ৬০ ॥
মস্তকে যখন তাঁ'র অধিষ্ঠান,
নিশ্চয় জানিও তবে,
সেই জন ত্বরা লক্ষ্মী-হীন হ'বে
বহু কষ্ট পা'বে ভবে।
ছাড়ি' লক্ষ্মী তা'রে অপরের ঘরে
নিশ্চয় যাইবে চলি'
হইবে পতন, যা'বে ধন জন
হারাইবে সে সকলি।
এই দৈত্যগণ লক্ষ্মীরে এখন
শিরে করি' ল'য়ে যায়;
এই সে কারণে লক্ষ্মী ছাড়া হ'বে
নাহিক সন্দেহ তায়। ৬১ ॥
অতএব সবে অস্ত্র করে ধরি'
যাও ইহাদের পিছে
বধহ সবারে খর অসি ধারে
বিলম্ব ক'রো না মিছে।
কিছু ভয় নাই জিনিবে সবাই
এবে যদি কর রণ,
তেজোহীন সবে হ'য়েছে এখন
হারা'বে সবে জীবন। ৬২ ॥

আজি রাজরাজেশ্বর রাজরাজেশ্বরী

উদিত পূরব ভূধরে।

Indian Press, Calcutta

মহামহিমান্বিত, অশেষরাজ-শ্রীযুক্ত

ভারত-রাজরাজেশ্বর শ্রীলশ্রীযুক্ত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

এবং

রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মেরী মহাদেবীর

শুভ-ভারতাগমন ও রাজসূয়-মহোৎসব উপলক্ষে

বিজয়-মঙ্গল-গীতিকা।

"যস্যানন্তমনন্তকোটিভুবনেষ্বেকাধিপত্যং স্থিরং
চন্দ্রার্কানিলপাবকপ্রভৃতয়ো নিত্যং যদাজ্ঞাবহাঃ।
যস্যাসীম-সভা-বিতানমখিলং তারাবিচিত্রং নভঃ
সামাত্যং সকুটুম্বকং স ভগবান্ ত্বাং পাতু বিশ্বেশ্বর ॥"

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য)*

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটি অনন্ত সাম্রাজ্য যাঁ'র
রবি-চন্দ্র বায়ু-জল বহিতেছে আজ্ঞা-ভার,
অনন্ত তারকারাজি-খচিত সুনীলাম্বর
যাঁ'র সভা আচ্ছাদিয়া রহিয়াছে নিরন্তর,
অনন্ত শক্তি-আধার সেই দেব ভগবান
নরেশে সজনসনে করুন করুণাদান।

হে মঙ্গলময়, মঙ্গল কর
আজি এ মঙ্গল-বাসরে।
এ পুণ্য প্রভাতে পুণ্য প্রভা-তে
সাজাও ভারতে সাদরে।
এস দিনকর, তব পুণ্য করে
পরশ নরেশ-অঙ্গ,
জগত মাতাও আনন্দে ভাসাও
আজি হে ভঙ্গ-বঙ্গ,
রাজরাজেশ্বর-আদেশে
অভাব রবে না এ দেশে
সকলে হাসিবে আনন্দে ভাসিবে
চির-মঙ্গল-সাগরে। ১।

অঞ্জন গঞ্জিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ
তমোরাশি ছিল আকাশে,
ঢেকে রেখেছিল ভারত-বদন
ঘুচিল এ রবি বিকাশে,
দশ দিশি হাসে সুহাসে,
ধরণী ভরিল সুবাসে,
আজ, রাজরাজেশ্বর রাজরাজেশ্বরী
উদিত পূরব-দুয়ারে। ২।
সুনীল কমলে ফুটিল কমল
শত হৃদয়-সরসে,
গন্ধবহ, গন্ধ বহনে
রত, তাহে কিবা হরষে,

* সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এ বৃদ্ধ বয়সে "শ্রীসম্রাড়াভিনন্দনম্" নামে অষ্টাদশ সংস্কৃত শ্লোকাত্মক একখানি অভিনন্দন পত্র রচনা করিয়া স্বকৃত ব্যাখ্যার সহিত ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি-গ্রাম-মধ্যস্থিত রাজপুর মিউনিসিপালিটির প্রাঙ্গণে অভিষেক মহোৎসব সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তাহার প্রথম শ্লোকটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া ভাবানুবাদ সহ এই বিজয়-মঙ্গল-গীতিকার মঙ্গলাচরণরূপে উপরে দিলাম। (গৃহস্থ-সম্পাদক)

হের এ বিশ্ব-সরসে
ভারত-কমল হরষে
ফুটেছে আবার উঠেছে ভাসিয়ে
কোলে নিতে নৃপে আদরে। ৩।
কোটি-কণ্ঠে গগন ভেদিয়ে
কর জয় জয় ঘোষণা,
বহুদিন পরে আজি শুভদিন
এ দিন কখন পাব না,
ছাড় রে দুখের ভাবনা,
এ সুখের কথা ভাব না,
আর কি এমন শুভ-দিন পাবে
কভু এ জীবন মাঝারে? ৪।

এই ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডব-সবে
রাজসূয় যজ্ঞ করিল,
রাজরাজেশ্বর শুভ আগমনে
সে ধাম পুলকে ভরিল,
ভাগ্য-চক্র ঘুরিল,
বহু আশা আজি পূরিল,
জয় রাজ্যেশ্বর, জয় রাজ্যেশ্বরী
বল রে ফুল্ল অন্তরে। ৫।
মঙ্গলময় মঙ্গল করে
তোষ হে এ দোঁহে সাদরে।
অকিঞ্চন আজি তোমার চরণে
চাহে এ ভিক্ষা কাতরে।

এই গীতটি "মল্লার রাগিণী একতালায়" গাওয়া যায়।

ভারতবাসীগণ জানেন, নৃপতি এই মর্ত্ত্যধামে নর-দেব। নৃপতি, প্রজার চক্ষে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ভারতবাসীগণ নরপতিকে চিরদিন সেই ভাবে পূজিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তাই আজ রাজরাজেশ্বরকে ভারতে দেখিয়া পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন। ভারত, বহুকাল রাজদর্শন-পুণ্যে বঞ্চিত। বহুদিন পরে রাজ-রাজেশ্বরের দর্শনজনিত আনন্দে সাগরাম্বরা ভারত-জননীর দীন সন্তানগণ আজ কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। এই খ্রীঃ ১৯১১ অব্দের ১২ই ডিসেম্বরের মত শুভদিন, বোধ হয় কোনও দেশের পক্ষে কোনও দিন ঘটে নাই। এই দিনে বিশাল ভারতের ক্ষুদ্রতম পল্লীর সুদীন দরিদ্রও আনন্দে উৎ-ফুল্ল হইয়া নিজ গৃহের দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গল ঘট স্থাপন-পূর্ব্বক পুষ্পমাল্য ও দীপাবলি-দ্বারা দ্বার সজ্জিত করিয়া উৎসব করিয়াছে। গ্রামের সকলে মিলিয়া, নিরন্নকে অন্নদান প্রভৃতি মঙ্গল-কার্য্য করিয়াছে। জগদীশ্বর, আমাদের ভাগ্যে এ দিনের পুনরাবৃত্তি করুন।

অকিঞ্চন।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

"ভাই, মালি, তুমি, আমার সর্ব্বস্ব—আমিও তোমার ভাই। এস ভাই, দু'জনে একটু গল্প করি।" এক দিন অপরাহ্নে, আমি শ্রীযুক্ত মালীকে এইরূপ আদর কোরে ডাক্লাম্। তা'কে আমি এমনি ক'রেই ডেকে থাকি। আমাকেও সে বড়ই ভালবাসে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে, দিনের মধ্যে এই তিনটিবার মাত্র তা'তে আমাতে দেখা হয়। বাকী সময় সে তা'র কাজ করে, আমি আমার কাজ করি। আর প্রতি রাত্রেই সারা রাতটা কেবল তা'র কথা ভেবেই কাটাই। ভাবি যে কত কি, তা তোমাদের বলা মিছে; আমার ভাবনা পরের ভাল লাগ্‌বে কেন? তবু একটা বলি; ভাল লাগে পোড়ো, না হয় না পোড়ো; কিন্তু কিছু না লিখ্‌লে সম্পাদক মশাই রাগ কর্‌বেন, তাই লিখ্‌লাম।

যখন-তখন এক-এক-বার মনে হয়, এ বিশ্ব-সংসারে কেবল সে আর আমি আছি। দুনিয়ায় আর কিছুই নাই—সে আর আমি—স এবং অহং। মনে হয়, আমরা দু'টিতে একাঙ্গ হ'য়ে, কোথায় কোন্ সুন্দর দেশে মিলেমিসে ছিলাম। সে আমায় বড় ভালবাস্‌তো। তখনও ভালবাস্‌তো, এখনও ভালবাসে—ভালবাসা একবার হোলে কি আর যায়? ছাড়াছাড়ি যদিই হয়, তা'হোলে ভালবাসাটা আরো বাড়ে বই কমে না। চোখের জলে, বিরহের আগুন বাড়ে বই নেভে না। কিন্তু তাতে আমাতে কোনো দিন ছাড়াছাড়ি নেই—হয় নি—হ'বেও না—হোতে পারেও না। কেন না আমি তা'তে আছি—সে আমাতে আছে—আর আমরা দু'টিতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছি।

সে দেশে ছিলাম বড় সুখে—মুখে হাসি বই কান্না ছিল না। সে দেশে আলো আছে—আঁধার নাই—সুখ আছে দুঃখ নাই—মিলন আছে বিচ্ছেদ নাই। এদেশেও তাই—তবে এথায় যেটা নাই, সেটাই আছে মনে কোরে আমরা আকুল—কেন না এখানে ভুল ব'লে একটা মিথ্যা জিনিস—অসৎ পদার্থ—কি-জানি-কোথা-থেকে এসেছে। ঐ ভুলের সঙ্গে ভাব ক'রেই এখানে যত ভাবের অপ্রতুল হো'য়ে গেছে। মনে পড়ে সে দেশে বড় সুখেই ছিলাম—কারণ সুখ বই ত আর কিছুই নাই—সে যে সুখময়। সুখের আর একটা নাম আনন্দ, তা'র আর একটা নাম আনন্দময়। কিন্তু তা'র আসল নাম প্রাণনাথ আর আমার নাম প্রাণময়ী। আমরা দু'টি বই যে আর কিছুই নাই এমন নয়। আমি আছি, আর আমার হাত, পা, নাক, চোখ, কান এ সব্ কি কিছুই নাই? তাও কি কখন হ'তে পারে? ছিল বই কি—আছে বই কি। আমার আটটি সঙ্গিনী আছে—তা'দের নাম—সুভাষময়ী, সুকোমলা, সুরূপা, রসিকা, সুবাসময়ী, মনোময়ী, জ্ঞানময়ী আর তেজোময়ী—তা'রা তিনটি আ আর পাঁচটি ঈ—আর আমি তাদের প্রাণময়ী—আর তিনি—আমার প্রাণেশ্বর তা'দেরও প্রাণেশ্বর—আর যে আমার হ'বে তা'রও প্রাণেশ্বর।

একদিন, আমি প্রাণেশ্বরের নিকট ব'সে আছি। তিনি বোল্লেন—"প্রাণময়ি, আমরা জাতিতে নট—অভিনয় আমাদের ব্যবসায়—এস, অভিনয় করা যা'ক।"

আমি বোল্লাম—"অভিনয় ত কর্‌বো, কিন্তু দেখ্‌বে কে?"

তিনি বোল্লেন—"দেখ্‌বার লোকের অপ্রতুল হ'বে না। ভূলোক থেকে সত্যলোক পর্য্যন্ত সকলেই দেখ্‌তে পারে। যা'র ইচ্ছা হ'বে, দেখ্‌বে। যা'র দেখ্‌তে ইচ্ছা না হ'বে, সে চোক বুজে চ'লে যা'বে।"

আমি বোল্লাম—"কিন্তু ও সব লোকে লোক কই?'

তিনি বোল্লেন—"ঐ।"

এই কথা শোনবামাত্র আমি নিদ্রিতা হ'য়ে তাঁ'র কোলে শয়ন কর্‌লাম। আমার স্বামী যাদুকর কি না?

আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লাম "তাঁ'র দেহ হ'তে অসংখ্য জীব উৎপন্ন হোয়ে সপ্ত-লোক ভ'রে গেল। তাঁ'র দেহের জ্যোতিতে জগৎ ভ'রে গেল। আমি আর আমার সখি-গণের দেহ হ'তেও আলোক-তরঙ্গ গিয়ে সেই সব জীবে মিস্‌তে লাগ্‌লো। আমি যে কতবার কত রকম বেশ ধারণ কোল্লেম তা আর কি বোলবে? শেষে এখন তিনি—মালী *—আর আমি—

আপনাদের শ্রীচরণরেণুর ভিকারী

শ্রীহীন পাগল।

শ্মশানে-কাঙ্গাল।

শোভিছে শ্মশান মাঝে দারুর শয়নে
কেগো অই সীমন্তিনী, পতি রাখি সতীরাণী,
স্মরিছে অনন্তে অন্তে মুদিত-নয়নে?
হ'ল যাঁ'র ভব-লীলা-রাত্রি আজি ভোর;
অই সেই মাতৃরূপা ইষ্টদেবী মোর।

অন্তিম-মিলন-স্থানে দারুর শয্যায়,
সতীর বিমল মন স্মরি রে পতি-চরণ
ধরার নিকটে আজি লই'ছে বিদায়।
বাজিল দুন্দুভি আদি নীরদ ভবনে;
পবিত্রিল স্বর্গ আজি সতী আগমনে।

এত দিন বুঝি নাই, মা' কাহারে বলে?
মাতৃ-লীলা হ'ল শেষ, ছাড়িল মা ছদ্মবেশ,
এখন বুঝেছি মা'ই সব ধরাতলে;
ছেলের সোহাগ-স্থল মা'ই ভূমণ্ডলে;
সকল দুঃখের শান্তি আছে মার কোলে।

সকলে বলি'ছে মোরে কেন হতভাগা?
মা মোরে ছেড়েছে ব'লে তাই কিগো সবে বলে?
"ইহার সমান নাই ধরায় দুর্ভাগা।
ভাগ্যও গেল কি মোর মা'র সঙ্গে চ'লে?
হেরেছি মায়ের সঙ্গে ভাগ্যরবি টলে।

চারিদিকে যেন "কিছু" হেরিগো অভাব।
যত বেশী "কিছু" পাই তবু পুনঃ ভাবি "তাই
অভাবে ডুবেছে যেন সমস্ত স্বভাব।
মাতৃস্নেহ হেরিতেছি স্বভাবে অভাব;
তাই মোর সংসারে গো "কিছুর" অভাব।

কাঙ্গাল।

---

* বোধ হয় আমাদের "পাগলের" এই মালীর কথাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় নবম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন।—(গৃ, স,)

সূর্য্য।

মা আমার উদিলেন আজি,
রবিরূপে হৃদি-গগনে।
কত রূপ দেখাবি গো মা,
সব কি মা তুই ত্রিভুবনে॥
ধরিস্ মা তুই যেরূপ যখন,
তাতেই ভুলে যায় নয়ন মন
আর যে কোথাও আছে কিছু,
তাতো মা থাকে না মনে॥
কিবা রক্তাম্বুজোপরে বসি পদ্মাসন ভরে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক সৌর-যোগ-পীঠাসনে॥
চারি করে বরাভয় রক্ত শতদলদ্বয়
শোভা করে তাহাতে ঝরে মহাশান্তি ত্রিভুবনে।
ত্রিলোচন মাঝে বসি শোভা করে স-কল শশী
অধরে মধুর হাসি কিবা নূপুর চরণে॥
সুকুঞ্চিত কেশ-ভার স্কন্ধে কি বাহার মার
পাপ-তাপ-অন্ধকার বিলীন দেহ কিরণে॥
অরুণ শরীর-ভাতি বিভূষণ নানা জাতি
শোভা করে শরীর পুন রক্তবাসানুলেপনে॥
মাণিক্য-মুকুট শিরে মণি হারে শোভা করে
সর্ব্বগুণৈকসাগর দয়া কর দীন জনে॥
আহা কি মূরতি রবি ব্রহ্মার সাকার ছবি
ত্রিশক্তি সতত যথা থাকেন বসি' সংগোপনে॥
বোধানন্দ দেখ্‌তে মাকে চেয়েছিলি, দেখ্‌রে তাঁকে
যা যেখানে সব যে তিনি ভিন্ন ভাব ভাবিস্ না মনে।

শ্রীবিষ্ণুরূপে মাতা, হোয়ে জগত পাতা
জাগিলেন আজি হৃদি-মাঝারে।
লোয়ে তুলসীদল সুগন্ধ গঙ্গা-জল
চল মন চল চল ত্বরা রে।
পূজ মা'র শ্রীচরণ ভব-ভয়-নিবারণ
হ'বে, রবে না ভয় কাহারে॥
বালার্ক-কোটী-দ্যুতি যিনি অঙ্গের জ্যোতি
তপ্ত কাঞ্চন, বরণে হারে।
লোচন নাহিক ভালে চূড়া চাঁচর চুলে
কিরীটে শোভে শিখী-পাখা রে।
পঙ্কজ-শঙ্খ-গদা-সুদর্শন-চক্র তথা
করে মার চারি করে শোভা রে।
ভালে মা'র ছিল শশী কৌস্তভরূপে বসি'
বক্ষে তা'র দেখ কিবা প্রভা রে।
বক্ষে শ্রীবৎস-রেখা ধ্বজাঙ্কুশ-বজ্র-লেখা
দেখ, যায় পদতলে দেখা রে।
কেয়ূরাঙ্গদ-হার কুণ্ডল তাগা তার
শোভে গায় নানা জাতি ভূষা রে।
বামে কমলা সতী দক্ষিণে বসুমতী
দেবগণ করযোড়ে নেহারে।
সম্মুখে বোধানন্দ, নারদ, সদানন্দ
নাচে গায় হরি-গুণ-গাথারে।

ব্যর্থ।

সাঁজের ছায়া ছড়িয়ে গেল ধরাখানি আঁধার ক'রে।
সারাদিনটা আকুল প্রাণে ব'সে আছি তোমার তরে।
ভেবেছিনু আলোয় সখা! বারেক তব পাব দেখা,
মিলিয়ে গেল রবির রেখা, আর কি তুমি আস্‌বে পরে?
শুকিয়ে যায় যে ফুলের মালা, গেঁথেছি যা সকাল বেলা,
এস এস এই বেলা নাথ, দলগুলি হায় যায় যে ঝ'রে।

শ্রীলালগোপাল মল্লিক।

যাদুর কুড়ুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

'গাজির কুড়ুলের' কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু 'যাদুর কুড়ুল' বোধ হয় কেহ কখন শুনেন নাই। গাজির কুড়ুল্ "নড়ে চড়ে খসে না," অর্থাৎ- কুড়ুলখানি একটি মন্দিরের গায়ে লাগান আছে, যত লোক তথায় যায় সকলেই উহাকে একবার নাড়া চাড়া দেয়, এইরূপে কত কাল যাবৎ অনবরত নাড়া চাড়া খাইয়াও উহা নড়ে চড়ে মাত্র কিন্তু খসিয়া পড়ে না। যাদুর কুড়ুলের ওরূপ কোন গুণ না থাকিলেও ইহার একটি অতি ভীষণ গুণ আছে। এই কুঠার যাহার হস্তে পড়িবে, সেই ব্যক্তি অনতিবিলম্বে কোন না কোন আত্মীয়, বন্ধু অথবা প্রভু বা গুরুকে হত্যা করিবে। সুহৃদ্-হত্যাই ইহার একমাত্র গুণ।

১৮৬১ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বুদা-পেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার হপ্‌ষ্টিন্‌কে কোন ব্যক্তি কলেজের গেট হইতে প্রায় এক রশি তফাতে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল।

অধ্যাপক হপ্‌ষ্টিন্ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কি ছাত্রবর্গ, কি সহরের অন্যান্য লোক সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত। তাঁহার এরূপ আকস্মিক ও অদ্ভুত রকমের মৃত্যুতে সকলেই নিতান্ত দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই খুনের কথা সমস্ত অষ্ট্রীয়া ও হঙ্গেরীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ের সংবাদপত্রসমূহে এই ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া ক্রিস্‌মাস্ এন্যুয়েল্ নামক ইংরাজি পুস্তিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

উল্লিখিত ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে স্কুলিং নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি, নিজ ভৃত্যের হস্তে অতি নিষ্ঠুররূপে হত হইয়াছিলেন। মৃত্যু-কালে তিনি তাঁহার অতি-যত্নে-সংগৃহীত বহুতর প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং হস্তলিখিত অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বুদা-পেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যান। সেই সকল দ্রব্য বুঝিয়া লইবার জন্য অধ্যাপক হপ্‌ষ্টিন্, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মিউজিয়ম্-আগারের সব্-কিউরেটর বা নায়েব-রক্ষক এবং রসায়ন-শাস্ত্রের সহকারী শিক্ষক মিঃ শ্লেশিঙ্গরকে সঙ্গে লইয়া, অপরাহ্ন পাঁচটা তিন মিনিটের সময় ভিয়েনা নগর হইতে যে ট্রেণ ছাড়ে, সেই ট্রেণটি ধরিবার উদ্দেশে উক্ত দিবস বেলা সাড়ে চারিটার সময় বিদ্যালয় হইতে রওনা হইয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের এই সকল বিষয়ে এত যত্ন ছিল, যে তিনি সেই বহুমূল্য দানসামগ্রী-গুলি বুঝিয়া লইবার ভার কোন কর্ম্মচারীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। শ্লেশিঙ্গরের সাহায্যে তিনি সেই সমস্ত জিনিস-গুলি ট্রেণ হইতে নামাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রেরিত একখানি শকটে বোঝাই করিয়া আনিয়াছিলেন।

অধিকাংশ পুস্তক এবং ভঙ্গপ্রবণ জিনিস-গুলি দেবদারু কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে উত্তম-

রূপে প্যাক্ করা ছিল, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলি প্রায় সমস্তই কেবল ঘাস বা খড় দিয়া জড়ান ছিল মাত্র। অধ্যাপক মহাশয়ের অতি সন্দিগ্ধ মন, পাছে কোন জিনিস লোক্‌সান হয়, এই ভয়ে তিনি রেলের কোন কর্ম্মচারীকেই উহাতে হাত দিতে দেন নাই, সুতরাং এক একটি করিয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি নামাইতে তাঁহার অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং শকটের উপর ছিলেন আর শ্লেশিঙ্গর এক একটি করিয়া জিনিস লইয়া প্ল্যাটফর্ম্ পার হইয়া তাঁহার হাতে দিতেছিলেন এবং তিনি গুছাইয়া গুছাইয়া শকটের উপর রাখিতেছিলেন। এইরূপে, যখন সমস্ত জিনিসগুলি শকটে বোঝাই করা হইল, তখন সেই শকট লইয়া উভয়ে বিদ্যালয়াভিমুখে গমন করিলেন।

অধ্যাপক মহাশয়ের সে দিন মেজাজ খুব খুসি ছিল, এবং তিনি যে এই বৃদ্ধ বয়সে এতটা খাটিতে পারিয়াছেন সে জন্য তাঁহার মনে একটু গৌরব বোধও হইয়াছিল। তাঁহারা যখন গাড়ি লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে দ্বার-রক্ষক রিন্‌মল্ এবং শিফার নামক তাহার একজন ইহুদী বন্ধু মাত্র উপস্থিত ছিল এবং তাহারাই ঐ সকল জিনিসপত্রগুলি গাড়ি হইতে নামাইতে সাহায্য করিয়াছিল। সমস্ত জিনিসপত্র গুদাম ঘরে উঠান হইলে, দুয়ারে তালা বন্ধ করা হইল। তখন অধ্যাপক মহাশয় সব্-কিউরেটরকে চাবিটি বুঝাইয়া দিয়া, হৃষ্টচিত্তে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বাসার দিকে রওনা হইলেন। শ্লেশিঙ্গরও সমস্ত ঠিক্ আছে কি না আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেলেন, কেবল রিন্‌মল্ ও তাহার বন্ধু শিফার উভয়ে রিন্‌মলের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

অধ্যাপক মহাশয় এইরূপে বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ রাত্র প্রায় ১১টার সময় একজন সৈনিক পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখ দিয়া বারিকে যাইবার সময় রাস্তার কিনারা হইতে কিঞ্চিৎ তফাতে অধ্যাপকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। দুই হাত মেলিয়া উবুড় হইয়া দেহটি পড়িয়া আছে—মাথাটা প্রচণ্ড আঘাতে দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে। আঘাতটা পশ্চাৎ হইতে পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধ হইল। বৃদ্ধের বদনমণ্ডলে তখনও শান্তিপূর্ণ হাস্যের জ্যোতি রহিয়াছে—বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও তিনি সেই দুষ্প্রাপ্য পুরাতন দ্রব্যগুলির বিষয় ভাবিয়া হর্ষান্বিত হইতেছিলেন। শরীরের আর কোনও স্থানে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না, কেবল বাম হাঁটুর উপর একস্থানে কিঞ্চিৎ থেঁৎলান মত জখম ছিল—সেটা বোধ হয় পতন-কালের আঘাতে হইয়া থাকিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার নিকট ৪৩টি স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি মূল্যবান্ ওয়াচ্ ঘড়ি ছিল, তাহা কেহ স্পর্শও করে নাই। সুতরাং কোন দুষ্টলোক অর্থলোভে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, তবে হইতে পারে যে অর্থ অপহরণ করিবার পুর্ব্বেই হয় ত কোন রূপ ব্যাঘাত ঘটায় তাহারা পলায়ন করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাই বা কি রূপে বলা যায়, প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক সময় সেই ভাবে লাস পড়িয়া থাকার পর যখন লোকে দেখিয়াছে, তখন দস্যুগণের ব্যাঘাতের কারণই বা কোথায়? ফলতঃ এইরূপ নানা প্রকার

তর্কবিতর্কের পরেও এ অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য-ভেদ করিতে কেহই সমর্থ হইলেন না। পুলিস তদন্ত করিতে লাগিল কিন্তু কোন কিনারা করিতে পারিল না। হত্যাকারীর কোন অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না, এমন কি ছন্দাংশেও এমন কোন হেতু পাওয়া গেল না, যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তিকে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে।

পরলোকগত অধ্যাপক মহাশয় নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই আপনার লেখা পড়ার চর্চ্চাতেই থাকিতেন, পৃথিবীর কাহারও সঙ্গে তাঁহার বেশী সম্পর্কই ছিল না। কাহারও মনে তাঁহার প্রতি শত্রুতা ভাবের উদয় হইতে পারে এরূপ কার্য্যও তিনি কখন করেন নাই। সুতরাং এই নির্দ্দয় হত্যা, যাহা দ্বারা হইয়াছিল, সে নিশ্চয়ই পিশাচ প্রকৃতি, এবং নরশোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্যই যে সে এই দারুণ কার্য্য করিয়াছে, এইরূপই সকলে স্থির করিলেন।

পুলিস কর্ম্মচারীরা যদিও খুনের কোনও সন্ধান বাহির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের সন্দেহ শিফারের উপর হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অধ্যাপকের চলিয়া যাওয়ার পর শিফার রিন্‌মলের ঘরে রহিয়াগিয়াছিল। শিফার জাতিতে ইহুদী আর হঙ্গেরীর লোকেরা ইহুদীদিগকে চিরকালই দেখিতে পারে না। সুতরাং অনেকেই শিফারকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিসকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কণামাত্রও প্রমাণ না পাওয়াতে পুলিস কর্ম্মচারীগণ এই বে-আইনী কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল না।

রিন্‌মল বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনিটার বা দ্বাররক্ষক ছিল, সে বহুদিনের পুরাতন চাকর এবং বয়সও অধিক হইয়াছিল, সহরের সকলেই সে জন্য তাহাকে একটু খাতির করিত। রিন্‌মল শপথ করিয়া বলিল যে শিফার বরাবর তাহার নিকটেই ছিল এবং সৈনিকের চীৎকার-শব্দ শুনিয়া তাহারা দুই জনে একত্রে বাহির হইয়া দেখিতে গিয়াছিল। যদিও রিন্‌মলকে এই খুনের ব্যাপারে লিপ্ত থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কথা কাহারও মনে একবারও উদয় হয় নাই বটে, কিন্তু শিফারের সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব থাকার জন্য, তাহাকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে হয়তো সে মিথ্যা কথা বলিতেছে, কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই ব্যাপার লইয়া সহরে খুব তোলপাড় হইতে লাগিল, এমন কি রাজপথে শিকারের বাহির হওয়া মুস্কিল হইয়া পড়িল। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ এমন আর একটি ঘটনা হইল যে সকলের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

অধ্যাপকের মৃত্যুর ঠিক নয় দিন পরে, ১২ই ডিসেম্বরের প্রাতঃকালে সেই ইহুদী শিফারকে গ্রাগুপ্লাজ নামক ময়দানের উত্তর পশ্চিম কোণে সম্পূর্ণ মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল। তাহার শরীর এমনই খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়াছিল যে তাহাকে হঠাৎ চিনিতে পারা কঠিন হইয়াছিল। অধ্যাপক হপ্‌ষ্টিনের মত তাহারাও মাথাটা দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার শরীরে আরও অনেকগুলি গভীর কোপের দাগ ছিল। দেখিলে বোধ হয় যে হত্যাকারী ব্যক্তি এতই উন্মত্ত হইয়াছিল যে বুঝিবা মৃত দেহটাকেও কুচি কুচি করিয়া কাটিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

এই ঘটনার পূর্ব্বদিন খুব বরফ পড়িয়াছিল এবং সমস্ত ময়দানটাতে প্রায় এক ফুট বরফ জাগিয়াছিল। রাত্রেও কিছু কিছু বরফ-পাত হইয়াছিল এবং মৃত ব্যক্তির শরীরের উপরে চাদরের মত এক পুরু বরফ জমিয়াছিল। বরফের উপর চলিলে পায়ের দাগ পড়ে, লোকে মনে করিয়াছিল যে পায়ের দাগ দেখিয়া আসামীকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু দিবাভাগে সেই ময়দানে বহুলোকের গতায়াত হওয়ায় এত অধিক পদচিহ্ন হইয়াছিল। যে তাহা হইতে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বাহির করা অসম্ভব। মৃত ইহুদীর পকেটেও অনেকগুলি নগদ টাকা এবং কতকগুলি বিল্ ছিল, কিন্তু তাহা কেহ স্পর্শও করে নাই। সুতরাং হপ্‌ষ্টিনের খুনের ন্যায় এই খুন সম্বন্ধেও হত্যাকারীর উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিয়া উঠা গেল না। পুলিশ প্রথমে অনুমান করিয়াছিল যে হয়তো তাহার কোন খাতক দেনার দায় এড়াইবার জন্য এই কাজ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা হইলে সে কি এমন সুবিধা পাইয়াও টাকাগুলি ছাড়িয়া যাইত?

মেরি থেরেসা ষ্ট্রীটের ৪৯ নং বাড়ীতে গুগা নাম্নী একটি বিধবা রমণীর বাড়ীতে শিফার বাস করিতেন। বাড়ীওয়ালী ও তাহার ছেলেদের এজাহারে প্রকাশ হইল, যে হত ব্যক্তি পূর্ব্বদিন সমস্ত দিবাভাগ অত্যন্ত বিমর্ষভাবে গৃহমধ্যেই ছিলেন। লোকে তাঁহার প্রতি অধ্যাপকের হত্যাসম্বন্ধে সন্দেহ করাতেই তিনি এইরূপ বিমর্ষ হইয়াছিলেন। রাত্রি ১১টার সময় তিনি বাসা হইতে বাহির হইয়া যান এবং তাহার কিছুকাল পরেই তাহারা সকলে শয়ন করিয়াছিল। পাছে পথে তাঁহাকে চিনিতে পারিলে লোকে তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করে, এই ভয়ে তিনি এত অধিক রাত্রে বাহির হইয়াছিলেন।

উপর্য্যুপরি দুইটা খুন এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে হওয়াতে কেবল বুদা-পেস্ত সহর কেন, সমস্ত হঙ্গেরীময় লোকের মনে একটা বিষম উদ্বেগ ও শঙ্কা উপস্থিত হইল। কাহার কখন কি হয়? সকলেই এই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। অধ্যাপক হপ্‌ষ্টিন্ ও ইহুদী শিফারের হত্যাকাণ্ডের পরস্পরের মধ্যে অনেক বিষয়ে এত মিল ছিল যে এই দুইটি ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় কোনরূপ সংশ্রব আছে, এরূপ মনে না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। খুনের কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না—চুরির মৎলব নাই—খুনির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না—আঘাত উভয়স্থলেই একই প্রকার ভয়ানক—একই অথবা এক প্রকারেরই অস্ত্রদ্বারা আঘাত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে একই ব্যক্তিদ্বারা একই উদ্দেশ্যে এই উভয় খুনই হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ নানাপ্রকার সন্দেহজনক আন্দোলনে সহরের লোকের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

অশ্রু।

শ্যাম-মন্ত্র।

(রাধিকার উক্তি)

কি বলিব সখি, তোরে,
(মোর) শ্যাম-মন্ত্রে উপাসনা।
সে চরণে এ জীবনে
সঁপেছি সব বাসনা।

সে নাকি গো শ্যামবর্ণ
লোকে বলে প্রাণসখি,
কোটী চন্দ্র পদতলে
মোর চক্ষে আমি দেখি;
স্বর্ণে এত লাবণ্য
কভু আর দেখেছ কি?
(তার) কালো রূপে জগত আলো
সে রূপের নাহি তুলনা!

কি চোখে সে চন্দ্র-মুখে
দেখেছি আমি সজনি,
সুখে দুঃখে বুকে মম
জাগিছে দিবারজনী;
না জেনে তা পোড়া লোকে
বলে রাধা কলঙ্কিনী;
(তারা) জানে না যে কৃষ্ণ বিনা
রাধিকার নাহি কামনা।

মনে করি প্রাণ-হরি
ভাবিব না আর মনে,
পাগলিনী হ'য়ে পড়ি
সে মুখেরি বাঁশী শুনে;
লোক-লজ্জা পরিহরি
ছুটে ফিরি অন্বেষণে,
বৃন্দা বলে, ওগো রাধে,
প্রেমেতে ভুলায় আপনা।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার B.A., B.T.

রাধা-নাম।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জানি না সে রাধা-নামে
ঝরে কত সুধারাশি!
রাধা রাধা রাধা ব'লে
দিবা-নিশি ডাকে বাঁশী।

মধুর মূরতি তার,
সে রূপের কোথা সীমা!
চাঁদেতে সে চারু-মুখে
কেমনে দিব উপমা!
চাঁদিমা কালিমা-মাখা
কোথা পাবে সে গরিমা!
কলঙ্ক-বিহীন তার,
চির পূর্ণ মুখ-শশী!

কোন্ দিনে কোন্ ক্ষণে
তার সনে হল দেখা,
কার কাছে রাধা-মন্ত্র
শিখিলাম মধুমাখা?
কবে তার প্রেম-ছবি
হৃদি-পটে হ'ল আঁকা।
কোন্ পুণ্য-ক্ষণে তার
নিরখিনু সুধা-হাসি!

পলকে পলকে তার
মনে পড়ে চন্দ্রাননে,
ভুলিতে ভাবিলে তারে
ম'রে যাই মনে মনে;
সে কি গো সামান্য নিধি
ফেলে দিব অযতনে?
বৃন্দা ভণে প্রেমগুণে
প্রাণে প্রাণে বাঁধে ফাঁসি।

শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বাস।

নিত্য ও অনিত্য।

অতি প্রাচীন কালে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানব-হৃদয়ে এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে—"এই বিশ্ববিকাশ, এই সৌন্দর্য্যময় জীবসঙ্কুল সৃষ্টি, ইহা কি সত্য?—ইহা কি নিত্য?" প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক মনুষ্য সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন আপনাকে ও পরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে। এই সৃষ্টি মধ্যে, মনুষ্য সর্ব্বদাই দেখিতেছে, আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই অথবা থাকিলেও পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন যেন জাগতিক নিয়ম। এই পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টি, ইহাই নিত্য বলিয়া মানব ধরিয়া লয়। নয়নে দর্শন করিলাম, একটি ক্ষুদ্র বীজ আজ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, ক্রমে তাহা হইতে অঙ্কুর, পরে ক্ষুদ্র বৃক্ষাকার-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখাদি সমন্বিত মহাবৃক্ষ, কিছুদিন পরে আবার লয়,—স্থূল ছাড়িয়া সেই সূক্ষ্ম-বীজ-স্বরূপে ব্যবস্থিত। এই সতত পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টির উপর নিত্যত্ব আরোপ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করিতেছি। একে ত আমরা যে চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছি তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, মানব অপেক্ষা বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি অধিক, চীল, শকুনিও বহুদূর উচ্চাকাশ হইতে আপনার খাদ্য-দ্রব্য দেখিতে পায়। গাভীর—কুকুরের শ্রবণ-শক্তি আমা অপেক্ষা অনেক অধিক। আমি শ্রেষ্ঠজীব মানব, আমি এক পোয়া পথের অধিক দেখিতে পাই না—দুই হস্ত দূরের ঘ্রাণ নাকে আসে না। এইরূপ অত্যন্ত অপক্ক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পরিবর্ত্তনশীল পদার্থসমূহের যে অনুভূতি হইতেছে, তাহাকে কি রূপে নিত্য বলি? অথচ কে যেন আমাদের চক্ষে ধাঁধাঁ দিয়া এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর পদার্থসমূহকে সত্য ও নিত্য বলিয়া অনুমিত করাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বলিয়াছেন—

"তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।"

মরীচিকায় বারিভ্রমের ন্যায় এই নশ্বর-অনিত্য-মায়ার খেলাঘরকে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই মিথ্যার সংসারকে সত্য জ্ঞানে মানব মজিয়া আছে। যেরূপ নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ স্বপ্নে যাহা দেখে, তাহা সত্য বলিয়াই মনে করিয়া শোক, ভয়, আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতির অনুভব করে; নিদ্রাভঙ্গে বুঝিতে পারে, এ স্বপ্ন, মিথ্যা, তেমনি এ জগতের এই যে লীলা-খেলা—এই স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া সংসার পাতা—এই বিদ্যার অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, উচ্চ পদবীর অহঙ্কার—এই শতসহস্র অহঙ্কারসমন্বিত এই সংসাররূপ ক্রীড়াগৃহ—এও স্বপ্ন; যখন এ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে, যখন মহাকাল আসিয়া এই নিদ্রার শেষে—এই কালরাত্রির পরিণামে, আমায় কবলিত করিবে, তখন জাগ্রত হইব, এ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে, তখন বুঝিব, "উঃ! কি ভয়ানক, কি বিস্ময়কর, কি আনন্দময় স্বপ্ন দেখিলাম।" এই স্বপ্নের খেলায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, মানব অহরহঃ কত অপকার্য্য করিতেছে ও পিতার নিকট হইতে দূরে পড়িতেছে। দয়াল পিতা সন্তানদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবিমৃষ্য-কারিতা দেখিয়াও শান্তিময় ক্রোড় পাতিয়া ডাকিতেছেন, সন্তান অগ্রাহ্য করিয়া, ক্ষণস্থায়ী

আনন্দভোগে রত হইতেছে, যখন অন্তকালে, নয়নের জ্যোতি বিলুপ্ত হইবে, কর্ণ বধির হইবে, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিতে বিরত হইবে, যখন অতীতের ঘটনাবলী সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া ভবিষ্যতের—জন্মান্তরের সূত্রপাত করিবার উদ্যোগ করিবে, তখন কি তোমার জ্ঞান হইবে? তখন কি এ সংসার অনিত্য বলিয়া বুঝিবে?

যে জীবনকে, চিরস্থায়ী মনে করিয়া কত দম্ভের সহিত কালাতিপাত করিতেছ, যে ধনসম্পত্তির অণুমাত্রও ক্ষতি করিলে, প্রতিহিংসা লইবার জন্য পৃথিবীকে রসাতলে দিতে উদ্যত হইতেছ, যখন শ্বাসবায়ু আর তোমার দেহরক্ষার জন্য যাতায়াত করিবে না, যখন এই প্রপঞ্চ, পঞ্চে মিশিবার জন্য পুনরায় চেষ্টিত হইবে, তখন কি তোমার জ্ঞান হইবে? যখন এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমন্বিত, তরুলতাকীটপতঙ্গপূর্ণ বিশাল ধরণী তোমার চক্ষের পরোক্ষ হইবে, তখন মানব, তখন কি তুমি বুঝিবে, ইহা কিছুই নয়—স্বপ্নের বিকার—অনিত্য? যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে, ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছানুসারে আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে, মানবীয় জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় তোমার দেহ-ঘটে আছে, ততক্ষণ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কি লইয়া মজিয়া আছ? কি অপার্থিব ধন পদদলিত করিয়া, নশ্বর—নিমেষমাত্র আয়ুষ্মান অসার পদার্থে মত্ত হইয়া আছ? যতক্ষণ সময় আছে, ততক্ষণ জীবনের সমালোচনা আরম্ভ কর ভাই, দেখিবে, সমস্ত জীবনটাই মিথ্যা কাটিয়াছে। যতক্ষণ রসনায় বল আছে, ততক্ষণ ভাইবন্ধুগণের সহিত কেবল কি সত্য, কি নিত্য বস্তু, সেই বিষয়ে বিচার করিয়া স্থির হও। স্বার্থবশে অপরকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিও না। ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম।"

যাহারা মূর্খ যাহাদের বর্ণজ্ঞান নাই, যাহাদের জ্ঞান স্বভাবের শোভায় মণ্ডিত, মনোহর বাক্‌পটুতার দ্বারা তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইও না। তুমি বিদ্বান, তুমি জগতের লোকের কাছে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, তুমি যাহা করিবে, যে দৃষ্টান্ত দেখাইবে, সাধারণ ব্যক্তি সেই পথ আশ্রয় করিবে। সেই জন্য বড়কে বড় সাবধানে চলিতে হয়।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

তুমি যাহা দেখাইবে, লোকে তাহাই করিবে। বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিও না।

কিন্তু এ সংসার অনিত্য। শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতার কত আনন্দ! জননী দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া, প্রসব-বেদনার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, সন্তানের মুখ দেখিয়া কত আনন্দিতা, সব যন্ত্রণা ভুলিয়া, সেই সদ্যোজাত শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেন। জনকজননী দিনে দিনে সেই শিশুর বয়োবৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া মনে-মনে কত আশার বাসা বাঁধেন। সেই সন্তান ক্রমে বাল্য, কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। তারপর, অকস্মাৎ এক দিন যুবক সন্তান জনকজননীর চক্ষের সমক্ষে তাহাদের বক্ষে শত শেল বিদ্ধ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। জনকজননীর হাহাকার সার হইল। এই, নিত্যতা! এই নিত্যতার জন্য আবার অত্যাচার, অবিচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কিছুতেই আমরা পশ্চাদ্‌পদ হই

না। ইহাতেও চৈতন্য হয় না। তাই ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"যেমন উটের কাঁটা ঘাস খাওয়া।" কাঁটা ঘাস খাইতে খাইতে ওষ্ঠ কাটিয়া দরদরিত ধরে রক্তপাত হইতেছে, তথাপি সে কাঁটা ঘাস ছাড়িবে না। এত মধুরতা সেই কাঁটা ঘাসে সে পাইয়াছে। সেইরূপ এই জগত সংসারে, কত আঘাত, কত বিপদ, সব অবাধে সহ্য করিয়া উষ্ট্রবৃত্ত আমরা সেই সংসার-কূপে মগ্ন আছি।

বকরূপী ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কি-মাশ্চর্য্যং" এই প্রশ্নটি ছিল। পাণ্ডুতনয় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥

"দেখি' প্রতিদিন, কত নারী-নর
যাইতেছে যম-ঘর,
তবু ভাবে মনে রব চিরদিন
কিমাশ্চর্য্য এর পর।"

এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। অন্ধবৎ স্বেচ্ছায় এই বিষয়কে আলিঙ্গন করিয়া আমরা ইহাতেই সুখী হইতে চাই। মার্জ্জারবৃত্ত আমরা, আড়াই পদ না যাইতে যাইতেই সব ভুলিয়া যাই। বার বার এই জ্বালা সহিতেছি, কবে চৈতন্য হইবে? কবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত সুপথ অবলম্বন করিয়া মানব ধন্য হইবে?

এই অনিত্যে নিত্য বোধ কাহার খেলা? এই খেলা লইয়া মহামায়া বিরাট লীলা করিতেছেন। মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধচিত্ত মানব আপন দেবত্ব বিস্মৃত হইয়া, জ্ঞানহীন পশুর ন্যায়—স্রোতের তৃণের মত—এই মায়ার স্রোতের সঙ্গে উদ্বেলিত ও প্রশান্ত হইতেছে। এই ত গেল মায়ার খেলা, অনিত্যে নিত্য বোধ। কিন্তু প্রকৃত নিত্য কোথায়?

যৌবনের প্রারম্ভে, পশুবলদৃপ্ত যুবাপুরুষকে-জিজ্ঞাসা কর "নিত্য কি? সত্য কি?" সে বলিবে, এই শতসহস্র সম্ভোগের উপাদানপূর্ণ, শতসহস্র বাসনা-পরিতৃপ্তির উপযোগী দ্রব্যে পূর্ণ, এই সংসারই নিত্য। যাহা চক্ষে দেখিতেছি, হৃদয়ে অনুভব করিতেছি, তাহাই সত্য ও নিত্য, অন্য কিছু নিত্য নাই। কিন্তু সেই যুবক মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিলে, মনে মনে প্রশ্ন করিবে,—"তবে কি এই অলৌকিক বিকাশ, সত্য নয়? মৃত্যুই কি সকলের পরিণাম?" অশীতিপর বৃদ্ধ, যাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল, দেহের শক্তি হ্রস্ব, বাসনার দাস হইয়া, অতৃপ্ত কামনা লইয়া, ক্রমে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে, "সকলই অদৃষ্ট। অদৃষ্টের ফেরে যা'ছিল, এখন চলিলাম। কোথায় কি করিতে? তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর।" এই প্রশ্নের মীমাংসা কোথায়? সকলই অনিত্য, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, তবে কোথাও কি নিত্য পরিবর্ত্তনহীন দ্রব্য নাই? মানব-হৃদয়ের গুহ্যতম দেশ হইতে এই প্রশ্ন উদিত হয়। নিত্য কি? চিরস্থায়ী কি? অনন্ত কামনায় সাক্ষী কে?

পুরাকাল হইতে যেখানে ইতিহাস আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারে না—সত্যযুগের মহামুনিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের জড় বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সকলে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছেন। এই পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য বিশ্বব্যাপারে অতীত, কোথাও কিছু নিত্য স্থিতিশীল বস্তু নাই কি?

তুমি বলিতে পার, এই অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? কি লাভ, কি স্বার্থ? স্বার্থ ও লাভ কিছু আছে বৈকি? নহিলে মহাপুরুষগণ সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা করিলেন কেন? জগতের নিয়মানুসারে মনুষ্যজীবনে সুখ ও দুঃখ দেখা যায়। জীবনে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ কেহ পায় নাই—পাইতে পারে না। চির-কাল দুঃখও কেহ ভোগ করে না। মানব স্বভাবতঃ আনন্দপ্রিয়, সুখের অনুসন্ধান সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সুখের আশায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত হয়—ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া এই গতিশীল পদার্থসমূহে নিত্য সুখ পাইবার আশায় অশেষ দুর্গতির দাস হয়।

মানব কি আপনার স্বরূপতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া অনন্তকাল বাস করিবে? ইহা হইতে কি নিষ্কৃতি নাই? আর্য্য ঋষিগণ এ প্রশ্নেরও মীমাংসা করিয়াছেন।

এই জড় দেহ অণু-পরমাণু-সমবায়, কি শক্তি দ্বারা ইহা গতিশীল হইয়াছে? এই জড়ের অন্তরালে অবশ্য কোন শক্তি কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তিবলে ইহা গতিশীল হইয়াছে। সেই শক্তি নিত্য সেই নিত্য-শক্তির সন্ধান জন্য বেদান্তের সৃষ্টি—"একং" এই তত্ত্বে উপনীত হওয়াই, বেদান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই একই নিত্য। এই নিত্যানু-সন্ধানের শেষফল শ্বেতাশ্বেতর এক কথায় বলিয়াছেন—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতো পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্রং পুরুষং মহান্তং॥" (আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

টুক্ টুক্ টুক্।

পূর্ব্ব দিকে উঠে রবি লোহিত বরণ।
মরি কি সুষমা ভাতি নয়ন-রঞ্জন॥
গোধূলির রক্তিমাভা বড়ই সুন্দর।
মুগ্ধ করি, হেরি' ছবি, প্রফুল্ল-অন্তর॥
সরোবরে শতদল, স্থলে রক্ত জবা।
সুললিত, কি লোহিত, প্রাণ-মন-লোভা।
নারীর সীমন্তে হেরি হিঙ্গুলের টিপ্।
মনে হয় জ্বলে বুঝি সুখের প্রদীপ॥
ফাগুনে ফাগুয়া খেলা কিবা লালে লাল।
খেলে অপরূপ খেলা নন্দের দুলাল॥
সকলের চেয়ে প্রাণে বাড়ায় কৌতুক্।
রাঙ্গা-পা-দু'খানি লাল টুক্ টুক্ টুক্॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে

ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্।

তপস্যাচরণে মহাভাগ ভগীরথ
ব্রহ্মারে করিয়া তুষ্ট, পূর্ণ মনোরথ॥
মোক্ষ-বিধায়িনী মাতা পতিত-পাবনী।
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু হ'তে আসে সুরধুনী॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করি'।
পাছে যান্ ভাগীরথী জগৎ উদ্ধারি'॥
ঐরাবতে ভাসাইয়া চলে বেগবতী।
হিমালয়ে গোমুখীর দিকে হয় গতি॥
ভারতে, ভারতী শুনি, করিল প্রবেশ।
ভাগ্য-ফলে জগতের কল্যাণ অশেষ॥
গোমুখীর মুখ হ'তে মধুর, মধুর।
পূত-বারি-ধারা ঝরে ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

যবনিকার অন্তরালে।

এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎটা যবনিকা। ইহার অন্তরালে সূক্ষ্ম জগৎ আছে। এই সূক্ষ্ম জগতে যে কত রহস্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। ইহার দু'একটি পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

শিক্ষিতের হেতুবাদ।

প্রায় সকল দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, মাদুলি বা কবচাদি ধারণ করিবার একটা প্রথাবহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। রোগমুক্তির জন্য, দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য, অপদেবতার ভয় হইতে আত্মরক্ষার জন্য, কোন অভীষ্ট কার্য্যে সাফল্য লাভের জন্য,—নানা উদ্দেশ্যে কবচ ধারণ করা হয়। আধুনিক-শিক্ষিত-সম্প্রদায় কিন্তু, এ প্রথাটাকে বড় সু-নজরে দেখেন না, বরং কুসংস্কার ও মূর্খতা বোধে অন্তরের সহিত ঘৃণাই করেন। এ জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আমরা দোষ দিই না, বরং প্রশংসাই করি। কারণ, তাঁহারা হেতুবাদী,—যুক্তিবাদী; না বুঝিয়া, অন্ধভাবে কিছুই বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহারা সকল বিষয়ের কারণ জানিতে চান। তাঁহারা বলেন, "কেন এরূপ হইবে, কি কারণ-পরম্পরাদ্বারা এই দুইটি ঘটনা পরস্পর সম্বদ্ধ (যেমন উত্তাপের সহিত বাষ্পের, বাষ্পের সহিত মেঘের সম্বন্ধ), ইহা যতক্ষণ না বুঝিব, ততক্ষণ কাহারো মুখের কথায় বিশ্বাস করিব না। যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসই সকল অনর্থের মূল, কারণ, উহাই জগতে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আনিয়াছে।" ঠিক কথা। এই যে, সকল বিষয় বুঝিবার চেষ্টা,—সকল বিষয়ের কারণ জানিবার ইচ্ছা,—ইহা একটি ঐশী শক্তি, ইহা ভগবানের অমূল্য দান। ইহা যেন চিরকাল মানবে অক্ষুণ্ণ থাকে।

বৈজ্ঞানিকের গোঁড়ামি

কিন্তু মানবের দোষ এই যে, সে মনকে সর্ব্বদা নূতন সত্যের, নূতন আলোকের জন্য উন্মুক্ত (receptive) রাখিতে পারে না। যেরূপ ভাবিতে, যেরূপ বিচার করিতে, বহুকাল অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাকেই চরম সত্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকে। তাহার জ্ঞানের বাহিরে যে সকল সত্য আছে, তাহা অনুসন্ধান করা দূরে থাক, সম্ভব বলিয়াও মনে করে না। যদি কোনও বৈজ্ঞানিককে বলা যায়, এক ব্যক্তি বিনা অবলম্বনে ভূমি হইতে ১৫ হাত উচ্চে উঠিয়াছিল, বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই আমাকে পাগল বলিবেন বা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কারণ, তিনি কেবল মাধ্যাকর্ষণের নিয়মই জানেন এবং এই নিয়মের বাহিরে যে কিছু সত্য আছে বা থাকিতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতেই পারেন না। অর্থাৎ তিনি গোঁড়ামির একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়া, নূতন বা গুহ্য সত্যকে আর মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। কিন্তু যিনি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তিনি কখনই এরূপ করিবেন না। একটা ঘটনা তাঁহার নিকট যতই নূতন, অলৌকিক বা অসম্ভব হউক না কেন, তিনি কখনই তাহা উড়াইয়া দিবেন না। তিনি ধীরচিত্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, তন্ন তন্ন করিয়া, তাহা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবেন, স্থিরভাবে চিন্তা ও বিচার করিবেন এবং যত দিন প্রকৃত কারণে উপনীত না হন, তত দিন নিশ্চিন্ত হইতে

পারিবেন না, তত দিন সে সম্বন্ধে কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা (final opinion) দিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মদাতা লর্ড বেকন (Lord Bacon) তাঁহার এড্‌ভান্সমেণ্ট অব লার্নিং (Advancement of Learning)-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সকলকেই তাহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কবচ ধারণ।

এখন, কবচ ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে উপকার পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, ইহা একটি প্রকৃত ঘটনা (fact)। সুতরাং এই ঘটনাটি কুসংস্কার বলিয়া একবারে উড়াইয়া না দিয়া, দেখা যাক ইহার কোনও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা (rational explanation) পাওয়া যায় কিনা? অনেক দিব্যদর্শী মহাত্মা (clairvoyants) এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই অনুসন্ধান ফল নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

রোগোৎপত্তির কারণ।

প্রথম দেখা যাক, অসুস্থ দেহ কাহাকে বলে? কি হইলে দেহ অসুস্থ হয়? আমরা অসুস্থতার মোটামুটি দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। ১ম, আভ্যন্তর কারণ বা দেহ-যন্ত্রাদির স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদনে অক্ষমতা, ২য়, আগন্তুজ কারণ অর্থাৎ বহির্দেশ হইতে কোন বিষাক্ত পদার্থ প্রভৃতিশ রীরমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া। যদি শরীরের যন্ত্রগুলি স্বস্ব নিরূপিত কার্য্য (যেমন যকৃৎ পিত্তনিঃসারণ কার্য্য, হৃৎপিণ্ড রক্তসঞ্চালন কার্য্য, কিড্‌নি মূত্রনির্ম্মাণ-কার্য্য, অন্ত্র মলনির্গমন-কার্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি) সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে দেহের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, দূষিত পদার্থগুলি সঞ্চিত হইয়া, দেহটি রোগগ্রস্ত করে। আবার এরূপও হইতে পারে, যে যন্ত্রগুলি স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য ঠিক করিয়া যাইতেছে, অথচ বহির্ভাগ হইতে কোন বিষাক্ত পদার্থ (যেমন কলেরা, বসন্ত, সান্নিপাতিক জ্বর, প্লেগ প্রভৃতির বীজাণু) হঠাৎ দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রোগ আনয়ন করিল এবং সব যন্ত্রগুলিকে বিকৃত করিয়া দিল, তাহাদিগকে অবাধ-কর্ত্তব্য-পালনে অপারগ করিয়া ফেলিল।

রোগনিবারণের উপায়।

অসুস্থ দেহকে সুস্থ করিবার উপায় কি? দূষিত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া এবং যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা। দূষিত পদার্থকে বাহির করিলেও যতক্ষণ যন্ত্রগুলি ঠিক কার্য্যক্ষম না হয়, ততক্ষণ দেহ সুস্থ হয় না, পুনরায় রোগ হইতে পারে। কিন্তু যন্ত্রগুলিকে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়, তাহা হইলে দূষিত পদার্থ অনেক সময় আপনা-আপনিই বহির্গত হইয়া যায়। এই জন্যই চিকিৎসাবিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, বিরেচক, বমনকারক, স্বেদকারক, মূত্রকারক প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ ততই কমিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনাই রোগ-নিবারণের প্রধান. বোধ হয়, একমাত্র উপায়।

স্নায়ুশক্তি।

যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইলে, বুঝিতে হইবে, ইহারা কোন্ শক্তিতে কার্য্য করে? সে শক্তি কোথা হইতে আইসে? কি কি কারণে সেই শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়? সেই শক্তিকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিবার উপায় কি? আধুনিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র বলেন

স্নায়ুশক্তি (nerve power) দ্বারাই যন্ত্রগুলি স্ব স্ব কার্য্য করে। কিন্তু এই স্নায়ুশক্তি আইসে কোথা হইতে? বিজ্ঞান নীরব।

প্রাণশক্তির ক্রিয়া।

সূক্ষ্মদর্শীরা (occultists) বলেন, আমাদের স্থূল দেহের মধ্যে ঠিক ইহার অনুরূপ একটি ইথারের দেহ (Etheric double) আছে। শাস্ত্রে ইহারই নাম প্রাণময় কোষ। এই কোষে একটি শক্তি অনবরত ক্রিয়া করিতেছে। এই শক্তির নাম প্রাণ। এই শক্তিই স্নায়ুপথ দিয়া স্থূল দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া, স্থূলদেহকে সজীব ও কার্য্যক্ষম রাখিয়াছে। এই প্রাণশক্তি দ্বারাই যকৃৎ, অন্ত্র, হৃদয়াদি স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে। এই শক্তির একটি নিয়মিত বেগ বা স্পন্দন আছে। যতক্ষণ প্রাণ নিয়মিত রূপে স্পন্দিত হয়, ততক্ষণই যন্ত্রাদি স্ব স্ব কার্য্য যথাযথ পালন করিতে পারে। ইহারই নাম সুস্থাবস্থা। কিন্তু যদি কোনো কারণে এই স্পন্দনের ব্যতিক্রম হয়, প্রাণের বেগ কমিয়া বা বাড়িয়া যায়, অমনি যন্ত্রগুলি বিকৃত হইতে থাকে এবং দীর্ঘকাল এরূপ থাকিলে, কোন না কোন পীড়া প্রকাশ পায়। শরীরে কোনো বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করিলে রোগ উৎপন্ন হয় কেন? বিষাক্ত বস্তুটি প্রাণময় কোষে একটি বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল স্পন্দন উৎপাদন করে। তখন প্রাণের সহিত এই স্পন্দনের একটা সংগ্রাম বাঁধে। এই সংগ্রামে যদি প্রাণ জয়ী হয় তবেই মঙ্গল, বিষাক্ত বস্তুটাকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। আর যদি বিষের জয় হয়, তাহা হইলে উহা প্রাণের স্বাভাবিক স্পন্দনকে রুদ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সুতরাং যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, দেহের মৃত্যু ঘটে।

উদাহরণ—হোমিওপ্যাথি।

অতএব দেখা যাইতেছে, মানব যখন প্রাণের নিয়মিত স্পন্দনটি ঠিক জানিতে পারিবে এবং ইচ্ছামাত্র নিজের বা অপরের দেহে ঐ স্পন্দনটি সঞ্চারিত করিতে পারিবে, তখন্ আর কাহাকেও রোগে ভুগিতে হইবে না। চিকিৎসাটা আর কিছুই নহে, প্রাণের বিকৃত স্পন্দনকে নিয়মিত করা, স্বাভাবিক পথে আনা। সমস্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রই জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক ঠিক তাহাই করিতেছে—বিকৃত স্পন্দনকে সাম্যাবস্থায় আনিতেছে। মনে করুন, হোমিওপ্যাথিক ১০০০ ক্রমের এক ফোঁটা ঔষধে একটি রোগ আরাম হইল। এই ফোঁটাটিতে ঔষধ কিছু আছে কি? কিছুই না। তবে আছে কি? যাহা দরকার তাহাই আছে, আছে শক্তি, আছে স্পন্দন, উহার মধ্যস্থ ইথারের তীব্র ও বেগবান স্পন্দন। এই স্পন্দনই প্রাণময় কোষের বিকৃত স্পন্দনকে নিয়মিত করিল, স্বাভাবিক অবস্থায় আনিল, সুতরাং রোগ সারিয়া গেল। শুনা যায় ডাক্তার স্যাল্জার একটি রোগীকে দেখিতে গিয়া দেখিলেন, রোগী অচেতন ও নিস্পন্দ, ঔষধ খাইবার শক্তি নাই। তখন ডাক্তার তাঁহার রুমালে কয়েক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া, ঐ রুমাল রোগীর নাকের কাছে নাড়িতে লাগিলেন। ইহাতেই রোগীর চেতনা হইল, তিনি অনেক সুস্থ হইলেন। আবার দেখা গিয়াছে, কোন একটা পাতা বা শিকড়ের ঘ্রাণ লইয়া অনেকে পালাজ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি যখন কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ খুব বাড়িয়া-

ছিল, অনেক ডাক্তার ইগ্‌নেসিয়া ফল ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, এই ফল ধারণ করিলে প্লেগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা হতবীর্য্য হইয়া যায়। এই সকল ঘটনা হইতে কি ইহাই বুঝা যায় না যে প্রাণময় কোষে অনুকূল স্পন্দন উৎপাদন করিয়াই ঔষধাদি রোগ নিবারণে সমর্থ হয়?

তাড়িত চিকিৎসা -- ক্রমোপ্যাথি।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "উহা দ্রব্যগুণ বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। ইথারের স্পন্দনে যে এইরূপ ঘটে তাহার প্রমাণ কি?" বলি, দ্রব্য কোথায় যে রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে? পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা দ্রব্যের একটি পরমাণুও শরীরে প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। কিন্তু রোগ যে আরাম হয়, তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। আচ্ছা, আরও কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আজকাল যে স্থানে স্থানে তাড়িত-চিকিৎসা (Electric treatment) প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। রোগীর শরীরের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করিয়া রোগ আরাম করা হয়। তড়িৎ-শক্তিটা কি? উহা কি কেবল ইথারের একটি বিশিষ্ট স্পন্দনমাত্র নহে? আবার, আর এক রকম চিকিৎসা আছে, তাহার শক্তিও বোধ হয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার নাম ক্রোমোপ্যাথি (chromopathy) বা বর্ণ-চিকিৎসা। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের কাচের শিশিতে বিশুদ্ধ জল রাখিয়া, ঐ শিশি গুলি ২।১ দিন রৌদ্রে রাখিতে হয়। এই জলই ঔষধ। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন শিশির জল রোগীকে খাওয়াইতে হয়। ইহাতেই রোগ সারিয়া যায়। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে ভিন্ন ভিন্ন শিশিতে ইথারের ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন সঞ্চিত করা হইয়াছে লাল কাচের ভিতর দিয়া যেরূপ স্পন্দন আসিয়াছে, নীল কাচের ভিতর দিয়া সেরূপ আইসে নাই। এই জন্যই বিভিন্ন জলের বিভিন্ন গুণ; কোনটি জ্বরে, কোনটি উদরাময়ে, কোনটি বা সর্দ্দিকাসিতে প্রয়োজ্য। রোগী মস্তকের যন্ত্রণায় অস্থির, মস্তকে নীল বর্ণ কাচের মধ্য দিয়া নীল আলোক প্রদত্ত হইল। কয়েক মিনিট মধ্যে সে যন্ত্রণা গেল, রোগী ঘুমাইল। নীল আলোকের এ শক্তিকে ইথর-স্পন্দন বই কি বলিব?

মেস্‌মেরিক চিকিৎসা জলপড়া'।

অতএব, প্রাণময় কোষে অনুকূল স্পন্দন উৎপাদিত করিলেই রোগ সারিয়া যায়। যাঁহার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। ততদূর কষ্ট না করেন, তাহা হইলে যেন ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক মেস্‌মেরিক চিকিৎসার (curative mesmerism-এর) বৃত্তান্তগুলি এক বার পাঠ করেন। ডাক্তার রোগীকে কোন ঔষধ খাইতে দেন না, এমন কি স্পর্শও করেন না। তিনি রোগীর নিকট বসেন, কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, অথবা রোগীর উপর শূন্যে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন (pass) করেন। ইহাতেই রোগ সারিয়া যায়। এইরূপ অদ্ভুত আরোগ্যের সহস্র সহস্র বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং শত শত ব্যক্তি এই চিকিৎসায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এ দেশেও এরূপ চিকিৎসকের অপ্রতুল নাই। ইহাঁরা বলেন, চিকিৎসক তাঁহার নিজ দেহের উত্তম তড়িৎ (good animal magnetism)

রোগীর দেহে সঞ্চালিত করিয়া, রোগ আরাম করেন। বস্তুতঃ দেখা যায় এরূপ চিকিৎসার পর, চিকিৎসক একটু দুর্ব্বলতা অনুভব করেন। ইহার কারণ এই, যে তাঁহার নিজের প্রাণময় কোষ হইতে কতকটা অনুকূল-শক্তি (প্রাণ) রোগিদেহে সঞ্চারিত করিয়া দেন। ইহাতে রোগীর প্রাণময় কোষে অনুকূল স্পন্দন উৎপাদিত হওয়ায় রোগী সুস্থ হন বটে, কিন্তু চিকিৎসক ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ও অবসাদ বোধ করেন। জল একটি উত্তম স্পন্দন-বাহন, অর্থাৎ স্পন্দন ধারণ করিয়া রাখিবার জলের একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। এইজন্য এইসকল চিকিৎসক অনেক সময় জল শক্তিযুক্ত (magnetised) করিয়া রোগীকে খাইতে দেন। ইহাতেই রোগ আরাম হয়। যাঁহারা আমাদের দেশের "জল-পড়ায়" বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এখন কি বলিবেন ? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের শত শত পরীক্ষার ফলকে উড়াইয়া দিবেন কি ? অথবা, এটা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিবেন ?

যদি স্বীকারই করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি জলে শক্তিসঞ্চার করা সম্ভব হয় তবে, যে কোন উপযুক্ত বস্তুতে (যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তরাদিতে) ইহা করা সম্ভব নয় কেন ? যাঁহারা সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে পান, কিরূপে শক্তি সঞ্চার করিতে হয় জানেন, এবং কিরূপ স্পন্দন কোন্ রোগের প্রতিষেধক অবগত আছেন, তাঁহারা কি উপযুক্ত বস্তু (good vehicles) বাছিয়া লইতে পারেন না ? অথবা ঐ সকল পদার্থে ইচ্ছামত শক্তি সঞ্চার করিতে অপারগ ? তাহাই যদি হয়, তবে কবচ আর কাহাকে বলে ? কোনও ধাতু বা প্রস্তর বা কোনও উপযুক্ত বস্তুতে যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি (বা মহাপুরুষ) এরূপ একটি বিশিষ্ট শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন যে উহার স্পন্দন, ধারয়িতার দেহের বা মনের বিকৃত স্পন্দনকে নিয়মিত করে, সেই ধাতু বা প্রস্তরকেই কবচ বলে। তবে, কবচ অসম্ভব কিসে ?

কবচ কাহাকে বলে।

আমরা এ পর্য্যন্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কবচের দ্বারা আমাদের স্থূল দেহের রোগ নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাই কবচের একমাত্র কার্য্য নহে। মনের উপরও ইহা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কিরূপে ইহা ঘটে বুঝিতে গেলে মনটি কি বস্তু এবং কবচের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি ? আগে বুঝা প্রয়োজন। অতএব, সূক্ষ্ম জগৎ ও সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলিব।

মনের উপরও কবচ ক্রিয়া করে।

আমরা সাধারণতঃ পদার্থের তিনটি মাত্র অবস্থা জানি,—কঠিন; তরল ও বাষ্পীয়। কঠিন অপেক্ষা তরল সূক্ষ্ম এবং তরল অপেক্ষা বাষ্প সূক্ষ্ম। (এক খণ্ড স্বর্ণকে উত্তাপ দ্বারা তরল করিলে, উহা লঘু ও পাতলা হয় এবং আরও তাপ দিয়া ঐ তরল স্বর্ণকে বাষ্প করিতে পারিলে উহা আরও লঘু ও সূক্ষ্ম হয়। সেই অবধি আমরা জানি।) কিন্তু বাষ্প অপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান ও স্বীকার করেন। এই সূক্ষ্ম পদার্থের নাম ইথার। ইথারের চারিটি শ্রেণী আছে। ইহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। প্রথম শ্রেণীর ইথর অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় এবং তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ সূক্ষ্মতর। অতএব আমরা সাতটি পদার্থ (বা পদার্থের সাতটি

ক্ষিতিতত্ত্ব ও স্থূলদেহ।

অবস্থা) পাইলাম। কঠিন, তরল, বাষ্প এবং চারি প্রকার ইথার। এই সাতটি পদার্থের নাম ক্ষিতিতত্ত্ব। ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত তাহার নাম ভূলোক (physical place)। আবার ক্ষিতিতত্ত্বের নির্ম্মিত আমাদের এক একটি দেহ আছে। ইহার নাম স্থূলদেহ। স্থূলদেহের দুইটি কোষ আছে,—অন্নময় ও প্রাণময়। অন্নময় কোষটি কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থে নির্ম্মিত। প্রাণময় কোষটি অন্নময় কোষের ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। এই প্রাণময় কোষে প্রাণশক্তি নিয়ত স্পন্দিত থাকিয়া স্থূলদেহকে সজীব রাখিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পূর্ব্বে যে সূক্ষ্মতম (৪নং) ইথারের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাই যে শেষ তাহা ভাবিবেন না। উহা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে। এই পদার্থের নাম অপ্‌তত্ত্ব। ইথার যেমন ইট, কাট, সোনা, লোহা, প্রভৃতি সকল পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ এই অপ্‌তত্ত্ব (তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বলিয়া) ইথারের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অপ্‌তত্ত্বের ও সাতটি শ্রেণী আছে,—একটি অপেক্ষা আর একটি সূক্ষ্ম। এই অপ্‌তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত একটি জগৎ আছে। ইহার নাম ভুবর্লোক (Astral plane)। এই লোকেও নানাবিধ জীব বাস করে। ইহাদের দেহও অবশ্য অপ্‌তত্ত্বে নির্ম্মিত। ভূত, প্রেত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। তাহ'লে ভুবর্লোকটি আছে কোথায়? ভূর্লোকের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট, পৃথিবীর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত

অপ্‌তত্ত্ব ও ভুবর্লোক।

হইয়া আছে। হয় ত আমাদের ঘরের মধ্যেই কত ভূত প্রেত বেড়াইতেছে, হয় ত আমাদের দেহের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অথচ আমরা জানিতে পারিতেছি না।

আবার, এই অপ্‌তত্ত্ব অপেক্ষা সহস্র সহস্রগুণ সূক্ষ্ম ও লঘু আর এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহার নাম তেজস্তত্ত্ব। ইহার দ্বারা নির্ম্মিত একটি জগৎ আছে। তাহার নাম স্বর্লোক বা স্বর্গ। স্বর্গ ভুবর্লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং এখানেও অসংখ্য জীবের বাস। এইরূপে মহঃ, জন প্রভৃতি উচ্চতর লোক আছে। তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত এবং একটির মধ্যে আর একটি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেই জীবের বাস আছে। তবে এই সকল জীব মানবের চেয়ে অনেক উন্নত, অনেক শ্রেষ্ঠ। আদিত্য, বসু রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ মুক্তপুরুষ, ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং ইন্দ্র মনু প্রজাপতি প্রভৃতি লোকপালগণ এই সকল উচ্চতর লোকে বিরাজমান।

তেজস্তত্ত্ব ও স্বর্লোক।

সে কথা যাক্। এখন, আমাদের দেহের কথা বলি। এই অপ্‌তত্ত্বে ও তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত আমাদের প্রত্যেকের এক একটি দেহ আছে। এই দেহের নাম সূক্ষ্মদেহ। ইহা ডিম্বাকার (oval) এবং স্থূল দেহ অপেক্ষা কিছু বড়। সুতরাং ইহা স্থূল দেহের ভিতরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া বাহিরেও কিছুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সূক্ষ্মদেহের নামই মন। সুতরাং **মন একটা পদার্থ একটি শরীর**। এই জন্যই ইহার নাম মনোময় কোষ। মৃত্যুর পর, মানব এই সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়াই প্রথমে ভুব-

লোকে, পরে স্বর্গে গমন করে। জীবিতাবস্থায় সাধারণ মানবগণ স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহটি আলাদা বা পৃথক করিতে পারে না। কিন্তু যোগী ও সাধকেরা তাহা পারেন। সুতরাং ইচ্ছামাত্র তাঁহারা স্থূলদেহটি ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে ভুবর্লোকে ও স্বর্লোকে বিচরণ করিয়া আসিতে পারেন। এই সময় তাঁহাদের স্থূলদেহ জড় ও নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনই চিন্তা

এই যে আমাদের সূক্ষ্মদেহ, এটি সর্ব্বদা নানাভাবে, নানাপ্রকারে স্পন্দিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন বিভিন্ন প্রকার পরমাণুব উপর নির্ভর করে। এক একটি স্পন্দনই এক একটি চিন্তা—এক একটি বাসনা। এক প্রকার স্পন্দনের নাম ক্রোধ, আর এক প্রকার স্পন্দনের নাম লোভ, তৃতীয় প্রকার স্পন্দনের নাম স্নেহ ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ স্পন্দনই বিশেষ বিশেষ ভাব—বিশেষ বিশেষ চিন্তা। যদি কেনো স্পন্দনই না থাকে, কোনো ভাব বা চিন্তা থাকিবে না। আবার, যদি এক প্রকার স্পন্দনকে আর এক প্রকার স্পন্দনে পরিবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। আমার ক্রোধ হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নয়, আমার সূক্ষ্মদেহটি একটি বিশেষভাবে স্পন্দিত হইতেছে। যদি এই স্পন্দনটিকে কেহ থামাইয়া দেয়, তাহা হইলে রাগও থামিয়া যাইবে। অথবা যদি কেহ ইহাতে দয়ার স্পন্দন উৎপাদন করিয়া দেন, তাহা হইলে ক্রোধের স্থানে দয়ার উদ্রেক হইবে।

অতএব বুঝা গেল আমাদের সূক্ষ্মদেহ নিয়তই স্পন্দিত হইতেছে। তাহার ফলে —ক্রোধ, হিংসা, দয়া, ভক্তি, যুক্তি, কল্পনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাবে আলোড়িত হইতেছে। এই স্পন্দনগুলি যে কেবল সূক্ষ্মদেহে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা নহে। যেমন জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে ঐ স্পন্দন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন ভুবর্লোকের বায়ুমণ্ডলে (atmosphere-এ) ছড়াইয়া পড়িতেছে। এবং অপরের সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিয়া অনুরূপ তরঙ্গ তুলিতেছে।

মানবের দায়িত্ব

মানব! এইবার তোমার কঠিন দায়িত্ব একবার ভাবিয়া দেখ! তুমি ভাব মনোমধ্যে কোনো পাপচিন্তা পোষণ করিলে অপরের অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ দেখ, তোমার সূক্ষ্মদেহ হইতে ক্রোধের স্পন্দন কি বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভুবর্লোকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ঐ দেখ উহা শত শত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিয়া তাহাদের মনেও ক্রোধ জাগাইয়া দিতেছে! আহা! দেখ, দেখ, উহা কি সর্ব্বনাশই সাধন করিল! বেলা দ্বিপ্রহরে ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ক্ষুৎপিপাসাকাতর কৃষক, পত্নীর নিকট অন্ন চাহিতেছিল এবং বিলম্ব দেখিয়া বিরক্ত হইতেছিল। এমন সময় তোমার ক্রোধের প্রচণ্ড স্পন্দন বেচারীর সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিল। হতভাগ্য ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া হস্তস্থিত কুঠার-দ্বারা পত্নীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিল! এখন ভাবিয়া দেখ, নরহত্যা করিল কে? কৃষক না তুমি?

এইরূপে আমরা সূক্ষ্মদেহ হইতে ক্রমাগত ভাল বা মন্দ স্পন্দন চারিদিকে ছড়াইতেছি

সংসর্গ সহস্থ।

এবং অলক্ষ্যে মানবের মঙ্গল বা অনিষ্ট সাধন করিতেছি। ইহা আমরা বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না কিন্তু না জানিলেও, ইহার ক্রিয়া অব্যর্থ, —অকাট্য। কারণ, ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, যেরূপ বল সেইরূপ ফল (change of motion is proportional to the force)। জড়শক্তির যে নিয়ম, সূক্ষ্ম শক্তিরও সেই নিয়ম। কোনো স্থানে জল আলোড়িত হইলে, যেমন তাহার পার্শ্বস্থ বা নিকটবর্ত্তী স্থানেই সমধিক বেগ দৃষ্ট হয় এবং যতই দূরে যাওয়া যায়, বেগ ততই মন্দীভূত হইতে থাকে ঠিক সেইরূপ স্পন্দনশীল সূক্ষ্মদেহের নিকটে যত বেগ, দূরে তত নহে। এইজন্য সাধু বা অসাধু ব্যক্তির নিকটে থাকিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, দূরে থাকিলে ততটা পাওয়া যায় না। সকল ধর্ম্মই, এই কারণে, সহবাস সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে পরামর্শ দেন। "সর্ব্বদা সাধু সহবাস করিবে, অসাধু ব্যক্তির সহিত একত্র বাস করিবে না" এইরূপ বিধি নিষেধ সকল দেশেই আছে। সাধু ও মহাপুরুষদিগের সূক্ষ্মদেহ হইতে নিয়ত যে প্রেম, দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির স্পন্দন উত্থিত হয় তদ্দ্বারা তাঁহাদের চতুঃপার্শ্বস্থ সূক্ষ্মাকাশ পূর্ণ ও পবিত্র হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যদি সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট বাস করি, অলক্ষ্যে আমাদের অপবিত্র স্পন্দনগুলি প্রশমিত ও দমিত হইয়া যায়, পবিত্রভাব ও পবিত্র চিন্তা উদ্দীপিত হয়। অসাধু ও দুষ্ট ব্যক্তিদিগের সহবাসে ঠিক বিপরীত ঘটে, তাহাদের কাম ক্রোধাদির অপবিত্র স্পন্দনে আমাদের সূক্ষ্মদেহে ঐ সকল প্রবৃত্তি সবল ও পরিপুষ্ট হয়।

সূক্ষ্মস্পন্দন চিরস্থায়ী।

আর একটি কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। স্থূল স্পন্দন যত শীঘ্র থামিয়া যায়, সূক্ষ্ম স্পন্দন তত শীঘ্র থামে না, দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। একটা পাত্রে খানিকটা জল লইয়া পাত্রটা নাড়িয়া দিন। প্রথমে, অবশ্য, পাত্রটা নড়িবে, জলও নড়িবে। একটু পরেই পাত্রটা থামিয়া যাইবে, কিন্তু জল তখনও নড়িতে থাকিবে। পাত্রটি থামিবার অনেক পরে জল থামিবে। আবার, যদি বায়ু দেখিতে পাইতেন তো দেখিতেন যে জল থামিবার পরেও বায়ুর স্পন্দন চলিতেছে। বায়ু থামিতে অনেক বিলম্ব হইবে। আবার, বায়ু থামিলেও, ইথার থামে নাই, ইথারের স্পন্দন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী। হয় ত ১০।১২ দিন (কিম্বা আরও অধিককাল) ইথারের স্পন্দন চলিবে। এইরূপে অপ্‌তত্ত্বের স্পন্দন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী, হয় ত কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিবে, তেজস্তত্ত্বের স্পন্দন হয় ত কয়েক যুগ চলিবে এবং আকাশতত্ত্বের স্পন্দন চিরস্থায়ী। এই জন্যই সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যত স্পন্দন (চিন্তা, ভাব, বা কার্য্য) হইয়াছে, সমস্তই আকাশে চলিতেছে।

দেবালয় পবিত্র কেন?

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনে সন্নিহিত সূক্ষ্মাকাশ (astral atmosphere) স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনটি স্থূল পদার্থের হইলে শীঘ্রই থামিয়া যাইত। কিন্তু ইহা অপ্‌তত্ত্বের স্পন্দন বলিয়া অনেককাল থাকে। এখন, মনে করুন কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা গৃহে আপনি প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে (ভালই হউক বা মন্দই হউক) চিন্তা করেন। ইহার ফল কি হয়? একই

স্থানের সূক্ষ্মাকাশে সেই নির্দ্দিষ্ট স্পন্দনটি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। কালে উহা এরূপ প্রবল হইতে পারে যে অপর কোনো ব্যক্তি ঐ স্থানে আসিলেই তাহার চিত্তে ঐ চিন্তা বা ভাবটি উদিত হইবে। এই জন্যই যে গৃহে বহুকাল ধরিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা হইয়াছে, যে স্থানে বহুকাল পূজা হইয়া আসিতেছে, সেখানকার সূক্ষ্মাকাশ পবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ থাকে। অপবিত্র স্পন্দনের দ্বারা এই পবিত্রতা কমিয়া যায়, নষ্ট হয়। দেবমন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জিদ্ প্রভৃতি এই কারণেই পবিত্র। শত শত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমবেত ভক্তির স্পন্দনে ঐ স্থানগুলি পবিত্রীকৃত। উহারা একপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি-কেন্দ্র বা ব্যাটারি-স্বরূপ; ভক্তিভাব, পবিত্রতা ও ভগবানে বিশ্বাস জাগাইতে সক্ষম। যাহা জীবের এরূপ কল্যাণ-দায়ক, অপবিত্র স্পন্দনের দ্বারা তাহাকে কলুষিত করা মহাপাপ। এই জন্যই ঐ সকল স্থানে কুভাব ও কুচিন্তা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

বেশ্যালয়াদি অপবিত্র কেন?

আবার, যে গৃহে কেবল বিষয়-চিন্তা, কুতর্ক, ক্রোধ, লোভ ও হিংসাদির কথা হয়, তাহার সূক্ষ্মাকাশ অপবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ। সুতরাং এরূপ স্থানে ভগবানে মনোনিবেশ করা বা ভক্তিভাব আনা বড়ই কঠিন। এই জন্য সকলেরই পৃথক্ পূজাগৃহ থাকা উচিত। ঐ ঘরে ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা, কোন কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনেকে বলেন ভগবানকে ডাকিব, তার আবার স্থানাস্থান বিচার কি? যেখানে সেখানে তাঁহাকে ডাকা যায়। ডাকিতে দোষ নাই। যেখানে সেখানে ডাকিতে পারিলে ভাল বটে, কিন্তু পারিবেন কি? আমার একটি বন্ধুর গল্প বলি শুনুন। ইনি বেশ ভক্তিমান ও পবিত্রাত্মা। একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য বিদেশে যান। যাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন, তিনি খুব বড় লোক। দাসদাসীপূর্ণ সুসজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকায় বন্ধুর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি একটি নির্জ্জন স্থান চাহিলেন। ইহাতে গৃহস্বামী সানন্দে বন্ধুকে স্বীয় বাগান-বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন। বন্ধু দেখিলেন এক সুবৃহৎ উদ্যান, এবং মধ্যস্থলে একটি সুন্দর গৃহ; কোনো গোলমাল নাই। বন্ধুর খুব আনন্দ হইল, তিনি যাহা চান তাহাই মিলিয়াছে। কিছু রাত্রে, তিনি তাঁহার নিত্য-কার্য্য (উপাসনা) করিতে বসিলেন। কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ হয় না; অনেক ক্ষণ (কয়েক ঘণ্টা) চেষ্টার পর তিনি বিফল মনোরথ হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং প্রভাত হইলে সে স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। খুব প্রত্যুষে দেখিলেন বাগানের মালী উঠিয়াছে। বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু এ ঘরে কি হয়? কেহ ছিল কি?" মালীর মুখে যাহা শুনিলেন তাহাতেই সব বুঝিতে পারিলেন। শুনিলেন সেই ঘরে বাবু মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব, সুরা ও কামিনী লইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। সেই ঘরের সূক্ষ্মাকাশ অপবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ ছিল। তাই শত চেষ্টা করিয়াও বন্ধু পবিত্র স্পন্দন আনিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি বেশ্যালয়, শৌণ্ডিকালয় প্রভৃতি অপবিত্র কেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখমলাল রায়চৌধুরী, B.A.

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

গ্রহ-সংবাদ।--বুধ গ্রহ, সূর্য্যের অতি সন্নিহিত, এজন্য বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকে। যখন দর্শন-যোগ্য স্থানে থাকেন, তখন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরই দৃষ্টিগোচর হন। আগামী মাঘ মাসের প্রথম তারিখে, প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে, এবং ১৫ই চৈত্র সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে দর্শনের সুবিধা আছে। শুক্র এখন প্রভাতের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছেন তাহারই পূর্ব্বভাগে অদূরে বৃহস্পতিও প্রভাত তারা রূপে আছেন। ২৫এ পৌষ শুক্র বৃহস্পতিকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে যাইবেন। তৎপরে অগ্রে বৃহস্পতি পরে শুক্র প্রভাত তারারূপে উদিত হইবেন। মঙ্গল এবং শনি এখন সন্ধ্যাকালে উদিত থাকেন। ১২ই মাঘ প্রাতে চন্দ্র মঙ্গলের এবং আগামী ১৩১৯ সালের ২রা বৈশাখ মধ্যরাত্রে শুক্রের উপর দিয়া যাইবেন। কিন্তু তৎকালে দেখা যাইবে না। পূর্ব্ব ও পর দিন সন্নিধিতে দৃষ্ট হইবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।--আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত, পুস্তকাদি সমালোচনার্থ উপহার পাইয়াছি।

১। *Coronation*—(সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ রাজ্যাভিষেক)—শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিবৃত। এই পুস্তকখানি সময়োপযোগী সংস্কৃত শ্লোকাত্মক। দেবোদ্দেশে যাহা ভক্তীপূর্ণ হৃদয়ে প্রদত্ত হয় তাহাই ভাল, আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ২৯।৫ বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেন হইতে প্রকাশিত।

২। **An Atlas of Sri Gouranga-Bharat-bhumi.**—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মানচিত্রাবলীর একখানি সূচীপত্র (Index) আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। মানচিত্রাবলী আজিও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। আমরা ঔৎসুক্য প্রকাশ করায়, তিনি তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত মানচিত্রগুলি আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। মানচিত্রের সংখ্যা চব্বিশখানি। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মভূমি ও লীলাক্ষেত্রগুলি, এবং শ্রীবৈষ্ণব মহাজনগণের অনেকেরই জন্মস্থান প্রভৃতি চিহ্নিত আছে। মানচিত্রগুলিতে চিহ্নিত স্থানসমূহের মাহাত্ম্যের হেতু পর্য্যন্ত লিখিত আছে। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল, প্রকাশিত হইলে, ইহা শিক্ষিতগণের আদরের বস্তু ও ভক্তগণের হৃদয়ের ধন হইবে সন্দেহ নাই। সূচীপত্রখানিই এমন অমূল্য পদার্থ হইয়াছে যে চক্ষের সমক্ষে রাখিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারহস্য স্মরণে অশেষ আনন্দের উদয় হয়। জগদীশ্বরের কৃপায় এই মহারত্ন শীঘ্র প্রকাশিত হইলে আমরা বড়ই উপকৃত ও আনন্দিত হইব।

৩। **সামাজিক সমস্যা**—প্রথম খণ্ড।—শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গ্রন্থখানিতে উন্নতি, কর্ত্তব্য, শিক্ষা, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিবিধ সমস্যা বেশ সরল ভাষায় সুন্দররূপ অবতারিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন সুস্পষ্টই অনুভূত। আমরা গ্রন্থকারের এই উদ্যমের ধন্যবাদ করি।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

উৎসর্গপত্রম্‌।

সর্ব্বদেবময়ং নাথং পরমাত্মস্বরূপিণম্‌।
প্রণম্য শ্রীগুরুং ভক্ত্যা মহাজনবিচিন্তিতা॥
অপূর্ব্বা ভক্তিরত্নানাং রাজী সংগৃহ্য যত্নতঃ।
অকিঞ্চনেন স্বীয়েন ক্ষীণভক্তি-প্রতস্তুনা॥
গুম্ফিতা বৈষ্ণবগ্রন্থ-রত্নাবলিরিয়ং ময়া।
অর্পিতা বৈষ্ণবানাঞ্চ সাধুনাঞ্চ সতাং করে॥
সৎপ্রসঙ্গেতি সম্ভাব্য মন্যতে সাদৃতা ভবেৎ।
তদৈব শ্রমসাফল্যং নাধিকং বাঞ্ছতেঽত্র বঃ॥

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রাব্দাঃ ৪২৫, |
মাধব-কৃষ্ণাপঞ্চমী। |

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" ১॥

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥" ২॥

"তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥" ৩॥

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥" ৪॥

"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥" ৫॥

"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতমাচার্য্যং ভক্তি-শংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥" ৬॥

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥" ৭॥

"শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥" ৮॥

ইতি শ্রীমঙ্গলাচরণাষ্টকম্।

ভূমিকা।

শ্রীভগবানের ইচ্ছায়, এই গুরুভার এ অকিঞ্চনের উপর পড়িল। যে সকল মহাত্মার ইচ্ছায়, আজ এ অকিঞ্চন, প্রেম-ভক্তি-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত মহামূল্য রত্নরাজী, মহাজনগণের শ্রীকর-কমল হইতে গ্রহণপূর্ব্বক, স্বীয় ক্ষীণ-শ্রদ্ধা-সূত্রে এই **শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থ-রত্নাবলি** গ্রন্থনে সমুদ্যত, তাঁহাদেরই কৃপার উপর এই দুরূহ কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সে যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রী যেমন চালাইবেন, যন্ত্র তেমনি চলিবে। যদি এ যন্ত্রের পীড়নে কোন রত্ন মলিন হইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়াই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থরত্নরাজীমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমসমুদ্রোদ্ভূত শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকই প্রধান। সেটি পরিত্যাগ করিলে এ হার অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া, সেটি প্রথমেই প্রদত্ত হইল। নিত্য-পাঠ সৌকার্য্যার্থে প্রত্যেক রত্ন একবার পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইয়া, পরে প্রত্যেক শ্লোক স্বতন্ত্রভাবে অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদির সহিত প্রকাশিত হইবে। মহাজনগণ কোনটির পর কোনটি দিলে ভাল হয়, এ অধম অকিঞ্চনকে শিখাইয়া দিবেন। যাঁহার কাছে এ জাতীয় যে কোন রত্ন থাকে, তাহাকে দিয়া সাহায্য করিবেন। এরূপ সাহায্যকারিগণ গ্রথিত **রত্নাবলি** কণ্ঠে ধারণ করিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৫, মাধব-কৃষ্ণাপঞ্চমী।
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

অকিঞ্চন।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রবদনারবিন্দবিগলিতমমৃতং

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রপ্রেমাম্বুধিমথনোদ্ভূতং

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্।

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

পরং (সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপং) শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং (শ্রীকৃষ্ণ-নামগুণাদি-কীর্ত্তনং) বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)। কথম্ভূতং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং? চেতোদর্পণমার্জ্জনং (অবিদ্যাদি-মলদূষিত-চিত্তদর্পণস্য মলাপাকর্ষণং) ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং (ভব সংসারদুঃখ এব মহাদাবাগ্নিস্তন্নির্ব্বাণ-কারণং) শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং (শ্রেয়ো শ্রীকৃষ্ণসেবানুরাগ এব কৈরবং কুমুদং, তৎ প্রকাশয়তি যা চন্দ্রিকা কৌমুদী তাং বিস্তারয়তীতি) আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং (হ্লাদিনীসারবৃত্তিবর্দ্ধনং) প্রতিপদং (পদে পদে, শ্রীকৃষ্ণেতিনাম্নঃ প্রত্যক্ষরাত্মকং পদমিতি বা) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (নিত্য-নির্ম্মল-প্রেমামৃতাস্বাদনকারণং) (তথা) সর্ব্বাত্ম-স্নপনং (জড়াজড়াত্ম-তর্পণকারণং সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তিকারকং বা) ইতি। ১ ॥

অবিদ্যা মলেতে রয়েছে মলিন
চিত্ত দরপণ হায়,
যাঁ'র শক্তি-বলে হইয়া মার্জ্জিত
সেই মল দূরে যায়;
জন্ম-মৃত্যুময় এ ভব-কান্তারে
দুঃখ-দাবানল জ্বলে,
নিভে যায় সেই মহাদাবানল
যেই নাম-ধারা বলে;

সংসারী জীবের সর্ব্ব শ্রেয়ঃ রূপ
কুমুদ প্রফুল্ল হয়,
যেই চন্দ্রিকায় সে চন্দ্রিকা ঝরে
হ'লে নাম-চন্দ্রোদয়;
পরা-বিদ্যা-রূপা কুলবধূ যিনি
তাহার জীবন-ধন;
যাঁহার প্রকাশে আনন্দ-অম্বুধি
বৃদ্ধি পায় প্রতিক্ষণ;

প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃত-ধারা শ্রীকৃষ্ণ নামের হেন সঙ্কীর্ত্তন,
বহিয়া যে নাম হ'তে, যাহার তুলনা নাই,
সবার আত্মায় করে তৃপ্তি দান, পরম মঙ্গল স্বরূপ যাঁহার
সন্তোষিয়া বিধিমতে; এস তাঁ'র যশ গাই। ১।

কলিপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু, কলিকলুষ-মলিন মানবগণের শ্রদ্ধাকর্ষণ-মানসে যখন সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক, কলিযুগে সহজসাধ্য সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া আপনি আচরিয়া, জগৎকে শিখাইতেছিলেন। সেই সময়ে নামপ্রবাহে সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিতা হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচলবাসের শেষ সময়ে, তিনি শ্রীস্বরূপদামোদর এবং শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলারসাস্বাদনে তৃপ্ত হইতেন। এই আস্বাদনের প্রয়োজন জগৎকে শিক্ষাদান। তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বলে॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে।
রাত্রিদিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগাদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড, ২০ পরিচ্ছেদ)

এইরূপ, শ্লোকাস্বাদন করিতে করিতে, অনেক সময় সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত হইত; তিন জনেই নিদ্রার কথা ভুলিয়া যাইতেন। যখন নামের তরঙ্গ উঠিত, তখন তিন জনেই বিহ্বল হইতেন। এক এক দিন তিনি ব্রজপ্রেমরস-সুধাপানে এমনি বিভোর হইতেন যে তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইত। এক দিন এইরূপ শ্লোকাস্বাদন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোক তাঁহার শ্রীমুখে উদিত হইল। শ্রীজনকের প্রতি মহর্ষি করভাজনের উক্তির এই শ্লোকটি তিনি উচ্চারণ করিলেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্লোকটির আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রীমুখে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। শ্লোকটি লইয়া কোনও আলোচনা করিলেন না। কেবল বলিলেন——

"————————শুন, স্বরূপ রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥"

(শ্রীচরিতামৃত, অন্ত্য, ২০)

এই কথা বলিয়া, একে একে "চেতোদর্পণমার্জ্জনং "প্রভৃতি আটটি শ্লোক পাঠ করিলেন। সেই শ্লোকাষ্টকই **শ্রীশিক্ষাষ্টক।** শ্রীমুখোচ্চারিত সেই শ্লোকাষ্টক শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়ধন—নিত্য-আস্বাদ্য পরমামৃত—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাব্ধিসমুত্থিত উজ্জ্বলতম রত্নাষ্টক।

সেই আটটি রত্নের প্রথমটি শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের শক্তি-দ্যুতি-প্রকাশক। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনের সেই মহাশক্তি শ্রীবৈষ্ণবগণ নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বহির্মুখ জনগণও যে কিছু কিছু অনুভব না করেন এমন নয়। তবে যাঁহাদের হৃদয় জড়চিন্তায় একান্ত মলিন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবিদুর, মহর্ষি মৈত্রেয়কে বলিতেছেন "মুনিবর, যে সকল মানব, স্বীয় সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পাপরাশির ফলে শ্রীহরি-কথায় বিমুখ, তাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও শাস্ত্রতত্ত্ব-বিষয়ে মূঢ়, এবম্বিধ জনে, নিতান্ত মূর্খ অপেক্ষাও শোচ্য। আমি তাহাদের জন্য বড়ই দুঃখিত। তাহাদের বাক্য, মন ও দেহব্যাপার সমূহ বৃথা। কাল নিরন্তর তাহাদের ব্যর্থ-জীবন হরণ করিতেছেন।"*

* "তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষামায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্।"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৫ম-অ, ১৪ শ্লোক)

মহর্ষি-মৈত্রেয়ও বলিয়াছিলেন, "অহো! পুরাণ-শাস্ত্রাদি মধ্যে ভবভয়নাশক ভগবানের নামগুণানুকীর্ত্তনামৃত কর্ণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া, এ সংসারে নরেতর জীব ব্যতীত কোন্ পুরুষার্থসারতত্ত্ববিৎ তদ্বিষয়ে বিরত হইতে পারে?"*

মহারাজ পরীক্ষিতও বলিয়াছিলেন, "নিবৃত্তর্ষ-মুক্তগণ যে উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণগানে আনন্দ লাভ করেন, যাহা শ্রবণ ও মনের অভিরাম এবং ভবব্যাধির একমাত্র ঔষধ, সেই সুধাময় কথায়, আত্মঘাতী ব্যতীত আর কে বিরত হইতে পারে?" †

শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-শক্তির, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধু শ্রীবৈষ্ণবগণ। তদ্ব্যতীত শাস্ত্রবাক্য ভিন্ন অন্য কোনও রূপ প্রমাণ দিবার শক্তি এ অকিঞ্চনের নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, এই সকল বাক্যে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারা অন্যের অলক্ষিতে নির্জনে বসিয়া প্রত্যহ, কিছুক্ষণের জন্য, কয়েক দিন এই সুধাময় নাম উচ্চারণ করুন। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে সাহস না হয়, মনে মনেই জপ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, নামের শক্তি আছে কি না? বোধ হয়, এ নামের মাধুরীতে তাঁহাদের সে সর্ব্বানর্থকরী অশ্রদ্ধা দূরে যাইতে পারে। কারণ শুনিয়াছি---

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম॥"

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন;—"শুদ্ধ নামে যে কি ফল হয় তাহা, জীবের সহজবোধগম্য নহে। তাহার ফল কৃষ্ণপ্রেম। কিন্তু সাঙ্কেত্য, পরিহাস্য, স্তোভ ও হেলা এই চতুর্ব্বিধ ছায়া-নামভাসেও অশেষ পাপ ধ্বংস হয়। ‡

* "কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্।"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩স্ক, ১৩অ, ৪৯ শ্লো)

† "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ।"
(শ্রীমদ্ভাগবত-১০ম স্ক, ১অ, ৪ শ্লো)

‡ "সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৪)

আমি। "আমার বড় ইচ্ছা হয়, ঝড় বৃষ্টি, সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির সময় নির্ণয় কর্‌তে শিখি।"

গুরুদেব হাসিলেন, ব'লিলেন, "সকলি সময়-সাপেক্ষ, যত্নপূর্ব্বক শেখো, সকলি জান্‌তে পার্‌বে। শাস্ত্র বলেন, রহস্য সমুদায়—

"সুপরীক্ষিত শিষ্যায় দেয়ং বৎসরবাসিনে।"

যাই হোক, আমি স্থূলভাবে গ্রহণ-গণনার একটা সঙ্কেত জানি। এটা বস্তুতঃ অতি-স্থূল সঙ্কেত, কিন্তু লব্ধ ফল ঠিক না হ'লেও নিতান্ত অশুদ্ধ হ'বে না। তোমাকে বৃষ্টি প্রভৃতি নির্ণয়ের সঙ্কেত আজ দিতে পার্‌লাম না, কারণ তা'তে স্ফুটাদি জ্ঞান প্রয়োজন আছে; কাজেই সে সব কথা কয়েকদিন পরে জান্‌তে পার্‌বে। আপাততঃ এই স্থূল গ্রহণ-গণনাটা শেখো—

এই গণনায় রাহু এবং রবি বা চন্দ্রের ধ্রুবাঙ্ক নির্ণয় কর্‌তে হ'বে। প্রথম রাহু বা কেতু যে নক্ষত্রে আছে, সেই নক্ষত্রে কত-দিন আগে প্রবেশ করেছে গণনা কর। তা'র পর ঐ দিন সংখ্যার চতুর্থাংশ, ষাইট কলা হ'তে বিযুক্ত কর্‌লে যা অবশিষ্ট থাক্‌বে, তত কলা এবং গত নক্ষত্রাঙ্ককে অংশ কল্পনা ক'রে রাহু বা কেতুর গতি বল্‌বে, এইটা একটা ধ্রুবাঙ্ক মাত্র, অংশ কলা না বলে অঙ্গুল ব্যঙ্গুল বল্‌লেও কিছু ক্ষতি নাই। তা'র পর চন্দ্রগ্রহণ পক্ষে, চন্দ্র বর্ত্তমান নক্ষত্রে, পর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত কত দণ্ড থাকিবেন নির্ণয় কর?

আমি। পর্ব্বান্ত কি?

গুরু। "পূর্ণা ও প্রতিপদ্ সন্ধিকে এ স্থলে পর্ব্বান্ত বলা হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে পূর্ণাতিথি বলে তা বোধ হয় জান?"—

"পঞ্চমী দশমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।
পূর্ণাখ্যাস্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বদা হি মনীষিভিঃ।"

চারিটি পূর্ণাতিথির মধ্যে শেষ দু'টিই এখানে গ্রাহ্য। চন্দ্রের পর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত নক্ষত্র পরিমাণ স্থির হ'লে, সেই দণ্ডাদিকে কলাদি এবং গত নক্ষত্রকে অংশ কল্পনা ক'রে, চন্দ্রের গতি বা ধ্রুবাঙ্ক নির্ণয় কর। সূর্য্য-গ্রহণ পক্ষে ঐ পর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত রবি কত দিন-দণ্ডাদি ঐ নক্ষত্রে থাকবেন তা নির্ণয় ক'রে তাহাকে সাড়ে চারিগুণ কর্‌লে যে অঙ্ক পাওয়া যা'বে, তা'কে কলাদি ও গত নক্ষত্রকে অংশ কল্পনা ক'রে রবির গতি বা ধ্রুবাঙ্ক নির্ণয় কর। চন্দ্রগ্রহণে যদি রাহু বা কেতুর ও চন্দ্রের ধ্রুবাঙ্কের অন্তর ষাইটের বেশী না হয় এবং সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্য ও পাতের ধ্রুবাঙ্কের অন্তর ৪৫-এর অধিক না হয় তা'হ'লে নিশ্চয় গ্রহণ হ'বে। এ সম্বন্ধে কারিকা এই—

"ভ-ত্রিপাদান্তরে রাহোঃ কেতোর্ব্বা সংস্থিতো রবিঃ।
চতুষ্পাদান্তরে চন্দ্রস্তদা সম্ভাব্যতে গ্রহঃ।"

গ্রহণ সম্ভাবনা নির্ণীত হ'লে। পাতের নক্ষত্রাবস্থান দিন সংখ্যার চতুর্থাংশের অনু-পাত দ্বারা গ্রাস পরিমাণ এবং ঐ অঙ্কের (দিনসংখ্যাচতুর্থাংশের) ছয় ভাগের এক ভাগ যত দণ্ডাদি তাহাই স্থূল ভাবে স্থিতি কাল এবং তা'রি অর্দ্ধেক পরিমিত ঘণ্টাদি স্থিত্যর্দ্ধ। পর্ব্বান্তের তত পূর্ব্বে গ্রহণারম্ভ ও তত পরে গ্রহণ শেষ হ'বে। একটা উদাহরণ দেখ—

আগামী ১৩০০ সালের ৮ই চৈত্র চন্দ্রগ্রহণ হ'বার কথা রয়েছে। ঐ দিনে চন্দ্র ১২ উত্তরফল্গুনীতে এবং কেতু ১৩ হস্তাতে আছে—

কেতু ১১ই পৌষ হস্তায় এসেছে—

∵ পৌষের দিন সংখ্যা = ২৯

— ১১ বাদ দিয়া

পেলাম পৌষের ১৮ দিন

মাঘের ৩০ ,,

ফাল্গুনের ৩০ ,, এবং

চৈত্রের ৮ ,,

সমষ্টি ৮৬ দিন

চতুর্থাংশ ২১ ,,

∵ ৬০—২১ = ৩৯ কলা এবং

গত নক্ষত্রাঙ্ক—১২

∴ উভয়যোগে ১২।১৯ অংশাদি কেতুর গতি বা পাত-ধ্রুবাঙ্ক।

∵ চন্দ্র, ৭ই দং ৪১।৩১ পলের পর উত্তর ফল্গুনীতে প্রবেশ ক'রেছেন এবং ৮ই পর্ব্বান্ত সূর্য্যোদয় হ'তে ৩৪ দণ্ড ৫১ পল পরে,

∴ ৭ই = ৬০ দণ্ড

— ৭ই পূর্ব্বফল্গুনীর ৪১।৩১

= উত্তরফল্গুনী ১৮।২৯

+ ৮ই পর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত ৩৪।৫১

= সমষ্টি ৫৩।২০

গত নক্ষত্রাঙ্ক ১১।০।০

= চন্দ্র-ধ্রুবাঙ্ক ১১।৫৩ অংশাদি

∵ কেতু-ধ্রুবাঙ্ক ১২।৩৯ অংশাদি

— চন্দ্র-ধ্রুবাঙ্ক ১১।৫৩ ,,

= গত্যন্তর ০।৪৬ কলা

ইহা ৬০এর কম সুতরাং গ্রহণ হইবে।

এখন প্রথমলব্ধ দিনের চতুর্থাংশ ২১ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রৈরাশিক দ্বারা—

৬০ কলা : ২১ কলা :: ৪ পাদ : কত ?

$\frac{২১ \times ৪}{৬০}$ = ১$\frac{২}{৫}$ গ্রাস-পরিমাণ ;

অর্থাৎ এক পাদের কিছু বেশী গ্রাস হ'বে। পঞ্জিকায় লিখ্‌চে "কিঞ্চিন্ন্যূন পাদগ্রাসঃ।"

আর ২১এর ছয় ভাগের এক ভাগ—

৬ | ২১

২॥ | ৩—৩০ দণ্ডাদি

২ | ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট স্থিতি

০ — ৪২ মিনিট স্থিত্যর্দ্ধ

পর্ব্বান্ত ঘণ্টাদি রাত্রি ৮।৫

— ০।৪২

= ৭।২৩ স্পর্শ-কাল

∴ রাত্রি ৭টা ২৩ মিনিটের সময় স্পর্শ। পঞ্জিকাতে স্পর্শ-কাল ৭।২১।৩০, দেড় মিনিটে। তফাৎ হ'লো, কিন্তু পঞ্জিকার স্থিতি-কাল—১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৫০ সেকেণ্ড, সুতরাং আমাদের লব্ধ অঙ্ক অপেক্ষা—প্রায় ১৮ মিনিট বেশী। আমরা মোটামুটি মোক্ষ-কাল পা'চ্চি প্রায় ৯টা। কিন্তু এটা লক্ষ্য ক'রো পঞ্জিকার গ্রহণটা স্ফুটচন্দ্রিকা অর্থাৎ ইউরোপীয় পঞ্জিকা মতে, পঞ্জিকায় স্থিতি-কাল ১।৪১।৫০ সুতরাং স্থিত্যর্দ্ধ ১।৪১।৫০ ÷ ২ = ৫০ মি, ৫৫ সে।

গ্রাসারম্ভ বা স্পর্শ-কাল ৭।২১।৩০

+ ০।৫০।৫৫

= ৮।১২।২৫

সুতরাং রাত্রি ৮টা ১২ মি ২৫ সেকেণ্ড পর্ব্বান্ত স্বীকার করা হ'য়েছে।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাখানা আমি আজো পাই নাই। পেলে দেখ্‌বে, তা'র অঙ্ক দিয়ে আরও ঠিক ফল পা'বে।"

(পরে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা আসিবার পর দেখিয়াছিলাম। তাহার সহিত, স্ফুট-চন্দ্রিকার

মিল নাই। পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন "স্ফুট-চন্দ্রিকা নামে কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ নাই।" জগদীশ্বর জানেন। তবে, আমার পক্ষে গুরু-বাক্যই বেদ-বাক্য। যত দিন ঐ গ্রন্থ প্রত্যক্ষ না দেখিব, তত দিন, উহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া মনে করিতে আমি বাধ্য।)

চন্দ্রগ্রহণ দেখাইয়া, বলিলেন "এইবার তুমি আমার প্রদত্ত সূত্র অনুসারে সূর্য্যগ্রহণ কস।"

আমি। "১৩০০ সালের ২৪এ চৈত্র সূর্য্য গ্রহণ হ'বে। ঐ দিন রবি ও রাহু ২৭ রেবতী নক্ষত্রে আছে।

(আমি বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা পাইবার পর তাহা হইতেও সূর্য্য-গ্রহণটি কসিয়াছিলাম, সে দুইটি ফল পাশাপাশি দিলাম।)

	গুপ্ত প্রেস মতে	বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে
রাহুর নক্ষত্র সঞ্চার, ২৭ রেবতী	৮ই আশ্বিন	৬ই ভাদ্র
মাসের পরিমাণ	৩১ দিন	৩১ দিন
বাকী আশ্বিনের	২৩ দিন	ভাদ্রের ২৫ দিন
আশ্বিন		৩০ ,,
কার্ত্তিক	২৯ দিন	৩০ ,,
অগ্রহায়ণ	৩০ ,,	৩০ ,,
পৌষ	২৯ ,,	২৯ ,,
মাঘ	৩০ ,,	৩০ ,,
ফাল্গুন	৩০ ,,	৩০ ,,
চৈত্র	২৪ ,,	২৪ ,,
সমষ্টি	১৯৫ ,,	২২৮ ,,
চতুর্থাংশ	৪৯	৫৭
৬০ হইতে বিয়োগফল	১১	৩
গত নক্ষত্রাঙ্ক	২৬	২৬
∴ রাহুর ধ্রুবাঙ্ক	২৬।১১	২৬।৩
রবির ২৭ রেবতীতে সঞ্চার ১৬ই চৈত্র	দং ৩৩।১০	দং ৩৩।৫১
অহোরাত্রমান ৬০ দণ্ড হইতে বিয়োগ করিয়া		
ঐ দিন ভোগ্যদণ্ডাদি	২৬।৫০	২৬।৯
১৬ই হইতে ২৩এ পর্য্যন্ত	৭ দিন	৭ দিন
২৪এ ভোগ্য	দং ৯।৫২	১০।৪
নক্ষত্রভোগ-মান দিনাদি	৭।৩৬।৪২	৭।৩৬।১৩
	× ৪॥	× ৪॥
দিনাদি চতুর্গুণ	৩০।২৬।৪৮	৩০।২৪।৫২
+ ভোগার্দ্ধ	৩।৪৮।২১	+ ৩।৪৮।৬
সাড়ে চারিগুণ	৩৪।১৫।৯	৩৪।১২।৫৮
গত নক্ষত্রাঙ্ক	২৬	২৬
রবির ধ্রুবাঙ্ক	২৬।৩৪	২৬।৩৪

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা হইতে প্রাপ্ত অঙ্ক হইতে রাহুর দিন-সমষ্টির চতুর্থাংশ ৪৯

∴ ৬০ : ৪৯ :: ৪ পাদ বা ১২ অঙ্গুল : কত ?

$$= \frac{৪ \times ৪৯}{৬০} = ৩\frac{৪}{১৫} \text{ পাদ বা } ৯\frac{৪}{৫} \text{ অঙ্গুল গ্রাস।}$$

গুপ্তপ্রেসে লেখা আছে অর্দ্ধাধিক গ্রাস।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রাপ্ত অঙ্কানুসারে দিন-সমষ্টির চতুর্থাংশ ৫৭

∴ ৬০ : ৫৭ :: ১২ অঙ্গুল : কত ?

$$= \frac{৫৭ \times ১২}{৬০} = ১১ \text{ অঙ্গুল } ২৪ \text{ ব্যঙ্গুল}$$

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তমতে ১১ অঙ্গুল ৪৬ ব্যঙ্গুল ৪১ অনুঙ্গুল গ্রাস। স্থূলাঙ্ক-নির্দ্দিষ্ট গ্রাসাঙ্ক হইতে কিঞ্চিদধিক ২২ ব্যঙ্গুল মাত্র অধিক।

বস্তুতঃ ঐ দিনের গ্রহণ প্রায় পূর্ণ গ্রাসই হইয়াছিল।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের অনুসারে অঙ্কদ্বারা স্থূল গণনায় লব্ধ স্থিত্যাদি প্রদত্ত হইতেছে

রাহু-গতিদিন সংখ্যার

চতুর্থাংশ = ৫৭

তাহার ষষ্ঠাংশ = ৯।৩০ দণ্ডাদি } স্থিতফল

তাহার ২½ ভাগ = ৩।৪৮ ঘণ্টাদি }

তাহার অর্দ্ধ = ১।৫৪ ,, স্থিত্যর্দ্ধ

পর্য্যন্ত = ৯।৫৩ ঘণ্টাদি

∴ ৯।৫৩ − ১।৫৪ = ৭টা ৫৯মি স্পর্শ কাল।

এবং ৯।৫৩ + ১।৫৪ = ১১টা ৪৭মি মোক্ষকাল

এই হইল স্থূল ফল—

কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় ঐ পঞ্জিকায়—

গ্রহণ মধ্য বা পর্ব্বান্ত ৮টা ৫৯মি ৩০সেকেণ্ড স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে স্থূল স্থিত্যর্দ্ধ বিয়োগ করিয়া ৭টা ৫মি ৩০সে স্পর্শ, এবং যোগ করিলে ১০টা ৫৩মি ৩০সে মোক্ষকাল পাই। পঞ্জিকায় লেখা আছে।

	ঘ	মি	সে
স্পর্শঃ—	৭	৪৫	১০
মধ্য—	৮	৫৯	৩০
মোক্ষ—	১০	২২	১৮

গ্রহণের এই নিয়মটি অত্যন্ত স্থূল হইলেও, এটি পাইয়া আমার এত আনন্দ হইয়াছিল, যে সন্ধান করিয়া ঢাকার ৺মদনমোহন বসাক মহাশয়দিগের গদি হইতে কয়েক দিন যাবত পুরাতন পঞ্জিকা আনিয়া প্রায় ২০।২৫টি গ্রহণ কসিয়াছিলাম।

বাসায় আসিয়া পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা করিলাম। আসিবার সময় ১৩০০ সালের পঞ্জিকাখানি আনিয়াছিলাম। সেখানিতে দেখিলাম, আমার পঠিত বিষয়ের নিম্নে লেখা, দিবা ৩১।৮।৫৩, তৎপর দিন ৩১এ ৩১।১২।২০; মনে করিলাম, ৩০এ চৈত্র দিনমান একত্রিশ দণ্ড, আট পল, তিপ্পান্ন বিপল হ'য়ে থাকে। এ বৎসরের ৩০এ দেখিলাম, দিবা ৩১।১০।০ দণ্ডাদি। কেন এরূপ হয়? বৎসর বৎসর প্রতি তারিখের দিনমানও কি এক নয়? নিজে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না; সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিব স্থির করিলাম। তাহার নীচে দেখিলাম, শকাব্দা ১৮১৫, তন্নিম্নে সন ১৩০০ উভয়ের অন্তর ৫১৫ ঐগুলির পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করিতে করিতে স্বর্গীয়

জ্ঞানেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িল। তাঁহার খাতা বাহির করিয়া, তাহা হইতে নিজের খাতায় লিখিলাম—

সন+৫১৫=শকাব্দা।

শকাব্দা−৫১৫=সন।

শকাব্দা+১৯৫৫৮৮৩১৭৯=সৃষ্টিতোঽতীতাব্দাঃ।

শকাব্দা+৩১৭৯=কলের্গতাব্দাঃ।

শকাব্দা+১৩৫=সম্বৎ। চান্দ্রফাল্গুন অমাবস্যার পর ১৩৬ যোগ করিবে।

শকাব্দা−১৪০৭=শ্রীচৈতন্যাব্দ। দোল পূর্ণিমার পর ১৪০৬ যোগ করিবে।

শকাব্দা+৭৮=খ্রীষ্টাব্দ। পৌষের পর ৭৯।

ইহার পরে হিজরী, ফস্‌লী, বিলায়তী ও মগী অব্দ পঞ্জিকাতে লেখা আছে। ইচ্ছা হইল এই সকল অব্দের কোনটা কোন সময়ে প্রচলিত হইয়াছে জানি, এবং যদি সম্ভব হয়, পৃথিবীতে কত প্রকার অব্দ আছে এবং সেগুলি কাহা-কর্ত্তৃক কেন প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও জানি। তাহার পর সমস্ত দিনের কৃত কার্য্য দৈনন্দিন লিপিতে লিখিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিনের ঘটনা চিন্তা করিবার সময় মনে উদয় হইল, ইংরাজী জ্যোতিষ (Astronomy)-শাস্ত্র একটু পড়া উচিত। পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে প্রাচ্য জ্ঞান দৃঢ়তর করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা করিলে, রহস্য জ্ঞান সহজ হইবে। এই মীমাংসা মনে উদয় হইবামাত্র আমি তখনি ইংরাজী জ্যোতিষ লইয়া বসিলাম।

ইংরাজী জ্যোতিষ খুলিয়া প্রথমেই অয়নাংশ সম্বন্ধে কি লেখা আছে, দেখিলাম। দেখিলাম—

"The *Tropical year* is, at present, 365·242264 days or $365^d\ 5^h\ 48^m\ 51{\cdot}6^s$; while the *sidereal year* is longer by 0·014119 of a day, or $20^m\ 20^s$. It follows from this that the equinoxes have a retrograde motion on the ecliptic, opposite to that of the Sun, by virtue of which, they describe on that circle an arc each year, which occupies the Sun $20^m\ 20^s$ to traverse. The differences between the tropical and sidereal years causes the phenomenon called the *procession of the equinoxes*, which complete their revolution in the plane of the ecliptic in

$$\frac{365242264}{14119} = 25869 \text{ years.}$$

From the earliest times of Astronomy the positions of the stars and other celestial bodies have been referred to the intersection of the Equator and Ecliptic, performing its complete revolution in the space of 25,869 years:

"Incipiunt magni
Procedere menses."

Since the formation of the earliest catalogue of stars on record, the place of the equinox has retrograded by 30° of the whole 360° that constitute the ecliptic."—Vide **Manual of Astronomy** by *The Rev. J. A. Galbraith, M. A.* and *The Rev. S. Haughton M. A.* pp. 9-10.

বুঝিলাম, যে সৌরবর্ষ অপেক্ষা সাবনবর্ষ কুড়ি মিনিট, কুড়ি সেকেণ্ড দীর্ঘ; এই জন্য ক্রান্তি-বিষুবৎ-ছেদবিন্দু-দু'টি বিপরীত গতিতে অর্থাৎ মেষ হইতে মীন, মীন হইতে কুম্ভ

ইত্যাদিক্রমে পশ্চাদ্গামী হইতেছে; কাজেই সূর্য্যকে প্রতিবর্ষে কুড়ি মিনিট ও কুড়ি সেকেণ্ড গমন করিয়া, পূর্ব্বস্থানে আসিতে হইতেছে। ইহারই ফলে প্রেসেসন অব দি ইকুইনক্স বা অয়ন-চলন। এই গতি ২৫৮৬৯ বর্ষে সমস্ত চক্র-পরিমিত অর্থাৎ ২৫৮৬৯ বৎসর পরে ক্রান্তি-বিষুবৎ-ছেদ-বিন্দুটি আবার পূর্ব্বস্থানে আসিবে। তবে এই মতে বার্ষিক অয়ন গতি কত? কসিলাম—

২৫৮৬৯বর্ষ : ১বর্ষ : : ৩৬০ অংশ : কত অংশ?

$$\text{বা } \frac{\text{৩৬০ অংশ}}{\text{২৫৮৬৯ বর্ষ}} = \text{৫০'৯ বিকলা}$$

```
২৫৮৬৯ ) ৩৬০ অংশ ( ৫০.৯০৮৪ ইত্যাদি
         ৬০
      ২১৬০০ কলা
           ৬০
      ১২৯৬০০০ বিকলা
      ১২৯৩৪৫
           ২৫৫০০০
           ২৩২৮২১
              ২১৭৯০০
              ২০৬৯৪২
               ১০৯৫৮০
               ১০৩৪৭৬
```

ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য মতে তবে অয়নগতি বর্ষ-প্রতি প্রায় ৫০''.৯ বিকলা। ৫১ বিকলা বলিলেও চলে। আমাদের দেশের মতে কিন্তু ৫৪" বিকলা। তফাৎ ত বড় কম নয়?

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলাম। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তৎপরে (ইংরাজী উদ্ধৃতাংশের) প্রথম ছত্রে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম লেখা আছে at present সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ঐ তফাৎ। তবে, হয়ত শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা হইবার সময়ে আরও বেশী অন্তর ছিল। তবে এই অন্তরের হ্রাস কি পরিমাণে হইতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই ত শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে কবে এ কথা লেখা হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যাইবে? সে দিন ঐ পর্য্যন্তই রহিল।

(পরে যখন শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত পড়িলাম, তখন দেখিলাম এই সিদ্ধান্তমতে অয়ন নিরন্তর পশ্চাদ্গামী নহে কিন্তু—

"ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্-পরিলম্বতে।"

ভ-চক্র মহাযুগে ছয় শত বার পরিলম্বিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ একবার বিপরীত গতিতে ২৭ অংশ গমন করিয়া সহজ গতিতে সেই স্থানে আসিয়া আরও ২৭ অংশ অগ্রগমনপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসে।)

অয়নাংশ।

পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণোপান্তে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, তিনিও স্নান করিয়া, পুষ্পাদি সংগ্রহপূর্ব্বক পূজা-গৃহে রাখিলেন। আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"একটু বেলায় এলে হ'তো।"

গুরুদেব। "না, বাবা, এই সময়ই ঠিক। আমি মনে কর্‌ছিলাম হয়ত তোমার বেলা হ'বে, আজ এই বেলা পূজা সেরে নিই, কাল থেকে খুব সকালে আস্‌তে বল্‌বো। সকালে না হ'লে পড়ার অনেক ব্যাঘাত ঘট্‌বে। একটু বেলা হ'লে, লোকে প্রশ্ন নিয়ে আস্‌তে থাক্‌বে, তখন পড়ান যা'বে না। দশটার মধ্যে এ দিক সেরে, নিশ্চিন্ত

হ'য়ে পূজা কর্‌বো। তুমিও তখন গিয়ে অনায়াসে নিজের আহার্য্য পাক কর্‌তে পার্‌বে।"

এই কথা বলিতে বলিতে গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক শ্লেট, পেন্‌সিল, পঞ্জিকা প্রভৃতি লইয়া বসিলেন। আমিও পুনঃপ্রণাম করিয়া স্বতন্ত্র আসনে বসিলাম; এবং ১৩১০ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকাখানির ৭৮ পৃষ্ঠা খুলিলাম। বলিলাম, "এই বর্ষ-প্রবৃত্তি নির্ণীত হয় কেমন ক'রে? দিনমানই বা নির্ণীত হয় কেমন করে? আর অয়নাংশই বা নির্ণয় হয় কেমন ক'রে?"

গুরুদেব। "সব ক'টা ত একেবারে বলা যা'বে না। আজ অয়নাংশ সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার কথা ছিল। তা হোক, আগে ঐ বর্ষ-প্রবৃত্তি, আর দিনমানের কথাটাই স্থূল-ভাবে হোক। সূক্ষ্ম আপাততঃ থাক্, কি বল?"

আমি। "আপনার যেরূপ ইচ্ছা।"

গুরুদেব। "আমার ইচ্ছার কথা নয়। শিখ্‌তে গেলে, আগে মোটামুটি একটু জ্ঞান কোরে নিয়ে, তা'র পর সূক্ষ্ম মীমাংসা শেখাই সহজ। মনে কর এই ১৩০০ সালেরই বৈশাখ-সংক্রমণ গণনা কর্‌তে হ'বে। আমি যে নিয়মে করি, তা এই—

আচ্ছা কস দেখি

এক শকের জন্য ১।১৫।৩১।৩১।২৪, সুতরাং ১৮১৫ শকে কত অঙ্ক হ'বে?

আমি। "দশমিক কর্‌বো?"

গুরুদেব। "যেমন ক'রে পার কর।"

আমি ১।১৫।৩১।৩১।২৪ কে দিনের দশমিক করিলাম। হইল ১·২৫৮৭৫৬৪৮১ সঙ্গে সঙ্গে একটা টেবিল করিলাম—

প্রথম সারিণী।

১	১·২৫৮৭৫৬৪৮১৪৮১৪··
২	২·৫১৭৫১২৯৬২৯৬২৯··
৩	৩·৭৭৬২৬৯৪৪৪৪৪৪৪··
৪	৫·০৩৫০২৫৯২৫৯২৫৯··
৫	৬·২৯৩৭৮২৪০৭৪০৭৪··
৬	৭·৫৫২৫৩৮৮৮৮৮৮৮৮··
৭	৮·৮১১২৯৬৭০৩৭০৩৭··
৮	১০·০৭০০৫১৮৫১৮৫১৮··
৯	১১·৩২৮৮০৮৩৩৩৩৩৩৩··

এটা আমার গণিত প্রথম টেবিল বলিয়াই যথাযথ রাখিয়াছি। আজ যদি টেবিল করিতাম, তাহা হইলে অত দশমিক রাখিতাম না। তা'র পর কসিলাম—

১০০০ = ১২৫৮·৭৫৬৫
৮০০ = ১০০৭·০০৫২
১০ = ১২·৫৮৭৬
৫ = ৬·২৯৩৮
―――――――――
২২৮৪·৬৪৩১

বলিলাম দু হাজার দু শ চুরাশির চেয়ে কিছু বেশী।"

গুরুদেব। "২২৮৪কে সাত দিয়া ভাগ দাও।"

আমি। ভাগ করিয়া—

৭ | ২২৮৪
―――――
৩২৬ — ২

বলিলাম—"তিন শত ছাব্বিশ ভাগফল বাকী দুই।"

গুরুদেব। "তারপর দণ্ড পল কর।

আমি। কসিলাম—

'৬৪৩১
৬০
৩৮'৫৮৬
৬০
৩৫'১৬

বলিলাম,—"আটত্রিশ দণ্ড পয়ত্রিস পল।"

গুরুদেব। "তবে হ'লো ২।৩৮।৩৫ ওর
সঙ্গে যোগ কর ১।১২।৫৫
হলো ৩।৫১।৩০

সুতরাং বর্ষ-প্রবেশ বা বৈশাখ-প্রবৃত্তি হ'লো মঙ্গলবার একান্ন দণ্ড ত্রিশ পলের সময়। পঞ্জিকার সঙ্গে একটু তফাৎ হ'লো। ওটা চরাদি সংস্কার কর্‌লে শুধ্‌রে যা'বে। অন্যান্য মাসের সংক্রমণ জান্‌তে হ'লে ক্ষেপক জান্‌তে হ'বে।

বৈশাখে	ক্ষেপ	১।১২।৫৫
জ্যৈষ্ঠে	,,	৪।৯।৫৫
আষাঢ়ে	,,	০।৩৫।৪২
শ্রাবণে	,,	৪।১৪।২৮
ভাদ্রে	,,	০।৪২।৩৭
আশ্বিনে	,,	৩।৪৩।৪
কার্ত্তিকে	,,	৬।৮।৪৪
অগ্রহায়ণে	,,	১।১।২৮
পৌষে	,,	২।৩০।১৯
মাঘে	,,	৩।৪৯।১৪
ফাল্গুনে	,,	৫।১৬।২৫
চৈত্রে	,,	০।৬।২২

সুতরাং অন্য কোন মাসের সংক্রমণ জান্‌তে হ'লে, সেই মাসের ক্ষেপ যোগ কর্‌বে। আচ্ছা এই কটা অঙ্ক কস দেখি?"

প্রশ্নমালা।*

১। ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠের সংক্রমণ? কাল নির্ণয় কর।

২। ১৭৮০ শকের ২রা কার্ত্তিক কি বার?

৩। ১৩১৯ সালের প্রতি মাসের সংক্রমণ সময় নির্ণয় করিয়া কোন বারে প্রতি মাসের ১লা হইবে নির্দ্দেশ কর।

আমি বলিলাম, "অঙ্ক ক'টা বাড়ী থেকে ক'সে আন্‌বো। আপনি দিনমান-নির্ণয়ের সঙ্কেত বলুন।"

গুরুদেব। "তুমি জান সূর্য্যের উদয় লক্ষ্য কর্‌লে দেখতে পাওয়া যায়, প্রতিদিন একস্থান হ'তে সূর্য্যোদয় হয় না। সূর্য্য বৎসরের মধ্যে কিছুদিন বিষুবতের উত্তরে থাকেন, কিছুদিন বিষুবতের দক্ষিণে থাকেন। এই যাতায়াত প্রসঙ্গে বৎসরের মধ্যে দু'টি দিন মাত্র বিষুবতের উপরে থাকেন, সে কথাও তুমি জান। এখন একবার স্থির ভাবে ভেবে দেখ—বোধ হয় বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চো, যে, বিষুবদ্দিন দু'টিতে দিবা রাত্রি সমান হয়। আর তা'র পর দক্ষিণ গতি আরম্ভ হ'লে, ক্রমে দিন কম্‌তে থাকে। যখন চরম-দক্ষিণ-গমন শেষ হ'য়ে যায়, তখন দিনের চরম হ্রাস হয়, তা'র পর, আবার ধীরে ধীরে দিন বাড়্‌তে থাকে। এইরূপে বাড়্‌তে বাড়্‌তে যখন আবার বিষুবতে আসেন, তখন আবার দিন রাত্রি সমান হয়।

* আমরা প্রত্যেক সূত্রের নীচে কয়েকটি করিয়া প্রশ্ন দিব। যাঁহারা আমাদের নিকট প্রশ্নোত্তর দ্বারা, জ্যোতিষ-প্রসঙ্গের সাহায্যে জ্যোতিষ শিখিতেছেন, তাঁহারা উত্তর নির্ণয় পূর্ব্বক পাঠাইলে ভ্রম-প্রমাদ থাকিলে বুঝাইয়া দিব।

পরদারাবমর্শাচ্চ দগ্ধপুণ্যা হতৌজসঃ।
তস্মাদেতেঽভিহন্যন্তাং ভবদ্ভিরবিশঙ্কিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥

গর্গ উবাচ।

ততস্তে বিবিধৈরস্ত্রৈর্বধ্যমানাঃ সুরারয়ঃ।
শিরঃস্থ লক্ষ্ম্যাপ্যাক্রান্তা বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৬৪ ॥

লক্ষ্মীশ্চোৎপত্য সংপ্রাপ্তা দত্তাত্রেয়ং মহামুনিম্।
স্তূয়মানা সুরৈঃ সেন্দ্রৈর্দৈত্যনাশান্মুদান্বিতৈঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রণিপত্য ততো দেবা দত্তাত্রেয়ং মহামুনিম্।
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ দৈত্যান্তকহর প্রভো ॥ ৬৬ ॥

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবাক্ষরাজর।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুখং লক্ষ্মী রাজ্যং সম্পজ্জনার্দ্দন ॥ ৬৭ ॥

পরদারা হরি' পাপের উদয়
হ'য়েছে দেহে সবার,
গেছে তেজ-বল হয়েছে দুর্ব্বল
সন্দেহ নাহিক আর।
এবে সবে যাও করে অস্ত্র লও
হও সবে আগুয়ান,
নাহি কর ভয় অচিরে সকলে
সমরে ত্যজিবে প্রাণ।" ৬৩ ॥

গর্গ বলে—"মহারাজ করহ শ্রবণ,
দত্তাত্রেয় বাক্যে সবে করিল গমন।
শিরে লক্ষ্মী লয়ে দূরে দৈত্যগণ যায়,
দ্রুত গিয়ে দেবগণ আক্রমে সবায়।
সেই যুদ্ধে দৈত্যগণ হারায় জীবন,
দেবগণ হইলেন, নির্বিশঙ্ক-মন। ৬৪ ॥
লক্ষ্মী শূন্যপথে আইলা দত্তাত্রেয়-পাশ,
জয়ী হ'য়ে দেবগণ হৈলা পূর্ণ-আশ।

ইন্দ্র-সনে দেবগণ, জিনি' দৈত্যগণে,
লক্ষ্মীর করেন স্তব হর্ষযুক্ত মনে। ৬৫ ॥
দত্তাত্রেয়-আশ্রমেতে আসিয়া সকলে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লুটাইলা পদতলে।
বলে—সবে "জয় কৃষ্ণ, জয় জগন্নাথ,
তব সম কেবা?—তুমি জগতের তাত;
দৈত্যভয়, যমভয়, করহ হরণ,
তব সম ভবে আর আছে কোন জন? ৬৬ ॥
জয় নারায়ণ, জয় অচ্যুত, অনন্ত,
ভবে কেবা আছে হেন বুঝে তব অন্ত?
জয় জয় বাসুদেব, অজর, অক্ষয়,
তোমার সমান লোকে আর কেহ নয়।
তোমার প্রসাদে পেনু লক্ষ্মী, রাজ্য আর
পাইনু সম্পৎ-সুখ, পদে নমস্কার।
জয় জয় জনার্দ্দন, অখিলের পতি,
তোমার প্রসাদে আজ ঘুচিল দুর্গতি। ৬৭ ॥

শার্ঙ্গধন্বংশ্চক্রপাণে ভক্তানাং নিত্যবৎসল।
ইতি স্তুত্বা নাকপৃষ্ঠং যথাপূর্ব্বং গতাঃ সুরাঃ ॥ ৬৮ ॥

তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র যদীচ্ছসি যথেপ্সিতম্।
প্রাপ্তুমৈশ্বর্য্যমতুলং তূর্ণমারাধয়স্ব তম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়মাহাত্ম্যবর্ণনে দৈত্যনিবর্হণং নাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

হে শারঙ্গ-ধনুর্ধারী, ওহে চক্রধর,
ভকতবৎসল কেবা তোমার সোসর ?"
এই রূপে স্তব করি' যত দেবগণ,
স্বর্গরাজ্যে পুনঃ সবে করিলা গমন। ৬৮ ॥
হে রাজেন্দ্র, যদি তুমি
বাসনা পূরাতে চাও,
অচিরে তাঁহার পদে
যাইয়া শরণ নাও,
অতুল ঐশ্বর্য্য পা'বে
সন্দেহ নাহিক তা'র,
আরাধনা কর তাঁ'র
বিলম্ব ক'রো না আর"। ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে দত্তাত্রেয়মাহাত্ম্যে দৈত্যনিবর্হণ নামক অষ্টাদশাধ্যায়।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।

ইত্যমের্বচনং শ্রুত্বা কার্ত্তবীর্য্যো নরেশ্বরঃ।
দত্তাত্রেয়াশ্রমং গত্বা তং ভক্ত্যা সমপূজয়ৎ ॥ ১ ॥

পাদসংবাহনাদ্যেন অর্ঘ্যার্ঘাহরণেন চ।
স্রক্‌চন্দনাদি গন্ধাম্বুফলাদ্যানয়নেন চ ॥ ২ ॥

তথান্নসাধনৈস্তস্য উচ্ছিষ্টাপোহনেন চ।
পরিতুষ্টোমুনির্ভূপং তমুবাচ তথৈব সঃ ॥ ৩ ॥

যথৈবোক্তাঃ পুরা দেবা মদ্যভোজ্যাদি কুৎসনম্ ॥ ৪ ॥

পুত্র বলে শুন পিতা, বলিব অপূর্ব্ব কথা
এবে আমি তোমার গোচর,—
"ঋষির বচন শুনি' কার্ত্তবীর্য্য নৃপমণি,
হইলেন অতীব তৎপর।
দত্তাত্রেয় যোগীবর, যেই স্থানে নিরন্তর
সুখেতে করেন অবস্থান,
সেই পুণ্যময় দেশে যায় রাজা ভক্ত্যাবেশে
পূজিবারে আকুল পরাণ। ১ ॥
গিয়ে তথা নরেশ্বর হ'য়ে সভক্তি অন্তর
পাদ্য-অর্ঘ্য করি' আহরণ,
পূজা কৈলা যথোচিত, পরে তাঁ'রে করে প্রীত
করি' তাঁ'র পদ-সম্বাহন।
সুগন্ধ-কুসুম-হার, চন্দন, গন্ধাম্বু আর,
ফল-মূল আহরণ করি',
আনিয়ে অতি যতনে সদা প্রফুল্লিত মনে
দিতেন সম্মুখে তাঁ'র ধরি'। ২ ॥
করি' অন্ন আয়োজন তুষিতেন তাঁ'র মন,
পরে হ'লে ভোজন তাঁহার,
উচ্ছিষ্ট করি' মার্জ্জন, প্রসাদ করি' গ্রহণ,
তুষ্টি চেষ্টা করিতেন তাঁ'র।
এরূপ সেবায় তাঁ'র হইল কৃপা সঞ্চার
পরিতুষ্ট হৈলা অতিশয়,
হাসি' হাসি' নৃপবরে বলিলা কোমল-স্বরে,
দত্তাত্রেয় হইয়া সদয়। ৩ ॥
দেবগণে যেই মত বলেছিলা, সেই মত
এখনো বলিলা যোগীবর,
মদ্যাদির নিন্দা করি' নিজাচার, ছলা ধরি'
বর্ণিলা অকার্য্য বহুতর।
পার্শ্বস্থিতা রমণীরে লক্ষ্য করি' ধীরে ধীরে
নিজাচার করিলা নিন্দন,
"মোরে না ভাবিও যোগী, নারী-মদ্য-মাংসভোগী
কদাচারী আমি হে রাজন। ৪ ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

স্ত্রী চেয়ং মম পার্শ্বস্থেত্যেতদ্ভোগানুকুৎসিতঃ।
সদৈবাহং ন মামেবমুপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি।
অশক্তমুপকারায় শক্তমারাধস্ব ভোঃ ॥ ৫ ॥

পুত্র উবাচ।

তেনৈবমুক্তো মুনিনা স্মৃত্বা গর্গবচশ্চ তৎ।
প্রত্যুবাচ প্রণম্যৈনং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং মাং মোহয়সে দেব স্বাং মায়াং সমুপাশ্রিতঃ
অনঘস্ত্বং তথৈবেয়ং দেবী সর্ব্বভবারণিঃ ॥ ৭ ॥

পুত্র উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রীতিমান্ দেবস্ততস্তং প্রত্যুবাচ হ।
কার্ত্তবীর্য্যং মহাভাগং বশীকৃতমহীতলম্ ॥ ৮ ॥

সদা আমি এই মত জীবন করিনু গত,
মোর সেবা করি'ছ বৃথায়,
কি শক্তি আছে আমার করি তব উপকার?
বৃথা তুমি সেবিলে আমায়।
ঢালি' ঘৃত ভস্মমাঝে, আছ হেথা কিবা কাজে?
শক্তিমান কাছে ত্বরা যাও,
সেবিলে পাইবে ফল মোর সেবা সুনিষ্ফল
মিছা কেন এত কষ্ট পাও?" ৫ ॥

শুনিয়া মুনির ভাষ রাজা না ছাড়িল আশ,
গর্গ-বাক্য করিল স্মরণ,
গললগ্নীকৃতবাসে প্রাণমিয়া পদপাশে
বলে তাঁ'রে বিনয়-বচন। ৬ ॥

অর্জ্জুন বলেন, "দেব, পদে প্রণিপাত,
জানি আমি, তুমি দেব জগতের তাত,
ছাড় দেব, উপহাস, পুরাও মনের আশ,
কৃপা ভিক্ষা করি পদে কাতর অন্তরে।
ভুলায়ো না, দয়াময়, মায়া-মোহে মায়াময়,
মোহিত ক'রো না আজি এ তব কিঙ্করে।
কৃপা করি করুণা করহ ক্ষুদ্র নরে।

হে অনঘ, তুমি পাপ-পুণ্যের অতীত,
সদসৎ যত কিছু তোমাতেই স্থিত,
তোমার বামেতে যিনি, রমণীর শিরোমণি,
সর্ব্বভবারণি ইনি, আছি সুবিদিত।
ইচ্ছাময়ী-ইচ্ছা হ'লে জিয়ে জীব জলে, স্থলে,
অনলে, ভীষণ বনে, নাহি হয় ভীত।
উভয়ের তত্ত্ব আমি জেনেছি নিশ্চিত।" ৭ ॥

পুত্র বলে, পিতা, করহ শ্রবণ—
"রাজার বচন শুনি';
হ'য়ে প্রীত অতি, সহাস্য বদনে
বলিলেন তবে মুনি,— ৮॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

বরং বৃণীষ্ব গুহ্যং মে যৎ ত্বয়া সমুদীরিতম্।
তেন তুষ্টিঃ পরা জাতা ত্বয্যদ্য মম পার্থিব ॥ ৯

যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি গন্ধমাল্যাদিভির্নরাঃ।।
মাংসমদ্যোপহারৈশ্চ মিষ্টান্নৈশ্চাজ্যসংযুতৈঃ ॥ ১০

লক্ষ্মীসমেতং গীতৈশ্চ ব্রাহ্মণানাং তথার্চ্চনৈঃ।
বাদ্যৈর্মনোরমৈর্বীণাবেণুশঙ্খাদিভিস্তথা ॥ ১১ ॥

তেষামহং পরাং পুষ্টিং পুত্রদারধনাদিকম্।
প্রদাস্যাম্যবঘাতঞ্চ হরিষ্যাম্যবমন্যতাম্ ॥ ১২ ॥

স ত্বং বরয় ভদ্রং তে বরং যন্মনসেপ্সিতম্।
প্রসাদসুমুখস্তেঽহং গুহ্যনামপ্রকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৩ ॥

"যাহা ইচ্ছা তব চাও সেই বর,
কবিব এবে প্রদান,
গুহ্য-তত্ত্ব মোর করিলে কীর্ত্তন
তুষ্ট আমি মতিমান। ৯ ॥

হে রাজন্, যেবা মদ্য মাংস দিয়ে
পূজে মোরে ভক্তিভরে ;
ঘৃতযুক্ত যত মিষ্টান্নে সতত
তোষে যত দ্বিজবরে,

বেণু, বীণা, শঙ্খ, আদি বাদ্য যত,
বাজায়ে সম্মুখে মোর,
নৃত্য-গীত-আদি করি' তুষে, তা'র
ভোগার নাহিক ওর ;

গন্ধ-মাল্য-আদি করয়ে অর্পণ,
সতত ভকতি-ভরে,
তুষ্ট হ'য়ে তা'য় পুত্র-দারা-ধন
দিব প্রফুল্ল অন্তরে।

অপঘাত যত নাশিব তাহার
অপমান ঘুচাইব,
অশেষ বিশেষে বিপদে তাহারে
সতত আমি রক্ষিব। ১০-১২ ॥

গুহ্য নাম মোর করেছ কীর্ত্তন,
এই সে কারণে আজ,
তুষ্ট হ'য়ে, তব বাসনা পূরা'ব
কিবা চাও মহারাজ ?" ১৩ ॥

কার্ত্তবীর্য্য উবাচ।

যদি দেব প্রসন্নস্ত্বং তৎ প্রযচ্ছদ্ধিমুত্তমাম্।
যয়া প্রজাঃ পালয়েঽহং ন চাধর্ম্মমবাপ্নুয়াম্॥ ১৪

পরানুসরণে জ্ঞানমপ্রতিদ্বন্দ্বতাং রণে।
সহস্রমাপ্তুমিচ্ছামি বাহূনাং লঘুতাগুণম্॥ ১৫॥

অসঙ্গা গতয়ঃ সন্তু শৈলাকাশাম্বুভূমিষু।
পাতালেষু চ সর্ব্বেষু বধশ্চাপ্যধিকান্নরাৎ॥ ১৬॥

তথোন্মার্গপ্রবৃত্তস্য সন্তু সন্মার্গদেশিকাঃ।
সন্তু মেঽতিথয়ঃ শ্লাঘ্যা বিত্তদানে তথাক্ষয়ে॥ ১৭

কার্ত্তবীর্য্য বলে— "যদি, কৃপাময়,
কৃপাময় মোর প্রতি,
হেন ঋদ্ধি মোরে দাও, দয়াময়,
শক্তিমান হই অতি,
প্রজার পালন করিব এমন,
কষ্ট কারো নাহি র'বে,
আমার পালনে জগত-সংসার
শত-সুখে সুখী হ'বে।
অধর্ম্ম কখন যেন হে আমারে
নাহি করে আক্রমণ,
হেন শক্তি দাও ওহে শক্তিধর,
পদে এই নিবেদন। ১৪॥
সে পরম-তত্ত্ব অনুসরণের
জ্ঞান দাও দয়াময়;
রণেতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ
ধরায় যেন না রয়।
লঘুভার বাহু সহস্র আমার
সদা সর্ব্ব-কার্য্য-ক্ষম,
দাও মোরে প্রভু, সেবিব জগত
মনে এ বাসনা মম। ১৫॥
আসক্তি রহিত হোক গতি মোর
বাধাহীন সর্ব্ব স্থানে,
শৈলাকাশ আর সলিলে কি ভূমে
কিম্বা পাতালে, বিমানে,
সকলের শ্রেষ্ঠ হ'য়ে র'ব সদা,
এই এ মনের আশ,
শ্রেষ্ঠ-জন-হাতে জীবন ত্যজিব
কাটিব যমের ফাঁস। ১৬॥
উন্মার্গে প্রবৃত্ত আছে যত জন,
সন্মার্গ দেখা'ব সবে,
অতিথি পাইব উপযুক্ত জনে,
মন-আশ পূর্ণ হ'বে।
অক্ষয় রহিবে ভাণ্ডার আমার;
অকাতরে দিব দান;
সবে তুষ্ট হ'বে সদা সুখে র'বে
দেখে ফুল্ল হ'বে প্রাণ। ১৭॥

অনষ্টদ্রব্যতা রাষ্ট্রে মমানুস্মরণেন চ ।
ত্বয়ি ভক্তির্মমৈবাস্তু নিত্যমব্যভিচারিণী ॥ ১৮ ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ ।

য এতে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে তান্ বরান্ সমবাপ্স্যসি ।
মৎ প্রসাদৎ প্রভবিতা চক্রবর্ত্তীত্বমীশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

পুত্র উবাচ ।

প্রণিপত্য ততস্তস্মৈ দত্তাত্রেয়ায় সোঽর্জ্জুনঃ ।
আনীয় প্রকৃতীঃ সম্যগভিষেকমগৃহ্নত ॥ ২০ ॥

আগতাশ্চাপি গন্ধর্ব্বাস্তথা চাপ্সরসাং বরাঃ ।
ঋষয়োঽথ বশিষ্ঠাদ্যা মের্বাদ্যাঃ পর্ব্বতাস্তথা ॥ ২১ ॥

গঙ্গাদ্যাশ্চ তথা নদ্যঃ সমুদ্রাজলসংবৃতাঃ ।
প্লক্ষাদ্যাশ্চ তথা বৃক্ষা দেবা বৈ বাসবাদয়ঃ ॥ ২২ ॥

রাজ্যেতে আমার　দ্রব্য নষ্ট কারো
　নাহি হ'বে কদাচন,
আমারে স্মরিলে　নষ্ট-দ্রব্য পা'বে
　জগতের নরগণ ।
তোমার চরণে　সতত আমার
　অটুট ভকতি র'বে,
ক্ষণেকের তরে　যেন হে, ভুলি না
　সুখে সদা র'ব তবে ।" ১৮ ॥
দত্তাত্রেয় বলে,　"শুনহ রাজন,
　পুরিবে মনের সাধ,
যা কিছু চাহিলে　দিলাম সকলি,
　ঘুচে যা'বে পরমাদ ।
আমার প্রসাদে　সুনিশ্চয় তুমি
　রাজচক্রবর্ত্তী হ'বে,
এ বিশ্বের নর　কেহ কোন দিন
　তব তুল্য নাহি র'বে ।" ১৯ ॥
পুত্র বলে পিতা　করহ শ্রবণ—
　"শুনি' দত্তাত্রেয় ভাষ,

কার্ত্তবীর্য্য অতি　হৈলা পুলকিত
　পূরিল মনের আশ ।
দত্তাত্রেয় পদে　করি' প্রণিপাত
　আদেশ তাঁহার লয়ে,
প্রজা-জনে তবে　ডাকিলেন তথা,
　অতি আনন্দিত হ'য়ে ।
অচির কালেতে　হইল তথায়
　অভিষেক-আয়োজন ;
হৈল অভিষেক　পুলকিত সবে
　পূর্ণ-আশ সর্ব্বজন । ২০ ॥
সেই অভিষেকে　আসে স্বর্গ হ'তে,
　যতেক গন্ধর্ব্বগণ,
আসিল অপ্সর,　আসিল কিন্নর,
　মুনি ঋষি অগণন ।
আসে বশিষ্ঠাদি　শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ,
　আসে তথা মেরুগণ,
গঙ্গা আদি নদী　আসিল সাগর
　প্লক্ষ আদি বৃক্ষগণ ।

বাসুকিপ্রমুখা নাগা অভিষেকার্থমাগতাঃ।
তার্ক্ষ্যাদ্যাঃ পক্ষিণশ্চৈব পৌরজানপদাস্তথা ॥ ২৩ ॥

সম্ভারাঃ সম্ভৃতাঃ সর্ব্বে দত্তাত্রেয়প্রসাদতঃ।
অথ সঞ্জাল্য তৈর্বহ্নিং দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সহ ॥ ২৪ ॥

নারায়ণেনাভিষিক্তো দত্তাত্রেয়স্বরূপিণা।
সমুদ্রৈশ্চ নদীভিশ্চ ঋষিভিশ্চাভিষেচিতঃ ॥ ২৫ ॥

আঘোষয়ামাস তদা স্থিতো রাজ্যে স হৈহয়ঃ।
দত্তাত্রেয়াৎ পরামৃদ্ধিমবাপ্যাতি বলান্বিতঃ ॥ ২৬ ॥

অদ্যপ্রভৃতি যঃ শস্ত্রং মামৃতেঽন্যো গৃহীষ্যতি।
হন্তব্যঃ স ময়া দস্যুঃ পরহিংসারতোঽপি বা ॥ ২৭ ॥

ইন্দ্র-চন্দ্র-আদি যত দেবগণ,
বাসুকী প্রভৃতি আর,
যত নাগগণ কৈল আগমন
ল'য়ে গণ যে যাহার।
তার্ক্ষ্য আদি পাখী পৌর, জানপদ,
আসিল সকলে তথা,
রাজ-অভিষেক করি' দরশন,
ঘুচাইল মনব্যথা। ২১-২৩ ॥

ইচ্ছাময় সেই দত্তাত্রেয় যোগী,
তাঁহার ইচ্ছায় সবে,
যথাযোগ্য যত সম্ভার লইয়া
উপনীত হৈলা তবে।
ব্রহ্মা আদি সবে মন্ত্র-উচ্চারণ
করিলেন সেই স্থানে,
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অভিষেক তরে
সবে প্রফুল্লিত প্রাণে। ২৪ ॥

দত্তাত্রেয়-রূপী দেব নারায়ণ,
অভিষেক নিজে করে,
সাগর আপনি আনিলেন বারি
সেই অভিষেক তরে।
নদনদীগণ মুনিগণ সনে
শিরে ঢালে ধারা-জল,
রাজ-অভিষেকে ফুল্ল দিক্‌চয়
ধরা হ'লো সুশীতল। ২৫ ॥

হৈহয়-রাজন অভিষিক্ত হ'য়ে
দত্তাত্রেয় কৃপাবলে,
পূর্ণ ঋদ্ধি লাভ করি' হর্ষভরে
আপন রাজ্যেতে চলে;
রাজ্যেতে আসিয়া সেই নৃপবর,
হ'য়ে অতি বলবান,
শাসি' প্রজাগণে পরম যতনে
করে সবে তুষ্টপ্রাণ। ২৬ ॥

করেন ঘোষণা, আজি হ'তে আর
আমি বিনা কোন জন,
অস্ত্র না ধরিবে, শুধু সুখে র'বে,
আমি করিব পালন।
দস্যু তস্করের করিব উচ্ছেদ
না রাখিব আর ভয়।
পরহিংসা-কারী দেখিলে কাহারে
বধিব তা'রে নিশ্চয়। ২৭ ॥

ষড়ভুজ।

"ঊর্দ্ধ দুই হাতে ধরে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হাতে ধরে মুরলী অধর।
নম্র দুই হাতে ধরে দণ্ড কমণ্ডল।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥"
(শ্রীমৎ লোচনদাস)

শ্রীগৌরাঙ্গ।

নবীন পদ

তুমি হে গৌরচন্দ্র !
ভকত-মানস-রঞ্জন, নিখিল ভুবন-বন্দ্য ॥

তুমি, শচীর দুলাল, পরম দয়াল, গৌরকান্তি লইয়া।
পতিত তারিতে, নাম বিলাইতে, হুঙ্কারে এলে নামিয়া ॥

দিলে জাম্বুনদ হেম, সুনির্ম্মল প্রেম,
(আর) দেখালে রসের রঙ্গ ॥

ওহে ও আনন্দ-কন্দ।
তুমি গৌর-সুন্দর, জগমনোহর, নদীয়া-গগন-চন্দ্র ॥

আজি নামগানে, মধুর কীর্ত্তনে, গেছে যে বিশ্ব ভরিয়া।
গভীর আঁধারে দূরে অতি দূরে আছি হে আমি পড়িয়া ॥

বঞ্চিত প্রাণে, শ্রীনাম গানে,
হইয়ে আছি যে অন্ধ।
তুমি ত্রিলোক-আলোক, নাশ দুঃখ শোক,
ঘুচায়ে দাও হে ধন্দ ॥

ওহে শ্রীগৌরচন্দ্র।
তোমারি দত্ত এ মোর চিত্ত সন্তাপে গেছে জ্বলিয়া।
তুমি রসিক নাগর, রসের সাগর, দাও প্রেম রসে রসিয়া ॥
করুণার এক বিন্দু সঞ্চারে, লভিব পরমানন্দ।
মধুর ঝঙ্কারে, গাইব সংগীত ; দাও হে পরমানন্দ ॥

হে মোর গৌরচন্দ্র ॥
আমি দীন হীন, সদাই মলিন্, তোমারি ভরসা করিয়া।
বহুদিন হ'তে পড়িয়ে বিপদে, কাতরে আছি যে চাহিয়া॥

ওহে বিপদ-বারণ, অধম-তারণ,
ছাড় হে চাতুরী-রঙ্গ।
হে করুণাকর, দীনে দয়া কর, দূর কর ভব বন্ধ ॥
হে আমার গৌরচন্দ্র ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে

প্রাচীন পদ।

নীলাচল পুরে　　গতায়াত করে,
কত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সবাকারে　　কান্দিয়া সুধায়,
যত নবদ্বীপ বাসী ॥

তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম তাঁরে কি ভেটিয়াছ ?

বয়স নবীন　　দলিত কাঞ্চন
জিনি তনুখানি গোর।
হরেকৃষ্ণনাম　　বলয়ে সঘনে
নয়নে গলয়ে ধারা ॥

কখন হাসন　　কখন রোদন
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা,　　শিমূলের কাঁটা
ঐছন সোনার গায় ॥

সবে বলে আহা !　　দেখিয়াছি তাঁহা
থাকেন সাগরকূলে।
তেঁহ জগন্নাথ　　আপনে সাক্ষাৎ
তাঁরে কে মানুষ বলে ॥

যে রূপ যে গুণ　　নাচন কীর্ত্তন,
যে প্রেম বিকার দেখি।
হেন লয় মনে,　　তাঁহার চরণ
সদাই অন্তরে রাখি ॥

গিয়ে নীলাচলে　　ভাগ্য সে ফলিল
দেখিনু চরণ তাঁর।
প্রেমদাসে গায়　　সেই গোরা-রায়
প্রাণ ইহা সবাকার ॥

(এই পদটি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।)

যবনিকার অন্তরালে।

(৭৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

আর একটি কথা, আমাদের যেমন এক একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, প্রত্যেক বস্তুরই সেইরূপ (astral counterpart) আছে। ইট, কাঠ, সোনা, লোহা, বিছানা, মাদুর, টেবিল, চেয়ার সব জিনিসেরই আছে। এখন, যে সকল বস্তু আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি, তাহারা আমাদের সূক্ষ্ম স্পন্দন গ্রহণ করে, আমাদের স্পন্দনে তাহারাও স্পন্দিত হয়। যে আসনে বসিয়া আপনি নিত্য ভগবচ্চিন্তা করেন, সেই আসনে একটা শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইতে ভক্তি বা জ্ঞানের স্পন্দন নির্গত হয়। (এইজন্যই কোন উচ্চ সাধকের আসনে সাধারণ লোক বসিতে পারেন না, সে তীব্র স্পন্দন সহ্য করিতে পারেন না।) সেইরূপ, যে পুষ্প দিয়া আপনি দেব-পূজা করেন, যে মালা দিয়া জপ করেন, অথবা যে চেয়ারে বসিয়া মানসিক চিন্তা করেন, সেই পুষ্প, মালা, বা চেয়ারে অনুরূপ স্পন্দন সঞ্চিত হয়। যে তরবারি বা ছোরা দ্বারা নরহত্যা সাধিত হইয়াছে, তাহ হইতে ক্রোধ ও জিঘাংসার স্পন্দন উত্থিত হয় যে পরিচ্ছদাদি পরিয়া লম্পট কামিনী সম্ভোগ করে, তাহা কামের স্পন্দন বিকীর্ণ করে দুষ্ট ও অসাধু ব্যক্তিগণ যে গৃহে বাস করেন যে শয্যায় শয়ন করেন, যে আসনে উপবেশন করেন, যে বস্ত্র পরিধান করেন, যে পাত্রে পানাহার করেন, সেই সকল পদার্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসাদির স্পন্দনে স্পন্দি থাকে। সুতরাং অপরে তাহা ব্যবহার করিলে ক্ষতিগ্রস্ত বই লাভবান্ হন না। এই জন্যই উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অপরের বস্ত্রাদি পরিধান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে, সাধু ও মহাত্মা প্রভৃতি যে সকল জিনিষ ব্যবহার করেন তাহাতে পবিত্র স্পন্দন সঞ্চিত থাকে। এই কারণেই, গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ, পাদোদক পান প্রভৃতি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

অস্পৃশ্য বস্তু ও স্পৃশ্য বস্তু

হিন্দুর নিকট জল বড়ই পবিত্র। বৈদিক কাল হইতে তাঁহারা জলকে বহু মান্য ও পূজা করিয়া আসিতেছেন। "শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ"—সমুদ্রের জল, কূপের জল আমাদের মঙ্গল বিধান করুক, "আপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ"—জল আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুক, ইত্যাদি জলের স্তব বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। আধুনিক কালেও দেখা যায়, নদীতে স্নান, নদীর জল পান এমন কি স্পর্শ করিলেও আমরা পাপ-মুক্ত হই, ইহা শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুকে নিত্য আহ্নিক ক্রিয়ায় এই বলিয়া জলশুদ্ধি করিতে হয়,

হিন্দুর জল-পূজা।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর জল আমার এই জলে মিলিত হউক, ইহাকে পবিত্র করুক। অবশ্য, সকল জলই হিন্দুর পূজ্য, কিন্তু ইহার মধ্যে গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্যা ও পবিত্রা। ইহার কারণ কি? জড়বাদীরা বলিবেন অপবিত্র জল হইতেই সব রোগের উৎপত্তি। সকল রোগেরই বীজানু (germs) জলে যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হয়, এরূপ অন্য কিছুতে নহে। সুতরাং জল বিশুদ্ধ রাখিতে পারিলে,

কলেরা, জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই জন্যই পবিত্র জলের এরূপ মাহাত্ম্য। অবশ্য এ কথা, যে মিথ্যা, তাহা আমরা বলি না। কিন্তু ঋষিরা যে কেবল জড়দেহের জন্যই ব্যাকুল ছিলেন, তাহাও নহে। জড়দেহের স্বাস্থ্য অবশ্য তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সূক্ষ্মদেহের স্বাস্থ্য (মনের পবিত্রতা) তাঁহারা সহস্রগুণে মূল্যবান মনে করিতেন। মন নির্ম্মল ও পবিত্র করিতে জলের যেরূপ শক্তি, অন্য কোন বস্তুর সেরূপ আছে কি না সন্দেহ।

গঙ্গার মাহাত্ম্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জল একটি উত্তম স্পন্দন-বাহন। সূক্ষ্ম জগতের স্পন্দন, জল সহজেই ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেহ যদি স্নানের সময় পবিত্র-চিন্তা করেন, ভক্তিভাবে স্তব ও মন্ত্রাদি পাঠ করেন, দেব-পূজা বা ভগবদারাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সূক্ষ্মদেহের পবিত্র স্পন্দন জলে সহজেই সঞ্চিত হইতে থাকে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারত-বর্ষীয় নদী কূপাদিতে তাঁহাদের নিত্য-ক্রিয়া (পূজাদি) করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং ঐ জল যে পবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ হইয়া আছে ইহা কি বিচিত্র? এ সম্বন্ধে গঙ্গার প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, আর্য্য জাতির উপনিবেশ স্থাপনাবধি আজ পর্য্যন্ত যাবতীয় দেব-কার্য্যে গঙ্গাজল যত ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ আর কোন নদী হয় নাই। যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, অর্চ্চনা,—সমস্তই চিরকাল গঙ্গোপকূলে হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই যে গঙ্গাজলে পবিত্র স্পন্দন সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা আমাদের মনে পবিত্র স্পন্দন আনিতে সক্ষম—আমাদের পাপচিন্তা দূর করিতে সমর্থ। ইহা ব্যতীত, গঙ্গামাহাত্ম্যের আরও কারণ থাকিতে পারে। পুরাণ-বর্ণিত ভগীরথোপাখ্যানে একটি গূঢ় রহস্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

টাকা পয়সার অপবিত্রতা।

জলের ন্যায়, টাকা, পয়সা, ও নোট প্রভৃতিতেও সহস্র ব্যক্তির সমবেত স্পন্দন পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। তবে জলে যেমন সাধারণতঃ পবিত্র স্পন্দন নিহিত, টাকাকড়িতে সেরূপ নহে। কাম, ক্রোধ, লোভ বা নীচ বাসনাদির স্পন্দনেই ইহারা স্পন্দিত। আবার যে টাকা বা যে নোট যত অধিক পুরাতন হয়, যত অধিক হাত ফেরা করে, তাহার অপবিত্রতা ততই বাড়িয়া যায়। পয়সা ও পুরাতন নোট গুলোর অপবিত্রতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মোহর বা টাকার তত নহে। একজন সূক্ষ্ম-দর্শী বলেন, ক্ষুদ্র এক খণ্ড রেডিয়ম বুক পকেটে রাখিলে উহা যেমন স্থূলদেহে একটা বিষ-ক্রিয়া করে; খানিক পরে সেখানকার চামড়ায় একটা বিষম দুরারোগ্য ক্ষত উৎপন্ন হয়; টাকা পয়সা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিলে উহারাও ঠিক সেইরূপে আমাদের সূক্ষ্মদেহের অনিষ্ট করে, উহাদের অপবিত্র স্পন্দনের দ্বারা মনকে অপবিত্র ও কলুষিত করে। বোধ হয়, এই কারণেই আমাদের দেশে অনেক সাধু মহাত্মা টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন না। আমা-দের, অবশ্য, বর্ত্তমান অবস্থায় ততদূর করা সম্ভব নয়; টাকা কড়ি স্পর্শও করিতে হইবে এবং সঙ্গেও লইয়া যাইতে হইবে। তবে, যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ সঙ্গে রাখিব, অন্য সময় রাখিব না, (বিশেষ, পূজার সময় বা পূজার ঘরে রাখিব না), ইহা মনে থাকিলেই যথেষ্ট।

যাঁহারা সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পান, তাঁহারা বলেন বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্পন্দন আছে। কোন কোন বস্তু হইতে স্বভাবতঃ ভাল স্পন্দন এবং কোন কোন বস্তু হইতে স্বতঃই মন্দ স্পন্দন নির্গত হয়। বহুমূল্য প্রস্তরাদির (যেমন নীলা, মরকতাদির) স্বাভাবিক স্পন্দন পবিত্র। বৃক্ষের মধ্যেও এইরূপ আছে। কোন কোন গাছ স্বভাবতঃ পবিত্র, এবং কোন কোন গাছ অপবিত্র। তুলসী, বিল্ব, অশ্বথ, বট, নিম্ব প্রভৃতি প্রথম শ্রেণিভুক্ত। রুদ্রাক্ষ হইতে স্বতঃই একটা দৃঢ়তা ও তন্ময়তার স্পন্দন নির্গত হয়? এইজন্যই আমাদের দেশে রুদ্রাক্ষ, তুলসীর মালা প্রভৃতি ধারণ করিবার প্রথা আছে। বিশেষ বিশেষ গন্ধদ্রব্যেরও বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে। ধূপ, ধুনা, চন্দন ও পুষ্পাদি স্বভাবতঃ পবিত্র স্পন্দনে স্পন্দিত এবং মৃগনাভি প্রভৃতির স্পন্দন অপবিত্র। এই পবিত্রতার মধ্যেও আবার বিভিন্নতা আছে; কোনটি হয়ত একরূপ পবিত্রতার উদ্রেক করে, অন্যটি হয়ত আর এক রকম পবিত্রভাব জাগায়। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প দিয়া পূজা করিবার বিধি আছে। যে দেবতার যে স্পন্দন অনুকূল (harmonious), সেই দেবতাকে সেই পুষ্প দিবার ব্যবস্থা। ধুনার ধোঁয়া মনসাদেবীর অসহ্য।

পবিত্র দ্রব্য ও অপবিত্র দ্রব্য।

যে বস্তুর যে স্পন্দনটি স্বাভাবিক সেই বস্তুতে যদি সেই জাতীয় স্পন্দন সঞ্চারিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার শক্তি যে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয় ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি কবচ প্রস্তুত করিবার সময় ঠিক এইরূপই করিয়া থাকেন। মনে করুন, এক জন সর্ব্বদাই একটা অকারণ-ভয়ে ভীত হয়। তাহাকে একটা অভয় কবচ দেওয়া প্রয়োজন এ স্থলে কবচ-নির্ম্মাতা কি করিবেন? তিনি প্রথমে তাঁহার বস্তুটি (vehicle) নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন। যে বস্তু হইতে স্বভাবতঃ দৃঢ়তা ও সাহসের স্পন্দন নির্গত হয়, তিনি সেই বস্তুটি লইয়া স্থিরচিত্তে, একাগ্রমনে, তাঁহার সমগ্র ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া, উহাতে সাহসের স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিবেন। ইহা একদিনে না হয়, দু'দিন, চার দিন ক্রমাগত ঐরূপ করিবেন। যখন দেখিবেন উহা খুব শক্তিযুক্ত (Magnetised) হইয়াছে, তখন ঐ ব্যক্তিকে উহা ধারণ করিতে দিবেন। যোগী ও মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তির যে কত জোর তাহা পরে বলিব। কেবল ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা কবচ প্রস্তুত করা, —ইহা শক্তিশালী পুরুষ বা যোগীরাই পারেন। অবশ্য, সাধারণ ব্যক্তি ও কবচ প্রস্তুত করিতে সমর্থ। কিন্তু তাঁহাদের প্রণালী অন্যরূপ। তাঁহারা প্রধানতঃ মন্ত্রশক্তি ও দৈবশক্তির সাহায্যে করিয়া থাকেন। এ কথাও পরে বলিব।

কবচ প্রস্তুত প্রণালী।

কবচের ক্রিয়া।

এখন, ধারয়িতার উপর কবচ কিরূপে কার্য্য করে দেখা যাক তাঁহার সূক্ষ্মদেহে যেরূপ স্পন্দন প্রবল, কবচ দিনরাত ঠিক তাহার বিপরীত স্পন্দন উৎপাদন করিতে থাকে। সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাটি কমিয়া গিয়া, কবচের স্পন্দনই মনে ক্রমশঃ প্রবল হয়। অবশ্য, কবচে তাঁহার বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, কবচের কথা মনে থাকুক বা নাই থাকুক, কবচের যা ক্রিয়া তা হইবেই। কিন্তু যদি

কবচে তাঁ'র প্রবল বিশ্বাস হয়, যদি সর্ব্বদাই মনে হয় কবচ আছে, আমার ভয় কি, তাহা হইলে, তাঁহার নিজের ইচ্ছাশক্তি ও কবচের শক্তি সমবেত হইয়া কার্য্য করে, সুতরাং ফল ও অনেক বেশী হইবে। কবচের শক্তির সহিত বিশ্বাস মিলিত হইলে, কিরূপ অসাধারণ শক্তি জন্মায়, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। একটি স্ত্রীলোকের সদাই কেমন একটা ভয় হইত, বিশেষতঃ রাত্রিতে যখন তিনি একা থাকিতেন। তিনি এক মহাপুরুষের নিকট হইতে একটি অভয়-কবচ ধারণ করেন। এই কবচে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। এক দিন তিনি খুব একটি তেজী ঘোড়া জুতিয়া, গাড়ী নিজে হাঁকাইতে ছিলেন। সহিস পিছনে বসিয়াছিল। গাড়ীখানি বন-পথে যাইতেছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ক্ষেপিয়া গিয়া তীরবেগে বনের মধ্যে ছুটিতে লাগিল। ঘন-সন্নিবিষ্ট বড় বড় গাছের মধ্য দিয়া ঘোড়া নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে, যদি একটি গাছে ধাক্কা লাগে গাড়ী খানি একবারে চুরমার হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া সহিস প্রাণ-ভয়ে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু বিষম আহত হইল। কিন্তু রমণীর তৎক্ষণাৎ ঐ কবচের কথা স্মরণ হইল। তিনি ভাবিলেন "কবচ যখন আছে, তখন আমার কখনও বিপদ হইতে পারে না।" এই বিশ্বাসে তিনি স্থির ও ধীর ভাবে এত দক্ষতার সহিত ঘোড়া চালাইতে লাগিলেন, যে সহজ অবস্থায় সেরূপ কেহ পারে না। তাঁহার শরীর ও মনে একটা অমানুষিক শক্তি আসিল। এইরূপে অনেকক্ষণ দ্রুতগমনের পর ঘোড়া ক্লান্ত হইয়া থামিয়া গেলে, তিনি অক্ষত দেহে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন। পরে তিনি মহাপুরুষকে এই ঘটনাটি বলিয়া তাঁহার কবচের খুব সুখ্যাতি করিলে, মহাপুরুষ বলিলেন "কবচে তোমার অটুট বিশ্বাসই তোমাকে বাঁচাইয়াছে। এই বিশ্বাসবশতঃ তোমার যে মনের বল আসিয়াছিল তাহার সহিত কবচের শক্তি মিলিত হইয়াই এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে।"

কবচের অরূপ ক্রিয়া

কবচ-ধারয়িতার যদি খুব বিশ্বাস থাকে, তিনি বিপদের সময় আর এক প্রকারে সাহায্য পাইতে পারেন। যে মহাপুরুষ কবচ প্রস্তুত করিয়া দেন তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সহিত ঐ কবচের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ (Magnetic tie) বরাবরই থাকে। এখন, ধারয়িতা যদি খুব বিপদের সময় একমনে ঐ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন, যদি অন্তরের সহিত তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে মহাপুরুষ তাহা জানিতে পারেন এবং সূক্ষ্মদেহে আসিয়া অথবা সূক্ষ্ম শক্তি প্রেরণ করিয়া ধারয়িতাকে রক্ষা করেন।

অজ্ঞলোকের কবচ

আমরা দেখিলাম সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষেরাই শক্তি সঞ্চারিত করিতে জানেন, সুতরাং তাঁহারাই কবচাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ। তবে, আমাদের দেশের আচার্য্যগণ যে সকল কবচাদি করিয়া দেন, সেগুলি তো অসার; কারণ, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শীও নন, শক্তিশালীও নন। না—সেগুলিও অসার নহে। কারণ, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, নির্দ্দিষ্ট ফল অবশ্যম্ভাবী; ইহা পণ্ডিতই করুন বা মূর্খই করুন। রসায়ন বিজ্ঞান না জানিয়াও আপনি যদি কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট উপাদানগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করেন, তাহা হইলে বারুদ প্রস্তুত হয় না কি? আলোকতত্ত্ব না জানিয়াও শত শত ব্যক্তি ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিতেছেন না কি? সেইরূপ, সূক্ষ্ম

বিজ্ঞান (occult science) না জানিয়াও আমাদের আচার্য্যগণ ঋষি-কথিত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের উপায়গুলি প্রধানতঃ মন্ত্র-শক্তি ও দৈব-শক্তি।

মন্ত্র কি?

এখন, মন্ত্র ও দেবতা রহস্য যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।* মন্ত্র কি? ইহা একটি অক্ষর বা কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টি। লৌকিক ভাবে ইহার কোন অর্থ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিদিগের দ্বারা এই অক্ষরগুলি এরূপে নির্ব্বাচিত এবং পর পর সন্নিবেশিত যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইলে তদ্দারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে একটি নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন উৎপন্ন হয়। একটি মন্ত্রের দ্বারা এক প্রকার স্পন্দন, অন্য মন্ত্রের দ্বারা অন্য প্রকার স্পন্দন উত্থিত হয়। বহুবার (লক্ষ লক্ষ বার বা কোটি কোটি বার) ঠিক নিয়মানুসারে উচ্চারিত হইলে ঐ স্পন্দন এত প্রবল হইতে পারে যে উহা স্থূল দেহের বা সূক্ষ্ম দেহের অভ্যন্ত স্পন্দনকে সম্যক্ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে, অথবা স্থূল জগতে বা সূক্ষ্ম জগতে একটি বস্তুকে ভাঙ্গিতে পারে কিম্বা গড়িতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য ক্রমে পরিস্ফুট করিতেছি। তবে, এইটুকু স্মরণ রাখিবেন যে ইহা একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া। ধর্ম্ম বা ভগবানে বিশ্বাসের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এক জন নাস্তিক যেমন উত্তম রাসায়নিক (chemist) বা বাদ্যকর (musician) হইতে পারেন, সেইরূপ তিনি মন্ত্রসিদ্ধ ও হইতে পারেন।

শব্দের দ্বারা যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহার যে কি অসাধারণ শক্তি তাহা আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই। এক মতে শব্দ-স্পন্দনের দ্বারাই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং স্পন্দনের দ্বারাই ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহা শাস্ত্রেরই কথা। ইহার তাৎপর্য্য আমরা এখন বুঝিতে পারিব না, কারণ ইহা অতীব দুরূহ। তবে, আমরা নিত্য যাহা দেখিতে পাই তাহা হইতেই কতকটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পাতলা কাচের একটা গেলাস বা বাটী সম্মুখে রাখিয়া, মনে করুন, আমি তাহার নিকট একটা বাদ্যযন্ত্র (বেহালা বা এস্রাজ) বাজাইতে লাগিলাম। বেহালার সুরটি তুলিয়া বা নামাইয়া এরূপ একটি সুর পাওয়া যাইবে, যাহার সহিত ঐ কাচের ঠিক ঐক্য হইবে। অর্থাৎ যখন দেখিব আমি যে সুরটি বাজাইতেছি, কাচ হইতেও ঠিক সেই সুরটি নির্গত হইতেছে, তখনই বুঝিব এইবার কাচের সহিত ঐক্য হইয়াছে। মনে করুন এই সুরটি আমি ক্রমাগত বাজাইতে লাগিলাম। কি দেখিব? দেখিব ঐ গেলাস হইতে ঐ সুরটি ক্রমশঃ অধিক জোরে বাহির হইতেছে। আমি যদি তখনও বেহালা বাজাইয়া যাই, অবশেষে ঐ গেলাসটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কেন এরূপ হয়? কাচের অণুগুলির স্পন্দনের একটি সীমা আছে। যখন তাহাদের স্পন্দন ঐ সীমা অতিক্রম করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই উহা ভাঙ্গিয়া গেল। এই রহস্যটি জানিয়া ইউরোপের একজন বাদ্যকর সাধারণ লোকের

(স্পন্দন পদার্থকে ভাঙ্গিতে পারে)

* এ সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু অধিক জানিতে চান, তাঁহারা যেন শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল প্রণীত (Philosophy of the Gods) নামক পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

বড়ই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যে কোনও অট্টালিকা (যতই সুদৃঢ় হউক না কেন) তিনি বেহালা বাজাইয়া ভূমিসাৎ করিতে পারেন। এবং দু'একটি করিয়াও ছিলেন। ইহাতে লোকে বলিত তাঁহার ভৌতিক শক্তি আছে, তাঁহার অধীনস্থ ভূতেরাই উহা করে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে তিনি বেহালায় নানা সুর বাজাইয়া অট্টালিকার সহিত কোন্‌টির ঐক্য হয় আগে তাহা নিরূপণ করিতেন। তার পর সেই সুরটি অনবরত (২।৩ দিন ধরিয়া) বাজাইতে থাকিতেন। ইহাতে, প্রথমে অট্টালিকা হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইত, পরে উহা দুলিতে থাকিত, শেষে ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইত। ঈদৃশ ঘটনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যে স্পন্দনের দ্বারা কোন বস্তুকে ভাঙ্গা যাইতে পারে।

স্পন্দনের দ্বারা মূর্ত্তি সৃষ্টি।

আবার, সম্প্রতি আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে যে সকল পরীক্ষা ও যন্ত্রাবিষ্কার হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে স্পন্দন বস্তুকে ভাঙ্গিতেও পারে, গড়িতেও পারে। একটি বাদ্যযন্ত্রের উপর খুব লঘু পদার্থ (যেমন লাইকোপোডিয়মের গুঁড়া প্রভৃতি) ছড়াইয়া দিলে দেখা যায়, যে ঐ যন্ত্রে যখন একটি সুর বা রাগিণী বাজানো হয়, তখন ঐ গুঁড়াগুলি কম্পিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে শেষে একটি নির্দ্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে এবং যতক্ষণ ঐ রাগিণীটি বাজিতে থাকে, ততক্ষণ ঐ আকারের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যেমন অন্য রাগিণী বাজান হয়, অমনি ঐ আকারটি ভাঙ্গিয়া গিয়া আর একটি আকার গ্রহণ করে এইরূপে দেখা গিয়াছে যে একটি রাগিণীতে হয়ত একটি ফুলের আকার হইল, অন্য রাগিণীতে হয় ত একটি পাখী সৃষ্ট হইল, তৃতীয় রাগিণী হয় ত একটি পশুর আকার গড়িল, ইত্যাদি। এই সকল পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, যে বিভিন্ন স্পন্দন বিভিন্ন আকার সৃষ্টি করে। শুধু বা তাই কেন? ভাঙ্গিতেও পারে না কি? মনে করুন ফুলের আকারটি সৃষ্ট হইয়াছে। আর একটি রাগিণী বাজাইলে আগে তো ফুলটি ভাঙ্গিবে, তবে নূতন আকার গঠিত হইবে। অতএব, স্পন্দন, ভাঙ্গিতেও পারে গড়িতেও পারে। বহুকাল পূর্ব্বে ঋষিরা আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন যে বিভিন্ন রাগিণীর বিভিন্ন আকার বা মূর্ত্তি আছে এবং ঐ মূর্ত্তিগুলির বর্ণনাও করিয়া গিয়াছেন, যেমন ভৈরবীর এইরূপ আকার, বেহাগের এইরূপ আকার ইত্যাদি (সঙ্গীত শাস্ত্রে বা শব্দকল্পদ্রুমে দ্রষ্টব্য)। শিক্ষিত সম্প্রদায় এ গুলিকে রূপক বা 'গাঁজাখুরি' বলিয়া উড়াইয়া দেন। আমেরিকায় আবিষ্কৃত এই বিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে, বোধ হয় এ গুলিকে আর গাঁজাখুরি মনে হইবে না। প্রকৃত কথা এই, যে এক একটি রাগিণী ঠিক আলাপ করিলে সূক্ষ্ম-জগতে (অর্থাৎ পার্থিব ইথারে ও বায়ুতে) এক একটি মূর্ত্তি গঠিত হয়। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহাদের যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রের শক্তি

বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিও এরূপে রচিত ও গ্রথিত যে তাহাদের স্পন্দনে ঠিক ঐ রূপ ফল হয়, সূক্ষ্মাকাশে এক একটি মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়। এ কথা পরে বলিতেছি। আগে দেখা যাক সূক্ষ্মদেহের উপর মন্ত্রের কোনো ক্রিয়া আছে কি না? মনে করুন, এক ব্যক্তি বড় ক্রোধী, তাঁহার

সূক্ষ্মদেহে ক্রোধের স্পন্দনটি সদাই প্রবল। তিনি যদি নিত্য ২। ১ ঘণ্টা করিয়া একরূপ একটি মন্ত্র জপ করেন যাহা ধৈর্য্য বা ক্ষমার স্পন্দন উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা হইলে ফল কি হইবে? ক্রোধের স্পন্দনটি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকিবে, এবং জপের জোর যতই বাড়িবে, ক্রোধ ততই দমিত হইবে। অবশ্য, ইহার সহিত যদি তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি যোগ দেয়, ক্রোধ দমন করিতে যদি তাঁর আন্তরিক চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ফল আরও শীঘ্র পাইবেন নিশ্চিত। কেবল ইচ্ছা-শক্তি দ্বারাও ক্রোধাদি দমন করা যায়, অনেকে তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্রের সাহায্য লইলে কাজটি সহজে হয়। এইরূপে, বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা, চিত্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে দমন করা যাইতে পারে। কোনো মন্ত্রের দ্বারা বৈরাগ্য আনিতে পারে, কোনো মন্ত্রের সাহায্যে প্রেমের উদয় হইতে পারে আবার কোনো মন্ত্র হিংসা-রাক্ষসীকেও জাগাইয়া দিতে পারে। ডামর ও উড্ডীশাদি তন্ত্রে মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভনাদির যে সকল মন্ত্র আছে, তাহারা এই জঘন্য শ্রেণির। আবার মন্ত্রের স্পন্দন প্রাণময় কোষের উপরেও কার্য্য করিয়া নানাবিধ পীড়া আরোগ্য করিতে সমর্থ। কিন্তু মনে রাখিবেন, মন্ত্রের ফল সম্যক লাভ করিতে অসাধারণ ধৈর্য্য, একাগ্রতা দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ইহা অনেকের নাই বলিয়া, ফলও পান না।

আবার, মন্ত্রের দ্বারা অপরের সূক্ষ্ম দেহের স্পন্দনকে পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত করা যায়। আপনি যদি এক ব্যক্তির উদ্দেশে বা তাঁহার অঙ্গাদি স্পর্শ করিয়া কোনো মন্ত্র একাগ্র ভাবে জপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে ভাবান্তর হইতে পারে। কিন্তু যদি কোনো উপযুক্ত পদার্থে (যেমন অশ্বত্থ পত্র, বট পত্র, ভূর্জ্জপত্র বা প্রস্তরাদিতে) মন্ত্রের স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া, উহা ঐ ব্যক্তিকে ধারণ করিতে দেন, তাহা হইলে ফল আরও শীঘ্র পাওয়া যায়। আমাদের আচার্য্যেরা প্রায় এই প্রকারে কবচাদি প্রস্তুত করেন। অবশ্য, ইহার আনুসঙ্গিক অনেক ক্রিয়া আছে, যেমন কোনো নির্দ্দিষ্ট তিথি নক্ষত্রাদিতে ইহ করিতে হয় এবং দেবতার 'হোম-পূজাদি করিতে হয়। ইহার মধ্যেও অনেক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি, পৃথিবীর সকল বস্তুর উপর অনুক্ষণ একটা প্রভাব (influence) বিস্তার করিতেছে। কিন্তু গ্রহাদির বিশেষ বিশেষ অবস্থান অনুসারে এই প্রভাবের তারতম্য হয়। এক প্রকারে অবস্থিত হইলে অনুকূল স্পন্দন, অন্য প্রকারে অবস্থিত হইলে প্রতিকূল স্পন্দন প্রদান করে। এই জন্য কোন ব্যক্তির কবচ প্রস্তুত করিবার সময় দেখিতে হয় কোন্ দিনে বা কোন্ সময়ে গ্রহাদির প্রভাব (তাঁহার উপর এবং নির্ব্বাচিত পদার্থটির উপর) সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। ইহা ব্যতীত দৈবশক্তির সাহায্য লইলে আরও উত্তম হয়।

মন্ত্র সাহায্যে কবচনির্ম্মাণ।

দৈব শক্তিটা কি? দেবতা কাহাকে বলে? দেবতা শব্দে, ঈশ্বর বা ভগবানকে বুঝায় না।

দেবতা কি?

হিন্দুরা তেত্রিশ কোটী দেবতা স্বীকার করেন বলিয়া কেহ যেন না ভাবেন, হিন্দু বহু-ঈশ্বরবাদী। তবে দেবতারা কি? দেবতারা জীব। আমরা যেমন ভগবানের সৃষ্ট জীব, তাঁহারাও সেইরূপ।

তবে, জ্ঞানে, প্রেমে বা শক্তিতে তাঁহারা সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগকে ভগবানের মূর্ত্তিমান শক্তি বলা যাইতে পারে। আমরা যেমন স্থূলদেহে ভূলোকে বাস করি, তাঁহারা এরূপ করেন না। ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মর্ত্তলোক, প্রভৃতি সূক্ষ্মতর লোকেই তাঁহাদের বাসস্থান; এই সকল লোকেই তাঁহারা তত্তৎ লোকের অনুরূপ সূক্ষ্মদেহে বাস করেন।

আমরা পৃথিবীতেই দেখিতে পাই, সকল জীব সমান নহে, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ উৎকৃষ্ট। উদ্ভিদ অপেক্ষা পশু পক্ষী শ্রেষ্ঠ, পশু পক্ষী অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ। আবার সব পশুপক্ষী সমান নহে; ইহাদের মধ্যেও ইতর বিশেষ আছে, কেহ কম উন্নত, কেহ বেশী উন্নত। সেইরূপ মানুষের মধ্যেও আছে। অসভ্য উলঙ্গ মানুষের সহিত এক জন সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের তুলনাই হয় না। আবার, সাধারণ সভ্য মানুষের চেয়ে ঋষি মহাত্মারা অনেক উন্নত। এমন কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি শাস্ত্র,—সকলেই একবাক্যে বলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি ক্রমোন্নতির নিয়ম (Law of Evolution) আছে। এই নিয়মানুসারে নিম্নতর জীব ক্রমশঃ উচ্চতর জীবে পরিণত হয়। ভগবানের অখণ্ড্য নিয়মেই খনিজ পদার্থ (minerals) ক্রমোন্নত হইয়া, উদ্ভিদে, উদ্ভিদ পশুপক্ষিতে এবং পশুপক্ষী মানুষে পরিণত হইয়াছে। এখন এই ক্রমোন্নতি-শৃঙ্খল কি মানুষে আসিয়াই শেষ হইয়াছে? মানুষের উপরে কি আরও উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর জীব নাই? ইহা অস্বাভাবিক, ইহা অসম্ভব। কারণ, ভগবান একটি অতি প্রকাণ্ড বস্তু, অতি বৃহৎ। মানবের মধ্যে তাঁহার অনন্ত ব্যবধান। মানব, ক্রমোন্নত হইয়া ঈশ্বরে পরিণত হইবে অন্ততঃ ঈশ্বরের নিকটস্থ হইবে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানব এক লম্ফে এই অনন্ত ব্যবধান অতিক্রম করিবে ইহা কি সম্ভব? আমরা দেখিতেছি, জীব ক্রমশঃ উন্নত হয়, তিল তিল করিয়া বাড়ে। একটি বৃক্ষ এক লম্ফে একটি সাধু বা মহাপুরুষ হয় নাই; তাহাকে মধ্যবর্ত্তী অনেক অবস্থা স্বীকার করিতে হইয়াছে। সেইরূপ, ঈশ্বরে পঁহুছিতে হইলে, মানবকেও অসংখ্য উচ্চ অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হইবে। অতএব, মানবের উপরে অনেক উচ্চতর জীব আছেন, ইহা স্বীকার করা ছাড়া উপায় কি? এই উচ্চতর জীবগণই সাধারণতঃ দেবতা নামে অভিহিত।

জীবের ক্রমোন্নতি।

ইহা হইতেই অনেকের মনে হইতে পারে, সকল দেবতাই মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা মনুষ্য-জাতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাহা নহে মানুষের যেমন একটি ক্রমোন্নতি শৃঙ্খল (খনিজ হইতে উদ্ভিদ্ উদ্ভিদ হইতে পশু, পশু হইতে মানব, মানব হইতে উচ্চতর জীব) আছে, সেইরূপ দেবতাদিগেরও একটি পৃথক্ ক্রমোন্নতি-মার্গ আছে। তাঁহারাও সেই মার্গেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন, মানুষেরাও নিজের পথে উঠিতেছে। এই দুই মার্গের মধ্যে বড় একটা সম্বন্ধ নাই। তবে, মানুষ যখন উন্নত হন্, ঋষি বা মহাপুরুষের অবস্থা পান, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে, দেবতাদিগের শৃঙ্খলেও প্রবেশ করিতে পারেন। ইহা মানুষের অন্যতম পথ। সকল মানুষকেই যে দেবতা হইতেই হইবে, তাহা নহে। যাঁহারা দেবযান আশ্রয় করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকায়াদি দেহ

দেব-শৃঙ্খল ও মানব-শৃঙ্খল।

ধারণ করিয়া, উচ্চতরলোকে (মহঃ জন তপঃ আদি লোকে) বাস করেন এবং ক্রম মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইহাঁদের সহিত পৃথিবীর বা মানবের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু যাঁহারা ত্যাগ-মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহারা নির্ম্মাণ-কায়া গ্রহণ করিয়া মনুষ্য-জাতির উদ্ধারের জন্য পৃথিবীর সীমার মধ্যেই অবস্থান করেন। *

অতএব দেখা গেল, দেবতারা পৃথক জীব, তাঁহাদের পৃথক্ ক্রমোন্নতি মার্গ আছে।

নানাজাতীয় দেবতা।

কাজেই, সকল দেবতা সমান উন্নত নহেন ; ইহাঁদের নানা শ্রেণি,—নানা বিভাগ আছে। যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরাঃ, পিশাচ, গুহ্যক, বিদ্যাধর—এইগুলি নিম্ন স্তরের দেবতা। ইহাঁদিগকে দেবযোনি বলে। ইহাঁরা ভুবর্লোকে বাস করেন। ইহাঁরা জ্ঞানে বা প্রেমে যে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা নহে। তবে, সূক্ষ্মজগৎ ইহাঁদের স্বাভাবিক বাসস্থান (natural element) বলিয়া, তথায় ইহাঁদের শক্তি মানবের চেয়ে অনেক বেশী। ইহাঁরা সাধারণতঃ মানবদের সম্বন্ধে উদাসীন, ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই। কিন্তু মানবের দ্বারা উত্যক্ত হইলে অনিষ্ট করেন এবং পূজিত হইলে অনেক উপকারও করেন। উচ্চতর দেবতাগণ ক্রমশঃ উচ্চতর লোকে বাস করেন। ইহাঁরা জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিতে মানবাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা সদাই জীবহিতে নিযুক্ত থাকেন, জীবের পালন ও ক্রমোন্নতির জন্য ভগবান যাঁহার উপর যে ভার দিয়াছেন, তিনি তাহাই করিয়া যাইতেছেন।

দেবতাদিগকে মানব কি রূপে বশীভূত বা আকৃষ্ট করিতে পারে? তাহার কোন উপায় আছে কি? আছে। কিন্তু তাহা অতীব গুহ্য; সিদ্ধ পুরুষেরা সাধারণের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন না।

দেবতা-আকর্ষণ দেবতাসিদ্ধি।

তবে, তন্ত্রাদিতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলেন, প্রত্যেক দেবতার এক একটি পৃথক মন্ত্র আছে। মন্ত্রই দেবতা, দু'য়ে কোন প্রভেদ নাই। ইহার অর্থ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিভিন্ন মন্ত্র বিভিন্ন স্পন্দন উৎপাদন করে ও বিভিন্ন মূর্ত্তি সৃষ্টি করে। এই বিভিন্ন স্পন্দন ও বিভিন্ন মূর্ত্তি বিভিন্ন দেবতার উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ। এক প্রকার স্পন্দন হয় ত যক্ষদিগের অনুকূল (harmoneous), আর একপ্রকার স্পন্দন গন্ধর্ব্বদিগের উপযোগী, তৃতীয় প্রকার স্পন্দন হয় ত কোন উচ্চ দেবতার উপযোগী। অতএব আপনি যদি কোন বিশেষ মন্ত্র একাগ্রভাবে দীর্ঘকাল জপ করেন, তাহা হইলে, সেই মন্ত্রের দেবতা অর্থাৎ (সেই স্পন্দন যে দেবতার প্রীতিপ্রদ সেই দেবতা) তথায় আকৃষ্ট হন। কিরূপ জানেন? যেমন মধুর গন্ধ পাইলে মধুমক্ষিকা আকৃষ্ট হয়, যেখানে ভক্তি কথা হয় সেখানে যেমন চারিদিক হইতে ভক্তেরা আকৃষ্ট হন, আবার যেখানে পরনিন্দা, দুষ্ক্রিয়া ও পাপমন্ত্রণা হয় সেখানে যেমন দুষ্ট ব্যক্তিরা সহজেই আসিয়া জুটে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। অতএব, মন্ত্রদেবতা সাধকের নিকট (সূক্ষ্মাকাশে) আকৃষ্ট হন। শুধু তাই নহে। যদি সাধকের প্রবল অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা থাকে, যদি তিনি মন্ত্রের মূর্ত্তিটিকে পূর্ণরূপে (সূক্ষ্মাকাশে)

* এই সকল রহস্য, আমার শ্রদ্ধেয় পরমবন্ধু কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র" নামক পুস্তকে সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সকলকেই উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গড়িয়া তুলিতে পরেন, তাহা হইলে ঐ দেবতা ঐ মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হন এবং সাধকের কামনা পূর্ণ করেন। যদি সাধক দর্শনাভিলাষী হন, তাহা হইতে দেবতার কৃপায় ক্ষণকালের জন্য সাধকের সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, সাধক দিব্যনেত্রে ঐ সজীব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন। অথবা ঐ মূর্ত্তি ঘনীভূত হইয়া কতকটা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সাধক এবং অপরেও উহা দেখিতে পান। সাধক ঐ দেবতার একান্ত অনুগ্রহভাজন হন, এবং যাহা চান, (যদি সাধ্যায়ত্ত হয়) দেবতা তাহাই দান করেন। এইরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্র-সিদ্ধ বা দেবতা-সিদ্ধ পুরুষ বলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী B. A.

২—অশ্রু।

"বিকাশ-উন্মুখ গোলাপ-কলিকা কি সুন্দর সুকোমল !
নিরাশা হইতে আশার প্রকাশ কি মোহন সমুজ্জ্বল !
ঊষার শিশিরে ধৌত গোলাপ মধুর—মধুরতম ;
অশ্রু-মন্ত্রে জীবিত যে প্রেম কি আছে তাহার সম।"—S. W. Scott.

পাষাণ।

(রাধিকার উক্তি)

কি দোষ করেছি সখি, জানি না সে কৃষ্ণপদে,
মায়া পরিহরি হরি ফেলে গেছে এ বিপদে !
সখিরে পুরুষ-প্রাণ কঠিন পাষাণ সম,
অবলার মর্ম্মজ্বালা ভুলে না ভাবে কখন !
আমি সে শ্রীপদে সখি, করেছি সর্ব্বস্ব দান,
কাঁদি দুঃখে নিরবধি সে কভু কি ভুলে কাঁদে ?

আজি কৃষ্ণ রাজবেশে সিংহাসনে মথুরায়,
আমা হেন শত রাধা লুটাইবে রাঙা পায় ;
আমার সে শ্যাম বিনে অন্য কেহ নাহি চায় !
মন-অলি সব ফেলি ছুটে সেই কোকনদে !

হের সখি বৃন্দাবনে সব আজি শোকাকুল,
কাননে গাহে না পাখী উদ্যানে ফোটে না ফুল ;
বাঁশী বিনে শূন্যময় হ'য়েছে যমুনাকূল—
বৃন্দা বলে—সুখ পিছে দুখ আছে শুন রাধে।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

পাষাণী।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কি দোষ ক'রেছি পদে কহ রাধে হে সুন্দরি,
কেন হেন নিশিদিন দুখানলে জ্বলে মরি !
পুরুষ পরুষ-প্রাণ মিছে আছে এ ঘোষণা
রমণী পাষাণী-সম কেন গো ভেবে দেখে না !
রাধার নিঠুর মান শুনে নাই কোন্ জনা ?
সেধেছি কেঁদেছি কত তোমার চরণে ধরি'।

কে বলে অধমে রাজা ? প্রজা তব বিনোদিনি ;
বিনামূলে অভাগারে কিনেছ হৃদয়-মণি ;
শ্যাম-রাজ্যে প্রাণসখি, তুমি যে হৃদয়-রাণী,
মথুরায় আমি রাজা, তুমি রাজরাজেশ্বরী।

কাতরা মথুরা আজি দুখনীরে যায় ভাসি,
উদ্যান কানন বন ঢেকেছে তামসী নিশি,
হাসি বিনে মসীময় শশীর কিরণ রাশি,
বৃন্দা ভণে—রাজ্য ধনে জিনে না কি প্রেম হরি ?

শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বাস।

যাদুর কুড়ুল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্লেগেল্ নামক একটি ভদ্রবংশীয় যুবক এই সময় বুদাপেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই যুবক অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং কর্ম্মঠ ছিলেন, পড়াশুনায় তাঁহার কিছুমাত্র আলস্য ছিল না। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তাঁহার নাম সর্ব্বোপরি স্থান পাইত। সকলেই বলিত,তাঁহার মত বুদ্ধিমান ছাত্র অনেক দিন যাবৎ উক্ত বিদ্যালয়ে আসে নাই। তাঁহার গায়ে বেশ শক্তিও ছিল এবং তাঁহার সহপাঠীরা সকলই তাঁহাকে খুব ভাল বাসিত।

পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী, শ্লেগেল দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিয়া নিজের পাঠ অভ্যাস করিতেছেন। এই খুনের ব্যাপার লইয়া সহরময় একটা মহা হৈচৈ পড়িয়াছে, সকলের মুখেই সেই খুনের কথা, কিন্তু শ্লেগেলের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তিনি নিজের পড়া লইয়াই ব্যস্ত, একটিবারও তাঁহাকে কেহ এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে শুনে নাই। বড়দিনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে (যাহাকে খৃষ্টমস্-ইভ্ বলে) সহরে সমস্ত বাড়ী আলোক-মালায় শোভিত, কলেজের বাহিরে ছাত্র নিবাস সমূহ হইতে মদের গর্‌রার ভীষণ শব্দ আসিতেছে, সকলেই আমোদে বিভোর, আর শ্লেগেল সেই সময়ে তাঁহার পুস্তকখানি বগলে করিয়া ষ্ট্রসের বাসার দিকে চলিয়াছেন। পথের দু'ধারে ছাত্রেরা আমোদ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি সে দিকে লক্ষ্যও করিলেন না, এক মনে নিজ গন্তব্য পথে চলিলেন। ষ্ট্রস্ তাঁহার একজন সহপাঠী, ইচ্ছা, সেখানে যাইয়া শেষরাত্র পর্য্যন্ত দু জনে একসঙ্গে পড়াশুনা করিবেন।

ষ্ট্রসের সহিত শ্লেগেলের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দু'জনেরই বাড়ী এক গ্রামে, এবং শৈশবকাল হইতেই দু'জন একসঙ্গে পড়িয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ের সকলেই জানিত তাঁহারা উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু। ষ্ট্রসও খুব ভাল ছাত্র, প্রত্যেকবার পরীক্ষার সময় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে খুব জিদাজিদি লাগিত, কিন্তু সেই জিদাজিদিতে তাঁহাদের বন্ধুত্বের কিঞ্চিৎমাত্রও হ্রাস হইত না বরং অধিকতর দৃঢ় করিয়া দিত। শ্লেগেল তাঁহার বন্ধুর সাহস ও সরলতার প্রশংসা করিতেন, আবার ষ্ট্রস্‌ও শ্লেগেল্‌কে অসাধারণ বুদ্ধিমান বলিয়া গৌরব করিতেন।

দুই বন্ধুতে একযোগে বসিয়া পড়িতেছেন, একজন এনাটমির একখানি পুস্তক লইয়া পড়িয়া যাইতেছেন, আর একজন একটা মাথার খুলি লইয়া বর্ণিত স্থানগুলি দেখাইতেছেন, এমন সময়ে সেন্ট্ গ্রেগরি গির্জ্জায় গম্ভীর শব্দে বারটার ঘণ্টা বাজিল। শ্লেগেল ফট্ করিয়া বহিখানা বন্ধ করিয়া তাঁহার লম্বা পা দু'খানা আগুনের দিকে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওই শোন, বারটা বেজে গেল। খ্রীষ্ট্‌মাস্ প্রভাত হ'লো। এস ভাই, একটু গল্প করা যাক্"।

ষ্ট্রস বলিলেন, "আজকাল ছাত্র মহলে নূতন খবর কি?"

শ্লেগেল। "খুনের কথা ছাড়া আর কোন কথাই নাই। আমি আজ কাল সময়ও পাই না যে গল্প গুজব শুনিব।"

ষ্ট্রস্। "আমাদের বুড়া প্রোফেসারের মৃত্যুর দিন, তিনি যে সব বই আর অস্ত্রশস্ত্র এনেছিলেন, তুমি কি সেগুলি সব দেখেছ? শুনেছি সেগুলি দেখ্‌বার যোগ্য।"

শ্লেগেল তামাক খাইবার পাইপে আগুন ধরাইয়া উত্তর করিলেন, "আমি আজ দেখেছি রিন্‌মল্ আজ আমাকে গুদাম ঘরে নিয়া গিয়া সব দেখাইয়াছে। আমি স্কুলিংএর * আদত ক্যাটালগ্ দেখিয়া অনেক গুলি জিনিষে টিকিট মারিয়া দিলাম। যতদূর দেখিলাম তাহাতে একটি জিনিষ কেবল পাওয়া যাইতেছে না, আর সব ঠিক্ ঠিক্‌ই আছে।

ষ্ট্রস্। সে কি?—পাওয়া যায় না! তা'হ'লে বুড়া হপ্‌ষ্টিনের প্রেতাত্মা শান্তি পাবে না! যেটা পাওয়া গেল না, সেটা কি কোন মূল্যবান জিনিষ?

শ্লেগেল। ক্যাটালগে বর্ণনা আছে, সেটা একখান সাবেক ধরণের টাঙ্গী বা কুড়ল; তার ফলাটা ইস্পাতের আর দাণ্ডিটা রূপার রেলওয়ে কোম্পানীর কাছে চিঠি লেখা হয়েছে। পাওয়া যাবে অবশ্য।"

'যেতে পার'—বলিয়া ষ্ট্রস্ অন্য কথা পাড়িলেন। আগুন মিট্ মিট্ করিয়া জলিতেছিল। দুই বন্ধুতে এক বোতল রেনিশ (এক প্রকার মৃদুওয়াইন্ বা সরাপ বিশেষ) শেষ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং শ্লেগেল প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া গায়ের মোটা কাপড় খানা জড়াইয়া সড়াইয়া লইয়া বলিলেন, 'উঃ, কি ভয়ানক শীত!—কিহে, তুমিও যে টুপি মাথায় দিলে, তুমিও কি যাবে নাকি?'

ষ্ট্রাস্ কপাট লাগাইয়া দিয়া বলিলেন, 'হা, আমি তোমার সঙ্গে যা'ব।' বন্ধুর হাত ধরিয়া বন্ধুর সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, 'আমার শরীরটা বড় মেদা মেরে গেছে, চল তোমার বাসা পর্য্যন্তা বেড়াইয়া আসি, তা হ'লে একটু চাঙ্গা হ'বে এখন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নানা বিষয় আলাপ করিতে করিতে বন্ধুদ্বয় ষ্টিফেন ষ্ট্রীট দিয়া জুলিয়েন্ স্কোয়ার পার হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। যখন গ্র্যাণ্ড স্কোয়ারে উপস্থিত হইলেন, তখন যে স্থানটাতে শিফারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিকে দৃষ্টি পড়াতে স্বভাবতঃ ঐ খুনের সম্বন্ধে কথা উঠিল।

শ্লেগেল সেই স্থানটার দিকে লক্ষ্য করিয় বলিলেন, 'ঐ খানে তাহার লাস পাওয়া গিয়াছিল'।

ষ্ট্রস্। হয় তো হত্যাকারী আমাদের কাছেই আছে, চল তাড়াতাড়ি এখান থেকে যাই।

উভয়েই ফিরিয়াছেন, এমন সময় শ্লেগেল

* জমীদার স্কুলিং যিনি এই সকল দ্রব্য তাঁহার মৃত্যুকালে দান করিয়াছিলেন।

সহসা ক্লেশবোধক একটি শব্দ করিয়া হেঁট হইলেন।—বলিয়া উঠিলেন, 'আমার জুতা ফুঁড়িয়া পায় একটা কি বিঁধিয়াছে'।—এই বলিয়া বরফের মধ্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে একখানি ছোট চক্‌চকে কুড়ুল টানিয়া বাহির করিলেন। কুড়ুলখানি সমস্তই ধাতুময় বলিয়া বোধ হইল—ফলাখান অল্প উপরের দিকে উল্‌টান ছিল; তাই তাঁহার পা উহার দ্বারা কাটিয়া গিয়াছিল।

শ্লেগেল বলিয়া উঠিলেন, 'এই দিয়াই খুন করিয়াছিল।'—সঙ্গে সঙ্গে ট্রেস্‌ও বলিয়া উঠিলেন. 'মিউজিয়মের সেই রূপার কুড়ালি!'

সেই অস্ত্রখানিই যে হত্যার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং সেই খানিই যে সেই মিউজিয়মের কুড়ালিই বটে, তাহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না। ওরূপ অদ্ভুত অস্ত্র দু'খানি ছিল না, এবং কোপের যে রকম দাগ দেখা গিয়াছিল, তাহা ঠিক্ ঐরূপ একখানি অস্ত্র দ্বারা ভিন্ন হইতে পারে না। এখন স্পষ্ট বুঝা গেল যে হত্যাকারী ব্যক্তি সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য সম্পন্ন করার পর অস্ত্র খানিকে ঐখানে ফেলিয়া দিয়াছিল, এবং সেখানে উহা বরফ চাপা পড়িয়া ঢাকা পড়িয়াছিল। যেখানে লাস পাওয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে এই স্থানটি প্রায় কুড়ি গজ তফাৎ। এ যাবৎ বহুতর লোক ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিয়াছে বটে, কিন্তু বরফ খুব পুরু হইয়া পড়ায়, এবং ঐ স্থানটি চলাচলের স্থান হইতে কতকটা এক পার্শ্বে হওয়ায়, এ পর্য্যন্ত কুড়ালি খানি কাহারও চক্ষে পড়ে নাই।

শ্লেগেল অস্ত্রখানি হাতে তুলিয়া লইলেন, জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিতে পাইলেন, উহার সমস্ত ধারটাতেই রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে—দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন "এখন এখানিকে লইয়া আমরা কি করিব।"

ট্রেস্। "পুলিসের কমিসারির (প্রধান কর্ম্মচারীর) কাছে লইয়া যাই চল।"

শ্লেগ। "তিনি এখন শুইয়া আছেন—কিন্তু তাহাই করা উচিত বটে। এখন প্রায় চারিটা বাজে—আমি না হয় ভোর পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিব। তার পর তাঁহার প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বেই অস্ত্রখানি লইয়া তাঁহার কাছে হাজির হইব। এখন চল, এ খানিকে লইয়া আপাততঃ আমরা একবার বাসায় যাই।"

ট্রেস্। "সেই কথাই ভাল।"

এইরূপ কথোপকথনের পর, তাঁহারা যেরূপ আশ্চর্য্য রকমে এই অস্ত্রখানি পাইলেন, সেই বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে, দুই বন্ধুতে শ্লেগেলের বাসার দিকে চলিলেন। যখন বাসার দরজার নিকট আসিলেন, তখন ট্রেস্ "গুড্‌বাই" করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্লেগেল তাঁহাকে বসিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি আর বসিলেন না, দ্রুতপদে আপনার বাসার দিকে চলিয়া গেলেন।

শ্লেগেল কিঞ্চিৎ হেঁট হইয়া তালায় চাবি লাগাইতেছিলেন, এমন সময়, কি আশ্চর্য্য!—হঠাৎ তাঁহার মনের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিলেন—হাত হইতে চাবি খসিয়া পড়িল। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি সেই কুড়ালিখানির দাণ্ডিটাকে দৃঢ় করিয়া ধরিল, এবং তাঁহার চক্ষু অতি ভীষণভাবে তাঁহার সেই গমনশীল বন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সে

দিনকার সেই বিষম শীতেও তাঁহার কপোল-দেশে ঘর্ম্ম দেখা দিল—মুহূর্ত্তকাল বোধ হইল যেন তিনি নিজের প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছেন—নিজের গলা নিজেই চাপিয়া ধরিলেন—বুঝি বা তাঁহার দম্ আট্‌কাইয়া যায়। কিন্তু সে প্রবল যাদুর শক্তি কিছুতেই তিনি রোধ করিতে পারিলেন না—পরক্ষণেই আনত শরীরে দ্রুত অথচ নিঃশব্দে পদে পদে বন্ধুর অনুসরণ করিলেন।

ষ্ট্রস্ দৃঢ় পদক্ষেপে বরফের উপর দিয়া নিশ্চিন্তমনে চলিয়া যাইতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে গুণ্ গুণ্ করিয়া একএকটু গান করিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে যে কেহ আসিতেছে, তাহা তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। যখন ষ্ট্রস্ গ্র্যাণ্ড স্কোয়ারে পঁহুছিলেন, তখন শ্লেগেল তাঁহার চল্লিশ গজ পশ্চাতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। যখন ষ্টিফেন্ ষ্ট্রীটে, তখন দশ গজ পশ্চাতে—শ্লেগেল তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে।

ষ্ট্রস্ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে চলিয়াছেন। ক্রমে শ্লেগেল তাঁহার দুই হাত পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইল—কুড়ালিখানি চন্দ্রের আলোকে একবার ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল, এমন সময় বোধ হয় ষ্ট্রসের কানে কোনরূপ শব্দ যাওয়ায়, তিনি হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সম্মুখে শ্লেগেলের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে চমকিত হইয়া গেলেন।—মুখ পাঙ্গাশ বর্ণ, চক্ষু দুটা রক্তবর্ণ, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিতেছে, দেখিয়াই ষ্ট্রসের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ভাবিলেন এ কি?—শ্লেগেলকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "ওকি ভাই? ভয় পাইয়াছ নাকি? তোমার ওরূপ চেহারা হইয়াছে কেন? এস, আমার সঙ্গে আমার বাসায়—আরে, ক্ষেপেছ নাকি? কর কি? থাম, এখনই কুড়ালি ফেল—ফেল, নয়তো এখনি তোমার গলা টিপে মারিব।"

শ্লেগেল কিছুতেই থামিল না, ভয়ঙ্কর রব করিয়া, কুড়ালি উঠাইয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে গেল, কিন্তু ষ্ট্রস্ সহজে ভয় পাইবার লোক নহেন, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে শ্লেগেলের কোমর জড়াইয়া ধরিলেন। শ্লেগেল যে কোপ উঠাইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইল। লাগিলে নিশ্চয়ই তাঁহার মাথাটা দুই খণ্ড হইয়া যাইত।

কিছুক্ষণ উভয়ে ঘোরতর কোস্তাকুস্তির পর, ষ্ট্রস্ শ্লেগেলকে ফেলিয়া দিলেন, উভয়ে বরফের উপর পড়িয়া লটাপটি করিতে লাগিলেন। ষ্ট্রস্ শ্লেগেলের দক্ষিণ হস্তখানি সজোরে ধরিয়া রহিলেন, এবং প্রাণপণ শক্তিতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া দুইজন বলবান পুলিস প্রহরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সেই উন্মত্ত শ্লেগেলকে দমন করিতে পারিল না। তিন জনে হিম্‌সিম্ খাইয়া গেলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার হাত হইতে কুড়ালি খসাইতে পারিলেন না। একজন প্রহরীর নিকট খানিকটা রসি ছিল, সে কৌশলক্রমে সেই রসি দিয়া শ্লেগেলের শরীরের সঙ্গে হাতখানি বান্ধিয়া ফেলিল, এবং সেই অবস্থায় কোন গতিকে কতক ঠেলিতে ঠেলিতে, কতক টানিয়া হিঁচড়াইয়া বহু কষ্টে তাহাকে কোতয়ালিতে লইয়া গেল। শ্লেগেল সারা পথ ঘোরতর ধস্তাধস্তি ও চীৎকার করিতে লাগিল।

যদিও ট্রুস্ এই কার্য্যে পুলিস্‌কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে থানা পর্য্যন্ত গিয়াও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে, তিনি নিতান্ত কাতর ও দুঃখিত হইয়াছিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার বন্ধুর প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা না হয়, সে জন্য তিনি পুলিসের লোক-দিগকে বারম্বার বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বন্ধুর মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতেই যে তিনি এরূপ কদর্য্য কার্য্য করিয়াছেন, তাহা পুলিসকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্যও অনুরোধ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

বৃন্দাবন।

কহ ব্রজধাম, কোথা গেল তব,
মধুর শোভা ?
কোথায় তোমার, সে নীলরতন,
ব্রজের আভা ?
কুসুমের হার, কোথায় তোমার,
হৃদয়-লোভা ?

বিকসিত ফুল, শোভায় অতুল,
কেন শুকা'ল ?
কোথায় তোমার সে মধুর হাসি,
কোথা লুকাল ?
সে ব্রজভূষণ, ব্রজের রতন,
কোথা বিকাল ?

ব্রজ-গগনের, শ্যাম-সুধাকর
বনমালিয়',
চিরদিন তরে, কালা না তোমায়
গেছে ছাড়িয়া ?
কহ কেবা নিল, তোমারে মারিল
তারে কাড়িয়া ?

বাজে না কি আর, সে মধুর বাঁশী
প্রাণ মোহিয়ে ?
আর কি যমুনা, তেমন করিয়া,
যায় বহিয়ে ?
ফুটে কি গো ফুল, শোভায় অতুল,
বন ভরিয়ে ?

আর কি কোয়েলা, ভুবন মাতায়ে,
সুতানে গায় ?
ফুলের সুবাস, মিশে কি গো আর,
মলয় বায় ?
হেরি ফুলদল, করি কি গো ছল
ভ্রমর ধায় ?

ওগো ব্রজধামে, যত সুখ তব
গেছে ফুরায়ে,
কেহ যেন আসি, আশার প্রদীপ,
দেছে নিবায়ে,
ফুল্ল প্রসূন, আশার কুসুম,
গেছে শুকায়ে।

জীবনের সাধ, যাহা ছিল তব,
গেছে ফুরায়ে
নীরস জীবন, কাটিবে কি আর
শুধু দেখায়ে ?
যমুনা-সলিলে, মৃদুল হিল্লোলে
যাও লুকায়ে।

শ্রীহরিপদ দে

সরস্বতী।

কে জানে কে বলিতে পারে।
মা বোলে ডাকিতে হৃদে দেখি রে কারে।
দেব দেবী যথা যত সকলি মা বুঝি না তো
তাই মার এ নবরূপ ভাবি বিচারে।
প্রফুল্ল-কমল-বনে বর্ণ পুণ্ডরীকাসনে
মরালে মা সমাসীনা দেখ না তাঁরে।
শুভ্রকান্তি বিম্বাধরা সুশ্বেত-বসন-পরা
নবীনা নমিতাঙ্গী মা স্তনের ভারে।
ত্রিলোচনা মুক্তকেশী ভালোপরে খণ্ডশশী
মুকুটে মণির তেজে তপন হারে।
শরীরে ভূষণ যত গরবে ঝলকে কত
চরণে নূপুর স্বর রাখিতে নারে।
কুসুম-সৌরভ মেখে, ধীর বায়ু থেকে থেকে
কাঁপায়ে কমল-কোণ সেবিছে তাঁরে।
রূপসী ষোড়শী বালা বীণা-বিদ্যা-জপমালা
সুধাভরা কুম্ভ ধরা চারিটি করে॥
বাগ্‌দেবী বাণী ভারতী স্বরাক্ষরা সরস্বতী
কামধেনু ত্রয়ী নামে পূজি রে যারে॥
বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন করযোড়ে অনুক্ষণ,
বাণী না সেবিলে বাণী মুখে কি সরে॥
বোধানন্দের কণ্ঠদেশে থাক্ দেখি মা এলোকেশে
সাজাইয়া দিবে তোরে কবিতা হারে॥

শ্রীবোধানন্দ নাথ।

গয়াক্ষেত্রে গৌরচন্দ্র।

(৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

শ্রীমধুসূদন দর্শন হইল; মন্দারের অন্যান্য পবিত্র ক্ষেত্রও দেখা হইল; শ্রীহরি-ভক্ত বিপ্র-মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইল; যাহা করিতে মন্দারে গমন তাহা করা হইল; তখন মহাপ্রভু মন্দার ত্যাগ করিয়া চলিলেন। বদন গম্ভীর—যেন কি চিন্তা করিতেছেন। চিন্তামণির চিন্তনীয় ব্যাপার যে কি?—তাহা আমাদের চিন্তার অতীত; তবে বোধ হয়, বুঝি জগতের লোকগণকে শিখাইতেছিলেন যে কোন কার্য্যে সফলকাম হইতে হইলে, এই রূপ তন্মনস্ক হইয়া—কার্য্যোদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া যত্ন করিতে হয়; বুঝিবা দ্বাপরের প্রতিজ্ঞার কথাটিও প্রাণে উদিত হইয়া থাকিবে। বুঝিবা দেখাইতেছেন শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবার জন্য জীবের কিরূপ ব্যাকুলতার প্রয়োজন।

শ্রীগৌরাঙ্গের পার্শ্বে পণ্ডিত গদাধর। তিনি পথ চলিতেছেন বটে, কিন্তু "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।" চরণ চলিতেছে—তাহার চলা অভ্যাস,—তাই সে শ্রীগৌরাঙ্গের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, চক্ষুর দর্শনব্যাপার অভ্যস্ত, তাই সে পিপাসিত চকোরের মত শ্রীগৌরচন্দ্রের বদনচন্দ্রে নির্নিমেষে ন্যস্ত আছে, জগতে তা'র আর অন্য দ্রষ্টব্য নাই—কর্ণ দু'টি উৎকর্ণ হইয়া, কখন শ্রীমুখের মধুর বচন শুনিতে পাইবে, ভাবিতেছে—নাসিকা শ্রীগৌরদেহের পূষ্ট গন্ধবহে শ্বাসগ্রহণ করিয়া গদাধরের প্রাণ রক্ষা

করিতেছে—জিহ্বা কিছু বলিতে চায়—কিন্তু ব'লি ব'লি করিয়া বলা হয় না। যুগল বাহুরও কিছু সাধ হয়, কিন্তু আজও লজ্জার অধিকার আছে। প্রাণ স্বীয় সঙ্গিনী ইন্দ্রিয়শক্তি-গণের সঙ্গে গৌর-সমাগমের জন্য অভিসা-রিণী। প্রাণ ভরিয়া দূর হইতে দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন—

"চম্পক, শোণ কুসুম, কানকাচল,
শীতল গৌরতনু-লাবণী রে।
উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙনীরে॥"

শ্রীগোবিন্দদাস।

কভু বা সখিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে-ছেন—

"গৌরাঙ্গ নাগর রসের সাগর
পিরিতি বুঝব কে?
বিজুরী বাটই গা-খানি মাজল
সুধা সুধারস দে।
কাম-কামান ভুরুর সন্ধান
তাহে কটাক্ষ বাণ,
ধৈরজ ধরম কুলের সরম
ভাঙ্গল মানিনী-মান।
সখিরে, শপথি করি যে তোর।
এ দিনযামিনী গুণী-গুণি-গুণি
না জানি কি হ'বে মোর।

(শ্রীরায়শেখর)

যদিও জগৎ এখনও গোরাচাঁদকে চিনে নাই। তিনি আজিও জগৎ-সমক্ষে প্রকট হন নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গ যাঁহারা—তাঁহাদের চক্ষে ত আর তিনি কোনও দিন অপ্রকট নন। তাঁহারা তাঁহাকে আবি-র্ভাবের দিন হইতেই চিনিয়াছেন। নিজজন সহস্র আবরণে আবরিত থাকিলেও নিজজনের নিকট প্রকট। শ্রীগদাধর ত অন্যপর নহেন

"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌর-বল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥"

সুতরাং শ্রীগদাধরের প্রাণ যে নিজ প্রাণ-নাথের কণ্ঠালিঙ্গনের জন্য ব্যাকুল হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বহুক্ষণ পরে শ্রীগদাধরের কর্ণের আশা পূর্ণ হইল। শ্রীমুখ হইতে বাহির হইল—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যং রাজগৃহং বনম্
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং নদীনাঞ্চ পুনঃপুনা॥"

"এই যে দেশ দিয়ে আমরা চলেছি, এই কীকট দেশ। এরি আর একটি নাম মগধ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই—এ পুণ্য ময় রাজ্য—জগতে প্রসিদ্ধ আছে। এই রাজ্যের মধ্যে গয়াক্ষেত্রের মত পুণ্যতীর্থ জগতে দুর্লভ।

"তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ।
গয়াগমনমাত্রেণ পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥"

গয়াক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র পিতৃঋণ পরিশো-ধিত হয়। পিণ্ডদানমাত্র পিতৃগণ পরমাগতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু গয়ায় প্রবেশের পূর্ব্বে, পুনঃপুনাতীর্থে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। ঐ সেই পুণ্যবতী পুনঃপুনা। শ্রীমৎ লোচন দাস বলিয়াছেন—

"পুনঃপুনা-নদী-তীর্থে উত্তরিলা গিয়া॥
স্নান দেবার্চ্চন তথি করিলা তখন।
পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন॥"

প্রেমময়।

(শ্রীহীন পাগল-লিখিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষাদ-যোগ।

জ্যৈষ্ঠমাস। মধ্যাহ্ন সমাগত। তপনদেব মধ্যগগনে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় প্রখর তপ্তকরে ধরণীকে স্পর্শ করিলেন। ধরণী তাপিতা হইয়া কাতরা হইলেন। তাঁহার উষ্ণ নিঃশ্বাসে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইল। ধরার তনয়-তনয়াগণ যাতনায় অস্থির হইয়া কাতরা জননীর বক্ষের নিভৃত অংশে লুকাইবার জন্য সচেষ্ট হইল। যাহারা আশ্রয় পাইল, তাহারা সেই উত্তপ্ত হৃদয়েও কথঞ্চিৎ শীতল হইল—তাহাদের আর তীব্রতর প্রখর-তপন-করের ভয় রহিল না। তবে মায়ের উষ্ণ নিঃশ্বাস—তাহা সহ্য করিয়া আর কোন সন্তান স্বচ্ছন্দ অনুভব করিতে পারে? যাহারা আশ্রয় পাইল না, তাহাদের যন্ত্রণার অবধি নাই। তাহারা মায়ের উষ্ণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজ নিজ নিঃশ্বাস মিশাইয়া কাতর প্রাণে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। কিন্তু ধাবনেরই বা সামর্থ কৈ? সে প্রখর করে ক্রমেই তাহাদের শরীর শীর্ণ ও মলিন হইতে লাগিল।

সম্মুখে একটি প্রান্তর। সেটি তপন-তাপ-তাপিত বালুকারাশিতে পূর্ণ। চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে। নিকটে বা দূরে কোনও দিকে একটি ক্ষুদ্রতম তৃণও নয়নগোচর হয় না। এ হেন প্রান্তরে, একটি পুরুষ, অনাবৃত মস্তকে, অনাবৃত চরণে চলিয়াছে। পরিধান একখানি মলিন বসন, অঙ্গে জীর্ণ উত্তরীয়, আহা! তাহার কষ্ট দেখিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। সে নিশ্চয়ই নিরাশ্রয়; বোধ হয় নিরাহারে, অন্ন চেষ্টায় বাহির হইয়াছে, নহিলে এমন বিষম সময়ে, কোনও প্রাণীই সহজে গৃহের বাহির হইতে চাহে না।

পুরুষটি সুশ্রী, সুগৌর-দেহ সম্পন্ন; সেই মলিন আবরণে তাহার দেহ-লাবণ্য আবরিত হয় নাই। যদিও অন্নাভাবে শীর্ণ ও ঈষৎ মলিন হইয়াছে—যদিও বিষাদের রেখা, সুস্পষ্টই তাহার আননে লক্ষিত হইতেছে; তথাপি তাহাতে তাহার দেহ-লাবণ্যের হ্রাস হয় নাই। দেখিলে তাহাকে সম্ভ্রান্ত-বংশ-সম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। সে অতিশয় ক্লান্ত—ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে—এক একবার দ্রুত-পদে যাইবার চেষ্টা করিতেছে—আবার তখনি ক্লান্তি আসিয়া তাহার চরণ দু'টিকে অবশ অচল করিতেছে।

বহু দূর গমন পূর্ব্বক সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "হায়, রে! এ পথের কি শেষ নাই?—এ প্রান্তরটা কি অনন্ত? কোথাও কোন দিকে যে একটা গাছও দেখ্‌চি না, জলাশয় ত দূরের কথা—কি হ'বে? কত ক্ষণে কত দিনে? এ কষ্টের অন্ত হ'বে?—হায়! কোথাও কি এমন কেউ নাই যে আমায় রক্ষা করে?—প্রাণের মধ্যে এক একবার কে যেন ব'ল্‌চে, আশ্রয় পা'ব। এই প্রান্তরটা

পার হ'তে পার্‌লেই আশ্রয় পা'ব ! বোধ হয়, এ আশার আশ্বাস মাত্র ! হায়, যাঁ'দের আমি আপনার মনে ক'র্‌তাম—তা'রা ত আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমায় পথের ভিখারী ক'রে, নিশ্চিন্ত মনে আনন্দে কাল কাটা'চ্চে। আমি আছি কি নাই, এ সম্বাদটাও একবার নেয় না। তা'দের উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে, আমি পত্নী আর পুত্র-কন্যা নিয়ে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে কষ্টে কাল কাটাচ্চি; তবু তা'দের হাতে নিষ্কৃতি নাই। তা'রা ছলে-বলে-কৌশলে আমার সর্ব্বনাশ কর্বার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু আমার মন আজো কেন তা'দেরই জন্যে ব্যাকুল? আমার পত্নীও সন্তুষ্টা নন,—আর ত সহ্য হয় না। দিন রাত ত মনে মনে মনকে বুঝাচ্চি—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়ং অতীব বিচিত্রঃ॥"

কিন্তু কৈ? মন ত বোঝে না, আজো তা'দের জন্যই কাতর হয়?—যা ছিল, দিয়েছি, যত দিন ছিল, দিয়েছি-শরীরপাত ক'রে যা উপার্জ্জন ক'রেছি—লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও ক'রেছি—যেথা যা কিছু পেয়েছি, তা'দের এনে দিয়েছি। কিন্তু তা'তেও ত তা'রা তুষ্ট নয়—বলে আরও চাই—আরও পাই কোথা? ভগবান শঙ্কর সত্যই বলেছেন—

"যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ।
তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ॥"

কিন্তু তা'রা যত চায়, তত দিতে হ'বে! ভগবৎ-কৃপায়, নিজ শক্তির অনুরূপ যা সংগ্রহ কর্ত্তে পার্‌বো, তা দিলে তা'রা সন্তুষ্ট হ'বে না। এই যে অনাহারে, নিজের কর্ম্মফলের অনুরূপ কষ্ট সহ্য ক'রে চ'লেছি—কেন? উদরান্নের জন্য!—আচ্ছা! আমি এমন কি কর্ম্ম ক'রে-ছিলাম--যা'র ফলে এই কষ্ট?—কি কর্ম্ম ক'ল্লে, আবার আস্‌বার সময়, এমন কষ্ট পেতে হ'বে না?—দূর হো'ক! আর ঘরে যা'ব না! যাই, একবার দেখি, কারুকে যদি পাই, তবে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি—কিসে এ দুঃখের অন্ত হয়; কিন্তু তা'দের কে দেখ্‌বে?—কে দেখবে? যে দেখে দেখ্‌বে। আমাকেই বা কে দেখ্‌চে? —ভাল! কেউ কি কোথাও নাই? যে বিপন্নের বান্ধব!—জানি না!—"

পুরুষটি অন্যমনস্কভাবে দ্রুতপদে চলিতেছিল; ক্রমে যে, সে প্রান্তরের অপর পারে আসিয়াছে—ক্রমে যে তপন তেজোহীন হইয়া পশ্চিমগগন-প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সহসা, তাহার চিন্তার ঈষৎ বিরামে, সে সম্মুখে দেখিল, একটি নিবিড় অরণ্য। সে সেই কানন দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া, অদূরস্থিত একটি আম্র-বৃক্ষ তলে, স্বীয় জীর্ণ উত্তরীয়খানি পাতিয়া বসিল। মুখে তৃপ্তিব্যঞ্জক একটি শব্দ বাহির হইল। সে বলিল "আ—আঃ!"

সূর্য্যকে পশ্চিমগগনগামী দেখিয়া ধরণীও বলিলেন "বাঁচলাম! আ—আঃ!"—তাঁহার সেই তৃপ্তির শীতল শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সন্তানগুলিও "আ—আ—আঃ! বাঁচলাম!" বলিয়া একে একে বাহিরে আসিতে লাগিল। বৃক্ষতলোপবিষ্ট সেই পুরুষটির দেহেও মায়ের শীতল শ্বাস লাগিল—তাহার হৃদয়ের তাপ যেন একটু কমিল! সঙ্গে সঙ্গে সেই আশ্রয়-

বৃক্ষ হইতে, একটি সুপক্ক ফল তাহার অঙ্কে পতিত হইল। সে সেটি হাতে করিয়া, একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল "বঃ! বেশ আমটি ত? এটি তা'দের জন্যে নিয়ে যা'ব।" সহসা তাহার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি পড়িল—সে দেখিল, গাছে অজস্র আম্র পাকিয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া, বলিল, "তবে এটা আমি খাই, —বড় ক্ষুধা, আগে ক্ষুধা-শান্তি করি; তারপর গাছে ত আরো অনেক র'য়েছে—তা'দের জন্য গোটাকত তখন নিয়ে যা'ব।"

সে আম্রটি ভক্ষণ করিল। তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, সমস্ত দূর হইল। মনের বিষাদ যেন একটু কমিল। বলিল—"বোধ হয়, কেউ আছেন, যিনি বিপন্নের বন্ধু!"

সহসা কানে গেল "আছে বৈ কি বাপ্! নিশ্চয় আছে। না থাকলে এ সুন্দর বিশ্ব রচনা কা'র? বৃক্ষের ফল, প্রস্রবণের জল, ভূমির তৃণ, এ সব কা'র?—কা'র সৃষ্ট ফলে রসনার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আজ তোমার দেহের শ্রান্তি, ক্লান্তি, দূরে গেল?—যে দুরন্ত ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নে এতক্ষণ কাতর হ'য়ে ছুটে ছুটে প্রান্তর পার হ'য়ে এসেছিলে, সে ক্ষুৎ-পিপাসা দূর হ'ল কা'র কৃপায় বাপ্?"

এই কথা বলিতে বলিতে একজন সৌম্য মূর্ত্তি সন্ন্যাসী সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী "ওম্" বলিয়া তাঁহাকে সাদরে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। তাহার হৃদয় প্রশান্ত হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন "এস বাপ, আশ্রমে যাই!"

পুরুষ। "দেব, আপনার আশ্রমে যা'ব, সে ত ভাগ্যের কথা! কিন্তু আমার কুটীরে, পত্নী একাকিনী শিশু-পুত্র-কন্যা-গুলি নিয়ে কি ক'রে থাক্‌বে?—তা'দের ত এখনও আহার হয় নি। হায়, অনাহারে তা'রা না জানি কতই কষ্ট সহ্য ক'র্‌চে। আমি ফিরে না গেলে, তা'দের জীবননাশের সম্ভাবনা। আমায় ফিরে যেতেই হ'বে।"

সন্ন্যাসী। "অসম্ভব! ভেবে দেখ দেখি, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গৃহত্যাগ ক'রে, সমস্ত দিন দ্রুতপদে চ'লে, যে প্রান্তর অতিক্রম কর্‌তে সূর্য্যাস্ত হ'য়েছে—শ্রান্ত তুমি, সে প্রান্তর কি সমস্ত রাত্রেও আবার পার হ'তে পার্‌বে? তা'র পর, এখনও ত তা'দের জন্য কোনও আহার্য্য সংগ্রহ কর্‌তে পার নাই। আচ্ছা! না হয় আমাদের এই আশ্রম-পাদপ হ'তে তা'দের জন্য প্রচুর আম্রই নিয়ে গেলে; কিন্তু, যদি তা'রা এ পর্য্যন্ত আহার্য্য না পেয়ে থাকে, তবে কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তোমার পত্নী জীবিতা থাক্‌লেও শিশুগুলি কি জীবিত থাক্‌তে পারে? কালও ত তা'রা প্রচুর আহার্য্য পায় নাই।"

পুরুষ। "তবে উপায়?"

সন্ন্যাসী। "আমার আশ্রমে এস।"

পুরুষ। "তা'দের কি হ'বে?"

সন্ন্যাসী। "অবোধ! এই সুদীর্ঘ প্রান্তরে আজ শুষ্ককণ্ঠ হ'য়ে যদি তোমার প্রাণবায়ু বাহির হ'তো, তা'হ'লে তা'দের কি হ'তো? তুমি কে? যে তা'দের রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হ'চ্চো? বল্‌বে "তোমার কর্ত্তব্য?" যদি কর্ত্তব্য বোধে কর্‌তে পারতে, তবে অভাব থাক্‌তো না। ভেবে দেখ দেখি, উপার্জ্জনের সামর্থ্য না হ'তে যে একটি সুরূপা বালিকাকে

নিজের দুঃখভাগিনী ক'রেছিলে? সে কি কর্ত্তব্য বোধে? না, আর কারও তাড়নায়? সত্য বটে, সে সময়ে তোমার কিঞ্চিৎ পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, কিন্তু সঞ্চিত ধন ব্যয় করলে ক-দিন থাকে? তায় দুর্জনে সে সব নিয়েছে কাজেই দারিদ্র্য-পীড়নে কাতর হ'য়েছ। থাক্! এখন সে ভাবনা ত্যাগ কর। তা'দের জন্য তুমি কিছু ক'রতে পার না—কারণ এখন তা তোমার ক্ষমতার অতীত। মনে কর না কেন, তা'রা দুর্গম সংসার-কান্তারের এক পারে, তুমি আর এক পারে। তা'রা তা'দের কর্ম্মফল ভোগ করুক; তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর। এস আশ্রমে।"

পুরুষ। "একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?"

সন্ন্যাসী। "বল।"

পুরুষ। "যা'রা আমার আত্মীয় তা'রা ত লোভের বশে আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে আমায় পথের ভিখারী ক'রেছে। কিন্তু তবু তা'দিগকে পর ব'লে মনে ক'রতে পারি না কেন? তা'দের কোনও কষ্টের কথা শুনলে প্রাণ কাঁদে কেন?"

সন্ন্যাসী। "মমতা,—মায়া। এক দিন মহারাজ সুরথও ঐ কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন।"

পুরুষ। "দেব, আর একটা কথা!"

সন্ন্যাসী। "কি?"

পুরুষ। "যদি একজন দয়াময় আছেন, তিনিই যদি সকলকে দেখ্‌ছেন—রক্ষা করছেন; তবে এ সংসারে শোক দুঃখ কেন? শোক দুঃখের সৃষ্টি তিনি করলেন কেন?

সন্ন্যাসী। "নিষ্প্রয়োজনে কিছুই হয় নাই, বাপু! মঙ্গলময়ে অমঙ্গল নাই—প্রেমময়—শুধু প্রেম-ময়—কিন্তু সন্ধ্যা হয়, এখন ও কথা থাক্—আর বিলম্ব ক'রলে, অন্ধকারে যেতে কষ্ট হ'বে।" এই বলিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। সে সকল ভুলিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। কিন্তু তাহার শরীর দুর্ব্বল—চলিবার শক্তি নাই; ক্রমে অবসাদ আসিয়া শরীর আচ্ছন্ন করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। সে তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অচেতন হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিকানন।

সন্ধ্যা সমাগতা। লোকালয়ে, কুলাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক গৃহাঙ্গনে তুলসীতলে দীপদান করিতেছেন। কেহ বা ইষ্ট-স্মরণ করিতে করিতে, গৃহমধ্যে গমন পূর্ব্বক, দীপদানের আয়োজন করিতেছেন। অনেকেই রন্ধনাগারে, রন্ধনাদির উদ্যোগে ব্যস্ত। বৃদ্ধাগণ ইষ্টচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন; কেহ বা বালকবালিকাগণকে লইয়া উপকথায় ব্যাপৃতা। এ অরণ্যে সে সব কিছুই নাই। গুহায় একটি দীপ জলিতেছে। অজিনাসন আস্তৃত। ধূপ-গন্ধে চারিদিক আমোদিত! সন্ন্যাসী সেই দেহটি লইয়া সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক পার্শ্বে একখানি কম্বল পাতা ছিল। তাহারই উপর সেই দেহটি

রাখিলেন। পুরুষটি এখনও অচৈতন্য। সন্ন্যাসী অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কতকগুলি ফলমূল তাহার সম্মুখে রাখিলেন। বলিলেন, "শুন, বাপ্, একটি নাম বলি। এই নামটি স্মরণ রাখিও; সর্ব্বদা স্মরণ করিও—ইচ্ছা হয় উচ্চ-কণ্ঠে উচ্চারণ করিও।" এই বলিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহার দক্ষিণ কর্ণে একটি মধুর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই শব্দতরঙ্গে তাহার অন্তর আন্দোলিত হইল, সে তাঁহার চরণতলে প্রণত হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করি, মঙ্গল হউক, অন্তরে নামের উদয় হউক, নামী প্রত্যক্ষ হউন।"

পুরুষ। "নাম কৈ? এ ত একটি বর্ণ মাত্র। কত দিন কত বার কত লোকের মুখে শুনেছি।"

সন্ন্যাসী। "শুনেছ ব'লেই আজ এখানে আস্তে পেরেছ। অজ্ঞানে, অনেক বার ব'লেছ, সেই পুণ্যেই এখানে এসেছ। এখন, কিছু আহার ক'রে এই গুহামধ্যে যাও। যেখানে ইচ্ছা বিশ্রাম করিও। কোন ভয় নাই। কাল প্রাতে আবার পত্নী পুত্রাদির সঙ্গে মিলিত হ'বে। তোমার আরও পত্নী পুত্রাদি আছে, তা'দের কথা তোমার স্মরণ নাই। তা'দিগকেও পা'বে। ভয় নাই, গুহামধ্যে যত দূর ইচ্ছা যাও! অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। যেথা ইচ্ছা হয়, বিশ্রাম কর গে। কিন্তু নামটি ভুলো না। নিরন্তর মনে মনে জপ কোরো। কোনো বিপদ হ'বে না।"

গুরুদেবের আদেশে, সেই পুরুষটি, ফলমূলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ-পূর্ব্বক গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহামধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র একটি নবযৌবন-সম্পন্না সুন্দরী রমণী আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "নাথ, এত দিনে আমায় আবার মনে প'ড়েছে?"

পুরুষটি যুবতির এইরূপ সম্ভাষণে, চমকিত হইলেন। তাঁহার স্মরণ হইল না, যে তিনি কোনও দিন এ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এমন সময়ে তাহার গুরুদেব পশ্চাৎ হইতে বলিলেন "বাপ্ সন্দেহ কোরো না, এটি তোমারই পত্নী। এ গুহা সত্যের রাজ্য; এখানে কেহ মিথ্যা বলে না। তোমার পিতা মাতাকে তুমি চেন না; তাঁ'রা এক ধাত্রীর হস্তে তোমার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে স্থানান্তরে আছেন। ধাত্রী তোমায় নিজ পুত্রবৎ পালন ক'রেছিল। তাহার কথাও তুমি ভুলে গেছ। সেই সময়েই আমার দুইটি কন্যার সঙ্গে তোমার পরিণয় হয়েছিল। তুমি এই গুহাতেই তা'দের পাণিগ্রহণ ক'রেছিলে। তৎপরে, এক কুলটা তা'র উপপতিগণের সাহায্যে তোমায় এ স্থান হ'তে, ভুলিয়ে নিয়ে যায়। তুমি তা'রে কুমারী জ্ঞানে বিবাহ ক'রে অনেক ধনের অধিকারী হ'য়ে তা'দের দেশেই বাস কত্তেছিলে। তোমার পৈত্রিক ধন যা কিছু ছিল, সে সমস্তই সেই মায়াবিনীর কৌশলে তা'র উপপতিগণ অপহরণ ক'রে স্বতন্ত্র বাস ক'রচে। তুমি নিজে যা কিছু অর্জ্জন ক'রেছিলে—ক'র্‌ছিলে, তা'রা তা'র অধিকাংশই আত্মসাৎ ক'রেছে। সৌভাগ্যক্রমে, আজ তোমার অন্তরে বিষাদের উদয় হ'য়েছিল—তুমি অন্যমনস্কে এই মরু-প্রান্তরটি পার হ'য়ে, আবার আমাদের এই শান্তিকাননে

আস্‌তে পেরেছ। এটি আমার আশ্রম। এখানে এলে মনের সকল অশান্তি দূর হয় ব'লে, এর নাম শান্তিকানন রেখেছি। আমরা সকলেই এই গুহায় থাকি। এই প্রকোষ্ঠটি তোমার এই পত্নীর। আর একটি প্রকোষ্ঠে তোমার আর এক পত্নী আছেন। আমার অন্যান্য পুত্র কন্যাগণও এরি মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে আছেন। ক্রমে সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হ'বে।" এই বলিয়া তিনি সেই যুবতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "মা, তোমার স্বামীকে সঙ্গে ক'রে আমার প্রকোষ্ঠে তোমার জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করগে। তা'র পর তাঁ'র আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও।"

যুবতী, পিতৃপদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামীর কণ্ঠদেশ বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া মাতৃ সন্দর্শনে চলিলেন, যেন দু'টি বালকবালিকা! পুরুষটি একটু সঙ্কুচিত হইয়া যুবতিকে বলিলেন—"পিতার সমক্ষে।"

যুবতী। "তা'তে, দোষ কি নাথ? আমরা কি কোন অন্যায় কার্য্য ক'রুচি। তুমি যে দেশ থেকে এসেছ, সে দেশে কাম ব'লে একটা অতি কুৎসিত ভাব আছে শুনেছি। আমাদের এ শান্তিকাননে সেই ভাবটার স্বভাব আমরা কেউ জানি না। যা মন্দ তা লুকিয়েও ক'র্‌তে নাই, মনেও ভাবতে নাই। যা মন্দ নয়, তা গোপন করবার প্রয়োজন কি? বাবা, আমায় তোমার হাতে দিয়েছেন, দু'জনে পরস্পরকে ভালবেসে সুখে থাক্‌বো বোলে। আমরা যে সুখে আছি, তা দেখ্‌লে কি তাঁ'র অসুখ হ'বে, যে আমি লুকিয়ে তোমায় আদর কর্‌বো? নাথ, কত দিনের পর তোমায় আমায় দেখা। আমি তখনও যেমন তোমার ছিলাম, এখনও তেমনি তোমার আছি। তখন তোমায় আমায় গলা জড়াজড়ি ক'রে, বাবার কোলে ব'সে, কত গান গেয়েছি। এখন তুমি সে সব কথা ভুলে গেছ। আমি যে তোমার, এ কথা কারুকে জান্‌তে দিতে চাও না!"

পুরুষ। "আমার লজ্জা বোধ হয়। আমাদের দেশে পতি পত্নী, একত্রে লোকচক্ষুর সম্মুখে আসে না।"

যুবতী। "এ দেশে নাথ, সকলি উল্টা! দিন কত থাক্‌লেই বুঝতে পার্‌বে। এখন এস এইটি বাবার ঘর। ঐ মা ব'সে রয়েছেন। চল, মায়ের চরণে প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি গিয়ে।"

পুরুষ। "তুমি আগে গিয়ে আমার কথা ব'লে এসো, তার পর, আমি একা গিয়ে ওঁ'র চরণে, প্রণাম ক'রে আসবো।"

যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "একা গেলে, ও ঘরে যেতেই পা'বে না। এমনি ক'রেই যেতে হ'বে। বরং তুমিও এমনি ক'রে আমার গলাটি ধর।" এই বলিয়া নিজের অপর হস্তদ্বারা পতির হস্তখানি নিজের স্কন্ধে দিলেন, বলিলেন "হাত খুলে নিও না। তুমি যে আমায় আবার গ্রহণ ক'রেছ, এ দেখ্‌লে বাবা মা দু'জনে বড় খুসী হ'বেন। ঐ দেখ! বাবা মা যেমন কোরে ব'সে আছেন, অমনি ক'রে দু'জনে গায় গায় ঠেস দিয়ে ব'সে থাক্‌তে কি তোমার সাধ যায় না?"

পুরুষ। "সকলের সামনে কি পারা যায়?"

যুবতী। "ছিঃ! তুমি এখনও এ দেশের লোক হও নি। বাবা যে নামটি দিয়েছেন, সেটি বুঝি জপ কর্‌চো না?"

পুরুষ। "তোমায় পেয়ে ভুলে গেছি।"

যুবতী। "ভুলে গেলেই, আবার আমায় হারা'তে হবে। একবার ছড়াছাড়ি হ'য়েছিল, আবার যেন হয় না। যখন যেথায়, যেমন অবস্থায়, যে কাজই কর না কেন, ও নামটির দিকে মন রেখো। এই দেখ না! আমি নিরন্তর জপ ক'রচি, তাই আর তোমাদের দেশের ও লৌকিক ঘৃণালজ্জাভয় কিছুই নাই। তুমি ও-গুলোকে সঙ্গে নিয়েও যে এতদূর আস্‌তে পেরেছ, সে কেবল আমি তোমায় ছেড়ে দিই নে ব'লে; নইলে, ও সব ভাব নিয়ে এ গুহার ভেতর কেউ আস্‌তে পারে না। জপ কর, সব মলা কেটে যাবে। গীতায় উর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষের কথা প'ড়েছ ত? এ দেশে সেই গাছটা সোজাই আছে। আর সে দেশে সে গাছটা উল্টা। আমাদের এ দেশের সবই তোমার উল্টা বোধ হ'বে। তোমাদের সবই কিন্তু যথার্থ উল্টা। কেন জান? সেগুলো মায়ানদীতে ছায়া বই আর কিছুই নয়। জপ কর্‌চো ত?"

পুরুষটি এইবার সঙ্কোচভাব ত্যাগ করিয়া পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার গুরুদেব বলিলেন "এস বাপ্‌, আমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী—এই কৃপাদেবীকে প্রণাম কর। আজ এঁরই আশীর্ব্বাদে তুমি তোমার চির-দিনের হৃদয়বিহারিণী, আমার এই প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা সুকৃতিদেবীকে আবার বক্ষে ধারণ কোরে কৃতার্থ হ'য়েছে। বাপ্‌, সে দেশের কামজ ভালবাসা, রূপজ মোহ, এ সকল অতি কদর্য্য—কুৎসিৎ। তা'রা শত্রু। তা'দেরই কবলে প'ড়ে, তুমি সুকৃতিকে ভুলে কাম-ক্রোধাদি ছ'টি দুর্দ্দান্ত দস্যুর উপপত্নী প্রবৃত্তির পাণিগ্রহণ ক'রে, মায়ার রাজ্যে দিন কত সুখে বাস ক'রেছিলে। আজ আমার এই প্রাণাধিকা কন্যা সুকৃতির আকর্ষণে, এই শান্তিকাননে আস্‌তে সমর্থ হ'য়েছ; এখন এস বাপ্‌, আমার এই শান্তি-কুটীরে এসে আমার প্রণয়িনী কৃপাদেবীর চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে কৃতার্থ হও। সুকৃতিকে চির-দিন এমনি ক'রে নিঃসঙ্কোচে বক্ষে ধারণ ক'রে রেখো। ওটি আমার বড় আদরের মেয়ে।"

গুরুদেবের আদেশে, সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ, সুকৃতিকে বক্ষে লইয়া তাঁহাদের চরণতলে পতিত হইলেন। সুকৃতি সহস্তে কৃপাদেবীর পদধূলি লইয়া পতির সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। সে ধন্য হইল।

শ্রীশ্রীপঞ্চমী

অয়ি দেবি বীণাপাণি, জননী আমার!
এ দাসের সুনিভৃত হৃদয় মাঝার
আসন পেতেছি তব, মানস প্রসূনে
গাঁথিয়া রেখেছি মালা, ও রাঙ্গা চরণে
অঞ্জলি স'পিব ব'লে! এস তুমি আজ
ল'য়ে চির-কৃপাময়ী দুঃখহরা সাজ!
মা আমার! মোর সুপ্ত পরাণের মূলে
মধু-স্বরা বীণা তব আজি এ অকূলে
বারেক বাজাও মা গো! জন্ম জন্ম ধরি'
জাগে যাহে প্রতিধ্বনি দিবস শর্ব্বরী!
এস মাগো, এস তুমি! কাঙ্গাল সুতের
মিটাইয়ে আশা সাধ—অ-মৃত-লোকের
আনন্দ-সন্দেশ দিয়ে! বসুন্ধরা ভুলি'
ও আরাধ্য পদরজ শিরে লই তুলি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

হৃষীকেশ।

ভারতবর্ষে হৃষীকেশ হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ-স্থান। এখানে পুরাকালে পবিত্রচেতা মুনিঋষিগণ তপঃসাধন পূর্ব্বক ধন্য হইয়া গিয়াছেন। ভরত এখানেই তপস্যা করিয়াছিলেন। ভরতজীর মন্দির এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পবিত্র, অতি খরস্রোতা, স্বল্পায়তনা গঙ্গা ইহার নিম্নে পর্ব্বতগাত্রে প্রবাহিতা হইয়া, স্থানের মাহাত্ম্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছেন। তখন ইহা নিবিড় অরণ্যমাত্র ছিল; এক কথায় ইহা বন্য পশুরই আবাসভূমি ছিল; কেবল দুইচারিজন ত্যাগী পবিত্রচেতা মহাত্মা অরণ্যজাত কটুকষায় ফলমূলদ্বারা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া ভগবদারাধনায় কাল হরণ করিতেন। সে সময়ে এ স্থানে তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহারও বাস ছিল না। ন্যূনাধিক বিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহার অবস্থা এখনকার ন্যায় ছিল না। সে সময়ে হৃষীকেশ নিবিড় অরণ্য মাত্র ছিল। এক্ষণে ইহা মানবের বাসভূমি হইয়াছে। নিবিড় জঙ্গল ক্রমে মনুষ্যের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিপণি-শ্রেণী, তীর্থ-যাত্রী ও পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব পূরণ করিতেছে। তিন চারিটা মিষ্টান্নের দোকান পর্য্যন্ত রহিয়াছে। কিরূপে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল ক্রমে ইহা বর্ণনা করিতেছি। হৃষীকেশের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির সহিত এক মহাত্মার নাম অসম্বদ্ধভাবে জড়িত। ইনি "কাল-কম্বলীওয়ালা" নামে পরিচিত। "কালকম্বলীওয়ালা" যুক্ত-বিভাগ, পঞ্জাব, মারবার প্রভৃতির আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত। ন্যূনাধিক সতের আঠার বৎসর পূর্ব্বে, তিনি এখানে আসেন। এখানে যে সমস্ত সাধু বাস করিতেন তাঁহাদের এবং বদরিকাশ্রম, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি স্থানসমূহের তীর্থযাত্রীগণের অসহনীয় ক্লেশ দেখিয়া ইনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। (ইনি ভারতবর্ষীয় নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু ছিলেন এজন্য "কালকম্বলীওয়ালানাথ" নামে জনসমাজে পরিচিত। একখানি কাল কম্বল মাত্র সম্বল ছিল বলিয়া "কাল-কম্বকম্বলীওয়ালা" আখ্যা পাইয়াছিলেন।) "কালকম্বলীওয়ালানাথ" সাধু সন্ন্যাসী ও বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানের তীর্থযাত্রীদিগের ক্লেশ নিরাকরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজারস্থিত কোন ধনী মারবারনিবাসী বণিকের বাগান বাটীতে আশ্রয় লন। এখানে তিনি তিন দিবস অনাহারে কালযাপন করিয়া শ্রেষ্ঠ মারবারি বণিক সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাঁহারা ইহাঁর অনশন-ব্রত দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এখানে আসেন এবং আহারের জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। "কালকম্বলীওয়ালা" কিন্তু কিছুতেই জলগ্রহণ করিবেন না; অবশেষে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাঁহারা যদি তাঁহার কোন আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করেন, তবে তিনি আহার করিতে পারেন, নতুবা নহে। মারবারি বণিকেরা তাঁহার আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি আহার করিয়াছিলেন।

তিনি এই বণিকদিগকে "হৃষীকেশ" "বদরিকাশ্রম" প্রভৃতি স্থানে ছত্র ও ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিতে বলেন। সকল ছত্রে সমাগত সাধুরা প্রস্তুত আহার্য্য (দাল রুটী প্রভৃতি) ও গৃহস্থেরা আটা দাল ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য প্রাপ্ত হইতে পারেন এরূপ

বন্দোবস্ত করিতে বলেন। হৃষীকেশের ও উত্তরাখণ্ডস্থিত অন্যান্য ছত্রসমূহের সাধুরা পুস্তক বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাহাতে পান তাহারও সুবন্দোবস্ত করিতে বলেন। মারবারি ধনীগণ এই সমস্ত আদেশ পালনে স্বীকৃত হন। অচিরেই তাঁহাদের দত্ত বিপুল অর্থে হৃষীকেশে ছত্র, ধর্ম্মশালা এবং "বদরিকাশ্রম" প্রভৃতি স্থানের রাস্তায় বহু সংখ্যক ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে বদরিকাশ্রমের রাস্তা যেরূপ সুগম হইয়াছে, কিছু-দিন পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এক্ষণে যেরূপ দুই তিন মাইল অন্তর চটি ও ধর্ম্মশালা হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। নিতান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ধনী বা শ্রমসহিষ্ণু দুই চারি জন সাধু ভিন্ন অন্য কাহারও উক্ত স্থানে যাতায়াত অসম্ভব ছিল। যে অল্পসংখ্যক যাত্রী বদরিকাশ্রম যাত্রা করিতেন, তাঁহারা প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও বাসস্থানের অভাবে এবং অসহ্য শীতে প্রায় সকলেই পীড়িত হইয়া অতিকষ্টে ফিরিয়া আসিতেন—কেহ কেহ বা মৃত্যু মুখে পতিত হইতেন। এক্ষণে সে কষ্ট আর নাই। চটিগুলিতে প্রয়োজনীয় আহার্য্য সামগ্রী ও বাসস্থান মিলে। ধর্ম্মশালারও অভাব নাই। দরিদ্র যাত্রীগণ ও সাধুরা স্বর্গীয় ৺কালকম্বলীওয়ালার প্রভাবে রাস্তায় কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় আহার বাসস্থান লাভ করিয়া "বদরী-নারায়ণ" দর্শন করিয়া ফিরিতেছে। মারবারনিবাসী ধনীগণের বিপুল অর্থে ও গভর্ণমেণ্টের সুবন্দোবস্তগুণে প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীগুলির ও পার্ব্বত্য ঝরণার উপর সুন্দর সুন্দর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় বিঘ্নসঙ্কুল "ঝোলায়" আর নদী পার হইতে হয় না। ("ঝোলা" একপ্রকার দড়ির সাঁকো, একবারে দুই জনের অধিক ইহার সাহায্যে নদীপার হওয়া যায় না। ইহার সাহায্যে নদী পার হওয়া অতীব বিপদজনক। একটু অসাবধান হইলেই প্রখর স্রোতা পার্ব্বত্য নদীতে পড়িয়া যাইতে হয়। পার্ব্বত্য নদীর স্রোত এরূপ প্রখর, যে একবার পড়িলেই জীবন হারাইতে হয়। এরূপ "ঝোলা" অর্থাৎ সাঁকো স্বচক্ষে না দেখিলে কোন ধারণা হয় না।) "কালকম্বলীওয়ালা" ইহজগতে নাই কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালাগুলি ও ছত্রসমূহ তাঁহার মহানুভবতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ধর্ম্মশালা ও ছত্রগুলির বন্দোবস্ত মন্দ নহে কিন্তু যেরূপ বিপুল অর্থ ছত্রসমূহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, সেরূপ সুবন্দোবস্ত নাই। কলিকাতানিবাসী মারবারি ধনীরা, তাঁহাদের বিপুল অর্থ, কিরূপে ব্যয়িত হইতেছে দেখেন না বা দেখিবার অবসর পান না। এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে ছত্রগুলির বন্দোবস্ত আরও সুন্দর হইতে পারিত। হৃষীকেশে "কালকম্বলীওয়ালার" ছত্র বারমাসই খোলা থাকে এখানে সমাগত সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে দাল, রুটী, ভাত প্রভৃতি বিতরিত হয়। আশ্বিন মাস হইতে পাঞ্জাবিদের প্রতিষ্ঠিত "পাঞ্জাব-সিন্ধ ছত্র" এবং অন্যান্য অন্যূন চারি পাঁচটি ছত্র খুলে বলিয়া "কালকম্বলীওয়ালার" ছত্র হইতে প্রত্যহ বেলা এগারটা হইতে চারিখান করিয়া রুটী, দাল, ভাত প্রভৃতি সমাগত সাধুদিগকে বিতরণ করা হয়। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত এইরূপ চারিখানা রুটীর বন্দোবস্ত। বৈশাখ মাসের পর অন্যান্য ছত্র বন্ধ হইয়া থাকে; কারণ সে সময়ে অল্পসংখ্যক সাধুই হৃষীকেশে বাস করিয়া থাকেন। বৈশাখের পর হইতে আশ্বিন মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "কালকম্বলীওয়ালার" ছত্র হইতে প্রত্যহ আটখানা করিয়া রুটী সাধুদিগকে বিতরণ করা হয়। যে সমস্ত রুটী

ছত্র হইতে সাধুদিগকে দেওয়া হয়, উহা বাঙ্গালা দেশের রুটীর ন্যায় নহে। এক এক খানা রুটীর ওজন দেড় ছটাক হইতে অর্দ্ধ-পোয়া পর্য্যন্ত হইবে। মোটা রুটী অথচ সুসিদ্ধ ও সুস্বাদু, রুটী দালে ঘৃতেরও যথেষ্ট সংযোগ আছে। এতদ্ভিন্ন যাত্রীদের প্রদত্ত অর্থে প্রায়ই সাধুদিগকে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে, যথা হালুয়া, মালপুয়া, প্যারা, লাড্ডু ইত্যাদি। "পাঞ্জাবসিন্ধ ছত্র" হৃষীকেশে আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রায় আট মাস কাল খোলা থাকে। এই আট মাস কাল এই ছত্র হইতে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে চারিখানি উত্তম রুটী, ভাত, দাইল ও প্রায়ই অন্যান্য উপাদেয় সামগ্রীও সমবেত সাধুদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। উপরোক্ত দুইটি ছত্রই হৃষীকেশের প্রধান ছত্র, এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্র আছে এই সমস্ত ছত্র হইতেও নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ সাধু-দিগকে ন্যূনাধিক পরিমাণ আহার্য্য সামগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে। "পাঞ্জাব-সিন্ধ ছত্র" এবং "কালকম্বলীওয়ালার" ছত্র হইতে মাসে দুইবার করিয়া রাত্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য সাধুদিগকে সরিষার ও কেরোসিন তৈল দেওয়া হইয়া থাকে। পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতিও উভয় ছত্র হইতেই সাধুদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। উভয় ছত্রেই ধর্ম্মগ্রন্থের পুস্তকাগার আছে। উভয় ছত্রেরই ধর্ম্মগ্রন্থ-গুলি সাধুদিগের অধ্যয়নও অধ্যাপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু ছত্রের কর্ম্মচারীদিগের আলস্য বশতঃ এবং তথাকথিত সাধুদিগের অসাধুতা নিবন্ধন অনেকেরই ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। উভয় ছত্রেই পীড়িত সাধুদিগের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় আছে; তথায় একজন করিয়া ডাক্তার থাকিয়া সমবেত রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত "পাঞ্জাবীসিন্ধ" ধর্ম্মশালার সংলগ্ন একটি "সাধু" রোগীদিগের জন্য বাসভবনও আছে। বাসভবনটি বেশ প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। উভয় ছত্রেই রোগীদিগকে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী পথ্যাদি দিবার নিয়ম আছে। এক কথায় হৃষীকেশে আশ্বিন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অন্যূন সাত আট শত নানা সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁদের আহার্য্য, বস্ত্র বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই অভাব হয় না। ইচ্ছা করিলেই ইহাঁরা নিশ্চিন্ত মনে ভগবৎ আরাধনায় এবং জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন কিন্তু তাহারা তাহা-দের কর্ত্তব্য কিরূপ ভাবে পালন করেন তাহা ক্রমে পাঠকবর্গের গোচর করা যাইবে। "কালকম্বলীওয়ালার" এবং "পাঞ্জাব-সিন্ধ" ছত্রে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে গৃহস্থদিগকে সদাব্রত দিবার বন্দোবস্ত আছে। সদাব্রতে তিন পোয়া পরিমাণ আটা, দাল, ঘৃত, মসলা, কাষ্ঠ প্রভৃতি দেওয়া হয়। যাত্রীদের বাসের জন্য উভয় ছত্রের সংলগ্ন ধর্ম্মশালা আছে।

সাধুদিগের বাসের জন্যই হৃষীকেশের বর্ত্তমান অবস্থা। হৃষীকেশের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গা ও এই নদীর মধ্যে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটি দ্বীপ পড়িয়াছে; এইখানে সাধুরা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। হৃষীকেশের স্বাস্থ্য আশ্বিন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ভাল বলিয়া, বহুসংখ্যক নানা সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ এ সময়ে এখানে বাস করিয়া থাকেন। বর্ষাকালে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না এবং গঙ্গা বর্দ্ধিতা হইয়া দ্বীপ প্লাবিত হওয়ায় অনেক কুটীর ভাসিয়া যায়, তজ্জন্য বর্ষার পূর্ব্বেই অধিকাংশ সাধু এ স্থান ত্যাগ করেন। সাধুরা যে দ্বীপের উপর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস

করেন উহা "ঝারি" নামে কথিত হয়। কুটীরগুলি একবারে গঙ্গার উপরে। এই সমস্ত কুটীর সাধুরা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করেন বা মজুর দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া লন। কুটীরগুলি নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে আহৃত কাষ্ঠ এবং "কুস" নামক বনজাত তৃণে নির্ম্মিত। কুটীর দুই প্রকারের হইয়া থাকে। ইহাদের দুই রকম নামও আছে "কুঠিয়া" ও "কূপ বা ঝুপরি"। কুঠিয়াগুলি কিছু প্রশস্ত এক বা ততোধিক ব্যক্তি বাস করিতে পারে। "ঝুপরিতে" এক ব্যক্তি অতি কষ্টে বাস করিতে পারে। "ঝুপরির" আয়তন অতি ছোট; ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে দেহকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিতে হয়। চলিত কথায় হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। অধিকাংশ কূপের ভিতরেই দাঁড়াইতে পারা যায় না। ঝুপরি দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে তিন হাত সাড়ে তিন হাত ও উচ্চতায় আড়াই হাতের অধিক হইবে না। এখানে যে সমস্ত সাধু বাস করেন প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক বেদান্ত-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। অনেকে লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ বা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। অনেক সাধুদের সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ বেদান্তচর্চ্চা ভাষা গ্রন্থের দ্বারাই হইয়া থাকে। অনেক সাধুই অধ্যাপনার কার্য্য করিয়া থাকেন। দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে, সাধুদিগের অধিকাংশের মধ্যেই সংস্কৃত চর্চ্চা বা জ্ঞান তো নাইই হিন্দী ভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যেও তাঁহারা প্রকৃত বেদান্ত-তত্ত্বজ্ঞ হইবার প্রয়াসী নহেন। কোনরূপে বেদান্তের দুই চারিটি গৎ কণ্ঠস্থ করিয়া লোকসমাজে পরিচিত হওয়াই ইহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাঁদের জ্ঞান এরূপ অল্প যে আপনাদের মাতৃভাষা হিন্দীও সম্যক বুঝিতে পারেন না। লজ্জার সহিত লিখিতে হইতেছে, এই সমস্ত সাধুদিগের অধিকাংশই মূর্খ, কেবল পেটের দায়ে সাধুর বেশ ধরিয়াছেন, বেশের পরিপাট্যও বেশ আছে। পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ পঞ্জাব প্রদেশে সাধুর অন্নের অভাব নাই। সাধারণ গৃহস্থেরা যেরূপ অবস্থায় থাকেন তদপেক্ষা ইহাঁরা ভাল অবস্থায় থাকিতে পান। অনেকেরই সাধু হইয়া তবে হাতেখড়ি। সংস্কৃত চর্চ্চার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে দুই চারিজন সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন তাহারা যে প্রণালিতে অধ্যয়ন করেন তাহা অতি অদ্ভুত। এক লঘুকৌমুদী শেষ করিতে তিন চারি বৎসরেরও অধিক কাটিয়া যায়। সাধুরা মুখে "সোঽহং" "সোঽহং" বলেন, তাঁহারা কোন সংকল্প বিকল্প করেন না কিন্তু তাঁহাদের কোন কার্য্যেই তাহার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা মুখে প্রকাশ করেন তাঁহাদের এ সংসারে কর্ত্তব্য কিছুই নাই এবং ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দেন তাহার কষ্ট প্রারব্ধের ফল মাত্র কিন্তু তাহার কষ্টের নিরাকরণ তাঁহাদের অল্প শ্রম সাপেক্ষ হইলেও তাহা সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হন না। এরূপে তাঁহারা অদ্বৈত বাদের পূততত্ত্ব নিজেরা বুঝেন এবং জনসমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। হায়! ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ প্রচারের কেন্দ্র ভূমি হৃষীকেশ—যেখানে তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে পবিত্র অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিতেন, এখনও যেখানে পর্ব্বতগাত্রে ধনরাজ গিরির মঠ অবস্থিত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর বাসস্থান পর্য্যটককে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, তথাকার অধিবাসী সাধুবৃন্দ ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত পবিত্র অদ্বৈতবাদতত্ত্বের স্বকপোলকল্পিত আলস্য কর্ম্মহীনতার প্রশ্রয়দায়ক অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অবনত ভারতে সকলই সম্ভব

হইয়াছে। এই সমস্ত সাধুরা বুঝেন না যে তাঁহারা বেদান্তবিচারের সম্পূর্ণ অনধিকারী। এক কথায় ইঁহারা অদ্বৈতবাদের দোহাই দিয়া আলস্যপরায়ণ হইয়া দেশবাসীর অর্থে পুষ্ট হইতেছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশবাসী জনসাধারণকে অদ্বৈতবাদের ভ্রমাত্মক অর্থ বুঝাইতেছেন। তাঁহারা নিজেরা যে বিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ে অন্যকে বুঝাইবার ক্ষমতা তাঁহাদের কিরূপে থাকিতে পারে? অদ্বৈতবাদ এত সহজ হইলে, পুরাতন মনীষীরা বারংবার তাঁহাদের গ্রন্থে অধিকারীর উল্লেখ করিয়া যাইতেন না। যাহা লক্ষের মধ্যে একজনেরও আয়ত্তাধীন হওয়া অতি দুরূহ; তাহারই তত্ত্ববেত্তা এক্ষণে সকলেই হইয়া উঠিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ যেন বালকের ক্রীড়ার দ্রব্য হইয়াছে। এইরূপে, কর্ম্মতৎপরতার যুগে যখন সমগ্র পৃথিবীবাসী কর্ম্মস্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে, ভারতবাসী অদ্বৈতবাদের বিকৃত অর্থ হৃদয়ে পোষণ করিয়া ক্রমেই অলস ও কর্ম্মহীন হইয়া জগতে ঘৃণ্য জাতিরূপে পরিগণিত হইতেছে। গীতায় ভগবান বারংবার নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন; এইরূপে নিঃসঙ্গ ভাবে কর্ম্ম করিয়াই রাজর্ষি জনক নানাবিধ ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছেন। পতিত ভারতবাসী ভগবৎমুখনিঃসৃত সেই অমৃতময় বাণী—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।"

ভুলিয়া গিয়াছে।

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না। ইহাও আমরা ভুলিয়াছি, যে যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ করেন তিনি কপটতাকে প্রশ্রয় দান করেন মাত্র। অধঃপতিত ভারতে সকলই সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়

প্রার্থনা।

ভগবান!—

আমার কল্পনা আমার ভাবনা
মন হ'তে মুছে, দাও হে।

মোহ মায়া রূপে, ঘিরেছে যা মোরে,
সেগুলোও কেড়ে নাও হে॥

কেবল আমারে শক্তি দাও, দেব,
পরহিত-ব্রত সাধিতে।

প্রেম দাও হৃদে অনাবিল প্রীতি,
জীবগণে ভালবাসিতে॥

ভকতি দাও হে করুণা-নিলয়,
দেব, দ্বিজগণে পুজিতে।

পারি যেন নাথ, সংসারের মাঝে,
তোমারি নিদেশ পালিতে।

আর কিছু প্রভু, চাহিনাক আমি,
এইগুলি তুমি দিও হে।

যদি পরমেশ, কুপথেতে যাই,
সুপথেতে টানি নিও হে।

শ্রী:—

তারামূর্ত্তি।

আজি দেখি মা তারারূপে সমুদিতা হৃদি-কমলে।
মনোহর যে রূপে হর ক্ষোভ-রহিত হলাহলে ॥
বিশাল সাগর-জাত সিত শতদলোপরে,
ধূ ধূ জলে চিতানল তার মাঝে দেখ না মা-রে,
শবোপরে হেরিলে যাঁরে হর মন টলে ॥
প্রসারিত বাম পদ যোগীর জানুযুগলে,
আকুঞ্চিত বামেতর স্থাপিত তাঁর উরস্থলে,
একজটা জ্বলিছে বামে আপাদ ঝুলে ॥
নীলাঞ্জন শরীর দ্যুতি রূপসী ষোড়শী বালা,
লম্বোদরী প্রাচীনা যেন কটীতে বাঁধা বাঘছালা,
নরশির-গ্রথিত-মালা ঝুলিছে গলে ॥
খর্ব্বাকারা মহাভীমা লম্বিত-রসনা,
ঘোর দংষ্ট্রা করালাস্যা সাবেশ-স্মের-বদনা ;
ভালদেশে পুলকে হাসে শশী শকলে ॥
লোচন-ত্রিতয় যেন বালার্কমণ্ডল মা-র,
পীন পয়োধর দুটি চির রাকা সুধাধার ;
সাধে পিবে সাধের সুধা সাধকদলে ॥
বিবিধ বর্ণের সাপে মরি কি শরীর শোভা,
সাপের নূপুর পায়ে শিরে মুকুট মনোলোভা ;
কিবা সে কুণ্ডলে মণি ফণাশিরে জ্বলে ॥
চারি চারি পট্টিক যুত কপাল পঞ্চক মা-র;
ভূষিত ললাটদেশে ঝরে কসে শোণিত ধার ;
সমণি ফণীর ফণা চিকমালা গলে ॥
শোভিছে দুকরে বামে খাঁড়া কাটারি খরধার
বামেতরে নীলকমল নরকপাল সুধাধার ;
চারি পাশে নাচিছে ভূতপিশাচদলে ॥
দেবগণ দেখিছে মাকে কি যে বাকী কেহ না জানে,
বোধানন্দ সকলে ছাড়ি ছুটিল মায়ের পানে ;
শোভিল শ্রীপদ জবা মালুরদলে ॥

শ্রীবোধানন্দনাথ

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

সম্রাট স্বদেশে।—গত ৫ই ফেব্রুয়ারি শুভক্ষণে মেদিনা জাহাজ আমাদের ভারতরাজরাজেশ্বরকে পরিজনগণের সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে পোর্ট্‌স্‌মাউথে পৌছিয়া দিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডের বক্ষে রাজজননী আলেক্‌জান্দ্রা দেবীর ক্রোড়ে পৌছিয়াছেন। যাঁহাদিগকে দেশে রাখিয়া তিনি আমাদিগকে দেখা দিতে আসিয়াছিলেন, সেই নিজজনগণের সঙ্গে এতদিন পরে মিলিত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

প্রাপ্তিস্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে একখানি নূতন মাসিকপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

বিজ্ঞান।—শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিকপত্র। দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্সের সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার এফ, সি, এস-সম্পাদিত। ৫১ নং শাঁখারি-টোলা, এংলো সংস্কৃত প্রেস হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। বর্ত্তমান ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদক ও লেখকগণ সকলেই বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। এরূপ মাসিক পত্রের বহুল প্রচারে দেশের উপকার হইবে। ইহার বর্ত্তমান সংখ্যায়, সূচনা, উদ্ভিদ কীট ও তাহার বিনাশের উপায়, ছত্রক, পাট ও ধান, ইষ্টক ও লোনা, ক্রমোন্নতিশীলতা, আর্য্য ও অনার্য্য, সমালোচনা, তড়িৎ ও কাজের জিনিস এই কয়টি প্রবন্ধ আছে সকলগুলিই সুলিখিত। আমরা ইহা হইতে কয়েকটি কাজের জিনিস গৃহস্থের গ্রাহকগণ উপহার দিলাম।

"মারবেল পরিষ্কার করিবার উপায়।—সোডা ২ ভাগ, পিউমিস ষ্টোন-চূর্ণ ১ ভাগ, খড়ি-চূর্ণ ১ ভাগ। মিহি চালনীর দ্বারা চালিয়া লও। উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত কর। মারবেলের উপর রীতিমত ঘসিতে থাক। তৈলাক্ত দাগ উঠিয়া যাইবে, পরে সাবান জলের দ্বারা রীতিমত ধৌত করিয়া ফেল, মারবেল পরিষ্কার হইবে।"

"পুস্তক হইতে ছাতার দাগ নষ্ট করিবার উপায়।—১ পাঁইট জলে ১ ঔন্স জিলে টিন কয়েক ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখ। আর ১ পাঁইট জলে মাখিবার সাবান ১ ঔন্স গুলিয়া লও। এই দুই পাঁইট একত্রে অগ্নির উত্তাপ দাও। বেশ মিশিলে উত্তাপ বন্ধ কর। ২ ঔন্স জলে ১ ড্রাম ফটকিরি গুলিয়া উহাতে দাও। যখন, ঠাণ্ডা হইবে জলীয় অংশটুকু ঢালিয়া লও। একটা শক্ত পালকে করিয়া উহা দাগের উপর দাও। অনেক দিনের হইলে ৩।৪বার উপর্য্যুপরি লাগাইলে দাগ বিদূরিত হইবে। ঐ জলে অল্প স্পিরিট অব ওয়াইন মিশাইয়া রাখিলে অনেক দিন থাকে।

শোক সংবাদ।—আমরা ব্যথিত হৃদয়ে, দুই জন নাটককারের মৃত্যু-সংবাদ বক্ষে লইয়া, আজ পাঠকগণের সমীপে উপনীত হইলাম। রামাভিষেক, প্রণয়-পরীক্ষা প্রভৃতি নাটক-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবি মনোমোহন বসু এবং চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল প্রভৃতি অসংখ্য নাটককার বঙ্গের গ্যারিক, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের গুণের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে। শেষাবস্থায় গিরীশচন্দ্র শ্রীমৎ রামকৃষ্ণচরণাশ্রয়পূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিতে আমাদের চক্ষের সমক্ষে ছিলেন। শুনিলাম, তিনি নির্ব্বাণের পূর্ব্বে, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণ মিসনে দিয়া গিয়াছেন।

এখন চতুর্ব্বিধ নামাভাস কিরূপ? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সঙ্কলিত **শ্রীহরিনামচিন্তামণি** গ্রন্থে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে এই চতুর্ব্বিধ নামাভাসের স্বরূপ বলাইয়াছেন। যথা—

১। **সাঙ্কেত্য** নামাভাস—

"বিষ্ণু লক্ষ্য করি জড় বুদ্ধ্যো নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি বিষ্ণু নাম উচ্চারয়॥

সঙ্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তার শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥

যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বলি' কহে নামাভাসে॥

অন্যত্র সঙ্কেতে যদি হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৩২ পৃ)

অন্যত্রও এই নামাভাসের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। আমরা মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে দেখিতে পাই, মহর্ষি বাল্মিকী প্রথমে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন। তাঁহার জিহ্বার এত দূর জড়তা ছিল, যে "রাম" নাম তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। লোকপিতামহ ব্রহ্মা কৌশলে তাঁহাকে "মরামরামরা" জপ করিতে বলিয়া প্রকারান্তরে রাম নাম বলাইয়া, পাপমুক্ত করেন। সেই দস্যু-রত্নাকরই শেষে কাব্যরত্নাকর মহর্ষি বাল্মিকী হন; ইহাও সাঙ্কেত্য নামাভাসের একটি দৃষ্টান্ত।

২। **পারিহাস্য** নামাভাস—

"পরিহাসে কৃষ্ণ নাম যেই জন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে॥"

৩। **স্তোভ** নামাভাস—

"অঙ্গভঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাভাস।
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥"

৪। হেলা নামাভাস—

"মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞাভাবেতে।
কৃষ্ণ রাম বলে হেলা নামাভাস তাতে॥

এই সব নামাভাসে ম্লেচ্ছগণ তরে।
বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে॥"

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৩২ পৃঃ)

এই সকল নামাভাসে কৃষ্ণ-প্রেম ব্যতীত সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। নামাভাসদ্বারা কত দূর মঙ্গল হয়, তাহাও ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নামাভাস দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল॥

নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয়—কলি হয় হত॥

নামাভাসে নর হয় সুপংক্তিপাবন।
নামাভাসে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণ॥"—(৩০ পৃঃ)

"কৃষ্ণপ্রেম ছাড়ি সব নামাভাসে পায়।
নামাভাসে পুনঃ শুদ্ধ নাম হয়ে যায়॥—(৩৩ পৃঃ)

অধিক কি?—

"সর্ব্ব বেদাধিক সর্ব্বতীর্থ হইতে বর!
নামাভাস সর্ব্বশুভ-কর্ম্ম-শ্রেষ্ঠতর॥" (৩১ পৃঃ)

সুতরাং নামাভাস দ্বারা যে ক্রমে শুদ্ধ নামের উদয় হইয়া প্রেমোদয় হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নাম চিন্ময়। এই নাম জপের তুল্য কোনও কার্য্যই নাই, এ কথা আদিপুরাণে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। শ্রুতিও নামের চিন্ময়ত্ব ঘোষণা করিতেছেন।

জীব যখন শ্রীগুরুকৃপায় সেই পরমামৃত প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর সেবনে কৃতার্থ হইতে থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারে, যে নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই। "যেই নাম, সেই কৃষ্ণ" তাই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥"

তখনই জীবের বুঝিবার শক্তি হয়, কেন শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই কথাটি যখন জীব নিসংশয়ে বুঝিতে পারেন, তখন তিনি সাংসারিক অনন্ত কার্য্যে হস্তাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত রাখিয়া, মনে মুখে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

কলির এই তারকব্রহ্ম-নাম-মালা—এই "ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর" নিরন্তর জপ করিতে করিতে, আপনাকে উচ্চতর সোপান-আরোহণের অধিকারী করিতে থাকেন।

এই নামের কত শক্তি বুঝাইবার জন্যই শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখদ্বারে জীবের পরম কল্যাণকর শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের প্রকাশ। তিনি বলিতেছেন—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং" শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ফলে, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। মানবের চিত্তদর্পণ, প্রকৃতি বশে, হয় অবিদ্যা-মল-লিপ্ত নতুবা অপরা-বিদ্যাগণের* বাহ্য চাকচিক্যময় সৌন্দর্য্য-সাহচর্য্যে রঞ্জিত থাকে। এরূপ মলিন দর্পণে, স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি শিশুর চিত্ত প্রায়শঃ অতি নির্ম্মল। প্রায়শঃ বলিলাম, কেন না কখন কখন জনক-জননীর দোষে, নিতান্ত শিশু-হৃদয়েও মালিন্য প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। নির্ম্মল শিশু-হৃদয় দর্পণ আখ্যা পাইবার উপযুক্ত নয়। তখন তাহা হৃদয়ের নির্ম্মল স্বচ্ছ আবরণ মাত্র। যেমন কোন গৃহের গবাক্ষে, সুনির্ম্মল শুভ্র কাচের

* মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥" সুতরাং বেদাদি সমুদায় লৌকিকজ্ঞানই অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত।

আবরণ থাকিলে, সেই গৃহের অভ্যন্তরস্থিত সকল পদার্থই, সেই আবরণের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে পারে; শিশুর সুনির্ম্মল চিত্তটিও সেইরূপ, তাহার অন্তর-কক্ষের স্বচ্ছ আবরণ। শিশুর অন্তর কিরূপ? তাহাতে কি ভাব বর্ত্তমান? তাহা সহজেই জানা যায়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্বচ্ছ আবরণটির অন্তঃপ্রদেশ জ্ঞান-রসে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব দর্পণে পরিণত হয়। তখন আর অভ্যন্তরের কোনও কিছুই বাহ্যে প্রকট থাকে না, অন্তরের ভাব অন্তরেই আবরিত থাকে। দর্শক, সেই হৃদয়দর্পণে তাঁহার নিজের হৃদয়ে নিজের অনুরূপ ছায়া দেখিয়া তাহাকে সেইরূপ মনে করিতে বাধ্য হন। ঐ জ্ঞানরস, নিজের অবস্থা অনুসারে দর্পণের নির্ম্মলতার হেতু হয়। চিত্তস্থ জ্ঞানজাত ভাব দ্বারাই সেই চিত্তের অবস্থা উপলব্ধ হয়। বয়স্থ মানবের চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, ও নিরুদ্ধ। চিত্তবৃত্তির অসংখ্য ভেদ সত্ত্বেও সেই সমুদায় এই পঞ্চ প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। চিত্তের চঞ্চলাবস্থার নাম **ক্ষিপ্তাবস্থা**। সকলেই বলে মন চঞ্চল, সেই চঞ্চলতাই ক্ষিপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত বাহ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর অস্থির থাকে। চিত্তে তমোভাবের আধিক্য ঘটিলে, যে অবস্থা আসে, তাহারই নাম **মূঢ়াবস্থা**। চিত্ত বহু বিভিন্ন বিষয়ে এককালে আকৃষ্ট হইয়া যে অত্যন্ত অস্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে **বিক্ষিপ্তাবস্থা** বলে। চিত্ত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া রজস্তমভাব পরিহার পূর্ব্বক যখন বিষয় বিশেষে একলক্ষ্য হয় তাহার নাম **একাগ্রাবস্থা**। **নিরুদ্ধাবস্থায়** চিত্তের কার্য্য থাকে না, তখন তাহা পরম-কারণে লয় থাকে। এই নিরুদ্ধ অবস্থা দ্বিবিধ, একবিধ অবস্থায় দেহচেষ্টাদির লোপ হয়, অপর অবস্থায় দেহের কার্য্য লোপ না হইয়া "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে বর্ত্তন্ত"-রূপে কার্য্য হয়—চিত্ত, নামে বা নামীর প্রেমে মগ্ন থাকে। এই দ্বিতীয় অবস্থাই শ্রীবৈষ্ণবের প্রার্থনীয়। এই অবস্থা প্রাপ্তির কামনায় অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথী বলবদ্দৃঢম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

"কৃষ্ণ হে, চঞ্চল মন, হৃদয় করে মন্থন,
বলবান দৃঢ় অতিশয়,

তাহারে সংযত করা চঞ্চল বায়ুরে ধরা
দুই তুল্য জানি যে নিশ্চয়!"

ভগবান তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগেন চ গৃহ্যতে॥"

মহাবাহো, বলি শুন, মনের সহজ গুণ,
চঞ্চলতা জানিহ নিশ্চয়,
অভ্যাস বৈরাগ্য বলে, অতি কষ্টে সুকৌশলে,
কৌন্তেয়, জিনিতে তারে হয়।

ভগবান মনকে চঞ্চল স্বীকার করিয়া বলিলেন, **অভ্যাস** ও **বৈরাগ্যের** দ্বারা তাহাকে সংযত করা যায়। ভগবান পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।"

এই অভ্যাস এবং বৈরাগ্য কি এবং কিরূপে তাহা সাধন করিব? শ্রীগুরু প্রদর্শিত উপায়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নাম **অভ্যাস** এবং আসক্তি ত্যাগের নাম **বৈরাগ্য**। এই বৈরাগ্য প্রাপ্তির উপায় ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনং সংভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্॥"

স্ব-স্ব-বর্ণানুযায়ী তপের দ্বারা শ্রীহরির তুষ্টি সাধন করিলেই বৈরাগ্যাদির উদয় হয়। ভগবান পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা।"

ঈশ্বর-চিন্তাদ্বারাও চিত্তবৃত্তি সংযত হয়। আর আমাদের প্রাণ-গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনদ্বারা ঐ মলিন চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়। চিত্তের নির্ম্মল অবস্থাতেই ঐ অভীষ্ট অবস্থা লব্ধ হইয়া থাকে।

এখন বুঝিলাম, নাম-জপ, নাম-ধ্যান আর নাম-গান দ্বারা ক্রমে চিত্তের বিক্ষিপ্তাদি অবস্থা দূরীভূত হইয়া পরিষ্কৃত হইবে ও সেই হৃদয়-দর্পণে তাঁহাকে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিব।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, আমাদের চিত্ত-দর্পণের মালিন্যের হেতু, হয় অবিদ্যামল, না হয় অপরাবিদ্যার চাক্‌চিক্য। বাহ্যব্যাপারে আসক্তিবশেই এই দুই প্রকার মালিন্যের উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণনামদ্বারা ক্রমে নামে আসক্তি ও পরে নামীতে প্রেমোদয় হয়। অন্য বিষয়ে আসক্তির যতই অভাব ঘটিতে থাকে, ততই ঐ মলিনতার হ্রাস হইয়া চিত্তদর্পণ পরিষ্কৃত হইয়া যায়, ইহা অসংখ্য স্থলে প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

"যৎ কীর্ত্তনং যৎ স্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥"

(দ্বিতীয় স্কন্ধ)

তাঁর নাম কীর্ত্তন করিলে, জীবের কল্মষরাশি সদ্য নষ্ট হয়, এমনি সে নামের শক্তি। মালিন্যের নাশ হইলে, আর ভয় কি? যদি চিত্তের মালিন্য গেল, চিত্ত তাঁহার চরণে লগ্ন হইল, তবে আর সংসার-দুঃখ থাকিতে পারে না। তাই বলিয়াছেন—

"ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং" নামের গুণে সংসারদুঃখরূপ দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। দাবাগ্নি অরণ্যে জ্বলে। এ ভবারণ্যও বড় সহজ অরণ্য নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে মানব ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়া—

"ক্বচিদ্বিতোয়াঃ সরিতোঽভিযাতি
পরস্পরম্বা লষতে নিরন্নঃ।
আসাদ্য দাবং ক্বচিদগ্নিতপ্তো
নির্ব্বিদ্যতে ক্ব চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ ভবাটবীবর্ণন)

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে, এই ভবাটবীবর্ণন শ্রীগুরুচরণান্তিকে বসিয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা বৈরাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সাধারণ ভাবেও যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাহারাও সেই অরণ্যের এবং তদুত্থিত এই দাবাগ্নির ভীষণত্ব কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ

নাই। যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহারা একবার পড়িবেন ও একটু ভাবিবেন এবং যাহাতে সেই দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারেন সে জন্য একটু চেষ্টা করিবেন। শ্রীভগবানের নামামৃতধারাই সে দাবানল নির্ব্বাণের একমাত্র উপায়।

একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, **অনিত্য বিষয় বাসনা**টাই সেই প্রচণ্ড দাবানল। এই **বাসনা** বিষয় ভোগের দ্বারা নষ্ট হয় না, কেবল "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে।" বিষয়ভোগটা অনলে ঘৃতাহুতির কাজ করে। সুতরাং সংসারে জড় কামনার বস্তু যত আছে সে গুলি উপভোগ করিলে কামনার শান্তি না হইয়া শত গুণে বর্দ্ধিতই হয়। যত দিন জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য বাসনা, তত দিন ঐ জ্বালা; কিন্তু এই বাসনাকে আর এক দিকে লইতে পারিলেই নিস্তার পাওয়া যায়। প্রথমে নাম করিতে হইবে। নামাভাস হয় হৌক ক্ষতি নাই, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইতেছে তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই—
কারণ—

"এক কৃষ্ণনাম যদি মুখে বাহিরায়।
অথবা শ্রবণ-পথে অন্তরেতে যায়॥
শুদ্ধবর্ণ হয় বা অশুদ্ধ বর্ণ হয়।
তাতে জীব তরে এই শাস্ত্রের নির্ণয়॥"

তুমি দূরে দাঁড়াইয়া এ কথা শুনিয়া হাসিবে। হাসিতে পার, তাহাতে ক্ষতি নাই। বস্তুশক্তির পরীক্ষা দূরে থাকিয়া হয় না। হাতে করিয়া করিতে হয়। আমার মন সহস্র বিড়ম্বনা ঘটায় ক্ষতি কি? আমি যাঁহার নাম করিতেছি, তাঁহার ক্ষমতা মনের চেয়ে অনেক বেশী। মন ত তাঁ'র অধীন। আমি ত ঐ মনের উৎপীড়নে কাতর হইয়াই বারম্বার তাঁর নাম করিয়া ডাকিতেছি। এমনি করিয়া ডাকিতে ডাকিতেই এক দিন তিনি ঐ মনটাকে আত্মসাৎ করিয়া আমায় নির্ভয় করিবেন। তখন আর আমাকে "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" বলিয়া ভাবিতে হইবে না। যাঁহার ভাবনা তিনিই ভাবিবেন। আমি, যতক্ষণ তিনি না শোনেন যতদিন এই আপদ হইতে আমায় মুক্ত না ক'রেন, ততদিন কেবল ডাকিব। সত্য বটে যাঁহারা শুদ্ধ-নাম-ধনে ধনী তাঁহাদের সৌভাগ্যের উদয় অচিরে হয়। আমার এ নামাভাস। কিন্তু

শুনিয়াছি, এ নামাভাসেরও শক্তি অনন্ত। এরি শক্তিতে সুকৃতির উদয় হইয়া ক্রমে প্রাণে শুদ্ধ নামের উদয় হইবে। এখন নামে রুচি নাই, বড় তিক্ত লাগে। এ পৈত্তিকের মুখে ও মিছরী তো তিক্ত লাগিবেই। কিন্তু মিছরীর গুণে যখন পিত্তদোষ দূর হইবে, তখন মিষ্ট লাগিবে ত?—এখন নাক মুখ বুঝিয়া চিবাই, দু'দিন বিলম্ব হয় ক্ষতি কি? এখন বলি—পাখিপড়ার মত শুধু বলি—

"শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃর্ষভাবনীধ্রুগ্
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপজনিত ব্রজভৃত্যগীত
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যাম্॥"

বলিতে থাকি—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥"

উচ্চকণ্ঠে গাহিতে থাকি—

"হরি হরয়ে নমঃ।
কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

উচ্চকণ্ঠে বলি-বলা শোনা—দুইই হইবে। একেবারে দুইটা পথ দিয়া নাম অন্তরে গিয়া আপনার কার্য্য করিবেন। শুদ্ধ নামের উদয় সহজে হইবে।

সাধকমাত্রেরই নাম-জপ প্রধান সাধন বলিয়া বোধ হয়। যোগীর প্রণব সাধনও নাম করা।

"স্বর্ক্ষে যদি স্থিতৌ দ্বৌ চ ভানুবর্ষপ্রদায়কৌ।
পরর্ক্ষে সম্মতৌ দ্বৌ চ নাথান্তেন বিচিন্তয়েৎ॥

একঃ স্বক্ষেত্রগোঽন্যস্তু পরত্রে যদি সংস্থিতঃ।
তদান্যত্র স্থিতং নার্থং পরিগৃহ্য দশাং নয়েৎ॥

পরর্ক্ষে ভিন্ন ভিন্নস্থৌ দ্বয়োর্মধ্যে তু যো বলী।
তস্য নাথান্ত রীত্যা চ বর্ষাণি সংলিখেৎ দ্বিজ॥

অগ্রহাৎ সগ্রহঃ প্রাণী সগ্রহাদধিকগ্রহঃ।
সাম্যে চর-স্থির-দ্বন্দ্বাঃ ক্রমাৎ স্যু বলশালিনঃ॥

রাশিসাম্যে তদা বিপ্র বহুবর্ষপ্রদো বলী।
একস্য স্বগৃহস্থত্বং নহি কার্য্যোপযোগিকম্॥

একঃ স্বোচ্চগতস্ত্বন্য পরত্র যদি সংস্থিতঃ।
গ্রাহয়েদুচ্চখেটস্থং রাশিমন্যং বিহায় চ॥

যদ্যল্পবর্ষদো বিপ্র তদাপি তুঙ্গগো বলী।
নাথান্তেন সমা জ্ঞেয়া পূর্ব্বোক্তেন ক্রমেণ হি॥

পাপযুক্তঃ পাপদৃষ্টো যস্য পাপা স্ত্রিকোণজাঃ।
নিধনং তদ্দশায়াং বৈ ভাষিতং ব্রহ্মণা পুরা॥

কুজ-কেতু কিম্বা শনি-রাহু এক রাশিস্থ থাকিলে, তাহাদিগকে একগ্রহ বলিয়া গণনা পূর্ব্বক বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির দশা-বর্ষ নিরূপণ করিবে। কুজ-কেতু একত্রে বৃশ্চিকে থাকিলে, ১২ বৎসর ধনুতে থাকিলে ১ বৎসর মকরে থাকিলে ২ বৎসর ইত্যাদি রূপ দশাবর্ষ নির্ণেয়। যদি অধিপতিদ্বয়ের একটি স্বক্ষেত্রে এবং অপরটি ভিন্ন রাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে স্বর্ক্ষস্থ অর্থাৎ বৃশ্চিক বা কুম্ভ রাশিগত গ্রহকে পরিত্যাগ করিয়া, দশানয়নে ভিন্ন ক্ষেত্রস্থ গ্রহকেই অবলম্বন করিবে। উভয়ের মধ্যে একটি স্বক্ষেত্রে থাকিলে তদ্রাশি স্বামীযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। গ্রহদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে অবস্থান করিলে, তন্মধ্যে বলশালী গ্রহই দশানয়নে গ্রাহ্য। এক্ষণে এই বল কি প্রকার, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। গ্রহযুক্ত গৃহকেই বলবান বলা যায়। অগ্রহ গৃহ হইতে সগ্রহ গৃহ বলবান। উভয় গ্রহযুক্ত হইলে অধিক গ্রহযুক্ত গৃহকে বলবান ধরিবে। উভয় গৃহই যদি সম সংখ্যক গ্রহযুক্ত থাকে, তাহা হইলে রাশি বল গ্রহণ করিবে। চর রাশি হইতে স্থির রাশি এবং স্থির রাশি হইতে দ্বিস্বভাব রাশি বলবান, সুতরাং চরস্থ গ্রহ অপেক্ষা স্থির রাশিগত গ্রহ বলবান এবং স্থিরস্থ গ্রহ হইতে দ্ব্যাত্মক রাশিস্থিত গ্রহকে বলবান জানিবে। গ্রহদ্বয়ের মধ্যে উভয়ই যদি সম-সংখ্যক গ্রহ-যুক্ত হইয়া চর, স্থির কিম্বা দ্বিস্বভাবরূপ একতর রাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে যে গ্রহ

বহুবর্ষপ্রদ অর্থাৎ স্বক্ষেত্র হইতে অপরাপেক্ষা দূরতর, তাহাকেই বলবত্তর বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক দশাব্দানয়নে অবলম্বন করিবে। কিন্তু স্বল্পবর্ষপ্রদ গ্রহ তুঙ্গী থাকিলে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে; বহুবর্ষপ্রদ গ্রহ সে স্থলে দুর্ব্বল মধ্যে গণ্য।

উক্ত প্রকারে লগ্নাদি দ্বাদশ রাশির দশামান নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার সংস্কার করিবে। সংস্কার আর কিছুই নয়, কেবল গ্রহগণ উচ্চ নীচ থাকিলে যথাক্রমে তাহাদের দশামানে ১ বর্ষ যোগ বা বিয়োগ মাত্র। অনুপাতের কোন প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধ-কারিকায় লিখিত আছে—"উচ্চখেটস্থ সদ্ভাবে বর্ষমেকং বিনির্দ্দিশেৎ। তথৈব নীচখেটস্য বর্ষমেকং বিশোধয়েৎ॥" কোন রাশ্যাধিপতি উচ্চস্থ হইলে তদ্রাশি-প্রদত্ত দশাবর্ষে এক বর্ষ যোগ এবং নীচস্থ হইলে তাহা হইতে ১ বৎসর বিয়োগ করিবে। এই প্রকারে চর, দশা-পাত করিয়া, তাহা হইতে জাতকের সর্ব্ববিধ ফল, কাল নিশ্চয় করিবে। ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে রাশি পাপযুক্ত, পাপদৃষ্ট এবং যাহার পঞ্চম ও নবম স্থান পাপগ্রহ সমন্বিত, সেই রাশি-দশাতেই মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে॥

এই চর-সংজ্ঞক রাশি-দশাকে অনেকে ভাব-দশা বোধে যেরূপ ভিন্ন প্রকারে রাশিদিগের দশা-বর্ষাদি নিরূপণ করিবার উপদেশ দেন, তাহাও এস্থলে প্রকাশ করা অযৌক্তিক নহে। শ্রীধাম বারাণসীস্থ রণবীর-জ্যোতিষ-পাঠশালার জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত রামযত্ন শর্ম্মা, তাঁহার সূত্রার্থ-প্রকাশিকা নাম্নী টীকায় বলিয়াছেন—

'অত্র সম' অব্দা নাথান্তাঃ পূর্ব্বোক্ত ক্রমোৎক্রম-গণনানুসারেণ রাশীনাং স্বামীপর্য্যন্তা গ্রাহ্যাঃ! যত্র ক্রম-গণনা চেৎ তত্র গ্রহ মধ্যে ভাবা বিশোধ্যাঃ। উৎক্রমগণনা চেৎ তত্র ভাবমধ্যে গ্রহঃ শোধ্যঃ। যদবশিষ্টং তত্র রাশিতুল্যানি বর্ষাণি। অংশাদিভিশ্চানুপাতান্মাসাদয়শ্চানেয়াঃ। পুনশ্চ "তস্মাৎতদীশপর্য্যন্তমিত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ কারিকার বচনার্থে লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ ভাবাৎ তদীশপর্য্যন্তং যা সংখ্যা তামত্র দশাং বিদুঃ। তত্র নাথে—নাথে ভাবতুল্যে বর্ষদ্বাদশকং তত্র, ন চেৎ, তদা একং একাদিক্রমেণ বিনির্দ্দিশেদিতি।" ইহার প্রমাণ স্বরূপ "অস্মদ্ গুরুবরপ্রণীতাঃ শ্লোকাঃ" বলিয়া যে কয়টি শ্লোক স্বকৃত টীকা মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন আবশ্যক বোধে তাহার একটি এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

"ভবনশোধিত ভাবপতে র্ভবেদ্ যদিহ শেষভমব্দমিতি ক্রমে।
পতিবিশোধিত ভাববিশিষ্ট ভং ভবতি চাব্দমিতি বিপরীতকে॥"

উক্ত মতানুসারে দশামান নিরূপণ করিতে গ্রহস্ফুট এবং ভাবস্ফুট বিশেষ প্রয়োজন। ওজপদস্থ কোন রাশির দশামান নিরূপণে তদ্রাশিপতির স্ফুট হইতে তদ্রাশিগত ভাবস্ফুট বিয়োগ করিতে হইবে। রাশি সমপদস্থ হইলে, উহার বিপরীত অর্থাৎ তদ্রাশিস্থিত ভাবস্ফুট

হইতে তদ্ভাবপতির স্ফুট বিয়োজ্য। বিয়োগ করিলে যে রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার রাশিসংখ্যাই বৎসর। অবশিষ্ট অংশাদিকে দ্বাদশগুণিত করিয়া রাশ্যাদিতে পরিণত করিলেই যথাক্রমে মাস, দিন, দণ্ডাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যেমন কোন কুণ্ডলীতে তনুস্ফুট ২।১৬।৩০ বন্ধুস্ফুট ৫।৫।১৫ এবং তাহাদিগের অধিপতি বুধগ্রহের স্ফুট ৯।২২।২৮—ওজপদস্থ মিথুন রাশির দশা নির্ণয়ে তদধিপতি বুধস্ফুট ৯.২২।২৮ হইতে তদ্রাশিগত তনুস্ফুট ২।১৫।৩০ বাদ দিলে, রাশ্যাদি ৭।৬।৫৮ অবশিষ্ট রহিল। উহার রাশি সংখ্যা ৭ বৎসর গ্রাহ্য এবং অবশিষ্ট রাশ্যাদি ০।৬।৫৮কে ১২ দিয়া গুণ করিলে যথাক্রমে মাসাদি ২।২৩।৩৬ অর্থাৎ সাত বৎসর ২ মাস ২৩ দিন ৩৬ দণ্ড দশামান নির্ণীত হইল। তদ্রূপ সমরাশিস্থ কন্যারাশির দশায় তদ্রাশিগত বন্ধুস্ফুট ৫।৫।১৫ হইতে তদধিপতি বুধের স্ফুট ৯।২২।২৮ বাদ দিলে ৭।১২।৪৭ থাকে। ইহাকে পূর্ব্বক্রিয়া মত বর্ষাদিতে পরিণত করিলে বর্ষাদি ৭৪।৩।২৪ কন্যারাশির দশামান হইল। প্রথমোক্ত মতে ক্রিয়া করিলে ইহাদিগের দশামান যথাক্রমে ৭ ও ৮ বৎসর হইত।

এরূপস্থলে প্রকাশিকাকার না ধরিলেও দশামানের উচ্চ নীচ সংস্কারে যে অনুপাতের প্রয়োজন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বোধ হয় টীকা লিখিবার সময় এ বিষয়টি তাঁহার মস্তিষ্কে শুভাগমন করে নাই। যখন দেখা যাইতেছে যে "উচ্চখেটস্য সদ্ভাবে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকানুসারে কোন গ্রহ তুঙ্গী হইলে ১ বৎসর বৃদ্ধি এবং নীচস্থ থাকিলে ১ বৎসর হানি; তখন নীচগ্রহ হইতে উচ্চ গ্রহের দশামান দুই বৎসর অধিক ইহা নিশ্চিত। নীচ-স্থান হইতে উচ্চ স্থান ছয় রাশি অর্থাৎ ১৮০ অংশ অন্তরে অবস্থিত এবং উক্ত ১৮০ অংশেই দুই বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে। এই ১৮০ অংশ সহ গ্রহস্ফুটের অনুপাতের নিয়ম এই যে, গ্রহস্ফুট হইতে তাহার স্বনীচাংশ বিয়োগ করিয়া, ষড়্ভাধিক, হইলে তাহাকে রাশি শুদ্ধ করিবে, অথবা এরূপ ভাবে তাহাদের অন্তর করিবে যাহাতে অবশিষ্টাঙ্ক ৬ রাশির অধিক না হয়। পরে ছয় রাশি বা ১৮০ অংশে ২ বৎসর হইলে উক্ত অবশিষ্ট রাশ্যাদিতে কত বর্ষাদি হইবে এই ত্রৈরাশিক করিয়া বর্ষাদি বাহির করিবে। ছয় রাশিতে দুই বৎসর বৃদ্ধি হইলে প্রতি রাশিতে চারি মাস প্রতি অংশে চারিদিন এবং প্রতি কলাদিতে চারি চারি দণ্ডাদি হইয়া থাকে। গ্রহদিগের তুঙ্গবলকে দ্বিগুণিত করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ দিলেই বর্ষাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্তরূপে বর্ষাদি বাহির করিয়া দশাবর্ষে যোগ করিবে, তাহা হইলে এক বৎসর বাদ দিলেই বিশুদ্ধ দশামান স্থির হইল। নিম্নে আবশ্যক বোধে গ্রহগণের উচ্চ নীচাদি খণ্ডা বিলিখিত, হইল, যথা—

	গ্রহগণের উচ্চনীচ খণ্ডা রাশ্যাদি।								
গ্রহ।	রবি	চন্দ্র	কুজ	বুধ	গুরু	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
স্বচ্চাংশ	০।১০।০	১।৩।০	৯।২৮।০	৫।১৫।০	৩।৫।০	১১।২৭।০	৬।২০।০	২।২০।০	৮।৬।০
স্বনীচাংশ	৬।১০।০	৭।৩।০	৩।২৮।০	১১।১৫।০	৯।৫।০	৫।২৭।০	০।২০।০	৮।২০।০	২।৬।০

এক্ষণে জিজ্ঞাসা, উক্তরূপে প্রতি ভাবস্ফুট হইতে দশাপাত করিলে যখন কুণ্ডলী বিশেষে কোন দুই ভাব এক রাশি গত হইয়া অপর এক রাশি ভাবশূন্য হইবে, তখনকার উপায় কি? দ্বাদশরাশির মধ্যে দুইটি রাশি দুইবার করিয়া দশাপতি হইবে এবং অপর দুইটি রাশি তদধিকারে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে, ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি তনুস্ফুটে এক এক রাশি যোগ করিয়া ধনাদি অপরাপর ভাবস্ফুট স্থির করা যায়, তাহা হইলে উক্ত আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তশাস্ত্র কি তাহাতে সম্মত হইবেন? সে পথ ভ্রমাত্মক ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার স্বামী-গ্রহ ভাবতুল্য হইলে তদধিষ্ঠিত রাশির দ্বাদশ বর্ষাত্মক দশামান, ভাবাপেক্ষা এক বিকলা অধিক হইলেই দ্বাদশ পলে পরিণত ইহাও তো সহজে বিশ্বাস-যোগ্য নহে। প্রকাশিকামধ্যে এ সকল সমস্যার কোন প্রকার হেতুবাদ বা মীমাংসা না থাকায় অনুমান হয়, যে টীকা প্রণয়ন কালে এ সকল কথা আদৌ তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রতিভাত হয় নাই। বিশেষ উক্ত প্রকারে দশান্তর্দ্দশাদি সাধন বড় সহজসাধ্য নহে এবং মূলগ্রন্থে বা পরাশরী হোরায় উহার কোন প্রকার আভাস না থাকা প্রভৃতি বিবিধ কারণে উক্ত রীতি, বিচারসঙ্গত হইলেও এক প্রকার পরিহার্য্য বলিয়াই এ স্থলে সিদ্ধান্ত ॥ ২৭ ॥

যাবদীশাশ্রয়ং পদমৃক্ষাণাং ॥ ২৮ ॥

(ঋক্ষাণাং) রাশীনাং (ঈশাশ্রয়ং যাবৎ) স্বামীস্থিত রাশি পর্য্যন্তং যা সংখ্যা তাং অগ্রে সংগণ্য যো রাশিঃ প্রাপ্তঃ স রাশি বিচারাশ্রয়ীভূত রাশেঃ (পদং) । ২৮ ।

কোন রাশি হইতে তদধিপতি, যে কয় রাশি দূরে অবস্থিত অধিপতি হইতে তৎসংখ্যক দূরবর্ত্তী রাশিকে প্রথমোক্ত রাশির পদ কহে। ২৮।

এক্ষণে ফলবিশেষ বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত রাশিদিগের আরূঢ়-সংখ্যা কথিত হইতেছে। এই আরূঢ় শব্দেরই অপর নাম আরূঢ় পদ বা পদ। এই আরূঢ়-পদ সর্ব্বত্র তন্বারূঢ়, ধনারূঢ় ইত্যাদি প্রকারে ভাবানুযায়িক নামে প্রসিদ্ধ। বিচারানুগত আরূঢ়-পদ নির্ণয়ে ভাবাধিপতি স্ফুট হইতে ভাবস্ফুট বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট রাশ্যাদি তদ্‌ভাবপতি স্ফুটে যোগ করিলেই উৎপন্ন রাশ্যাদি সেই ভাবের আরূঢ়-পদ। যেমন বন্ধুস্ফুট রাশ্যাদি ৫।৫।১৫ এবং বুধগ্রহ ৯।২২।২৮—এ স্থলে ৯।২২।২৮ হইতে ৫।৫।১৫ বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট রাশ্যাদি ৪।১৭।১৩ বুধস্ফুটের সহিত যোগ করিলে ২।৯।৪১ বন্ধারূঢ়-পদ হইল। ইহাতে ক্রমোৎক্রম গণনার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ উভয়েই সমান। কিন্তু উক্ত রীতি মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। এই গ্রন্থোক্ত প্রায় সমস্তই রাশিগত। লগ্ন হইতে আবশ্যক মত ক্রমোৎক্রম গণনায় দ্বাদশ রাশি তনু ধনাদি দ্বাদশ ভাব নামে জ্ঞাতব্য। গণিতাগত ভাবের কোন প্রয়োজন নাই। দশাপতের ন্যায় এস্থলেও কেবল রাশি গণনা কার্য্য। বৃদ্ধকারিকায় লিখিত আছে—

লগ্নাদ্‌ যাবতিথে তিষ্ঠেদ্‌ রাশৌ লগ্নেশ্বরঃ ক্রমাৎ।
তত স্তাবতিথং রাশিং লগ্নারূঢ়ং প্রচক্ষ্যতে ॥"

লগ্ন হইতে লগ্নাধিপতি যে কয় রাশি দূরে অবস্থিত, লগ্নাধিপতি হইতে গণনায় তত রাশি দূরে লগ্নারূঢ়-পদ। এস্থলে লগ্ন শব্দ উপলক্ষ্য মাত্র, তনু-ধনাদি সকল ভাবের জ্ঞাপক। কারিকাকার শ্লোক মধ্যে রাশি শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন সুতরাং গণিতাগত আরূঢ়-পদ আসিবার কোন কারণ নাই। পরাশরী হোরাতে লিখিত আছে—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রাশ্যারূঢ়পদং দ্বিজ।
রাশীনাং দ্বাদশানান্তু যাবদীশাশ্রয়ো ভবেৎ॥
সংখ্যামীশোদয়াদগ্রে সমস্তা তৎ পদোচ্যতে।
রাশিবৎ খেচরারূঢ়ং জ্ঞায়তে গণকোত্তমৈঃ॥
যাবদ্দূরং যস্য রাশি স্তাবৎ সংখ্যাক্রমেণ বৈ।
অগ্রে পদং খগারূঢ়ং জ্ঞায়তে দ্বিজসত্তম॥
জন্মলগ্নাৎ লগ্নস্বামী যাবদ্দূরং হি তিষ্ঠতি।
তাবদ্দূরং তদগ্রে চ লগ্নারূঢ়ং চ কথ্যতে॥"

উক্ত পরাশরীয় শ্লোক কয়টিও রাশি গণনারই সপক্ষে। আরূঢ়-পদ দুই প্রকার। প্রথম রাশ্যারূঢ় ও দ্বিতীয় খগারূঢ়। কোন রাশি হইতে তদধিপতি যত দূরে অবস্থিত, অধিপতি হইতে তত দূরবর্ত্তী রাশিকে রাশ্যারূঢ় এবং কোন ভাবাধিপতি হইতে তদীয় ভাব যে কয় রাশি অন্তর, ভাব হইতে সেই কয় রাশি অন্তরিত স্থান খগারূঢ় বলিয়া জ্ঞাতব্য। যেমন সিংহ লগ্নে রবি বৃষস্থ। রবি সিংহের দশমস্থ থাকায় রবির দশমস্থ কুম্ভ রাশি লগ্নারূঢ় পদ এবং সিংহ রাশি রবির চতুর্থস্থ বলিয়া সিংহের চতুর্থ বৃশ্চিক রাশি খগারূঢ় বা রব্যারূঢ় পদ হইল।

স্বস্থে দারা। ২৯। সুতস্থে জন্ম। ৩০।

(স্বস্থে) ভাবাৎ চতুর্থস্থানগতে ভাবস্বামিনি, (দারা) চতুর্থরাশিরেব তদ্ভাবস্য আরূঢ়পদম্‌। ২৯। ভাবাধিপতৌ (সুতস্থে) ভাবাৎ সপ্তমস্থে সতি (জন্ম) ভাবাদ্দশমো রাশি স্তদ্ভাবস্য পদমিতি বোধ্যম্‌। ৩০।

ভাবপতি স্বীয় ভাব হইতে চতুর্থ স্থান গত হইলে, সেই চতুর্থ স্থানই তদ্ভাবের আরূঢ়-পদ। ২৯। কোন ভাবপতি স্বীয় ভাব হইতে সপ্তমস্থানগত হইলে ভাবের দশম স্থানে তাহার আরূঢ়-পদ জানিবে। ৩০।

বর্ত্তমান সূত্রদ্বয় পূর্ব্বোক্ত অষ্টাবিংশতিতম সূত্রের প্রতিষেধ মাত্র। ভাবাধিপতি চতুর্থে থাকিলে উক্ত সূত্রানুসারে সপ্তম স্থান এবং সপ্তমে থাকিলে তদ্ভাবের আরূঢ়-পদ না হইয়া, যথাক্রমে চতুর্থ ও দশম স্থান আরূঢ়-পদ হইবে, ইহাই বলিবার জন্য সূত্রদ্বয়ের প্রয়োজন। স্বামীগ্রহ চতুর্থে থাকিলে তদ্গ্রহ স্ফুটই আরূঢ় স্ফুট এবং সপ্তমে থাকিলে তদ্গ্রহস্ফুটে তিন রাশি যোগ করিলেই দশমস্থ আরূঢ়-স্ফুট প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বর্ত্তমান সূত্রদ্বয়কে পূর্ব্বোক্ত সূত্রের উদাহরণস্বরূপ কল্পনা পূর্ব্বক বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়া

তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য গ্রন্থকারকেও তৎপথাবলম্বী করিয়াছেন। তৎকৃত টীকায় লিখিত আছে "অথোদাহরণরূপং সূত্রদ্বয়মাহ—লগ্নাৎ স্বস্থে চতুর্থস্থে লগ্নস্বামিনি দারা সপ্তমোস্থা রাশি লগ্নারূঢ়ং ভবতি। লগ্নাৎ সুতস্থে সপ্তমস্থে লগ্নস্বামিনি জন্মলগ্নমারূঢ়ং ভবতীত্যর্থঃ।" এই গ্রন্থে এমন সকল সূত্র আছে যে, গ্রন্থান্তরোক্ত শ্লোকাদি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিলে, কখনই তাহাদের সম্যক অর্থোপলব্ধি হয় না, এরূপ স্থলে মহর্ষি জৈমিনী যে দুইটি নিরর্থক সূত্র প্রণয়ন পূর্ব্বক গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে রাশি ও ভাবের নাম সমস্তই কটপয়াদি শব্দ সংখ্যায় বিলিখিত, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। মহর্ষি জৈমিনীও উক্ত সূত্রদ্বয়োক্ত দারা ও জন্ম শব্দের অর্থ-সন্দেহ দূরীকরণমানসে পরবর্ত্তী সূত্রেই "সর্ব্বত্র সবর্ণা ভাবা রাশয়শ্চ" বলিয়া উক্তমত দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন। উক্ত সঙ্কেতানুসারে দারা শব্দে ৪ এবং জন্ম শব্দে ১০ ভিন্ন কখনই ৭ ও ১ হইতে পারে না। বিশেষতঃ চতুর্থে সূত্রে দারা শব্দে ৪ এবং বর্ত্তমানে ৭ অর্থ করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সূত্রার্থপ্রকাশিকা নামক টীকা হইতে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী শ্লোক সুবোধিনীকারের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ যথা—

"গ্রহে ভাবশুদ্ধেঽবশিষ্টন্তু যোজ্যং গ্রহে স্পষ্টমারূঢ়সংজ্ঞং ভবেত্তৎ।
সুখস্থে সুখং দ্যূনভে কর্ম্মভং সুসূক্ষ্মং পদং জৈমিনীয়ে নিরুক্তম্॥"

বলা বাহুল্য যে এ স্থলে উক্ত টীকাকার স্ফুটরাশ্যাদির যোগেই প্রথমোক্ত মতানুগ পদ নির্ণয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু তাহা পূর্ব্বেই নিষ্প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।

পুনশ্চ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ স্বকৃত সুবোধিনী মধ্যে "যৎ তু আদ্যৈঃ স্বস্থে দারা বিচারণীয়াঃ, সুতস্থে ভ্রাতৃজন্ম বিচার্য্যমিত্যুক্তং তদসঙ্গতমেব প্রতিভাতি" বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হউক বা না হউক, তাঁহার মত লোকের লেখনী প্রসূত হওয়া সুসঙ্গত হয় নাই। কারণে সপ্তমে পত্নী চিন্তা এবং একাদশে অগ্রজ ভ্রাতৃচিন্তা চিরপ্রসিদ্ধ যথা—

"একাদশাদগ্রজং তু তৃতীয়াৎ তু যবীয়সং।
পঞ্চমে পুত্রচিন্তা চ দ্যূনে দারং বিচিন্তয়েৎ॥"

গ্রন্থমধ্যে আত্মকারকার্থে স্ব শব্দের বহুব্যবহার আছে। স্ব-স্থে দারা; এ স্থলে স্ব শব্দে আত্মকারক গ্রহ এবং স্থ শব্দে বর্ণ সংস্কেতানুসারে সাত। সুতরাং আত্মকারক গ্রহ হইতে সপ্তমে স্ত্রীবিচার করা কখনই অযৌক্তিক নহে। তদ্রূপ সুতস্থ একটি শব্দ ধরিলে অক্ষরানুযায়িক ৭৬৭ অর্থাৎ ১১ হয়। অতএব পূর্ব্বসূত্রোক্ত স্ব শব্দের অনুবৃত্তি স্বীকার পূর্ব্বক আত্মকারক হইতে একাদশ স্থানে জন্ম অর্থাৎ অগ্রজাত ভ্রাতার জন্ম বিচার করা কিরূপে অসঙ্গত হইতে পারে। ৩০।

সর্ব্বত্র সবর্ণা ভাবা রাশয়শ্চ। ৩১।

অস্মিন্ গ্রন্থে (সর্ব্বত্র ভাবা রাশয়শ্চ সবর্ণাঃ) বর্ণেন সহ বর্ত্তমানাঃ কটপয়াদি সংজ্ঞোক্ত সংখ্যাবাচক শব্দগম্যাঃ। দ্বিতীয়ার্থস্তু চকারাৎ রাশয়ো ভাবাশ্চ সবর্ণাঃ বর্ণদ-বিশেষণোপেতা বর্ণদ-দশা-সহিতাশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বত্র ভাব ও রাশি কটপয়াদি সংজ্ঞোক্ত সংখ্যাবাচক শব্দে লিখিত আছে। "চ" শব্দ থাকায় রাশি ভাব এবং উপলক্ষণে দশা পর্য্যন্তও বর্ণদ আছে বুঝিতে হইবে॥ ৩১ ॥

বর্ত্তমান সূত্র পর্য্যালোচনায় বেশ বুঝা যায়, যে গ্রন্থ মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে রাশি বা ভাবের নাম লিখিত হয় নাই। উক্ত সূত্রে পুনর্ব্বার বর্ণদ রাশি, বর্ণদ ভাব এবং বর্ণদ দশার ও প্রকারান্তরে উল্লেখ আছে। কিন্তু কি প্রকারে উক্ত বর্ণদ রাশ্যাদি আনয়ন করিতে হইবে এই উপদেশসূত্রের মধ্যে তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও স্থানান্তরে **সিদ্ধিমন্যৎ** বলিয়া সূত্রকার নিজেই তদীয় গ্রন্থ মধ্যে অনুক্ত বিষয় সকল অন্যান্য প্রচলিত শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ণদ রাশ্যাদি আনয়ন করিতে প্রথমতঃ ঘটীলগ্নাদি জানিবার বিশেষ প্রয়োজন থাকায় অগ্রে তাহারই উল্লেখ করা আবশ্যক। এতদ্ বিবরণ পারাশরী হোরা হইতে সংগৃহীত হইল।

ঘটী-লগ্নম্।

সূর্য্যোদয় হইতে ইষ্ট-কাল পর্য্যন্ত যত দণ্ডাদি হইবে, তাহার প্রতি দণ্ডে এক এক রাশি কল্পনা করিয়া রাশ্যাদি সাবয়ব করিবে। যত দণ্ড তত রাশি এবং পলাদির অর্দ্ধেক গ্রহণ করিলেই ত্রৈরাশিক কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইল। প্রাপ্ত রাশি-সংখ্যা দ্বাদশোর্দ্ধ হইলে, যে তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। উক্ত রাশ্যাদি ওজ লগ্নে সূর্য্যস্ফুটে এবং যুগ্ম লগ্নে লগ্নস্ফুটে যোগ করিলেই ঘটীলগ্ন হইল। যেমন সূর্য্যস্ফুট ৩।৫।৬ ইষ্ট দণ্ডাদি ৩৩।৪৫ এবং লগ্নস্ফুট ৯।१।৪৫—ইষ্টদণ্ডাদি ৩৩।৪৫ হইতে রাশ্যাদি ৯।২২।৩০ হইল। এ স্থলে সমলগ্ন বশতঃ উক্ত রাশ্যাদি লগ্নস্ফুটে যোগ করিলে ঘটীলগ্নস্ফুট ৭।০।১৫ হইল। যথা পরাশরীয়ে—

> "ঘটীলগ্নং প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং দ্বিজসত্তম।
> সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য জন্মকালাবধি ক্রমাৎ॥
>
> যা চিন্ত্যা ঘটিকা জাতা তন্মধ্যে চার্কভাজিতা।
> একৈক ঘটিকা বিপ্র একৈকং লগ্নসংজ্ঞকম্॥
>
> ভানুস্তিষ্ঠেচ্ছিষ্টঘটীর্গণয়েৎ জন্মলগ্নতঃ॥
> যাবন্তিমো রাশি লব্ধং তদ্রাশির্ঘটিকাতনুঃ॥"

হোরালগ্নম্।

আড়াই দণ্ডে এক এক রাশি হয়। উক্ত হিসাবে সূর্য্যোদয় হইতে ইষ্টকাল পর্য্যন্ত বিগত দণ্ড পলাদিতে কত সাবয়ব রাশ্যাদি হয় নির্ণয় পূর্ব্বক সেই রাশ্যাদি ওজ লগ্ন স্থলে সূর্য্যস্ফুটে এবং যুগ্ম লগ্ন স্থলে লগ্নস্ফুটে যোগ করিলেই হোরা-লগ্নস্ফুট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইষ্টদণ্ডাদিকে

দ্বিগুণ করিয়া, তাহাকে পাঁচ দিয়া ভাগ দিলে, অবশিষ্ট দণ্ডে রাশি এবং পলাদির অর্দ্ধেক অংশাদি হইবে। যথা—ইষ্টদণ্ড ২২।২৫।১৫ ইহার দ্বিগুণ ৪৪।৫০।৩০ ইহাকে পাঁচ দিয়া ভাগ দিলে ৮।৫৮।৬ সুতরাং রাশ্যাদি ৮।২৯।৩ হইল। যথা পারাশরীয়ে—

"দ্বিসার্দ্ধঘটিকা বিপ্র কালাদিতি বিলগ্নভাৎ।
প্রয়াতি লগ্নাৎ তন্নাম হোরালগ্নং দ্বিজোত্তম॥
যজ্জন্ম বিষমক্ষের্স্মু সূর্য্যাদি গণয়েৎ ক্রমাৎ।
সমলগ্নে যদা জন্ম গণয়েৎ জন্মভাৎ দ্বিজ॥"

ভাবলগ্নম্।

যেমন ঘটীলগ্নে প্রতি দণ্ডে এক এক রাশি এবং হোরালগ্নে প্রতি আড়াই দণ্ডে এক এক রাশি তদ্রূপ ভাবলগ্নে প্রতি পাঁচ দণ্ডে রাশি গণনা করা যায়। সূর্য্যোদয় হইতে ইষ্টকাল পর্য্যন্ত যত দণ্ডাদি হইবে, তাহার প্রতি পাঁচ দণ্ডে এক এক রাশি কল্পনা পূর্ব্বক রাশ্যাদি স্থির করিবে। ইষ্টদণ্ডাদিকে ৫ দিয়া ভাগ দিয়া পূর্ব্বোক্ত মত অবশিষ্ট পলাদির অর্দ্ধেক গ্রহণ করিলে যথাক্রমে দণ্ডাদির স্থলে রাশ্যাদি নির্ণীত হইবে। উক্ত রাশ্যাদি লগ্নের ওজযুগ্মত্বানুসারে রবি বা তনুস্ফুটে যোগ করিলেই ভাবলগ্ন হইল। এতদ্বিষয়ে বৃদ্ধকারিকায় লিখিত আছে—

"সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য কলাপঞ্চ প্রমাণতঃ।
জন্মেষ্টকালপর্য্যন্তং গণনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
ওজরাশৌ যদা লগ্নং সূর্য্যরাশ্যনুসারতঃ।
সমলগ্নে জন্মলগ্নাৎ ভাবলগ্নং তদৈব হি॥"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে সূর্য্যোদয় হইতে ইষ্টকাল পর্য্যন্ত গণনায় যত দণ্ডাদি হইবে, তাহার প্রতি দণ্ডে, প্রতি আড়াই দণ্ডে এবং প্রতি পাঁচ দণ্ডে এক এক রাশি কল্পনা করিয়া সাবয়ব রাশ্যাদি নির্ণয় পূর্ব্বক লগ্নের ওজযুগ্মত্বানুসারে সূর্য্যস্ফুটে বা লগ্ন স্ফুটে যোগ করিলেই যথাক্রমে ঘটীলগ্ন, হোরালগ্ন এবং ভাবলগ্ন নির্ণীত হইল। জন্মলগ্ন স্ব স্ব দেশীয় উদয়মান হইতেই গৃহীত হইয়া থাকে। যখন সূর্য্যোদয় হইতেই সর্ব্ববিধ লগ্নের প্রবৃত্তি তখন ঘটী-লগ্নাদি বিষয়ে ইষ্ট দণ্ডাদি ঘটিত রাশ্যাদি কেন যে লগ্নের ওজ যুগ্মত্বানুসারে যথাক্রমে সূর্য্য এবং লগ্ন স্ফুটে যোজ্য তাহার কোন বিশেষ হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তত্তৎ রাশ্যাদি কেবল মাত্র সূর্য্য স্ফুটে যোগ করাই যুক্তি ও বিচার সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ স্বকৃত টীকার মধ্যে লিখিয়াছেন—

"সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকানাং তু পঞ্চকম্।
প্রয়াতি জন্মপর্য্যন্তং ভাবলগ্নং তথৈব চ॥
তথা সার্দ্ধদ্বিঘটিকামিতাৎ কালাদ্ বিলগ্নভাৎ।
প্রয়াতি লগ্নং তন্নাম হোরালগ্নং প্রচক্ষ্যতে॥"

সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরে একদিন।

সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার আশায় আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। চীনদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, আমাদের জাহাজ, জল এবং কয়লা লইবার জন্য এই স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল, সেইজন্য আমাদের ভাগ্যে এই মনোরম স্থান দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। জাহাজ হইতে সিঙ্গাপুর বন্দরের দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক এবং নয়নের আনন্দদায়ক (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। আমার বোধ হয় সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সমুদয় বন্দরের দৃশ্যই এইরূপ প্রীতিপ্রদ। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভাও অত্যন্ত মনোহর। বন্দর হইতে অনবরত জাহাজ গতায়াত জন্য সর্ব্বদাই সজীবতা পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রতীর পোত-সংস্কার-স্থান, জেটি, মালগুদাম এবং কয়লার গুদাম দ্বারা পরিপূর্ণ। অদূরে সমুদ্রমধ্যে একখানি যুদ্ধ জাহাজ যেন পাহারাওয়ালার মত দাঁড়াইয়া আছে। এই দ্বীপ মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। সিঙ্গাপুরের সহিত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এবং চীন সাম্রাজ্যের গুরুতর বাণিজ্য-সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। জাহাজ নঙ্গর করিলে, আমরা সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া কূলে অবতরণ করিলাম। অনন্তর একখানি রিক্সা-গাড়ী ভাড়া করিয়া, সহর দেখিতে বাহির হইলাম। এই গাড়ীও চীনদেশীয় টানা-গাড়ীর ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা কিছু বড়, দুই জন পাশাপাশি হইয়া বসিতে পারে। এখানেও চীনেরাই এই গাড়ী টানিয়া থাকে। রাস্তায় যাইতে যাইতে সুদূর বিস্তৃত নিবিড় অরণ্যানী নয়নগোচর হইল। এরূপ জঙ্গলপূর্ণ স্থান প্রায় সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই জঙ্গলের মধ্যে তাল, নারিকেল, কদলীবৃক্ষ, ইক্ষু, দারুচিনি, মুসব্বর, লবঙ্গ, জায়ফল, কাফি, আনারস, ম্যাঙ্গোষ্টিন এবং অন্যান্য ফলবান বৃক্ষের আবাদ হইয়া থাকে এবং এই সমুদয় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতিদেবী এখানে মুক্তহস্তা। উৎকৃষ্ট আবাদ প্রায়ই চীনেদের একচেটিয়া; অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টগুলি মালয়দ্বীপবাসিদিগের আয়ত্তাধীন। এখানে চীনদেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—লক্ষাধিক হইবে। অন্যান্য অধিবাসীর মধ্যে ভারতীয় লোকের সংখ্যা প্রায় আঠার হাজার হইবে। উহারা প্রায়ই মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কলিঙ্গদেশ হইতে আগত বলিয়া ক্লিং নামে অভিহিত। এই স্থানের নাম সিঙ্গাপুর বা সিংহপুর যে ভারতীয়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে হিন্দুরা যখন জবদ্বীপে বসতি করিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে ইহারও ঐরূপে নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ২৭ মাইল এবং প্রস্থে ১৪ মাইল হইলেও কলিকাতা সহরের এক তৃতীয়াংশ অনুমান হয়। এই দ্বীপ ব্রিটীশ রাজের শীর্ষ-উপনিবেশসমূহের মধ্যে একতম; তজ্জন্য ইহাকে সুদূর-পূরব-সাগরের রাণী বলা হইয়া থাকে। এখানেও নানা জাতির অপূর্ব্ব

সম্মিলন,—মালয়, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং চীনেমান। এখানকার লোকে কিরূপভাবে কাজকর্ম্ম করে, তাহার চিত্র প্রদত্ত হইল (৩নং চিত্র)। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জহোরের মহারাজার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, ব্রিটিশরাজ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার স্থাপয়িতা সার ষ্টাম্‌ফোর্ড রাফল্‌স্। এখানে একটি নদী আছে, তজ্জন্য সহরের মধ্যে মালপত্র লইবার এবং আবাদগুলিতে জল প্রদানের সুবিধা হয়। নদীতীর হইতে পামার পাহাড় পর্য্যন্ত অসংখ্য সুন্দর অট্টালিকা, সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। যাত্রীনৌকা, মালবোঝাই নৌকা, জেলেদের নৌকাদিতে নদীবক্ষ ছাইয়া রহিয়াছে। এই নদীর জন্য স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে উচ্চ আদালত, পুলিশ আদালত, জেল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, যাদুঘর, সৈন্যাবাস, ডাকঘর, স্কুল এবং গির্জ্জা আছে। হিন্দু ও চীনেদের মন্দির এবং মুসলমানের মসজিদও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সিঙ্গাপুরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই সংখ্যার মধ্যে চীনেদের সংখ্যাই অধিক। চীনা সহর সজীব কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, তথায় মূর্ত্তিমান উদ্যোগ এবং কার্য্যতৎপরতা বিদ্যমান। চীনদেশেও আমরা এই দৃশ্যই দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেটি যেন মুল, এখানে যেন তাহার কাণ্ড বিস্তৃত। বিচিত্র পণ্য সম্ভারে বিপণি-শ্রেণী সজ্জিত। বিবিধবর্ণের বিহঙ্গমকুল বিক্রয়ার্থ বাজারে সমানীত। প্রচুর পরিমাণে এত স্বাদু ফলমূল বাজারে বিক্রয়ার্থ পুঞ্জীভূত রহিয়াছে যে তন্মধ্যে কতকগুলি আমরা ভারতবর্ষে আদৌ দেখিতে পাই না। ইউরোপীয়গণ এই স্থানে প্রথমে বসবাস করিবার সময়ে ইহা যে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার প্রমাণ সহর ব্যতীত সর্ব্বত্রই অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এইখানে অপর্য্যাপ্ত লজ্জাবতী লতা দেখিতে পাইলাম। ইউরোপীয় এবং অন্যান্য বড়লোকদের বাগানবাড়ীর বৃক্ষ-রাজির অন্তরাল হইতে অসংখ্য লজ্জাবতী পরিলক্ষিত হইল। এখানে উত্তরদিকে পুলের রাস্তা এবং যে রাস্তা ক্যানিং কেল্লা হইতে পরিলক্ষিত হয় তাহা দেখিতে বেশ সুন্দর, (৩।৪ চিত্র দ্রষ্টব্য)। উদ্যানবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি শাসনকর্ত্তার প্রাসাদ অবস্থিত। অপর একটি পাহাড়ের উপর ক্যানিং নামক কেল্লা স্থাপিত। এখানে 'টাইমস্' পত্রিকার আফিস এবং ইউরোপীয় বড় বড় সওদাগরী আফিস আছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর শঙ্খ, ঝিনুক এবং প্রবাল এই স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে অথবা জলের মধ্যে চারিটি স্তম্ভের উপর মালয়গণ তালপত্র নির্ম্মিত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মৎস্যব্যবসায় চালাইয়া থাকে। একটি কথা পাঠককে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে নঙ্গর করিলে, কতকগুলি মালয় ডুবারী ছোট ছোট নৌকা করিয়া জাহাজের পাশে আসিয়া বলিতে লাগিল—'মহাশয়, কিছু সেণ্ট জলমধ্যে ফেলিয়া দিয়া ডুবারী দেখুন,' এই কথাগুলি অবশ্য তাহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিয়াছিল। তাহা কলিকাতার রাধাবাজারের ইংরাজীর ন্যায় বলা

যাইতে পারে। আমরা কৌতূহলবশে কতিপয় পাঁচ-সেণ্ট এবং সেণ্ট সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে ঐ সকল ডুবারীরা আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতা সহকারে জলমধ্যে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত সেণ্টগুলি দাঁত দিয়া কিম্বা হাত দিয়া তুলিয়া আনিতে লাগিল। এই খেলা এরূপ আমোদজনক বোধ হইল, যে প্রায় এক ডলারের সেণ্ট আমরা ক্রমে ক্রমে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটিও সমুদ্রগর্ভে স্থান পাইল না। আমাদের দেশের টাকার ন্যায় সিঙ্গাপুরে ডলার মুদ্রার প্রচলন। ঐ সকল মালয়গণ অধিকাংশই নীচ শ্রেণীর মুসলমান, তাহারা নৌকার মাঝি অথবা ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানের কাজ করিয়া থাকে। কতগুকলি আরবদেশীয় সওদাগরও ব্যবসা-বাণিজ্যার্থে এখানে আছে। এই স্থানের চীনেরা, চীন দেশের জাত-ভাইদের অপেক্ষা ধনসম্পত্তিতে অধিক উন্নত বলিয়া মনে হইল। তাহারা স্বজাতির শাস্ত্রগ্রন্থের তেমন পক্ষপাতী নহে। তাহারা হিন্দুস্থানী ও মালয়মিশ্রিত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। অনেকেই আবার লিখিতে পড়িতে জানে না। চীনদেশের অধিবাসীগণ এখানকার চীনেদিগকে অত্যন্ত হেয় মনে করে। অনেক ধনী চীনের সন্তানেরা এখানে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে। চীনেদের কাজকর্ম্মের হিসাবাদি কিন্তু চীনা ভাষাতেই নির্ব্বাহিত হয়। এই চীনেরাও চীনদেশীয়গণের ন্যায় পূর্ব্ব পুরুষগণের সমাধিস্থান-পূজাকে ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে ধরিয়া থাকে, তজ্জন্য অনেকে পূর্ব্ব পুরুষগণের উক্ত সমাধিস্থান দর্শনমানসে বৎসরান্তে স্বদেশে গমন করে। চীনে সুন্দরী বিবাহার্থেও ইহারা চীনদেশে গিয়া থাকে। এখানকার চীনেদের স্ত্রীলোকেরা পা ছোট করে না। পুরুষের মধ্যে অনেকেই ইউরোপীয় রুচি অনুকরণের সমধিক প্রয়াসী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বদান্য এবং বিলাসী। কেহ কেহ সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকে। শুনিলাম, এই স্থানের একজন চীনেম্যানের দানে এখানকার জলের কলের কাজ প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু পায়ে অনেক চীনেদের দেখিলাম, কিন্তু এই দৃশ্য চীনদেশে অত্যন্ত বিরল; দেখিয়াছি বলিয়া মনেই হয় না। চীনদেশে তাহারা বস্ত্র, রেশম কিম্বা মখমল নির্ম্মিত তলাপুরু এক প্রকার জুতা ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে, চীনেরা দেখা হইলে করমর্দ্দন করিয়া প্রত্যভিবাদন করে, চীনদেশের ন্যায় 'কো-টৌ' করে না বা 'চিন-চিন' বলে না। এই সকল চীনে, যে কোন ব্যবসাদ্বারা পয়সা উপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। চীনদেশেও এই প্রথাই বর্ত্তমান। একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়াছেন 'এই জাতির মধ্যে এক শত তেরটি কার্য্যকরী শিল্প বিদ্যমান, তদ্দ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের যথেষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে।' চাকুরীজীবি আমরা কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়াই পাই না। চীনেদের মধ্যে জাতীয় ব্যবসায় সমিতি আছে, বলিয়া তাহারা স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবসা চালাইতে পারে। এখানে প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব বড় বেশি। এখানে সামুদ্রিক কচ্ছপের ব্যবসায় চলিয়া থাকে। এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। এই স্থানে পুলিশের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর না

থাকিলে লড়াই দাঙ্গা সর্ব্বদাই হইত বলিয়া মনে হয়, কখন কখন এইরূপ হাঙ্গামা হইয়াও থাকে, কিন্তু পুলিশের সুবন্দোবস্তের জন্য সেগুলি বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। সিঙ্গাপুর সহর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শ্রীআশুতোষ রায়

দু'টি কবিতা

আকিঞ্চন।

দুখ পারাবারে রাখ গো ডুবায়ে
হেরিতে দিও না সুখের মুখ,
ভীষণ-অশনি-আঘাতে প্রভু গো!
জ্বলিতে দাও হে সতত বুক।
সুখ-সহচরী হয় যবে সাথী
তোমারে ভুলিয়া যাই,
ভাবিতে তোমারে বারেক তখন
নাহি যে সময় পাই।
দগধ-হৃদয় বিষাদ-পাথারে,
ভাসিলে দিবসে নিশিতে হরি,
জড়ায়ে চরণ ধরিব তোমার
রহিবে তুমিও করুণা করি।
সুখের তলাসে দুরবল চিত,
সুখ যে নিমেষে যায়,
অসার অনিত্যে কেন এত রত
কেন প্রাণ তারে চায়?
জীবনে মরণে তুমি যে কেবল
তেয়াগি না রহ কখনো স্বামি
তোমা হেন ধনে ভুলিয়া হৃদয়
তবু যে নিয়ত কুপরগামী
বাঁধ প্রভু! তব জ্ঞান-প্রেম-ডোরে
মলিন হৃদয় মোর,
এ বাঁধন কভু না দিও টুটিয়া
করিয়া মোহেতে ভোর।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

বাসন্তী নিশা।

হের হে প্রকৃতি আজি কিবা মধুময়,
সুনীল গগন-গায় নিৰ্ম্মল মলয়-বায়,
হাসিছে প্রকৃতি সদা ভরি জোছনায়।
বিমল গগনে ইন্দু উঠিয়াছে হায়!
বেষ্টিত তারকারাজি, যেন হে ফুলের সাজি,
সুশীতল সুধাসিন্ধু ধরায় ছিটায়।
সাদা ছোট মেঘগুলি হেথা সেথা ধায়,
চিকমিক ক'রে তারা, আনন্দে নাচিয়ে সারা,
মাথার মুকুটে যথা হীরা শোভা পায়।
মাতার করুণা-স্রোত নদীরূপে ধায়,
তাদের সে আলোগুলি, যেন রে জোনাকি মেলি,
আনন্দে প্রকৃতি রঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়।
দুরস্থিত ঘন কুঞ্জে শোভিতেছে হায়!
খদ্যোতিকা ক্ষুদ্রতর প্রকৃতির সহচর
ঘুমাইছে পাখিগণ অচেতন প্রায়।
এ দিকে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণছটায়,
হাসিছে সাগর-জল নদী গায় কল কল
দু'টি প্রাণ এক হ'য়ে খেলিছে সেথায়।
পার্ব্বতীয় নদিগুলি কল কলে ধায়,
মলা নাই তার হৃদে নমস্কারি গিরিপদে,
জগতের উপকারে নিম্নস্রোতে যায়।
নিঃস্বার্থ মানব যবে বদ্ধ প্রতিজ্ঞায়,
শুদ্ধ হৃদে অগ্রসরে পর-উপকার তরে,
নন্দন-কানন ক্ষিতি তবে হবে হায়।

শ্রীবিষ্ণুপদ দত্ত।

যবনিকার অন্তরালে

(৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

মন্ত্র ও দেবতা এক কেন ?

আমরা দেখিলাম, মন্ত্র, মূর্ত্তি ও দেবতা—একই। যাহা মন্ত্র, তাহাই মূর্ত্তি; শুনিলে বা উচ্চারণ করিলে মন্ত্র, আর দেখিতে পাইলেই মূর্ত্তি; এক দিক থেকে দেখিলে মন্ত্র, অপর দিক থেকে দেখিলে মূর্ত্তি; আবার, যেখানে মন্ত্র সেখানেই দেবতা আকৃষ্ট হন, সেখানেই তিনি মূর্ত্তিতে প্রকট হন। এই প্রকট মূর্ত্তিতেই সাধক দেবতাকে দেখেন, সুতরাং এই মূর্ত্তিই দেবতা ইহাই তাঁহার মনে হয়। এই মূর্ত্তি ছাড়া দেবতা কিরূপ, তাহা তিনি জানেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট মূর্ত্তি ও দেবতা এক। যেমন 'মানুষ' বলিলে দুই হাত, দুই পা বিশিষ্ট একটা মূর্ত্তিই মনে হয়; কারণ ঐ মূর্ত্তি ছাড়া—মানুষ কিরূপ, তাহা আমরা দেখি নাই। সেইরূপ, 'যক্ষ' বা 'গন্ধর্ব্ব' বলিলেই, সাধকের এক একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তিই মনে হয়, যে যে মূর্ত্তিতে ঐ সকল দেবতা তাঁহার নিকট সদাই আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব, মন্ত্রও যাহা দেবতাও তাই; কারণ দুইই মূর্ত্তি। অবশ্য, এই যে মূর্ত্তিটি (যে মূর্ত্তিটি মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট হয়), ইহাই যে ঐ দেবতার একমাত্র মূর্ত্তি তাহা নহে। দেবতা ইচ্ছা করিলে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। তবে, মন্ত্রসৃষ্ট মূর্ত্তিটি, বোধ হয়, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বা কার্য্যসাধিকা।

বিবিধ পূজা ও সিদ্ধি

অতএব, "মন্ত্রসিদ্ধ" বা "দেবতা-সিদ্ধ" বলিয়া যে একটা কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ইহা অলীক নহে, কুসংস্কারও নহে। প্রকৃতই এরূপ হওয়া যায়, এবং অনেকে হইয়াছেন। তবে, ক্ষুদ্র বা নিম্নশ্রেণীর দেবগণকে যত শীঘ্র বশ করা যায়, উচ্চতর দেবগণকে বশ করা তত সহজ নহে। মনুষ্যের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপ দেবতার পূজা করেন। যাঁহার কাম, ক্রোধ, মোহ, হিংসাদি প্রবল, তিনি ভূত, প্রেত ও পিশাচাদির সাহায্য গ্রহণ করেন, যিনি ধন, মান, রূপ, প্রভাব, প্রতিপত্তি পাইতে ইচ্ছুক তিনি যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির আশ্রয় লন, এবং যিনি জ্ঞান, দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, ভক্তির জন্য লালায়িত, তিনি সর্ব্বোচ্চ দেবতাদের শরণাপন্ন হন। গীতায় ভগবান ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥"
(১৭। ৪)

আমাদের দেশে 'বেদে', 'সাপুড়ে' প্রভৃতি ইতর শ্রেণির লোকের মধ্যে আজিও দু'একটা 'প্রেতসিদ্ধ' বা 'পিশাচসিদ্ধ' লোক দেখা যায়। কেহ হয়ত এক মুঠা ধূলা লইয়া পয়সা করিয়া দেয়, কেহ হয়ত অঞ্জলিতে প্রস্রাব

করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা টাকা করিয়া দেয়, কেহ বা এক জায়গায় বসিয়াই এক মণ মিঠাই উদরসাৎ করিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করে। যে সকল ব্যক্তি নানা রকম ম্যাজিক বা খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদের যে সবই হাতের চাতুরী তাহা নহে। তাহাদের অনেকেরই দু'একটা ক্ষুদ্র সিদ্ধি আছে। আবার, অনেকেই বোধ হয় সাপের 'ওঝা' দেখিয়াছেন। ইহারা যে সকলেই প্রতারক, তাহা নহে। প্রকৃত শক্তিশালীও আছেন। কি রূপে এরূপ হইলেন? কোন মন্ত্রের দ্বারা কোন নিম্ন শ্রেণির দেবতাকে বশে আনিয়াছেন। এই দেবযোনির সাহায্যেই তাঁহারা ঐরূপ কৃতকার্য্য হন।

আর একটি বিষয়, (যাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করেন) ভারতের তীর্থক্ষেত্র ও দেবমূর্ত্তি। কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইল, ইহাদের রহস্যই বা কি, তাহা সম্যক আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, এবং করিবারমত শক্তিও নাই। তবে মোটামুটি দুই একটা কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থক্ষেত্রগুলি এক একটি আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্র-স্বরূপ, শত শত বৎসর সহস্র সহস্র ভক্ত যাত্রীর সমবেত ভক্তি স্পন্দনে পূর্ণ। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি কি রূপে হইল? স্থানে স্থানে হয় ত কোন কোন মহাপুরুষ কোন কোন দেবতার আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবতার প্রসন্নতা ও দর্শন পাইয়াছিলেন। যে মূর্ত্তিতে দেবতা তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হন, লোকহিতের জন্য তাঁহারা

(তীর্থস্থান ও দেবমূর্ত্তির উৎপত্তি।)

সেই সেই স্থানে সেই সেই মূর্ত্তি পাথরে বা মৃত্তিকায় গঠিত করিয়া (বা করাইয়া) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপেই বোধ হয় ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রের ও দেবমূর্ত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভগবানের প্রধান প্রধান অবতারগুলিও ভক্তগণদ্বারা প্রস্তরাদিতে গঠিত হইয়া নানা স্থানে পূজিত হইতেছেন এবং কালে সেই সকল স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

এখন, তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কিরূপে হয় দেখা যা'ক। এক একটি মূর্ত্তি বা বিগ্রহ এক একটি দেবতার শক্তি-সঞ্চারের কেন্দ্র বা শরীর-স্বরূপ। যেমন, আতসি কাচ (lens) বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে, সেইরূপ এক একটি বিগ্রহ তত্তৎ দেবতার শুভ স্পন্দনকে পুঞ্জীকৃত করিতে পারে; সুতরাং বিগ্রহের মধ্য দিয়া দেবতা তাঁহার পবিত্র স্পন্দন (ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যাদি) বিকিরণ করিতে সহজেই সমর্থ হন। যেখানে এইরূপ হয়, সেখানে লোকেরা মূর্ত্তিকে 'জাগ্রত দেবতা' বলিয়া থাকেন। প্রকৃতই সেই মূর্ত্তিতে যেন একটা সজীবতা, একটা জ্যোতি দেখা যায়। অবশ্য সকল তীর্থক্ষেত্রেই যে সকল বিগ্রহই এইরূপ সজীব—জাগ্রত তাহা নহে। যে বিগ্রহগুলিতে উৎপত্তিকালে প্রতিষ্ঠাতা (বা দেবতা) যত অধিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন এবং যে বিগ্রহগুলি যত অধিক ভক্ত-যাত্রীর দ্বারা পূজিত হইয়াছেন, সেই বিগ্রহ ততই সজীব, ততই জাগ্রত। প্রথমটির কারণ সহজেই বুঝা যায়। আপনি একটা ব্যাটারিতে যত অধিক তড়িৎ সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন,

(তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য।)

বা একটা পুষ্করিণীতে যত অধিক জল পূরিয়া রাখিবেন, তাহা (অল্পে অল্পে ব্যয়িত হইয়া) তত দীর্ঘকাল থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয়টির কারণ কি? একটি বিগ্রহ যত অধিক পূজিত হন তাঁহার মাহাত্ম্য বা শক্তি তত বাড়ে কেন? দুইটি হেতু আছে, প্রথম ভক্তদের সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন বিগ্রহে সঞ্চিত হইতে থাকে, দ্বিতীয়তঃ ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্পন্দন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আকর্ষণ করে—টানিয়া আনে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়মটি (the law of action and reaction) কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, সকল রাজ্যেই খাটে। আপনি যত জোরে একটি দেবতার দিকে ভক্তির স্পন্দন দিবেন, দেবতা হইতে ঠিক তত জোরে একটি প্রতিক্রিয়া আসিবেই।

অতএব দেখা গেল, একটি মূর্ত্তির যত অধিক পূজা হয়, তাহার শক্তিও তত বাড়ে।

নিকৃষ্ট দেবতার পূজা পরিত্যাজ্য।

এখানে আমাদের একটি ভাবিবার বিষয় আছে। আমাদের তীর্থক্ষেত্রের সকল মূর্ত্তিগুলিই যে উচ্চস্তর দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত ও অনুপ্রাণিত, তাহা নহে। অনেক মূর্ত্তিতেই নিম্নস্তরের দেব-যোনিগণ (যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদি) অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং প্রদত্ত পশুমাংস ও পশুরক্তের দ্বারা দীর্ঘকাল তৃপ্ত হইয়া আসিতেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সকল নিকৃষ্ট দেবযোনিকে পূজা ও ভোগ দিয়া সজীব রাখা কর্ত্তব্য কি না? ইঁহারা আমাদের কতটুকু উপকার করিতে সমর্থ? নীচ বাসনা (যথা—ধনতৃষ্ণা, শত্রুসংহার, কামিনীসম্ভোগ ইত্যাদি) চরিতার্থ করা ব্যতীত ইঁহাদের অধিক কিছু করিবার শক্তি নাই; বড় জোর না হয় কোন শারীরিক পীড়া আরাম করিতে পারেন। আমরা কি এখনও নীচবাসনার এতই দাস যে এই সকল নিকৃষ্ট দেবযোনির দ্বারা উহা চরিতার্থ করিতে যত্ন করিব? বোধ হয়, কেহই ইহা স্বীকার করিবেন না। সে যুগ বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। যখন মানব অসভ্য ছিল, দুর্দ্দান্ত ছিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য ছিল, তখন সে পশুবলিদ্বারা নরবলিদ্বারা স্থূল মদ্য-মাংস-মৈথুনাদি জঘন্য উপচার দ্বারা নিকৃষ্ট দেবযোনিকে প্রসন্ন করিয়া পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরা ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, ও জ্ঞানের মহিমা বুঝিয়াছি। আমরা প্রেমের ভিখারী; অতএব ভাই, প্রেমময়ের আশ্রয় লও, আনন্দময়ীর চরণে নিজের কামছাগকে ও ক্রোধ মহিষকে বলি দাও। ইহাই প্রকৃষ্ট বলি।

তীর্থস্থানগুলিকে শক্তিশালী রাখিবার আর একটি উপায় আছে। মহাপুরুষদিগের আগমন ও অবস্থান। প্রায় প্রত্যেক তীর্থস্থানেই সাধু মহাত্মারা ছদ্মবেশে যান ও কিছুকাল অবস্থিতি করেন। ইহার কারণ কি?

তীর্থস্থানে শক্তিসঞ্চার।

অনেকে ভাবেন তাঁহারা নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই যান; কিন্তু তাহা নহে। মহাপুরুষেরা নিজের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল নন; পরের জন্য, জীবের হিতের জন্যই তাঁহারা নানা স্থানে গমনাগমন করেন। তাঁহারা তীর্থক্ষেত্রে গিয়া বিগ্রহে এবং তত্রত্য সূক্ষ্মাকাশে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া আসেন; প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞানের স্পন্দন দিয়া স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়া যান, যেন যাত্রি-

গণকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে না হয়, যেন তাঁহারা কিছু না কিছু লইয়া আসিতে পারেন। এই লোক-পাবন, পরহিতব্রত, শক্তিশালী মহাপুরুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে যত অধিক, পৃথিবীর আর কুত্রাপি তত নহে। এই জন্যই ভারতবর্ষে তীর্থক্ষেত্রও এত অধিক, এই জন্যই ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ এত নির্ম্মল ও পবিত্র, এই জন্যই অনেক বিদেশীয় সাধু ও যোগী ভারতে জন্মগ্রহণ করা ও বাস করা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন।

কেহ কেহ বলিবেন "তীর্থক্ষেত্রে পবিত্রতা কোথায়? যত পাপ, যত দুষ্কার্য্য, যত বীভৎস ব্যাপার তীর্থক্ষেত্রে দেখা যায়, বোধ হয় কুত্রাপি সেরূপ নাই।" ঠিক কথা। কিন্তু ইহাদ্বারাই তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতার ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি বীজের মধ্যে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত আছে। যদি উহা অনুকূল মৃত্তিকা, রস ও শক্তি পায়, তাহা হইলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়, পুষ্প ফল প্রসব করে, পরে শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। অধিকাংশ মানবের মধ্যেই কাম-ক্রোধ-লোভাদির বীজ নিহিত আছে। সাধারণতঃ সেগুলি এরূপ প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন থাকে, যে অনেকে তাহাদের অস্তিত্বও বুঝিতে পারে না। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রের তীব্র স্পন্দনের মধ্যে, ইহারা আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, বাহিরে প্রকাশ পায়, বৃক্ষে পরিণত হয় এবং শেষে মরিয়া যায়। ইহাঁরা যদি তীর্থক্ষেত্রে না থাকিয়া অন্যত্র থাকিতেন, তাহা হইলে এ বীজগুলি এত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইত না, হয় ত এ জন্মেই হইত না; কিন্তু এক সময় না এক সময় যে হইতেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থক্ষেত্রের শক্তি এই যে, উহা ভিতরের পাপগুলিকে বাহির করিয়া মারিয়া ফেলে। শরীরের মধ্যে যদি বিষ থাকে, উহা বিস্ফোটকাদিরূপে ফুটিয়া বাহির হইলেই মঙ্গল এবং সুচিকিৎসকেরা তাহাই করেন। মহাপুরুষদিগের চিকিৎসা-প্রণালীও এইরূপ। এই জন্যই তীর্থস্থানে এত দুষ্কার্য্য লক্ষিত হয়। তীর্থক্ষেত্রে মন্দ বীজগুলি যেমন প্রকাশ পায়, ভাল বীজগুলিও সেইরূপ ফুটিয়া উঠে। যদি দয়া, ভক্তি, প্রেমাদির বীজও অস্ফুট থাকে, তীর্থক্ষেত্র ইহাদিগকেও বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া মনোহর মূর্ত্তিতে সর্ব্বসমক্ষে আনয়ন করেন।

তীর্থক্ষেত্রে এত পাপ কেন?

দেব-মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর দু'একটি কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ মূর্ত্তিই কল্পিত নহে। মহাত্মা বা সিদ্ধপুরুষগণ প্রকৃতই যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই রূপই নির্ম্মিত বা খোদিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই মূর্ত্তির একমাত্র রহস্য নহে। অনেক রহস্য আছে। তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, মূর্ত্তির মধ্যে কোন রূপক (allegory) থাকিতে পারে, সৃষ্টি-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব বা উচ্চতর লোকের কোন ঘটনা বা সত্য, মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান থাকিতে পারে। যেমন, শিব-লিঙ্গ—প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গমে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, সর্ব্বত্রই প্রকৃতি-পুরুষ, প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ থাকিতে পারে না, এই তত্ত্বটি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে। সেইরূপ, ভগবানের অনন্ত শয্যা, দারুব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতি মূর্ত্তিতেও উচ্চতম লোকের এক একটি সত্য নিহিত আছে।

রহস্য।

দ্বিতীয়, মূর্ত্তি কোন বিশিষ্ট ভাবের (যেমন ভগবানের অনন্ত করুণা, প্রেম, বা ত্যাগের) দ্যোতক বা জ্ঞাপক হইতে পারে। যেমন, মহাদেব বিরাট ত্যাগের মূর্ত্তি, গঙ্গা ভগবানের অসীম করুণার মূর্ত্তি, ইত্যাদি। অবশ্য, একই মূর্ত্তিকে নানা ভাবে দেখা যায়। জ্ঞানী যে মূর্ত্তিতে একটা বিশ্ব-রহস্য (cosmic truth) দেখিতে পান, ভাবুক-ভক্ত তাহাতেই হয় ত অনন্ত প্রেম দেখিতে পাইয়া বিমোহিত হন। জ্ঞানী বা ভাবুক মূর্ত্তিটি দেখেন না—দেখিতে পান না। মূর্ত্তিটি উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এক অসীম জ্ঞান-রাজ্যে বা ভাব-রাজ্যে উঠিয়া যান।

সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে আজকাল আমরা আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া থাকি। ইহা অন্নপ্রাশনাদি দশবিধ সংস্কার এবং শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। অনেকেই এগুলি নিরর্থক ভাবিয়া তুলিয়া দিয়াছেন এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় ত ইহাদিগকে কুসংস্কার বলিয়াই মনে করেন; কিন্তু দিব্যদর্শী ঋষিগণ কেন যে এই ব্যবস্থাগুলি করিয়া গিয়াছেন, ইহাদের দ্বারা কি গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত যে দশটি সংস্কার করিতে হয়, প্রত্যেকটিতে দেবতা-পূজা, হোম, মন্ত্র-পাঠাদির বিধি আছে। এতদ্ব্যতীত, তিল, যব, হরিদ্রা, চন্দন, হরীতকী, ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা পূজা ও অন্যান্য ক্রিয়া করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ স্পন্দন আছে এবং কোন কোন দ্রব্য উত্তম স্পন্দন-বাহনও বটে। হোম-(মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতাহুতি)-দ্বারা একটি অতি প্রবল স্পন্দন সৃষ্ট হয়। এই স্পন্দন দেবতাদিগের অতিশয় অনুকূল ও প্রিয়। এই দ্রব্যাদি ও মন্ত্র এরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, যে তদ্দ্বারা কার্য্য করিলে বিশেষ বিশেষ উচ্চ দেবতা কর্ম্মস্থলে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের শুভস্পন্দনের দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মঙ্গল বিধান করেন। শিশু যখন গর্ভে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন হইতেই শুভ-স্পন্দন তৎপ্রতি বর্ষিত হইতে থাকে, তখন হইতেই কোনো বিশেষ দেবতাকে আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহার উপর শিশুর রক্ষা-ভার অর্পিত হয়। তৎপরে শিশু ভূমিষ্ট হইলে, পুনরায় সেই দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করা হয়। অতঃপর শিশুর যখন দন্তোদ্গম হয়, যখন মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় (foreign) অন্ন ভোজনের সময় আইসে, তখনও পুনরায় দেবতার শুভ-স্পন্দন আকৃষ্ট করা হয়, দেবতার কৃপা প্রার্থনা করা হয়। এইরূপে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বেও দেবতার শুভ-শক্তি-দ্বারা বালককে সবল ও দৃঢ় করা হয়, যেন সে তত্তৎ-আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হয়, যেন সে দেবানুকম্পায় স্বীয় কর্ত্তব্য অবিচলিতভাবে পালন করিতে সমর্থ হয়। ইহাই সংস্কারগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। যখন হিন্দুর প্রাণ ছিল—যখন দেবতায় প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল,—তখন সে প্রকৃতই দেবতার সাহায্য পাইত। কিন্তু এখন সে প্রাণ নাই, সে বিশ্বাস নাই; সংস্কারগুলিও জীবন-হীন প্রথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং যথানিয়মে সম্পাদিতও হয় না। তাই, আর দেবতা

দশবিধ সংস্কার।

আকৃষ্ট হন না, ক্রিয়াগুলি প্রায়ই নিষ্ফল হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক জন রক্ষা-দেবতা (Guardian angel) আছেন, যিনি ঐ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যে সাহায্য ও মঙ্গল প্রদান করেন, এইরূপ একটা বিশ্বাস খৃষ্টান-দিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

সেইরূপ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ নিরর্থক নহে। ইহা দ্বারা প্রেত ও পিতৃপুরুষগণ বিশেষ উপকৃত হন। 'কি রূপে হন' বুঝিতে গেলে, মৃত্যুর পর জীবের কি অবস্থা হয় একটু জানা প্রয়োজন।

মৃত্যুর পর প্রেতের অবস্থা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্মদেহে ভুবর্লোকে গমন করেন। এই ভুবর্লোকের সাতটি স্তর বা বিভাগ আছে; নিম্নতর স্তরগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং উচ্চতর স্তরগুলি সূক্ষ্ম। নীচের তিনটি স্তরের নাম প্রেতলোক, এবং উপরের চারটি স্তরের নাম পিতৃলোক। স্তর বলিলে, একটির উপর আর একটি আছে এরূপ বুঝিবেন না; একটির ভিতরে আর একটি আছে এবং বাহিরেও কিয়দ্দূর বিস্তৃত আছে। যেমন রসগোল্লা রসে ডুবান থাকিলে, রস ভিতরেও থাকে বাহিরেও থাকে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। সে যাহা হউক, জীবকে প্রথমে প্রেতলোকে যাইতে হয়। তাহার সূক্ষ্মদেহে সকল স্তরেরই উপাদান (mattar) আছে, সুতরাং সে যে স্তরে বাস করে, সেই স্তরের উপাদান গুলিই প্রধানতঃ স্পন্দিত হয়। ইহার ফল এই হয় যে, যতকাল সে প্রেতলোকে থাকে তাহাকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়; কারণ, নিম্নস্তরের পরমাণুগুলি স্থূল এবং স্থূল পরমাণুর স্পন্দনই কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসাদি নীচ প্রবৃত্তি। অতএব যত কাল তাহার সূক্ষ্ম-দেহ হইতে এই স্থূল পরমাণুগুলি ঝরিয়া না যায়, তত কাল সে এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে যাইতে পারে না, প্রেতলোক হইতে পিতৃলোকে বা পিতৃলোক হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইতে পারে না, তত কাল সে দুষ্প্রবৃত্তির ও নীচ-বাসনার তীব্র তাড়নে জ্বলিতে থাকে, ছট্‌ফট্‌ করে। যদি এরূপ কোন উপায় থাকে, যদ্দ্বারা এই স্থূল উপাদানগুলি শীঘ্র শীঘ্র খসিয়া যায়, সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মল ও পবিত্র হয় এবং প্রেতাত্মা সত্বর যাতনামুক্ত হইয়া উচ্চতর স্তরে বা স্বর্গে গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে কোন্‌ পুত্র, পৌত্র বা আত্মীয়-স্বজন সে উপায়টি অবলম্বন করিতে বাঞ্ছা করেন না? এরূপ নির্দ্দয় ও অকৃতজ্ঞ কেহ আছেন কি?

শ্রাদ্ধ ও তর্পণই সেই উপায়। যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেওয়া হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ এবং যদ্দ্বারা পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন তাহাই তর্পণ।

শ্রাদ্ধ-রহস্য।

"শ্রদ্ধাপূর্ব্বক" শব্দের অর্থ কি? যাহা দিবেন তাহা আন্তরিক ভক্তির সহিত, বিশ্বাসের সহিত, শুভ ইচ্ছার সহিত দেওয়া চাই। যদি কোন দ্রব্য না দিয়া কেবল ভক্তি দেন, কেবল শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করেন, যদি অন্তরের সহিত একাগ্রচিত্তে বাসনা করেন "পিতৃদেব যন্ত্রণামুক্ত হইয়া স্বর্গ-সুখভোগ করুন," তাহা হইলেও উত্তম শ্রাদ্ধ হইবে, যথেষ্ট ফল পাইবেন। কারণ আপনার সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন, শুভ ইচ্ছার স্পন্দন, উদ্দিষ্ট প্রেতাত্মার সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিয়া উহার স্থূল উপাদানকে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে, সূক্ষ্মদেহকে ক্রমশঃ নির্ম্মল

ও পবিত্র করিয়া তুলিবে। এইরূপ শ্রাদ্ধ (কেবল শুভ ইচ্ছা প্রেরণ) খ্রীষ্টানাদি অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। কিন্তু হিন্দুর শ্রাদ্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দু কেবল শুভ ইচ্ছা পাঠাইয়াই ক্ষান্ত নন, তিনি মন্ত্রশক্তি এবং দৈবশক্তিও তাহার সহিত যোগ করেন; সুতরাং তাঁহার শ্রাদ্ধের বল অনেক গুণে বর্দ্ধিত হয়। মন্ত্র-স্পন্দনের কতদূর প্রভাব এবং দেবানুগ্রহে কতদূর শুভ সাধিত হইতে পারে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এই দুই শক্তির সহিত আমাদের শুভ-ইচ্ছা সম্মিলিত হইলে, উদ্দেশ্য যে অতি সহজেই সিদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মন্ত্রের যে একটা পৃথক শক্তি আছে, উদ্গাতা উহার অর্থ বুঝুন আর নাই বুঝুন যথানিয়মে উচ্চারণ করিলেই একটা ফল পান, এই রহস্যটি না বুঝিয়া কেহ কেহ বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বৈদিক মন্ত্রগুলির পরিবর্ত্তে বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করেন। ইহাতে তাঁহারা শুভ ইচ্ছার ফলটি পান বটে, কিন্তু মন্ত্র-স্পন্দনের ফলটি পান না।

এখন, আহার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিব। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বড়ই আঁটাআঁটি, বাঁধাবাঁধি নিয়ম। একবার মন্বাদি স্মৃতি বা যোগের কোন পুস্তক উল্টাইলেই দেখা যায় এ বিষয়ে শাস্ত্র কি কঠোর। অমুক দ্রব্য খাইতে পারিবে না, অমুক দ্রব্য স্পর্শও করিতে পারিবে না, এইরূপ পর্য্যায় ক্রমাগত চলিয়াছে। যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন নিষিদ্ধ জিনিস খাইয়া ফেল, তাহার জন্য আবার প্রায়শ্চিত্ত! শুধু কি তাই? বিহিত জিনিসগুলি যে প্রত্যহ খাইবে, তাহারও উপায় নাই। অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য নিষিদ্ধ, নবমীতে লাউ খাইবে না, পঞ্চপর্ব্বে মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ, ইত্যাদি। শিক্ষিত হিন্দু এগুলিকে নেহাত অত্যাচার মনে করেন। তিনি ভাবেন 'আপ্ রুচি খানা,' যাহা ইচ্ছা হইবে, যাহা শরীরে সহ্য হইবে, তাহাই খাইবে; এ সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি নিয়মের প্রয়োজন কি?

খাদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের কঠোরতা

এ সম্বন্ধে, বোধ হয়, আমাদের অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ, যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ শিক্ষিত হিন্দুর গুরুস্থানীয়, তাহারাই দেখাইয়া দিয়াছেন, আহারের সহিত দেহ ও মনের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—মৎস্য, মাংস ও মদ্যাদির দ্বারা দেহের ও মনের কি কি অনিষ্ট সাধিত হয় এবং কেবল শাকসব্জি ফল ও দুগ্ধাদির দ্বারাই মানব সবল, দীর্ঘায়ু ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপে আজকাল যে পরিমাণে মদ্যত্যাগী নিরামিষাশীর দল বাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, কিছুকালের মধ্যে তাহাদের সেরি-স্যাম্পেন্-চপ্-কাট্‌লেট্ দুর্ভাগা ভারতের বাজারেই বিক্রীত হইবে, তাহাদের দেশে আর ক্রেতা পাইবে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মত।

সে যাহা হউক, বিভিন্ন আহার **শরীরের** উপর বিভিন্ন ক্রিয়া করে কেন? তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন; কারণ, বিজ্ঞানই দেখাইয়া দিতেছেন এই এই আহারের দ্বারা এই এই রাসায়নিক ক্রিয়া হয়, এই এই পদার্থ দেহ মধ্যে সঞ্চিত হয় ইত্যাদি। কিন্তু **মনের** উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে কেন তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

খাদ্য মনের উপর ক্রিয়া করে কেন?

যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তাঁহারা বলেন স্থূলদেহের অনুরূপে সূক্ষ্মদেহটি গঠিত হয়। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি কি ক্ষিতিতত্ত্ব, কি অপ্‌-তত্ত্ব, কি তেজস্তত্ত্ব, সকল তত্ত্বেরই সাত সাতটি স্তর আছে। নিম্ন স্তরের পরমাণুগুলি স্থূল এবং উচ্চস্তরের পরমাণুগুলি সূক্ষ্ম। যদি স্থূল দেহে নিম্নস্তরের পরমাণু সংখ্যা বাড়ে, সূক্ষ্ম-দেহেও নিম্ন স্তরের পরমাণু-বাড়িবে এবং স্থূল দেহে উচ্চস্তরের পরমাণু বাড়িলে, সূক্ষ্মদেহেও ঠিক তাই হইবে। ইহাই নিয়ম। এখন, মদ্যমাংসাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যের দ্বারা স্থূল-দেহের মোটা (coarse) পরমাণুগুলি বাড়ে বলিয়া, সূক্ষ্ম দেহেও ঠিক ঐরূপ ঘটে। ইহার ফল এই হয় যে, কাম-ক্রোধ-লোভাদি বৃদ্ধি পায়; কারণ মোটা পরমাণুগুলির স্পন্দনের নামই কাম-ক্রোধাদি, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার, সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা স্থূল দেহের সূক্ষ্ম (fine) পরমাণুগুলি বৃদ্ধি করিলে, সূক্ষ্মদেহও তদনুরূপ গঠিত হয়, সুতরাং উচ্চ স্পন্দন (দয়া, ভক্তি, বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি) প্রবলতা লাভ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী B.A.

ক্ষুদ্র কবিতা

বাসন্তী নিকুঞ্জে।

প্রভাত কাকলি গাহি, বেড়ায় বিহগ চয়,
বাসন্তী প্রসূন হাসি মালঞ্চ উজলি রয়,
প্রফুল্ল কুসুমদলে চুমে অলি প্রাণধন,—
মৃদুল মধুর স্বরে স্বনিতেছে সমীরণ।
বিরহবিধুরা বালা নগেন্দ্রনন্দিনী ধনি—
ছুটিতেছে কলনাদে পূজিতে নয়নমণি।
পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি উঁকি দিয়ে রাঙা রবি
তরলা তটিনীবুকে নাচিছে সোনার ছবি।
কনক-কিরণ-হাসে রঞ্জি নীল কাদম্বিনী,
তড়াগে কিরণ চুমে অর্দ্ধস্ফুট কমলিনী।
মাধবী-ব্রততী-জালে রচিত নিকুঞ্জ মাঝে
রাজিতেছে প্রেমলতা আলিঙ্গি মন্দাররাজে
কাননে মাধবী-সখা পঞ্চমে তুলিয়া তান
গোপনে নিতেছে হরি মোর ক্ষুদ্র হৃদিখান

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস।

উত্তরা।

কুরুক্ষেত্র মহারণ সাঙ্গ এত দিনে,
দিগন্ত-বিস্তৃত সেই বিজন শ্মশানে
ভ্রমিছে উত্তরা হায়! অভিমন্যু-প্রিয়া
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু গিয়াছে মুছিয়া!
গৈরিক বসনে ঢাকি ক্ষীণ তনুখানি,
কিশোর বয়সে বালা সেজেছে যোগিনী।
হৃদয়-রতনে হায়! দেছে বিসর্জ্জন,
কুরুক্ষেত্র মহারণে; সুখের তপন
হইয়াছে অস্তমিত চিরদিন তরে,
তাই বালা ভগ্ন-বুকে আকুল-অন্তরে
কাটাইছে গণি কাল তাঁরি প্রতীক্ষায়,
নিঠুর দেবতা কবে হইবে সদয়।
কঠোর বৈধব্য-ব্রত যাপি দিন শেষে
ইষ্ট দেবতার পদে নমিবে হরষে॥

শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু।

যাদুর কুড়ুল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইন্‌স্পেক্টর বোম্‌গাটন্‌, বেঁটে খাঁট লোক, বড় কর্ম্মঠ অথচ শান্ত-স্বভাব। বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসিত। কমিসারি বাহাদুর সে দিন উপস্থিত না থাকায়, তিনি এজ্‌লাস করিতেছিলেন। ছয় ঘণ্টা যাবৎ কাজ করিতেছেন, কিন্তু তখনও ডেস্কের সম্মুখে কানে কলম গুঁজিয়া সটান্‌ বসিয়া আছেন, একটুও ক্লান্তিবোধ নাই। অপর দিকে তাঁহার বন্ধু সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর উইংকেল্‌ আগুনের নিকট চেয়ারখানি পাতিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময়ে এজ্‌লাসের শান্তিভঙ্গ পূর্ব্বক প্রহরীদ্বয় কাম্‌রার দরজা খুলিয়া শ্লেগেলকে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের মুখের ভাব কখনই কিছুতে বিচলিত হয় না, কিন্তু যখন তিনি শ্লেগেলের সেই পাঙ্গাশপারা মুখ ও আলুথালু পরিধান বস্ত্র—হাতে তখনও সেই কুড়ালিখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে—দেখিলেন, তখন তাঁহারও মুখে একবার আশ্চর্য্যভাবের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। আবার যখন ষ্ট্রস্‌ ও প্রহরীদ্বয় সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, তখন তিনি আরও চমৎকৃত হইয়া গেলেন; অবশেষে সমস্ত বিবরণ রেজেষ্টরি বহিতে দস্তুরমত লিখিয়া লইয়া, কয়েদীর প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, "ছোকরা! তুমি খ্রীষ্টমাসের দিনে খুব কাজ করিয়াছ! তোমার এ দুর্ম্মতি হইল কেন?"

ইতিমধ্যে শ্লেগেলের মনের ভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছিল, এখন আর তাহার সেই উন্মত্তভাব ছিল না। অতিশয় দুঃখাতুর হইয়া কুড়ালিখানি হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া, দুই হস্তে নিজের মুখখানি ঢাকিয়া, ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে, কাতরস্বরে বলিল "ঈশ্বরই জানেন।"

ইন্‌স্পেক্টর। "এখন তোমার উপর অন্য খুনগুলিরও সন্দেহ হয়।"

শ্লেগেল অতি ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর না করুন—এমন কথা বলিবেন না!"

ইন্‌স্পেক্টর। "তুমি যে ষ্ট্রস্‌কে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে তাহাতো স্বীকার করিবে?"

"ষ্ট্রস্‌ আমার প্রিয়তম বন্ধু! কি জানি আমি কেমন করিয়া এমন কার্য্য করিলাম!" —অতি কাতরস্বরে শ্লেগেল এই কথা কয়টি বলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর। "তিনি তোমার বন্ধু বলিয়াই তোমার এ অপরাধ আরও দশ গুণ গুরুতর হইয়াছে।

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কঠোরভাবে আজ্ঞা করিলেন, "উহাকে হাজতে লইয়া যাও—রও, সবুর কর, ও কে আসে দেখ।"

দুয়ার খুলিয়া গেল, ও একজন অতি মলিন,

শীর্ণকায় মানুষ ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহার চেহারা এতই মলিন ও শীর্ণ যে তাহাকে জীবন্ত মানুষ বলিয়া হঠাৎ বোধ হয় না। সে কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারটি ও টেবিলটি ধরিয়া আস্তে আস্তে অতি কষ্টে কোন রকমে ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের ডেস্কের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। কেহই তাহাকে চিনিতে পারি না। কিন্তু বোমগার্টনের চতুর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে, তিনি চিনিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "কি ? মাষ্টার মহাশয় যে, আজ যে বড় সকালেই উঠিয়াছেন ? শ্লেগেল নামক আপনার এক জন ছাত্র, ট্রুস নামে অপর একটি ছাত্রকে খুন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, তাই শুনিয়া বুঝি দেখিতে আসিয়াছেন ?"

এক দিন যাঁহার সদানন্দ ভাব ও লাল চেহারা দেখিয়া সকল আনন্দিত হইত, এই কম্পিত-কলেবর শীর্ণদেহ মনুষ্যটি সেই মিউজিয়মের সব্‌কিউরেটর, কেমিষ্ট্রীর সহকারী শিক্ষক শ্লেশিঞ্জর। তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন.—"আজ্ঞে না, আমি নিজের দরকারেই এসেছি।"—অনেক কষ্টে গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, নিতান্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি একটা অতি গুরুতর পাপ করিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক যে করি নাই তাহা অবশ্য ভগবানই জানেন। তাই কবুল করিয়া মনের বোঝা হাল্‌কা করিতে আসিয়াছি। আমিই সেই বৃদ্ধ—আরে বাপ্‌রে—ঐ তো সেই পাপ অস্ত্র !—ওঃ, কি কুক্ষণেই ও খানা হাতে ক'রেছিলাম !"

এই বলিয়া সেই রূপার কুড়ালিখানির দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া তাকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হস্তখানি সেই দিকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভয়ে পশ্চাৎদিকে পাঁচ হাত সরিয়া গেলেন, এবং পাগলের ন্যায় বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখানেও আসিয়াছে—আমার অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্যই বুঝি আসিয়াছে। ঐ যে উহার গায়ে মরিচা লাগিয়া রহিয়াছে দেখিতেছেন, উহা কি তাহা জানেন ? —আমার পরমোপকারী বন্ধু হপ্‌ষ্টিনের রক্ত ! —যখন তাঁহার মস্তকের উপর আমি আঘাত করিলাম, তখন এই রক্ত ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইয়াছিল !—হা পরমেশ্বর !—এখনও যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

বোমগার্টন এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, এখন নিজের পুলিশী ধরণের গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া সব্ ইন্‌স্পেক্টর উইংকেল্‌কে বলিলেন, "ইনি নিজ মুখে অধ্যাপক হপ্‌ষ্টিন্‌কে খুন করা একরার করিতেছেন, তুমি ইহাঁকে গ্রেপ্তার কর। আর এই শ্লেগেল যে ট্রুস্‌কে খুন করিতে উদ্যত হওয়া অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়াছে, ইহাকেও তোমার জিম্মায় দিলাম।" তাহার পর ঘরের মেঝে হইতে সেই কুড়ালিখানি নিজ হস্তে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, 'উভয় আসামীই বোধ হয়, এই একই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে—এই অস্ত্রখানিও তোমার জিম্মায় রাখ।"

শ্লেশিঞ্জর এতক্ষণ মরা মানুষের মত নিশ্চল ভাবে একখানি টেবিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ইন্‌স্পক্টর সাহেবের কথা শেষ হইলে, যেন চটক্-ভাঙ্গার মত হইয়া বলিলেন, "কি বলিলেন ? শ্লেগেল ট্রুসকে খুন করিতে

গিয়াছিল?—কলেজের মধ্যে অন্য কোন দু'টি ছাত্রের মধ্যে তো এত ভাব।বা ভালবাসা দেখি নাই! তবে এ কি হইল? আমি এই অস্ত্র একবারমাত্র স্পর্শ করিয়া আমার বুড়া মাষ্টারকে মারিলাম, শ্লেগেল্ তাহার প্রাণের বন্ধু ষ্ট্রসকে এই অস্ত্র দ্বারা মারিতে উদ্যত হইল—বা মারিলই বা না বলি কেন, সে দৈববলে ওরূপভাবে ধৃত না হইলে তো নিশ্চয়ই ষ্ট্রসকে মারিয়া ফেলিত—ব্যাপারটা কি?—নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কি একটা গুপ্ত রহস্য আছে—আর কিছু না—ঐ অস্ত্র-খানাতেই কিছু যাদু করা আছে।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্লেশিঞ্জর নিতান্ত ভীত দৃষ্টিতে বোম্‌গার্টনের হস্তস্থিত সেই কুড়ালির দিকে দেখিতে লাগিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় মুচ্‌কি হাঁসিতেছিলেন, বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয়, ক্ষান্ত হউন, ওসব বাজে আছিলা করিয়া কেবল আপনার কেস্‌টা খারাপ করিবেন মাত্র। আইনের কাছে গুণ-জ্ঞান যাদু-মন্ত্র খাটে না।—কি বল উইংকেল?"

উইংকেল। কি জানি ভাই, পৃথিবীতে কত-কি আশ্চর্য্য আছে তাহা কে বলিতে পারে?—হয় তো—

উইংকেলের কথায় বাধা দিয়া বোমগার্টন ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি? আমার কথার প্রতিবাদ!

আমার উপর মত চালান? তুমি এই জঘন্য খুনে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে চাও? হতভাগা! তোমার আয়ু ফুরাই-য়াছে!"—এই বলিয়া হতবুদ্ধি উইংকেলের দিকে বেগে দৌড়িয়া গিয়া, তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া, সজোরে হস্তস্থিত সেই কুড়ালির কোপ্ মারিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় ঘরের কড়িগুলি খুব নীচু ছিল, কুড়ালির কোপ উইংকেলের মস্তকে না পড়িয়া একখানি কড়ি কাষ্ঠে লাগিল। ফলাখানা সেই কাঠেই লাগিয়া রহিল আর দাণ্ডিটা ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার্ হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

"ওহো!—আমি কি করিলাম?"—বলিয়া বোমগার্টন হাঁ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন, ও বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আমি করিলাম কি?"—

যে পুলিশ প্রহরীরা শ্লেগেল্‌কে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কয়েদীর হাত ছাড়িয়া দিয়াছিল, শ্লেগেল্ অবসর পাইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আপনি বিশেষ কিছুই করেন নাই, কেবল শ্লেশিঞ্জর মহা-শয়ের কথার সত্যতা প্রমাণ করিলেন মাত্র।—যদিও বিচার বা যুক্তিতে না পাইতে পারেন, কিন্তু ইহার ভিতর যে কোনরূপ যাদু আছে তাহাতে আর তিল মাত্র সংশয় নাই।—যাদু নিশ্চয় আছে।—ষ্ট্রস্! তুমিই বল দেখি ভাই, আমি সজ্ঞানে কি তোমার একগাছি চুলেরও কোন ক্ষতি করিতে পারি, বা আমার সেরূপ প্রবৃত্তি হইতে পারে?—আর, শ্লেশিঞ্জর মহা-শয়! আপনাকে আমরা উভয়েই বেস জানি। আপনি মৃত অধ্যাপক মহাশয়কে কতই না ভালবাসিতেন।—আর আপনি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়, আপনাকেও বলি যে আপনি আপ-নার বন্ধু সব্ ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়কে কখন ইচ্ছা পূর্ব্বক আঘাত করিতে পারেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তাহাও কি কখন হইতে পারে?"

শ্লেগেল। তবে কি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে না যে ইহার ভিতর কোন রকম যাদু আছে? —যাহাই হউক, এখন ভগবানের কৃপায় ঐ পাপ অস্ত্রখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বড় ভালই হইয়াছে; আর উহার দ্বারা কোন ক্ষতি হইতে পারিবে না।—কিন্তু ও কি?—দেখুন তো ওটা কি?"

ঘরের ঠিক্ মধ্যস্থলে মেঝের উপর পাংলা একখণ্ড পার্চমেণ্ট কাগজ গুটান পড়িয়াছিল। অস্ত্রখানার দাণ্ডিটার ভগ্নাংশগুলি যাহা পড়িয়াছিল, সেগুলি দেখিবামাত্র বুঝা গেল যে সেটা ফাঁপা ছিল। এই কাগজখানি বেস্ করিয়া পাকাইয়া একটি ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়া সেই রূপার ফাঁপা দাণ্ডির ভিতর ঢুকাইয়া ছিদ্রটিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্লেগেল অতিশয় কৌতুহলান্বিত হইয়া সেই কাগজখানি উঠাইয়া লইলেন এবং সযত্নে উহাকে খুলিয়া ফেলিলেন। বহু দিনের পুরাতন হওয়ায় লেখাটা নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, অনেক চেষ্টায় পড়া গেল। লেখা প্রাচীন জর্ম্মান ভাষায়, মর্ম্ম এই—

"আলিকিঞ্জন আমার ভগ্নী জোহানাকে এই অস্ত্রের দ্বারা খুন করিয়াছে। আমি জোহন বোদেক্ রোশিক্রুশিয়েন্ যোগীদিগের নিকট যে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই বিদ্যার প্রভাবে এই অস্ত্রকে অভিশপ্ত করিলাম। ইহা আমাকে যেমন দুঃখ দিল, তেমনি দুঃখ যেন সকলকেই দেয়। যে ইহাকে হাতে করিবে সেই যেন মিত্রহন্তা হয়।" আর সব শেষে লেখা আছে—

"পাপ পাপ মহাপাপ, দয়া-ধর্ম্ম লোপ!
যে ছোঁয় সে সুহৃদের শিরে হানে কোপ্!"

শ্লেগেল যখন এই অদ্ভুত কাগজখানি পড়িতেছিলেন, তখন ঘরের ভিতর যাঁহারা ছিলেন সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথাটি নাই—সকলেই ভীত, চমকিত—যেন কি এক অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে সকলেই মোহিত। কাগজখানি পড়া শেষ হইলে, ষ্ট্রস্ সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই, এ সব প্রমাণের আমার কোনও দরকার ছিল না। যে মুহূর্ত্তে তুমি আমার উপর অস্ত্র তুলিয়াছিলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি অন্তরে তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। আজি যদি আমাদের মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তিনিও নিশ্চয় শ্লেশিঙ্গরকে এই কথাই বলিতেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বোম্‌গার্টন্ তখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই ব্যাপার যতই অদ্ভুত হউক না কেন, আমাদিগকে আইন মতই চলিতে হইবে। অতএব উইংকেল্! আমি তোমার উপরওয়ালা কর্ম্মচারী স্বরূপে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তোমাকে খুন করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করার অপরাধে তুমি আমাকে গ্রেপ্তার কর। শ্লেগেল্ এবং শ্লেশিঙ্গরের সঙ্গে আমাকেও হাজতে রাখ। জজদিগের বেঞ্চ বসিলে আমাদের বিচার হইবে।" পার্চমেণ্টি কাগজখানি দেখাইয়া বলিলেন, "এই দলিলখানি সাবধানে রাখিও, আর আমি হাজতে থাকা সময়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিও যেন এই সূত্র ধরিয়া, ইহুদী সিফারকে কে খুন করিয়াছে তাহা বাহির করিতে পার।"

ফলতঃ শিকারের খুনের রহস্যও প্রকাশ হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। ২৮এ ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষক রিন্‌মলের পত্নী শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

টেবিলের উপর একখানি চিঠি পড়িয়া আছে, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "আমিই ইহুদী শিকারকে খুন করিয়াছি। মৃত শিকার আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু। আমি কোন মৎলবে তাঁহাকে খুন করি নাই, হঠাৎ মনের মধ্যে একটা অদম্য বেগের বশীভূত হইয়া এই ঘোরতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি।— অনুতাপে ও শোকে আজ আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইলাম। ভগবান আমার আত্মার প্রতি কৃপা করুন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ মোকদ্দমার দিন। আদালত লোকে লোকারণ্য। সকলেই মোকদ্দমার বিচার দেখিবার জন্য উৎসুক। কোন দেশের কোন আদালতে এমন একটি অদ্ভুত মোকদ্দমার বিচার কখন হইয়াছে বলিয়া কেহ কখন শুনে নাই, তাই আজ বহু দূরদেশ হইতেও লোকে এই মোকদ্দমার বিচার দেখিতে আসিয়াছে। জজসাহেবের এজলাসে মোকদ্দমার বিচার হইবে। আসামীদিগকে যথারীতি হাজির করা হইলে, এক এক-করিয়া তাহাদের সকলের এজাহার লওয়া হইল। তখন সরকারী উকীল মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাসদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে কয়েদীরা এই ঘটনার যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আইন আদালতে 'যাদু' বলিয়া কোন পদার্থ আছে এরূপ স্বীকার করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। পরন্তু এ ক্ষেত্রে প্রমাণপরম্পরা এতই প্রবল হইয়া দাড়াইয়াছিল, যে উকীল মহাশয় এত পরিশ্রম ও বাক্যব্যয় করিবার পরও, জজবাহাদুর জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

"এই রূপার কড়ালিখানি প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জমিদার স্কলিং মহাশয়ের বাস ভবনে দেওয়ালের গায়ে ঝুলান ছিল। তাঁহার প্রিয় খানসামার হস্তে তিনি যেরূপ ভীষণভাবে হত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আপনারা এখনও বিস্মৃত হন নাই। সাক্ষীর জবানবন্দীতে জানা যায় যে এই হত্যার দুই একদিন পূর্ব্বেই খানসামা পুরাতন অস্ত্রশস্ত্রগুলি নামাইয়া সব পরিষ্কার করিয়াছিল। পরিষ্কার করিবার সময় সে অবশ্যই এই কুড়ালির দাণ্ডিটা ছুঁইয়া থাকিবে। তাহার পরেই সে, যে প্রভুর কাছে বিশ বৎসর যাবৎ সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, তাঁহাকেই হত্যা করিল। তাহার পর জমিদার মহাশয়ের উইলের সর্ত্ত অনুসারে এই অস্ত্র বুদাপেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিল। ষ্টেশনে শ্লেশিঙ্গর উহা হাতে করিয়াছিলেন, এবং তাহার দুই ঘণ্টা পরেই তিনি স্বর্গীয় অধ্যাপক মহাশয়কে হত্যা করেন। তাহার পর প্রমাণ সূত্রে দেখা যায়, যে অস্ত্রগুলিকে যখন গাড়ি হইতে গুদাম ঘরে উঠান হয়, তখন জেনিটর রিন্‌মল ঐ কার্য্যে সাহায্য করিবার সময় এই অস্ত্রখানি স্পর্শ করিয়াছিল। সেও যেমন সুবিধা পাইল

অমনি তাহার প্রিয়বন্ধু শিফারের মস্তকে এই অস্ত্র প্রহার করিল। তৎপরে শ্লেগেল কর্ত্তৃক ষ্ট্রনের এবং ইন্স্পেক্টর বোম্‌গার্টনষ-কর্ত্তৃক উইংকেলের হত্যা সাধনের চেষ্টা!— ইঁহারাও ঐ কুড়ালিখানি হাতে লইবার পরেই হত্যাসাধনে উদ্যত হন। অবশেষে পেস্কার আপনাদিগকে শুনাইয়া যে কাগজখানি পড়িলেন, এই কাগজখানি দৈব ঘটনায় ঐ অস্ত্রের দাণ্ডি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অতএব হে জুরি মহাশয়গণ! আমি আপনাদের নিকট এই মোকদ্দমার প্রমাণ পরম্পরা সমস্ত সবিস্তার বর্ণনা করিলাম এখন আপনারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয়, নির্ভয়ে ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া সেইরূপ মত প্রকাশ করুন।"

ডাক্তার লঙ্গিমান্, যিনি ধাতুবিদ্যা ও বিষ-বিদ্যা সম্বন্ধে বহুতর গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।—

"এই ঘটনার হেতু নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইন্দ্রজাল কিম্বা যাদুবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, আমি এমন বোধ করি না। তবে আমি যাহা বলিব তাহাও অনুমান মাত্র কারণ তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু প্রমাণ না থাকিলেও, আমি যাহা বলিব তাহা অনেকটা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত।

"কুড়ালির ভিতর হইতে যে কাগজখানি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে যে রোশিক্রুসিয়েন্-দিগের নামোল্লেখ আছে, তাঁহারা পূর্ব্বকালে কিমিতিবিদ্যায় গভীর জ্ঞানী ছিলেন। কিমিতি বিদ্যার এখন অনেক উন্নতি হইলেও, কোন কোন বিষয়ে প্রাচীনেরা আমাদের অপেক্ষা ভাল জানিতেন, বিশেষতঃ অতি সূক্ষ্ম ও তীব্র বিষ সকল প্রস্তুত করিতে তাঁহারা বিশেষ পটু ছিলেন। এই ব্যক্তি যিনি জোহন বোদেক নামে আপন পরিচয় দিয়াছেন, ইনি রোশিক্রু-সিয়েন সম্প্রদায়ের একজন প্রধান চেলা ছিলেন। সুতরাং খুব সম্ভব তিনি এই সকল দ্রব্য সংযোগের সন্ধান জানিতেন, এবং এমন বিষ প্রস্তুত করিতে পারিতেন, যাহা ত্বকের ছিদ্র দিয়া শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষগুণ উৎপন্ন করিতে পারে। এই রূপার কুড়ালির দাণ্ডিটাতে তিনি এমন কোন পদার্থের লেপ দিয়া থাকিবেন, যাহা অতি সহজে ব্যাপ্ত হইয়া মনুষ্য শরীরকে এরূপভাবে বিষাক্ত করিতে পারে, যে সহসা প্রবলবেগে নরঘাতেচ্ছারূপ উন্মাদ ব্যাধি উৎপন্ন করে। এরূপ স্থলে, যাহাদিগকে সহজ অবস্থায় অধিক স্নেহ করা যায়, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আক্রোশ যে তাহাদেরই উপর বেশি হয়, এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন।"

অনন্তর জুরিগণ অনেকক্ষণ বিবেচনা ও তর্ক বিতর্কের পর সকলে একমত হইয়া এই অদ্ভুত অস্ত্রখানিকে 'যাদুর কুড়ূল' বলিয়াই সাব্যস্ত করিলেন ও আসামীদিগকে নির্দ্দোষ স্থির করিয়া তাহাদিগকে রেহাই দিবার জন্য মত প্রকাশ করিলেন।

জুরিগণ মত প্রকাশ করিলে জজ্ সাহেব, "আসামীগণ বেকসুর খালাস" বলিয়া সেদিন-কার এজলাস ভঙ্গ করিলেন। দর্শকগণ আনন্দ-ধ্বনি করিয়া চলিয়া গেলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

নিত্য ও অনিত্য।

(৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

এক হইতেই এ বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে, এ কথা সকল দেশের ধর্ম্মই স্বীকার করেন। কিন্তু সেই একের স্বরূপ লইয়াই মতদ্বৈধ। সেই মতদ্বৈধ হইতেই নানা ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি। সেই **একই** নিত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে সূতগোস্বামী বলিতেছেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"
(১।২।১১)

"অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা **তত্ত্ব** বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি। চিদ্বিস্তারস্বরূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি। চিদ্বিলাসরূপ ভগবান সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি। তিন অবস্থায় এই তিনটি নাম হইয়াছে।"—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালার অনুবাদ ৫১-৫২ পৃ)

এই ত্রিবিধ প্রতীতি, তিন অবস্থার সাধকে ঘটে। বস্তুতঃ তাঁহাতে কোন অবস্থান্তর নাই। জ্ঞানীর চক্ষে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর পক্ষে পরমাত্মা আর ভক্তের—**ভগবান**।

এই পরমতত্ত্বের———**একের** তত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভগবান-মুখ-নিঃসৃত বাক্যে বলিতেছেন—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌ যৎ সদসৎ পরম্‌।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্‌॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥
(২।২ ৩২-৩৫)

"**পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়তত্ত্ব।** প্রথমে আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ **আমি** মাত্র ছিলাম; আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমাপায়ী (উৎপত্তি ও নাশশীল) অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয় সম্বন্ধ, এই দুই যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে, তাহাও **আমি**। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্য্যের যেমন কিরণ, সর্ব্বভূত আমার সেইরূপ শক্তি-পরিণাম। **আমি** পরিণত হই না, কিন্তু আমার অক্ষর শক্তি, চিন্তামণির স্বর্ণ-প্রসবের ন্যায়, স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও **আমি** সর্ব্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্য শক্তির ভেদাভেদ পরিচয়। আবার প্রলয়ে **আমি** অবশিষ্ট **একই** থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবলদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, এই বাদ

সকল নামের বিবাদ মাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে, যে পরম সত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্য-শক্তি-পরিণাম-রূপ নিত্য-ভেদাভেদজ্ঞান। ইহাই সর্ব্ববেদবাক্য এবং মহাবাক্যসমূহ। বিবিধ মতবাদীগণ আমার অচিন্ত্যশক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে নাস্তি নাস্তি ইত্যাদি নানা প্রকার কল্পনা করে। সেও আমার প্রভাব। এক পরাশক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্যশক্তি। তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থা ও তটস্থ অবস্থা। জগৎ সৃষ্টিতে তটস্থ অবস্থাই অন্ত ও ছায়ারূপে দ্বি-প্রকার। অন্তঃটস্থা শক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে জীব-শক্তি বলিয়াছেন, তথাপি আমি তাহাকে পরা প্রকৃতি বলি। ছায়া তটস্থা-শক্তি অচিন্মায়া শক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম বহিরঙ্গা শক্তি। চিদ্ধামাদি প্রকাশক স্বরূপ-শক্তিকে চিৎশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বলে। মায়া বলিলে প্রধানতঃ আমার পরা শক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপ-শক্তি পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্মায়া শক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া মায়া বলিলেই অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া-তটস্থাকেই বুঝায়। আমি মূল মায়া-শক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি চৈতন্য-স্বরূপ —আত্মা—পুরুষ। ষড়বিংশতিতত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ তিন প্রকার তত্ত্ব বিভাগ আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্‌বিংশতির সমস্ত তত্ত্বকেই অর্থ বলি। অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্মা বস্তু এবং মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে, সকলি বস্তু-প্রায়, কিন্তু মায়া বস্তু নয়। বস্তু, যে আত্মা তাহার শক্তি মাত্র। বস্তুমধ্যে ইহার দুই প্রকার পরিচয়। আভাস ইহার প্রথম পরিচয় এবং তমঃ ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই আভাস পরিচয়। চিৎশক্তি অনুতটস্থ অবস্থায় আভাস-রূপ জীব। সুতরাং তাহার চিৎ-পরিচয়। অচিন্মায়ার তমঃ-পরিচয়; তাহাতে জড়-জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্ম স্বরূপতত্ত্ব-জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।—এখন রহস্য তত্ত্ব শুন। এ জড়-জগৎ মিথ্যা নয়। আমার শক্তি-পরিণতি এবং আমি সৎ-স্বরূপে তাহার মধ্যে আছি বলিয়া সত্য। সত্য হইলেও ইহার আগমাপায়ী প্রকাশ নশ্বর। এই জগতে মহাভূতসকল উচ্চাবচ ভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে অপ্রবিষ্ট। সেই রূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে অনুপ্রবৃষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক, বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে স্বস্বরূপে পূর্ণরূপে আছি। আমার জীব-শক্তি-পরিণতি জীব সকল স্বভাবতঃ আমার প্রণত দাস। তাহাদের ভিতরে পরমাত্মরূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমার চিদ্ধামে প্রাপ্ত-প্রেম জীবসমূহ লইয়া আমার নিরন্তর লীলা।—এখন দেখ, আমি স্বরূপ, স্বরূপ বৈভব জীব ও প্রধানরূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্যঅখণ্ড-অদ্বয়-তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কত প্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয় অন্বয় ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধিনিষেধ অথবা বিধিরাগ-ভেদ-অনুসারে সদ্গুরুচরণে জিজ্ঞাসা-দ্বারা যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করে, তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হয়।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর সঙ্কলিত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা ১৬২-৫ পৃ।

নিত্য সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলা অসম্ভব। উল্লিখিত তত্ত্বটি জানিতে পারিলে, এ জগতে কিছু জানিতে বাকী থাকে না। যাঁহাকে পাইলে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না—গীতা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

তদতিরিক্ত যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকলই অনিত্য।

এই অনিত্য পদার্থসমূহের উৎপত্তিক্রম সম্বন্ধে জগন্মান্য শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ যাহা বলিতেছেন তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে লিখিত আছে—

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মাঽনানামত্যুপলক্ষণঃ॥"

শ্রুতিরও ঐ কথা। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ বলিতেছেন—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসাদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"

এই অগ্র শব্দে কি বুঝিব?—এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির আগে?—তার আগে কি চিরদিন "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্?" না—ঠিক তা নয়। কল্পান্ত প্রলয়ের পূর্ব্বে জগত নিশ্চয়ই ছিল। প্রলয়ে সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ, মূল প্রকৃতি-ক্ষেত্রে লীন ছিল।—ছিল বটে কিন্তু বীজরূপে। যাঁহারা শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া ভূতশুদ্ধির অধিকারী হইয়াছেন। যাঁহারা মন্ত্রকয়টি কেবল মুখে উচ্চারণ করেন না, কার্য্যতঃ করিবার সামর্থ্য পাইয়াছেন। তাঁহারা ব্যাপারটি সহজে ধারণা করিতে পারিবেন; অপরের পক্ষে শ্রবণ বই উপায়ান্তর নাই।

"প্রলয়ের পর, পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎপদার্থ সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান ছিলেন। তখন এই জগৎ কারণরূপে অবস্থিত ছিল। ইহার পৃথক্ প্রতীতি ছিল না। তখন শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি শক্তিনিচয় আত্মগত—লীন ছিল। দ্রষ্টা তিনি, দৃশ্য কিছু ছিল না।"

এই সমস্ত শক্তির মধ্যে ইচ্ছা, মায়া, আর কাল এই তিনটি শক্তির কথা, শ্রীমদ্ভাগবত ঐ স্থলেই বলিয়াছেন। এই সকল শক্তির কথা, ব্যাখ্যাকারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা তত্ত্বৎ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। কার্য্যকারণাত্মিকা শক্তিই মায়া, আর যে শক্তির বলে পৌর্ব্বাপৌর্য্যক্রমে কালের প্রত্যনুবর্ত্তন হইতেছে তাহারই নাম কালশক্তি। এই কালকেও শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের রূপ বলিয়াছেন। যথা—

"এতদ্ভগবতোরূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কর্ম্মবিচেষ্টিতং।
রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে॥"
(তৃতীয় স্কন্ধ)

সৃষ্টি উপক্রম সময়ে, কাল সাহায্যে গুণময়ী মায়ার গর্ভে ভগবানের চিৎশক্তি রূপ বীর্য্য আধান হয়; তাহা হইতে মহত্তত্ত্বর উৎপত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাকারগণ—

"কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥"

এবং— (দ্বিতীয় স্কন্ধ ৫ অ)

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান॥
ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।

(তৃতীয়স্কন্ধ ৫অ)

ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহার সাহায্যে কথাটি বিশদ করিয়া লইবার যত্ন করিতে হইবে। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা এই—"সৃষ্টির উপযুক্ত কাল উপস্থিত হওয়াতে, শ্রীভগবানের ইচ্ছায়, চিৎশক্তির বলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইলেন। এটিও ভগবানের আর একটি শক্তি। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন মূলপ্রকৃতিতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। তিনি পুরুষে লীনা, সুতরাং ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান এই শক্তিত্রয়ও তাঁহাতেই লীনা। পুরুষ প্রকৃতি সংযোগোৎপন্ন মহত্তত্ত্বও তিনগুণের আধার। কিন্তু তাহাতে সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রাধান্য আছে। আবরক যে তমোগুণ তাহারই প্রাধান্য মহত্তত্ত্বোদ্ভূত অহঙ্কারতত্ত্বে আছে। মহতত্ত্বের কিয়দংশের পরিণামই অহঙ্কারতত্ত্ব।

অহঙ্কারতত্ত্ব তমঃপ্রধান হইলেও, ইহা সাত্ত্বিক রাজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ। এই সাত্ত্বিকাদি অহঙ্কার, যথাক্রমে জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূৎত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো॥"

(দ্বিতীয় স্কন্ধ ৫অ)

বৈকৃত তামস অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে শব্দগুণসম্পন্ন আকাশতত্ত্বের উৎপত্তি। বৈকৃত আকাশতত্ত্ব হইতে শব্দ ও স্পর্শ গুণাত্মক বায়ুতত্ত্বের উৎপত্তি। তাহা হইতে শব্দস্পর্শরূপাত্মক তেজস্তত্ত্ব, তাহা হইতে শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক অপ্‌স্তত্ত্ব এবং তাহা হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক পৃথ্বীতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহা হইতে এই বুঝিতে পারা যায় যে পদার্থনিচয়কে যদি এরূপে বিশ্লেষিত করা যায় যে, যে যে উপাদানের শক্তিতে দ্রব্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হয়, তাহা স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়, তবেই আর্য্যজাতির মহাভূত, বা তন্মাত্রগুলির স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। এই উপাদানের সত্ত্বাংশে মন ও দশেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ (দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ), রাজসিক অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণামে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণামে পঞ্চমহাভূত। এই হইল কারণ সৃষ্টি। এই পরমপুরুষ **প্রথম পুরুষ** অথবা বাসুদেবরূপে এই তত্ত্বসমূহের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত আছেন। এ স্থলে উৎপত্তিক্রম সহজে বুঝিবার জন্য একটি চক্র প্রদত্ত হইল।

কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা ব্যতীত হয় না। কুম্ভের উপাদান মৃত্তিকাদি উপস্থিত থাকিলেও যেমন কুম্ভকারের ইচ্ছা না হইলে কুম্ভ হয় না, সেইরূপ সেই ইচ্ছাময়ের অনন্ত শরীর মধ্যে অনন্ত শক্তি-সমন্বিত এই সমুদায় উপাদান-বীজ অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও, যতক্ষণ তাহার ইচ্ছা হয় নাই ততক্ষণ সেই শক্তিনিচয়—অক্ষুব্ধাবস্থায়ই ছিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, সৃষ্টি করিব। সে ইচ্ছাটি উপনিষৎসমূহে এইরূপ লিখিত আছে—
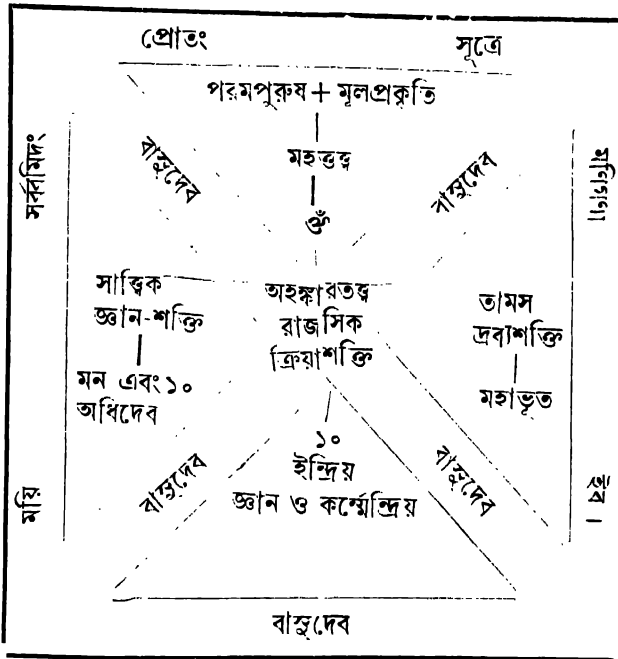
"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।"
(ছান্দোগ্য ৬।২।৩)

"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।"
(ঐতরেয় ১।১।১)

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যতে স এব তদভবৎ। তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবংসূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদংসর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে।"
(বৃহদারণ্যক ১।৪।১০)

এই সমস্ত মন্ত্রই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির দ্যোতক। সেই ইচ্ছার উদয়ে শক্তির ক্ষোভ হইল। এই মহাকুম্ভকার একবার আপনাকে নাড়িলেন। শক্তিগুলির বিকাশ হইল। এই কারণ সৃষ্টি। তার পর সেই কারণ হইতে ব্রহ্মাণ্ড-বিকাশ-কার্য্য কিরূপে হইল সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ আছে, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

"ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্ত লোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিরীশ্বরঃ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশং॥"

ভগবান, স্বীয় কালসংজ্ঞিতা শক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বগণে প্রবিষ্ট হইলেন, অর্থাৎ ভূতাদি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বে সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করিলেন।

ইহার পর যে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হইল আমরা তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

হোলী-খেলা।

কিবা, কাল কালিন্দি-কূলে কেলী-কদম্ব-মূলে
কাল-শশী হইল উদয় গো।
মধুর মুরলী মরি মধুর মধুর রবে
মাতাইল মানিনি-হৃদয় গো।
তাঁরা নাহি মানে কুললাজ, নাহি চায় গৃহকাজ
শ্যাম-দরশন আশে ধায় গো।
গিয়ে সে কদম্ব তলে দেখে বনমালা-গলে
বনমালী ঝুলি'ছে দোলায় গো।
কিবা সুমোহন ফুলদোলা, হেরি' যত ব্রজবালা
শ্যাম-বামে রাধারে বসায় গো।
আনিয়ে ফুলের ডালা, গাঁথিয়ে মোহন মালা,
সযতনে দোঁহারে সাজায় গো।
আহা উদিল যুগল-চাঁদ দূরে গেল পরমাদ
হৃদয়ের আঁধার লুকায় গো।
পেয়ে সেই প্রাণ-ছবি, আনন্দে খেলি'ছে গোরি
প্রাণ ভরি হরি-গুণ গায় গো।
কিবা মধুর-মৃদঙ্গ বাজে, মধুর মধুর সাজে
চারি ধারে নাচিয়ে বেড়ায় গো।
আনিয়ে যমুনা-বারি আবির তাহাতে ডারি'
পীচিকারী লয়ে কেহ ধায় গো।
আবার কেহ বা কুম্‌কুম নিয়ে যুগল শ্রীঅঙ্গে দিয়ে
শোভা হেরে প্রাণে সুখ পায় গো।
কেহ পাগলেরি প্রায়, নাচিয়ে কাননে ধায়
বসন্ত-বাহার কেহ গায় গো।
আর অকিঞ্চন মুদে আঁখি সবারে সম্মুখে রাখি'
হৃদয়ে হেরিয়ে সুখ পায় গো।
হৃদয়ের রজোরাশি অঞ্জলি পুরিয়ে
দেয় সুখে সে যুগল-পায় গো।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

Sree Gouranga Leela, illustrated by the **Index** to the Atlas of Sree Gouranga Bharatbhumi. By Srimat Radhagovinba Chatterjee. 46, Middle Road, Entally, P. O., Calcutta. আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রতিবেশী গৌরগতপ্রাণ শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আজীবন পরিশ্রমে এক মহা ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন, শ্রীগৌরচন্দ্র যে যে পথে যে যে স্থানে গমন করিয়া যে সকল দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন; সেই সকল স্থান এবং বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসিদ্ধ অন্যান্য স্থানসমূহ চিহ্নিত করিয়া কতকগুলি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মানচিত্রগুলিতে স্থান চিহ্নিত করিয়া তত্তৎ স্থানে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাও লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা অনুরোধ করায়, তিনি মানচিত্রগুলি আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। সেগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রকাশিত হইলে, শ্রীচৈতন্যলীলা-স্মরণের একটি প্রধান উপকরণ হইবে সন্দেহ নাই। এখন তিনি ঐ মানচিত্রাবলীর বিষয়গুলির নির্দ্দেশক একখানি সূচী প্রকাশ করিয়াছেন। এখানি পত্র-পত্রিকার আকারে একখানি বৃহৎ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। এ কাগজখানি একখানি মোটা পেষ্টবোর্ডে আঁটিয়া, দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলে, গৌরলীলাস্মরণের বড়ই সুবিধা হইবে। আমরা এ অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি।

রাজবংশ।—আমাদের সম্রাট ইউরোপের রাজবংশ সমূহের সহিত নিকট সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের রাজেশ্বর যেমন ভারতরাজরাজেশ্বরী স্বর্গীয়া ভিক্টোরিয়া দেবীর পৌত্র জর্ম্মনদেশাধীশ্বর তেমনি তাঁহার দৌহিত্র। আমাদের রাজরাজেশ্বরের জননী এবং রুস-সম্রাটের জননী, উভয়ে সহোদরা ভগিনী। আমাদের রাজরাজেশ্বরের জননী বর্ত্তমান ডেনমার্করাজের ভগিনী এবং সম্রাটের সহোদরা নরওয়ে দেশের রাজপত্নী। স্পেনের রাণীও রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্রী। পর্টুগালরাজের সঙ্গেও সম্রাটের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ। গ্রীসের রাজা প্রথম জর্জ্জ আমাদের সম্রাটজননীর সহোদর তাঁহার পুত্রের সঙ্গে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি দৌহিত্রীর বিবাহ হইয়াছে। সম্রাটের খুল্লতাত পুত্রীর সহিত সুইডেন-রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছে। বেলজিয়মরাজের সঙ্গেও সম্রাটের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ।

কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—

"ওমিত্যেত দ্ব্রহ্মণোনেদিষ্টং নাম।
যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি।"

"ওম্‌" এই শব্দটি ব্রহ্মের নেদিষ্ট (অতি নিকটবর্ত্তী) নাম। (কারণ এই নামটি স্বতঃই এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র নিরন্তর শব্দিত হইতেছে,) ইহা উচ্চার্য্যমান হইয়া জীবকে সংসার-ভয়ে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ।" সকল জাতীয় সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণের স্ব স্ব ধর্ম্মোক্ত নামও তাঁহারই নাম, কারণ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই সেই সকল নাম প্রযুক্ত হইতেছে। এই সকল নামেরই সংসার-ভয়-ত্রাণের শক্তি আছে। কেবল শ্রীকৃষ্ণনামের প্রেমদানের শক্তি আছে, কারণ গোপীজন-রাগানুগাসাধন ব্যতীত অন্যত্র মধুর-ভাব সাধনের রীতি নাই। শ্রীকৃষ্ণনাম কর্ণপুটে পান করিলে, তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে এবং প্রাণকে আকুল করিয়া ঐ নাম নিরন্তর জপ করিতে বাধ্য করে। তা'র পর নাম জপিতে জপিতে ক্রমে পরা ঠাকুরাণীর কৃপায় সেই প্রেমের ঠাকুরকে পাওয়াও যায়। তখন হৃদয় গগনে সেই কালোশশীর উদয় হইয়া অন্তর আলোকিত হয়। শাস্ত্রকারগণ সেই নাম ও নামীকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহসা এই কথাটি সকলের ঠিক বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। কিন্তু ঠিক কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। শোনা কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে, যাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, এমন দুই একটি মহাবাক্যের উদ্ধার করাই প্রয়োজন। শ্রুতি বলিতেছেন—প্রণবই তাহার নেদিষ্ট নাম। আবার শ্রুতিই বলিতেছেন এই প্রণবই তাঁহার স্বরূপ—যথা কঠোপনিষদে—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদংসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি।

অথর্ব্বশির উপনিষৎও বলিতেছেন—

"যঃ ওঁকার স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স সর্ব্বব্যাপী
যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তো যোঽনন্তস্তত্তারং"—ইত্যাদি

সমগ্র মাণ্ডুক্য উপনিষদখানিই এই প্রণবরূপী শ্রীভগবানের তত্ত্ব-ব্যাখ্যানে পূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু সেখানি সদ্গুরু সমীপে অধ্যয়ন করিলে এ রহস্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ মন্ত্রমাত্রই দেবতার রূপ। তাই শ্রীপদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীনামচন্দ্র একই। এই চন্দ্রের চন্দ্রিকায় জীবের শ্রেয়ঃ কুমুদ বিকসিত হয়।

তাই বলিলেন—

"শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকাবিতরণং" সকলেই এই কথার যাথার্থ্য নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। নামাভাসেই যখন অশেষ মঙ্গলের উদয় হয়, তখন নামের শক্তিতে যে পরমশ্রেয়ঃ লব্ধ হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ কি? তাই আদিপুরাণ বলিতেছেন—

"ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ॥
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ॥
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরু॥"

এই সকল বাক্য যাঁহার আজ্ঞা, লীলান্তরাশ্রয়পূর্ব্বক আজ তিনিই আমাদিগের জন্য সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সাধু বৈষ্ণবমাত্রের মুখেই "শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণের" যে অর্থ পাই. তাহা হইতে প্রাণে যে ভাবের উদয় হয় তাহা উল্লিখিত হইল। একবার এক মহাপুরুষের মুখে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম—কৈরব শব্দে অন্তঃপুর-মধ্যে বদ্ধা হইয়া হৃদয়বল্লভের সহিত মিলনাশায় রোদন করে যে নারী (কে রৌতীতি কৈরবা) কৃষ্ণের নাম-চন্দ্র উদিত হইলে সেই নারী আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীরাধার ন্যায় বলে—

"সই রে কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম ?
(আমার) কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন-প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তা'রে।"

চণ্ডীদাস।

এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হয়—প্রাণ সেই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমামৃত ধারা পানের জন্য ব্যাকুল হয়—তখন সে কি করে?—যাঁ'র নাম শুনিয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে তাঁহাকে একবার দূরে থেকে চোখের দেখা দেখিতে চায়। সখির কৃপায় দেখিতে ও পায়। তখন ভাবে—

"জলদ-বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হ'য়েছে সুধাময়।
নয়ন-চকোর মোর পিতে হয় উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।"

চণ্ডীদাস।

এই আকুল ভাব ক্রমে বাড়িতে থাকে। ক্রমে শ্যামসঙ্গলাভের লালসা হয়। তখন সখির কৃপায় সে ক্রমে শ্রীমতীর চিহ্নিতা দাসীরূপে গৃহীতা হইয়া সেবার অধিকার লাভ করে—ইহাই পরম শ্রেয়ঃ—অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত

বৈষ্ণবের সঙ্গলাভই একমাত্র শ্রেয়স্পদবাচ্য। শ্রীচরিতামৃতে আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"

শ্রীরায় রামানন্দ বলিতেছেন—

"কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ বিনু শ্রেয়ঃ নাহি আর।"

শ্রেয়ঃকুমুদ প্রস্ফুটিত হইলে, সেটি সেই নামরূপী শ্রীগুরুদেবের চরণেই **শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু** বলিয়া অর্পণ করিতে হইবে। তিনি বহু মূর্ত্তিতে বহু বার আসিয়াছেন। এক বার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়া এই নামতত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন। আবার যখন যাহার প্রয়োজন, তখন তাহার জন্য **শ্রীগুরুরূপে** আগমন পূর্ব্বক, তাহাকে নাম-মহামন্ত্র দানপূর্ব্বক অন্তরে পরাবিদ্যার বিকাশ সাধন করেন। এই নামামৃতই সেই বিদ্যার জীবন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

"বিদ্যাবধূজীবনম্"—শ্রীকৃষ্ণের নামই বিদ্যা-বধূর জীবনস্বরূপ। এই স্থলে বিদ্যা শব্দে **কৃষ্ণভক্তি** বুঝিতে হইবে। একবার শ্রীচরিতামৃতের "রামানন্দসঙ্গোৎসবাধ্যায়" স্মরণ করুন।

"প্রভু কহে "কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?
রায় কহে "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"

এই পরাবিদ্যাবধূর শ্রীকৃষ্ণ-নামই জীবন। গরুড়পুরাণ বলিতেছেন—

"যদীচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাৎ যৎ পরমং পদম্।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥

"হে রাজেন্দ্র, যদি বাসনা অন্তরে
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভে তব,
যেই জ্ঞান হ'তে শ্রেষ্ঠতম পদ
লভে ভবে নর সব ;
তবে, বৃথা আর শাস্ত্র-আলাপনে
কাটা'য়ো না তব কাল,

গোবিন্দের নাম করহ কীর্ত্তন
আদরে,—যা'বে জঞ্জাল॥"

নামকীর্ত্তন করিতে করিতেই সেই পরাবিদ্যারূপা কৃষ্ণভক্তিকে পাইবে। তিনি ঐ নামকীর্ত্তনেই নিত্য পুষ্টা হইবেন। ঐ নামামৃতের অপার শক্তির বলেই তিনি জীবিতা থাকেন। তিনি কুলবধূ। শ্রীভগবান শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার এই প্রিয়তমা তনয়াটিকে উপযুক্ত পাত্র পাইলে সম্প্রদান করেন। ইনি উপযুক্ত পাত্রকে বরণ করিয়া কুলবধূরূপে নিরন্তর তাঁহারই অন্তঃপুরে বাস করেন—চিরাবগুণ্ঠিতা হইয়াই বাস করেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গজন ব্যতীত যার-তার সমক্ষে অবগুণ্ঠনহীনা হইয়া বাহির হন না। শাস্ত্র কথিত চতুর্দ্দশ বিদ্যা * এই পরাবিদ্যার চিরসেবিকা। তাঁহারা নিরন্তর সর্ব্বজীবকে এই পরাবিদ্যার অধিকারী করিবার জন্য চারিদিকে ফিরিতেছেন এবং যখন যাহাকে উপযুক্ত দেখিতেছেন তাহাকে ধীরে অগ্রসর করিতেছেন। জীব নামের গুণে পরাকে পাইলেও নাম ছাড়েন না, কেন না নামই সেই পরার জীবন; এমন কি শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন "নির্ব্বিণ্ণ ও অকুতোভয়লাভেচ্ছু যোগীদিগের পক্ষেও একমাত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য।" +

যাঁহার অন্তরমধ্যে হরিভক্তিরূপ পরাবিদ্যা নিরন্তর বিরাজিতা তিনি সতত আনন্দাম্বুধিনীরে সুখে সন্তরণ করেন। সুতরাং—

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং"—এই শ্রীকৃষ্ণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধক। হরিনামামৃতবাদীর যোগে আনন্দ-সমুদ্র নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকেন—আর

* চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥

ছয় বেদাঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

ষড়ঙ্গ যথা—

"শিক্ষাকল্পৌ ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাংগণঃ।
ছন্দসাং বিচিতিশ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥"

+ "এতন্নির্বিদ্যমানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নীরাম্বুধিনীর বৰ্দ্ধিত হয়—পূর্ণিমায় সাগরের জলে যেমন জোয়ার আসে—শ্রীরামচন্দ্রোদয়েও তেমনি আনন্দ-সাগরে জোয়ার আসে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"একান্তিনো যস্য ন কিঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥"

নীরসমুদ্রে মগ্ন হইলে প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন, কিন্তু এই আনন্দাম্বুধিতে ডুবিলে আর প্রাণের ভয় থাকে না। লবণাম্বুজলমগ্ন সেই জল পান করিয়া, যদি কোন প্রকারে প্রাণ পান, কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। কিন্তু এ আনন্দাম্বুধির জল আকণ্ঠ পান করিলেও কোন কষ্ট নাই—প্রত্যুত অনন্ত আনন্দের সহিত অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায়। তাই বলিয়াছেন—

"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্"—শ্রীকৃষ্ণনামামৃত পানে, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হইয়া অমৃতত্ব লব্ধ হয়। "প্রতিপদং" শব্দে বুঝিতে হইবে প্রত্যেক অক্ষরে—"নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।" এই অমৃত সম্বন্ধেই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

এই অমৃতের ধারা সেই পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে নিঃসৃত হইতেছে (তাই পূর্ণমদঃ) আর এই যে নাম ইহাও নিত্যামৃতপূর্ণ (তাই পূর্ণমিদং) আর নাম হইতে প্রাণের যে অমৃতত্ব তাও পূর্ণ (তাই পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে) এখন এই পূর্ণামৃত নামধারা জগতময় ছড়াইতে থাকুন যাহার প্রয়োজন সে পূর্ণরূপেই গ্রহণ করুক, তথাপি আমার প্রাণগোবিন্দের নামামৃত যে পূর্ণ সেই পূর্ণই থাকিবে (তাই পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে)।

অনেকে হয় ত বলিবেন, ঐ মন্ত্রের ও রূপ অর্থ নয়। তাঁহাদের পক্ষে না হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রাণ উহার ঐ অর্থই অনুভব করে।

সেই পূর্ণামৃতাস্বাদনের ফল—

"সর্ব্বাত্ম-স্নপনং" এই সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বাত্ম-স্নপন হয়। এই সর্ব্বাত্ম শব্দটি পণ্ডিতগণ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্নপন শব্দের অর্থ স্নান—অভিষেক সুতরাং ধৌত করা বা আর্দ্র করা ও তৃপ্ত করা বলা যাইতে পারে। সোজা অর্থ—এ বিশ্বের জড়াজড় সকলের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয় এই হরিনামে। কেহ বলেন সর্ব্বশব্দের অর্থ শিব, তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হয় এই হরিনামে। কোনও সাধু শ্রীবৈষ্ণবমুখে শুনিয়াছি সর্ব্বাত্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।" (১০।১৪।৫৫)

ব্রহ্মাণ্ডে দেহধারী যত কিছু আছে এই শ্রীকৃষ্ণই সে সকলের আত্মস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তনামৃত ধারায় সেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাত্মের স্নপন হয়—তাঁহার প্রেমামৃত সিন্ধুউচ্ছলিত হইয়া বিশ্ববাসীর হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার করে—তাহারা যে তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হয় সে পক্ষে শাস্ত্রই প্রমাণ। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং" এ কথা কেনা জানে। আর নামামৃত ধারায় স্নান যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর তাহা তাঁহার শ্রীমুখের বাক্যেই প্রকাশিত আছে। তিনি শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

যেখানে ভক্তগণ তাঁহার গুণগান করেন সেখানে তিনি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া নিরন্তর নামামৃতধারায় স্নান করেন। এই স্নানেই তাঁ'র তৃপ্তি। তাঁ'র তৃপ্তিতেই জগত তৃপ্ত।

এমন সুধামাখা শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়ঘোষণাপূর্ব্বক শ্রীগৌরচন্দ্র সংক্ষেপে কলির জীবের সাধনপথ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই স্থলে, এই অকিঞ্চনের পিতামহকল্প শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দাদা মহাশয়ের শ্রীশিক্ষাষ্টক-সম্মোদনভাষ্য হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া এ শ্লোকাভাষবর্ণন শেষ করিব।

"মায়াশক্তিপ্রসূতপ্রপাঞ্চিকে বিশ্বে কথং কৃষ্ণকীর্ত্তনং বিজয়তে ?—শ্রূয়তাং। একমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুতেঃ পরমতত্ত্বস্যৈকত্বং। নেহনা নাস্তিকঞ্চন ইতি শ্রুতিবচনাত্তত্ত্বস্য নির্ব্বিশেষত্বং। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি নিগমবচনাত্তস্যৈব

সর্ব্বদা সবিশেষত্বং সিদ্ধং। যুগপৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষে সিদ্ধৌ সবিশেষস্য প্রতীতিরেব সুতরাং বলবতী নির্ব্বিশেষস্যোপলব্ধ্যভাবাৎ। অস্মত্তত্ত্বাচার্য্য শ্রীমজ্জীবচরণা বদন্তি। এবমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। অত্রেদমেবোক্তং ভবতি। ভগবানের পরমং তত্ত্বং। স এব শক্তিমন। শক্তিশক্তিমতোরভেদ ইতি ব্রহ্মসূত্রাৎ তযোরভেদঃ। কিন্তু পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়ত ইতি বেদবাক্যেন তয়াঽচিন্ত্য-শক্ত্যা দুর্ঘটঘটকত্বমপি সিধ্যতি। অতো নিত্যাভেদোঽপ্যনিবার্য্যঃ। স তু কেবলাদ্বৈতবাদ যুক্ত্যা ন নিবর্ত্তনীয়ঃ। সা পরাশক্তিরন্তরঙ্গা-তটস্থা-বহিরঙ্গাভেদেন ত্রিধাব ভাসতে। তত্রান্তরঙ্গা স্বরূপশক্ত্যা পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ তত্তত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণ-গুণাশ্রয়তয়া ভগবদ্রূপেণ নিত্যং বিরাজতে। তল্লীলাসম্পাদনার্থং তদানুকূল্যময্যা তয়া স্বরূপশক্ত্যা তত্তত্ত্বং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণাবতিষ্ঠতে। পুনস্তটস্থশক্ত্যা রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়চিদেকাত্মজীবরূপেণ তদেব বর্ত্ততে। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যায়া শক্ত্যা প্রতিচ্ছবি-গত-বর্ণশাবল্য-স্থানীয়-তদীয় বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্ম প্রধান রূপেণাপি তল্লক্ষ্যতে। এবম্প্রকারেণ জীব-জড়-বৈকুণ্ঠভগবৎস্বরূপাণামচিন্ত্য-ভেদাভেদৌ জ্ঞেয়ৌ। জীবস্যাপি তদেকদেশত্বং তদাশ্রয়াৎ। বহিশ্চরত্বং তজ্জ্ঞানাভাবাৎ ছায়য়া রশ্মিবৎ মায়য়াভিভাব্যত্বাচ্চ ব্যপদিশ্যতে। তচ্ছক্তিত্বঞ্চ তয়ৈব তদীয়লীলোপকরণত্বাৎ। তটস্থশক্তিস্বভাবাতস্য মায়াভিভাব্যত্বমপি সম্ভবতি। মায়াবশতাপন্নানাং তেষাং জীবানাং সংসার দুঃখং। স্বরূপশক্তি-সম্বন্ধাৎ মায়ান্তর্ধানে সংসারনাশঃ স্বস্বরূপাবস্থিতিশ্চ। মায়ামুগ্ধানাং জীবানাং পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশানুভবানন্তরং যদা সৎপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসো ভগবন্মাধুর্য্যে লোভো বা জায়তে তদা তেষাং স্বরূপশক্তেহ্লাদিনীসার বৃত্তিভূতায়াং ভক্তাবধিকারো ভবতি। জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপসৎসঙ্গ প্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণান্তরং যদা তৎকীর্ত্তনং ভবতি তদা মায়াদমন প্রক্রিয়ারূপজীবস্বরূপবিক্রম এব লক্ষ্যতে। প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তনবিজয়স্যৈষা প্রক্রিয়া।”

উদ্ধৃত অংশটুকু অতি সরল। তথাপি ইহার ভাবাস্বাদনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

এত দিন পর্য্যন্ত দিন বাড়িলেও, দিনের পরিমাণ রাত্রি অপেক্ষা বেশী হয় নাই। এই বিষুবদিনের পর ক্রমে রাত্রি অপেক্ষা দিন পরিমাণে অধিক হইতে থাকে। ক্রমে প্রায় ২৩ অংশ উত্তরে আসিবার পর দিনের চরম বৃদ্ধি হয়। তার পর আবার হ্রাস। এখন বল দেখি কোন্ কোন্ দিন, দিন রাত্রি সমান হয় আর কোন্ কোন্ দিনই বা দিন চরম বর্দ্ধিত আর চরমহ্রস্ব হয়?"

আমি। "আমি বেশ, ক'রে দেখেছি, ১০ই আশ্বিন আর ১০ই চৈত্র দিন রাত্রি সমান আছে। ১০ই আশ্বিন থেকে একটু ক'রে ক'মে ক্রমে ১০ই পৌষ দিন সব চেয়ে ছোটো হয়। তা'র পর ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত দিন বাড়ে বটে, কিন্তু রাত্রি ত্রিশ দণ্ডের বেশী থাকে। ১০ই চৈত্র থেকে রাত্রি ৩০ দণ্ডের চেয়ে কম্‌তে থাকে, দিন ত্রিশ দণ্ডের চেয়ে বড় হয়, এই রূপে বাড়্‌তে বাড়্‌তে ১০ই আষাঢ় দিনের চরম বৃদ্ধি হয়, তা'র পর আবার ক্ষয় হয়।

গুরুদেব। "এই সকল বিষয় বেশ ক'রে দেখ্‌লেই, সহজে সকল তত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, রাশিচক্র ও গ্রহনক্ষত্রগুলিকেও চিন্‌তে হ'বে, তা'হলে শীঘ্রই জ্যোতিষে উন্নতিলাভ কর্‌তে পার্‌বে। আচ্ছা, এটা লক্ষ্য ক'রেছ কি? ১০ই পৌষের পর দিন বাড়্‌তে থাক্‌লেও, কয়েকদিন প্রাতে সূর্য্যোদয় পূর্ব্বদিনের চেয়ে বিলম্বে হওয়ায় পূর্ব্বাহ্ণের পরিমাণ কমে এবং সূর্য্যাস্ত প্রত্যহ পূর্ব্বদিনের চেয়ে পরে হওয়াতে অপরাহ্ণের পরিমাণ বাড়্‌তে থাকে, শেষে মাঘমাসের প্রথমে সূর্য্যোদয় পূর্ব্বদিনাপেক্ষা পূর্ব্বে হওয়াতে পূর্ব্বাহ্ণের পরিমাণও ক্রমে বাড়্‌তে থাকে।" *

আমি। "হাঁ দেখেছি বটে। কিন্তু ওরূপ হয় কেন বুঝ্‌তে পারি নি।"

গুরুদেব। "এর পরে ক্রমে বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন দিনমান নির্ণয়ের উপায় বলি শোনো। সূর্য্যের উদয়াস্তই যে দিনমানের কারণ তা আর বিশেষ ক'রে বল্‌তে হ'বে না। সূর্য্য যে সম্বৎসর ধীরে ধীরে কখনও গগনের দক্ষিণ প্রান্তে আবার কখন উত্তর প্রান্তে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গমন করেন, তা'ত তুমি লক্ষ্য ক'রেছ। এই উত্তর ও দক্ষিণ গমন প্রসঙ্গে সূর্য্য প্রতিদিন বিষুবৎ হ'তে ভিন্ন ভিন্ন পরিমিত দূরে থাকেন, এই দূরত্বকে ক্রান্তি বলে। দৈনিক ক্রান্তি সকল গ্রহেরই আছে। ইংরাজীতে এই ক্রান্তির নাম ডেক্লিনেসন (Declination) চেম্বার্স কোম্পানীদ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত গণিত-সারণী-(Mathemetical tables)-তে এই ক্রান্তি ও অভীষ্ট দেশের অক্ষাংশের সাহায্যে গ্রহগণের উদয়াস্ত ও আকাশে স্থিতিকাল নির্ণয় করিবার জন্য একটি সারণী আছে, তাহার সাহায্যে অনায়াসে উদয়াস্তাদির স্ফুট-কাল নির্ণীত হ'তে পারে। তারপর কাল-সমীকরণাঙ্ক দ্বারা সহজেই মধ্যকাল নির্ণয় করা যায়।"

আমি। "স্ফুটকাল, মধ্যকাল কি?"

গুরুদেব। "সূর্য্যদেব যে সময়ে মধ্যগগনে আসেন, ঠিক সেই সময়ের নামই মধ্যাহ্ন

---

* ইংরাজী জ্যোতিষসম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত তত্ত্বই পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত খাতা হইতে গৃহীত।

হওয়া উচিত, কিন্তু যদি এই মধ্যাহ্নকে বারটা বলি, তবে ঘড়িদ্বারা নির্দ্দেশ করা সহজ নয়, কারণ সূর্য্যের উদয়-কাল নিয়ত এক নয়। সেই জন্য ঘড়িতে মধ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। ঘড়ির বারটার সময় সূর্য্য সকল দিন মধ্যাকাশে বা মধ্যাকাশ হ'তে সমান দূরে থাকেন না। কখন তাঁহার মধ্যাকাশের আগমনের পূর্ব্বে, কখনও বা পরে বারটা বাজে। এই উভয়বিধ মধ্যাহ্নের অন্তরকে কাল-সমীকরণাঙ্ক—ইংরাজীতে ইকোয়েসন অব টাইম (Equation of time) বলে। সূর্য্যের পূর্ব্বাকাশে আগমন ও পশ্চিমাকাশে অদর্শনের গণিতাগত সময়কে স্ফুটকাল বলে। সূর্য্য ঘড়ি (sun-dial) বা শঙ্কুদ্বারাও এই স্ফুটকালই নির্ণয় হ'য়ে থাকে। সেই অঙ্ককে ঐ কালসমীকরণাঙ্ক দ্বারা শুদ্ধ করিয়া মধ্যকাল বা ঘড়ির সময় পাওয়া যায়। এখন উদয়াস্ত কসি। এই চেম্বার্স টেবিলের ৪১৬ পৃষ্ঠায় সেমি-ডায়র্ণাল ও সেমি-নক্‌টারন্যাল আর্কের টেবিল দেখ। কলিকাতা অঞ্চলের অক্ষাংশ মোটামুটি সাড়ে বাইশ অংশ ধর্‌লাম। ১৩০০ সালের ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রেল। ১৮৯৩ সালের ইংরাজী পাঁজীখানায় দেখ সূর্য্যের ক্রান্তি প্রায় ৯° উত্তর। এখন দেখ এই টেবিলে ৯° নয় অংশের নীচে ২২° ও ২৩° অংশের সমসূত্রে ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট লেখা আছে : সুতরাং ২২ ও ২৩ অংশ অক্ষের মধ্যে যত দেশ সর্ব্বত্রই ঐ সওয়া ছয় ঘণ্টা হ'বে। এখন ঐ টেবিলের উপরে লেখা আছে দেখ অক্ষ ও ক্রান্তি উভয় উত্তর বা দক্ষিণ হ'লে ঐ অঙ্ক অস্তকাল, বিভিন্ন হ'লে উদয়কাল। এখানে আমাদের দেশের অক্ষ উত্তর, সূর্য্যের ক্রান্তিও উত্তর সুতরাং ঐ দিন স্ফুটকাল ছ'টা পনর মিনিটে সূর্য্যাস্ত হ'বে। আর ১২ ঘণ্টা থেকে ঐ ৬।১৫ বাদ দিলে পাওয়া গেল ৫।৪৫, অর্থাৎ ৫টা ৪৫ পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট

১২। ০
অস্তকাল ঘ ৬। ১৫ বাদদিয়া
পাইলাম ঘ ৫। ৪৫ উদয়কাল

অস্তকালের দ্বিগুণ ঘ ১২। ৩০ দিনমান
উদয়কালের দ্বিগুণ ঘ ১১। ৩০ রাত্রিমান

স্ফুটকালে সূর্য্যোদয় হয়। ঐ দিনের কালসমীকরণাঙ্ক পঁচিশ সেকেণ্ড উহার সাহায্যে মধ্যকাল নির্ণীত হ'তে পার্‌বে। অস্তঘণ্টাদির দ্বিগুণ দিনমান এবং উদয়কালের দ্বিগুণ রাত্রিমান। এখন ঐ টেবিলটা লক্ষ্য কল্লে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌বে শূন্য অংশ অক্ষ বা নিরক্ষ প্রদেশে সর্ব্বদাই দিবারাত্রি সমান, ১ অংশে সূর্য্যের ৭° ক্রান্তি পর্য্যন্তও তাই। তৎপরে সামান্য কমবেশী হয়।"

আমি। "টেবিলটা লিখে নিই।"

গুরুদেব। "একখানা বই (Chambers' Mathemetical table) কেনাই সুবিধা।"

আমি। "সে কথা ঠিক, সকল টেবিলেই ত দরকার ; কত লিখ্‌বো, কিন্তু আজিই ত আর বই কিনতে পারচি না। যা শেখালেন তা'র অভ্যাস না কল্লে ত ভাল বুঝ্‌তে পার্‌বো না।"

গুরুদেব। "সবটা লেখবার দরকার নেই। ১০ অংশ অন্তর কুড়ি পর্য্যন্ত লেখ তার পর ২১।২২ ইত্যাদি ক্রমে ৩০ পর্য্যন্ত লিখে ৪০।৫০ আর ৬০ অংশের লিখ্‌লেই হ'বে, কারণ আমাদের সচরাচর ২০ থেকে ৩০ পর্য্যন্ত অক্ষের মধ্যেই গণনা করতে হয়।"

দিবার্দ্ধ ও রাত্র্যর্দ্ধাঙ্ক সারণী।

অক্ষ ও ক্রান্তি উত্তর বা দক্ষিণ হইলে লব্ধ অঙ্ক অস্তকাল অন্যথা উদয়কাল।

অক্ষাংশ	১	১০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
ক্রান্তি	ঘ. মি	ঘ. মি	ঘ. মি	ঘ. মি	ঘ.মি	ঘ.মি	ঘ.মি	ঘ.মি
০	৬।০	৬।০	৬।০	৬।০	৬।০	৬।০	৬।০	৬।০
১	৬।০	৬।১	৬।১	৬।২	৬।২	৬।২	৬।২	৬।২
২	৬।০	৬।১	৬।৩	৬।৩	৬।৩	৬।৩	৬।৪	৬।৪
৩	৬।০	৬।২	৬।৪	৬।৫	৬।৫	৬।৫	৬।৫	৬।৬
৪	৬।০	৬।৩	৬।৬	৬।৬	৬।৬	৬।৭	৬।৭	৬।৭
৫	৬।০	৬।৪	৬।৭	৬।৮	৬।৮	৬।৯	৬।৯	৬।৯
৬	৬।০	৬।৪	৬।৯	৬।৯	৬।১০	৬।১০	৬।১১	৬।১১
৭	৬।০	৬।৫	৬।১০	৬।১১	৬।১১	৬।১২	৬।১৩	৬।১৩
৮	৬।১	৬।৬	৬।১২	৬।১২	৬।১৩	৬।১৪	৬।১৪	৬।১৫
৯	৬।১	৬।৬	৬।১৩	৬।১৪	৬।১৫	৬।১৫	৬।১৬	৬।১৭
১০	৬।১	৬।৭	৬।১৫	৬।১৬	৬।১৬	৬।১৭	৬।১৮	৬।১৯
১১	৬।১	৬।৮	৬।১৬	৬।১৭	৬।১৮	৬।১৯	৬।২০	৬।২১
১২	৬।১	৬।৯	৬।১৮	৬।১৯	৬।২০	৬।২১	৬।২২	৬।২৩
১৩	৬।১	৬।৯	৬।১৯	৬।২০	৬।২১	৬।২২	৬।২৪	৬।২৫
১৪	৬।১	৬।১০	৬।২১	৬।২২	৬।২৩	৬।২৪	৬।২৫	৬।২৭
১৫	৬।১	৬।১১	৬।২২	৬।২৪	৬।২৫	৬।২৬	৬।২৭	৬।২৯
১৬	৬।১	৬।১২	৬।২৪	৬।২৫	৬।২৭	৬।২৮	৬।২৯	৬।৩১
১৭	৬।১	৬।১২	৬।২৬	৬।২৭	৬।২৮	৬।৩০	৬।৩১	৬।৩৩
১৮	৬।১	৬।১৩	৬।২৭	৬।২৯	৬।৩০	৬।৩২	৬।৩৩	৬।৩৫
১৯	৬।১	৬।১৪	৬।২৯	৬।৩০	৬।৩২	৬।৩৪	৬।৩৫	৬।৩৭
২০	৬।১	৬।১৫	৬।৩০	৬।৩২	৬।৩৪	৬।৩৬	৬।৩৭	৬।৩৯
২১	৬।১	৬।১৬	৬।৩২	৬।৩৪	৬।৩৬	৬।৩৮	৬।৩৯	৬।৪১
২২	৬।১	৬।১৬	৬।৩৪	৬।৩৬	৬।৩৮	৬।৩৯	৬।৪১	৬।৪৩
২৩	৬।২	৬।১৭	৬।৩৬	৬।৩৮	৬।৪০	৬।৪২	৬।৪৭	৬।৪৬
২৩-২৮	৬।২	৬।১৮	৬।৩৬	৬।৩৮	৬।৪০	৬।৪২	৬।৪৫	৬।৪৭

আমি। "তাই কর্‌চি।" এই বলিয়া তাঁহার উপদেশমত খাতায় এই টেবিলটি লিখিলাম (দিবার্দ্ধ ও রাত্র্যর্দ্ধ সারিণী). তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম "এ ত লিখে নিলাম, কিন্তু এ সব অঙ্ক নির্ণীত হ'লো কি রূপে ?"

গুরুদেব। "সে সব কথা এখন থাক্। উপপত্তিগুলা এর পর বুঝিয়ে দিব। এখন টেবিলের সাহায্যেই কাজ করতে থাক। এই টেবিল দিয়ে যে শুধু সূর্য্যের উদয়াস্ত আর দিনমান নির্ণীত হ'তে পারে, তা নয়। যে কোনও গ্রহ চক্রবালের উপরে যতক্ষণ

দিবার্দ্ধ ও রাত্র্যর্দ্ধাঙ্ক সারণী।

অক্ষ ও ক্রান্তি উত্তর বা দক্ষিণ হইলে লব্ধ অঙ্ক অস্তকাল অন্যথা উদয়কাল।

অক্ষাংশ	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৪০	৫০	৬০
ক্রান্তি	ঘ,মি	ঘ,মি	ঘ.মি	ঘ,মি	ঘ,মি	ঘ,মি	ঘ,মি	ঘ,মি
০	৬ | ০	৬ | ০	৬ | ০	৬ | ০	৬ | ০	৬ | ০	৬ | ০	৬ | ০
১	৬ | ২	৬ | ২	৬ | ২	৬ | ২	৬ | ২	৬ | ৩	৬ | ৫	৬ | ৭
২	৬ | ৪	৬ | ৪	৬ | ৪	৬ | ৪	৬ | ৫	৬ | ৭	৬ | ১০	৬ | ১৪
৩	৬ | ৬	৬ | ৬	৬ | ৬	৬ | ৭	৬ | ৭	৬ | ১০	৬ | ১৪	৬ | ২১
৪	৬ | ৮	৬ | ৮	৬ | ৯	৬ | ৯	৬ | ৯	৬ | ১৩	৬ | ১৯	৬ | ২৮
৫	৬ | ১০	৬ | ১০	৬ | ১১	৬ | ১১	৬ | ১২	৬ | ১৭	৬ | ২৪	৬ | ৩৫
৬	৬ | ১২	৬ | ১২	৬ | ১৩	৬ | ১৩	৬ | ১৪	৬ | ২০	৬ | ২৯	৬ | ৪২
৭	৬ | ১৪	৬ | ১৪	৬ | ১৫	৬ | ১৬	৬ | ১৬	৬ | ২৪	৬ | ৩৪	৬ | ৪৯
৮	৬ | ১৬	৬ | ১৬	৬ | ১৭	৬ | ১৮	৬ | ১৯	৬ | ২৭	৬ | ৩৯	৬ | ৫৬
৯	৬ | ১৮	৬ | ১৯	৬ | ১৯	৬ | ২০	৬ | ২১	৬ | ৩১	৬ | ৪৪	৭ | ৪
১০	৬ | ২০	৬ | ২১	৬ | ২২	৬ | ২২	৬ | ২৩	৬ | ৩৪	৬ | ৪৯	৭ | ১১
১১	৬ | ২২	৬ | ২৩	৬ | ২৪	৬ | ২৫	৬ | ২৬	৬ | ৩৮	৬ | ৫৪	৭ | ১৯
১২	৬ | ২৪	৬ | ২৫	৬ | ২৬	৬ | ২৭	৬ | ২৮	৬ | ৪১	৬ | ৫৯	৭ | ২৬
১৩	৬ | ২৬	৬ | ২৭	৬ | ২৮	৬ | ২৯	৬ | ৩১	৬ | ৪৫	৭ | ৪	৭ | ৩৪
১৪	৬ | ২৮	৬ | ২৯	৬ | ৩০	৬ | ৩২	৬ | ৩৩	৬ | ৪৮	৭ | ৯	৪ | ৪২
১৫	৬ | ৩০	৬ | ৩১	৬ | ৩৩	৬ | ৩৪	৬ | ৩৬	৬ | ৫২	৭ | ১৪	৭ | ৫১
১৬	৬ | ৩২	৬ | ৩৪	৬ | ৩৫	৬ | ৩৭	৬ | ৩৮	৬ | ৫৬	৭ | ২০	৭ | ৫৯
১৭	৬ | ৩৪	৬ | ৩৬	৬ | ৩৭	৬ | ৩৯	৬ | ৪১	৬ | ৫৯	৭ | ২৫	৮ | ৮
১৮	৬ | ৩৬	৬ | ৩৮	৬ | ৪০	৬ | ৪২	৬ | ৪৩	৭ | ৩	৭ | ৩১	৮ | ১৭
১৯	৬ | ৩৯	৬ | ৪০	৬ | ৪২	৬ | ৪৪	৬ | ৪৬	৭ | ৭	৭ | ৩৭	৮ | ২৬
২০	৬ | ৪১	৬ | ৪৩	৬ | ৪৫	৬ | ৪৭	৬ | ৪৯	৭ | ১১	৭ | ৪৩	৮ | ৩৬
২১	৬ | ৪৩	৬ | ৪৫	৬ | ৪৭	৬ | ৪৯	৬ | ৫১	৭ | ১৫	৭ | ৪৯	৮ | ৪৭
২২	৬ | ৪৫	৬ | ৪৮	৬ | ৫০	৬ | ৫২	৬ | ৫৪	৭ | ১৯	৭ | ৫৫	৮ | ৫৮
২৩	৬ | ৪৮	৬ | ৫০	৬ | ৫২	৬ | ৫৪	৬ | ৫৭	৭ | ২৩	৮ | ২	৯ | ৯
২৩।২৮	৬ | ৪৯	৬ | ৫১	৬ | ৫৩	৬ | ৫৬	৬ | ৫৮	৭ | ২৫	৮ | ৫	৯ | ১৫

থাকেন তা'র অর্দ্ধেক পরিমাণ ইহার দ্বারা নির্ণীত হ'তে পারে। সর্ব্বত্রই এই উপায়ে স্ফুটকাল নির্ণয় ক'রে, সেই দিনের কাল-সমীকরণাঙ্ক সাহায্যে মধ্যকাল নির্ণয় কর্‌তে হ'বে।"

আমি। "কিন্তু সূর্য্য বা মঙ্গলাদি গ্রহের ক্রান্তি পা'ব কোথায় ?"

গুরুদেব। "প্রতি বৎসরের জন্য ইয়ুরোপে আমেরিকায় কয়েক প্রকার নৌপঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ঐ সমুদায়ের গণনা অতি সূক্ষ্ম, তা থেকে প্রয়োজনমত স্থূলতর অঙ্ক গ্রহণ করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল্‌চি। এই দেখ এক দিনের কতকগুলি অঙ্ক আমার খাতায় লেখা রয়েছে, এ থেকেই সব উদাহরণ করা যা'ক।"

গ্রীনীচ মধ্য-মধ্যাহ্নে—

সূর্য্যের স্ফুট সরলোত্থান—১৬ ঘণ্ট ৫১ মিনিট ৪১.১৮ সেকেণ্ড।
" " ক্রান্তি দঃ ২২ অংশ ৩১ কলা ৩১.৯ বিকলা।

কালসমীকরণাঙ্ক, মধ্যকালে যোজ্য ৮ মিনিট ৪৮.২৯ সেকেণ্ড।
নাক্ষত্র ঘণ্টাদি ১৭।০।৩৩.৫৬
সূর্য্যের স্ফুট ২৫৪ অংশ ১৬ কলা ৩০.৪ বিকলা।
সায়ন মেষারম্ভ বিন্দুর মধ্যাকাশে আগমন কাল ৬ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট ১৭.৭১ সেকেণ্ড।

চন্দ্রের স্ফুট ৯৩ অংশ ৫১ কলা ৫০.৪ বিকলা
" বিক্ষেপ উ ৪ " ৩৬ " ৩৩.৬ "
" ক্রান্তি উ ১৮ " ০ " ১১.৭ "

বুধের স্ফুট সরলোত্থান ১৮ ঘণ্টা ২২মিনিট ৫১.১৫ সেকেণ্ড।
" স্ফুট ক্রান্তি দ ২৯ অংশ ৪০ কলা ০.৫ বিকলা।
" সৌরকেন্দ্রিক স্ফুট ৩৪৯ অংশ ৪৯ কলা ১১.৫ বিকলা।
বিক্ষেপ দ ৫ " ৫৪ " ৪৭.৮ "

শুক্রের স্ফুট সরলোত্থান ১৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ১৬.৮২ সেকেণ্ড
ক্রান্তি দ ৮ অংশ ৩০ কলা ৩১ বিকলা
" সৌরকেন্দ্রিক স্ফুট ১২৪ " ৫৩ " ৩২.৭
" বিক্ষেপ উ ১ " ৩৩ " ৫৬.৪ "

আর বৃহস্পতি প্রভৃতির তোল্‌বার দরকার নাই। পঞ্জিকাতে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় অঙ্ক আছে। সেগুলি, এক দিন একখানা পঞ্জিকা এনে তোমায় দেখিয়ে দিব। আজ বুধ ও শুক্রের উদয়াস্ত দেখ—

আমাদের দেশের অক্ষাংশ উ. ২২।৩০
বুধের ক্রান্তি দ ২১।৪০
এই একুশ অংশ ৪০ কলাকে ২২ ধর্‌লাম।
এখন দেখ ২২ অক্ষাংশ ২২ ক্রান্তি ঘ ৬।৩৮
২৩ " ২২ " ঘ ৬.৩৯
∴ ২২।৩০ " ২২ " ঘ ৬.৩৮।৩০
এখানে অক্ষ উত্তর ও ক্রান্তি দক্ষিণ হওয়াতে ঐ ৬৩৮.৩০ ঘণ্টাদি পূর্ব্বাহ্ণ, উদয়কাল এবং ১২ হইতে উহা বাদ দিলে পাওয়া যায় ৫।২১.৩০ ঘণ্টাদি অপরাহ্ণ, অস্তকাল। ইহা অবশ্য স্ফুট-কাল! এইবার সূর্য্য ও শুক্রের তুমি কস।"

আমি কসিলাম—

∵ আমাদের দেশের অক্ষ ২২।৩০ উ
সূর্য্যের ক্রান্তি ২২।৩০ দ
এবং ∵ ২১ অক্ষ ২২ ক্রান্তি=ঘ ৬।৩৮
এবং ২৩ অক্ষ ২২ " =ঘ ৬।৩৯
∴ ২১।৩০" ২২ " =ঘ ৬।৩৮।৩০
এবং ∵ ২২ " ২৩ " =ঘ ৬৪০
এবং ২৩ " ২৩ " =ঘ ৬।৪২
∴ ২২।৩০" ২৩ " =ঘ ৬।৪১

∴ ২২।৩০ অক্ষ ২২ ক্রান্তি = ঘ ৬।৩৮।৩০
এবং ২২।৩০ „ ২৩ „ = ঘ ৬ ৪১

সমষ্টি = ঘ ১৩।১৯।৩০

১৩।১৯।৩০ ÷ ২ = ৬।৩৯।৪৫

∴ ২২।৩০ „ ২২।৩০ „ = ঘ ৬।৩৯।৪৫
ইহাই সূর্য্যের উদয়কাল; এবং এই অঙ্ক ১২ হইতে বাদ দিয়া ঘ ৫।২০।১৫ অস্ত কাল।

আমাদের অক্ষ ২২।৩০ উ

শুক্রের ক্রান্তি ৮।৩০। দ

∵ ২২ অক্ষ ৮ „ = ৬ ১৭
২৩ „ ৮ „ = ৬।১৪
এবং ২২ „ ৯ „ = ৬ ১২
২৩ „ ৯ „ = ৬ ১৫

সমষ্টি = ২৪।৫৭

চতুর্থাংশ = ৬।১৪।৩০

∵ ২২°।৩০ অক্ষে ৮°।৩০ ক্রান্তিতে ৬ ১৪।৩০ ঘণ্টাদি পূর্ব্বাহ্ণ ইহাই শুক্রের উদয় কাল।

ইহা ১২ হইতে অন্তর করিয়া ৫।৪৫।৩০ অপরাহ্ণ অস্তকাল। তা'হলে শুক্র ৬টা সাড়ে চৌদ্দ মিনিট থেকে ৫টা সাড়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত দেখা যাবে?'

শুরুদেব। "বাবা, তুমি যে, হঠাৎ এমন প্রশ্ন করবে তা আমি আশা করি নি। দেখ, সূর্য্য যদি ৬।৪০ পূর্ব্বাহ্ণ থেকে ৫টা ২০ মিনিট পর্য্যন্ত উদিত থাকেন, তা'হ'লে শুক্র ৬টা ১৫ মিনিট থেকে ৬।৪০ মিনিটের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্তই পূর্ব্বাকাশে দেখা যা'বার সম্ভাবনা; তারপর সূর্য্যরশ্মির দ্বারা শুক্রের অদর্শন অবশ্য ম্ভাবী। আর বুধের বেলা দেখ সূর্য্যোদয়ের সমকালেই বুধের উদয় সুতরাং বুধ দেখা যাবেন না। এখন এ দুই গ্রহের দর্শন ও অদর্শন কালের পরিমাণ অনায়াসে নির্ণয় কত্তে পার্ব্বে সন্দেহ নাই। কিন্তু কসবার আগে গ্রহের অঙ্কাদিতে দেশান্তর সংস্কার দিতে হয়। এইবারে উদয়াস্ত-নির্ণয়ের গোটাকত প্রশ্ন দিই এ কটিও কসে দেখো।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন-মালা।

১। যে দিন সূর্য্যের ক্রান্তি ২৩°দ সে দিন ২২°-৩০ কলা অক্ষস্থিত দেশে উদয়াস্ত কাল ও দিবারাত্রিপরিমাণস্ফুট কত?

২। উত্তর অক্ষাংশ ৪৫°। ১৫ কলায় যে দেশ অবস্থিত, তাহার ঐ দিন দিন-পরিমাণ কত?

৩। যে দিন সূর্য্যের ক্রান্তি উ ৭ অংশ ৪৫ কলা সেই দিন কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এলাহাবাদ ও লাহোরে সূর্য্যের স্ফুট উদয়-কাল নির্দ্দেশ কর।

৪। কোন গ্রহের ক্রান্তি উ অংশাদি ৩।৩৫ যে দেশের অক্ষাংশ ২০ সে দেশে সে দিন ঐ গ্রহ কোন সময় হইতে কোন সময় পর্য্যন্ত দেখা যাইবে?

---

১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রশ্নমালার উত্তর।

আমাদের একটি পাঠিকা প্রশ্ন কয়টির উত্তর দিয়াছেন। উত্তরগুলি যথা প্রকাশিত হইল। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন কোন মাস কোন তারিখে শেষ হইবে তাহা নির্ণয়ের উপায় কি? তাহার উত্তর শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে নিজে যাহা করিয়া ... তাহা ... নির্ণয় করিতে পারেন।

১ম উত্তর। ১৩০০ সাল = শকাব্দা ১৮১৫
১৮১৫ = ২ । ৩৮ । ৩৫ (১৬ পৃ)
জ্যৈষ্ঠের ক্ষেপ = ৪ । ৯ । ৫৫ (ঐ)
৬ । ৪৮ । ৩০

সুতরাং শুক্রবার ৪৮ দণ্ডের সময় জ্যৈষ্ঠ সংক্রমণ হইবে।

২য় উত্তর। ১৭৮০শক ২রা কার্ত্তিক।
১০০০ = ১২৫৮·৭৫৭
৭০০ = ৮৮১·১২৯
৮০ = ১০০·৭০১
৭ | ২২৪০·৫৮৭
৩২ — ০·৫৮৭
৬০
৩৫·২২০

অর্থাৎ ১৭৮০ = ০ । ৩৫
কার্ত্তিকের ক্ষেপ = ৬ । ৯
২রা কার্ত্তিক = ১
৭ | ৮ । ৪৪
১ । ৪৪

সুতরাং ২রা কার্ত্তিক রবিবার।

৩য় উত্তর। ১৩১৯ সাল = ১৮৩৪ শকাব্দা।
১৮১৫ = ২·৬৪৩
১০ = ১২·৫৮৮
৯ = ১১·৩২৯
৭ | ২৬·৫৬০
৩ — ৫·৫৬
৬০
৩৩·৬০
১৮৩৪ = ৫ । ৩৪

বৈশাখ ক্ষেপ ১।১৩ জ্যৈষ্ঠ ক্ষেপ ৪।১০
+ ৫।৩৪ + ৫।৩৪
৬।৪৭ ২।৪৫

৪৫ দণ্ডের বেশী বলিয়া, বোধ হয় বৈশাখ সংক্রমণ শুক্রবারে না হইয়া শনিবারে হইবে ও ১লা রবিবার হইবে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ সোমবারে সংক্রমণ ও ১লা মঙ্গলবার হইবে।

আষাঢ়ের ক্ষেপ ০ । ৩৬ শ্রাবণ-ক্ষেপ ৪।১৪
+ ৫ । ৩৪ + ৫।৩৪
৬ । ১০ ২।৪৮

আষাঢ়-সংক্রমণ শুক্রবার ও ১লা শনিবার এবং শ্রাবণ-সংক্রমণ সোমবার ৪৫ দণ্ডের পর বলিয়া মঙ্গলবার সংক্রান্তি ও বুধবার ১লা হইবে।

ভাদ্র-ক্ষেপ ০ । ৪৩ আশ্বিন-ক্ষেপ ৩ । ৪৩
+ ৫ । ৩৪ + ৫ । ৩৪
৬ । ১৭ ২ । ১৭

ভাদ্র-সংক্রমণ শুক্রবার, ১লা শনিবার। আশ্বিন-সংক্রমণ সোমবার ১লা মঙ্গলবার।

কার্ত্তিক-ক্ষেপ ৬ । ৯ অগ্রহায়ণ-ক্ষেপ ১ । ১
+ ৫ । ৩৪ + ৫ । ৩৪
৪ । ৪৩ ৬ । ৩৫

কার্ত্তিক-সংক্রমণ বুধবার ১লা বৃহস্পতিবার এবং অগ্রহায়ণ-সংক্রমণ শুক্রবার ১লা শনিবার;

পৌষ-ক্ষেপ ২ । ৩০ মাঘ ক্ষেপ ৩ । ৪৯
+ ৫ । ৩৭ + ৫ । ৩৪
———— ————
১ । ৪ ২ । ২৩

পৌষ-সংক্রমণ রবিবার, ১লা সোমবার। মাঘ-সংক্রমণ সোমবার, ১লা মঙ্গলবার।

ফাল্গুন ক্ষেপ ৫ । ১৬ চৈত্র-ক্ষেপ ০ । ৬
+ ৫ । ৩৪ + ৫ । ৩৪
———— ————
৩ । ৫০ ৫ । ৪০

ফাল্গুন-সংক্রমণ ৫০ দণ্ডে বলিয়া সংক্রান্তি মঙ্গলবারে না হইয়া বুধবারে ও ১লা বৃহস্পতিবারে এবং চৈত্রের সংক্রমণ বৃহস্পতিবারে ১লা শুক্রবারে।

———

দ্রষ্টব্য। সংক্রান্তির মীমাংসা এত স্থূল ভাবে হয় না। তিনি সাধারণতঃ উদয় হইতে ৪৫ দণ্ডে রাত্র্যর্দ্ধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু দিবারাত্রি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন ৩৩ । ৩০ দিন তখন, ২৬ । ৩০ + ১৬ । ৪৫ = ৪৩ । ১৫ সওয়া তেতাল্লিশ দণ্ডেই অর্দ্ধ রাত্র হইবে। সুতরাং দিনমান নির্ণয়পূর্ব্বক বিচার করা উচিত।

———

আমি। "উদয়াস্ত নির্ণয়ের পাশ্চাত্য সঙ্কেত শেখালেন, আমাদের দেশের উদয়াস্ত-নির্ণয়ের উপায় কি?"

গুরুদেব। "শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তের নিয়ম পরে বল্‌বো, আপাততঃ শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তসম্মত সিদ্ধান্তরহস্যের নিয়মটা বলি। এ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের সূত্র এই—

"খংখাগ্নী যুগশায়কৌ যুগরসৌ বেদেষবঃ খাগ্নয়ঃ
ছায়াঘ্নাঃ খনবোদ্ধৃতাঃ খদহনৈর্যুক্তা দ্যুমানানি ষট্।
স্পষ্টার্কোদয়নাংশযুক্তবিষুবচ্ছায়াক্রমাৎ ষষ্টিতঃ
চেৎ শুদ্ধান্যপরাণি ষট্ তদপরাণ্যত্রানুপাতাৎ পুনঃ॥"

অর্থাৎ খং = ০, খাগ্নী = ৩০, যুগশায়কৌ = ৫৪, যুগরসৌ = ৬৪, বেদেষবঃ = ৫৪ এবং খাগ্নয় ৩০ এই ছ'টি অঙ্ক যথাক্রমে বৈশাখাদি মাসের জন্য গ্রহণ কর। পরে বিষুবচ্ছায়া বা পলভ দ্বারা গুণ ক'রে ৯০ দিয়ে ভাগ দিলে যে ভাগফল লব্ধ হ'বে, তাতে ৩০দণ্ড যোগ কোল্লে যে অঙ্ক হ'বে, তাই ঐ কয় মাসের সংক্রমণ দিনের দিনমান দণ্ডাদি আর ঐ ছয়টি ৬০ হ'তে বাদ দিলে, কার্ত্তিকাদি ছয় মাসের সংক্রমণ দিনের দিনমান হ'বে। এখন উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিই। যে দেশের বিষুবচ্ছায়া বা পলভ ৫ অঙ্গুল সে দেশের জন্যে—

বিষুব দিনের ... ... ০ । ০
বৃষ সংক্রমে ৩০ × ৫ ÷ ৯০ = ১ । ৪
মিথুন সংক্রমে ৫৪ × ৫ ÷ ৯০ = ৩ । ০
কর্কট সংক্রমে ৬৪ × ৫ ÷ ৯০ = ৩ । ৩৩ ২
সিংহ সংক্রমে ৫৪ × ৫ ÷ ৯০ = ৩ । ০ । ০
কন্যা সংক্রমে ৩০ × ৯ ÷ ৯০ = ১ । ৪

∴ বিষুব-দিনে দিনমান ৩০ । ০
বৃষ সংক্রমে „ ৩১ । ৪
মিথুন „ „ ৩৩ । ০
কর্কট „ „ ৩৩ । ৩৩
সিংহ „ „ ৩৩ । ০
কন্যা „ „ ৩১ । ৪

এবং ষাইট হইতে বাদ দিয়া—

তুলা সংক্রমে দিনমান ৬০ — ৬০।০ = ৩০।০
বৃশ্চিক „ „ ৬০ — ৩১।৪ = ২৮।৫৬
ধনু „ „ ৬০ — ৩৩।০ = ২৭।০
মকর „ „ ৬০ — ৩৩।৩৩ = ২৬।২৭
কুম্ভ „ „ ... ... ২৭।০
মীন „ „ ... ... ২৮।৫৬

ইত্যাজ্ঞপ্তে ন তদ্রাষ্ট্রে কশ্চিদায়ুধধৃঙ্নরঃ।
তস্মতে পুরুষব্যাঘ্রং বভূবোরুপরাক্রমম্॥ ২৮॥

স এব গ্রামপালোঽভূৎ পশুপালঃ স এব চ।
ক্ষেত্রপালঃ স এবাসীদ্দ্বিজাতিনাঞ্চ রক্ষিতা॥ ২৯॥

তপস্বিনাং পালয়িতা সার্থপালশ্চ সোঽভবৎ।
দস্যুব্যালাগ্নিশস্ত্রারিভয়েষ্বব্ধৌ নিমজ্জতাম্॥ ৩০॥

অন্যাসু চৈব মগ্নানামাপৎসু পরবীরহা।
স এব সংস্মৃতঃ সদ্যঃ সমুদ্ধর্ত্তাভবেন্নৃণাম্॥ ৩১॥

অনষ্টদ্রব্যতা চাসীৎ তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে।
তেনেষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ॥ ৩২॥

তপশ্চ তপ্তং সুমহৎ সংগ্রামেবাতিচেষ্টিতম্।
তস্যর্দ্ধিমহিমানঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রাহাঙ্গিরা মুনিঃ॥ ৩৩॥

রাজার আদেশে আর সেই দেশে
অস্ত্রধর না রহিল,
রাজা একেশ্বর র'হে অস্ত্রধর
দস্যুভয় দূর হ'ল,
মহা পরাক্রম সেই ত রাজার
তাঁহার সোসর নাই,
নরমাঝে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ-ধনুর্দ্ধর
শ্রেষ্ঠ-পূজ্য সর্ব্ব ঠাঁই। ২৮॥
গ্রাম-পাল তিনি, পশুর পালক
ক্ষেত্রপাল নরপাল,
ব্রাহ্মণগণের রক্ষণের তরে
রত তিনি সর্ব্বকাল। ২৯॥
তপস্বী-পালক অর্থের রক্ষক
হইলেন নরেশ্বর,
দস্যু, সর্প, অগ্নি, অস্ত্র শস্ত্র হ'তে
রক্ষি' সবে নিরন্তর।

সাগর-সলিলে পতিত জনেরে
করে সদা পরিত্রাণ,
স্মরিলে রাজারে দূরে যায় ভয়
বিপদেতে পায় প্রাণ। ৩০-৩১॥
রাজার শাসনে কোনো দ্রব্য কারো
কভু নষ্ট নাহি হয়,
সদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন বহু,
তুষিতে দেবতাচয়। ৩২॥
সদা তপোশীল সেই নরেশ্বর
রণে সদা ধনুর্দ্ধর,
সর্ব্ব-গুণে রাজা সদা বিভূষিত
না দেখি তাঁ'র সোসর।
তাঁহার সমৃদ্ধি সম্মান দেখিয়া
গুরু, অঙ্গিরা-নন্দন,
উচ্চ কণ্ঠে তাঁ'র, যশঃ বিঘোষিয়া
বলিলা হেন বচন— ৩৩॥

বৃহস্পতিরুবাচ ।

ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্বা সংগ্রামেচাতিচেষ্টিতৈঃ ॥ ৩৪ ॥

পুত্র উবাচ ।

দত্তাত্রেয়াদ্দিনে যস্মিন্ স প্রাপর্দ্ধিং নরেশ্বরঃ ।
তস্মিংস্তস্মিন্ দিনে যাগং দত্তাত্রেয়স্য সোঽকরোৎ ॥ ৩৫ ॥
তথৈব চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তস্মিন্নহনি ভূপতেঃ ।
তস্যর্দ্ধিং পরমাং দৃষ্ট্বা যাগং চক্রুঃ সমাধিনা ॥ ৩৬ ॥
ইত্যেতৎ তস্য মাহাত্ম্যং দত্তাত্রেয়স্য ধীমতঃ ।
বিষ্ণোশ্চরাচরগুরোরনন্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু কথ্যন্তে শার্ঙ্গধন্বনঃ ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
এতস্য পরমং রূপং যশ্চিন্তয়তি মানব ।
স সুখী স চ সংসারাৎ সমুত্তীর্ণোঽচিরাদ্ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
সদৈব বৈষ্ণবানাঞ্চ ভক্ত্যাহং সুলভোঽস্মি ভোঃ ।
পত্রে পুষ্পফলেনাহং পূজিতো মোক্ষদোঽস্মি বৈ ॥ ৪০ ॥

"হেন রাজা আর
না হ'বে কখন,
যজ্ঞদান তপস্যায় ।
নাহিক সোসর,
না হবে কখন
কেহ আর এ ধরায় ।" ৩৪ ॥
যেই দিন নরেশ্বর দত্তাত্রেয়-পাশ
পাইয়া অতুল ঋদ্ধি, হৈলা পূর্ণ-আশ,
সেই দিন স্মরি' প্রতি বর্ষে নররায়
করে দত্তাত্রেয়-যাগ, কহিনু তোমায় ।
হেরিয়া রাজার ঋদ্ধি যত প্রজাগণ,
করে সেই মহাযাগ সদা হৃষ্ট-মন । ৩৬ ॥

দত্তাত্রেয়রূপী বিষ্ণু জগৎ ঈশ্বর,
চরাচর-গুরু যে অনন্ত শক্তিধর,
এই তাঁ'র মাহাত্ম্য করিনু সংকীর্ত্তন,
তাঁ'র গুণ বর্ণে, শক্তি ধরে কোন জন ? ৩৭
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধারী নারায়ণ,
অপ্রমেয় অনন্তের উদ্ভব-কীর্ত্তন,
অষ্টাদশ পুরাণে বর্ণিত বহুবার
সে সকল কথা বলিবার শক্তি কা'র ? ৩৮ ॥
তাঁ'র সে পরম রূপ যে করে চিন্তন,
সংসার-বন্ধনে মুক্ত হয় সেই জন । ৩৯ ॥
সতত বলেন যিনি—"শুন সর্ব্বজন,
বৈষ্ণবের ভক্তিতে সুলভ দরশন,

ইত্যেবং যস্য বৈ বাচস্তং কথং নাশ্রয়েজ্জনঃ ॥ ৪১ ॥
অধর্ম্মস্য বিনাশায় ধর্ম্মাচারার্থমেব চ।
অনাদিনিধনো দেবঃ করোতি স্থিতিপালনম্ ॥ ৪২ ॥
তথৈব জন্ম চাখ্যাতমলর্কং কথয়ামি তে।
যথা চ যোগঃ কথিতো দত্তাত্রেয়েণ তস্য বৈ।
পিতৃভক্তস্য রাজর্ষেরলর্কস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়মাহাত্ম্যং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পত্র পুষ্প ফল আদি করি' আহরণ,
ভক্তিভরে পূজে যদি আমার চরণ,
আমারে ভক্তির বলে পারে পাইবারে,
এই তত্ত্ব দৃঢ় করি' কহিনু সবারে।"
সেই পরাৎপর-পদে কেন নরগণ
প্রপন্ন হইয়া নাহি দেয় প্রাণ-মন। ৪০
অনাদি-নিধন দেব সদা এ সংসারে
করেন পালন-স্থিতি ধর্ম্ম-রক্ষা তরে,
অধর্ম্মের করি নাশ সদা নারায়ণ
করি'ছেন এই ভবে ধর্ম্মের স্থাপন। ৪১।
এই ত বলিনু সব, শুন এইবার,
কহিব জনম-কথা অলর্ক রাজার। ৪২ ॥
যে অলর্ক রাজর্ষিরে দত্তাত্রেয় ধীর
যোগতত্ত্ব শুনাইয়া করিলেন স্থির।
পিতৃভক্ত রাজ-ঋষি অলর্ক চরিত
করিব বর্ণন শুন হ'য়ে সমাহিত ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে দত্তাত্রেয়-মাহাত্ম্য নামক একবিংশ অধ্যায়।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজপুত্র উবাচ।

প্রাগ্বভূব মহাবীর্য্যঃ শত্রুজিন্নাম পার্থিবঃ।
তুতোষ যস্য যজ্ঞেষু সোমাবাপ্ত্যা পুরন্দরঃ॥ ১॥
তস্যাত্মজো মহাবীর্য্যো বভূবারিবিদারণঃ।
বুদ্ধিবিক্রমলাবণ্যৈর্গুরুশক্রাশ্বিভিঃ সমঃ॥ ২॥
স সমানবয়োবুদ্ধিসত্ত্ববিক্রমচেষ্টিতৈঃ।
নৃপপুত্রো নৃপসুতৈর্নিত্যমাস্তে সমাবৃতঃ॥ ৩॥
কদাচিচ্ছাস্ত্রসদ্ভাববিবেককৃতনিশ্চয়ঃ।
কদাচিৎ কাব্যসংলাপগীতনাটকসম্ভবৈঃ॥ ৪॥
তথৈবাক্ষবিনোদৈশ্চ শাস্ত্রাস্ত্রবিনোদেষু চ।
যোগ্যা নিযুদ্ধনাগাশ্বস্যন্দনাভ্যাসতৎপরঃ॥ ৫॥

দ্বিজ-পুত্র বলে, "পিতা, করহ শ্রবণ,
শত্রুজিৎ নামে রাজা ছিলা এক জন।
মহাবলবান সেই মহাধনুর্দ্ধর;
ধর্ম্মপরায়ণ সদা যজ্ঞেতে তৎপর।
তাঁ'র যজ্ঞে সোম পান করি' নিরন্তর,
পুরন্দর ছিলা তুষ্ট তাঁহার উপর। ১।
কালেতে জন্মিল পুত্র সেই ত রাজার
অশ্বিনীকুমার জিনি' লাবণ্য তাহার।
ক্রমে রাজপুত্র হৈলা মহাবলবান,
বিক্রমে ইন্দ্রের সম হৈলা মতিমান,
বুদ্ধিতে কুমার হৈল যেন বৃহস্পতি।
শত্রুগণ হেরি' তাঁ'রে শঙ্কান্বিত অতি। ২।
বহু রাজপুত্র সঙ্গী হইল তাঁহার,
সমান বয়স-বুদ্ধি-বিক্রম সবার,
সমান সাত্ত্বিক সবে এক কার্য্যে রতি,
এক জনো তা'র মাঝে নহে দুষ্টমতি।
সে সবার সনে সেই রাজার কুমার,
নিরন্তর রাজ্যমাঝে করেন বিহার। ৩।
কভু বা শাস্ত্রের তত্ত্ব করিয়া বিচার
বিবেক উদয়ে মন স্থির সবাকার;
কভু কাব্য-আলাপনে রত সর্ব্বজন,
কভু বা সঙ্গীতে মগ্ন সবাকার মন;
নাট্য-অভিনয় কভু দর্শন করিয়া,
কাটান সময় সবে আনন্দিত হিয়া; ৪।
কভু অক্ষক্রীড়ায় ব্যাপৃত সর্ব্বজন
কভু শাস্ত্র-অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষা-রত মন;
কভু বা বিনীতভাবে যোগ্য জন সঙ্গে
মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন সদা রঙ্গে;

রেমে নরেন্দ্রপুত্রোঽসৌ নরেন্দ্রতনয়ৈঃ সহ।
যথৈব হি দিবা তদ্বদ্রাত্রাবপি মুদাযুতঃ॥ ৬॥

তেষান্তু ক্রীড়তাং তত্র দ্বিজভূপবিশাং সুতাঃ।
সমানবয়সঃ প্রীত্যা রন্তুমায়ান্ত্যনেকশঃ॥ ৭॥

কস্যচিত্ত্বথকালস্য নাগলোকাৎ মহীতলম্।
কুমারাবাগতৌ নাগৌ পুত্রাবশ্বতরস্য তু॥ ৮॥

ব্রহ্মরূপপ্রতিচ্ছন্নৌ তরুণৌ প্রিয়দর্শনৌ।
তৌ তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্দ্ধং তথৈবান্যৈর্দ্বিজাত্মজৈঃ॥ ৯

বিনোদৈর্বিবিধৈস্তত্র তস্থতু প্রীতিসংযুতৌ।
সর্ব্বে চ তে নৃপসুতাস্তে চ ব্রহ্মবিশাং সুতাঃ॥ ১০॥

নাগরাজাত্মজৌ তৌ চ স্নানসংবাহনাদিকম্।
বস্ত্রগন্ধান্ন-সংযুক্তাং চক্রুর্ভোগভুজিক্রিয়াম্॥ ১১॥

অহন্যহন্যনুপ্রাপ্তে তৌ চ নাগকুমারকৌ।
আজগ্মতুর্মুদাযুক্তৌ প্রীত্যা সূনোর্মহীপতেঃ॥ ১২॥

কভু হস্তী, কভু অশ্ব, করি আরোহণ,
চালন বিষয়ে পটু হন সর্ব্বজন।
রথের চালনা কভু করেন অভ্যাস,
এই রূপ সুখেতে কাটয়ে দিন—মাস। ৫।
হেনমতে রাজপুত্র সদা নানা রঙ্গে
আছিলা আনন্দে রাজপুত্রগণ সঙ্গে
দিবানিশি ছিলা নানা ক্রীড়ায় তৎপর,
না ছিল হৃদয়ে ভেদ-বুদ্ধি-আত্ম-পর। ৬।
সমান-বয়সী বিপ্র-ক্ষত্র-বৈশ্য-সুত,
আসিয়া মিলিত বহু, সবে হর্ষযুত; ৭॥
এইরূপ আমোদে কাটায় সবে কাল,
কোন চিন্তা নাই হৃদে—নাহিক জঞ্জাল;
এক দিন, অশ্বতর-নাগের নন্দন,
আসিলেন সেই স্থানে ভাই দুই জন,
নাগলোক ছাড়ি' দোঁহে সখ্যলাভ-আশে
আসিলেন মর্ত্ত্যলোকে রাজপুত্রপাশে। ৮।
ব্রাহ্মণকুমার-বেশ করিয়া ধারণ,
ঋতধ্বজ-পাশে আসে ভাই দুই জন।
বয়সে তরুণ দোঁহে প্রিয়-দরশন
আসিয়া মোহিল দোঁহে সবাকার মন।
কুমারগণের সঙ্গে হৈল পরিচয়,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যে তুল্যভাব হয়।৯ ১০।
নাগরাজপুত্র দোঁহে সবাকার সনে;
স্নান-সম্বাহন-আদি করে ফুল্লমনে:
বস্ত্র-গন্ধ-মাল্য আদি করেন ধারণ,
এক সঙ্গে বসি সবে করেন ভোজন। ১১।
দিনে দিনে নাগরাজপুত্র দুই জন,
রাজকুমারের মন কৈলা আকর্ষণ।

স চ তাভ্যাং নৃপসুতঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্।
বিনোদৈর্বিবিধৈর্হাস্য-সংলাপাদিভিরেব চ ॥ ১৩ ॥

বিনা তাভ্যাং ন বুভুজে ন সস্নৌ ন পপৌ মধু।
ন ররাম ন জগ্রাহ শাস্ত্রাণ্যাত্মগুণর্দ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥

রসাতলে চ তৌ রাত্রিং বিনা তেন মহাত্মনা।
নিঃশ্বাসপরমৌ নীত্বা জগ্মতুস্তং দিনে দিনে ॥ ১৫ ॥

অথ কালেন মহতা পিতা পুত্রাবপৃচ্ছত।
মর্ত্তলোকে পরা প্রীতির্ভবতো কেন পুত্রকৌ ॥ ১৬

দৃষ্টৌ ন চাপি পাতালে বহূনি দিবসানি মে।
দিবা রজন্যামেবোভৌ পশ্যামি প্রিয়দর্শনৌ ॥ ১৭ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

ইতি পিত্রা স্বয়ং পৃষ্ঠৌ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলী।
প্রত্যূচতু র্মহাভাগাবুরগাধিপতেঃ সুতৌ ॥ ১৮ ॥

রাজকুমারের প্রীতিযুক্ত ব্যবহারে
নিত্য আসে দুই জনে সেই ত আগারে। ১২।
তাঁহাদের ব্যবহারে—হাস্য-আলাপনে
ক্রমেতে জন্মিল প্রীতি রাজপুত্র-মনে। ১৩।
ক্রমে প্রীতি গাঢ়তর হইল এমন
না পারে সহিতে তাঁহাদের অদর্শন।
আহার-বিহার, স্নান, মধুপানে আর,
সে দোঁহে না পেলে তৃপ্তি হয় না তাঁহার।
আত্মজ্ঞানবৃদ্ধি তরে শাস্ত্র-আলাপন,
না হেরিলে, তাহাতেও নাহি যায় মন। ১৪।
তাঁ'রাও দু'জনে, যবে রজনি-সময়
যান রসাতলবাসে, মনস্থির নয়,
যতক্ষণ সেথানে থাকেন দুই জন,
দীর্ঘশ্বাস হাহুতাস করে সর্ব্বক্ষণ।

হইলে প্রভাত দোঁহে ত্বরিত-গমনে,
আসি' মর্ত্তে মিলিতেন রাজপুত্র সনে। ১৫।
কিছু দিন এইরূপে গত হ'য়ে যায়,
এক দিন নাগরাজ, জিজ্ঞাসে দোঁহায়।
মর্ত্ত্যলোকে কা'র প্রতি প্রীতির উদয়
হইয়াছে তোমাদের বল এ সময়। ১৬।
দিবাভাগে তোমাদের দেখিতে না পাই,
প্রয়োজন হ'লে খুঁজিয়াছি সব ঠাঁই,
বহুদিন লক্ষ্য করি' বুঝেছি এখন
রজনী-সময়ে পুরে কর আগমন। ১৭।
দ্বিজপুত্র বলে "পিতা, করহ শ্রবণ,
পিতার মুখেতে শুনি এ হেন বচন
প্রণাম করিয়া দোঁহে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে
বলে নাগরাজে তাঁ'র পদধূলি ল'য়ে। ১৮।

নাগপুত্রাবূচতুঃ ।

পুত্রঃ শত্রুজিতস্তাত নাম্না খ্যাত ঋতধ্বজঃ ।
রূপবানার্জ্জবোপেতঃ শূরো মানী প্রিয়ংবদঃ ॥ ১৯ ॥

অনাবৃতকথো বাগ্মী বিদ্বান্ মৈত্রো গুণাকরঃ ।
মান্যমানয়িতা ধীমান্ হ্রীমান্ বিনয়ভূষণঃ ॥ ২০ ॥

তস্যোপচার-সম্প্রীতি-সম্ভোগাপহৃতং মনঃ ।
নাগলোকেঽন্যলোকে বা ন রতিং বিন্দতে পিতঃ ॥ ২১ ॥

তদ্বিয়োগেন নস্তাত নিশা পাতালশীতলা ।
পরিতাপায় তৎসঙ্গশ্চাহ্লাদায় রবির্দিবা ॥ ২২ ॥

নাগরাজোবাচ ।

পুত্র পুণ্যবতো ধন্যঃ স যস্যৈবং ভবদ্বিধৈঃ ।
পরোক্ষস্যাপি গুণিভিঃ ক্রিয়তে গুণকীর্ত্তনম্ ॥ ২৩ ॥

সন্তি শাস্ত্রবিদোঽশীলাঃ সন্তি মূর্খাঃ সুশীলিনঃ ।
শাস্ত্রশীলসমং মন্যে পুত্রৌ ধন্যতরস্তু তম্ ॥ ২৪ ॥

"শত্রুজিৎ নামে রাজা, বিদিত ভুবন,
তাঁ'র পুত্র ঋতধ্বজ, সদা ফুল্লমন,
সারল্যের প্রতিমা সে অতি রূপবান,
মহাবলী, মিষ্টভাষী, সুবাগ্মী, বিদ্বান,
ধীমান, হ্রীমান অতি, বিনয়ভূষণ,
তাঁ'র প্রতি প্রীতিমান আমাদের মন। ১৯ ২০।
নানা উপচারে সদা তোষেন সবায়
তাঁ'রে ছাড়ি থাকিবারে প্রাণ নাহি চায়।
ভূলোকে দ্যুলোকে কিম্বা নাগলোকে আর
কোথাও না হয় প্রীতি আমা দোঁহাকার। ২১।
পাতাল শীতল এত, হেথা নিশাকালে
তাঁহার বিরহ যেন হৃদে অগ্নি জ্বালে।
দিবার উত্তাপে মোরা থাকি তাঁ'র পাশে
আনন্দে কাটাই কাল ; হৃদিতাপ নাশে। ২২।
নাগরাজ বলে "বৎস, ধন্য সেই জন,
সুনিশ্চয় পুণ্যবান রাজার নন্দন,
তোমরা দু'জনে জানি গুণগ্রাহী অতি,
সামান্যেতে ভুলে নাই তোমাদের মতি ;
পরোক্ষে করিলে এত গুণানুকীর্ত্তন,
নিশ্চয় বুঝিনু মনে ধন্য সেই জন। ২৩।
শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানী হেন আছে বহু জন,
দুঃশীলতা দোষে যেন সর্পের মতন।
বহু মূর্খ আছে হেন, এই ত ভুবনে,
সুশীলতা গুণে তুষ্ট করে সর্ব্বজনে।

যস্য মিত্রগুণান্ মিত্রাণ্যমিত্রাশ্চ পরাক্রমম্।
কথয়ন্তি সদা সৎস্থ পুত্রবাংস্তেন বৈ পিতা ॥ ২৫ ॥

তস্যোপকারিণঃ কচ্চিদ্ভবদ্ভ্যামভিবাঞ্ছিতম্।
কিঞ্চিন্নিষ্পাদিতং বৎসৌ পরিতোষায় চেতসঃ ॥ ২৬

স ধন্যো জীবিতং তস্য তস্য জন্ম সুজন্মনঃ।
যস্যার্থিনো ন বিমুখা মিত্রার্থো ন চ দুর্ব্বলঃ ॥ ২৭ ॥

মদ্গৃহে যৎ সুবর্ণাদি রত্নং বাহনমাসনম্।
যদ্বান্যৎ প্রীতয়ে তস্য তদ্দেয়মবিশঙ্কয়া ॥ ২৮ ॥

ধিক্ তস্য জীবিতং পুংসো মিত্রাণামুপকারিণাম।
প্রতিরূপমকুর্ব্বন্ যো জীবামিত্যবগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

উপকারং সুহৃদ্বর্গেষ্বপকারঞ্চ শত্রুষু।
নৃমেঘো বর্ষতি প্রাজ্ঞা তস্যেচ্ছন্তি সদোন্নতি ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ সুশীল জন ধন্য সুনিশ্চয়,
সেইরূপ ধন্য-নব, সে রাজতনয়। ২৪।
মিত্রমুখে মিত্রতা-গুণের তত্ত্ব পাই
শত্রুমুখে পরাক্রম শুনি সর্ব্ব ঠাঁই;
হেন পুত্র লাভ হয় ভাগ্যেতে যাঁহার,
সেই সত্য পুত্রবান সন্দেহ কি তা'র? ২৫।
সেই রাজপুত্র-সখা তোমা দোঁহাকার,
ক'রেছ কি কোন দিন কোন কার্য্য তাঁ'র?
তাঁ'র মনস্তুষ্টি তরে, কর্ত্তব্য নিশ্চয়
হেন কোন কাজ, যাহে তাঁ'র তৃপ্তি হয়।
কোন অভিলাষ তাঁ'র আছে কি অন্তরে?
থাকিলে, বলহ তাহা আমার গোচরে। ২৬।
যাঁ'র কাছে অর্থী কভু প্রত্যাখ্যাত নয়,
মিত্রতার প্রয়োজন খর্ব্ব নাহি হয়,

সেই ধন্য ধন্য, তা'র জীবন-ধারণ—
তা'রি জন্ম জন্ম বলি' করি যে গণন। ২৭।
সুবর্ণ, রত্নাদি, আর বাহন, আসন,
আমার গৃহেতে, বৎস, আছে অগণন,
যাহা কিছু উপায়ন দিতে মন চায়
ল'য়ে গিয়ে দাও তাঁ'রে চিন্তা নাহি তা'য়। ২৮।
উপকারী মিত্রের না করে উপকার
যেই জন, ব্যর্থ জেনো জীবন তাহার। ২৯।
যে পুরুষ, মেঘ সম করয়ে বর্ষণ
মিত্রজনে উপকার, মনের মতন,
শত্রুজনে অপকার ধারার সমান,
দেবগণ তার প্রতি সদা তুষ্ট-প্রাণ।
প্রাজ্ঞজনে সদা তা'র উন্নতির তরে
করেন যতন সদা প্রফুল্ল-অন্তরে। ৩০।

পুরীধামে ইন্দ্রদমন সরোবর ।

প্রেমময়।

(শ্রীহীন পাগল-লিখিত)

(১০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুহা।

সেই ভাগ্যবান পুরুষ, শ্রীগুরুদেব ও কৃপা-দেবীর চরণধূলির সহিত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন. সেই গুহার উপরে তেজোময় বর্ণমালায় লিখিত আছে—

"দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ
প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা
গুহা সেয়ং পরম্পরা॥"

এই অক্ষর কয়টি দর্শন করিয়া. তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"আমি এ কোথায় আসিয়াছি?—আমি নিদ্রিত না জাগ্রৎ?—একি স্বপ্ন না সত্য?—সত্যই কি আমি কোন সময় এই অনবদ্যা চার্ব্বঙ্গীর পাণিগ্রহণ ক'রেছিলাম? সে কবে?—শুন্‌লেম, আমি তখন এই দেশে ছিলাম—হ'তে পারে। বাল্যকালের কথা আমি ভুলে গিছি। আমার পত্নী নিরন্তর আমারই কথা চিন্তা ক'ত্তেন, তাই তাঁ'র সে সব কথা স্মরণ আছে। সত্যই কি প্রবৃত্তি দুঃশীলা? সত্যই কি সে আমার প্রিয়সঙ্গিগণের উপপত্নী? তবুও ত তা'দের জন্য মন কেমন ক'চ্চে।—আমার এই সুশীলা পত্নীটি নিতান্ত পতিপরায়ণা। দেখ, কত শিশুবয়সে আমাদের বিবাহ হ'য়েছিল; সে কথা যখন আমারই বিন্দুমাত্রও স্মরণ নাই, তখন বোধ হয়, আমার এই পত্নীরও সে সময় জ্ঞানের সঞ্চার হয় নাই। কে জানে কয়দিন আমরা একত্রে ছিলাম—কৈ? আমার ত কিছুই মনে হয় না—মনে ক'ত্তে এত চেষ্টা ক'চ্চি তবুও ত মনে হ'চ্চে না। গুরুদেব ব'ল্লেন আমার জনক জননী আজিও জীবিত আছেন। কোথায়? কোন দেশে? কোনও দিন কি আবার তাঁ'দের চরণ দর্শন ক'ত্তে পা'ব? ভগবান জানেন। শুন্‌লাম আমার আরও পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী আছেন—তাঁ'র গর্ভজ সন্তানাদি আছে! এইটি আরও আশ্চর্য্য কথা। যে বয়সের কথা কিছুই স্মরণ হ'চ্চে না, সে বয়সে বিবাহিত হ'লেও সন্তান!—অসম্ভব!—ছিছি! আমি একি ভাব্‌চি? শ্রীগুরুবাক্য মিথ্যা নয়—নিশ্চয়—"

এমন সময়ে সুকৃতিদেবী বলিলেন "দেখ দেখ, নাথ! তোমার আর একটি কন্যা!"

পুরুষটি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বড় সুন্দরী বালিকা।

"ক্ষণে ক্ষণে "সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥"

জিজ্ঞাসিলেন—"কা'র কন্যা ?"

সুকৃতি।—"তোমার আর আমার। আশ্চর্য্য হ'য়ো না। এ দেশের ব্যাপার বড় অদ্ভুত। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এটির জন্ম হ'য়েছে। এ দেশে মানসপুত্র কন্যাই উৎপন্ন হয়। তোমায় আমায় বিবাহিত হ'বার পর, বহুদিন পূর্ব্বে আমার একটি পুত্র উদয় হ'য়েছিল। সে'টিকে আমি তোমার রক্ষার জন্য সে দেশে তোমার সঙ্গে দিয়েছিলাম। তুমি মনে ক'চ্চো, আমাদের যখন বিবাহ হ'য়েছিল, তখন আমরা শিশু ছিলাম, কিন্তু তা নয়। তখনও আমরা যুবক-যুবতী ছিলাম। তবে তোমার বর্ত্তমান পরিচ্ছদ ছিল না। জান ত নাথ, জড় দেহটা পরিচ্ছদমাত্র। জীর্ণ হ'লে ফেলে দিতে হয়। যত দিন জীর্ণ না হয়, একেবারে পরিত্যাগ কর্‌বার প্রয়োজন হয়না; কিন্তু তখনও প্রয়োজনমত, সময়ে সময়ে ছেড়ে রাখা যে না চলে, এমন নয়। তার প্রমাণ প্রভাতেই দেখ্‌তে পা'বে। আমাদের সেই পুত্রটি তোমায় কোনরূপে এ রাজ্যে এনেছে। সে এখন দাদার কাছে আছে, যখন আমরা সেখানে যা'ব, তোমার সঙ্গে তা'র দেখা হ'বে। এবারে এখানে আস্‌বার পর, এই কন্যাটি জন্মেছে। যখন তুমি প্রথমে আমার কথায় নাম ক'ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে, সেই সময়েই সে মানসগর্ভে আকৃতিমতী হ'লো—আর যেই অশেষ সন্দেহের স্থল দেখেও, তুমি পিতৃদেবের কথা অসত্য হ'তে পারে না মনে ক'রেছ, তখন এটি মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তোমার সমক্ষে দাঁড়িয়েছে। মানস-পুত্রকন্যাগণ এইরূপেই উৎপন্ন হয়। নাম ভুলো না। ক্রমে সব গোল মিটে যা'বে।"

পুরুষ।—"প্রণবই কি ভগবানের নাম ?"

সুকৃতি।—"হাঁ প্রণবই তাঁ'র নির্দিষ্ট নাম, আর প্রণবই তাঁ'র আদ্য প্রকট মূর্ত্তি। ও সব কথা মেজদাদার কাছে বেশ ক'রে বুঝে নিও। আমি মেয়ে মানুষ ও সব জানি না। আমি জানি তাঁ'র নাম শ্রীকৃষ্ণ; এই নামটিই আমার সবচেয়ে মধুর মনে হয়—তাঁ'র রূপও বড় মনোহর! তিনিই, তোমার হৃদয়মধ্যে থেকে আমায় আর আমার হৃদয়মধ্যে থেকে তোমায় নিরন্তর আলিঙ্গন ক'রে রয়েছেন। তুমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্চো না. দু'দিন পরে সব বুঝ্‌তে পার্ব্বে। বাঃ! তোমার ত আর নাম ক'ত্তে ভুল হ'চ্চে না!"

পুরুষ।—"ও কি ভোলবার জিনিস ? যত বল্‌চি, ততই বল্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে। ব'লে আশ্ মিট্‌চে না।"

সুকৃতি।—"ঐ দেখ, নাথ, তোমার আর একটি কন্যা।"

সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ দেখিলেন, আর একটি বালিকা পূর্ব্বকথিত বালিকাটির পাশে দাঁড়াইয়া। সে'টিও বড়ই সুন্দর!

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, তাঁহারা দুই জনে একটি নাতিপ্রশস্ত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একখানি শ্বেতমর্ম্মরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। জ্যেষ্ঠা বালিকাটি পিতার এবং কনিষ্ঠাটি জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিল।

সুকৃতি বলিলেন "বাবার আর মার আসন বেশ ক'রে দেখেচ ত ?"

পুরুষ। "হাঁ! দেখেচি। সেখানে গেলে না দেখে ত থাকা যায় না। সহজেই নজরে পড়ে। একটি পদ্মের দু'টি পাপড়ি। আচ্ছা!

ওর আর পাপড়িগুলি কি সব ঝ'রে প'ড়ে গিয়েছে ?"

সুকৃতি হাসিলেন। বলিলেন "এখানে কি কিছু ঝরে ? ঝরে তোমাদের দেশে। এ দেশে সব যেখানে যেমন, তেমনি অনন্তকাল আছে—অনন্তকাল থাক্‌বে। আমি তখন যেমনটি ছিলাম, এখনও তেমনিটিই আছি। বাবা আর মাকে চিরদিনই অমনি দেখ্‌চি। দু'জনে এক আসনে গায়ে গায়ে ঠেশ্ দিয়ে ব'সে আছেন। অনন্ত-কাল আছেন—অনন্ত-কাল থাক্‌বেন। ওঁরা আসন ত্যাগ ক'রে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও যান না।"

পুরুষ।—"যখন বাহিরে গিয়ে আমায় সঙ্গে ক'রে আন্‌লেন ?"

সুকৃতি।—"তখনও দু'জনে ঐখানে ঐরূপ ছিলেন। আবার যখন যেখানে প্রয়োজন হ'বে, সেখানেও ওঁকে দেখ্‌তে পা'বে ? কিন্তু তখনও উনি ঐখানে ঐরূপেই থাক্‌বেন। এরি নাম "অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব।" এরি নাম "দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।" ও সকল কথাও মেজদাদা তোমায় বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেবেন। দেখ দেখ নাথ, আমাদের শ্রদ্ধা আর রুচি, এরা দু'টি বোনে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত বড় হ'য়ে উঠেছে। এখন এদের বিয়ে দেওয়া উচিত নয় কি ?"

সত্য সত্যই, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা যোড়শী যুবতী হইয়া উঠিয়াছে! আহা ! তাহাদের কি সুন্দর দেহ-গঠন !

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলুনং কররুহৈ-
রনামুক্তং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি ভুবি।"

আহা! সেই অনাঘ্রাত পুষ্প—নখাঘাত বর্জ্জিত নবকিশলয়,—অব্যবহৃত রত্ন—অনাস্বাদিত নূতন মধু—অখণ্ড পুণ্যফলের মত অপূর্ব্ব নির্ম্মল রূপ—না জানি কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে লাভ হইবে ?

পুরুষ, সেই কন্যা দু'টির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিয়া, সুকৃতিদেবীকে বলিলেন "দেবি, এ দেশের আমি কিছুই জানি না। তুমি তোমার পুত্র আর ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় কর। কি আশ্চর্য্য! এ দেশে জীব এত অল্প সময়ে বৃদ্ধি পায় ?"

সুকৃতি।—"হাঁ, নাথ! আমাদের এ দেশের সকলি আশ্চর্য্য। মা, শ্রদ্ধা, তুমি আপাততঃ পিতৃদেবের চরণসেবা কর গে। আমরা একবার গুহা ভ্রমণ কর্‌বো। রুচি আপাততঃ আমাদের সঙ্গে থাক্। তা'র পর পিতা যা ব্যবস্থা ক'র্‌বেন তাই হ'বে। এস নাথ, গুহা মধ্যে ভ্রমণ ক'রে তোমায় সব দেখাই গে।"

পুরুষ।—"চল। এখন তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা। তুমি যে পথে নে যা'বে, সেই পথেই যা'ব।"

সহসা ধ্বনি হইল,—"তাই কোরো। সুকৃতির আশ্রয়ে বলবান্ হ'য়ে সর্ব্ব কর্ম্ম কর। এ দেশে শক্তিহীন হ'য়ে কোন কাজ করা যায় না। **শক্তিই উপাস্য।**"

পুরুষটি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। সম্মুখে গুরুদেব।

গুরুদেব।—"এস, বাপ্, সুকৃতিকে বক্ষে ক'রে রুচির হাত ধ'রে, নাম ক'ত্তে ক'ত্তে আমার সঙ্গে। শ্রদ্ধা আমার কক্ষে আমার সেবার জন্য গেছে। সে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন

ক'রে আমার সেবায় জীবন-পাত করুক; রুচির জন্য উপযুক্ত পাত্র অচিরেই পা'বে।"

এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। সুকৃতিপতি স্বীয় বাম বাহু দ্বারা সুকৃতিকে বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে রুচির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া, গুরুদেব বলিলেন, "বাপু, আমাদের এ গুহাটি অতি অপূর্ব্ব। এর অপর প্রান্তে যা'বার দু'টি পথ আছে। কিন্তু গন্তব্য স্থান আমাদের পশ্চাতে। সম্মুখে এই যে মন্দিরটি দেখ্‌চো, এটি আমার সেই প্রকোষ্ঠের পশ্চাৎ ভাগ। সুকৃতি তোমায় সঙ্গে ক'রে আমার প্রকোষ্ঠে ক্ষণেকের জন্য নিয়ে গিয়েছিল সত্য—কিন্তু তুমি সহস্র চেষ্টাতেও এখন আর সেখানে যেতে পার্‌বে না। এই মন্দিরের দু'ধারে যে দু'টি অল্প পরিসর পথ দেখ্‌তে পাচ্চো, এরি একটি ধ'রে গেলে, আমার প্রকোষ্ঠে গমন ক'ত্তে পারা যায়। আমার আসনের উর্দ্ধে একটি অতি গুপ্ত পথ আছে। আমার অপরা পত্নীকে প্রসন্ন ক'রে, যদি তাঁ'র সঙ্গে সেই পথে প্রবেশ ক'ত্তে পার, তবেই সহজে গুহার প্রান্তে উপনীত হ'তে পারবে। নাম ভুলো না, চেষ্টা ছেড়ো না, সহজেই কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বে। যাও প্রবেশ কর। প্রয়োজন হ'লে আমার দেখা পা'বে।" এই বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

পুরুষ।—"দেবি, তুমি এখানে থাক, আমি রুচির হাত ধ'রে নাম জপ ক'ত্তে ক'ত্তে এই দক্ষিণধারের পথটি ধ'রে ভিতরে যাই। এ পথ বড় সরু, তিন জনে এক সঙ্গে যাওয়া যা'বে না।"

সুকৃতিদেবী, সহাস্যবদনে বলিলেন, "আচ্ছা, মেয়েই তোমায় পথ দেখা'বে। আমি এই খানেই ব'সে রইলাম।"

সুকৃতিদেবী শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। পুরুষটি রুচির হাত ধরিয়া নাম জপ করিতে করিতে সেই পথে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পথ।

গুরু-প্রদর্শিত সেই দুইটি পথের বাহিরে, দু'টি স্বতন্ত্র দ্বার আছে। সেই দ্বার দুইটির একটি দিয়া প্রবেশ করিলে, সম্মুখেই একটি নাতিপ্রশস্ত চত্বর। সেই চত্বর হইতেই সুড়ঙ্গাকারে দু'টি পথ পাশাপাশি নিম্নাভিমুখে গিয়াছে। মধ্যে সেই মন্দির—যাহাতে শ্রীগুরুদেব শক্তি-সঙ্গে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। দু'টি পথ দিয়াই গুহাপথে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু এই উভয় পথের মধ্যে আর একটি তৃতীয় পথ আছে। সে পথটিতে প্রবেশ করিতে পারিলেই গুহার প্রান্ত সীমায় সহজে উপনীত হইতে পারা যায়। সেই তৃতীয় পথের উভয় প্রান্তই সর্ব্বদা রুদ্ধ। উপায় দ্বারা তাহা উদ্ঘাটন করিতে হয়। শ্রীগুরুদেব সুকৃতিপতিকে বলিয়াছেন—"তাঁ'র অপরা পত্নীকে প্রসন্ন ক'রে, তাঁ'র সহায়তায় সেই পথে প্রবেশ করা যায়।" শ্রীগুরুদেবের এই দ্বিতীয়া পত্নীর নাম কি? তিনি কোথায়

থাকেন? কি রূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে? সে কথা পুরুষটি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই হইল তাঁহার একটি ভ্রম। তার পর শ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন "সুকৃতি তোমায় সঙ্গে ক'রে ক্ষণেকের জন্য আমার প্রকোষ্ঠে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তুমি সহস্র চেষ্টাতেও আর এখন সেখানে যেতে পার্বে না।" এই কথায় তাঁহার বোঝা উচিত ছিল, যে সুকৃতিকে সঙ্গে করিয়া না গেলে কোন ফল হইবে না। কিন্তু তিনি তাহা বুঝেন নাই। তিনি যে রাজ্যের লোক, সেখানকার নিয়ম "পথে নারী-বিবর্জ্জিত হইয়া গমন করিবে।" তিনি সেই শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া সুকৃতিকে বাহিরে রাখিয়া, সেই দুর্গম পথে প্রবেশ করিলেন। সুকৃতি সঙ্গিনী হইলে আমরাও যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমাদের ভাগ্য ফলে তাহা হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সুকৃতিপতি, তনয়ার হস্তধারণ পূর্ব্বক অপর দ্বার দিয়া সেই খানে আসিলেন, আবার সেই পথে প্রবেশ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ পরে অপর দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলেন। এইরূপ বারম্বার করিতেছেন দেখিয়া, সুকৃতিদেবী সেই শিলাপট্টে উপবেশন পূর্ব্বক মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। কয়েকবার এইরূপ গমনাগমনের পর একটি পুরুষ সহসা সেই খানে আগমন পূর্ব্বক সুকৃতিপতিকে আক্রমণ করিল। সুকৃতি দেখিতেছেন, কিন্তু কিছু বলিতেছেন না—কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। রুচিও পিতার হাত ছাড়িয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন। উভয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে সেই পুরুষ, সুকৃতিপতিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া চলিল। তখন তিনি পত্নীর পানে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "দেবি, প্রিয়তমে—আমায় নে যায়!—এ কে?—এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চে?—আমার উপায় কি হ'বে? এ জন্মে কি আর তোমার সঙ্গে মিলিত হ'তে পার্ব্বো?—হা অদৃষ্ট! পেয়ে হারা'লাম!"

সুকৃতি বলিলেন—"আমার কি সাধ্য নাথ? আমি ত অবলা—পিতাকে স্মরণ করুন।"

তখন সেই পুরুষ কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"গুরো! দয়াময়! দেখুন দস্যুতে আমার অপহরণ ক'রে নিয়ে যায়। আমায় রক্ষা করুন।"

সহসা সেই স্থান অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া, সেই পুরুষ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তখন শ্রীগুরুদেব সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "ভয় নাই! তুমি নির্ব্বোধের মত সুকৃতিকে বাহিরে রেখে, গুহায় প্রবেশ ক'রেছিলে। নামের গুণে তোমার প্রাণ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু সাবধান। আর কখনও শক্তি ছাড়া হ'য়ো না।" এই বলিয়াই তিনি আবার অন্তর্হিত হইলেন।

তখন সেই পুরুষ, আবার সুকৃতির পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। দ্বন্দ্বজনিত শ্রম, দ্বন্দ্বভাবের অপগমে দূর হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, ঐ দুর্দ্দান্ত দস্যুটাও ত তোমাদের এই দেশেরই লোক?"

সুকৃতি।—"হাঁ আমাদের দেশের লোক বটে। লোকটা কিন্তু মন্দ নয়, দস্যুও নয়, ও বড় আমুদে। ঐ রূপে লোকের সঙ্গে

তামাসা করা ওর অভ্যাস। তবে তামাসা বড় তীব্র। সময় সময় কষ্ট হয়। কিন্তু অব্যাহতি পেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গত-ব্যাপার ভাব্‌লে হাসি আসে। মনে হয় ঐ দুর্ব্বল লোকটা আমায় নিয়ে এত নাকাল ক'ল্লে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না?"

পুরুষ।—"হাঁ আমোদ বটে। ব্যাপারটা বড় সহজ নয়, আমি এখনো হাঁপাচ্চি। ও আবার দুর্ব্বল? আমাকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

সুরুচি।—"তুমি আড়ষ্ট হ'য়ে প'ড়েছিলে, তখন আর টেনে-নে যাওয়া আশ্চর্য্য কি? একটু বাধা দিতে যদি, ও তখনি পালাত। ও বড় দুর্ব্বল! শরীরে ওর এক রতিও মাংস নাই, কেবল জমকাল পোষাকের জোরে মহা-বীর সেজে বেড়ায়!"

পুরুষ।—"ও কে? ওর নাম কি?"

সুরুচি।—"ওর নাম মন। লোকে আদর ক'রে ওকে এই গুহার রাজা বলে। বস্তুতঃ এ সমুদায়ই আমার পিতার রাজ্য। ও ত রাজা নয়ই—আমার পিতার একটি সামান্য ভৃত্য মাত্র।"

পুরুষ।—"তবুও আমাকে এত লাঞ্ছনা ক'ল্লে?—কৈ? পিতা ত সেজন্য ওকে কিছু বল্‌লেন না?"

সুরুচি।—"ওর একটু ছিট্ আছে। পাগল ব'লে বাবা ওরে কিছু বলেন না। যখন ভাল থাকে, তখন প্রাণপণে পিতার সেবাই ওর ব্রত। যখন ক্ষেপে ওঠে, তখন ও অনেক অকর্ম্ম করে। মানুষকে ভয় দেখান ওর একটা রোগ। এখন কি কর্‌বে? আবার গুহা দেখ্‌তে যা'বে? না একটু শোবে?"

পুরুষ।—"গুহাটি ত অন্ধকার, দেখ্‌বার ত উপায় কিছুই নেই।"

সুরুচি।—অন্ধকার স্থানে যেতে হ'লে আলো জ্বাল্‌তে হয়। সেখানে ত আলোর সুব্যবস্থা আছে, তুমি কিছুই জান না তাই অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে খুন হ'য়েছ।—আমায় যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে, তা'হ'লে ঘোরাটা হয় ত নিষ্ফল হ'তো না। কোথায় কি আছে, আমি সব জানি। তোমায় সব দেখাতে পাত্তাম।"

পুরুষ।—"কিন্তু পথ বড় সরু। শুধু রুচির সঙ্গে যেতেও কষ্ট হ'য়েছে।"

সুরুচি।—"উপায় আছে।"

পুরুষ।—"কি উপায়?"

সুরুচি।—"হয় তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর—না হয় আমি তোমার দেহে প্রবেশ ক'রে তোমায় চালিত করি।"

পুরুষ।—"কি ক'রে?"

সুরুচি।—"যোগ-বলে।"

পুরুষ।—"তবে তুমিই আমার দেহে প্রবেশ ক'রে আমায় চালিত কর।"

"তবে তাই হোক" বলিয়া সুরুচি সেই পুরুষের দেহে মিশিয়া গেলেন। এরি নাম কি পরকায়-প্রবেশ-শক্তি?—না। পতি পত্নী ত একে দুই' আর দু'য়ে এক।

এই বার সেই পুরুষটির আর নিজের স্বাতন্ত্র্য রহিল না; সুরুচি তাঁহাকে যেরূপে চালাইতে লাগিলেন, তিনি সেইরূপই চলিতে লাগিলেন।

তখন সুরুচিপতি, সুরুচি চালিত হইয়া রুচির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আবার গুহা-পথে প্রবিষ্ট হইলেন। এবার প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন, সেই পথে বিন্দুমাত্রও অন্ধকার নাই—চারিদিক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। সেথা চন্দ্র সূর্য্য নাই—দীপও নাই—অথচ আলোকিত। সে আলোকদ্যুতি কোটি তপনের উজ্জ্বল আলোক অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর অথচ অনন্ত হিমাংশুর স্নিগ্ধ-কিরণ-তুল্য নয়নের প্রীতিকর। সেই আলোকে তিনি দেখিলেন, পথ অপ্রশস্ত নয়। পথ পার্শ্বেই তরঙ্গিণী তীব্র বেগে প্রবাহিতা হইতেছেন। কূলে নৌকা।

সুকৃতি পতিদেহে মিশিয়া থাকিয়াই বলিলেন "দেখ্‌লে ত কেমন সুন্দর পথ! ইচ্ছা হ'লে জলপথে-নৌকাযোগেও যেতে পার।"

"নৌকা কা'র?"

"মায়ের নৌকা। এর নাম কৃপা-তরি। এ তরি এই যুক্ত ত্রিবেণীতে এই গঙ্গার ঘাটে চিরদিনই বাঁধা আছে। এতে ওঠবার অধিকারী হ'লেই, এ নৌকা তা'রে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায়।"

"ত্রিবেণী বল্‌লে। তিনটি কৈ?"

"আর একটু উপরে, অদূরে বারাণসী। তা'র উপর একটু দূরে ত্রিবেণী। এখান থেকে ত্রিবেণীতে আস্‌তে হ'লে, বরাবর গঙ্গা বেয়ে শেষে যমুনা দিয়ে উজান বেয়ে আস্‌তে হ'বে। আর মুক্ত ত্রিবেণী আরও নীচে, আমরা এই গঙ্গা দিয়ে সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে, তার পর যমুনার স্রোত ধ'র্ত্তে পার্‌বো।"

"সেখানে পৌঁছিলেই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন দেখ্‌তে পা'ব?"

"যুক্ত ও মুক্ত উভয় ত্রিবেণীতেই গঙ্গা ও যমুনার মিলন দেখ্‌তে পা'বে; কিন্তু সরস্বতী অন্তঃসলিলা। মায়ের বিশেষ কৃপা ব্যতীত সরস্বতীর দর্শন লাভ সম্ভব নয়। এখন কি কর্‌বে? স্থলপথে পদব্রজেই যা'বে? না জলপথে যা'বে?"

"অন্ধকারে অন্ধকারে, অনেকবার ত ঘুরেছি। এবার যখন নৌকা পেয়েছি জলপথেই যাই চল। তুমি যখন আছ, তখন সবই হ'বে। গুরুদেব ব'লেছেন, তোমার আশ্রয়ে বলবান হ'য়ে যে কাজ কর্ব্বো তা'তেই সফলকাম হ'বো। আমি শক্তিহীন হ'য়ে এর মধ্যে এসে অনর্থক সময় নষ্ট ক'রেছি কষ্টও পেয়েছি।"

"তবে নৌকায় ওঠ।"

সুকৃতিপতি রুচিকে বলিলেন "আয় মা রুচি, আমরা প্রাণভ'রে নামগান ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে গঙ্গায় ভাসি।"

রুচি।—"একটু গঙ্গাজল মাথায় দাও।" এই বলিয়া সে সেই পবিত্র সলিল, অঞ্জলি করিয়া পিতার মস্তকে দিল।

(ক্রমশঃ)

স্থূল ও সূক্ষ্মের তারতম্য।

দ্বিতীয় বর্ষ বৈশাখ সংখ্যার ১৪০পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের শেষ।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জীবশরীরস্থিত সূক্ষ্ম শক্তিদু'টি-(তাপ ও তড়িতশক্তি)-র অসামঞ্জস্য হইলেই রোগের উৎপত্তি, এবং উহাদের সামঞ্জস্য করিতে পারিলেই রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব এখন দেখা যাউক যে কি উপায়ে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে। পরন্তু ইহা বুঝিতে হইলে, এই শক্তি মনুষ্য-শরীরে কি ভাবে কার্য্য করে, প্রথমে তাহা জানা আবশ্যক। সুতরাং প্রথমে আমরা তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য-শরীর একটি তড়িৎ-যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্রের কেন্দ্র মস্তকে, স্নায়ুমণ্ডল ইহার তার, এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহার কার্য্যভূমি। এই স্নায়ুমণ্ডলরূপ তারের সাহায্যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ইহার ক্রিয়া হইতেছে। মস্তক যেমন এই দেহযন্ত্রের কেন্দ্র বা তড়িচ্ছক্তির মূলাধার তেমনি উহা আবার ইচ্ছাশক্তিরও একমাত্র আধার স্থান। কেন্দ্রস্থিত তড়িৎ পদার্থ সূক্ষ্ম, ও অতি সূক্ষ্ম তার-স্বরূপ স্নায়ুমণ্ডল মধ্যে অবিরত প্রবাহিত হইয়া মনুষ্য-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কার্য্য করিতেছে। স্বভাবের এই কার্য্য অতি অপরূপ। ইহাই জীবরক্তে জীবনীশক্তি প্রদান করে—ইহা মনুষ্য বিশ্লেষণের অসাধ্য। **ভগবানের** প্রদত্ত এই শক্তি, যাহা অবিরত অজ্ঞাতসারে আমাদের শরীরমধ্যে কার্য্য করিতেছে—যাহা আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই শক্তিকে আবার **তাঁ হই** কৃপায় আমাদের ইচ্ছা-শক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিতে পারা যায়, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে আমরা এই কেন্দ্রস্থিত তড়িৎকে সেই একই স্বভাবিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে ইচ্ছামত নিজের অঙ্গ বিশেষে অথবা দেহান্তরে বিনা আয়াসে চালনা করিতে পারি। এই জীবনী-শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও সূক্ষ্মতম।

পূর্ব্বে আরও বলা হইয়াছে যে বিশ্বস্রষ্টা পরমকরুণানিধান **পরমেশ্বর** তাঁহার ক্রীড়া-পুত্তলি এই মনুষ্য-শরীর-যন্ত্রটি বিনা এঞ্জিনে চালাইবার জন্য যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অদ্ভুত শক্তিটি প্রদান করিয়াছেন, তাহা দু'টি বিপরীত গুণ-সম্পন্ন, অর্থাৎ একটি পজিটিভ্ (Positive) বা বিকর্ষণী এবং অন্যটি নেগেটিভ্ (Negative) বা আকর্ষণীগুণসম্পন্ন। মস্তক, প্রথম অর্থাৎ বিকর্ষণী, এবং দেহ, দ্বিতীয় অর্থাৎ আকর্ষণী গুণের আধার। মস্তক, কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া সেই সূক্ষ্মশক্তিকে অবিরত বিকর্ষণ, বিক্ষেপ বা দান করিতেছে, আর সমগ্র শরীরযন্ত্র উহা আকর্ষণ বা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের পুষ্টিসাধন করিতেছে। কিন্তু **সর্ব্ব-শক্তিমানের** কি অপূর্ব্বলীলা—**তাঁহার** কার্য্যের কি অপরিমেয় কৌশল! কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! মস্তক সর্ব্বথা বিকর্ষণী গুণ সম্পন্ন হইলেও, যখন বাহ্যিক ক্রিয়া দ্বারা আমরা কোন বিষয়ের অনুধাবন করি, টেলি-গ্রাফে খবর যাওয়ার মত তৎক্ষণাৎ স্নায়ুমণ্ড-লের ভিতর দিয়া সেই সংবাদ কেন্দ্রাভিমুখে

ধাবিত হয়, তখন উহাও গ্রহণ করিতে পরা-ঙ্মুখ হয় না—তখন তথায় আকর্ষণীগুণ ক্রিয়া করিতে থাকে; কারণ মস্তকই শরীর-যন্ত্রের এঞ্জিনস্বরূপ, বা স্প্রীংএর চাবি স্বরূপ, অথবা শরীর-রাজ্যের একমাত্র রাজাস্বরূপ। রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল রাজার কার্য্যের উপরেই নির্ভর করে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে বা অজ্ঞাতসারে কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না।

আবার অনুভবশক্তি সম্পূর্ণরূপে মস্তকের আয়ত্বাধীন বলিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে সংবাদ না পৌঁছিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মস্তিষ্ক তাহা গ্রহণ করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়াই আমরা অনুভব করিতে পারিব না। সুতরাং আকর্ষণী ও বিকর্ষণী, এই দু'টি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধশক্তি অবিশ্রাম একই কেন্দ্রে ক্রিয়া করিতেছে। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই দু'টি বিপরীত গুণের এমন চমৎকার সামঞ্জস্য আছে যে বিরুদ্ধ হইলেও ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া নির্ব্বিবাদে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, উহা সমস্তই শরীরের আভ্যন্তরিক ব্যাপার। বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আবার ভিন্ন প্রকার বন্দোবস্ত আছে। যথা, দেহের সমস্ত সম্মুখভাগ বিকর্ষণী, এবং পশ্চাৎভাগ আকর্ষণী-গুণ বিশিষ্ট। সেইরূপ আবার দক্ষিণ অঙ্গ বিকর্ষণী ও বাম অঙ্গ আকর্ষণী এবং বক্ষঃস্থল বিকর্ষণী ও পদদ্বয় আকর্ষণীগুণ সম্পন্ন। সেই কারণেই পশ্চাৎ অপেক্ষা সম্মুখভাগে লোকে অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারে এবং পদদ্বয় আকর্ষণী-গুণবিশিষ্ট বলিয়াই শীতলতা হইতে উহাকে রক্ষা করা এত প্রয়োজন। অধিকক্ষণ জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে বা শীতল স্থানে নগ্নপদে বিচরণ করিলে শীঘ্র তাহার কুফল ফলিতে দেখা যায়। আধুনিক সভ্যতার খাতিরে আজকাল অনেক সৌখিন বাবু মহাশয়েরা মস্তকের পশ্চাৎ-ভাগের কেশগুলি এত অধিক ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলেন যে ঐ ভাগ প্রায় কেশশূন্য হইয়া যায় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু উহা যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে কতদূর অহিতকর তাহা বোধ হয় এই সূক্ষ্মশক্তির বিষয় পাঠ করিলে অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

আবার মস্তকটিকে পৃথকভাবে ধরিলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় ইহারও কতকটা বাহ্যিক বন্দোবস্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তক বিকর্ষণী গুণের আধার হইলেও উহার বাহ্যাভ্যন্তর সমভাবে ঐ গুণসম্পন্ন নহে। বিকর্ষণীগুণ মস্তিষ্ক মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকিয়া সম্মুখদিকে অর্থাৎ মুখেরদিকে তাহার বাহ্যক্রিয়ার বিকাশ করে বা তদভিমুখে বিক্ষেপিত হয়, সুতরাং পশ্চাৎ অপেক্ষা সম্মুখ ভাগই অধিক পরিমাণে উক্ত গুণসম্পন্ন হয়, আর পশ্চাৎভাগ কাজে কাজেই সদাই তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ পশ্চাৎ-দিকে কেবল আকর্ষণী শক্তিরই বিকাশ হয়। সুতরাং মস্তকের পশ্চাৎভাগকে সর্ব্বদা সুর-ক্ষিত রাখা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ প্রদত্ত কেশই ইহার সুরক্ষার স্বাভাবিক উপায়। পরন্তু মস্তিষ্ক বিকর্ষণী-গুণের আধার বলিয়া সর্ব্বদা উহাকে শীতল রাখা কর্ত্তব্য।

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্নগুণসম্পন্ন হইলেও **ইচ্ছাশক্তির** নিকট সকলকেই পরাভব মানিতে হয়। এই শক্তি অতি সূক্ষ্ম সুতরাং অধিকতর প্রবল।

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আত্ম-শরীরের যে কোন স্থানকে বিকর্ষণী ও পর-শরীরের যে কোন অঙ্গকে আকর্ষণী গুণ সম্পন্ন করিতে পারা যায়। **ইহাই সামঞ্জস্য রক্ষার একমাত্র উপায়।** ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিজ শরীরস্থিত জীবনীশক্তি বা তড়িচ্ছক্তি অন্যের শরীরে প্রবেশ করাইয়া, তাহার যে অঙ্গের যে স্থানে সেই শক্তির অভাব আছে, তাহার পূরণ করিয়া দিলেই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইল। সমস্ত সেই কৃপাময় ভগবানেরই ইচ্ছা। তিনি আমাদের ইচ্ছাশক্তিতে এত প্রবল ক্ষমতা প্রদান না করিলে পরস্পর শক্তিচালনা পূর্ব্বক একের দ্বারা অন্যের শক্তি সামঞ্জস্য করিবার কোনই উপায় থাকিত না।

মেস্‌মেরিজমের দ্বারা রোগ আরোগ্য করার কথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। চিকিৎসার অসাধ্য দুরারোগ্য ব্যাধিও মেস্‌মেরিজম্‌-দ্বারা অবলীলাক্রমে আরোগ্য হইতে দেখা যায়, অথচ কোন প্রকার ঔষধের ব্যবস্থাই উহাতে নাই। বিনা ঔষধে, কোন্ শক্তির প্রভাবে এই কার্য্য সাধিত হয়?—উত্তর, "ইচ্ছাশক্তি।" ইচ্ছাশক্তির আদেশে বিকর্ষণী গুণের সঞ্চালন দ্বারাই এই অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

মেস্‌মেরিজমের যে কত ক্ষমতা, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা ইহার তথ্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য F. T. S. প্রণীত ও মৎ সম্পাদিত "সচিত্র মেস্‌মেরিজম্‌-শিক্ষা" নামক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকের অবতরণিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই আধ্যাত্মিক বিদ্যার চর্চ্চাভাবে আমরা তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমরা জড়পদার্থের বহুতর তত্ত্ব অনুশীলন করি, তাই আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিও জড়পদার্থের ন্যায় স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বিজাতীয়দিগের মধ্যে অনেকেই আমাদের সেই পদদলিত গৃহলক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যরাশি দৃষ্টে হতজ্ঞান হইয়া তাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কালের এমনি অদ্ভুত গতি!" যাঁহারা মানুষের চিন্তাস্রোত কিরূপ কারণে কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা বলেন যে এইরূপ বিশ্বাসের অভ্যুদয়, কালের চক্রগতির অবশ্যম্ভাবী ফল। এই বিশ্বাস এ কালে ক্রমশই বদ্ধমূল হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকিবে—ফলতঃ তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে।

মেস্‌মেরিজম্ জিনিসটা কি, এবং কেনই বা ইহাদ্বারা অলৌকিক কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়, তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস দিবার জন্য, উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে দুএকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে এই বিদ্যা কত আশ্চর্য্য ও মনোমুগ্ধকর; বাস্তবিক এই সভ্যতার চরমোন্নতির দিনে স্থূলের আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মের দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থারম্ভে, ইচ্ছা-শক্তি (Will power) ও জীবদেহের তড়িৎ-শক্তি-(Animal Magnetism)-র এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা—

"মনুষ্য যে শক্তি দ্বারা মেস্‌মেরিক্ (mesmeric = মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধীয়) ব্যাপার সকল উৎপন্ন করিতে পারে, ইংরাজিতে তাহাকে উইল্-পাউয়ার অর্থাৎ 'ইচ্ছা-শক্তি' বলে। এই ইচ্ছা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং সেই শক্তির যথাযথ চালনা করার নামই মেস্‌মেরিজম্। জীবশরীর মাত্রেই এক-প্রকার তড়িত পদার্থ বিদ্যমান আছে, ইহা-কেই ইংরাজিতে এনিমেল্ ম্যাগ্‌নেটিজম্ অর্থাৎ জীবদেহের তড়িৎ বা চৌম্বক-শক্তি বলে। ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে উহা সংযতভাবে চালনা করা যায়, এবং এই ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে স্বকীয় দেহস্থিত তড়িৎ পদার্থকে অন্যতর সজীব বা জড় পদার্থে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে পারিলেই, উহাকে 'মেস্‌মেরাইজ্' অর্থাৎ আয়ত্ত করা হইল বলা যায়।"

জীবশরীরস্থিত তড়িৎ পদার্থের চালনা, করিবার উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "...... ইচ্ছা, স্পর্শ এবং দৃষ্টি (will, touch and look), এই তিনটি উক্ত তড়িৎ চালনার প্রধান প্রবর্ত্তক উপায়। 'আমার শরীরস্থিত তড়িৎ পদার্থ নির্গত হইয়া অন্য জীবশরীরে বা কোন জড় পদার্থে প্রবেশ করুক,' এইরূপ ইচ্ছা মনোমধ্যে দৃঢ় রাখিয়া, স্পর্শ এবং দৃষ্টি-শক্তির সাহায্যে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা মেস্‌মেরাইজর বা ক্রিয়াসাধক তাঁহার সব্‌জেক্ট (subject) বা পাত্র অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা বস্তুর উপর শক্তি চালনা করিতেছেন, সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে অল্প সময় মধ্যে এরূপ আয়ত্ত বা বশীভূত করিতে পারিবেন যে, পাত্র সজীব হইলে তাহার পৃথক অস্তিত্ব জ্ঞান লোপ সুতরাং সদসৎ বিচার বিহীন হইয়া ক্রিয়াসাধ-কের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবে; এবং পাত্র নির্জীব বা জড় পদার্থ হইলে, উহা ক্রিয়াসাধ-কের অভিপ্রায়মত গুণ সম্পন্ন হইবে। সাধকের সহিত পাত্রের এরূপ একতাভাব হইতে দেখা যায়, যে সাধক যাহা পান ভোজন বা অনুভব করিবেন, অথবা করিতেছেন এরূপ মনে করিবেন, পাত্রও ঠিক্ সেই সময়ে সেই সেই দ্রব্যের আস্বাদন ও সেই সেই ভাব অনু-ভব করিবে।" ইত্যাদি।

আরও বলিয়াছেন—"উপরে যে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা হইল তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়-মান হইতেছে যে ইচ্ছাশক্তির চালনাই মেস্‌মেরিজমের মূল মন্ত্র। সুতরাং পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এই ইচ্ছা-শক্তি চালনা করিবার উপায় কি?—ইহার উত্তর **সাধনা**—সাধনাই ইহার উপায়—আর এই সাধনার অর্থ মনঃসংযম এবং একাগ্রতা অভ্যাস করা। যাহা 'ইচ্ছা' করিবে, তাহা সম্পূর্ণ মনঃসংযোগের সহিত করিতে হইবে। মনকে তৎকালে অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আনিয়া সেই একই 'ইচ্ছা'তে নিবিষ্ট করিবে। এইরূপ একাগ্রতা অভ্যাস করার নামই **সাধনা**।"

মেস্‌মেরিজমের লক্ষণ বা ভাব প্রকাশ, যথা—জাগ্রৎ-সুষুপ্তি, ভাব পরিবর্ত্তন, নবজীবন বা বিভক্ত সংজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি, অনৈ-সর্গিক শ্রবণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের শক্তি ভবিষ্যদ্দর্শন ভাবোৎকর্ষ প্রভৃতি মেস্‌মেরিজমের সাহায্যে লব্ধ হয় বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে সে সমস্ত উল্লেখ করিলাম না।

শরীর যন্ত্রের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুণাগুণ ও তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া এবং তৎসমুদয়ের উপর এক ইচ্ছা-শক্তির প্রবল কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে যথাসাধ্য বলিলাম, কিন্তু এই ইচ্ছা-শক্তির উপর আর কাহারও কোন-রূপ অধিকার বা প্রভুত্ব আছে কি না সে বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

স্থূলবাদীগণ মনুষ্য-শরীর হইতে মনকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ বলিয়া মনে করেন। চিকিৎসকগণও অনেকটা সেই মতাবলম্বী বলিয়াই অনুমান হয়, কারণ তাহারাও মনের অবস্থার প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব স্থাপন না করিয়া কেবল শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়ার অবস্থা দেখিয়াই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মবাদীগণ তাহা বলেন না। তাঁহাদের মতে শরীর ও মনের নিত্য সম্বন্ধ। বিকর্ষণী ও আকর্ষণী শক্তির যেমন নিত্য সম্বন্ধ তাহাদেরও যেমন একের অভাবে অন্যটি কার্য্য করিতে পারে না—শরীর ও মনেরও ঠিক্ তদ্রূপ সম্বন্ধ উহাদেরও একের অভাবে অন্যের কোন কার্য্যই হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের শরীরযন্ত্রের দ্বারা যে সকল বাহ্য ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, সে সমস্তেরই মূল প্রবর্ত্তক আমাদের ইচ্ছা-শক্তি। এই ইচ্ছা-শক্তিই কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া সদসৎ সকল কার্য্যেরই পরিচালনা করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা' কাহার?—কে ইচ্ছা করিতেছে?—উত্তর **মন**। মনই এই ইচ্ছার মালিক—মন ইচ্ছা না করিলে কোন কার্য্যই হয় না। সুতরাং মন, ইচ্ছা-শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং ইচ্ছার উপর মনেরই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে বলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণের মধ্যে কেহ কেহ মনকেই, জীবাত্মার নীচে, সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি না, কারণ মনকে যদি সর্ব্বময় কর্ত্তা বলা হয়, তবে আমাদের সদসৎ কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী কে? মন কেন কখন সৎ এবং কখন বা অসৎ কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়? আর কেই বা এই কার্য্য-কলাপের সদসৎ বিচার করে?—পরম করুণাময় **পরমেশ্বর** মনকে আয়ত্বাধীন রাখিবার জন্য আমাদিগকে আরও দুইটি শক্তি প্রদান করিয়াছেন। উহা **জ্ঞান ও বিবেক**। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে বিচার দ্বারা সৎ ও অসতের প্রভেদ অনুভব হয়, ও তখন অসৎ পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যে মনকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। এই মনোজয় কার্য্য কিরূপে সুসিদ্ধ হয় তাহা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম লইয়া আমরা এত কথা বলিলাম, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাদেরও উভয়ের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে, কারণ সূক্ষ্ম ব্যতীত স্থূলের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্মেরও প্রকাশ বা বিকাশ হয় না। সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যে ঘটিকা যন্ত্রের পেণ্ডুলমের ন্যায় একটি সম্বন্ধ সূত্র অনবরতই দুলিতেছে—যেখানে প্রথমের শেষ, সেইখানেই দ্বিতীয়ের আরম্ভ, অর্থাৎ যেখানে সূক্ষ্মের অবসান সেই খানেই স্থূলের উৎপত্তি বা বিকাশ।

স্থূলের উপর সূক্ষ্মের ক্ষমতা এত অধিক যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থূলশক্তি একত্র করিলেও তাহার তুল্য হইতে পারে না।

নেপোলিয়নের মাতা গর্ভাবস্থায় তাঁহার স্বামীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া মনে যে ভীষণ যুদ্ধলিপ্সা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার পুত্র জগৎবিখ্যাত যোদ্ধা হইতে পারিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র উপদেষ্টার উপদেশ বা সহস্র সহস্র চিকিৎসকের চিকিৎসাও এরূপ অলৌকিক ফলদায়ক হইতে পারে কি? কখনই না। সূক্ষ্মের ক্ষমতার তুলনায় স্থূল-উপায় অতি তুচ্ছ। যত দিন না সূক্ষ্মশক্তির দিকে লোকের লক্ষ্য হইবে, তত দিন প্রকৃত উন্নতির আশা কোথায়?

সমাপ্ত

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

দু'টি কবিতা।

যুগল।

হৃদয়ের অন্তঃপুরে চেয়ে দেখি আজ
সে নিঃশব্দ নিস্তরঙ্গ দেব-গৃহ মাঝ
তুমি আর আমি শুধু প্রফুল্ল অন্তরে
করি বাস চিরদিন! মুহূর্ত্তেক তরে
সেথায় পশে না কেহ, চির-কোলাহল
সেথায় পায় না কেহ ঠাঁই! ধ্রুব অচঞ্চল
প্রেম-মুগ্ধ প্রাণ দু'টি মগ্ন পরস্পরে
পাশরিয়ে বসুন্ধরা! রাজ-দণ্ড করে
কভু তুমি রাজেন্দ্রানী, আমি দাস তব,—
তোমারি অনুজ্ঞা পালি হর্ষে অভিনব
দাঁড়াইয়ে সিংহাসন-তলে! হেরি কভু;
তুমিলো সেবিকা মোর, আমি তব প্রভু;
সাজায়ে পূজার অর্ঘ্যে জীবন যৌবন
নত শিরে মোর আজ্ঞা করিছ পালন!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

নিবেদন।

হে দেব মহান্ স্বামী! ওহে মহেশ্বর!
আমারে নিস্পৃহ কোরো যশ-খ্যাতি-ধনে।
যা'কিছু পার্থিব প্রভু! যা'কিছু নশ্বর,
যেন গো সে সব মোর নাহি পড়ে মনে।
পৃথিবীর সুখ-দুঃখ-বিপদ-সম্পদে,
অধীর না হই যেন আশা বা নিরাশে,
যেন হে পরমপিতা ওই রাঙ্গা পদে
সকল সময়ে মতি, রহে এ মানসে।
অভাব জানায়ে, দিও নিত্য নব কাজ,
সাধিতে সামর্থ্য দিও আমি দুরবল;
পূর্ণ হোক তব ইচ্ছা ও গো রাজরাজ!
তোমারি করুণা—কৃপা আমার সম্বল।
এই নিবেদন প্রভু! রাতুল চরণে!
আমি যেন মরি তব কার্য্য সমাধানে।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক। *
"পানিহাটী—অক্ষয় কুটীর"

* গত মাঘ মাসের "প্রার্থনা" কবিতাটি ইহাঁরই রচিত।

সুখ ও দুঃখ।

"Our planet with each revolution carries a huge load of human suffering."—E. B. Foote, M. D.

সংসারের যে দিকে তাকাই দেখি কেবলই দুঃখ। সুখ যাহাকে বলে তাহার ভাগ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা কর সবাই বলিবে, জগতে সুখ পাইলাম না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া লোকে অশিববাদী হইয়া পড়ে; তাহারা বলে, "এ সংসার যখন দুঃখময়, তখন ইহার যিনি মালিক তিনি সয়তান, মঙ্গলময় বা আনন্দময় ভগবান কখনই হইতে পারেন না। জীবকে অজস্র দুঃখ দিবার জন্য যিনি তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে ঘোর অত্যাচারী নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বিধাতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?"

আমাদের দর্শনকারেরা বলিয়া গিয়াছেন সংসারে কেবলই দুঃখ, দুঃখগুলি ত আছেই, উপরান্ত যাহাকে আমরা সুখের আখ্যা দিয়া থাকি, সেগুলিও দুঃখের কারণ বই আর কিছুই নয়। কেন না সুখ পাইবার আশায় নানা প্রকার দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সুখ করতলস্থ হইলে তাহাকে বজায় রাখিতে বেগ পাইতে হয়, কখন্ হারাই, কখন্ হারাই ভাবিতে ভাবিতে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়, তার পর যখন ফুরাইয়া যায় তখন হায়ঃ করিতে করিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। সুতরাং সুখগুলিও দুঃখের হেতু। তবেই সিদ্ধান্ত হইল সংসার দুঃখময়।

বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন "বিজ্ঞানাদি পঞ্চস্কন্ধের ন্যায় দুঃখ নাই।" এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে আমাদের সকল অবস্থা আসিয়া গেল। ধর্ম্মপদের একস্থলে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাপরীত মনুষ্য বারম্বার ঘূর্ণমান হয়, পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চবিষয় এই দশ প্রকার শৃঙ্খলে আসক্ত হইয়া দীর্ঘ কাল পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।" নানাস্থানে তিনি তনহা—তৃষ্ণা বা কামনার বিস্তর নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, এবং উহাকেই সকল প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ বাসনা আকাঙ্ক্ষা যখন দুঃখের হেতু, তখন সুখের কামনা দুঃখপ্রদ না হইবে কেন? যদি কেহ বলেন যে সুখের আকাঙ্ক্ষা দুঃখজনক হইতে পারে, কিন্তু লব্ধসুখে দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়? তদুত্তরে বলিতে হয় যে প্রাপ্তসুখে যদি তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হইতে পারি তাহা হইলে ত কথাই নাই, সব গোলই মিটিয়া যায়; পরন্তু তাহা পারি কৈ? সুখ সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার যে সীমা নাই। কাহার সাধ্য কামনার উদর পূর্ণ করে? মহামতি কার্লাইল্ একস্থলে বলিয়াছেন "ওরে নির্ব্বোধ! আ'জ যদি তোকে অর্দ্ধেক বিশ্বের অধীশ্বর করিয়া দেওয়া হয়, কা'ল তুই অপরার্দ্ধের অধিকার লোভে তাহার মালিকের সহিত দ্বন্দ্ব বাধাইবি! তোর তৃষ্ণার ত সীমা নাই!" তাহার অপেক্ষা, সুখ সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় আসক্তি ত্যাগে যত্ন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সুখসম্পদে আকাঙ্ক্ষা ত আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, কাজেই কোন একটা ঈপ্সিত সুখের প্রাপ্তিতেও নিস্তার নাই।

মুসলমানেরা বলেন, "আনন্দের পরব্ ইদ্ এক দিন মাত্র থাকে, আর শোকের পরব্ মহ-রম্ দশ দিন স্থায়ী। তবেই জানিবে সংসারে এক দিন যদি সুখ পাও, দশ দিন দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে এই অনুপাতে খোদা সুখ দুঃখ বণ্টন করিয়াছেন।" সুতরাং মহম্মদীয় ভ্রাতাগণ দুনিয়াকে প্রায় দুঃখময় বলিয়া থাকেন।

খৃষ্টানধর্ম্ম বলেন "বাবা আদম ও মা হবার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সংসার পাপময় হইয়াছে। পাপ কোনকালে দুঃখের বই সুখের কারণ ত পারে না। পাপজনিত দুঃখ ভোগ-করিতেই আমাদের জন্ম, এবং সেই পাপ ও দুঃখ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রভু-যিশুখ্রীষ্টের পদাশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে যাঁহারা একটু তলাইয়া দেখিতে গিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন যে সাধারণভাবে যত কিছু চেষ্টা কর না কেন, ভবসংসারে দুঃখের হাত এড়াই-বার উপায় নাই। যদি কেহ দুঃখ নিবৃত্তির পন্থা জানিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহাকে বিবেক বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; এবং ক্রমে বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা ব্রহ্মা-নন্দ লাভে সক্ষম হইলে, যথার্থ সুখ অনুভব করিবার অধিকার প্রাপ্তি ঘটিবে; কারণ, পরিমিত অনিত্য মায়িক বস্তুতে কখনই সুখ থাকিতে পারে না, সুখ কেবল অপরিমিত নিত্য সৎপদার্থেই সম্ভব; এইজন্য শ্রুতি বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেনঃ—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

৩—অশ্রু।

নিরদয়—

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

কেন নিরদয় হেন হইল সে বংশীধারী!
না হেরে নয়নে তারে, সখিরে বিরহে মরি।
কিছু যে বুঝিতে নারি—সব প্রহেলিকা-প্রায়,
এত প্রেমে এ বিচ্ছেদ কেন সখি হ'ল হায়!
নিদারুণ অভিশাপে, কে কাঁদাল রাধিকায়!
চল্ সখি রাধানাথে আনিগে চরণে ধরি।
কত দিন মান ভরে চাহি নাই তার পানে,
তাই কি মাধব ফিরে আসিবে না অভিমানে!
কেন দিয়েছিনু ব্যথা—সখিরে তাহার প্রাণে;
হৃদয় বিদরে দুখে আজিকে সে সব স্মরি!
এস হরি ব্রজে ফিরে, রাধিকার প্রাণধন;
আর কভু অভিমানে, করিব না অযতন;
তুমি তো অন্তরযামী, জানিতে আমার মন,
বৃন্দা বলে, ধৈর্য্য ধর পাবে শ্যামে হে কিশোরি

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

নিদয়া—

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

এ হেন নিদয়া কেন হইল সে বিনোদিনী,
সকলে তাহারে বলে রাধা শ্যাম-সোহাগিনী।
সরলা চপলা কোলে কঠিন কুলিশ যেন,
কোমল কামিনী দেহে নিদয় নিঠুর প্রাণ;
শশাঙ্কে কলঙ্ক বল, কেন হ'ল সংঘটন;
কণ্টকে বেষ্টিতা কেন জলে শোভে কমলিনী?
কখন কদম্বমূলে, কখন কালিন্দীকূলে,
একা আসি করে বাঁশী ডাকিয়াছি রাধা ব'লে;
কত দিন নিরজনে ভাসিয়াছি আঁখি-জলে,
তবুও দেয় নি দেখা, অভিমানে সে মানিনী!
কাঁদালে কাঁদিতে হয়—বিধির বিধান ভবে;
আগেতে কেঁদেছি আমি তুমি সখি কাঁদ এবে;
সময় পূরিলে পুনঃ মানসে মিলন হবে—
বৃন্দা বলে, এত দুঃখ দিও না হে গুণমণি।

শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বাস।

যবনিকার অন্তরালে।

(১২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর।)

সকলে সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পায় না কেন?

এখন, স্থূল দেহে ও সূক্ষ্ম দেহে উচ্চস্তরের পরমাণুগুলি (finer particles) বাড়িলে আর কি ফল পাওয়া যায় দেখা যাক। আমরা যেটাকে জ্ঞান বা অনুভূতি (Perception) বলি, সেটা কি? সেটা আর কিছুই নহে, স্পন্দন গ্রহণ করিবার শক্তি (power of responding to vibrations)। আমাদের চতুর্দ্দিকে বাহ্যজগতে (স্থূল সূক্ষ্ম সকল জগতেই) অসংখ্য প্রকারের স্পন্দন রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যত অধিক সংখ্যক স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারেন বাহ্য জগতের জ্ঞান (perception) তাঁহার ততই অধিক হয়। এই, মনে করুন ইথারের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন মাত্র (অমুক সীমা হইতে অমুক সীমা পর্য্যন্ত), আমরা এখন গ্রহণ করিতে পারি, সুতরাং আমাদের আলোক জ্ঞান লালবর্ণ হইতে ভাওলেট বর্ণ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমার বাহিরেও অসংখ্য স্পন্দন রহিয়াছে। যাঁহাদের চক্ষু (retina বা brain) এই বাহিরের স্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে পারে তাঁহাদের আলোকজ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই এইরূপ; যত অধিক স্পন্দন আমরা গ্রহণ করিতে পারিব, তত অধিকসংখ্যক স্পন্দনে আমাদের দেহ স্পন্দিত হইবে, আমাদের অনুভূতি (perception) ততই বাড়িবে। আচ্ছা, সূক্ষ্ম জগৎগুলি (ভুবর্লোক, স্বর্লোকাদি) নিয়তই তো আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে, আমরা তো উহাদের মধ্যে ডুবিয়াই রহিয়াছি, অথচ সে গুলির জ্ঞান (perception) আমাদের হয় না কেন? তাহাদের স্পন্দন আমরা গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া, তাহাদের স্পন্দনে আমাদের মস্তিষ্ক স্পন্দিত হয় না বলিয়া।

(দেখিবার উপায় কি?)

কিরূপে এই স্পন্দন গ্রহণ পটুতা লাভ কয়া যায়? একটা খুব চলিত উদাহরণ লওয়া যাক। সেতার বা এস্‌রাজ বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহাতে অনেক তার আছে, সরু, মোটা, ছোট বড়, লোহার, রূপার ইত্যাদি। এই তারগুলিকে আবার নানাস্থরে, যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে, বাঁধা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটির নিকট যদি নানারকম শব্দ করা হয়, নানাপ্রকার স্পন্দন দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার একটি না একটি তার কাঁপিয়া উঠে নীচু স্বর দিলে মোটা তারগুলি, আর উচ্চ বা এরূপ নীচু স্বর দেওয়া হয় যাহার অনুরূপ তার ঐ যন্ত্রে নাই, তা'হলে যন্ত্রটি মোটেই কাঁপে না, স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে না। এখন মনে করুন এই মোটা তারগুলি দেহের স্থূল পরমাণু (Coarse partubes) আর সরু তারগুলি সূক্ষ্ম পরমাণু। অতএব বুঝা গেল যে আমাদের দেহের (স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহেরই) সূক্ষ্ম পরমাণু যতই বাড়িবে, ততই আমরা সূক্ষ্ম স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারিব, ততই সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার শক্তি লাভ করিব। এই সূক্ষ্ম পরমাণু বাড়াইবার নানা উপায় আছে।

উচ্চ মানসিক চিন্তা, ধ্যান, ও পবিত্রভাব পোষণ করা—এই গুলিই প্রধান উপায়। সাত্বিক আহার অন্যতম উপায়। এই জন্যই যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টি (clairvoyance) লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পান, ইচ্ছামত তথায় গমনাগমন করিতে পারেন এবং নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে যোগী বলিয়া থাকেন। কিন্তু "যোগী" শব্দের অর্থ ঠিক এরূপ নহে; যাঁহারা ভগবান বা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়াছেন, একীভূত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত যোগী। অতএব এই অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যোগী না বলিয়া আমরা সিদ্ধপুরুষ বলিব। তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিকে বিভূতি, ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধি বলে। যাঁহারা যোগমার্গ অবলম্বন করেন, কিছুকালের মধ্যেই তাঁহাদের নানাবিধ শক্তি বা সিদ্ধি আয়ত্তে আইসে; কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য খুব উচ্চ, তাঁহারা এগুলির প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। নিম্ন সাধকেরা অথবা যাঁহারা সূক্ষ্মজগতে জীবসেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাই প্রায় এইগুলি লইয়া থাকেন।

যোগী ও সিদ্ধপুরুষ।

সে যাহা হউক, মানুষের যে এরূপ শক্তি থাকা অসম্ভব নহে, ইহাই অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁহারা এগুলিকে অপ্রাকৃত (unnatural) বলিয়া মনে করেন। অতএব, সর্ব্বাগ্রে আমাদের বুঝা উচিত জগতে কিছুই অপ্রাকৃত নাই, সমস্তই প্রকৃতির নিয়মাধীন। তবে, প্রকৃতির অনেক স্তর আছে, জড়, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি। জড় প্রকৃতি হইতে জড়বিজ্ঞান-(physical science)-এর সৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্মবিজ্ঞান-(occult science)-এর সৃষ্টি। যাঁহারা জড়-প্রকৃতির ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া সাধারণ-সূত্র (law) স্থাপন করেন তাঁহারা যেমন বৈজ্ঞানিক, যাঁহারা সূক্ষ্মপ্রকৃতির ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া সাধারণ-সূত্র করিতেছেন তাঁহারাও সেইরূপ বৈজ্ঞানিক। তবে, প্রথমোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু শেষোক্ত বৈজ্ঞানিকের শক্তির সীমা নাই, উহা তাঁহার মধ্যেই আছে, কেবল বিকাশসাপেক্ষ।

জড়বিজ্ঞান ও সূক্ষ্মবিজ্ঞান

সাধারণের একটা ভুল ধারণা আছে। অনেকেই ভাবেন, সিদ্ধপুরুষ মাত্রই খুব পবিত্রাত্মা, সাধু বা ভক্ত। কোন ব্যক্তির কোন অলৌকিক শক্তি দেখিলে তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান, আর ভাবেন ইনি একজন মহাত্মা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিদ্ধির সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির (ভক্তি বা জ্ঞানের) কোন সম্বন্ধই নাই। একজন নাস্তিক, নিষ্ঠুর বা লম্পট যেমন অনায়াসে অসাধারণ রসায়নবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ বা জ্যোতির্বেত্তা হইতে পারেন, সেইরূপ একজন দুষ্টপ্রকৃতি পরপীড়ক দস্যুও দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সিদ্ধপুরুষ হইতে পারেন। সিদ্ধি তো আর কিছুই নহে, সূক্ষ্মজগতে শক্তিলাভের নামই সিদ্ধি। যাঁহার উদ্যম, উৎসাহ ও একাগ্রতা আছে, তিনিই ইহা পাইতে

সিদ্ধপুরুষমাত্রই সাধু নহেন।

পারেন। ভগবানে বিশ্বাস বা নৈতিক চরিত্রের উপর ইহা নির্ভর করে না। বাস্তবিকই, অসাধু, হিংস্রপ্রকৃতি সিদ্ধপুরুষ পৃথিবীতে অনেক আছেন। ইহাঁদিগকে আভিচারিক (Black Magicians) বলে। ইহাঁদের দ্বারা জীবের ও জগতের অমঙ্গলই হয়। কিন্তু সাধু ও করুণাময় সিদ্ধপুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক। এই লোক-পাবন জগত্তারণ মহাত্মারা অনুক্ষণ জীবের মঙ্গল করিয়া সেই পরম কারুণিকের সেবা করিতেছেন।

উপসংহারে, আমরা দু'চারিটি অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিয়া উহাদের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধপুরুষগণ সূক্ষ্মজগতে কৃতকার্য্য ও সিদ্ধহস্ত, সুতরাং আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা যেমন সোনা, লোহা, লবণ, চিনি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলিকে স্বেচ্ছামত সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিতে পারেন, তাঁহারা সূক্ষ্মভূতগুলিকে সেরূপ তো পারেনই, অনেক বেশী করিতে পারেন। * দু'একটা উদাহরণ দিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

লঘিমা

একটা সিদ্ধি আছে যাহার নাম লঘিমা। অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষ নিজ দেহকে (বা অপর কোন বস্তুকে এরূপ লঘু করিতে পারেন যে উহা আকাশে উড়িতে পারে। এরূপ করিবার তাঁহার নানা প্রণালী আছে। একটি প্রণালী এই—আমাদের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের যেমন একটা চাপ (pressure) আছে, ইথারের সেইরূপ আছে। কিন্তু ইথারের চাপ বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক বেশী। এখন, যে বস্তুকে লঘু করিতে হইবে, সিদ্ধপুরুষ সেই বস্তুর উপরিভাগস্থ কতকটা ইথার সরাইয়া ফেলেন। ইহার ফল এই হয় যে, যেমন চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর চাপে ব্যারোমিটারের পারদ উপরে উঠে, সেইরূপ চতুঃপার্শ্বস্থ ইথারের চাপে ঐ বস্তুটা উপরে উঠিতে থাকে।

এই ইথারের দ্বারাই তাঁহারা আরও অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়া থাকেন, যেমন পদার্থের চূর্ণীকরণ ইত্যাদি।

চূর্ণীকরণ

মনে করুন, সম্মুখে একটা সুদৃঢ় টেবিল রহিয়াছে। সিদ্ধপুরুষ স্বচ্ছন্দে উহার তলদেশ হইতে কতকটা ইথার সরাইয়া লইতে পারেন। ইহার ফল এই হয় যে, উপরিভাগস্থ ইথারের প্রচণ্ড চাপে টেবিলটা ভগ্ন বা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের বৈজ্ঞানিকের বায়ুনিষ্কাসন যন্ত্রের (Air-pumpএর) ন্যায় তাঁহাদিগকে কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয় না। মনের শক্তি (ইচ্ছাশক্তি) দ্বারাই তাঁহারা সব করিয়া থাকেন। কোন বস্তুকে ভগ্ন করিবার ইহাই যে একমাত্র উপায়, তাহা নহে; অনেক উপায় আছে। কঠিন পদার্থ মাত্রের একটা আণবিক আকর্ষণ (Cohesion) আছে, ইহাই অণুগুলিকে সংহত ও একত্র করিয়া রাখে। সিদ্ধপুরুষ ইচ্ছামাত্র যে কোন স্থানের আকর্ষণকে নষ্ট (Neutralised) করিতে পারেন। এইরূপে, একটি লোহার বিম্‌কে যত ভাগে ইচ্ছা খণ্ড খণ্ড করিতে পারেন।

* এ সম্বন্ধে যাঁহারা একটু বেশী জানিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুত লেডবিটার প্রণীত Clairvoyance এবং শ্রীমতী আনি বেসান্তের Occult Chemistry পাঠ করিবেন।

এক পদার্থকে আর এক পদার্থে পরিণত বা রূপান্তরিত করা যায় (যেমন তাম্র লৌহাদিকে স্বর্ণে), এই বিশ্বাস সকল জাতির মধ্যে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ইহা অসম্ভব মনে করেন। তাঁহারা বলেন তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি পৃথক পৃথক মূল-পদার্থ (Elements) অর্থাৎ ইহারাবিশেষ বিশেষ পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত ; সুতরাং স্বর্ণের পরমাণু চিরকাল স্বর্ণের পরমাণুই আছে এবং থাকিবে। সকল মূল পদার্থের পক্ষেই এই নিয়ম। ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি ক্রুক্স (Crookes) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এগুলি বাস্তবিক মূল-পদার্থ নহে, সবই যৌগিক পদার্থ (compounds)। একটি মাত্র মূল-পদার্থ আছে। ইহাকে তিনি প্রোটাইল (protyle) বলেন। (আমরা পূর্ব্বে যাহাকে ৪নং ইথার বলিয়াছি, তাহারই নাম প্রোটাইল প্রোটাইলেরই বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণু বিভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হইয়া, বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান তাহাদিগকেই এক একটি মূল-পদার্থ বলেন। অতএব স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অক্সিজেন,হাইড্রোজেন প্রভৃতিপ্রোটাইল-পরমাণুরই সমষ্টি মাত্র। যেমন, কতকগুলি ইটকে দশ দশখানি করিয়া সাজাইলে এক-প্রকার আকার হয়, ছয় ছয় খানি করিয়া সাজাইলে আর এক রকম আকার হয়, এবং সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সব একই ইষ্টক স্তূপে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রোটাইলেরই পরমাণু একভাবে সন্নিবেশিত হইয়া স্বর্ণ, আর একভাবে সন্নিবেশিত হইয়া রৌপ্য ইত্যাদি উৎপাদন করে, এবং ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সবই এক প্রোটাইলে পরিণত হইবে। কিন্তু কিরূপে ভাঙ্গিতে হয়, জড়বিজ্ঞান জানেন না। সিদ্ধপুরুষ তাহা জানেন। শুধু তাহাই নহে; কিরূপে গড়িতে হয়, তাহাও তিনি জানেন। সুতরাং তিনি লৌহাদিগকে প্রথমে প্রোটাইলে পরিণত করেন। তারপর, ঐ প্রোটাইলকে যে ভাবে সন্নিবেশিত করিলে স্বর্ণ হয়, সেই ভাবে সংযোজিত করেন। এই উপায়ে তিনি যে কোন ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করিতে পারেন। ইহা একটি উপায় মাত্র; সিদ্ধপুরুষেরা অনেক উপায় জানেন। ক্ষুদ্র দেবযোনি-(Nature-spirits)-দ্বারাও ইহা অনায়াসে করাইয়া লইতে পারেন। সুতরাং সুবর্ণীকরণ একটা স্বপ্ন বা কুসংস্কার নহে।

(রূপান্তর—Transmutation)

আমরা কঠিন পদার্থকে তরল এবং তরল পদার্থকে গ্যাসে পরিণত করিতে পারি; আবার, গ্যাসকে তরল ও কঠিন অবস্থায় আনিতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরা অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসকে কঠিন করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধপুরুষ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পারেন। তিনি ইথারকে এবং অপূতত্ত্বাদিগকেও কঠিন অবস্থায় আনিতে পারেন। ইহারই নাম স্থূলীকরণ,—সূক্ষ্মপদার্থকে স্থূল পদার্থে পরিণত করা। এই শক্তিদ্বারা সিদ্ধপুরুষ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকেন, যেমন অলৌকিক লিখন, আকস্মিক বস্তুসৃষ্টি ইত্যাদি।* মনে করুন,

(স্থূলীকরণ Materialization)

* শ্রীমতী ম্যাডেম্ ব্লাভাট্স্কির এইরূপ অনেক শক্তি ছিল। তিনি অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি কৌতূহল হয়, পাঠক Mr. Sinnett-প্রণীত The occult world পাঠ করিবেন।

এক সিদ্ধপুরুষ বিলাতে আছেন। তিনি আপনাকে একখানি পত্র দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার দোয়াত কলম, কাগজ বা পোষ্টাফিসের প্রয়োজন নাই। তিনি ইথার বা অপ্‌তত্ত্ব হইতে কাগজ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা না করিয়া এইরূপ করেন—আপনার ঘরে অবশ্য কোন কাগজ আছেই, তিনি তাহার উপরেই লিখেন। যাহা লিখিতে হইবে, তিনি প্রথমে সেই অক্ষরগুলির একটা মানসিক চিত্র (mental image) করেন। তৎপরে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঐ চিত্রটিকে আপনার ঘরের কোনও কাগজে পাতিত করেন। অতঃপর বায়ুস্থিত কার্বলিক এসিড হইতে কার্বন অংশ টানিয়া লইয়া ঐ চিত্রের অক্ষরে অক্ষরে বসাইয়া দেন। ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিকতা নাই। আমরা যেমন স্বর্ণের বা রৌপ্যের আরকে (solution) পিতল বা তামা ডুবাইয়া একটা তড়িৎস্রোত দিলেই সোনা বা রূপার পরমাণুগুলি ঐ পিতলের উপর ঠিক বসিয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। পাতিত চিত্রের উপর যে কার্বলিক এসিড গ্যাস আছে উহাতে তাঁহার শারীর-তড়িৎ (magnetic current) দিলেই, কার্ব্বন-পরমাণু ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বসিয়া যায়। এটা তত কঠিন নহে; কঠিন—মানসিক চিত্রটি ঠিক রাখা। এক নিমেষও মন হইতে চিত্রটি অন্তর্হিত হইলে চলিবে না।

এইরূপে, সিদ্ধপুরুষ কোন আকস্মিক বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন। মনে করুন

আকস্মিক বস্তু সৃষ্টি।

আপনার একটি আংটি হারাইয়াছে। সিদ্ধপুরুষ উহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি উহার যথাযথ মানসিক চিত্র করিতে সমর্থ। তিনি ইচ্ছা করিলে আপনাকে সেইরূপ আংটি সৃষ্টি করিয়া দিতে পারেন। প্রথমে মানসিক চিত্রটি ঠিক রাখিয়া, (নিকটে যদি কোন স্বর্ণের জিনিস থাকে, যেমন চেন, আংটি,) তাহা হইতে কতক পরমাণু টানিয়া চিত্রের উপর বসাইতে পারেন। তাহা হইলেই আংটি প্রস্তুত হইবে। ইহাতে, অবশ্য, উক্ত চেন প্রভৃতির ওজন কমিয়া যাইবে। যদি কাছে কোন স্বর্ণের জিনিস বা স্বর্ণমিশ্রিত জিনিস না থাকে, তাহ হইলে ইথারকে (বা প্রয়োজন হইলে অপ্‌তত্ত্বকেও) স্বর্ণে পরিণত করিয়া নির্দ্দিষ্ট আংটি সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম উপায়টিতে কাজ সহজেই হয়, বেশী শ্রম করিতে হয় না। এইরূপে তিনি ঘড়ী, রুমাল, পুষ্প প্রভৃতি নানা বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্লাভাট্‌স্কি এই প্রকারে নানা দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া অনেক অবিশ্বাসী জড়বাদীকে ধর্ম্মপথে ফিরিয়াছেন।

কোন স্থূল বস্তুকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াও সিদ্ধপুরুষের নিকট কঠিন

পরিচালন

ব্যাপার নহে। শুনা যায় ব্লাভাট্‌স্কি মাদ্রাজ হইতে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি (statue) সিমলা পাহাড়ে আনিয়া অনেককে দেখাইয়াছিলেন। ইহার নানা উপায় থাকিতে পারে। প্রস্তরমূর্ত্তিটিকে ইথরে পরিণত করিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট ইথার-রাশিকে মাদ্রাজ হইতে সিমলায় আনিয়া কোন স্থানে ছাড়িয়া দিলেই উহা আপনা আপনিই নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে পরিণত হইবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তিনি উহাকে ইথারে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। উহার আণবিক আকর্ষণ (cohesion) ধ্বংস করেন

নাই। তাই, ছাড়িয়া দিলেই উহা স্বতঃই পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করিবে। অথবা ঐ মূর্ত্তিটির একটি মানসিক চিত্র গড়িয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিত্রটি পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু এ উপায়টি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য।

আমরা কয়েকটিমাত্র ক্ষুদ্র সিদ্ধির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। সিদ্ধপুরুষ, ইহা ছাড়া অনেক অদ্ভুত-ক্রিয়া করিতে সমর্থ। সেগুলির প্রণালী আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় বুঝিতে অক্ষম। বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ কৃষক যেমন টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, ফটোগ্রাফি প্রভৃতির গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ সকল সিদ্ধির রহস্য বুঝিতে পারি না। এরূপ স্থলে, অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া বুঝিবার পথ অবলম্বন করাই প্রকৃত-ধীমানের কর্ত্তব্য।

(সিদ্ধি-রহস্য অনেকস্থলে দুর্ব্বোধ্য)

আমরা দেখিলাম হিন্দুর আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির মধ্যে সত্য নিহিত আছে। মন্ত্রজপ, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান, তীর্থস্নান, দেবপূজা, শ্রাদ্ধতর্পণ, দশবিধ সংস্কার, উচ্ছিষ্টবর্জ্জন, খাদ্যাখাদ্য-বিচার, গুরুসেবা, অস্পৃশ্যবিচার, কোনটিই নিরর্থক নহে—অসার কুসংস্কার নহে। প্রত্যেকটিরই গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, প্রয়োজন আছে। অবশ্য, যাঁহারা উচ্চাধিকারী,—যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান বা পরা-ভক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের এ সকলে প্রয়োজন না থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ লোক কয়টি? লক্ষলক্ষ হিন্দুই নিম্নাধিকারী, সুতরাং আচার তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়। তবে, এ কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি যে, উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, রহস্য না জানিয়া, কলের পুতুলের ন্যায়, নির্জ্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায়, আচারগুলি পালন করায় বিশেষ ফল নাই। ইহা মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম নহে, ইহা জড়ের ধর্ম্ম। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ একটি জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছে; ইহাতে প্রাণ নাই। অজ্ঞানই ইহার কারণ। জ্ঞান ব্যতীত প্রাণ আসে না, আন্তরিক বিশ্বাস আসে না। হিন্দুসমাজ এখন তাঁহাদের ঋষি-সঞ্চিত অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি হারাইয়াছে। থিওসফিই এই চাবি হাতে করিয়া আজ মর্ত্ত্যধামে উপস্থিত। অতএব, ভাই হিন্দু, এই চাবি দিয়া তোমাদের ভাণ্ডার খুলিয়া দেখ কি অমূল্য রত্নই উহাতে নিহিত আছে। তুমি কর্ম্মীই হও, জ্ঞানীই হও বা ভক্তই হও, তুমি শৈবই হও, শাক্তই হও, বা বৈষ্ণবই হও, তুমি ব্রাহ্মই হও, কবীরপন্থীই হও, বা রাধাস্বামীই হও, তুমি যাহাই হও না কেন, থিওসফি-বর্ত্তিকা হাতে লইয়া স্ব স্ব পথে অগ্রসর হও; দেখিবে, ইহার আলোকে ধর্ম্মের জটিল, অন্ধকারময় প্রদেশগুলিও আলোকিত হইবে। ইহা দ্বারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবে, রহস্য বুঝিতে পারিবে। শুধু হিন্দুই বা কেন? খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, পার্শী, জৈন, ইহুদী,—পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মই থিওসফির শুভ্র আলোকে আলোকিত হইয়াছে, নবজীবন পাইতেছে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য দুই হইতে পারে না, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র ধর্ম্ম। থিওসফি সেই ব্রহ্মজ্ঞান বই আর কিছুই নহে। থিওসফি

(শেষ কথা।)

কাহাকেও তাঁহার স্বধর্ম্ম ছাড়িতে বলে না যিনি যে ধর্ম্মে আছেন তিনি সেই ধর্ম্মেই থাকুন, ইহাই থিওসফির ইচ্ছা। তবে, থিওসফি তাঁহাকে জ্ঞান দিবে, আলোক দিবে। যেমন, একই আকাশ-বারি সকল নদনদী, খালবিলই জলপূর্ণ করে, সকল ভূমিই উর্ব্বরা ও শস্যশ্যামলা করে,—সেই রূপ এই এক মাত্র ব্রহ্মবিদ্যা (থিওসফি) সকল ধর্ম্মকেই সজীব ও পূর্ণ করিতেছে ও করিবে। থিওসফির একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে; বোধ হয়, সে দিনের অধিক বিলম্ব নাই। অতএব ভাই, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী B. A.

পর্য্যটকের পত্র।

(হৃষীকেশের পরিশেষ)

ভগবান বলিয়া গিয়াছেন—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।"

হে অর্জ্জুন, যিনি মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রশংসাযোগ্য; অর্থাৎ যিনি মনেও কোনরূপ অপবিত্র চিন্তাকে স্থান না দিয়া কেবল কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকেন তিনিই প্রশংসার্হ। কর্ম্মত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব; দেহ যত দিন থাকিবে, তত দিন অবশ্যই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।

হে অর্জ্জুন, তুমি নিয়তই সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল; কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান সততই করিতে হইবে বটে, কিন্তু কর্ম্মে আবদ্ধ হইলে চলিবে না। যে কর্ম্মই হউক না কেন তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।"

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু যজ্ঞে ব্যবহার কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সমস্তেরই ফল আমাতে অর্পণ করিবে।

অদ্বৈতবাদের দোহাই দিয়া যদি আমরা বলি "আত্মা" ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর যে অস্তিত্বই নাই তবে আমাদের কোন কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে "আত্মা" ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই, ইহার উপলব্ধি কয় জনের হইতে পারে? যখন যাঁহার বাস্তবিক এইরূপ উপলব্ধি হয়, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য কিছু থাকে না। সম্পূর্ণরূপে এই জ্ঞানের অধিকারী হইলে তাঁহার কর্ম্মফলগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানীপুরুষকেই জীবন্মুক্ত পুরুষ কহে। জীবন্মুক্ত পুরুষের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বোধ থাকে না, অর্থাৎ তাঁহা হইতে অহংজ্ঞান লোপ পায়; তাঁহাদেরও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় বটে কিন্তু তাহারা কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করেন না,—বা তাহাতে আবদ্ধ হন না। "তত্ত্বমসি"

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "সোঽহং," এই তিন মহাবাক্যের উপলব্ধি হওয়ায় তাঁহাদিগকে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না; সুতরাং পুনর্জন্মও হইতে পারে না। প্রারব্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলের জন্যই তাঁহাদিগকে ইহজগতে থাকিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভগবান বশিষ্ঠ জীবন্মুক্ত পুরুষের এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন :—

"যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তি যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।"

অর্থাৎ যে ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহের লয় না হইলেও জাগ্রৎ অবস্থায় স্থিত, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান সত্ত্বেও যাঁহার রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ হয় না, যাহার বাসনা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। অজ্ঞানী পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং অহংজ্ঞানাক্রান্ত হইয়া কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। জগৎ জ্ঞানী পুরুষকে অজ্ঞানী পুরুষের ন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিতেছে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ হওয়ায় তাঁহাকে "সুষুপ্তিস্থ" বোধ হইলেও তিনি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা জাগ্রত অবস্থায় আছেন। জগৎ দেখিতেছে, তিনি ইন্দ্রিয়বিষয়ে জাগ্রত, অর্থাৎ তিনি রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সকল ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন; প্রকৃত পক্ষে তিনি ইন্দ্রিয়-বিষয় গ্রহণে উদাসীন; ইন্দ্রিয়-বিষয়-গ্রহণে তিনি জাগ্রত নহেন, তিনি দেখিয়াও দেখেন না শুনিয়াও শুনেন না। ভগবান বলিতেছেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।"

অজ্ঞানী সাধারণ পুরুষের রাত্রিই ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী পুরুষের দিবা। এই রাত্রিকালে যখন অজ্ঞানী পুরুষ নিদ্রাভিভূত থাকেন, তখন জ্ঞানী জাগ্রত অবস্থায় স্থিত; আবার অজ্ঞানী পুরুষের যাহা দিবা, তাহা জ্ঞানী পুরুষের নিশা কাল। যে সময়ে অজ্ঞানী পুরুষ জাগ্রত সেই সময়ে জ্ঞানী নিদ্রিত। উপরোক্ত শ্লোকে ভগবান জ্ঞানীর (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের) এবং অজ্ঞানীর পার্থক্য বিশেষরূপে দেখাইতেছেন। অজ্ঞানী কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমানে কর্ম্ম করিতেছে, প্রকৃত তত্ত্বে উদাসীন, অজ্ঞাননিশায় গাঢ় নিদ্রাভিভূত; জ্ঞানী প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞান শূন্য হইয়া জাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছেন। অজ্ঞানী সাধারণ মানব ইন্দ্রিয়বিষয়ে জাগ্রত, রূপ রসাদি উপভোগ করিতেছে, কর্ম্মজালে জড়িত হইতেছে, জ্ঞানী কিন্তু তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তিনি কর্ম্ম করিয়াও ইন্দ্রিয়-বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি জ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত পুরুষ বিন্দুমাত্র রাগদ্বেষেরও বশীভূত হন না? আর যদি তাঁহাদেরও রাগদ্বেষ সম্ভব হয়, তবে তাহারা কিরূপ মুক্ত পুরুষ?

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অজ্ঞান সম্ভূত। এই অজ্ঞান কি? "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপংযদ্‌কিঞ্চিৎ" এই অজ্ঞান সৎও নহে অসৎও নহে ইহাকে সৎ বলিয়া স্বীকার করা যায় না কারণ অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত বস্তুর ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই; ইহাকে অসৎও বলা যায় না, কারণ ইহা শশকের শৃঙ্গ, অশ্বের ডিম্ব, বা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় আত্যন্তিক অবস্তু নহে। যখন ইহার

প্রভাবেই জগৎ পরিদৃশ্যমান তখন ইহাকে সম্পূর্ণ "অভাব" বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। আবার ত্রৈকালিক অস্তিত্ববিহীন হওয়ায় সম্পূর্ণ "ভাব"ও নহে। সুতরাং ইহা বাক্যের অতীত অনির্ব্বচনীয় ভাবরূপ। এই অনির্ব্বচনীয় ভাব সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ সম্বলিত, কারণ অজ্ঞান সম্ভূত প্রত্যেক তথাকথিত বস্তুরই এই তিনগুণ আছে। এই অজ্ঞান এক, অনেক, সমষ্টি, ব্যষ্টি-ভাবাপন্ন। যেরূপ বৃক্ষের 'সমষ্টি' বলিলে বন বুঝায়, জলের সমষ্টি বলিলে জলাশয় বুঝায়, অজ্ঞানও তদ্রূপ। ব্যষ্টি অজ্ঞান বলিলে জীবগত পৃথক পৃথক অজ্ঞান; এবং সমষ্টি অজ্ঞান এই সমস্ত অজ্ঞানের যোগফল-স্বরূপ-বিশেষ। তবে সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে পার্থক্য এই—সমষ্টি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট। কেন না নির্বিকল্প সচ্চিদানন্দরূপ চৈতন্যকে দর্পণ কল্পনা করা গেল; যাবতীয় তথাকথিত সৃষ্ট পদার্থ ইহাতে প্রতিফলিত মনে করা যাউক; একটি একটি করিয়া যখন দর্পণের সম্মুখে লইয়া যাওয়া গেল তখন একটি একটিরই স্বরূপ দেখিতে পাওয়া গেল, অর্থাৎ একটি একটি সম্বন্ধেই জ্ঞান হইল। এইরূপে যদি দর্পণটিকে এরূপ বৃহৎ কল্পনা করা যায় যে তাহাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত হইতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেরই স্বরূপ প্রকটিত হইল; অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধি-জ্ঞানের বিকাশ হইল। সত্ত্বগুণই জ্ঞানপ্রসূ। চৈতন্যে ব্যষ্টি অজ্ঞান প্রতিফলিত হইলে অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞানেরই বিকাশ হয়; সুতরাং শাস্ত্রকারেরা ইহাকে "মলিনসত্ত্বপ্রধানা" বলিয়াছেন। সমষ্টি অজ্ঞান চৈতন্যে প্রতিফলিত হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেরই জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় ইহাকে "বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা" বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ দুইটি শক্তি আছে। আবরণ-শক্তির প্রভাবে আমরা প্রকৃত কি উপলব্ধি করিতে পারি না কেবল স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব করি। "সোঽহং", "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই তিন মহা-বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই আবরণ শক্তিকে মহামায়ার প্রভাব বলা যায়। ইহার প্রভাবেই জগতের অস্তিত্ব; বাস্তবপক্ষে জগৎ "তাসের কেল্লা" মাত্র। প্রকৃত জ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক আবরণশক্তির ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপ লোপ পায়। অভিনয়ের পট উত্তোলন করিলে অভিনেতৃগণ যেরূপ পরি-দৃশ্যমান হন ইহাও তদ্রূপ। জ্ঞানীর আত্ম-জ্ঞান হওয়াতে আবরণশক্তি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে বটে কিন্তু বিক্ষেপশক্তি তখনও কার্য্যকারী থাকিবে। বিক্ষেপশক্তি অজ্ঞানলেশ-কথিত হইয়া থাকে। আবরণশক্তি যেরূপ আত্মজ্ঞানবিরোধি, বিক্ষেপশক্তি তদ্রূপ নহে। এই বিক্ষেপশক্তি বা অজ্ঞানের লেশমাত্রের জন্যই আভাসমাত্র রাগদ্বেষ বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানবান পুরুষে এই আভাসমাত্র রাগদ্বেষেরই অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। এই আভাসমাত্র রাগদ্বেষ প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের অনুকুল; অর্থাৎ এই আভাসমাত্র রাগদ্বেষ দ্বারাই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; ধর্ম্মাধর্ম্মই পুনর্জ্জন্মের হেতু, কিন্তু জ্ঞানী ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। তৎকৃত কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের

সৃষ্টি হয় না। তিনি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ফলভোগের জন্য। এই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হয়; যেরূপ ভর্জিত কলা ভক্ষণে তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু উহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানীর এইরূপ কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্মের সৃষ্টি হয় না।

অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তিবলে যে আভাসমাত্র রাগদ্বেষের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে ইহার নাম বাধিতানুবৃত্তি। আত্মজ্ঞান দ্বারা রাগ দ্বেষ বাধিত হয় বলিয়াই শাস্ত্রকারেরা ইহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলিয়াছেন। যেরূপ অতিবেগবান্ অশ্বের গতি নিপুণ অশ্বচালক রোধ করিয়া অশ্বকে অতি মৃদুগতিতে চলিতে বাধ্য করেন, সেইরূপ জ্ঞানীও রাগ দ্বেষকে সংযত করিয়া ফেলিয়া অতি মৃদু অবস্থাতে আনয়ন করেন। এই মৃদু অবস্থাই অজ্ঞানলেশসম্ঘটিত।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবানকে জ্ঞানীর লক্ষণ বিষয়ে প্রশ্ন করায় ভগবান নিম্নলিখিত শ্লোক সমূহ দ্বারা জ্ঞানীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন ঃ—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ।"

জ্ঞানীর মনোগত অভিলাষ দূর হইয়া যায়। আত্মার দ্বারা আত্মায় তুষ্ট হইয়া থাকেন; অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণশক্তি তাহার উপর কার্য্যকরী না হওয়ায় তাঁহার বিষয়বাসনা থাকে না। "তিনি কি ?" তাঁহার উপলব্ধি হওয়ায় তিনি যে আত্মাস্বরূপ তাহা বুঝিতে পারেন। এরূপ জ্ঞানী দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখেও স্পৃহাহীন; তিনি অনুরাগ, ভয়, ক্রোধের অতীত, সকল বিষয়েই মমতাশূন্য, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না। কচ্ছপ যেরূপ স্বীয় অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া রাখে সেই রূপ জ্ঞানীও ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে দূরে রাখেন; অর্থাৎ বিক্ষেপশক্তি বা অজ্ঞতালেশের প্রভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ঐ কর্ম্মসমূহ প্রারব্ধজনিত, ভোগ সমাপ্তির অনুকূল মাত্র। ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান প্রযুক্ত রাগদ্বেষের বশীভূত হন না।

এখন দেখা যাউক, এরূপ জ্ঞানলাভের অধিকারী কে ? যিনি বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া তাহার স্থূল মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইহজন্মে অথবা জন্মান্তরে কাম্য ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন এবং অতি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া চারিপ্রকার সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি বেদান্ত আলোচনা দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী। কাম্য কর্ম্ম কি ? স্বর্গ বা অন্যান্য সুখলাভের কামনায় যে সমস্ত কার্য্য করা যায় উহাই কাম্য কর্ম্ম; যেরূপ জ্যোতিষ্টোম রাজসূয় যজ্ঞ, ইত্যাদি। যে সকল কর্ম্ম করিলে নরকগামী হইতে হয়; তজ্জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্মের নিষেধ আছে উহাই নিষিদ্ধ কর্ম্ম; যেরূপ ব্রহ্মহত্যা। কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাজ্য

বলিয়াই যজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য হইবে এমন নহে। ভগবান বলিয়াছেন—

"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপাঃ যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

দেবগণ—যজ্ঞসমূহের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্ট্যাদি দ্বারা মানবসমূহকে অভীষ্ট ভোগ দান করেন; অর্থাৎ বৃষ্টি না হইলে শস্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। শস্যাদি উৎপন্ন না হইলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহে সহায়তার জন্য দেবতারা সততই যত্নবান কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহাদের না দিয়া ভোগ করি, তবে আমরা পরস্বাপহারক বই আর কি? যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যিনি কেবল আপনার জন্যই পাক করেন অর্থাৎ পক্ব দ্রব্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে অর্পণ না করিয়া নিজেই ভক্ষণ করেন, তিনি পাপকেই ভোজন করেন। আবার দেখা যাইতেছে অন্নই শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া ভূতসমূহ সৃষ্টি করিতেছে। বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি; বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন। কর্ম্মের উৎপত্তি বেদ হইতে, বেদ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহলোকে যিনি এরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুসরণ না করেন তাঁহার জীবন পাপময় তিনি বৃথাই জীবিত থাকেন। অতএব যজ্ঞ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। ফলাকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী হইলেও কামনাবিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মনকে ভগবদভিমুখী করিতে হইবে। ইহা (নিষ্কাম যজ্ঞানুষ্ঠান) আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ-সাধন। এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান স্বর্গাদি কামনাহীন। এইরূপ অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণাবিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন।"

এখানে বেদানুবচন বলিতে বেদের অধ্যয়ন, যজ্ঞে বলিতে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, দান বলিতে যজ্ঞে ধনাদি দান, তপঃ বলিতে হিতকারী ও পবিত্র অন্নভোজন; সুতরাং এই তপঃ "অনাশকেন" বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়াছে। হিতকারী ও পবিত্র অন্নের দ্বারা শরীররক্ষা হয় বলিয়া ইহাকে "অনাশক" বলা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা "তপসা" শব্দকে অনাশকেন শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট না করিয়া 'নাশকেন' দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন। উহা করিলে তপের অর্থ শরীর ক্ষীণকারী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি তপঃ অথবা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক দেহত্যাগরূপ তপঃ বুঝিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকারের মতে এরূপ তপঃ কলিযুগে নিষিদ্ধ। উক্ত শ্লোকে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারীকে অবশ্যই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নিত্যকর্ম্ম দ্বারা সন্ধ্যা বন্দনাদি বুঝিতে হইবে। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাপক্ষয় হয়। নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যে কর্ম্ম কোন

নিমিত্ত উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, যথা পুত্রেষ্টি-যাগ, জাতকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, যে সমস্ত কর্ম্ম কেবল পাপনাশের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। উপাসনা অর্থে কেবল সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। উল্লিখিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হইলে এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হইয়া একাগ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া বেদান্ত আলোচনার অধিকারী হইতে পারা যাইবে। সাধনচতু-ষ্টয় অর্থে—

১। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার;
২। ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগে বিরাগ;
৩। শম দমাদি ছয় প্রকার গুণের অভ্যাস;
৪। মুমুক্ষু হওয়া।

নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার কি? ব্রহ্মই নিত্যবস্তু অন্য সব অনিত্য এইরূপ বিবেচনা করা। শমদমাদি কি? শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা। 'শম'—শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অনুপযোগী বিষয় হইতে মনের নিগ্রহ। "দম"—আত্ম-জ্ঞানের বিরোধী বিষয় হইতে বাহেন্দ্রিয়গণের দমন। বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হইলেও যাহাতে পুনর্ব্বার ইহার উদয় না হয় এরূপ বিধান করা। অথবা বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্ম পরি-ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ। ইহারই নাম উপরতি। "তিতিক্ষা" অর্থে শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা বুঝায়। "সমাধান"—আত্মাতে চিত্তের একাভিনিবেশ উৎপাদন। শ্রদ্ধা—গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস। মুমুক্ষত্ব—মোক্ষেচ্ছা।

কিন্তু হায়, আমাদের দেশের তথাকথিত অদ্বৈতবাদী সাধু সম্প্রদায় মধ্যে কয়জন উপ-রোক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান এবং সগুণব্রহ্মের উপাসনা পূর্ব্বক সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া একাগ্রাবস্থা হইয়া-ছেন। তাঁহারা বলিতে পারেন পূর্ব্বজন্মেই তাঁহারা অধিকারীর সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের আর এ জন্মে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেরূপ শুদ্ধচিত্তের লক্ষণ কি তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? আর এরূপ শুদ্ধচিত্ত হওয়া কি মুখের কথা?

পুরাকালে বেদান্ত আলোচনায় অধিকার ভিক্ষুসম্প্রদায়েরই ছিল। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ সমাপন না করিয়া কেহই ভিক্ষু হইতে পারিতেন না। তখন উক্ত আশ্রমত্রয়দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, বেদান্ত আলোচনার অধি-কারী হইতে পারা যাইত। দুই একটি মাত্র ক্ষণজন্মা পুরুষকেই কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্য হই-তেই চতুর্থাশ্রমের অধিকারী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা এক্ষণে এই আশ্রমসমূহের প্রথমটির কর্ত্তব্য পালন না করিয়াই বাসনার বোঝা মস্তকে লইয়া বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া বসি। তাই আমা-দের এত দুর্দ্দশা, এত অবনতি। শুধু হৃষিকেশের কেন সমগ্র সাধুমণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা এই। দুই একটি প্রকৃত সাধু থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু উহা বর্ত্তমান সমগ্র সাধু-মণ্ডলীর অনুপাতে নগণ্য মাত্র।

যাবতীয় জীবই কর্ম্মের অধীন, কি নিকৃষ্ট কি উৎকৃষ্ট সকলেই কর্ম্মজালে আবদ্ধ। ইহার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই; প্রার-ব্ধের তারতম্যানুসারে কৃতকর্ম্মেরও তারতম্য

হইয়া থাকে, বিশেষ এই মাত্র। স্বয়ং ভগবানই যখন নিস্তার পান নাই, তখন আমাদের কা কথা। তিনিই বলিতেছেন—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

হে পার্থ, আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য ও কিছুই নাই তথাপি আমিও কর্ম্মে ব্যাপৃত। পশু পক্ষী, সামান্য মানব হইতে রাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই এই বিষয় বাত্যায় ঘূর্ণায়মান। তবে কি উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে পার্থক্য নাই সকলেরই গতি কি গড্ডলিকা-প্রবাহানুরূপ? না, তাহাই বা কিরূপে হইবে, তাহা হইলে ক্রমোন্নতিসম্ভূত মনুষ্য-জন্ম বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়?

পরিদৃশ্যমান জগৎ পণ্যদ্রব্যের বিপণিশ্রেণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ঈপ্সিত দ্রব্য লাভের জন্য এই হাটে বেচাকেনা করিতেই হইবে; ক্রয়বিক্রয়ের প্রয়োজনান্ত পর্য্যন্ত পণ্যবীথিকার অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। জীবের প্রয়োজন সাধনোপযোগী পণ্যের জন্য বিপণির পথ পূতি-গন্ধপূর্ণ হইলেও তথায় না আসিয়া উপায়ান্তর নাই। ঈপ্সিত দ্রব্য লাভের জন্যই কোলাহল-পূর্ণ জগতের সৃষ্টি। সকলেই আপন আপন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছে। আকাঙ্ক্ষা অতি স্থূল হইতে স্থূল স্থূল হইতে সূক্ষ্ম. সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া জীব জগতে উচ্চ নীচ স্তরের অবতারণা করিয়া দিতেছে।

যাবতীয় জীব যেন কি একটা হৃত বস্তুর পুনরুদ্ধারের জন্য ইতস্ততঃ সংমুগ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। একটা কিছু লাভ করিয়া কিছু দিন উহা নাড়াচাড়া করিতেছে। বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় নূতন বস্তু লাভে যত্নবান হইতেছে—উহাতেও পরিতৃপ্তি নাই, নূতন নূতন কামনা আসিয়া জীবকে স্বতঃই মথিত, উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে, কিছুতেই শান্তি নাই—বাসনার অন্ত নাই। নিম্নশ্রেণীর জীব-সমূহ নিম্নস্তরসুলভ বাসনার অধীন। মানব ক্রমোন্নতজীবসুলভ কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত বাসনার তরঙ্গাভিঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। এই অশান্তি হইতে পরিত্রাণলাভ মানবের অনেকটা সাধ্যায়ত্ত। এই জন্যই প্রকৃত শান্তিলাভের সোপান এই মানব-জন্ম "দুর্লভ মানবজন্ম" নামে কথিত হইয়া থাকে। মানব বৈরাগ্যবলে শান্তির অধিকারী হইতে পারে সত্য—কিন্তু এই বৈরাগ্য কয়জন লাভ করিতে পারেন? ইহা কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। অতি ভাগ্য-বান্ পুরুষই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইতে পারেন। আমরা সর্ব্বদাই ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহ এবং প্রবল আততায়ী-বৃন্দ হইতে সতর্ক থাকি কিন্তু নিয়ত যে এতদ-পেক্ষা সহস্রগুণ পরাক্রান্ত রিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কি উপায় করিয়া থাকি? আমরা অবিদ্যার মোহে এরূপ মুহ্যমান যে ক্ষণেকের জন্য জ্ঞানের উদয় হইলেও পরক্ষণই পুনরায় সংসারপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়ি। সংসারসমুদ্রে সকলেই শান্তি-মণি লাভ করিবার জন্য বারিধি আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছে। অতি ভীষণ হাঙ্গর-কুম্ভীর-সমাকীর্ণ প্রকৃত স্থানে উপনীত হইতে পারি-তেছে না। এই দুরন্ত শত্রুগুলাকে স্বস্থান-চ্যুত করিবার প্রয়াস কাহারও নাই; সে

প্রয়ত্নের শক্তিও নাই, শক্তি সাধনার চেষ্টাই বা কোথায়? এইতো বর্ত্তমান মানবসমাজ। পার্থিব বিজ্ঞান রসায়নের উৎকর্ষ সাধন প্রযুক্ত নিত্য নূতন নকলমণি মানব সমাজকে বিভূষিত করিয়া ক্ষণকালের জন্য মোহিত করিতেছে কিন্তু সহস্র উদ্যমেও হৃদয়ের তমোনাশী সেই অমূল্য রত্ন লাভ হইতেছে না। জগৎ নায়কবিহীন নৌ-সেনায় পরিণত হইয়াছে। বাহিনী সততই জয়লাভোদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত, কিন্তু সেনাপতিবিহীন বিপুল অনীকিনীকে কে প্রকৃত পথে চালনা করিবে? যে অদিতিনন্দনেরা দুরন্ত সমরে জয়লাভ করিয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহারাও নকলমণির আপাতঃ অসার জ্যোতিতে প্রলুব্ধ হইয়া অমূল্য সম্পত্তি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মবিস্মৃত সাধারণ মানবের সহিত আত্মশক্তি বিলীন করিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় মনীষিরা স্বদেশবাসীকে দুর্দ্দমনীয় শত্রুযুদ্ধে জয়ী করিবার জন্য মাতৃগর্ভ হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহী অবিশ্রান্ত শক্তিসঞ্চার প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমগ্র চেষ্টা মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন মন্বাদি শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের গ্রন্থসমূহের প্রতিপত্রে, প্রতিছত্রে এই শিক্ষারই চূড়ান্ত প্রয়াস। সার্ব্বভৌম নরপতি হইতে অতি দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলকেই একই অনুশাসনের অধীন হইয়া উন্নতিসোপানারোহণে প্রবৃত্ত হইতে হইত, নতুবা তাঁহারা সমাজে পতিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া যশঃ সম্মান হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। কি ধনী, কি নির্ধন বাল্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। বিলাস সর্ব্বোন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ ও পাপ-প্রসূ ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যবংশীয়দিগের শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁহারা সততই সুকুমার বালক বালিকাবৃন্দকে ইহা হইতে দূরে রাখিতেন। আদর্শ শিক্ষকেরা ত্যাগের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে গঠিত হইতেন। শিক্ষকের আদর্শেই ভবিষ্য বংশের চরিত্র গঠিত হইত। যত দিন সমাজ এই সুনিয়মে পরিচালিত তত দিন ভারত জগতের আদর্শ ছিল, তত দিন ভারতে লক্ষ্মী বিরাজমানা ছিলেন, তাই আমরা এই যুগে ব্যাস, বাল্মিকী, ভীম, অর্জ্জুন, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সূর্য্য চন্দ্রে ভারতগগণ উদ্ভাসিত দেখিয়াছিলাম। সনাতন আচার শিক্ষা পদ্ধতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য জাতির অবনতির সূচনা, আমরা সেই অবনতির নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। যে ভারত এক কালে সমগ্র জগতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহারই সন্ততিগণ এক্ষণে দীন হীন, পরমুখাপেক্ষী। ভারত চিরদিনই দেবের লীলাভূমী তাই বুঝি অমর ভারত মরিয়াও জীবিত, তাই এ দুর্দ্দিনেও তমসাচ্ছন্ন নিশাতে দুই একটা তারা ভারতগগণে উদিত হইয়া ভারতবাসীর স্মৃতিপটে তাহার গৌরবময় দিনের স্মৃতি জাগরুক করিয়া দিতেছে। ভারত মাতা যেন ভারতসন্তানের কর্ণকুহরে বলিতেছেন—

—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

আমরা এত দিন পথহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম কোন স্বর্গীয় শক্তি যেন আমাদের মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমরা যেন জগতে আমাদের কি স্থান

বুঝিতে পারিয়াছি। জগত যেন সোৎসুক-নেত্রে পরম পদার্থের জন্য ভারতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পতিত ভারতবাসী বুঝিয়াছে ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ; সমগ্র প্রাচ্য প্রতীচ্যে শান্তিরাজ্য স্থাপনই তাহার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। এই আদর্শে পুনরুজ্জীবিত হইয়া ভারত সন্তান কর্ত্তব্যের গুরুভার মস্তকে লইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। এই ঐশ্বরিক শক্তিবলেই বাঙ্গালা ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনাক্ষেত্র হইতে চলিতেছে। এই শক্তিরই প্রভাবে সংসারাবদ্ধ সামান্য মানব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ব্যগ্র হইতেছে। ভারতের এই সুদিনে মাদৃশ অধম সন্তান ও জীবনের আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করিল। এত দিন জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে পারিতে-ছিলাম না; সহসা কর্ত্তব্যের পথ যেন সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিলাম। বাল্যকাল হইতেই বড় আশা ছিল জ্ঞানলাভ করিয়া মানসিক তমঃ দূর করিব সে আশা ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া হৃদয়েই লীন হইতেছিল, না হইবেই বা কেন —"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ।" মানব মনে সময়ে সময়ে আত্মোন্নতির ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু ইহা ক্ষণস্থায়ী হইয়া সংসারের কোলাহলে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যায় এই জন্যই ভগবান রামকৃষ্ণ সংসারীজীবকে সময়ে সময়ে কোলাহলপূর্ণ সংসার হইতে নির্জ্জনে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হইতে বলিয়াছেন। আমার বাল্যকাল হইতেই দেশ-ভ্রমণের বাসনা ছিল এখনও আছে, মানসিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই বাসনা ও তাহার প্রভাব বিস্তার করিল। আমিও এই সুযোগ অবহেলা না করিয়া দেশভ্রমণে কৃতসংকল্প হইলাম। ইচ্ছা হইল পার্থিব সম্বল বিহীন হইয়া সর্ব্বশক্তিমানকে একমাত্র সম্বল করিয়া বাহির হই। মানবের সুইচ্ছায় কণ্টক অনেক, দেশভ্রমণে কৃতসংকল্প হইয়াছি বটে কিন্তু বাধাও অনেক জুটিতে লাগিল। যাহা হউক ভগবদনুগ্রহে সমস্ত বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ১৩১৬ সালের মাঘ মাসের শেষভাগে কলিকাতা হইতে বাহির হইলাম। স্থির করিলাম ৺ কাশীধাম হইয়া হরিদ্বার যাইব, পরে কি করিব কিছুই স্থির নাই, মনে করিলাম—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" হরিদ্বারের দারুণ শীত হইতে শরীর রক্ষার জন্য দুইখানি কম্বল একখানি গাত্রবস্ত্র ও দুইখানি পরিধান বস্ত্র ও হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেলভাড়া ইহাই সম্বল লইলাম। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বৈকালের একটা ট্রেণে কলি-কাতা ত্যাগ করিয়া ৺ কাশীধাম চলিলাম। সমস্ত রাত্রি গাড়িতে কাটিয়া গেল পরদিন বেলা দশটার সময় রাজঘাট ষ্টেসনে পহুছিয়া এক্কা ভাড়া করিয়া কাশীর ভিতর চলিলাম। আমার জনৈক বন্ধু বাঙ্গালি টোলায় থাকিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছিলেন তাঁহারই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া তাঁহার বাসা পাইলাম বটে কিন্তু শুনিলাম তিনি দুই তিন দিবস হইল বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আমার বন্ধুর পরিচিত জনৈক বাঙ্গালি যুবকের সহিত এস্থানে পরিচয় হইল। আমার বন্ধু ইহাঁর সহিত একত্রে বাস করিতেছিলেন ইনি আমার কথা ইতিপূর্ব্বেই বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলেন, আমাকে অতি আগ্রহের সহিত

দ্বিতলের একটী ঘরে লইয়া যাইলেন এবং বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। তিনি আমার বন্ধুকে ডাকিতে গেলেন আমার বন্ধুও আমার সংবাদ পাইয়া সত্বর আসিলেন। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর আমি গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম। মধ্যাহ্ন অতীত হওয়ায় আর ভাতের হাঙ্গাম করা গেল না জলযোগ করিয়া বন্ধু ও বন্ধুর পরিচিত বাঙ্গালিযুবকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ আলাপের পর বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গত রাত্রের অনিদ্রাজনিত শ্রান্তি দূরোপলক্ষে দিবানিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দুই তিন ঘণ্টার সুনিদ্রায় শ্রান্তিদূর হইল; বন্ধুবর বাসায় গিয়াছিলেন তিনিও আসিলেন। দুজনে ভ্রমনে বহির্গত হইলাম। সন্ধ্যার সময়ে বাঙ্গালিটোলাস্থ কোন বৃদ্ধা বিধবা ব্রাহ্মণীর গৃহে আহার করা স্থির হইল। আমার পরিচিত বাঙ্গালি যুবক যে সময় প্রথমে কাশী আসেন সে সময়ে ব্রাহ্মণী যে বাটীতে বাস করিতেছিলেন, তাহারই উপর তালায় বাসা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যুবকটী সে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন কিন্তু রন্ধন কার্য্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন না সুতরাং স্বহস্তে পাক করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইত। ব্রাহ্মণী ইহাঁর কষ্ট দেখিয়া দয়াপরবশ হন এবং তাঁহাকে তাঁহার নিকট আহার করিতে বলেন সেই হইতে ইহাঁর গৃহেই আহার করিতেছেন। বিধবা ব্রাহ্মণীর আর্থিক অবস্থা ভাল নহে বাঙ্গালি যুবক ইহাকে মাসিক সাড়ে পাচ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন। যুবকের প্রস্তাবেই যে কয়েক দিবস কাশীতে থাকি ব্রাহ্মণীর গৃহেই আহার করিব স্থির করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়।

সংবাদ।

পারিতোষিক বিতরণ।—গত ১৭ই চৈত্র কলিকাতা ট্রেনিং ও মডেল-স্কুলের এবং ২২এ চৈত্র ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের উপযুক্ত ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। শেষোক্ত বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণের পর সূক্ষ্ম-শিল্পের প্রদর্শনী উদ্বোধন হইয়াছে।

শোক সংবাদ।—বিখ্যাত "গঙ্গা-গোবিন্দ"-বংশের মুখোজ্জ্বলকারী কুমার শরচ্চন্দ্র ইহজগতে আর নাই। গত ১৪ইচৈত্র বুধবার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া তিনি অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। কুমার শরচ্চন্দ্র ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম যেমন শরচ্চন্দ্র, তাঁহার চরিত্রও সেইরূপ নির্ম্মল ছিল। তিনিই উপযুক্ত পিতা প্রতাপচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত যাঁহার একবার পরিচয় হইয়াছে, তিনিই তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।"

(বসুমতী)

গৃহস্থ-পঞ্জিকা।

সন ১৩১৯ সাল।

শকাব্দা ১৮৩৪। খ্রী ১৯১২-১৩ অব্দ।

হরিনাভি জ্যোতিষ চতুষ্পাঠী হইতে উদ্ভাবিত।

মাস	দিন	মাস আরম্ভ	১, ৮, ১৫, ২২, ২৯	২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০	৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১	৪, ১১, ১৮, ২৫, ৩২	৫, ১২, ১৯, ২৬, *	৬, ১৩, ২০, ২৭, *	৭, ১৪, ২১, ২৮, *	ইংরাজী মাস আরম্ভ	পূর্ণিমার নিশিপালন	অমাবস্যার নিশিপালন	একাদশীর উপবাস
বৈশাখ	৩০ দিন	বৈশাখ আরম্ভ ১৯১২, ১৪ই এপ্রেল	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	মে মাস আরম্ভ ১৮ই বৈশাখ	১৭ই	৩রা	১৪ই, ৩০এ
জ্যৈষ্ঠ	৩২ দিন	জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ ১৯১২, ১৪ই মে	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	জুন মাস আরম্ভ ১৯এ জ্যৈষ্ঠ	১৭ই	৩রা। ৩২এ	১৪ই, ২৯এ
আষাঢ়	৩২ দিন	আষাঢ় আরম্ভ ১৯১২, ১৫ই জুন	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	জুলাই আরম্ভ ১৭ই আষাঢ়	১৪ই	২৯এ	১১ই, ২৬এ
শ্রাবণ	৩১ দিন	শ্রাবণ আরম্ভ ১৯১২, ১৭ই জুলাই	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	আগষ্ট আরম্ভ ১৬ই শ্রাবণ	১২ই	২৭এ	৮ই, ২৪এ
ভাদ্র	৩১ দিন	ভাদ্র আরম্ভ ১৯১২, ১৭ই আগষ্ট	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	সেপ্টেম্বরারম্ভ ১৬ই ভাদ্র	১১ই	২৫এ	৭ই, ২২এ
আশ্বিন	৩০ দিন	আশ্বিন আরম্ভ ১৯১২, ১৭ই সেপ্টেম্বর	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	অক্টোবরারম্ভ ১৫ই আশ্বিন	৯ই	২৩এ	৬ই, ২১এ
কার্ত্তিক	৩০ দিন	কার্ত্তিক আরম্ভ ১৯১২, ১৭ই অক্টোবর	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	নবেম্বরারম্ভ ১৬ই কার্ত্তিক	৯ই	২৩এ	৫ই, ২০এ
অগ্রহায়ণ	৩০ দিন	অগ্রহায়ণ আরম্ভ ১৯১২, ১৬ই নবেম্বর	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	ডিসেম্বরারম্ভ ১৬ই অগ্রহায়ণ	৯ই	২৩এ	৫ই, ১৯এ
পৌষ	২৯ দিন	পৌষ মাস আরম্ভ ১৯১২, ১৬ই ডিসেম্বর	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	খ্রী ১৯১৩ অব্দারম্ভ ১৭ই পৌষ	৮ই	২২এ	৫ই, ১৯এ
মাঘ	৩০ দিন	মাঘ মাস আরম্ভ .৯১৩, ১৪ই জানুয়ারী	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	ফেব্রুয়ারী আরম্ভ ১৯এ মাঘ	৯ই	২৩এ	৫ই, ১৯এ
ফাল্গুন	২৯ দিন	ফাল্গুন আরম্ভ ১৯১৩, ১৩ই ফেব্রুয়ারী	বৃহ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	মার্চ্চ আরম্ভ ১৭ই ফাল্গুন	৮ই	২৩এ	৫ই, ১৯এ
চৈত্র	৩১ দিন	চৈত্র মাস আরম্ভ ১৯১৩, ১৪ই মার্চ্চ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	এপ্রেল আরম্ভ ১৯এ চৈত্র	৯ই	২৪এ	৫ই, ২০এ

এই সংক্রমণ কিন্তু সায়ন-সংক্রমণ; অর্থাৎ যে দিনের সূর্য্যস্ফুটে তদ্দিনের অয়নাংশ যোগ করিলে অংশ সংখ্যা শূন্য হয় সেই দিনের দিনমান। যেমন মনে কর, কোন বর্ষে পৌষারম্ভে অয়ন ২২ অংশ ১৮ কলা, ঐ বর্ষের পৌষের যে তারিখে রবির নিরয়নস্ফুট ৮ রাশি ৭ অংশ ৪২ কলার কাছাকাছি হইবে, (অর্থাৎ সম্ভবতঃ ৮ই পৌষ,) উল্লিখিত দেশে সেই দিন সায়ন মকর-সংক্রমণ দিন হইবে এবং সেই দিনই ঐ দেশে ২৬ দণ্ড ২৭ পল দিনমান হইবে। আবার পূর্ব্ব মাসে ঐরূপ সময়ে সায়ন ধনুসংক্রমণের দিনে, ২৭ দণ্ড দিনমান হইবে। এই উভয় তারিখের অন্তর যত দিন, ২৭ দণ্ড ও ২৬ দণ্ড ২৭ পলের অন্তরের (২৭।০—২৬।২৭ = ০।৩৩ পলের) তত ভাগের এক ভাগ সেই দিন হইতে প্রত্যহ কমিবে অর্থাৎ প্রত্যহ এক পলের কিছু বেশী কমিবে। এইরূপে প্রাত্যহিক দিনমান নির্ণীত হইতে পারিবে। এই দিনমানের অর্দ্ধেকের পরিমান যত দণ্ডাদি হইবে, তাহাকে ঘণ্টাদি করিলে অস্তকাল পাওয়া যাইবে। ঐ অস্তকালকে ১২ ঘণ্টা হইতে বাদ দিলে উদয়কাল হইবে। অবশ্য এ সকলই স্ফুট-কাল।

আমি। "তা যেন হলো। কিন্তু ঐ পলভ বা দেশান্তর পাই কোথায়?"

গুরু। "কেন? মানচিত্রের সাহায্যে?"

আমি। "মানচিত্রে ত সকল স্থানের নাম পাওয়া যায় না।"

গুরু। "বঙ্গদেশের একখানা বড় বা মাঝারি মানচিত্র থাকা চাই। স্থানটা তাতে লেখা না থাকিলেও—যিনি সে জায়গাটা কোথায় জানেন, তিনি ঐ মানচিত্রে তাহার আনুমানিক স্থান নির্দ্দেশ করতে পারিবেন সন্দেহ নাই। তার পর সেই স্থানটি মানচিত্রের একটি অক্ষাংশ-রেখার কত উপরে বা নীচে এবং কোনও দেশান্তর রেখার কত পূর্ব্বে বা পশ্চিমে পরিমাণ করিয়া প্রতি মাইলে ৫২.৩ বিকলা অক্ষাংশ অন্তর এবং প্রতি ১৬ মাইলে ১৫ কলা দেশান্তর ধরিলে বড় বেশী অন্তর হইবে না। তাহা দ্বারাই অনায়াসে বেশ সূক্ষ্মভাবে গণনা করা যাইবে। অন্যান্য জটিল উপায়ের কথা এর পর বলা যাইবে। আপাততঃ আমার এই খাতাখানা থেকে কতকগুলি স্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর লিখিয়া লও।"

আমি "আচ্ছা তাই করছি।" এই বলিয়া নিম্নলিখিত তালিকাটি লিখিয়া লইলাম।

(অক্ষাংশাদি সারিণীর অধিকাংশই আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ ভট্টাচার্য্য M. A. মহাশয় হণ্টারের গেজেটিয়ার হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কয়েকটি স্থানের অক্ষাংশাদি, মানচিত্র-সাহায্যে তত্তৎ স্থান-জাত জাতকের কোষ্ঠীর জন্য অনুপাত দ্বারা স্থূলভাবে নির্ণীত হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণীত হইলে যে পার্থক্য হইবে, তদ্দ্বারা কোষ্ঠীর অঙ্কে ইতর বিশেষ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।)

এই সারিণীতে দেশান্তর গ্রীণিচের "পূ" পূর্ব্বে "প" পশ্চিমে অংশাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৫ অংশে এক ঘণ্টা হিসাবে ঘণ্টাদি নির্ণয় করিলে যত ঘণ্টাদি নির্ণীত হইবে, পূর্ব্বস্থিত দেশে গ্রীণিচ মধ্যাহ্নে, তত ঘণ্টাদি অপরাহ্ণ এবং পশ্চিমস্থিত দেশে তত ঘণ্টাদি পূর্ব্বাহ্ণ বুঝিতে হইবে। অক্ষাংশগুলি উ চিহ্নিত হইলে বিষুবতের উত্তর এবং দ চিহ্নিত হইলে বিষুবতের দক্ষিণস্থিত বুঝিতে হইবে। কেবল অংশ ও কলা প্রদত্ত হইল। কোষ্ঠীর জন্য তদপেক্ষা সূক্ষ্ম নিষ্প্রয়োজন।

অক্ষাংশাদি সারিণী

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর *
অমরপুর (ব্রহ্মদেশ)	...	২১।৫৫ উ	...	৯৬। ৭ পূ
" (নেপাল)	...	২৬।৫৮ "	...	৮৬।৫৯ "
" (বোম্বাই)	...	২১।৫৭ "	...	৭৩। ৪ "
অমরাবতী	...	২০।৫৬ "	...	৭৭।৪৮ "
অমৃতবাজার	...	২৩। ৯ "	...	৮৯। ৬ "
অমৃতসর	...	৩১।৩৮ "	...	৭৪।৫৫ "
অযোধ্যা	...	২৬।৪৮ "	...	৮২।১৫ "
আকায়াব	...	২৬।৪৫ "	...	৯২।৫৭ "
আগড়পাড়া	...	২২।৪১ "	...	৮৮।২৫ "
আগরতলা	...	২৩।৫১ "	...	৯১।২৩ "
আগরা	...	২৭।১০ "	...	৭৮। ৫ "
আঙ্গুল	...	২০।৪৮ "	...	৮৫। ১ "
আচিপুর	...	২২।২৭ "	...	৮৮।১০ "
আজমীঢ়	...	২৬।২৭ "	...	৭৫।৪৪ "
আজিমগঞ্জ	...	২৪।১৪ "	...	৮৮।১৮ "
আটক	...	২৩।৪২ "	...	৮৭। ১ "
আটিয়া	...	২৪।১২ "	...	৮৯।৫৩ "
আমতা	...	২২।৩৫ "	...	৮৮। ৯ "
আরঙ্গাবাদ (অযোধ্যা)	...	২৭।৪৭ "	...	৮৩।২৭ "
" (বোম্বাই)	...	১৯।৫২ "	...	৭৫। ৮ "
আরা	...	২৫।৩৩ "	...	৮৪।৪২ "
আরামবাগ	...	২২।৫৪ "	...	৮৮।২২ "
আর্কট	...	১২।৫৫ "	...	৭৯।২০ "
আলমডাঙ্গা	...	২৩।৪৬ "	...	৮৯। ০ "
আলাহাবাদ	...	২৫।২৬ "	...	৮১।৫৩ "
আলিপুর (২৪-পরগণা)	...	২২।৩২ "	...	৮৮।২৪ "
" (জলপাইগুড়ি)	...	২৬।৩০ "	...	৮৯।৩৮ "
আলীগড়	...	২৭।৫৬ "	...	৭৮। ৭ "
আসানসোল	...	২৩।৪২ "	...	৮৭। ১ "
ইছাপুর	...	২২।৩৬ "	...	৭৮।২৩ "
ইন্দোর	...	২২।৪২ "	...	৭৪।৫৪ "
ইংলিশবাজার	...	২৫। ০ "	...	৮৮।১০ "

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর
ঈশ্বরগঞ্জ	...	২৪।৪২ উ	...	৯০।৩৮ পূ
উজ্জয়িনী	...	২৩।১১ „	...	৭৫।৫২ „
উদয়পুর	...	২২। ৪ „	...	৮৩।৫০ „
উলুবেড়িয়া	...	২২।২৮ „	...	৮৮।১০ „
এটোয়া	...	২৬।৪৬ „	...	৭৯। ৩ „
এডিনবর্গ	...	৫৫।৫৭ „	...	৩।১১ প
এঁড়িয়াদহ	...	২২।৪০ „	...	৮৮।২৫ পূ
ঔরঙ্গবাদ (গয়া)	...	২৪।৪৪ „	...	৮৪।২৩ „
কটক	...	২০।২৯ „	...	৮৫।৫৫ „
„ লালবাগ	...	২০।২৮ „	...	৮৫।৫৪ „
কলিকাতা				
„ ৩৫ পার্ক ষ্ট্রীট	...	২২।৩৩ „	...	৮৮।২৪ „
„ গবর্ণমেণ্ট হৌস	...	২২।৩৪ „	...	৮৮।২৪ „
„ ফোর্ট উইলিয়ম ফ্লাগ		২২।৩৪ „	...	৮৮।২৩ „
„ ইটালি	...	২২।৩৩ „	...	৮৮।২৫ „
„ বেলিয়াঘাটা	...	২২।৩৩ „	...	৮৮।২৭ „
„ শিবাদহ	...	২২।৩৫ „	...	৮৮।২৬ „
কনোজ	...	২৭। ৩ „	...	৭৯।৫৮ „
কমিল্লা	...	২৩।২৮ „	...	৮৫।৩৮ „
করাচি	...	২৪।৫১ „	...	৬৭। ৫ „
কশবা (ত্রিপুরা)	...	২৩।৩৫ „	...	৮৫।৩৮ „
„ (বালিগঞ্জ)	...	২২।৩১ „	...	৮৮।২৬ „
কাটোয়া	...	২৩।৩৯ „	...	৮৮।১১ „
কাদিহাটী	...	২২।৩৯ „	...	৮৮।৩০ „
কানপুর	...	২৬।২৮ „	...	৮০।২৩ „
কাঁথী	...	২১।৪৭ „	...	৮৭।২৭ „
কান্দী	...	২৩।৫৮ „	...	৮৮। ৫ „
কামাখ্যা	...	২৬।১০ „	...	৯১।৪৫ „
কালীঘাট	...	২২।৩২ „	...	৮৮।২৩ „
কালনা	...	২৩।১৩ „	...	৮৮।২৫ „
কাশী	...	২৫।১৮ „	...	৮৩। ৮ „
কাশীপুর	...	২২।৩৮ „	...	৮৪।২৫ „
কাসিমবাজার	...	২৪। ৮ „	...	৮৮।১৯ „
কিশোরগঞ্জ	...	২৪।২৬ „	...	৯০।৫৩ „
কিষণগঞ্জ (পূর্ণিয়া)	...	২৬। ৬ „	...	৮৭।৫৩ „

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর
কুচবিহার	...	২৬।২০ উ	...	৮৯।২৯ পূ
কুড়িগ্রাম (রংপুর)	...	২৫।৫০ ,,	...	৮৯।৩৮ ,,
কুমারখালী	...	২৩।৫২ "	...	৮৯।১৭ ,,
কুরুক্ষেত্র	...	২৯।৫৯ "	...	৭৬।৪৮ "
কেন্দ্রাপাড়া	...	২০।৩০ "	...	৮৬।২৮ "
কৃষ্ণগঞ্জ	...	২৩। ২ "	...	৮৮।৪৬ "
কৃষ্ণনগর	...	২৩।২৪ "	...	৮৮।৩৩ "
কোটচাঁদপুর	...	২৩।৪৫ "	...	৮৮। ৩ "
কোতলপুর (বাঁকুড়া)	..	২৩। ১ "	...	৮৭।৩৮ "
কোন্নগর	...	২২।৪২ "	...	৮৮।২৩ "
কোয়েটা	...	৩০।১২ "	...	৬৬।৫৫ "
খড়দহ	...	২২।৪৪ ,,	...	৮৮।২৫ ,,
খাড়ি	...	২২। ৪ ,,	...	৮৮।২৯ ,,
খিদিরপুর	...	২২।৩২ ,,	...	৮৮।২২ ,,
খুরদা (উড়িসা)	..	২০।১১ ,,	...	৮৫।৩৯ ,,
খুলনা	...	২২।৪৯ ,,	...	৮৯।৩৭ ,,
গঞ্জাম	...	১৯।২২ ,,	...	৮৫। ৩ ,,
গড়বেতা	..	২২।৫২ ,,	...	৮৭।২৪ "
গয়া	...	২৪।৪৯ "	...	৮৫। ৩ "
গাইবাঁধা (রংপুর)	...	২৫।২১ "	...	৮৯।৩৯ "
গাজীপুর	...	২৫।৩৪ "	...	৮৩।৩৫ "
গার্ডেন রিচ	...	২২।৩২ "	...	৩৮।২২ "
গিধোড়	...	২৪।৫১ "	...	৮৬।১৪ "
গিরিধি	...	২৪।১২ "	...	৮৬।২৪ "
গুজরাট	...	৩২।৩৫ "	...	৭৪। ৮ "
গোকুল	...	২৭।২৬ "	...	৭৭।৪৭ "
গোপালগঞ্জ	...	২৬।২৮ "	...	৮৪।২৪ "
গোয়ালন্দ	...	২৩।৫০ "	...	৮৯।৪৬ "
গোয়ালপাড়া	...	২৬।১১ "	...	৯০।৪২ "
গোয়ালিয়র	...	২৬।১৩ ,,	...	৭৮।১২ "
গোরক্ষপুর	...	২৬।৪৪ "	...	৮৩।২৪ "
গোরাবাজার	...	২৪। ৫ "	...	৮৮।১৮ "
গোবিন্দপুর (২৪ পরগণা)		২২।২৪ "	...	৮৮।৩০ "
" (ছোটনাগপুর)	...	২৩।৫০ "	...	৮৬।৩৯ "
গৌড়	...	২৪।৫২ "	...	৮৮।১০ "

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর।
গৌহাটী	...	২৬|১১ উ	...	৯১|৪৮ পূ
গ্রীণিচ	...	৫১|২৯ „	...	০	০ ”
ঘাটাল	...	২২|৪০ „	...	৮৭|৪৬ „
চট্টগ্রাম	...	২২|২১ „	...	৯১|৫৩ „
চন্দননগর	...	২২|৫২ „	...	৮৮|২৫ „
চন্দ্রকোণা	...	২২|৪৪ „	...	৮৭|৩৩ „
চন্দ্রনাথ	...	২২|৩৮ „	...	৯১|৪৪ „
চম্পারণ	...	২৬|৩৮ „	...	৮৪|৫৮ „
চাঁদপুর	...	২৩|১৪ „	...	৯০|৪৩ „
চাঁদবালী	...	২০|৪৭ „	...	৮৭|৪৮ „
চুচূড়া	...	২২|৫৩ „	...	৮৮|২৭ „
চুয়াডাঙ্গা	...	২৩|৩৯ „	...	৮৮|৫৪ „
চৈবাসা	...	২২|৩৪ „	...	৮৫|৫১ „
চৌসা	...	২৫|২৯ „	...	৮৩|৫৮ „
ছাপরা	...	২৫|৪৭ „	...	৮৪|৪৭ „
জঙ্গীপুর	...	২৪|২৮ „	...	৮৮|৭ „
জব্বলপুর	...	২৩|১১ „	...	৭৯|৫৯ „
জয়নগর (২৪ পরগণা)	...	২২|১২ „	...	৮৮|২৮ „
জয়পুর (রাজপুতানা)	...	২৬|৫৬ „	...	৭৫|১৯ „
জলপাইগুড়ি	...	২৬|৩২ „	...	৮৮|৪৬ „
জামতাড়া	...	২৩|৫৯ „	...	৮৬|৫৪ „
জামালপুর (মুঙ্গের)	...	২৫|১৯ „	...	৮৬|৩২ „
„ (ময়মনসিং)	...	২৪|৫৬ „	...	৮৯|৫৯ „
জাসপুর (রাঁচি)	...	২২|৫৩ „	...	৮৪|১৭ „
জাহানাবাদ (হুগলী)	...	২২|৫৩ „	...	৮৭|৪৯ „
„ (গয়া)	...	২৫|১৩ „	...	৮৪|৫৪ „
ঝান্সি	...	২৫|২৮ „	...	৭৮|৩৭ „
ঝিনাইদহ	...	২৩|৩৩ „	...	৮৯|১৩ „
টাকী	...	২২|৩৫ „	...	৮৮|৫৮ „
টাঙ্গাইল	...	২৪|১৫ „	...	৮৯|৫৩ „
টিকারী	...	২৪|৫৬ „	...	৮৫|৫৩ „
টিটাগড়	...	২২|৪৪ „	...	৮৮|২৬ „
ঠাকুর গাঁ	...	২৬|৫ „	...	৮৮|২৩ „
ডাবলিন	...	৫৩|১১ „	...	৬|১৮ প
ডায়মণ্ডহারবার	...	২২|১১ „	...	৮৮|১৪ পূ
ডাল্টনগঞ্জ	...	২৪|২ „	...	৮৪| ৭ „

স্থান	অক্ষাংশাদি	দেশান্তর
ডুমরাওন্	২৫।৩৩ উ	৮৪।১২ পূ
ডুমুরদহ	১৩।২ „	৮৮।২৯ „
ঢাকা	২৩।৪৩ „	৯০।২৬ „
ঢোলপুর	২৬।৪২ „	৭৭।৫৬ „
তমোলুক	২২।১৮ „	৮৭।৫৮ „
তাঞ্জোর	১০।৪৭ „	৭৯।১০ „
তাড়দহ	১২।২৭ „	৮৮।৩৩ „
তারকেশ্বর	২২।৫৩ „	৮৮। ৪ „
তেজপুর	২৬।৩৭ „	৯২।২৬ „
ত্রিচিঙ্কপল্লী	১০।৫০ „	৭৮।৪৪ „
ত্রিপুরা	২৩।৫১ „	৯১।২৩ „
ত্রিবেণী	১২।৫৯ „	৮৮।২৭ „
দমদম	২২।৩৮ „	৮৮।২৮ „
দাঁতন	২১।৫৭ „	৮৭ ২৪ „
দানাপুর	২৫।৩৮ „	৮৫। ৫ „
দারজিলিং	২৭। ৩ „	৮৮।১৯ „
দাসপুর	২১।৫৮ „	৮৬। ৮ „
দিনাজপুর	২৫।৩৮ „	৮৮।৪১ „
দিল্লি	২৮।৩৯ „	৭৭।১৬ „
দিব্রুগড়	২৭।৩২ „	৯৫। ১ „
দুবরাজপুর	২৩।৪৮ „	৮৭।২৩ „
দুর্গাপুর (স্ব সং)	২৫। ৮ „	৮৬। ২ „
দেবগড়	২১।৩২ „	৮৪।৩৮ „
দেবঘর (দেওঘর)	২৪।৩০ „	৮৬।৪৫ „
দেবনগর	২৭।২৯ „	৯৪।৫৮ „
দ্বারভাঙ্গা	২৬।১০ „	৮৫।৫৪ „
ধপধপী	২২।২০ „	৮৮।৩১ „
ধুবড়ী	২৬। ২ „	৯০। ২ „
নওগাঁ	২৪।৪৮ „	৮৮।৫৪ „
নড়াইল	২৩।১০ „	৮৯।৩৩ „
নবদ্বীপ	২৩।২৫ „	৮৮।২৫ „
নবাবগঞ্জ	২২।৪৬ „	৮৮।২৪ „
নয়াদুমকা	২৪।১৬ „	৮৭।১৮ „
নরসিংহপুর (উড়িষ্যা)	২০।২৮ „	৮৫। ৮ „
নসিরাবাদ	২০।৫৯ „	৭৫।৪২ „
নাগপুর	২১।১০ „	৭৯। ৭ „

স্থান	অক্ষাংশাদি	দেশান্তর
নাটোর	২৪।২৫ উ	৮৯। ২ পূ
নারায়ণগঞ্জ	২৩।৩৭ „	৯০।৩২ „
নারায়ণপুর	২২।২৯ „	৮৮।৩৭ „
নিউইয়র্ক	৪০।৪৩ „	৭৪। ০ প
নীলগিরি	২১।২৭ „	৮৬।৫৩ পূ
নীলফামারী	২৫।৫৮ „	৮৮।৫৪ „
নেত্রকোণা	২৪।৫৩ „	৯০।৪৫ „
নৈনীতাল	২৯।২২ „	৭৯।৩০ „
নৈহাটী	২২।৫৪ „	৮৮।২৮ „
নোয়াখালী	২২।৪৮ „	৯১। ৯ „
পটুয়াখালী	২২।২১ „	৯০।২৩ „
পলাসী	২৩।৪৭ „	৮৮।১৮ „
পাকুড়	২৪।৩৭ „	৮৭।৫৩ „
পাটনা	২৫।৩৭ „	৮৫।১৩ „
পাণ্ডুয়া	২৩।৪ „	৮৮।২০ „
পাতিয়ালা	৩০।২০ „	৭৬।২৫ „
পানিপথ	২৯।২৩ „	৭৭। ১ „
পাবনা	২৪। ১ „	৮৯।১৯ „
পারিস	৪৮।৫০ „	২।২০ „
পালামৌ	২৩।৫৩ „	৮১।৪৬ „
পিরোজপুর	২২।৩০ „	৮৯।৫৪ „
পুনা	১৮।৩১ „	৭৩।৫৫ „
পুরী	১৯।৪৮ „	৮৫।৫২ „
পুরুলিয়া	২৩।২০ „	৮৬।২৫ „
পূর্ণিয়া	২৫।৪৬ „	৮৭।৩১ „
পোর্ট ক্যানিং	২২।১৯ „	৮৮।৪৩ „
ফতেপুর	২৫।৫৫ „	৮০।৫৩ „
ফয়জাবাদ	২৬।৪৭ „	৮২।১২ „
ফরিদপুর	২৩।৩৬ „	৮৯।৫৩ „
ফলতা	২২।১৮ „	৮৮।১০ „
ফিরিঙ্গিবাজার	২৩।৩৩ „	৯০।৩৩ „
ফুলবাড়ী	২৫।৩০ „	৮৮।৫০ „
বক্তিয়ারপুর	২৫।২৮ „	৮৫।৩৪ „
বক্সার	২৫।৩৪ „	৮৪। ১ „
বগুড়া	২৪।৫১ „	৮৯।২৬ „

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর
বজবজ	...	২২।২৯ উ	...	৮৮।১৪ পূ
বনগ্রাম	...	২২।৫২ „	...	৮৮।৪২ „
„ (যশোর)	...	২৩। ৩ „	...	৮৮।৫৪ „
বরদা	...	২২।১৮ „	...	৭৩।১৬ „
বরিশাল	...	২২।৪২ „	...	৯০।২৫ „
বৰ্দ্ধমান	...	২৩।১৪ „	...	৮৭।৫৪ „
বসিরহাট	...	২২।৪০ „	...	৮৮।৫৪ „
বহরমপুর	...	২৪। ৭ „	...	৮৮।১৮ „
বাখরগঞ্জ	...	২২।৩৩ „	...	৯০।২৩ „
বাগেরহাট	...	২২।৪০ „	...	৮৯।৫০ „
বাঙ্গালোর	...	১২।৩৭ „	...	৭৭।৩৭ „
বাজিতপুর	...	২৪।১৩ „	...	৯১। ০ „
বাড়	...	২৫।২৯ „	...	৮৫।৪৬ „
বামড়া	...	২১।৩২ „	...	৮৪।৩৮ „
বারাকপুর	...	২২।৪৬ „	...	৮৮।২৪ „
বারাসত	...	২২।৪৩ „	...	৮৮।২৭ „
„ (দক্ষিণ)	...	২২।২০ „	...	৮৮।২৬ „
বারিপদা	...	২১।৫৬ „	...	৮৬।৫৪ „
বারুইপুর	...	২২।২২ „	...	৮৮।২৯ „
বালি	...	২২।৪৮ „	...	৮৭।৪৯ „
বালেশ্বর	...	২১।৩০ „	...	৮৬।৫৮ „
বাঁকা-(ভাগলপুর)	...	২৪।৫৩ „	...	৮৬।৫৪ „
বাঁকিপুর (বেহার)	...	২৫।৩৭ „	...	৮৫।১১ „
„ (বাঙ্গালা)	...	২২।৩০ „	...	৮৮।২৫ „
বাঁকুড়া	...	২৩।১৪ „	...	৮৭। ৮ „
বাঁশবেড়িয়া	...	২২।৫৮ „	...	৮৮।২৭ „
বিষ্ণুপুর (গয়মন্ত হারবার)	...	২২। ৯ „	...	৮৮।২৬ „
„ (বাঁকুড়া)	...	২৩। ৫ „	...	৮৮।৮ „
বিজগাপত্তন	...	১৭।৪২ „	...	৮৩।২০ „
বিলাসপুর	...	২২। ৫ „	...	৮২।১২ „
বীরভূম	...	২৩। ৫ „	...	৮৭। ৮ „
বুদ্ধগয়া	...	২৪।৪১ „	...	৮৫। ২ „
বুর্হানপুর	...	১৯।১৯ „	...	৮৪।৪৮ „
বুলন্দসহর	...	২৮।২৪ „	...	৭৭।৫৪ „
বৃন্দাবন	....	২৭।২৩ „	...	৭৭।৪৪ „
বেগুসরাই	...	২৫।২৫ „	...	৮৬।২৪ „
বেটিয়া	...	২৬।৪৯ „	...	৮৪।৩৮ „

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

কিং তস্য কৃতকৃতস্য কর্ত্তুং শক্যেত কেনচিৎ।
যস্য সর্ব্বার্থিনো গেহে সর্ব্বকামৈঃ সদার্চ্চিতাঃ ॥ ৩১ ॥
যানি রত্নানি তদ্‌গেহে পাতালে তানি নঃ কুতঃ।
বাহনাসনযানানি ভূষণান্যম্বরাণি চ ॥ ৩২ ॥
বিজ্ঞানং যচ্চ তত্রাস্তি তদন্যত্র ন বিদ্যতে।
প্রাজ্ঞানামপ্যসৌ তাত সর্ব্বসন্দেহহৃদ্ভ্রমঃ ॥ ৩৩ ॥
একং তস্যাস্তি কর্ত্তব্যমসাধ্যং তচ্চ নো মতম্।
হিরণ্যগর্ভ-গোবিন্দ-শর্ব্বাদীনাং বরাদৃতে ॥ ৩৪ ॥

নাগরাজোবাচ।

তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য যৎ কার্য্যমুত্তমম্।
অসাধ্যমথবা সাধ্যং কিঞ্চাসাধ্যং বিপশ্চিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
দেবত্বমমরেশত্বং তৎপূজ্যত্বঞ্চ মানবাঃ।
প্রয়ান্তি বাঞ্ছিতং চান্যাদ্দৃঢ়ং যে ব্যবসায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥

নাগপুত্র দুইজনে, পিতার বচন শুনে
বলে—"পিতা, করহ শ্রবণ,
সতত যাচক জনে ইষ্টধন বিতরণে
তুষ্ট করে যেই মহাজন,
কৃতকৃত্য সুনিশ্চয় সেই ত নৃপ-তনয়
কি করিব তাঁ'র উপকার ?
গেহে তাঁ'র রত্নধন আছে পিতা অগণন
আসন, বাহন, যান, আর
ভূষণ-বসনচয় আছে কত শোভাময়
পাতালেতে নাহিক তেমন,
হ'বে তাঁ'র উপকার কোথায় কি পা'ব আর ?
সেই চেষ্টা অসাধ্য-সাধন। ৩১-৩২।
জ্ঞানের অভাব নাই বিজ্ঞানে মগ্ন সদাই
সর্ব্বতত্ত্বে পূর্ণ হৃদি তাঁ'র,
অতিশয় বিজ্ঞজন হইলে সন্দিগ্ধ মন
সে সন্দেহ মিটান তাঁহার। ৩৩।

একটি অভাব তাঁ'র আছে, মাত্র জানি সার
কিন্তু তাহা করিতে পূরণ,
নহে সাধ্য, জানি মনে বিধি হরি-হর বিনে
কে পারিবে করিতে সাধন ?" ৩৪।
শুনি নাগরাজ কয়— "কিছুই অসাধ্য নয়
কি অভাব বলহ আমায়,
জ্ঞানযোগ আছে যা'র সকলি সুসাধ্য তা'র
অতএব শুনিতে জুয়ায়। ৩৫।
দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব আর, কিম্বা তৎ-পূজ্যত্ব সার,
মানবের যেই ইচ্ছা হয়,
দৃঢ়তর চেষ্টা হ'লে সে ইচ্ছা অবশ্য ফলে
এই তত্ত্ব জানিও নিশ্চয়।
আত্মা-আর প্রাণ-মন বাহ্যান্তরেন্দ্রিয়গণ
করি সবে একা-অনুগত
যদি চেষ্টা করে নর, অসাধ্য তাহার পর
নাহি তা'র, শাস্ত্রের সম্মত। ৩৬।

নাবিজ্ঞাতং ন চাগম্যং নাপ্রাপ্যং দিবিচেহ বা।
উদ্যতানাং মনুষ্যাণাং যতচিত্তেন্দ্রিয়াত্মনাম্ ॥ ৩৭ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি ব্রজন্ যাতি পিপীলিকঃ।
অগচ্ছন্ বৈনতেয়োঽপি পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥ ৩৮
অযুক্তানাং মনুষ্যাণাং গম্যাগম্যং ন বিদ্যতে।
ক্ক ভূতলং ক্ক চ ধ্রৌব্যং স্থানং যৎ প্রাপ্তবান্ ধ্রুবঃ
উত্তানপাদনৃপতেঃ পুত্রঃ সদ্ভূমিগোচরঃ ॥ ৩৯ ॥
তৎ কথ্যতাং মহাভাগৌ কার্য্যবান্ যেন পুত্রকৌ।
স ভূপালসুতঃ সাধুর্যেনানৃণ্যং লভেত বাম্ ॥ ৪০ ॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

তেনাখ্যাতমিদং তাত পূর্ব্ববৃত্তং মহাত্মনা।
কৌমারকে যথা তস্য বৃত্তং সদ্বৃত্তশালিনঃ ॥ ৪১ ॥

পাতালে কি স্বর্গপুরে নিকটে কি বহু দূরে
অবিজ্ঞাত তত্ত্ব নাহি তা'র,
অগম্য নাহিক স্থান অপ্রাপ্য নাহিক জ্ঞান
ধন, ধর্ম্ম, মান, যশ আর।
যতচিত্তেন্দ্রিয়-জন আত্ম-গত অনুক্ষণ
সদাই উদ্যোগী চেষ্টাবান
হে বৎস তাঁহার কাছে কি বল দুষ্প্রাপ্য আছে ?
দুর্ব্বল নহে ত তাঁ'র প্রাণ। ৩৭।
পিপীলিকা ক্ষুদ্র অতি, কিন্তু, হ'য়ে স্থিরমতি
ধীরে ধীরে করিলে গমন,
এক দিন সুনিশ্চয় যত্ন তা'র সিদ্ধ হয়,
পারে যেতে সহস্র যোজন।
বৈনতেয় বলবান যদি চেষ্টা নাহি পান,
স্থিরভাবে থাকেন বসিয়া,
রয়েছেন যেই স্থানে থাকিবেন সেইখানে
জড়বৎ অচল হইয়া। ৩৮
অযুক্ত যে জন হায় গম্যাগম্য এ ধরায়
নাহি তা'র কহিনু নিশ্চয় ;
কোথায় ভূতল এই—কোথা ধ্রুবলোক সেই
দেখ ভেবে ঘুচিবে সংশয়।
উত্তানপাদের সুত, সকল সদ্গুণযুত
ধ্রুব নাম, বিখ্যাত ভুবনে,
পঞ্চম বর্ষের কালে ছিঁড়িয়া মমতা জালে
গিয়েছিলা গহন কাননে ;
করিয়া দুশ্চর তপ করি হরি-নাম-জপ
সিদ্ধিলাভ করিলা কেমন,
অন্যের অগম্যস্থল ধ্রুবলোক সুবিমল
পাইলেন করিয়া যতন। ৩৯।
তাই বলি, বৎসগণ, বলহ মোরে এখন
কিসে তাঁ'র হ'বে উপকার ?
সেই ত রাজার সুত সাধু, সর্ব্বগুণযুত,
সদা মিত্র তোমা দোঁহাকার।
সে মিত্রতা-ঋণ হায় শুধিবারে ইচ্ছা যায়,
ইচ্ছা—চেষ্টা করি একবার,
যদি পারি শুধিবারে, ঋণশূন্য দোঁহাকারে
দেখিব উপায় করিবার।" ৪০।

তস্ত শত্রুজিতং তাত পূর্ব্বং কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ।
গালবোঽভ্যাগমদ্ধীমান্ গৃহীত্বা তুরগোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥
প্রত্যুবাচ চ রাজানাং সমুপেত্যাশ্রমং মম।
কোঽপি দৈত্যাধমো রাজন্ বিধ্বংসয়তি পাপকৃৎ ॥ ৪৩ ॥
তভদ্রূপং সমাস্থায় সিংহেভবনচারিণাম্।
অন্যেষাঞ্চাতিকায়ানামহর্নিশমকারণাৎ ॥ ৪৪ ॥
সমাধিধ্যানযুক্তস্য মৌনব্রতরতস্য চ।
তথা করোতি বিঘ্নানি যথা চলতি মে মনঃ ॥ ৪৫ ॥
দগ্ধুং কোপাগ্নিনা সদ্যঃ সমর্থস্তং বয়ং ন তু।
দুঃখার্জ্জিতস্য তপসো ব্যয়মিচ্ছামি পার্থিব ॥ ৪৬ ॥
একদা তু ময়া রাজন্নতিনির্ব্বিণ্ণচেতসা।
তৎক্লেশিতেন নিঃশ্বাসো নিরীক্ষ্যাম্বরমুজ্ঝিতঃ ॥ ৪৭ ॥
ততোঽম্বরতলাৎ সদ্যঃ পতিতোঽয়ং তুরঙ্গমঃ।
বাক্‌চাশরীরিণী প্রাহ নরনাথ শৃণুষ্ব তাম্ ॥ ৪৮ ॥

শুনি হেন, পিতৃমুখে, ভাই দুইজন,
বলে, "পিতা, বলি শুন অদ্ভুত কথন।
সদাচারশালী সেই রাজার তনয়
শোকে সুখে কোনকালে কাতর ত নয়।
এক দিন, কৌমার কালের গূঢ় কথা,
বলিয়া মোদের কাছে প্রকাশিলা ব্যথা। ৪১।
একদা গালব নামে ঋষি একজন
সুন্দর তুরঙ্গ লয়ে করে আগমন;
শত্রুজিৎ রাজ-পাশে আসি' দ্বিজবর,
বলিলেন, নরনাথে প্রকাশি অন্তর। ৪২।
"শুন নরনাথ, এক দানব দুর্জ্জন,
নিরন্তর আশ্রমে করিয়া আগমন.
উৎপীড়ন করে মোর, বিনাশে আশ্রম,
তাহার দৌরাত্ম্যে মোর পণ্ড হ'লো শ্রম।৪৩।
কভু সিংহরূপ ধরে, কভু হস্ত্যাকার
কভু বন্যজন্তু অন্য—বিবিধ প্রকার;
আশ্রম-পাদপ নাশে তপোবিঘ্ন করে,
আশ্রমবাসিরা সবে কাঁপে তা'র ডরে। ৪৪।
যে সময়ে সমাধিতে ধ্যানযুক্ত-মন
থাকি আমি, সে দানব করে আগমন।
মৌনব্রতরত হ'য়ে থাকি যে সময়,
দুরাত্মা-দৌরাত্ম্যে হয় চঞ্চল-হৃদয়। ৪৫।
রোষানলে পারি তা'রে দগ্ধ করিবারে,
কিন্তু সেই কার্য্য অতি অযোগ্য আমারে;
দুঃখার্জিত তপোফল নাশ হ'বে তা'য়,
এই হেতু, সেই কাজ, প্রাণে নাহি চায়। ৪৬
এক দিন আমি সেই দুষ্টের পীড়নে
ত্যেজেছিনু দীর্ঘ-শ্বাস সুদুঃখিত মনে। ৪৭।
সেই কালে অশ্ব এই, আকাশ হইতে
পতিত হইল, রাজা, এই অবনীতে,
হইল আকাশবাণী শুনিনু শ্রবণে,
সেই কথা, বিস্তারি' বলিব এই ক্ষণে। ৪৮।

অশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ।
সমর্থঃ ক্রান্তুমর্কেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ॥ ৪৯॥
পাতালাম্বরতোয়েষু ন চাস্য বিহতা গতিঃ।
সমস্ত দিক্ষু ব্রজতো ন ভঙ্গঃ পর্ব্বতেষ্বপি॥ ৫০॥
যতো ভূবলয়ং সর্ব্বমশ্রান্তোঽয়ং চরিষ্যতি।
অতঃ কুবলয়ো নাম্না খ্যাতিং লোকেষু যাস্যতি॥ ৫১॥
ক্লিশ্যতাহনিশং পাপো যশ্চ ত্বাং দানবাধমঃ।
তমপ্যেনং সমারুহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ হনিষ্যতি॥ ৫২॥
শক্রজিন্নাম ভূপালস্তস্য পুত্র ঋতধ্বজঃ।
প্রাপ্যৈতদশ্বরত্নঞ্চ খ্যাতিমেতেন যাস্যতি॥ ৫৩॥
সোঽহং ত্বাং সমনুপ্রাপ্তস্তপসো বিঘ্নকারিণম্।
ত্বং নিবারয় ভূপাল ভাগভাঙ্*নৃপতির্যতঃ॥ ৫৪॥

সে আকাশ-বাণী এই—"এই অশ্বোত্তম,
তোমারে দিলাম এবে, নাহি এর সম।
অশ্রান্ত সতত ইহা তপনের প্রায়
পারে ধরা ভ্রমিবারে সন্ধ নাহি তায়;
ভূবলয় ভ্রমিতে সমর্থ এই হয়,
ইহার শক্তিতে কভু না কর সংশয়। ৪৯
পাতাল, অম্বর আর সলিল, পর্ব্বত,
সর্ব্বদিকে যেতে পারে এ অশ্ব সতত।
এর গতি কোন স্থানে প্রতিহত নয়,
সর্ব্বত্র যাইতে শক্ত কহিনু নিশ্চয়। ৫০।
অবিরত ভূবলয় প্রদক্ষিণ করি'
শ্রান্ত নাহি হ'বে অশ্ব, কহিনু বিবরি,'
এই হেতু কুবলয় নামে খ্যাত হয়
হইবে এ ত্রিভুবনে কহিনু নিশ্চয়। ৫১।
তোমার আশ্রমে যেই দানব অধম,
করয়ে উৎপাত পাপী হইয়া নির্ম্মম,
নিরর্থক তব প্রাণে ক্লেশ করে দান,
তাঁ'রে নাশিবার এবে কহি যে সন্ধান—
শক্রজিৎ নামে রাজা বিদিত ভুবন
ঋতধ্বজ নামে আছে তাঁহার নন্দন
সেই ধীর বীর অতি জানিহ নিশ্চয়
নাশিতে পারিবে দৈত্যে আরোহি' এ হয়।
এই অশ্বরত্ন লাভ করি' বীরবর,
কুবলয়াশ্ব নামেতে, খ্যাত অতঃপর,
হইবেন ধরাধামে কহিনু নিশ্চয়,
যাও ত্বরা আন তাঁ'রে হেথা এ সময়।"৫২-৫৩
শুনি তাই আসিয়াছি সকাশে তোমার,
তপোবিঘ্ন নাশি' রাখ আশ্রম আমার।
আমার তপের ভাগ-ভাগী* তুমি রায়
বিপদে রক্ষিতে মোরে অবশ্য জুয়ায়। ৫৪।

* ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, রাজা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাদির উপার্জ্জিত ধর্ম্মের ভাগভাক্। যথা—
"স রক্ষ্যমাণো রাজা যং কুরুতে ধর্ম্মমন্বহম্।
তেনায়ুর্বর্দ্ধতে রাজ্ঞো দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ॥"

তদেতদশ্বরত্নং তে ময়া ভূপ নিবেদিতম্।
পুত্রমাজ্ঞাপয় তথা যথা ধর্ম্মো ন লুপ্যতে ॥ ৫৫ ॥
স তস্য বচনাদ্রাজা স্বং বৈ পুত্রমৃতধ্বজম্।
তদশ্বরত্নমারোপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলম্।
অপ্রেষয়ত ধর্ম্মাত্মা গালবেন সমং তদা ॥ ৫৬ ॥
স্বমাশ্রমপদং সোঽপি তমাদায় যযৌ মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে ঋতধ্বজচরিতে
কুবলয়োৎপত্তির্নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

এনেছি এ অশ্বরত্ন তব পুত্র তরে,
রাখিলাম এবে এটি তোমার গোচরে।
ধর্ম্মলোপ নাহি হয় যাহে নররায়,
সেই মত কার্য্য এবে করিতে জুয়ায়।
পুত্রে আজ্ঞা কর, রাজা, ধর্ম্ম রক্ষা কর,
তোমার মঙ্গল মোরা চিন্তি নিরন্তর।" ৫৫।

মুনির বচন রাজা করিয়া শ্রবণ,
পুত্র ঋতধ্বজে আজ্ঞা করিলা তখন।
কৌতুক-মঙ্গলাচার পুত্রের কল্যাণে
করি' বসাইলা অশ্বে বিহিত বিধানে। ৫৬।
প্রেরণ করিলা তাঁ'রে গালবের সনে,
গেলা মুনি তাঁ'রে ল'য়ে নিজ তপোবনে। ৫৭।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে পিতাপুত্রসম্বাদে ঋতধ্বজচরিতে
কুবলয়-প্রাপ্তি নামক বিংশ অধ্যায়।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

নাগরাজোবাচ।

গালবেন সমং গত্বা নৃপপুত্রেণ তেন সঃ।
কৃতং তৎ কথ্যতাং পুত্রৌ বিচিত্রা যুবয়োঃ কথা॥ ১॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

স গালবাশ্রমে রম্যে তিষ্ঠন্ ভূপালনন্দনঃ।
সর্ব্ববিঘ্নোপশমনং চকার ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২॥
বারং কুবলয়াশ্বং তং বসন্তং গালবাশ্রমে।
মদাবলেপোপহতো নাজানাদ্দানবাধমঃ॥ ৩॥
ততস্তং গালবং বিপ্রং সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্।
শৌকরং রূপমাস্থায় প্রধর্ষয়িতুমাগতম্॥ ৪॥

বলে নাগরাজ— "সুমধুর অতি
এ আখ্যান সুনিশ্চয়,
শুনিয়া আনন্দ হইতেছে অতি,
বল মোরে সমুদয়।
গালবের সনে নরেশ-নন্দন
গিয়ে সেই তপোবনে,
আশ্রমের বিঘ্ন নাশিলা যেরূপে
বল মোরে এই ক্ষণে।" ১।
নাগপুত্র দোঁহে বলে—"শুন, পিতা,
সেই ত রাজনন্দন,
গালবের সনে আশ্রমে তাঁহার
করিলা তবে গমন।
রম্য তপোবন করি' দরশন
প্রীতি জন্মে তাঁ'র প্রাণে,
করেন যতন বিঘ্ন নাশ তরে
তথা, বিহিত বিধানে।
ব্রহ্মবাদিগণ তাঁ'র আগমনে
হৈলা সবে ফুল্লপ্রাণ,
যাগযজ্ঞ তরে করে আয়োজন
যেমন আছে বিধান। ২।
কুবলয়-অশ্ব সে অশ্বে চড়িয়া
করে সদা বিচরণ,
তা'র তেজে দীপ্ত সে আশ্রমে আর
নাহি আসে হিংস্রজন।
সেই ত দানব এ সব সন্ধান
কিছু না জানিতে পারে,
মদগর্ব্বে মত্ত হ'য়ে সে কারণে,
আছিল নিজ আগারে। ৩।
জানিত না দৈত্য শমন তাহার
আছে মুনি তপোবনে,
শূকর হইয়া আসিল সেথায়
এক দিন সেই বনে।
মহর্ষি গালব সন্ধ্যা-উপাসনা
করেন নিশ্চিন্ত মন,
হেন কালে এলো সেই দুরাচার
করিতে তাঁরে পীড়ন।

মুনিশিষ্যৈরথোৎকৃষ্টে শীঘ্রমারুহ্য তং হয়ম্ ।
অন্বধাবদ্বরাহং তং নৃপপুত্রঃ শরাসনী ॥ ৫ ॥
আজঘান চ বাণেন চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসা ।
আকৃষ্য বলবচ্চাপং চারুচিত্রোপশোভিতম্ ॥ ৬
নারাচাভিহতঃ শীঘ্রমাত্মত্রাণপরোমৃগ ।
গিরিপাদপসম্বাধাং সোঽন্বক্রামন্মহাটবীম্ ॥ ৭ ॥
তমনুধাবদ্বেগেন তুরগোঽসৌ মনোজবঃ ।
চোদিতো রাজপুত্রেণ পিতুরাদেশকারিণা ॥ ৮ ॥
অতিক্রম্যাথবেগেন যোজনানি সহস্রশঃ ।
ধরণ্যাং বিবৃতে গর্ত্তে নিপপাত লঘুক্রমঃ ॥ ৯ ॥
তস্যানন্তরমেবাশু সোঽপ্যশ্বী নৃপতেঃ সুতঃ ।
নিপপাত মহাগর্ত্তে তিমিরৌঘসমাবৃতে ॥ ১০ ॥

মুনিশিষ্যগণ করি' আগমন
নরেন্দ্র-নন্দন পাশে
বলে—"যুবরাজ, সে দানব আজ
এলো উপদ্রব-আশে।"
শুনি' সেই বাণী, বীরচূড়ামণি
আরোহিয়ে কুবলয়ে,
নাশিতে তাহারে তীক্ষ্ণ শরধারে
চলে অস্ত্রশস্ত্র ল'য়ে।
সে বরাহে বনে হেরিয়া নয়নে
নৃপসুত সেইক্ষণে
লক্ষ্য করি' তা'রে বধ করিবারে
শর জুড়ে শরাসনে। ৫।
চারুচিত্রময় সেই শরাসন
তাহে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ,
জুড়ি' রাজসুত সর্ব্বগুণযুত
করিলা তবে সন্ধান।
মহাতেজোময় সেই মহাশর
গর্জ্জিয়া উঠি' অম্বরে
পড়ে ভীমবেগে ত্বরিতে আসিয়া
দানব-দেহ-উপরে। ৬।

আহত হইয়া যায় পলাইয়া
আত্মত্রাণ-আশা করি'
পর্ব্বতে—কন্দরে কানন ভিতরে
ছুটে বাণ পৃষ্ঠে ধরি'। ৭।
রাজার কুমার পশ্চাতে তাহার
করে ধরি' শরাসন,
চলিলা সত্বরে অশ্বের উপরে;
ধায় অশ্ব সুলক্ষণ।
আদেশ পিতার মনে আছে তাঁ'র
দানব নাশিতে ভ'বে,
এই সে কারণে চলিলা কাননে
বধিতে তা'রে আহবে। ৮।
সহস্র যোজন করিয়া গমন
লঘুক্রম সে দানব
ধরণী বিবরে প্রবেশে সত্বরে
ধায় অশ্ব মনোজব। ৯।
তিমিরেতে ভরা সেই গর্ত্ত মাঝ
অশ্ব পৃষ্ঠে নৃপ-সুত
পশিয়া সত্বর করে দরশন
ব্যাপার অতি অদ্ভুত। ১০।

ততোনাদৃশ্যত মৃগঃ স তস্মিন্ রাজসূনুনা।
প্রকাশঞ্চ স পাতালমপশ্যৎ তত্র নাপি তম্ ॥ ১১ ॥
ততোঽপশ্যৎ স সৌবর্ণপ্রাসাদশতসঙ্কুলম্।
পুরন্দরপুরপ্রখ্যং পুরং প্রাকারশোভিতম্ ॥ ১২ ॥
তৎ প্রবিশ্য স নাপশ্যৎ তত্র কঞ্চিন্নরং পুরে।
ভ্রমতা চ ততো দৃষ্টা তত্র যোষিত্ত্বরান্বিতা ॥ ১৩ ॥
সা পৃষ্টা তেন তন্বঙ্গী প্রস্থিতা ক্কেতি কস্য বা।
নোবাচ কিঞ্চিৎ প্রাসাদমারুরোহ চ ভামিনী ॥ ১৪ ॥
সোপ্যশ্বমেকতোবদ্ধা তামেবানুসসার বৈ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো নিঃশঙ্কো নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ১৫ ॥
ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণে পর্য্যঙ্কেসর্ব্বকাঞ্চনে।
নিষণ্ণাং কন্যকামেকাং কামযুক্তা রতীমিব ॥ ১৬ ॥

সবি অন্ধকার কোথা সে দানব
কিছুই দেখা না যায়,
দূরে ক্ষীণ আলো সেই পথে গেল—
আলোক প্রকাশ পায়।
প্রবেশি' তথায় দৈত্যে নাহি পায়
লুকাল কোথায় হায়
নৃপসুত ভাবে বুঝি অনুভাবে
লুকায়ে আছে মায়ায়। ১১।
শত শত তথা সৌবর্ণ প্রাসাদ
চারি দিকে শোভে মরি,
যেন ইন্দ্রপুর শোভার আধার
প্রকাশ রয়েছে ঘিরি। ১২।
প্রবেশি তথায় করে দরশন
নর মাত্র তথা নাই;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখিলেন দূরে
নারী এক যায় ধাই। ১৩।
রাজার কুমার ত্বরাপর হ'য়ে
নিকটে গিয়ে তাঁহার,
সেই তন্বঙ্গীরে করিলা জিজ্ঞাসা
চলেছ নিকটে কা'র?
কেই বা তোমারে করেছে প্রেরণ
কোথা হ'তে এথা এলে?
এ বা কোন স্থান বলহ আমারে
নাহি যাও দ্রুত চ'লে।
সেই ত কৃশাঙ্গী কিছু না বলিলা
কুমারের কথা শুনি;
আপনার মনে দ্রুত পদে অতি
প্রাসাদে প'শে তখনি। ১৪।
রাজার নন্দন বাঁধিয়া বৃক্ষেতে
নিজের সে অশ্ববর,
বিস্মিত অন্তরে যায় তা'র পিছে
শঙ্কাহীন নিরন্তর। ১৫।
পশিয়ে প্রাসাদে করে দরশন
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কোপরে
কন্যা মনোহরা রয়েছে বসিয়া
রতি যেন কাম তরে। ১৬।

শ্রীশ্রীগণদেব।

India Press, Calcutta.

শ্রীশ্রীগণেশস্তোত্রম্
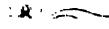
ওঁকারমাদ্যং প্রবদন্তি সন্তো
বাচঃ শ্রুতীনামপি যে গৃণন্তি
গজাননং দেবগণানতাঙ্ঘ্রিম্
ভজেঽহমর্দ্ধেন্দুকৃতাবতংসম্ ॥

পাদারবিন্দার্চ্চনতৎপরাণাম্ ।
সংসারদাবানলভঙ্গদক্ষম্ ।
নিরন্তরং নির্গতদানতোয়ৈঃ
তং নৌমি বিঘ্নেশ্বরমম্বুজাভম্ ॥ ২

কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন
মত্তালিমালাং মদপঙ্কলগ্নাম্ ।
নিবারয়ন্তং নিজকর্ণতালৈঃ
কো বিস্মরেৎ পুত্রমনঙ্গশত্রোঃ ॥ ৩

শম্ভোর্জটাজুটনিবাসিগঙ্গা-
জলং সমাদায় করাম্বুজেন ।
লীলাভিরারাচ্ছিবমর্চ্চয়ন্তম্
গজাননং ভক্তিযুতা ভজন্তি ॥ ৪ ॥

কুমারভুক্তৌ পুনরাত্মহেতোঃ
পয়োধরৌ পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ ।
প্রক্ষালয়ন্তং করশীকরেণ
মৌগ্ধেন তং নাগমুখং ভজামি ॥ ৫

ত্বয়া সমুদ্ধৃত্য গজাস্যহস্তম্
যে শীকরাঃ পুষ্করন্ধ্রমুক্তাঃ ।
ব্যোমাঙ্গনে তে বিচরন্তিতারাঃ
কালাত্মনা মৌক্তিকতুল্যভাসঃ ॥ ৬

ক্রীড়ারতে বারিনিধৌগজাস্যে
বেলামতিক্রামতি বারিপূরে
কল্পাবসানং পরিচিন্ত্য দেবাঃ
কৈলাসনাথং শ্রুতিভিঃ স্তুবন্তি ॥ ৭ ॥

নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে
ক্রীড়ারতে দেবকুমার সঙ্ঘৈঃ ।
ত্বয়ি ক্ষণং কালগতিং বিহায়
তৌ প্রাপতু কন্দুকতামিনেন্দূ ॥ ৮ ॥

মদোল্লসৎ পঞ্চমুখৈরজস্রম্
অধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্ ।
দেবান্ ঋষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রম্
হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি ॥ ৯ ॥

পদাম্বুজাভ্যামতিকোমলাভ্যাম্
কৃতার্থয়ন্তং কৃপয়া ধরিত্রীম্ ।
অকারণং কারণমাপ্তবাচাম্
তন্নাগবক্ত্রং ন জহাতি চেতঃ ॥ ১০ ॥

যেনার্পিতং সত্যবতী সুতায়
পুরাণমাখিল্য বিষণকোট্যা।
তং চন্দ্র মৌলেস্তনয়ং তপোভিঃ
আরাধ্যমানন্দঘনং ভজামি ॥ ১১ ॥

পদং শ্রুতীনামপদং স্বতীনাম্
লীলাবতারং পরমাত্মমূর্ত্তেঃ।
নাগাত্মকো বা পুরুষাত্মকো বে—
ত্যভেদ্য মাদ্যং ভজ বিঘ্নরাজম ॥ ১২।

পাশাঙ্কুশৌ ভগ্নরদন্ত্বভীষ্টম্
করৈর্দধানং কররন্ধ্র মুক্তৈঃ।
মুক্তা ফলাভৈঃ পৃথশীকরৌঘৈঃ
সিঞ্চন্তমঙ্গং শিবয়োর্ভজামি ॥ ১৩ ॥

অনেকমেকং গজমেকদন্তম্
চৈতন্যরূপং জগদাদিবীজম্।
ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
তং শম্ভু সূনুং সততং ভজামি ॥ ১৪ ॥

অঙ্গে স্থিতায়া নিজ বল্লভায়া
মুখাম্বুজালোকন লোলনেত্রম্।
স্মেরাননাব্জং মদবৈভবেন
রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্ ॥ ১৫

যে পূর্ব্বমারাধ্য গজাননং ত্বাম্
সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পঠান্ত তোষাম্।
ত্বত্তো ন চান্যৎ প্রতিপাদ্যমস্তি
তদস্তি চেৎ সত্যমসত্যকল্পম্ ॥ ১৬ ॥

হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারম্
কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্।
গজাননং যং প্রবদন্তি সন্তঃ
তং কাল যোগৈস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১৭

বেদান্তগীতং পুরুষং ভজেঽহম্
আত্মানমানন্দঘনং হৃদিস্থম্।
গজাননং যন্মহসা জনানাম্
বিঘ্নান্তকারো বিলয়ং প্রয়াতি ॥ ১৮ ॥

শম্ভোঃ সমালোক্য জটাকলাপে
শশাঙ্কখণ্ডং নিজপুষ্করেণ।
স্বভগ্নদন্তং প্রবিচিন্ত্য মৌগ্ধ্যাদ্
আকষ্টু কামঃ শ্রিয়মাতনোতু ॥ ১৯ ॥

বিঘ্নার্গলানাং বিনিপাতনার্থম্
যন্নারিকেলৈঃ কদলীফলাদ্যৈঃ।
প্রভাবয়ন্তো মদবারণাস্যম্
প্রভুং সদাভীষ্টমহং ভজেতম্ ॥ ২০ ॥

যজ্ঞৈরনেকৈর্বহুভিস্তপোভির্
আরাধ্যমাদ্যং গজরাজবক্ত্রম্।
স্তুত্যানয়া যে বিধিনা স্তুবন্তি
তে সর্ব্বলক্ষ্মীনিধয়ো ভবন্তি ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়ঃ শ্রীকৃষ্ণানন্দ সঙ্কলিতে তন্ত্রসারে শ্রীশ্রীগণেশস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

পুত্রের প্রতি উপদেশ

প্রাতরুত্থান।—অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবে। সূর্য্যোদয়ের অন্ততঃ একঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা চাই। যে সময়ে পূর্ব্বদিক একটু একটু আলোকিত হইতে আরম্ভ হইতেছে অথচ আকাশে নক্ষত্র দৃষ্টমান থাকে সেই সময়ই শয্যাত্যাগের প্রকৃষ্ট সময়। শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপর নিদ্রা-ভঙ্গের পর একটু বসিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে ও দেবমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। যে পরিবারে যে দেবতার নাম প্রচার বেশী সে পরিবারের লোকের সেই দেবতার নাম উচ্চারণ করা ও মূর্ত্তি চিন্তা কর্ত্তব্য। তোমার কি কর্ত্তব্য তাহা তুমি স্বয়ং বিবেচনা করিয়া লইবে। তৎপরে গুরু লোককে স্মরণ করিবে। যাঁহাকে যাঁহাকে তোমার আন্তরিক ভক্তি হয় যাঁহাদের নিকট তুমি কিছু মাত্রও সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছ যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন—যত্ন করেন, যাঁহাদের নিকট তুমি যে কোনরূপ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছ, এ প্রকার সকলকেই স্মরণ করিবে ও তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। যদি এরূপ লোকের সংখ্যা বড় বেশি হয় তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চরিত্রবান, সদ্‌গুণ-বত্তায়, বিদ্যাবুদ্ধির আধার বলিয়া তোমার নিকট সমধিক আদৃত এরূপ কয়েকটি আদর্শ বাছিয়া স্থির করিবে। এবং তাঁহাদিগকে স্মরণ ও প্রণাম করিবে। তৎপরে শয্যাত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল ছাদের উপর বা গৃহ প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সুনীল, অসীম তারকান্বিত গগনের দিকে একবার নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টিপাত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে আকাশ কি অসীম। ইহার কূল কিনারা নাই। আমরা কতটুকুই বা দেখিতে পাই। আকাশ ব্যতীত অপর কোন অসীম বস্তু আর দেখ নাই। পৃথিবীর সীমা আছে, সমুদ্রের সীমা আছে। নিকটে হউক, দূরে হউক সীমা আছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সুনীল আকাশের কোন দিকের সীমা নাই। এই অসীম আকাশের মধ্যে এই নক্ষত্রগুলি রহিয়াছে। তুমি বহুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়াছ, এই সকল নক্ষত্র একএকটি সূর্য্যের মত। বহু দূরে যে সকল নক্ষত্র আছে তাহাদের দেখিতে পাওয়াই যায় না। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাহারা এ পর্য্যন্ত মানবের নয়নগোচর হয় নাই, অর্থাৎ আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল অগ্রসর হইয়াও দূরত্বের জন্য আজও পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। এই সকল নক্ষত্রও অগণ্য। এই অগণ্য নক্ষত্র-রাজী অসীম আকাশের মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে।

* এই প্রবন্ধ কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌সটিটিউটে ১৯১২ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই প্রবন্ধ প্রথমে লেখক তাঁহার নিজ পুত্রের প্রতি উপদেশ জন্য রচনা করেন। কয়েকজন বিদ্যার্থীর উপদেশ জন্য পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিত সমস্তই লেখকের নিজ ধর্ম্মানুসারে হইয়াছে। তৎসময়ের অবস্থানুসারে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের অনুযায়ী করিলে সাধারণ বিদ্যার্থী সকলেরই উপদেশ হইতে পারে। সভাস্থলে মাননীয় সভাপতি মহাশয় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

আকাশেরও শেষ নাই, নক্ষত্রেরও শেষ নাই। আবার এই সকল নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের মত গ্রহগণে বেষ্টিত। সে সকল গ্রহ উপগ্রহ দূরবীক্ষণ সহকারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের অস্তিত্ব কেবল আনুমানিক, বিচার-সাপেক্ষ মাত্র। এই সকল গ্রহ উপগ্রহ পরি-বেষ্টিত অসংখ্য নক্ষত্ররাশির মধ্যে সূর্য্য একটি, তাহার চারিদিকে আর কতগুলি গ্রহ উপগ্রহ নিত্য পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সকল সূর্য্যাশ্রিত গ্রহের মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ মাত্র। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ বড়, কত দূরে অবস্থিত। আমরা এই পৃথিবীর উপর বাস করিতেছি। এই গ্রহনক্ষত্র বিভূষিত সমস্ত আকাশের সহিত তুলনায় আমরা কি অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু এই বিষয়টা বেশ নিবিষ্টচিত্তে একটু বিবেচনা করিবে। আমি এমনই অনন্ত, অসীম আকাশের কথা বলিতেছিলাম। আর কোন অনন্ত অসীম জিনিষ জান কি? যে জিনিষ যত বেশি সে জিনিষ সেই পরিমাণে সকলেরই অনায়াস লভ্য এবং অক্লেশ প্রাপ্য। অপর যে সমস্ত পদার্থের কথা বলিতেছিলাম তাহা আর কিছু নয় অনন্ত কালের কথা। কাল পদার্থ কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিচার করুন। কিন্তু তুমি দুইটি অনন্ত বস্তু ভাবিবার জন্য পাইলে। ঐ উপরের, উপরেরই বা বলি কেন, ঐ চারিদিকের, উপরের—নীচের—পার্শ্বের অনন্ত আকাশ, আর এই অসীম সময়। সময় কবে সৃষ্ট হইল তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। অনন্তকালের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় কোন শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। তবে সৃষ্টি কথাটাই অসঙ্গত। অনন্তের এই অনন্ত বা মহাকাল (eternal time) নিশ্চেষ্ট ভাবে চিরদিন পড়িয়া আছে এবং তদুপরি এই অনন্ত মহাকাশে কি এক মহাশক্তির প্রভাবে কত গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক এই অনন্তকাল ও অসীম আকাশের বিষয় একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবালোক আসিয়া পড়িবে, কাকাদি পক্ষী ডাকিতে থাকিবে এমন সময়, তুমিও জীব-দেহের হস্তের ক্রিয়া সমাপন করণান্তর শুচি হইবে এবং পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। পরিষ্কৃত বস্ত্র বলিতে আমি মূল্যবান চাকচিক্য-শালী বস্ত্রের কথা বলিতেছি না। যাহাকে আমাদের আচারানুসারে পরিচ্ছন্ন বলে সেই-রূপ ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা আবশ্যক।

প্রাতঃকৃত্য।—প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা প্রাতেই সমাপন করিবে। উহা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল নহে, কিন্তু কি করিবে, উপযুক্ত সময়ে করিবার অবকাশ পাইবে না। তোমাকে দশটার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে। অগত্যা একেবারে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা বর্জ্জন না করিয়া বরং সময়ের পূর্ব্বে করা ভাল। একেবারে কোন সন্ধ্যা বাদ দেওয়া ভাল নহে। সন্ধ্যার ও তৎ-পরে পূজার জন্য যে সকল উপকরণ আবশ্যক তাহা স্বয়ং সংগ্রহ করিবে। গঙ্গা বা নিকটস্থ নদী, অভাবে পুষ্করিণী বা কূপ হইতে নিজে জল আনিবে। ফুল, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র প্রভৃতি যাহা যাহা দরকার স্বয়ং আহরণ করিবে। এই সকল এক স্থানে পাইবে না। নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। পর্য্যুষিত পুষ্প বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র এবং পূর্ব্ব দিনের আহৃত জল ব্যবহার করা অনুচিত। নিতান্ত ঠেকিয়া করিতে হয় তাহা আপদ্ধর্ম্মরূপে মনে করিবে। অর্থাৎ তাহা না করাই শ্রেয়ঃ। ইহা রীতিমত করিলে ইহকাল পরকালের মঙ্গল হইবে। এই সকল পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে যে পথ ভ্রমণ হয় ও ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহাতে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাতে ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল না। এটা বিদেশী লোকের সংস্পর্শে আমরা শিখিয়াছি। ধর্ম্মভাব কমিয়াছে, সন্ধ্যাপূজা বর্জ্জন হইতেছে বলিয়া দরকার হইয়াছে। অনেকে এইরূপ ভ্রমণকে "বৃথাটন" বলেন। ইহা প্রমাদজনক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ স্বাস্থ্যের জন্য প্রাতঃভ্রমণ জানিতেন না। তাঁহারা প্রাতে ভ্রমণ করিতেন না এমত মনে করিও না, খুবই বেড়াইতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোন্নতি নহে। সন্ধ্যা পূজার উপকরণ আহরণ করা। বল দেখি শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ঘুরিয়া বেড়ান এবং ভগবদর্চ্চনার জন্য পুষ্পাদি সংগ্রহ জন্য পুষ্পাদি সংগ্রহ জন্য ভ্রমণ ফলে দুইটি একই জিনিস হইলেও কোন উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে আমাদের শাস্ত্রে কেবল শরীররক্ষার জন্য কোন প্রয়াস করিবার কোন ব্যবস্থা বা উপদেশ নাই। শরীর ধর্ম্মসাধনের আদ্য কারণ হইলেও নিজের শরীর লইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। শরীরী অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মার ভাবনাই তাঁহারা ভাবিতেন। আত্মার উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতেন তাহাতে শরীর আপনা হইতেই ভাল থাকিত। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর তুমি কোন লোকের সুখসচ্ছন্দের জন্য বড়ই যত্ন কর, আন্তরিক চেষ্টা কর। তিনি কিসে ভাল খাইবেন, ভাল বস্ত্র পরিধান করিবেন, ভাল স্থানে শয়ন করিবেন তদ্বিষয় অনুক্ষণ চেষ্টা কর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবাস গৃহের কথা কি তুমি ভাবিবে না? তিনি যে গৃহে বাস করেন তাহা যদি বাসোপযোগী না থাকে তাহা হইলে তাঁহার কষ্ট হইবে। সুতরাং তাঁহার স্থানটি সর্ব্বাগ্রে ভাল অবস্থায় রাখিবার জন্যই স্বতঃই তোমার চেষ্টা হইবে। বর্ষার পূর্ব্বেই তোমার ভাবনা ছাদে কোথাও জল পড়ে কি না। হিম পড়িবার পূর্ব্বেই তোমার চেষ্টা দরজা জানালা ঠিক আছে কি না দেখা। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে শরীরস্থ আত্মার মঙ্গলকারী মানব শরীরের কুশল সাধনে অবশ্যই করিবে। তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই। আত্মার কিসে প্রকৃত হিতসাধন হইবে তৎপ্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে।

এই পূজোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার দুইটি মহাপুরুষের কথা স্মরণ হইতেছে তাহা তোমার শিক্ষার জন্য সংক্ষেপভাবে বলা আবশ্যক। এক জন তোমার অপবর্গ ভ্রান্ত পিতামহ দেব। তুমি যখন এক বৎসরের শিশু সেই সময় তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং সে দেবদেহের স্মরণ তোমার থাকিবার কথা নয়। তাঁহার কোন কথা এখানে বলিবার স্থান নহে। অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সময় পাইলে স্থানান্তরে বলিব। বলিবার অনেক কথা আছে। তিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলময়

দেবতা ছিলেন। এই লীলাক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়া কত কি যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা কোথায়? সে যাহা হউক যে সম্বন্ধে তাঁহার কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। তিনি কত রাত্রি থাকিতে উঠিতেন, কত প্রত্যূষে ফুলের সাজি হস্তে কত ধনী লোকের সুরক্ষিত, নির্দনের অরক্ষিত পুষ্পোদ্যানে গিয়া ফুল পত্রাদি চয়ন করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে প্রথম কিছু দিন তাঁহার একটু অসুবিধা বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ভক্তের মনের কষ্ট ভগবানই বুঝেন, শীঘ্রই তাঁহার সে অসুবিধার অপনোদন হইয়াছিল। এক দিন তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট তিনি উক্ত অসুবিধার কথা বলায় তাঁহার সেই বন্ধু কাশিমবাজারের স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর তদানিন্তন কলিকাতার কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট বলিয়া মহারাণী মহাশয়ার কলিকাতাস্থ উদ্যানে অবাধে পুষ্পাদি সংগ্রহের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় গিয়া প্রতিদিন পিতৃদেব নানাবিধ পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি প্রচুর আহরণ করিতেন। আবার কখন কখন পিতৃদেবের পরম বন্ধু সর্ব্বদেশ পূজিত মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীস্থ বাগান হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন। ক্রমশঃ অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায় তাঁহার পুষ্পচয়ন ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি প্রত্যূষে কত ভ্রমণ করিয়া কত ফুল বিল্বপত্রাদি আনিতেন। কঠোর শীতের দিনে যখন অনেক লোক জুতা মোজায় পদদ্বয় আবৃত করিয়াও শীতে ক্লিষ্ট বোধ করেন, সেই সময় তিনি শূন্য পদে শিশিরসিক্ত ও ধুলি বালুকা সংলগ্ন চরণে যখন প্রচুর ফুল ভার লইয়া প্রহৃষ্টমনে বাটী ফিরিতেন, তখন কি মনে হইত? রাজমুকুটধারী নরপতি হইতে দীনদুঃখী পর্য্যন্ত সেই চরণ রেণুর ভিখারী হইত। সে যাহা হউক ইহাতে তাঁহার শরীর ভাল থাকিত। মনও খুব প্রফুল্ল থাকিত। অপর যে মহাত্মার কথা বলিতেছিলাম তিনি আমার স্বর্গগত পিসা মহাশয় ৺ কালীচরণ বাচস্পতি। ইনি চিরদিন কাশীধামে বাস করিতেন। ৺ বিশ্বেশ্বরের সংসর্গে থাকিয়া, কর্ম্মফলে, চরিত্রবলে ইনিও জীয়ন্তেই শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বোধ হয় বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে নহে শয্যাগত হন। শয্যাগত হইবার পূর্ব্বে চিরদিনই তিনি গৃহের জন্য মাঠ হইতে কুশ, উদ্যান হইতে পুষ্প বিল্বপত্রাদি এবং গঙ্গা হইতে স্বহস্তে জল আনিতেন। যখন ৯০।৯৫ বৎসরের বৃদ্ধ হাতে ঝুলাইয়া ঘড়া করিয়া গঙ্গা হইতে জল আনিতেন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। শুধু তাহাই নহে। গৃহোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে ইহাঁর এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তাঁহার ইষ্টদেবের ভোগ্য মহার্ঘ্যবস্ত্র প্রস্তুতও তিনি স্বয়ং করিতেন। এইরূপে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া স্বধর্ম্ম পালনের ফল হইয়াছিল, তাঁহার দীর্ঘজীবন এবং নীরোগ শরীর। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ভ্রমণ করিতেন বটে কিন্তু সেটা শরীরের জন্য নহে তাহা গৃহোপকরণ সংগ্রহ জন্য। ধন্য তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধন্য তাঁহাদের কর্ম্ম ও চেষ্টা। সেইরূপ সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হইবে ও শরীর নীরোগ হইবে।

কথাপ্রসঙ্গে অপর এক কথা ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও সংশ্লিষ্ট কথা বলিয়া বলিতেছি। যেরূপ প্রাতভ্রমণের কথা বলিলাম, কেবল স্বাস্থ্যোন্নতি চেষ্টায়, শরীর ভাল রাখিবার জন্য প্রাতে ভ্রমণ করিবার কথা বলিলাম ও তদনুরূপ আর একটি ব্যবহার আজ কাল খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বায়ুসেবন জন্য স্থান পরিবর্ত্তন। আমরা সকলেই কর্ম্মের দাস। জপাদি সৎকর্ম্মের কথা বলিতেছি না। আমরা কেহ বা উদরান্নের জন্য, কেহ বা বিলাসিতার দায়ে পড়িয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতিনিয়ত কর্ম্মস্থলে, সহরে বা পল্লীগ্রামে বাস করি। কেহ কিন্তু একস্থানে চিরদিন থাকিতে সুখ বোধ করেন না, না করিবার কথা বটে। এক স্থান, সেই একরূপ পথঘাট, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারী, খাদ্য, পেয়, আচার ব্যবহার কতদিন ভাল লাগিবে? তাহাতে মন ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং শরীরও অসুস্থ হয়। এটা আজ বলিয়া নয় চিরদিনই হইতেছে। পূর্ব্বেও লোকে এক স্থানে চিরদিন থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন, এখনও করেন। নিতান্ত যোগী না হইলে একস্থান চিরদিন ভাল লাগিবে কেন? এই জন্যই বোধ হয় "স্থাণু" কথাটির অর্থ হইয়াছে। যিনি যোগী শ্রেষ্ঠ তিনিই কেবল একস্থানে চিরদিন থাকিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা কষ্টকর, সেই জন্য পূর্ব্বকাল হইতে তাহার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই ব্যবহার রকম ফের হইয়াছে তাহাই এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয়। পূর্ব্বে তীর্থদর্শন বলিয়া একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল। তীর্থস্থানগুলি সকলই খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু স্বাস্থ্যের চেষ্টায় কেহ তীর্থ যাইতেন না। তাঁহারা যাইতেন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য। সেকালে যখন রেল ষ্টিমার ছিল না যাঁহারা যানবাহন সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম, অধিকাংশ লোকেই পদব্রজে বহুদূরব্যাপী ভারতের নানা স্থানে তীর্থে যাইতেন। কোথায় চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, আর কোথায় সমুদ্রকূলস্থ দ্বারকাপুরী, কোথায় সেই হিমাচলশিখরস্থ বদরিকাশ্রম আর কোথায় সেই ভারত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-বেষ্টিত রামেশ্বর? এই সকল সুদূরস্থ স্থান সমূহে অবলীলাক্রমে সকলে যাইতেন, যাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দ অবহেলা করিয়া আত্মার যাহাতে তৃপ্তি হয় তাহাই করিতেন ইহকাল ভুলিয়া পরকালের ভাবনা ভাবিতেন। তীর্থবাসের আবার অনেকগুলি নিয়ম ছিল। সংযতভাবে ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতে হইত। শ্রাদ্ধতর্পণ, পূজা-অর্চ্চনা, জপহোমাদিতে তথায় কালাতিপাত করিতে হইত। এই সকল তীর্থস্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করিতেন, এখনও যে কোথাও করেন না তাহা নহে। তীর্থে যাইলে এই সকল মহাপুরুষগণকে দর্শন করা, তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। তীর্থে যাইয়া অন্ততঃ ত্রিরাত্রিবাস করিতেন। তাহাতে পথশ্রম দূর হইত, শরীর সুস্থ হইত, দুশ্চিন্তা স্থানে ধর্ম্মচিন্তা আসিয়া মনকে প্রফুল্ল করিত, আত্মা তৃপ্তিলাভ করিত। এই সকল ছাড়া ইহা একটি বড় সামাজিকতা শিক্ষার উপায় ছিল। যে কোন তীর্থে যাইলে দেখিবে ভারতের কত

দূর দেশস্থ কত শত নরনারী আসিয়া সমবেত। বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্ত সীমাস্থ লোক উত্তর পশ্চিমের অধিবাসী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়, ওড্রদেশবাসী, সকল স্থানের নানা প্রকার লোক এক উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত। সকলেই সকলকে ভক্তিবিনম্রনয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। বল দেখি এমন সার্ব্বজনিক মহাসভা (Congress) অন্য স্থানে হইতে পারে কি? যদি বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুমণ্ডলীর একত্র সমাবেশ দেখিতে চাও তীর্থে যাইবে। সকলের সহিত মিশিলে সকলের মনের ভাব, সামাজিক আচার ব্যবহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়াদি পাইলে তোমারও অভিজ্ঞতা বাড়িয়া যাইবে, হৃদয় প্রসারিত হইবে। প্রাদেশিক ভাব দূর হইবে। তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীকে পার্সী বলিয়া ভয় করিবে না, ওড্রদেশবাসীকে উড়িয়া বলিয়া ঘৃণা করিবে না, পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে বাঙ্গাল বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে না, এবং উত্তরপশ্চিমের লোককে খোট্টা বলিয়া অভিহিত করিয়া নিজের মনের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে হইবে না। মনে হইবে আমরা সকলেই এক। এত প্রকার উপকার সাধক তীর্থযাত্রার স্থানে আজ কাল ঘটিয়াছে কি? একেবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম বিহীন সমাজ হইতে দূরস্থিত প্রান্তর বা জঙ্গল মধ্যে অবস্থান। যেখানে গিয়া কেবল শারীরিক স্বচ্ছন্দ চেষ্টা, তাহা বৈধ উপায়েও বটে অবৈধ উপায়েও বটে। সমাজের ভয়ে যে সকল আচার বাটীতে সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না এই সকল নিভৃত স্থানে গিয়া কেহ কেহ তাহাই করিয়া থাকেন। কোন সামাজিক শিক্ষা হয় না, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। এ সকল ভাল আচার নহে। ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পুষ্পাদি চয়ন করিয়া আসিয়া, পদ ধৌত করিয়া পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে এবং পূজার অপর যে কিছু আয়োজন করিতে হয় নিজেই করিয়া লইবে। অর্থাৎ চন্দন পেশন, নৈবেদ্য প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্যও নিজেই করিয়া লইবে। তৎপরে পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবে। তদনন্তর পূজা। তোমার এখন ও দীক্ষা হয় নাই। দীক্ষা হইলে পর গুরুপদেশ মত পূজা করিবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই করিবে। শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা করিবে। পূজার আড়ম্বর করিবে না। সামান্যভাবে ভক্তির সহিত শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। সাধারণ কথা মনে রাখিবে, ভক্তের ভগবান। ভক্তির ন্যায় পূজার উপকরণ আর কিছুই নাই। আর শিবের প্রণাম মন্ত্রের একটি সার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি তাহাই প্রকৃত কথা। "নিবেদয়ামিচাত্মানং", বলিয়া যখন প্রণাম করিবে, তখন প্রকৃতপক্ষেই সেই দেবাদিদেব মঙ্গলময় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূজার আড়ম্বর করিবে না যত সংক্ষেপে হয় সারিবে। স্তব স্তোত্রাদির বাহুল্যে অনেক সময়ক্ষেপ করা তোমার এক্ষণে উচিত নয়। এ সম্বন্ধে একটি কথা তোমার মনে আছে কি না জানি না। একবার পূজার অবকাশে তুমি ও আমি ৺ কাশীধামে ৺ দুর্গাবাড়ীর দক্ষিণে শঙ্করমোচনের নিকট আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তের বাগান বাটীতে বাস

করিয়াছিলাম। সে সময় উক্ত বাগানের নিকটস্থ আর একটি বাগানে একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। ব্রহ্মচারী বাঙ্গালির ছেলে কিন্তু বহু দিন সংসার ত্যাগ করিয়া এক্ষণে হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট আসিতেন। তাঁহার সহিত অনেক সময়ে অনেক ভাল কথা হইত। তাহার মধ্যে এখানে উল্লেখ যোগ্য বিষয়টি মাত্র বলিতেছি। একদিন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, "আপনি দেব-কার্য্য প্রত্যহ কি করেন?" তাহাতে তিনি যে উত্তর দেন তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন "আমি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা, শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা ব্যতীত অপর কিছুই করি না।" এমন কি সময়াভাবে তাঁহার প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শনও ঘটিয়া উঠিত না। তিনি তখন দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভগবান বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিতে-ছেন। অপরের দয়ায় উপজীবিকা চলিতেছে। তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি বলিলেন "এক্ষণে দর্শন শাস্ত্র আয়ত্তাধীন করাই তাঁহার লক্ষ্য, বিদ্যাভ্যাসই তাঁহার তপস্যা।" আমি বলি "তোমার এখনও তাহাই। বিদ্যাভ্যাসই তোমার তপস্যা, নিতান্ত ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্য যাহা দরকার তাহা ব্যতীত আর কিছুতেই মনোনিবেশ করিবে না, করিলে উপকার না হইয়া অপকার হইবারই সম্ভাবনা।" বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচারক ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্য-দেবও শিক্ষা শেষ না করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনো-নিবেশ করেন নাই।

পাঠাভ্যাস।—এইরূপে প্রাতঃ-কৃত্য সমাপনানন্তর পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দিবে। কিন্তু নিজের পড়া শুনা করিবার পূর্ব্বে তোমার কনিষ্ঠ সহোদরের লেখা পড়ার দিকে দৃষ্টি করিবে। যদিও আমি তাহার লেখা পড়া দেখিতেছি এবং যাহাতে তাহার পড়া শুনা ভাল করিয়া হয় তদ্বিষয় মনোযোগী আছি, কিন্তু এ কথা তোমার সর্ব্বদা মনে রাখা চাই, যে তাহার লেখাপড়া যাহাতে ভালরূপে হয় তাহার তত্ত্বাবধান করা এবং দরকার মত তাহার প্রয়োজনানুসারে তাহাকে সাহায্য করা তোমারই কর্ত্তব্য। ইহাতে তাহার পড়া শুনা ভাল হইবে এবং ইহার আর একটি অনন্তর সুফল আছে। ইহাতে সৌভ্রাত্র যেন আরও ঘনিষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে একটি বিষয় তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। যদি তোমার কনিষ্ঠ তোমার শিক্ষার অর্থগ্রহণ শীঘ্র করিতে না পারে, তাহা হইলে, তুমি তাহার উপর রাগ করিবে না, বা কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিবে না। তাহাকে শাসন করিতে নিষেধ করি না, তবে শাসন যেন এমত না হয় যে ভবিষ্যতে সে তোমার নিকট পড়িতে বা শিক্ষা জন্য যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে। বিদ্যাভ্যাস পক্ষে ইহা অপেক্ষা ক্ষতি-কর আর কিছুই নাই। তাহাকে নিঃসঙ্কোচে ও অবাধে তোমার নিকট পড়া বলিয়া লইতে দিবার সুযোগ দেওয়া চাই। তবে তোমারও পড়া শুনা আছে, সুতরাং একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, ঠিক সেই সময়ে সে তোমার নিকট শিক্ষা লাভ করিবে। যদি তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটি বা অভাব বোধ কর তাহা আমাকে জানাইবে। তৎপরে

তুমি যতক্ষণ সময় পাও নিজের লেখাপড়া করিবে। কতক্ষণ কোন বিষয় পড়িবে বা কি ভাবে পড়িবে, তাহা এখন আর তোমাকে বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে লেখা পড়া করিতে হইবে। যে কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, সকল বিষয়ে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনায় সময় ক্ষেপ করিবে। তবে একটি কথা মনে রাখিবে, যাহা আজ করিতে পার, কাল করিবে বলিয়া কখন রাখিয়া দিবে না। যখন যাহা পড়িবে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিবে। যখন দেখিবে কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতেছ অথচ তাহাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ হইতেছে না, তখন তাহা অধ্যয়ন হইতে ক্ষান্ত হইবে।

আহার। পড়াশুনা শেষ করিয়া আহার করিবে। কোনরূপ দুশ্চিন্তা না করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত আহার করিতে যাইবে। আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তাড়াতাড়ি আহার করিবে না। আস্তে আস্তে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। আস্তে আস্তে খাইলে ক্ষুধার পরিমাণের সহিত খাদ্যের সামঞ্জস্য হইতেছে কি না তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে এবং তাহা হইলে যখনই খাদ্য ভাল লাগিবে না মনে করিবে অমনই আহার বন্ধ করিবে। তদভাবে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। কি খাইবে, কি না খাইবে সে ভাবনা তোমার জননীর, তোমার সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তিনি যাহা দিবেন তাহাই আহার করিবে। আহার সম্বন্ধে একটি মোটা কথা আছে, "কেহ কেহ আহারের জন্য জীবন ধারণ করেন, অপর কেহ কেহ জীবন ধারণ জন্য আহার করেন।" বলা বাহুল্য প্রথমোক্ত লোককে সকলে ঘৃণা করেন। এই সকল উদরপরায়ণ চির দিনই সকলের নিকট ঘৃণিত। সমাজে ঘৃণিত, পরিবার মধ্যে কেহ কিছু বলুন বা না বলুন ঘৃণিত। আহার একটি জন্তু-ধর্ম্ম। ইহা পশুদের সহিত আমাদের সাধারণ কর্ম্ম। তাহারা সমস্ত দিন আহারান্বেষণ করে। মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? পশুরা যাহা করে, মানুষ তাহা যতদূর না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। তাহার সাফল্যের নামই মনুষ্যত্ব, আর তাহা হইতে যত দূরে থাকিবে, তাহা করিতে যতটা অকৃতকার্য্য হইবে ততটাই মানুষের পশুত্ব। জীবন ধারণ করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য যতটুকু আহার না হইলে চলিবে না ততটুকু মাত্র আহার করা চাই। আহার্য্য বস্তু অস্বাস্থ্যকর না হইলেই হইল। সুমিষ্ট আহার্য্য জিনিস খাইয়া সুখবোধ করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে। ভাল জিনিস অবশ্যই সকলেরই ভাল লাগিবে, তোমারও ভাল লাগিবে। তাহা খাইতে নিষেধ করি না। তবে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে না, আকাঙ্খা করিবে না। তাহার জন্য স্পৃহা থাকিবে না, লালসা থাকিবে না। অযাচিতভাবে সম্মুখে উপস্থিত হইলে অবশ্য ত্যাগ করিবে না। এই জিনিসটি খাইতে ভালবাস, এই জিনিসটি না হইলে আহার হয় না, অথবা এই জিনিসটি খাইতে পার না বা চাহ না এরূপ কথা লজ্জার বিষয়। যাহা কেহ খাইতে পারে তাহাই তোমার আহার্য্য। তবে পানাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য, দেশাচার, লোকাচার, পারিবারিক আচার,

মানিয়া চলিবে। খাইতে বসিয়া বিচার করিবে না। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ অথবা আপৎকালে বা লাচারে পড়িয়া খাইবার বিধি আছে, তাহা বর্জ্জন করিবে। এমন অনেক জিনিস আছে যাহা শাস্ত্রে নিষেধ নাই, অথচ দেশাচার বা লোকাচার অনুসারে আহারে নিসিদ্ধ, এরূপ বস্তু কদাচ খাইবে না। আবার অনেক পরিবারে অনেক বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে। বাটীর গৃহিণীরা এবিষয়ের শাস্ত্র-বর্ত্তী। তাঁহাদের কথা মান্য করিয়া চলিবে। তাঁহাদের নিষেধ বাক্য অবশ্য প্রতিপাল্য। মোট কথা পানাহার সম্বন্ধে যে কেহ যাহা কিছু নিষেধ করেন তাহা ত্যাগ করিবে। তাহা ব্যতীত যে যাহা দেন তাহাই গ্রাহ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, M.A., B.L.,

প্রেমময়।

(শ্রীহীন-পাগল-লিখিত*)

(১৪৩ পৃষ্ঠায়† প্রকাশিত অংশের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্তর-রাজ্য।

সেই ভাগ্যবান পুরুষ দিব্যালোকে আলোকিত সেই গুহাভ্যন্তরস্থিত সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গোপরি দোদুল্যমান রূপাতরিতে আরোহণ পূর্ব্বক, সুকৃতিদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেবি, এই ক্ষুদ্র গুহার মধ্যে এমন অপূর্ব্ব রাজ্য!—এ যে স্বপ্নের অগোচর!"

সুকৃতি। "নাথ, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যে যে কত অদ্ভুত অপূর্ব্ব পদার্থ আছে, তা'র সংখ্যা করা মানুষের সাধ্যাতীত। তুমি যে সৌর জগতের পৃথিবীতে বাস ক'চ্ছিলে, সেই জগতে এবং সেই পৃথিবীতে যা কিছু আছে—যা কিছু তোমরা জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে

* সম্পাদক মহাশয়ের কাছে, গৃহস্থের পাঠক পাঠিকাদের কেহ কেহ আমার নামে এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তাঁহাদের আর্জ্জি "আমার লেখা বোঝা যায় না।" নালিশ পাইয়া সম্পাদক মহাশয় আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন, শুধু কৈফিয়ৎ নয়, আমার লেখার ব্যাখ্যা চাহিয়াছেন। আমার কৈফিয়ৎ "যদি আমার লেখা বোঝাই যাইবে তবে আর আমি পাগল কেন? গঞ্জিকার ঝোঁকে যখন যে খেয়াল দেখি, তাই আমার কাছে সত্য-তত্ত্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়, আমার সমধর্ম্মী বই অন্যের তাহা অবশ্যই দুর্ব্বোধ্য। পাগলের পাগলামীর অর্থ করা দুষ্কর। টীকা টিপ্পনী লেখা আমার ব্যবসা নয়। অতএব আমাকে টীকার দায়ে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয়।"—(শ্রীহীন পাগল)

† ভ্রমক্রমে গত চৈত্রের প্রথম ফর্ম্মার, পত্রাঙ্কে ভ্রম হইয়াছে। ১০৫ এর পরিবর্ত্তে ১৩৭ ও পরবর্ত্তী পত্রাঙ্কগুলি যথাক্রমে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।—গৃহস্থ সম্পাদক।

প্রত্যক্ষ ক'ত্তে সমর্থ হ'য়েচো, সে সমুদায় ত এই গুহা মধ্যে আছেই,—তদ্ব্যতীত এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা তোমাদের সে জগতে থাক্‌লেও, তা প্রত্যক্ষ করা জড়-বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত। তথায় অনন্ত কাল ধ'রে যে সকল ঘটনা ঘটেচে—ঘট্‌চে—ঘট্‌বে—এ গুহার মধ্যে সে সমুদায় এককালে নিত্যবর্ত্তমান।—তুমি বল্‌চো এ গুহা ক্ষুদ্র। বাহির হ'তে ক্ষুদ্র বোধ হ'লেও—এ গুহা অনন্ত। এ গুহা **এক** অথচ **অনেক**। এ সকল বিষয়ের তত্ত্বই তুমি দাদাদের কাছে শুন্‌তে পা'বে। তা'র পর মায়ের কৃপা হ'লে নিজে প্রত্যক্ষ কোরে কৃতার্থ হ'বে।—এখন কোথা যা'বে বল?"

"কোথাও ত যেতে ইচ্ছা হ'চ্চে না। ইচ্ছা হ'চ্চে এই খানে ব'সে, তোমার মুখের মধুমাখা বাক্যগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে নিরন্তর সুধামাখা নামটি জপ করি আর কেবল ঐ ঊর্দ্ধপানে চেয়ে থাকি।—আহা! কি সুন্দর আকাশ!—কেমন সুনীল বর্ণ—বাহিরের আকাশের ত এমন সুন্দর বর্ণ নয়—এ যেন সেই নীলোৎপলদলশ্যামল-সুন্দরের সুন্দর দেহদ্যুতি-মাখা! আহা ঐ আকাশের ঐ সুন্দর বর্ণে প্রাণে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হ'চ্চে, বোধ হ'চ্চে যেন সেই প্রাণারাম শ্যামসুন্দর, হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের নিকটে আস্‌চেন।"

"তিনি আর আস্‌বেন কি?—তাঁ'র কি আসা-যাওয়া আছে?—তিনি ত নিরন্তর আমাদের অঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে মিলিত হ'য়ে আছেন। দু'দিন দেরী কর সেই রঙ্গনাথের এই সুবিশাল রঙ্গভূমির রঙ্গ দেখে প্রাণ পরিতৃপ্ত কোত্তে সমর্থ হ'বে।—তবে দাদাদের সঙ্গে দেখা কোত্তে যা'বে না?—যদি এখেনেই থাক্‌বে? তবে নৌকায় ওঠবার দরকার কি ছিল?—এই ভাগীরথীর তীরে ব'সেই ত সব দেখ্‌তে পাত্তে।"

"তরঙ্গিণীর তরঙ্গের সঙ্গে তরণীখানি কেমন দুল্‌চে!—অনন্ত আকাশের কোলে থেকে সেই মধুমাখা নামের ধ্বনি দিগন্ত পূর্ণ ক'রে কেমন দুল্‌তে দুল্‌তে আস্‌চে—সেই নামকীর্ত্তন কে ক'চ্চে জানি না—কিন্তু তা'রি তালে তালেই যেন তরিখানি নাচ্‌তেছে, আর সেই সঙ্গে আমার হৃদয়ও নেচে নেচে সেই নাম গান ক'চ্চে। আমি প্রাণের ভিতর শুন্‌তে পাচ্চি তুমিও সেই নাম গান ক'চ্চো—রুচিও গান ক'চ্চে।—আর—আর—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জড়াজড় সকল পদার্থ—প্রত্যেক পরমাণু যেন সেই নাম গানে মত্ত হ'য়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে বেড়া'চ্চে। দেখ্‌তে পা'চ্চি না অথচ যেন স্পষ্টই দেখ্‌তি পা'চ্চি। কি সুন্দর!"

"নাথ, তোমার এ অবস্থাটি যদি স্থায়ী হয়, তবে তুমি অচিরেই কৃতার্থ হ'বে। এখন বল, আমরা অগ্রসর হই। তোমার ইচ্ছা না হ'লে ত নৌকা চল্‌বে না। এ নৌকা অমনি নাচ্‌তে নাচ্‌তেই চল্‌বে। যদি ভাগ্যে থাকে ত ও গান চিরদিনই অমনি শুন্‌তে পা'বে—অন্তর-রাজ্যের এ প্রকৃতি-শোভা এমনই দেখ্‌তে পা'বে—ঐ সুনীল অম্বর সর্ব্বদাই আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে থাক্‌বে—তবে আর এখানে বিলম্বের প্রয়োজন কি?"

"না! তুমি যখন যেতে বল্‌চো তখন যাবো বৈ কি?—তোমার দাদাদের সঙ্গে—দিদির

সঙ্গে দেখা কর্‌বো বৈ কি? তাঁ'রা কি আমায় চেনেন?"

"জন্মান্তর থেকে চেনেন্। তাঁ'রা নিত্যে বাস ক'চ্চেন—তুমি দিন কয়েক চক্ষের আড়াল হ'য়েছিলে ব'লে কি তাঁ'রা ভুলে যেতে পারেন?—আমি কি ভুলে গিয়েছিলাম।"

"তোমার সঙ্গে স্বতন্ত্র সম্পর্ক।"

"না নাথ, স্বতন্ত্র নয়। তুমি পরতন্ত্র হ'য়েছিলে বলেই এমন মনে ক'চ্চো। ব্যষ্টিভাবে **আমরা**। কিন্তু সমষ্টিভাবে **তুমি**। স্বতন্ত্র নয়—সবি **এক**। এই দেখ নাথ, আমার বড় দাদা কর্ম্মদেবের ঘাটে আমরা এলাম। এখন উঠে এস, দাদার সঙ্গে দেখা কর; পুত্রটিকে আশীর্ব্বাদ কর। সে আজ তোমায় এখানে আন্‌তে পেরে—এত দিনে পুত্রোচিত কার্য্য ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছে। ঐ দেখ নাথ, আমার দাদার সঙ্গে আমাদের হৃদয়নন্দন **পুণ্যচন্দ্র** আস্‌চে, ওকে বক্ষে ধারণ ক'রে বক্ষ শীতল কর।"

এমন সময়ে **কর্ম্ম, পুণ্যের** হস্তধারণ পূর্ব্বক সেই তীর্থাবতরণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সেই পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আরে, কে ও? জীব যে—এই যে সৌভাগ্য বলে সুকৃতির সঙ্গে একাঙ্গ হ'য়েচ। বেশ, বেশ,—এস, এস," এই বলিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নৌকা হইতে নামাইলেন। পরে রুচিকে দেখিয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ মেয়েটি ত! আয় বেটি, কোলে আয়, এই তোর দাদাকে প্রণাম কর।"

রুচি কর্ম্মের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক, পুণ্যকে প্রণাম করিল।

পুণ্য রুচির হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "ভাই, রুচি, কায়মনে পিতৃসেবা ক'রো। দেখো, যেন ক্ষণেকের তরেও তাঁ'রে ত্যাগ ক'রে আর স্থানান্তরে যেয়ো না। উনি অনেক কষ্ট সহ্য কোরেচেন, আর যেন তেমন না হয়।"

রুচি বলিলেন "না,—দাদা, আমি বাবাকে ছেড়ে এক দণ্ড থাক্‌তে পারিনে। উনি আমায় বড় ভালবাসেন। একদণ্ডও চক্ষের আড়াল ক'ত্তে পারেন না।"

এদিকে কর্ম্মদেব, জীবকে নদীতটে আনয়ন পূর্ব্বক, গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ভাই, জীব, অনেক কর্ম্মভোগ ক'রেচ, অনেক বার এখানে এসে, কেবল কর্ম্ম বা অকর্ম্ম গুহায় ভ্রমণ কোত্তে কোত্তে বাহির হ'য়ে গিয়েচে। এবার যখন সুকৃতির সঙ্গে একাঙ্গ হ'য়েচ, তখন আর অপথে যা'বার সম্ভাবনা নাই, এই বার নৈষ্কর্ম্ম্য গুহার মধ্য দিয়ে জ্ঞান-ভাইয়ের নিকটে যাও—অথবা চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্চি। রুচি, পুণ্য, তোরাও আয়, তোদের জ্ঞান-মামাকে দেখ্‌বি চল। সে বড় ছেলে ভালবাসে।"

তখন তাঁহারা সকলে গঙ্গাতীর হইতে দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক, এক গুহাগৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। সেই দ্বারে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ
অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু
স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

সেই দ্বার পার হইয়া একটি নাতিপ্রশস্ত পথ। সেই পথে একটু গমন করিলে, দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বার, দক্ষিণ ধারের দ্বারের উপর

লেখা **কর্ম্মপথ**। পথটি তত প্রশস্ত নয়। বাম পার্শ্বের দ্বারের উপর লেখা **অকর্ম্ম-পথ**। সেই পথটি বেশ সুপ্রশস্ত সরল ও সুন্দর।

কর্ম্মদেব বলিলেন—"ভাই, জীব, ইতঃপূর্ব্বে তুমি বহুবার এই দু'টি পথ দোরে বাহিরে গিয়েচ, এবং প্রতিবারই কিছু দিন বাহিরে অবস্থান কোরে আবার ফিরে এসেচ, এবার সুকৃতি তোমায় ও দুই পথের কোনো পথেই নিয়ে যা'বেন না। এবার বরাবর সোজা গিয়ে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানদেবের কক্ষে উপ-নীত হ'বে। সেখানে তা'র কাছে যা কিছু জান্‌বার জেনে, আমাদের অগ্রজা ভগিনী ভক্তিদেবীর আশ্রমে গমন কোর্ব্বে। তা'র আশ্রমের শোভা দেখ্‌লে তোমার মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত হ'বে সন্দেহ নাই।"

জীব। "এ পথের নাম কি?"

কর্ম্ম। "এ পথের নাম, অদূরবর্ত্তী দ্বারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লিখিত আছে। সেখানে গেলেই জান্‌তে পার্বে।"

এই কথা শেষ হইবার একটু পরেই তাঁহারা দ্বারের সমক্ষে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, লেখা—

নৈষ্কর্ম্ম্য পথ।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমচ্যুতভাববর্জিতম্
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"

জীব। "এ শ্লোকটির অর্থ কি?"

কর্ম্ম। "মোক্ষের সাধক নৈষ্কর্ম্ম্য ও অবি-দ্যার নিবর্ত্তক নিরঞ্জন জ্ঞান যদি ভগবদ্ভক্তি- শূন্য হয়, তবে তাহার বিন্দুমাত্রও শোভা থাকে না; অতএব সাধন সময়ে এবং ফলদানকালে দুঃখ-প্রদ যে কাম্য কর্ম্ম এবং কামনাহীন যে কর্ম্ম এই সমুদায়ই শ্রীভগবানে অর্পিত না হইলে নিরর্থক বলিয়া জানিবে। ভাই, অচ্যুত-ভাবাশ্রিত কর্ম্মই কেবল মাত্র নৈষ্কর্ম্ম্য নামে অভিহিত। বস্তুতঃ কোন কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে না, অতএব অচ্যুত-প্রীতির কামনায় কৃত যে কর্ম্ম তাই নিষ্কাম। কেবল তাই পাপ ও পুণ্যের অতীত। সেই জন্য শাস্ত্র মধ্যে শ্রীভগবান ব'লেচেন—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি পুণ্যায় কল্প্যতে।"

এখন এখানে আর বিলম্ব কর্‌বার দরকার নাই; ঐ অদূরে **জ্ঞান**-দেবের গুহা। বহু দিন আমি ভাইটিকে দেখিনি, তাই আজ তোমার সঙ্গে তা'রে দেক্তে এলাম। আমি সংসারী সে নিঃসঙ্গ। এই দেখ লেখা রয়েছে "**জ্ঞান-নিলয়।**" তা'র নীচে কি লেখা আছে দেখ।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

বস্তুতই জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। কিন্তু সেই পবিত্র জ্ঞান, যোগমার্গাশ্রয় ব্যতীত লাভ হ'বার সম্ভাবনা নাই। যোগের চরম ফল এখন কিছু জানা, যা জান্‌লে জগ-তের সকল তত্ত্বই নখদর্পণবৎ হ'য়ে যায়। শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ক'রে যে এই পথে যায়, তা'র যে কি সুখ, তা'রি ছায়ামাত্র, আজ তুমি দেখ্‌চো, কিছু দিন পরে যোগসংসিদ্ধ হ'য়ে আত্মারামাবস্থায় প্রত্যক্ষ ক'রে তৃপ্ত হ'বে।

ঐ দেখ, আমার প্রাণের ভাই জ্ঞান অজিনাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আত্মানন্দে বিভোর হ'য়ে চতুঃশ্লোকী-রহস্য প্রত্যক্ষ ক'চ্চেন।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে জ্ঞানদেবের নিকটে গিয়া "ভাই, জ্ঞান" বলিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। চকিতে দুই অঙ্গ এক হইল। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলন হইল।

তখন জ্ঞানদেব অগ্রসর হইয়া দুই হস্তে জীবের হস্ত-দু'টি ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—"জীব, বহুদিনের পর আবার তোমায় দেক্তে পেলাম। অচিরেই তুমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে আবার সেই আনন্দময়ের আনন্দরাজ্যে নিত্যানন্দ-সঙ্গের অধিকারী হ'বে সন্দেহ নাই। বাপ্, পুণ্য, তোমার ছোট মা নিবৃত্তিদেবী ঐ গুহায় তপোনিরতা আছেন, তাঁ'কে তোমার পিতার আগমন সম্বাদ দাও। তাঁ'কে ব'লো তিনি যেন শীঘ্র বিবেক আর বৈরাগ্যকে সঙ্গে কো'রে এখানে আসেন। ভাই, তা'রা দু'টি তোমারই পুত্র, দু'জনেই নিবৃত্তি-গর্ভজ। তুমি বহুদিন তা'দের ভুলে, শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়ার বশে সংসার মরুভূমে বিষয়-মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হ'য়েছিলে,—প্রবৃত্তির মায়া-কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে অনিত্যকে নিত্য—অসুখকে সুখ মনে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। এখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তুমি যে হরিদাস তা বুঝ্তে পেরেচ। নিরন্তর নাম-জপই যে তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য, তা বুঝ্তে পেরেচ—মুল্লুকের অধিপতি মনের কাছে লাঞ্ছিত হ'য়েচ—গঙ্গায় ভেসেচ। নাম জপ-ব্রত গ্রহণের ফলে আমার সঙ্গে মিলিত হ'লে। আমিই অদ্বৈত—আমিই শঙ্কর—"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।" এই অদ্বৈতের সহায়তায় অচিরাৎ তোমার চৈতন্য লাভ হ'বে। তখন চৈতন্যের কৃপায় নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অনন্তকাল নাম-মহিমা প্রচার কোরো।" তোমার স্মরণ হয় কি—আর একবার আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?—না।—স্মরণ হ'বার সম্ভাবনা নাই। কারণ এখনও তুমি মায়ার আবরণে আবৃত আছ। প্রপন্ন হ'য়ে তাঁ'র চরণাশ্রয় কর। কে তিনি?—তিনিই তোমার গুরুদেব—তাঁ'র অন্য স্বরূপ জান্‌বার আজো সময় হয় নি। এখন—

> "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
> গুরুরেব পরং ব্রহ্ম————————"

জেনে তাঁ'র শরণাপন্ন হও। নিরন্তর—

> "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্।
> স্থাবরং জঙ্গমং চৈব প্রণমামি জগন্ময়ম্।"

বোলে তাঁ'র চরণে প্রণত থাকো। আর কিছুই চাই না ভাই। চাইতে গেলে চাইবার জিনিস্ এতো দেক্তে পা'বে যে চেয়ে শেষ ক'ত্তে পা'বে না। তা'র চেয়ে কিছুই চেয়ো না। তোমার যা দরকার, তা তিনি জানেন। যেমন কোরে যে জিনিসটি যখন দিলে তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হ'বে, তা তিনি তোমার চেয়ে জানেন। তুমি তাঁ'র নাম-রূপ-স্বরূপ যে মহাবীজ শ্রীগুরুকৃপায় পেয়েচ তা'তে দিন রাত লেগে থাক—

> "হরসোঁ লাগি রহ রে ভাই।
> তেরা বনত বনত বন যাই।"

এমন সময়ে নিবৃত্তিদেবী আসিয়া জীবের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। বলিলেন "ভগিনি, সুকৃতি, তুমি

ধন্যা। ধন্য পুত্র গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে। আজ সেই কুলপ্রদীপ পুত্রের কল্যাণে আমরা আবার একত্রিত হ'তে পেলাম। বৎস বিবেক, বৎস বৈরাগ্য, তোমরাও পুণ্যের ন্যায় তোমাদের জনকের কল্যাণ উদ্দেশে নিরন্তর এঁর সেবা-রত হও। আমি ভগিনী স্বকৃতির মত পতি-অঙ্গে মিলিতা হই।" এই বলিয়া নিবৃত্তিদেবী স্বামী-বক্ষে বিলীনা হইলেন।

জ্ঞান বলিলেন "জীব, আজ তুমি ধন্য হ'লে। আজ থেকে স্বকৃতি আর নিবৃত্তি তোমার অঙ্গ হ'লেন। পুণ্য, বিবেক আর বৈরাগ্যের সহায়তায় বিপুল বল লাভ কোরে—আর আমার রুচি-মাকে কোলে কোরে নিরন্তর নাম ক'ত্তে থাক। এখন চল আমার অধিকৃত এ রাজ্যটি তোমায় দেখাই গিয়ে।"

এই বলিয়া জ্ঞানদেব জীবের দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক, গুহা হইতে বাহির হইলেন। রুচি পিতার বাম হস্ত ধারণপূর্ব্বক চলিলেন। পশ্চাতে বিবেক, বৈরাগ্য ও পুণ্য। বৈরাগ্য তালবৃন্ত লইয়া পিতৃ-অঙ্গে ব্যজন করিতে করিতে চলিলেন।

গুহার বাহিরে আসিয়া, জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলেন "জীব, কোন্ দিকে যা'বে ?"

জীব। "যে দিকে আপনাদের ইচ্ছা। আমি ত কোন দিকের কথাই জানি না।"

জ্ঞান। "তবে চল।—এই যে দক্ষিণ দিকে এই প্রশস্ত রাজপথটি দেক্তে পা'চ্চ ? এটির নাম সত্য যুগ। পৃথিবীতে সত্যযুগে যে সকল ঘটনা ঘটে, এই রাজ্যের এই অংশে সেই সকল ঘটনা নিরন্তর ঘট্‌তেচে। এখানে সেই সত্যযুগের মধুকৈটভবধ, দেবাসুরযুদ্ধ, সমুদ্রমন্থন প্রভৃতি নিরন্তর হ'চ্চে। কিন্তু এ পথে যা'বার অধিকার আজো তোমার হয় নি। তা'র পার্শ্বে ঐ সরণিটি ত্রেতাযুগ। ওখানে রামরাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি ত্রেতাযুগের লীলা-নিচয় নিরন্তর সংঘটিত হ'চ্চে। বাম পার্শ্বের ঐ পথটি দ্বাপরযুগ। ওখানে দ্বাপর-লীলানিচয় নিরন্তর সংঘটিত হ'চ্চে। আর বামের এই পথটি কলিযুগ। এস আমরা এ যুগচতুষ্টয়কে পশ্চাতে রেখে নৈষ্কর্ম্ম্য পথে ঐ অনন্তের দিকে যাই। দেখ, ভাই, আমার দু'টি অনুচর আছে, একটির নাম বাক্য আর একটির নাম মন। আমি তা'দের দু'জনকে ঐ অনন্তের সন্ধানে পাঠিয়েছি, কিন্তু তা'রা আজিও ফেরে নাই।"

জীব। "মন ত গুহা-প্রবেশ-দ্বারে আমার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রেছিল। আপনি তা'রে কবে পাঠিয়েছেন ?"

জ্ঞান। "অনেক দিন পাঠিয়েচি। গুহা-দ্বারে মন তোমায় আক্রমণ ক'রেছিল বটে। তা'তে যে সে আমার আজ্ঞা অমান্য ক'রেচে এমন মনে কোরো না। তা'রা দু'টিতে গেছে, তা'তে সন্দেহ নাই। আমাদের এ অপূর্ব্ব রাজ্যের অপূর্ব্বত্ব এই—এখানে আমরা এক হ'য়েও বহু। এখানে অনন্ত গুহাদ্বারে অনন্ত স্বকৃতি স্বীয় পতি জীবের জন্য দণ্ডায়মান আছে। শ্রীগুরুদেব অনন্ত দেহে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়কে স্বকৃতির সহিত মিলিত কোরে, নাম-মহামন্ত্রদানের জন্য ব্যাকুলবৎ "আয় বাপ্" ব'লে কোল পেতে দাঁড়িয়ে আছেন। অবোধ জীব, তাঁ'র কোলের ছেলে হ'য়েও কোলে ফিরে আস্‌তে চায় না। স্বকৃতি নিবৃত্তিকে ভুলে, পুন্নাম-নরক-ত্রাণকারি বিবেক, বৈরাগ্য, পুণ্য ও নিত্যবোধ এই পুত্রচতুষ্টয়কে ভুলে,—শ্রদ্ধা, রুচি প্রভৃতি তনয়াগণের

মমতা ভুলে—পাপীয়সী প্রবৃত্তির সঙ্গে তা'র উপনায়ক কাম ক্রোধাদির কুহকে ভুলে, স্বীয় জারজ সন্তানগণকে নিয়ে সুখে সংসার-কান্তারের অপর পারে অবস্থিত বিষয়রাজ্যে বাস ক'চ্চে। আমার অনুচর বাক্য আমার আদেশ পালনের—আমার সেবার জন্য নিরন্তর আমার কাছে থেকেও অনন্তজীবের মুখে মুখে নৃত্য ক'চ্চে। আর মন আমার সেবায়—আমার পিতার সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত থেকেও অনন্তজীবহৃদয়ে নিরন্তর নৃত্যপরায়ণ আছে। আমি জ্ঞান আজ কর্ম্মের সঙ্গে একাঙ্গ হ'য়ে তোমার এই অন্তর রাজ্যে তোমায় নিয়ে বেড়াচ্চি। আমি অনন্তে শিবরূপে বর্ত্তমান—অথচ অনন্তজীবব্যূহের অন্তর-রাজ্যেও অনন্ত শিবরূপে বর্ত্তমান। আগে তুমি তোমার এই অন্তর-রাজ্যের সাহায্যে এ রহস্যগুলি প্রত্যক্ষ কোরে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন অনন্তের অন্তর-রাজ্যে ভ্রমণের অধিকারী হ'বে, তখন সব প্রত্যক্ষ কোরে কৃতার্থ হ'বে ?"

জীব। "আহা, কি সুন্দর শান্তিময় স্থান! এটি কোন দেশ ?"

জ্ঞান। "এটি বিজ্ঞান-রাজ্য। এরি পরপারে শ্রীগুরুস্থান ও আনন্দরাজ্য। এখনো তোমার সে পথে যা'বার অধিকার হয়নি।"

এই পার্শ্বেই **বিজ্ঞানময়ের** শান্তিকানন। তুমি এই কাননের অপর পার্শ্বস্থিত অমৃতবৃক্ষের তলে শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎলাভ কোরেছিলে। এদিকেও অনন্ত অমৃত-বৃক্ষ আছে। দু একটা ফল খা'বে ?

জীব। "আর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই। এ দেশে এসে অবধি, কি এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-তরঙ্গ নিরন্তর শুন্‌তে পাচ্চি, তাই শুনে প্রাণে যেন অমৃতধারা সিঞ্চিত হ'চ্চে। এ দেশে থাক্‌লে বোধ হয় আর এ জন্মে আহারের প্রয়োজন হ'বে না।"

জ্ঞান। "ও ধ্বনিটি কি, কিছু বুঝ্‌তে পা'চ্চো কি ?"

জীব। "যেন প্রণবধ্বনি বলে বোধ হ'চ্চে।"

জ্ঞান। "তাই বটে। ঐ ধ্বনি হ'তেই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ঐ ধ্বনিতেই স্থিতি আবার ওই ধ্বনিতেই লয়। অকার উকার আর মকার হ'তেই ঐ প্রণব। ঐ বর্ণত্রয় ভিন্ন রূপে স্থাপিত হ'লে, যে বীজ হয় তাহাই লয় বীজ। জীব নিরন্তর জ্ঞানে অজ্ঞানে ঐ বীজ উচ্চারণ ক'চ্চে। জ্ঞানে উচ্চারণের নাম জপ। অজ্ঞানে জপের নাম শ্বাস। যখন জীব মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ট হয়, তখন তাঁ'র প্রথম ক্রন্দন ধ্বনি "ওমা ওমা"—সেই প্রণবেরই রূপভেদ। কষ্টে, দুঃখে, সুখে যখনি জীব "ওমা" ব'লে শব্দ করে, তখনি সে অজ্ঞানে প্রণব উচ্চারণ করে। নইলে তা'র অন্তর মধ্যে চির দিন—নিরন্তর প্রণব উচ্চারিত হ'চ্চে। তা'র তা'তে লক্ষ্য নাই ব'লে সে বুঝ্‌তে পারে না।"

জীব। "কিন্তু এ যে বড় মধুর।"

জ্ঞান। "ইহা সুধার প্রস্রবণ। মধুর না হ'বে কেন ?"

জীব। "এখানে একটু বস্‌লে হয় না। বড় সুন্দর স্থান। কেমন মৃদুমধুর পবন-হিল্লোল—স্থানটি বেশ নয়নরঞ্জন।"

জ্ঞান। "স্থানটির নাম শুন্‌লে ত শান্তি-কানন। এ কাননে বাস কর্‌বার অধিকারী

ব্যক্তি চিরশান্তিসুখের অধিকারী। এস, এই বৃক্ষমূলে প্রস্তরাসনে উপবেশন কর।"

এই বলিয়া জ্ঞানদেব, জীবকে সেই প্রস্তরাসনে বসাইলেন এবং নিজে পুণ্যকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক, বিবেককে জীবের ক্রোড়ে বসিতে বলিলেন। বিবেক পিতৃ-ক্রোড়ে উপবেশন করিলে, বৈরাগ্য তাঁহাদের অঙ্গে বীজন করিতে লাগিলেন। রুচি পিতার পদতলে উপবেশন পূর্ব্বক, জ্ঞানদেবের পদ-সেবা করিতে লাগিলেন।"

জ্ঞানদেব বলিলেন "দেখ, জীব, আমাদের বিবেক চিরকৌমার্য্যব্রত গ্রহণ ক'রচেন; অতএব তিনিও আমার মত আর সংসারী হ'বেন না। আমার ইচ্ছা বৈরাগ্যের হস্তে তোমার রুচিকে সমর্পণ কর। পৃথিবীর মধ্যে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মানস পুত্রকন্যাগণের মধ্যে সে বিধি নিষিদ্ধ নয়। দেখ, স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা, বিরিঞ্চির মানস-পুত্রকন্যা, তাঁহাদের বিবাহের কথা শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এ দেশের বিবাহে দেহসম্বন্ধ নাই। এখানের মিলনে প্রেম অর্জিত হ'য়ে সেই পরমপুরুষে অর্পিত হয়। অতএব এই শুভমুহূর্ত্তে তুমি তোমার রুচিকে বৈরাগ্যে সংযোজিত কর।"

জীব দ্বিরুক্তি না করিয়া, সেই মুহূর্ত্তে রুচিকে বৈরাগ্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। রুচি বৈরাগ্যের দেহে মিলিতা হইলেন। জীব আনন্দে অধীর হইয়া যেমন বৈরাগ্যকে স্বীয়-ভুজপাশে আবদ্ধ করিলেন, বৈরাগ্য ও অমনি তাঁহার দেহে বিলীন হইলেন। তদ্দর্শনে বিবেক "পিতা, আমাকেও অঙ্গী করুন" বলিয়া পিতৃপদে পতিত হইলেন। জীব সাদরে তাঁহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন, বিবেকও তাহার অঙ্গে মিলিত হইলেন।

তখন পুণ্য কহিলেন "বাবা, আমি?"

জীব। "তুমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম সেবা কর গে।"

আদেশ মাত্র পুণ্য অন্তর্হিত হইলেন। শান্তিকাননে তখন জীব আর জ্ঞান ব্যতীত কেহই প্রকট থাকিল না।

উভয়ে পুনরায় সেই শিলাপট্টে উপবিষ্ট হইলে, জ্ঞান জীবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"জীব, তোমার কৃতার্থতা লাভের আর অধিক বিলম্ব নাই। এইবার একবার অতীত জীবনের কথা স্মরণে যত্ন কর। যে সময়ে তুমি আমার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হ'য়েছিলে, সে কথা কি কিছুই স্মরণ হয় না? ঐ দেখ উত্তুঙ্গ বিজ্ঞানশৃঙ্গ—যে পর্ব্বততলে আমাদের এ সব আবাসগুহা, তাহারই শিরোদেশ বিভূষিত ক'রে এই শৃঙ্গটি বর্ত্তমান। জন্মান্তরে যখন তুমি এই শান্তিকাননের পাদস্থিত কর্ম্মপথে, স্বীয় গন্তব্য-স্থানে গমনের জন্য যত্ন ক'চ্ছিলে, সেই সময়ে আমি ঐ শৃঙ্গে আরোহণ ক'ত্তে গিয়ে স্খলিতপদ হ'য়ে ভূপতিত হই। পতনজনিত আঘাতে আমি, ভগ্নপদ হ'য়ে চীৎকার ক'ত্তে থাকি, তুমি দয়া পরবশ হ'য়ে আমাকে উঠিয়েছিলে এবং আমার কর ধারণ পূর্ব্বক, আমাকে আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা ভক্তিদেবীর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলে। তিনি তখন অন্ধ ছিলেন। নিজের শরীর পোষণের যত্ন করাও তাঁ'র পক্ষে অসাধ্য ছিল। এমন সময়ে আমি তাঁ'র গলগ্রহ হ'লাম। তিনি বুঝলেন, দু'টিতে সেই নির্জ্জন প্রদেশে

থাকলে, অনশনে দেহত্যাগ ক'ত্তে হ'বে। তাই ব'ল্লেন "ভাই জ্ঞান, তুমি খঞ্জ আর আমি অন্ধ। এ অবস্থায় এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমায় আমায় বাস করা একান্ত অসম্ভব, যিনি তোমায় এখানে এনেছেন, তিনি এখনও উপস্থিত আছেন, চল আমরা এঁরই সাহায্যে **প্রেমময়ের** সদাব্রতে যাই। কি বল? আমি তোমায় কোলে কোরে নিয়ে যা'ব, তোমার কোনও কষ্ট হ'বে না। যিনি তোমায় এনেছেন, তিনি আমার হাত ধোরে নিয়ে গেলে আমরা অনায়াসেই সেখানে উপনীত হ'তে পার্‌বো। তুমি আমাদিগকে মায়ানদীর উপকূল পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলে। মনে পড়ে কি?"

জীব।—"যেন মনে হয়-হয়-হয় না।"

জ্ঞান।—"আচ্ছা চল দেখি মায়া-নদীর উপকূল পর্য্যন্ত যাই। তা'তেও যদি মনে হয়।"

জীব।—"সে কথা স্মরণ করবার বিশেষ কি প্রয়োজন আছে?"

জ্ঞান।—"প্রয়োজন আছে। স্মৃতিকে জাগা'তে হ'বে। ওঠ, চল যাই।"

জীব।—"চলুন।"

জ্ঞানদেব জীবকে লইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য পথে মায়া-নদী দেখাইতে চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

মনের কথা।

"মনের কথা বলিলে লোকে পাগল বলে—তা বলে বলুক। মনের কথা চাপিতে গিয়া আমি সত্যই পাগল হইতে বসিয়াছি—অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা পাগল অপবাদও ভাল। ওঃ—মানুষের মনটা কি ভয়ানক জিনিস! মন কোথায় না যায়, আর কি না করে? ইহার অসাধ্য তো জগতে কিছুই নাই? 'মন' হৃদয়ের অতি গুহ্য স্থানে বসিয়া তাহার চিরঅনুগতা দাসী 'ইচ্ছা'কে যথাভিরুচি প্রবর্ত্তিত করিতেছে, আর দাসানুদাস ইন্দ্রিয়গণ অমনি তাহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে তৎপর হইতেছে—আমি 'হতভম্ব' হইয়া দেখিতেছি। কেন—মনের এত প্রভুত্ব কেন?—মনকে শাসন করিবার কি কেহ নাই?"

বন্ধু বলিলেন, "আছেন বৈকি, কিন্তু তিনি নিদ্রিত। তাঁহার নিদ্রিতাবস্থাতেই মন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া লইতে পারে, তিনি জাগ্রত হইয়া চাবুক্ হাতে করিয়া একবার দাঁড়াইলে, মন অমনি ভয়ে জড় সড়—আর একটু এদিক ওদিক করিবার যো নাই—তখন ঠিক্ ঠিক্ কাজ করিতে হইবে। মনের শাসনকর্ত্তা 'জ্ঞান' আর 'বিবেক' তাঁহার চাবুক্।"

আমি। "সব তো জানি, তবে আমার নিজের মনটা এত অবাধ্য কেন?—কত বুঝাইতেছি—কত শাসন করিতে চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু কৈ, কিছুতেই তো মানে না। একটু ফুরসৎ পাইয়াছে কি অমনি একদিকে না একদিকে ছুটিয়াছে কিছুতেই বাগ্ মানে না।

বন্ধু।—তা হইবেই তো—গোড়া থেকে তাহাকে যেমন করিয়াছ তেমনই তো হইবে। গোড়া থেকে আস্‌কারা দিয়াছ—তা ছাড়া গুরুমহাশয়ের সঙ্গে তাহার কখনও দেখা শুনা নাই—তবে এখন আর সে তোমার বাধ্য হইবে কেন? বালককে যেমন গোড়া থেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় না পাঠাইলে ও কেবল আস্‌কারা দিলে সে নিতান্ত দুর্দ্দমনীয় যথেচ্ছাচারী হয়, মনও ঠিক্ তদ্রূপ। শেষে সেই বালককে বা মনকে কোন মতে শাসন করা যায় না। বয়োধিক্য হইলে কখন কখন একটু আধটু শান্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটা প্রকৃত নহে—সেটা কেবল শক্তির অল্পতা বা অপারগতা হেতু। তোমার মনকে বালককাল হইতে একবারও শাসন কর নাই বা করিতে চেষ্টাও কর নাই, সে ইচ্ছামত বিচরণ ও কার্য্যাদি করিয়াছে, সদ্‌গুরুর মুখ কখন দেখে নাই, সুতরাং চাবুকও খায় নাই, তবে আর সংযত হইবে কিসে? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন্দমতিও ক্রমশঃ পাকিয়া উঠিয়াছে। যেমন অনেক দিন ধরিয়া একটা নেশা করিলে শেষে মৌতাত দাঁড়িয়ে যায়, তেমনি বহুকাল যাবৎ কুমতিকে প্রশ্রয় দেওয়ায় সেটা এখন মৌতাতে দাঁড়িয়েছে। এখন আর হঠাৎ ছাড়িবার যো নাই—ছাড়িতে গেলেই মৌতাতীর মত হাই উঠিবে—পেট ফুলিবে; তখন আবার মনে হইবে "আজ একটু খেয়ে এ ধাক্কাটা তো সাম্‌লাই, তারপর কাল থেকে আর খা'বো না"—প্রত্যহই ছাড়িতে যাইবে আর প্রত্যহই ঐরূপ ধাক্কা সাম্‌লাইতে জীবনের গোণা দিন কটা কাটিয়া যাইবে—ছাড়া আর হইবে না।"

আমি। "তবে উপায়?"

বন্ধু।—"উপায়— **শ্রীগুরুচরণ-ভরসা**। গুরুর উপদেশ ভিন্ন আর উপায় নাই। একমাত্র তিনিই নিদ্রিত জ্ঞানকে জাগাইতে সক্ষম। সদ্‌গুরুর কৃপায় জ্ঞান জাগ্রত হইয়া বিবেকরূপ চাবুক হস্তে যখন দণ্ডায়মান হইবেন, তখনই মন সংযত হইবে। মন সংযত না হইলে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে সৎপথে আনয়ন করে। তাই ভক্ত প্রধান তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

> "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে
> জ্ঞান করে উপদেশ,
> তব্ কয়লাকে ময়লা ছুটে
> যব্ আগ্ করে পরবেশ।"

অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলে যেমন কয়লার ময়লাভাব ঘুচিয়া যায়, অর্থাৎ অতি কদাকার কৃষ্ণবর্ণ ঘুচিয়া উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সদ্‌গুরুর জ্ঞান উপদেশে মনের সমস্ত ময়লা কাটিয়া অতি পবিত্ররূপ ধারণ করে। দেখ বন্ধু, আমরা বালককাল হইতে উভয়কে উভয়ে কত ভালবাসি। এক গ্রামে বাস, এক সঙ্গে খেলা, একই বয়স—আমাদের প্রণয় অটুট, কিন্তু শিক্ষার গুণে দেখ আমাদের মন দু'টি সম্পূর্ণ দু'রকম হ'য়ে গিয়েছে—কেন বলিতে পার?"

আমি।—"কেন? তুমি সংস্কৃত পড়েছ আর আমি ইংরাজি পড়েছি বলে না কি?"

বন্ধু।—"কতকটা বটে, কিন্তু ঠিক্ তা নয়। ইংরাজি পড়িলেই যে সব নষ্ট হয় সে কথা আমি বলি না।"

আমি।—"তবে কি?"

বন্ধু।—"তবে, কি শুনিবে?—এই আধুনিক

শিক্ষাপদ্ধতি। আজকাল যে পদ্ধতিতে বিদ্যালয় সমূহে বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে নিতান্ত সুকৃতি ও ভগবানের কৃপা না থাকিলে, তাহাদের মন কখনই সুপথগামী হইতে পারে না। ধর্ম্মোপদেশ ও নীতি শিক্ষা না থাকিলে কেবল তোতার মত পাঠ মুখস্থ করিয়া কেহ কখন যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে না, আর জ্ঞান না হইলে মনকেও বশ করা যায় না। বালককাল হইতে ধর্ম্মোপদেশ ও নীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম্মে মতি হয়, ধর্ম্মে মতি হইলে ক্রমশঃ জ্ঞানের সঞ্চার ও মন সংযত হইয়া দিন দিন জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে সদ্গুরুর অন্বেষণ, গুরু-প্রাপ্তি, ও তাঁহার সদুপদেশে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইলে মনের সব ধাঁধা মিটিয়া যায়। তোমাদের তো কখন এ সুযোগ ঘটে নাই, কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া কতকগুলা ইংরাজি কথা মুখস্থ করিয়াছ, আর তাই নাড়াচাড়া করিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ করিতেছ। মনকে সংযত করিতে কখন চেষ্টাও কর নাই, সুতরাং হয়ও নাই। তবে আর মনের দোষ কি ভাই ?"

আমি।—"ঠিক্ বলিয়াছ ভাই, এটা আমাদের শিক্ষারই দোষ। তবে আজ কাল যে 'হিন্দু ইউনিভারসিটি' হইবার কথা শুনিতেছি, তাহাতে না কি ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। বোধ হয় তাহা হইলে এখনকার ছেলেপিলেগুলার একটা উপায় হইবে।"

বন্ধু।—"সেটা তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সোনার যেমন পাথরবাটী হইতে পারে না, ইংরাজি কেতায় হিন্দুয়ানী শিক্ষা ও তেমনি হইতে পারে না। ধর্ম্ম প্রকৃতিগত। ভিন্ন প্রকৃতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্ম্মবীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—কখন কখন বা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়—ধর্ম্ম-সুনীতি-শিক্ষা-প্রণালীও ঠিক্ তদ্রূপ। হিন্দু-ইউনিভারসিটি স্থাপিত হইলে আমাদের জাতীয় কর্ম্মোন্নতির একটা কীর্ত্তি থাকিবে বটে, কিন্তু ধর্ম্মোন্নতির সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। পরন্তু কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যোগ না থাকিলে প্রকৃত উন্নতি হয় না। ইংরাজি অর্থকরী বিদ্যা সুতরাং উহা শিক্ষা করিতেই হইবে, অতএব যদি বালকগণকে প্রকৃত উন্নত করিতে চাহ—তাহাদিগকে এককালে ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ম্মবীর উভয়ই করিতে চাহ, তবে নিজ নিজ গৃহে একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া, উপযুক্ত গুরুদ্বারা প্রত্যহ তাহাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান কর। তাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কর্ম্মবীর ও গৃহ-শিক্ষায় ধর্ম্মপ্রাণ হউক। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা পাইলে ধর্ম্মে মতি দৃঢ় হইবে, তখন তাহাদের সদ্গুরু প্রাপ্তির আকাঙ্খা হইবে এবং তাঁহার কৃপায় জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে এইরূপ ধর্ম্ম-শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করিতে পারিলে তবে ভবিষ্যতের পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়, নতুবা "যেমন বাপ্ তার তেমনি বেটা' হওয়াই নিশ্চয়।

শ্রী বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

ঐকান্তিক সাধনার ফল

যে দিন বালক ধ্রুব বিমাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পিতার ক্রোড় হইতে নামিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল "তুচ্ছ পিতৃ-সিংহাসন, আমি এমন স্থান লাভ করিব যাহা আমার পিতৃ-পিতামহের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই।" বালক এই চিন্তা করিতে করিতে বিষণ্ণ মনে মাতার কুটীরে ফিরিয়া আসিল। মা ছেলের ভাবান্তর দেখিয়াই বুঝিলেন কিছু একটা ঘটিয়াছে। ছেলেকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, যাদু আমার, আজ তোমার মুখ এমন মলিন দেখিতেছি কেন? কেহ কি দুঃখিনীর ধন বলিয়া তোমাকে মন্দ বাক্য বলিয়াছে, তোমার মলিন মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তুই যে বাছা আমার অন্ধের নয়নমণি, তুই ব্যতীত তোর এ দুঃখিনী মায়ের যে আর কেহ নাই।" পুত্র মায়ের আদরে সকল ভর্ৎসনা, সকল অপমান, সকল কষ্ট ভুলিয়া গেল, ক্ষণেকের তরে বিজলী-রেখার ন্যায় মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। আহা! মায়ের স্নেহ জগতে অনাবিল ও অতুলনীয়। এমন মায়ের মনেও অনেক দুষ্ট বালক বৃথা কষ্ট দিয়া থাকে। "হাঁ মা, সত্য সত্যই কি আমাদের আর কেহ নাই?" মা বলিলেন "বাছা তোর এক দাদা ছাড়া এ জগতে সত্য সত্যই আপনার বলিতে এখন আর কেহ নাই।" বালক আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ মা, আমার দাদা আছেন এ কথা ত তুমি আমাকে আগে বল নাই। তাঁহার নাম কি? তিনি কোথায় থাকেন? তাঁহাকে ত কখন এখানে আসিতে দেখি নাই।" মা উত্তর করিলেন "বাছা তোমার দাদার নাম পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি। তিনি বড় দুষ্ট, সর্ব্বদা নিকটেই আছেন কিন্তু সহজে কাহাকেও ধরা দেন না। এক মনে না ডাকিলে কাহারও ডাকে সাড়া দেন না।" বালক অমনি উৎসাহে নাচিয়া উঠিয়া বলিল "মা আজ থেকে এক মনে দাদাকে ডাকিয়া দেখিব, তাঁহার দেখা পাই কি না? দেখা পাইলে প্রাণের কষ্ট তাঁহাকে বলিব।" আহা! পাঁচ বৎসরের বালকের একাগ্রতা কি সুন্দর, মায়ের কথায় দৃঢ়বিশ্বাস কি মধুর।

তৎপরে সেই বালক মুনিকুমারগণের সহিত রাজসভায় গমন হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই মাতাকে বলিল।

মাতা বলিলেন,—

"যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎপুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণা পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥"

অর্থ,—"সুরুচির বাক্যে যদি তোমার অত্যন্ত দুঃখই হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্য অর্জ্জন করিতে যত্নশীল হও। তুমি সুশীল হও, ধর্ম্মাত্মা হও, সকলের উপর সমভাবাপন্ন হও, জগতের হিতে রত হও। জল যেমন নিম্ন-গতি-শীল তদ্রূপ সুখৈশ্বর্য্যও গুণশালী ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে।"

ধ্রুব বলিল,—

"অম্ব যত্ত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতদ্ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি॥

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্॥
নান্যদত্তমভীপ্স্যামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম॥"

অর্থঃ—

"মা তুমি আমার ক্ষোভ শান্তির জন্য যে কথা বলিলে, বিমাতার দুর্ব্বাক্য বিদ্ধ আমার এ ভগ্ন হৃদয়ে তাহা কিছুতেই স্থান পাইতেছে না। আমি জগৎপূজিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিবার চেষ্টা করিব। হে মাতঃ! আমি আর অপরের প্রদত্ত স্থান পাইতে ইচ্ছা করি না। নিজকর্ম্ম দ্বারা এমন স্থান পাইতে ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতা কখন লাভ করেন নাই।"

মাতা অনেক বুঝাইলেন, অনেক কান্নাকাটি করিলেন কিন্তু বালকের অবিচলিত সংকল্পের নিকট সকলই পরাস্ত হইল। পাঁচ বৎসরের বালক আজ পথে বাহির হইল, অন্তরে বাহিরে কেবলই মনে হইতেছে কোথায় গেলে আমার দাদা সেই পদ্মপলাশলোচন হরির দেখা পাইব। পথে যাইতে যাইতে যাহার সহিত দেখা হইতেছে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে "পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি কোথায় থাকেন, তোমরা কেউ জান?" বালক তন্ময় হইয়া চলিয়াছে. ক্রমে সিংহ ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ বিজন অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশু পক্ষী যাহাকে দেখিতে পাইতেছে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে 'তোমরা আমার পদ্ম-পলাশ-লোচন হরিকে দেখিয়াছ? বালকের ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ নাই, পথশ্রমে ক্লান্তি নাই, কেবলই মনে হইতেছে ঐ বুঝি দাদা পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি আসিলেন। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, সন্ধ্যা আগতা, এমন সময়ে একটি প্রকাণ্ড সিংহ ঘোর গর্জ্জনে বনভূমি কম্পিত করিয়া বাহির হইল, কিন্তু সে কোথা, গর্জ্জনশব্দ বালকের কর্ণে যায় নাই, তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম যে হরিময় হইয়া রহিয়াছে। বালক অনুমাত্রও দ্বিধা না করিয়া একেবারে ছুটিয়া গিয়া পশুরাজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল 'দাদা তুমি কি আমার পদ্মপলাশলোচন হরি, এত ডাকিতেছি, এত ক্ষণ দেখা দাও নাই কেন?' বনের পশু হিংসাভাব ভুলিয়া গিয়া বালকের গা চাটিতে লাগিল, বালকের দিকে চাহিয়া যেন নামসুধা পান করিতে লাগিলেন। আহা, কি সুন্দর, কি মধুর, নামের এমনই গুণ, এমনই মাহাত্ম্য বটে। নামের গুণে বনের পশু ও বশীভূত হইল। বালকের ঐকান্তিকতা দেখিয়া শ্রীহরির আসন টলিল। তিনি আর কি স্থির থাকিতে পারেন, তিনি যে দীন দয়াল, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। ভক্তের ভগবান নারদকে ডাকিয়া বলিলেন "যাও নারদ, আমার একজন অতি প্রিয় ভক্ত আমাকে অহর্নিশি ডাকিতেছে। তাহার ডাকে আমি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি, তাহাকে সত্বর দীক্ষাদান করিয়া আইস। নারদ মুনি ভাবিতেছেন প্রভুর আমার লীলা বুঝা ভার, কখন যে কাহার উপর সদয় কিম্বা নিদয় হন কিছুই বুঝিতে পারি না, সাধে কি সংসারের লোকে 'শালগ্রামের শোওয়া বসা এক' বলিয়া থাকে?' নারদ আসিয়া বনমধ্যে উপনীত হইলেন, দেখিলেন একটি দুগ্ধপোষ্য বালক অনবরত বলিতেছে "কোথায় পদ্মপলাশ-লোচন-হরি একবার দেখা দাও," আর অজস্র ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। নাম সুধা-পানে শরীরের তেজ উছলিয়া পড়িতেছে।

নারদ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন এযে নিতান্ত শিশু দেখিতেছি, ইহার ডাকেই প্রভু আমার অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ভাল দেখা যাউক্ ইহার ঐকান্তিকতা কতদূর? তিনি বলিলেন 'ওহে বালক, কাহাকে ডাকিতেছ, এই যে আমি আসিয়াছি।' বালক বলিল আপনি কে? আপনি কি আমার সেই পদ্ম-পলাশলোচন হরি, কই, আপনার কথায় ত তেমন মিষ্টতা নাই, মা'র মুখে শুনিয়াছি আমার পদ্ম-পলাশ-লোচন হরির কথা মধুময়, কর্ণে একবার প্রবেশ করিলে শরীর শীতল হয়, কর্ণ জুড়ায়। আপনার বাক্যে ত সেরূপ কোন ভাব অনুভব করিতেছি না।' নারদ দেখিলেন ইহার সহিত বাক্‌চাতুরী বৃথা, এ বালকের দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে। দীক্ষার অভাবে সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিতেছে না। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া বালককে দীক্ষিত করিলেন। বালক এক মনে গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনা করিতে লাগিল। একাগ্রতার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হরি আসিয়া দেখা দিলেন। আহা, কি ভক্ত-বৎসলতা! ভগবান আসিয়া বলিলেন 'ভাই ধ্রুব, একবার চেয়ে দেখ তোমার দাদা আসিয়াছে।' ধ্রুবের প্রাণে কে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বালক চাহিয়া বলিল "দাদা এ অধম ভাইকে কি এত দিনে মনে পড়িয়াছে?" সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া প্রভু বলিলেন "ভাই পিতৃসিংহাসন হইতে অপমানিত হইয়া নামিতে হইয়াছিল, তজ্জন্যই কি এই দুষ্কর সাধনা আরম্ভ করিয়াছ? তোমার পিতার সিংহাসনে তোমাকেই অধিকারী করিব। তোমাকে দুষ্কর তপস্যা করিতে হইবে না।" ধ্রুব বলিলেন 'প্রভু তুচ্ছ পিতৃসিংহাসনের প্রলোভন আমাকে কি দেখাইতেছেন, আমি আর নশ্বর কোন জিনিসেরই অভিলাষী নহি।" তখন ভক্তাধীন হরি বলিলেন 'ভাই, আমি তোমার ঐকান্তিকতা এবং সাধনার প্রভাবে তোমার জন্য যে লোক প্রস্তুত করাইয়াছি, তাহা অবিনশ্বর, সপ্তম স্বর্গেরও উপরে অবস্থিত। ধ্রুবলোকে তোমার বাস নির্দ্দিষ্ট হইল। এখন চল, তোমার মাতার নিকটে তোমাকে লইয়া যাই। তিনি তোমা বিহনে পাগলিনীর ন্যায় দিন যাপন করিতেছেন।" পাঠক দেখিলেন, মুখে শুধু হরিবোল হরিবোল করিয়া সুদের হিসাব করিলে হরি মিলে না! একাগ্রতা চাই, তাঁহার নামে ডুবিয়া যাওয়া চাই, তবেই সিদ্ধি। সাধে কি কবি বলিয়াছেন "ডাকার মত ডাক দেখি মন কেমন হরি থাক্‌তে পারে।"

শ্রীআশুতোষ রায়।

ইন্দ্রদ্যুম্নচরিত।

(প্রথমাংশ)

রাজর্ষি **ইন্দ্রদ্যুম্ন** প্রাচীনতম রাজর্ষি। শ্রীস্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড মধ্যে দেখিতে পাই তিনি সত্যযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পদ্মযোনী ব্রহ্মা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। যথা—

"আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে স ধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চমপুরুষঃ॥ ৭।৬

শাস্ত্র মধ্যে দেখিতে পাই, শ্রীসূর্য্যদেব অদিতির পুত্র। অদিতি দক্ষের তনয়া। প্রজাপতিদক্ষ পদ্মযোনীর মানস পুত্র। সুতরাং ইন্দ্রদ্যুম্ন সূর্য্যপুত্র বলিয়াই প্রতীত হইতেছেন। ইনি সত্যযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের কোনও সত্যযুগে নহে। কারণ ঐ গ্রন্থেই দেখিতে পাই, তিনি যৎকালে নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক কিয়ৎ-ক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দ্বিতীয় মন্বন্তরের আদিযুগ অতীত হইয়াছিল। যথা—

"দ্বিতীয়স্য মনোরাদিযুগং স্বারোচিষস্য চ।
মমান্তিকে তে বসতো মৃত্যুর্বা ন জরা তথা।
বিপর্য্যয় ঋতূনাঞ্চ ন কালপরিণামিতা॥"

এই সময়টুকু তাহাকে ব্রহ্মলোকে বাস করিতে হইয়াছিল কেন?—তিনি যখন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন সে সময়ে ব্রহ্মার সমীপে, কোনও দিব্য গায়ক শ্রীলক্ষ্মী-পতির মহিমা গান করিতেছিলেন। মুহূর্ত্তকাল অর্থাৎ দিবসের পঞ্চদশাংশ পরিমিত কাল এই গানে অতিবাহিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার দিবসের পরিমাণ ৪৩২০ মানুষবর্ষ সুতরাং এই পার্থিব-বর্ষের পরিমাণে ২৮৮০০০০০ বর্ষ পরিমাণ সময় ঐ গানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্বারোচিষমন্বন্তরের আদিযুগের পরিমাণ ৩৪২০০০০ বর্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের শেষ ২৮৪৫৮০০০০ বর্ষও তিনি ব্রহ্মলোকে ছিলেন, তন্মধ্যে মন্বন্তরসন্ধি ১৭২৮০০০ বর্ষ বাদ দিলে ৮২৮৫২০০০ বর্ষ পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বায়ম্ভব মন্বন্তরাবসানের ২৮২৮৫২০০০ বর্ষপূর্ব্বে অর্থাৎ ঐ মন্বন্তরের ষষ্ঠ মহাযুগের সত্যযুগাবসান সময়ে ইনি ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন।

তাঁহার গুণসম্বন্ধে উৎকলখণ্ড বলেন—

"সত্যবাদী সদাচারোঽবদাতঃ সাত্ত্বিকাগ্রণীঃ।
ন্যায়াৎ সদা পালয়তি প্রজাঃ স্ব ইব স প্রজাঃ॥
অধ্যাত্মবিজ্ঞানশৌণ্ডঃ শূরঃ সংগ্রামবর্দ্ধনঃ।
সদোদ্যতঃ সদা বিপ্রপূজকঃ পিতৃভক্তিমান্॥
অষ্টাদশাস্ত বিদ্যাসু বৃহস্পতিরিবাপরঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ সুরাধীশঃ কুবেরঃ কোশসঞ্চয়ে॥
রূপবান্ সুভগঃ শীলো দাতা ভোক্তা প্রিয়ম্বদঃ।
যষ্টা সমস্তযজ্ঞানাং ব্রাহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ॥
বল্লভো নরনারীণাং পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শত্রুক্ষয়ক্ষমঙ্করঃ॥
বৈষ্ণবঃ সত্যসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাজসূয়ং ক্রতুবরং বাজিমেধসহস্রকম্।
ইয়াজ পরমঃ শ্রীমান্ মুমুক্ষুর্ধর্ম্মতৎপরঃ॥"

এইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন সেই রাজা অবন্তি নগরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন। তিনি, অচঞ্চলা ভক্তির সহিত নিরন্তর শ্রীপতি বাসুদেবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। একদা তিনি স্বীয়

পুরোহিতকে বলিলেন "মহাত্মন্, এই পৃথিবীতে কোন্ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কোন স্থানে গমন করিলে সাক্ষাৎ জগন্নাথকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হওয়া যায়? আপনি অনুগ্রহ করিয়া পরিব্রাজকগণসমীপে অনুসন্ধান পূর্ব্বক এ বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করুন।"

পুরোহিত, তীর্থভ্রমণকারীগণের মধ্যে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলে, একজন বহুতীর্থগামী, রাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন "রাজন্, আমি আশৈশব ভূমণ্ডলের অনেক তীর্থভ্রমণ করিয়াছি, অনেক সাধুসন্ন্যাসীর মুখে বহুতীর্থের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু **শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের** ন্যায় পবিত্রতম তীর্থ আর কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। এই ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরবর্ত্তী ওড্রদেশে ঐ পরম পবিত্র তীর্থ অবস্থিত। সেই দেশে কাননাবৃত নীলগিরিতে এক ক্রোশ পরিমিত একটি কল্পবৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের ছায়াস্পর্শে সদ্য ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও নষ্ট হয়। তৎসন্নিহিত রৌহিণকুণ্ডের পূর্ব্বতটে ভগবান বাসুদেবের নীলকান্তমণিনির্ম্মিত যে পরম সুন্দর মূর্ত্তি আছে তাহা সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ। যে ব্যক্তি সেই রৌহিণকুণ্ডে স্নান পূর্ব্বক সেই পুরুষোত্তম মূর্ত্তি দর্শন করে, সে সহস্র অশ্বমেধ ফললাভ পূর্ব্বক মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। আমি একবর্ষকাল সেই ক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলাম। শুনিয়াছি একটি কাক রৌহিণকুণ্ডে জল পানার্থ গমন পূর্ব্বক শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া কালবশে সেই জলে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সেই ফলে সে চতুর্ভুজধারী হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছে। আমি জন্মাবধি কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই। কিন্তু সেই ক্ষেত্রবাস-ফলে আমার অজ্ঞাত আর কিছুই নাই। আপনি পরম বৈষ্ণব জানিয়া সেই পবিত্র ক্ষেত্ররহস্য প্রচার মানসে আপনাকে এই উপদেশ দিবার জন্য আসিয়াছি, আপনি অচিরে সেই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থিত **পুরুষোত্তমকে** ভজনা করুন। এই বলিয়া সেই জটিল অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা, তদ্দর্শনে বিস্মিত ও পুরুষোত্তম দর্শনার্থ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পুরোহিতকে বলিলেন "দেব, আপনার আশ্রয়ে আমি ত্রিবর্গসাধনে কৃতার্থ হইয়াছি। এইক্ষণে কৃপা করিয়া এই চতুর্থ বর্গ সাধনের উপায় করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে, ঐ ওড্র দেশে প্রেরণ পূর্ব্বক, শীঘ্র তথায় বাসোপযোগী স্থানাদি নির্ণয় করিয়া আসিতে বলুন; পরে আমরা সকলে গিয়া চর্ম্ম চক্ষে সেই শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব।"

তৎপরে সেই পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতি শুভমুহূর্ত্তে রথোরোহণে ওড্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে অতুল আনন্দের উদয় হইল। তিনি অন্তরে শ্রীপুরুষোত্তমকে ভাবনা করিতে করিতে বহুদিনে সেই ওড্রদেশে উপনীত হইলেন। ক্রমে মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া একাম্রকাননে গমন করিলেন, তৎপরে যেস্থানে উপনীত হইলেন, সেইস্থানের সকল মানবই তাঁহার চক্ষে চতুর্ভুজধারী বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তখন তিনি ভাবিলেন এত দিনে আমার জন্মান্তর হইল সন্দেহ নাই। তাঁহার নয়নদ্বয় হর্ষাশ্রুদ্ধারা অবরুদ্ধ হইলে আর বহির্জগতের কোন পদার্থ দর্শনের সামর্থ রহিল না; কেবল হৃদয়ে সেই ভক্তহৃদয়বিহারীর

অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিতে করিতে, মনে মনে, নিরন্তর তাহার স্তব পূজাদি করিতে লাগিলেন। ক্রমে নীলাচল তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই কানন-শোভিত অভ্রভেদী অচলে অবস্থিত কল্পবট দর্শন করিয়া তাহার দেহ পুলক-রোমাঞ্চপূর্ণ হইল। ভাবিলেন, ঐ ত সেই নীলাচল। ঐ ত সেই কল্পপাদপ। ঐখানেই সেই রৌহিণকুণ্ড। উহারই কাছে সেই নীলমাধবের মন্দির আছে। যাই দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্ত করি গিয়া। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বহু অন্বেষণেও পথ পাইলেন না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, ভূমিতলে কুশপত্র বিস্তৃত করিয়া বাক্‌সংযম পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তাঁহার কর্ণে ভগবত্তত্ত্বালাপ কথা প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বিদ্যাপতি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গমনপূর্ব্বক অতি অল্প কাল মধ্যেই শবরদীপক নামক স্থানে উপনীত হইলেন। সেই স্থান-

"ক্ষেত্রস্য দীপসংস্থানং খ্যাতং শবরদীপকম্।"

সেই স্থানে বসিয়া হরিভক্তগণ ভগবৎ-কথালাপ করিতেছিলেন। বিদ্যাপতি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিশ্বাবসু নামে একজন বৃদ্ধ শবর হরিপূজা সমাপনান্তর নির্ম্মাল্যাদি ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাপতির প্রাণে অতুল আনন্দের উদয় হইল। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠও বিদ্যাপতিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন "দ্বিজবর, আপনি কিরূপে এই দুর্গম কাননে আগমন করিয়াছেন? দেখিতেছি আপনি ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর, অতএব কিয়ৎকাল এই স্থানে সুখে অবস্থান করুন। বলুন, আপনার সেবার জন্য ফলমূল আহরণ করিব, না পাকের আয়োজন করিয়া দিব।"

বিদ্যাপতি বলিলেন "হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, আমার ফলেও কাজ নাই, পাকেরও প্রয়োজন নাই। যে ফল প্রাপ্তির আশায় এই স্থানে আসিয়াছি তৎ-প্রাপ্তির সুবিধা করুন। আমি অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিত। রাজা একজন জটীল তপস্বীর মুখে এই নীলাচলক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক, আমাকে শ্রীপুরুষোত্তম-দর্শন-মানসে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সেই পরম দেবতার চরণযুগল দর্শন না করিয়া আহার করিব না।"

ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাবসুর হৃদয় কম্পিত হইল। ভাবিলেন, এইবার শ্রীনীলমাধব অন্তর্দ্ধান করিবেন। কারণ এই প্রদেশে জনপ্রবাদ প্রচারিত ছিল—

"অস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে ভূম্যান্তর্নীলমাধবে।
ইন্দ্রদ্যুম্নো নরপতি শক্রতুল্য-পরাক্রমঃ।
মনুষ্যবপুষা যোঽসৌ ব্রহ্মলোকং ব্রজেদপি।
সোঽস্মিন্ প্রজাভিরাগত্য বাজিমেধ শতেন চ।
ইষ্ট্বা দারুময়ং বিষ্ণুং চতুর্দ্ধা স্থাপয়িষ্যতি।"

অতএব ভগবানের অন্তর্দ্ধানের আর বিলম্ব নাই। ভগবদীচ্ছাই মূল। এ ব্রাহ্মণ নিতান্ত ভাগ্যবান, চর্ম্মচক্ষে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। তার পর আর সে মূর্ত্তি কেহ দেখিতে পাইবে না।" এই ভাবিয়া তিনি, বিদ্যাপতিকে বলিলেন—"দ্বিজবর, আপনাদের নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন যে এই ক্ষেত্রে বাস করিবেন এ কথা আমরা জানি। আপনি আসুন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন।" এই বলিয়া

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ পূর্ব্বক, অতি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম পথে সেই রৌহিণকুণ্ডের তটে উপনীত হইলেন, এবং কল্লান্তস্থায়ী সেই অক্ষয় বট ও অদূরস্থিত নিকুঞ্জমধ্যস্থ শ্রীনীলমাধবকে দর্শন করাইলেন।

বিদ্যাপতি, রৌহিণকুণ্ডে স্নানান্তর শ্রীপুরুষোত্তম সমীপে উপনীত হইয়া হর্ষ গদ্‌গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন—

"প্রধান পুরুষাতীত সর্ব্বব্যাপিন্ পরাৎপর।
চরাচরপরীণাম পরমার্থ নমোঽস্তু তে॥

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসসম্প্রতিপাদিতৈঃ।
কর্ম্মভিস্ত্বং সমারাধ্য এক এব জগৎপতে॥

ত্বত্ত এতজ্জগৎ সর্ব্বং সৃষ্টৌ সম্পদ্যতে বিভো।
ত্বদাধারমিদং দেব ত্বয়ৈব পরিপাল্যতে॥

কল্লান্তে সংহৃতং সর্ব্বং তৎকুক্ষৌ সাবকাশকম্।
সুখং বসতি সর্ব্বাত্মন্নন্তর্য্যামি নমোঽস্তু তে॥

নমস্তে দেবদেবায় ত্রয়ীরূপায় তে নমঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপেণ জগদ্ভাসয়তে সদা॥

সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা যস্য পাদাব্জসঙ্গমাৎ।
পুনাতি সকলাল্লোঁকাংস্তস্মৈ পাবয়তে নমঃ॥

হবীংষি মন্ত্রপূতানি সম্যগ্‌দত্তানি বহ্নিষু।
পরিণামকৃতে তুভ্যং জগজ্জীবয়তে নমঃ॥

নির্ম্মলায় স্বরূপায় শুভরূপায় মায়িনে।
সর্ব্বসঙ্গবিহীনায় নমস্তে বিশ্বসাক্ষিণে॥
বহুপাদাক্ষশীর্ষাস্যবাহবে সর্ব্বজিষ্ণবে।
সর্ব্বজীবস্বরূপায় নমস্তে সর্ব্বরূপিণে॥
নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে কমলাসন।
নমঃ কমলপত্রাক্ষ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥
অসার-সংসার-পরিভ্রমেণ
নিপীড্যমানং খলু রোগশোকৈঃ।
মামুদ্ধরাস্মাত্তবদুঃখজাতাৎ
পাদাব্জয়োস্তে শরণং প্রপন্নম্॥"

এইরূপে ভক্তিভরে সেই প্রণবরূপী ভগবানের স্তব করিয়া, তাঁহার সেই নেদিষ্ট নাম জপ করিলেন এবং শবরাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক, যাগযোগ্য উপচারের আয়োজন দর্শন করিয়া বলিলেন "হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, এরূপ আয়োজন সসাগরাধরাপতিগণের গৃহেও দুর্লভ, এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে এরূপ আয়োজন কিরূপে হইল?"

বিশ্বাবসু বলিলেন—"ইহা অতিগূঢ় তত্ত্ব। এই সমুদায় দ্রব্য নরলোকে একান্তদুর্লভ। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই সকল দিব্য উপচারে প্রতিদিন দেবদেবের পূজা করিয়া এই প্রসাদ আমাদিগকে অর্পণ করিয়া থাকেন। আজ আপনি জগন্নাথের এই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হউন। এই প্রসাদের বলেই আমি অযুতবর্ষকাল পুত্রপৌত্রাদির সহিত শ্রীপুরুষোত্তমের সেবাসুখের অধিকারী হইয়া বাস করিতেছি।" বিদ্যাপতি সানন্দে সেই প্রসাদ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—"হে বৈষ্ণবপ্রধান, আজ আপনার অনুকম্পায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি। ইচ্ছা করে, আপনার সহিত সখ্যতা করিয়া চিরজীবন এই খানেই থাকি, কিন্তু মহারাজকে সংবাদ দিবার জন্য আমি প্রতিশ্রুত, অতএব আমায় অচিরেই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তবে আশা এই, যে পুনরায় রাজার সঙ্গে এখানে আসিতে পারিব।"

শবররাজ বলিলেন—"সখে, আমাদের এ সখ্য নিত্য। কারণ আমরা উভয়েই শ্রীনিবাসের চিহ্নিত দাস। তাঁহার কৃপায় উভয়েই চর্ম্মচক্ষে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু সখে, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এত দিনে আমাদের

এ সুখের অবসান হইল। সেই নরপতি শ্রীনীল-মাধবের এই মূর্ত্তির দর্শন পাইবেন না। ইনি অচিরেই স্বর্ণবালুকায় আবৃত হইয়া অন্তর্দ্ধান করিবেন। তুমি-মাত্র জন্মান্তরের সুকৃতিফলে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলে; কিন্তু ভগবান যে অন্তর্হিত হইবেন, এ সংবাদ রাজাকে বলিও না। তিনি এখানে আসিয়া স্বপ্নে তাঁহার দর্শন পাইবেন মাত্র, তৎপরে ব্রহ্মার আদেশে তাঁহার দারুময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতবাসীগণের মহদুপকার সাধন করিবেন। আজ সুখে নিদ্রা যাও। কাল প্রাতে মহাসমুদ্রে স্নান পূর্ব্বক এই নীলকান্তমণিময় শ্রীমূর্ত্তি পুনর্দ্দর্শন করিয়া প্রস্থান করিও।"

পরদিন বিদ্যাপতি বিশ্বাবসুর সঙ্গে সমস্ত দিন শ্রীমূর্ত্তি সেবায় অতিবাহিত করিয়া, শ্রীনাথের প্রসাদমালা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক, অপরাহ্নে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলে, দেবগণ স্বয়ং সময়ে শ্রীনীলমাধবের পূজার্থ আগমন করিলেন। তাঁহাদের পূজাবসানে, বায়ু অতিবেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া শ্রীমূর্ত্তি আচ্ছাদন করিলেন। শ্রীনীল-মাধবও চিরদিনের জন্য ধরা ত্যাগ করিয়া নিজধামে অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতির মুখে শ্রীক্ষেত্র-বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং তাঁহার মস্তকস্থিত অম্লান দিব্য-মাল্য দর্শন পূর্ব্বক পুলকিত হৃদয়ে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রাজা, নিজ অমাত্য পুরোহিত ও প্রকৃতিবর্গের সহিত শুভমুহূর্ত্তে শুভযাত্রা করিলেন। ক্রমে নানা জনপদ অতিক্রম পূর্ব্বক সকলে উৎকলের সীমায় উপনীত হইয়া শ্রীচামুণ্ডাদেবীর পূজা করিলেন এবং অচিরে চিত্রোৎপলা মহানদীর তীরে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে এই মহানদী বিষকণ্টকনক্রাদি দ্বারা অধিকৃত ছিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের পরামর্শে বিচক্ষণ লোকদ্বারা সেই সমুদায় দোষ নাশ করিয়া এই খানে প্রথম স্নান তর্পণাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমন সম্বাদ পাইয়া উৎকলেশ্বর স্বীয় অমাত্য বর্গের সহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুশল সম্ভাষণাদির পর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন—"রাজন্, আপনার ন্যায় ভাগ্যবান নরপতি অতি দুর্লভ, যে হেতু ভগবান পুরুষোত্তম আপনার রাজ্যমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আপনাকে কুশল দান করিতেছেন। এক্ষণে সেই শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া আমাদিগকে প্রীত করুন।"

ওড্ররাজ বলিলেন "হে সম্রাটকুলতিলক, আপনি সত্যই বলিয়াছেন সেই শ্রীনীলমাধবের কৃপায় আমার রাজ্যে নিরন্তর কুশল ছিল। কিন্তু সেই জগন্নাথ নীলাম্বধিতীরস্থিত নিবিড়-অরণ্যাবৃত নীলাচলে ছিলেন। সেখানে শবররাজ বিশ্বাবসু ব্যতীত অন্য কাহারও গমনের শক্তি ছিল না। আমিও জন্মাবধি কোন দিন তাঁহাকে দর্শন করি নাই। সম্প্রতি এক দিন ভীষণ ঝটিকায় সমুদ্রের বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া সেই পর্ব্বত আচ্ছাদিত করিয়াছে। শ্রীনীলমাধবও অন্তর্হিত হইয়াছেন। সেইদিন হইতে আমার রাজ্যে নানা দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ প্রায় জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। আপনি উৎকলের সীমায় উপনীত

হইবার পর হইতে দেশে সুবৃষ্টি হইয়াছে। মরকাদিও প্রশান্ত হইয়াছে।''

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সম্বাদে ব্যাকুল নেত্রে নারদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "দেবর্ষে, আমার এত উদ্যোগ ব্যর্থ হইল!"

নারদ বলিলেন—"রাজর্ষে, ভয় নাই। তুমি সেই নীলমাধবকে অবশ্যই দর্শন করিবে। পিতা আমায় তোমার ব্যাকুলতা নিবারণ জন্যই প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমিও সেই জন্যই তোমার সঙ্গে আসিয়াছি। আজ রাত্রি হইয়াছে। এইখানেই বিশ্রাম করিয়া কাল সেই পবিত্রক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যাইবে।" রাজা দেবর্ষির বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সে দিন সেইখানে রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রভাত হইলে, ওড্ররাজ-প্রদর্শিত পথে তাঁহারা মহানদী পার হইয়া শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং একাম্রকানন (ভুবনেশ্বরতীর্থ) কপোতেশ্বর ও বিল্বেশ্বর (এই সকল তীর্থের বিবরণ সময়ান্তরে বিবৃত করা যাইবে) তীর্থ পার হইয়া গিরিশিরে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষতলে শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বিহিত বিধানে সেই নৃসিংহ দেবের পূজা করাইয়া, কল্পবট সন্নিহিত শ্রীনীলমাধবের স্থান দেখাইলেন। রাজা সেই স্থানে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া, জগন্নাথের স্তব করিলে, দৈববাণী হইল—

"মা চিন্তাং ব্রজ ভূপাল ব্রজিষ্যে স্বদৃশোঃ পথম্।
পৈতামহংবচঃ প্রাহ নারদো যৎ কুরুষ তৎ।"

সেই দৈববাণী অনুসারে তিনি সেই পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীনীলকণ্ঠ-সমীপে সেই অনাদি নৃসিংহ দেবের স্থাপনা পূর্ব্বক সহস্র অশ্বমেধে দীক্ষিত হইলেন। রাজা শ্রীনারদদ্বারা জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বাদশীতে স্বাতী নক্ষত্রে নৃসিংহদেবের স্থাপনাপূর্ব্বক যথাবিহিত পূজাদি করিয়া উপনিষদ গুহ্য স্তব করিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদাদির সহিত বলিলেন—

"একানেক-স্থূলসূক্ষ্মাণুমূর্ত্তে
ব্যোমাতীত ব্যোমরূপৈকরূপ।
ব্যোমাকারব্যাপিন ব্যোমসংস্থ
ব্যোমারূঢ় ব্যোমকেশাঙ্কযোনে॥
দুঃখাম্বোধেস্ত্রাহি মাং দিব্যসিংহ
প্রাদুর্ভূতানেককোট্যর্কধামন্।
নিত্যাসন্নো দূরসংস্থো ন দূরো
নাসন্নো বা বোধবোধ্যস্বভাব॥
জ্ঞেয়োঽজ্ঞেয়ো জ্ঞানগম্যোঽপ্যগম্যো
মায়াতীতো মানমেয়োঽনুমানাৎ।
কূটস্থাদ্যাদিঃ কূটস্থকর্ত্তান্তমন্তা
পাতা হর্ত্তা বিশ্বসাক্ষিন্নমস্তে॥
দুঃখধ্বংসৈকহেতুং ন হেতুং
ভেত্তুং ছেত্তুং সংশয়ানগ্রজাতম্।
জ্যোতীরূপ জ্ঞানরূপ প্রকাশঃ
স্বোনব্যূহাকারনির্ম্মাণহেতো॥
ত্বৎপাদাব্জে ভক্তিমগ্র্যাং সদা মে
দেহি স্বামিন্ মূলভূতাং চতুর্ণাম্।
শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈর্নিত্যমুক্তা ময়াস্তে
দীনাস্তিষ্ঠন্ত্যত্র বদ্ধা ভবাব্ধৌ।
অনন্তপাদং বহুহস্তনেত্রং
অনন্তকর্ণং ককুভৌঘবস্ত্রম্।
দিবানিশানাথসুকুণ্ডলাঢ্যং
নক্ষত্রমালাকৃতচারুহারম্॥
ত্বামদ্ভুতং দিব্য নৃসিংহমূর্ত্তিং
ভক্তেষ্টপূর্ত্তিং শরণং প্রপদ্যে।
যৎপাদপদ্মং হি পিতামহস্য
কিরীটরত্নৈর্বিকচত্বমেতি॥

যদীয় পাদাব্জযুগান্তভূমৌ
লুণ্ঠচ্ছিরো যস্য হি পাঞ্চভৌতম্।
তদ্দিব্যপাদং শিরসা বহন্তি
সুরেন্দ্রনার্য্যঃ খলু তং নমামি॥
তদ্দিব্যসিংহং হতপাপসঙ্ঘং
পাদাশ্রিতানাং করুণাব্ধিসিংহম্।
পাদাব্জসংঘট্টবিঘট্টমান
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং প্রণমামি চণ্ডম্।
সটাচ্ছটাকম্পনশীর্য্যমাণ
ঘনৌঘবিদ্রাবিতপাপসঙ্ঘম্।
চণ্ডাট্টহাসান্তরিতাব্দশব্দং
ত্রিলোকগর্ব্বং নৃহরিং নমামি॥
নমস্তে নমস্তে নমস্তেঽদ্য বিষ্ণো
পরিত্রাহি দীনানুকম্পিন্ননাথম্।
ভবন্তং সমাসাদ্য মে দেহবন্ধো
মুরারে ন সংসার-কারাগৃহেঽস্তু॥"

এই স্তবান্তে রাজা প্রার্থনা করিলেন—

"হয়মেধসহস্রান্তে যথা ত্বাং চর্ম্মচক্ষুষা।
দিব্যরূপং প্রপশ্যামি তথানুক্রোশয় প্রভো॥"

এইরূপ প্রার্থনার পর শ্রীনারদের সাহায্যে সেই স্থানে ইন্দ্রাদি দেবগণ ঋষিগণ ও অসংখ্য বেদ বেদাঙ্গবিৎ বিপ্রগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিহিত বিধানে সহস্র অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ সময়ে রাজা তুলাপুরুষাদি দান ও অসংখ্য গোদান করিয়াছিলেন। সেই গোগণের ক্ষুরাগ্রাঘাতে ও দানোৎসর্গ জলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের * উৎপত্তি হইয়াছিল। এই অশ্বমেধাদির বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রেমানন্দ

সংবাদ।

আপীল রুজু।—পুরীধামের রাজা, জগন্নাথ-মন্দিরের ম্যানেজারের নামে কটকের সব-জজ আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। অভিযোগে রাজা মন্দিরের হিসাব চাহিয়াছিলেন। সব জজ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিয়াছেন। রাজা কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল রুজু করিয়াছেন। আপোষ-নিষ্পত্তি হইলেই সুখের কথা। (বঙ্গবাসী)

পরলোক।—হুগলি-চুচুড়ার সুবিখ্যাত সোমবংশের স্বনামধন্য রায় বরদাপ্রসন্ন সোম বাহাদুর গত ২৪শে বৈশাখ মঙ্গলবার পরলোকগমন করিয়াছেন। সোম মহাশয় নানাগুণে বহুজনের প্রীতিভাজন ছিলেন। (বঙ্গবাসী)

নূতন দিল্লী।—দিল্লী সহরের নূতন রাজধানী কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এখনও তাহা স্থির হয় নাই, পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু ভারত গবরমেণ্ট ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে নূতন রাজধানী শাসন করিবেন, তন্মধ্যেই তাহার খসড়া নিয়মাবলী গঠন করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে এখনও আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। রাজধানী পত্তনের স্থান স্থির হইলেই, ভারত গবরমেণ্ট দিল্লী সহর পঞ্জাব-গবরমেণ্টের নিকট হইতে খাসে লইবেন। (বঙ্গবাসী)

নিদাঘ-নিবাস।—নূতন বিহার প্রদেশের ছোট লাট নিদাঘ কালে কোথায় থাকিবেন, এই কথা লইয়া খুবই আন্দোলন চলিতেছে। মধ্যে কথা উঠিয়াছিল, ছোট লাট সাহেব গ্রীষ্মকালে রাঁচিতেই অবস্থান করিবেন। এখন শুনিতেছি, গ্রীষ্মকালটা তিনি ময়ূরভঞ্জে কাটাইবেন। ময়ূরভঞ্জে পাহাড়ের উপর ছোট লাট বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস হইতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছে। বোধ হয়, অবিলম্বেই একটা কিছু সিদ্ধান্ত হইবে। (বঙ্গবাসী)

* গতসংখ্যায় এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।—গৃ-স

গবাদির গণনা।—গবরমেণ্টের আদেশে প্রত্যেক গ্রামে—প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহপালিত গবাদির গণনা হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে কোন্ গ্রামে গোচর ভূমি কত,—তাহারও পরিমাণ-নির্দ্দেশের ব্যবস্থা হইয়াছে। পঞ্চায়েত-প্রেসিডেণ্ট এবং পুলীশ-দারোগারা এই গণনার ভার পাইয়াছেন। এই গণনার রিপোর্ট-ফল জানিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত হইয়া রহিলাম। কোন্ গ্রামে পুকুরের সংখ্যা কত,—কয়টা পুকুরই বা জলশূন্য, আর কয়টা পুকুরই বা জলপূর্ণ;—ইহারও তদন্তের ব্যবস্থা হইবে কি?

নূতন নিয়োগ।—বঙ্গ, বিহার এবং আসামের কোর্ট অব ওয়ার্ড সমূহের জন্য একজন "লেডিএসিষ্টাণ্ট" বা "সহকারিণী রমণী আইন সচিব" নিযুক্ত হইবেন, ষ্টেট-সেক্রেটারী সম্প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। এ পদে পেন্সনও আছে। মিস কর্ণিলিয়া সোরাবজী আজ পাঁচ বৎসর কাল কোর্ট অব ওয়ার্ডে আইনের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ,—তিনিই এখন এ পদে পাকা হইলেন। কর্ণিলিয়া সোরাবজী বিলাতের ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা,—পারসী-রমণী। (বঙ্গবাসী)

কমলা লাইব্রেরী।—২২শে মে তারিখে উত্তর ইটালি কমলা লাইব্রেরীর প্রথম অধিবেশন হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্, এল্, ম্যাডক্স সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

পুলীশ আদালত।—ইতিপূর্ব্বে রটিয়াছিল, কলিকাতায় যে সুরম্যভবনে ইতিপূর্ব্বে ভারত গবরমেণ্টের ফরেণ আফিস এবং মিলিটারী আপিস প্রতিষ্ঠিত ছিল, এসপ্লানেডের সেই সুরম্য ভবনে লালবাজারের পুলীশ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ প্রস্তাবে ট্রেডস্ এসোসিয়েশন প্রভৃতি অনেকেই আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহাঁদের আপত্তির একটা কথা,—পুলীশ আদালতের প্রতিষ্ঠাফলে বহুতর ভবঘুরের প্রাদুর্ভাবে এ ভবনের সৌন্দর্য্য হানিরই সম্ভাবনা। এখন আবার আর এক বাধা উপস্থিত। ভারত গবরমেণ্ট এই বাড়ীর মূল্য হিসাবে পঁচিশ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন। সুতরাং এ প্রাসাদে লালবাজারের পুলীশ আদালত স্থানান্তরিত হইবে কি না, তাহা এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই। বেঙ্গল গবরমেণ্ট ভারত গবরমেণ্টের নিকট হইতে এত টাকা দিয়া এ বাড়ী লইতে রাজী হইবেন কি না, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। প্রকাশ,—মিউনিসিপাল আফিসে লালবাজারের পুলীশ আদালত যাইবে। আর মিউনিসিপাল আফিস যাইবে ফরেণ ও মিলিটারী আফিস বাড়ীতে। গত ১১ই এবং ১৪ই মে তারিখের "ইংলিসম্যান" এই প্রসঙ্গে কলিকাতা সহরে আরও গোটা কয়েক বড় বড় সরকারী বাড়ীর আনুমানিক মূল্য তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—গবরমেণ্ট হাউস ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা; ইম্পিরিয়াল সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিং ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা; কমার্স এণ্ড ইণ্ডষ্ট্রী বিল্ডিং ১৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা; পোষ্ট আপিস ২৬ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। টেলিগ্রাফ আপিস ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ইংলিশম্যান বলিয়াছেন—বেঙ্গলগবরমেণ্টের নিকট হইতে ভারতগবরমেণ্ট এই পরিমিত মূল্যই পাইতে পারেন।

(বঙ্গবাসী)

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর
বেনারস	...	২৫|১৯ উ	...	৮৩| ৩ পূ
বেহার	...	২৫|১১ "	...	৮৫|৩৪ "
বৈদ্যনাথ	...	২৫|১৭ "	...	৮৫|৩৬ "
বৈদ্যবাটি	...	২২|৪৭ "	...	৮৮|২২ "
বোড়াল	...	২২|২৭ "	...	৮৮|২৪ "
বোম্বাই	...	১৮|৫৫ "	...	৭৫|৫৪ "
বোলপুর	...	২৩|৪০ "	...	৮৮| ২ "
বৌদ	...	২০|৫০ "	...	৮৪|২৪ "
ব্রাহ্মণবেড়িয়া	...	২৩|৫৯ "	...	৮৪|৩৮ "
ভগবানগোলা	...	২৪|২০ "	...	৮৮|২০ "
ভদ্রক	...	২১| ৩ "	...	৮৬|৩৩ "
ভদ্রেশ্বর	...	২২|৫০ "	...	৮৮|২৪ "
ভবানীপুর	...	২২|৩১ "	...	৮৮|২৩ "
ভরতপুর	...	২৭|১৩ "	...	৭৭|৫২ "
ভাগলপুর	...	২৫|১৫ "	...	৮৭| ৩ "
ভাঙ্গড়	...	২২|৩১ "	...	৮৮|৩৯ "
ভুবনেশ্বর	...	২০|২৬ "	...	৮৫|৮৪ "
ভূপাল	...	২৩|১৫ "	...	৭৭|২৫ "
ভোলা	...	২২|৪১ "	...	৯০|৩৮ "
মজিলপুর	...	২২|১১ "	...	৮৮|২৮ "
মণিপুর	...	২৪|৪৮ "	...	৯৪| ১ "
মতিহারী	...	২৬|৩৮ "	...	৮৪|৫৮ "
মথুরা	...	২৭|৩০ "	...	৭৭|৪৪ "
মথুরাপুর (আলিপুর)		২২|২০ "	...	৮৮|২৯ "
" (ডায়মণ্ড হারবর)		২২| ৭ "	...	৮৮|২৭ "
মধুবানী	...	২৬|২১ "	...	৮৫| ৮ "
মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা)		২৪|১৭ "	...	৮৬|৩৮ "
মধেপুর (ভাগলপুর)	...	২৫|৫৬ "	...	৮৬|৫৩ "
ময়মনসিং	...	২৪|৪৬ "	...	৮৯|৫৩ "
ময়ূরভঞ্জ	...	২১|৫৬ "	...	৮৬|৫৪ "
মাগুরা	...	২৩|২৯ "	...	৮৯|২৮ "
মাণিকগঞ্জ	...	২৩|৫৩ "	...	৯০| ৫ "
মাতলা	...	২২|১৯ "	...	৮৮|৪৩ "
মাদারিপুর	...	২৩|১১ "	...	৯০| ৮ "
মানকর	...	২৩|২৬ "	...	৮৭|৩৭ "
মান্দ্রাজ	...	১৩| ৪ "	...	৮০|১৭ "
মায়াপুর	...	২৩|২৬ "	...	৮৮|১১ "

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর
মালদহ	...	২৫। ৩ উ	...	৮৮।১১ পূ
মাহেশ	...	২২।৪৪ „	...	৮৮।২৪ „
মিরাট	...	২৯। ১ „	...	৭৭।৪৫ „
মুঙ্গের	...	২৫।২৩ „	...	৮৬।৫০ „
মুজঃফরপুর	...	২৬। ৭ „	...	৮৫।২৪ „
মুন্সীগঞ্জ	...	২২।৩৩ „	...	৮৬। ৯ „
মুরসিদাবাদ	...	২৪।১১ „	...	৮৮।১৯ „
মুলতান	...	৩০।১২ „	...	৭১।৩১ „
মেদিনীপুর	...	২২।২৫ „	...	৮৭।২১ „
মেলবোর্ণ (অষ্ট্রেলিয়া)	...	৩৭।৫০ দ	...	১৪৪।৫৯ „
মেহেরপুর (নদিয়া)	...	২৩।৪৩ উ	...	৮৮।৩৮ „
যশোহর	...	২৩।১০ „	...	৮৯।১৫ „
যাজপুর	...	২১।৫১ „	...	৮৬।২৩ „
যোধপুর (রাজপুতানা)		২৬।১৭ „	...	৭৩। ৪ „
রঘুনাথপুর (ছোটনাগপুর)		২৩।৩২ „	...	৮৬।৩৯ „
„ (২৪ পরগণা)		২২।২৫ „	...	৮৮।২৯ „
রাজপুর (২৪ পরগণা)		২২।২৬ „	...	৮৮।৩০ „
রাজমহল	...	২৫। ৩ „	...	৮৭।৫৪ „
রাজাসাহী	...	২৪। ৩ „	...	৮৯।১১ „
রাণাঘাট	...	২৩।১১ „	...	৮৮।৩৭ „
রাণীগঞ্জ	...	২৩।৩৭ „	...	৮৭। ৯ „
রাঁচী	...	২৩।২২ „	...	৮৫।২৪ „
রামনগর (বেহার)		২৭।১০ „	...	৮৪।২৪ „
„ (বারুইপুর)		২২।২১ „	...	৮৮।২১ „
„ (ফলতা)		২৪। ৬ „	...	৮৮। ১ „
„ (খিদিরপুর)		২২।৩৪ „	...	৮৮।২৯ „
রামপুর বোয়ালিয়া	...	২৪।২২ „	...	৮৮।৩৯ „
রামপুরহাট	...	২৪। ৯ „	...	৮৭।৫০ „
রায়পুর	...	২১।১৫ „	...	৮১।৪১ „
রেঙ্গুন	...	১৬।৪৭ „	...	৯৬।৩৬ „
লণ্ডন	...	৫১।৩১ „	...	০। ৫ „
লক্ষীপুর (নোয়াখালী)		২৩।৫৭ „	...	৮৫।৫৩ „
„ (আসাম)	...	২৭।১৫ „	...	৯৪। ০ „
লক্ষ্ণৌ	...	২৬।৫২ „	...	৮০।৫৮ „
লাহোর	...	৩১।৩৪ „	...	৭৪।২১ „
লোহারডগা	...	২৩।২৬ „	...	৮৪।৪৩ „
শাকনাড়া	...	২৩। ৪ „	...	৮৭।৫৭ „

স্থান		অক্ষাংশাদি		দেশান্তর
শান্তিপুর	...	২৩।১৪ উ	...	৮৮।২৯ পূ
শিকারপুর	...	২৭।৫৭ „	...	৮৬।৪০ „
শিবগঞ্জ (মালদহ)		২৪।৪১ „	...	৮৮। ৯ „
শিবপুর	...	২২।৩৪ „	...	৮৮।১৩ „
শিবসাগর (আসাম)		২৬।৫৯ „	...	৯৪।৩৮ „
শিলচর (কাছাড়)		২৪।৪৯ „	...	৯২।৪৬ „
শিলং (আসাম)		২৫।৩৪ „	...	৯১।৫৮ „
শ্রীনগর	...	৩৪। ৬ „	...	৭৪।৫১ „
শ্রীরামপুর	...	২২।৪৫ „	...	৮৮।২৩ „
শ্রীহট্ট	...	২৪।৫৩ „	...	৯১।২৫ „
সপ্তগ্রাম	...	২২।৫৮ „	...	৮৮।২৫ „
সমস্তিপুর (দ্বারভাঙ্গা)		২৫।৫২ „	...	৮৫।৫৪ „
সম্বলপুর (উড়িষ্যা)		২১।২৭ „	...	৮৪। ১ „
সাতক্ষীরা (খুলনা)		২২।৪২ „	...	৮৯। ৯ „
সাহেবগঞ্জ	...	২৫।১৫ „	...	৮৭।৪০ „
সিকরোল	...	২৫।২০ „	...	৮৩। ১ „
সিমলা	...	৩১। ৬ „	...	৭৭।১১ „
সিরাজগঞ্জ	...	২৪।২৮ „	...	৮৭। ৩ „
সিরোহী	...	২৪।৫৩ „	...	৭২।৫৪ „
সীতামারি	...	২৬।৩৫ „	...	৮৫।১৪ „
সুধারাম	...	২২।৪৮ „	...	৯১। ৯ „
সুরাট	...	২১। ৯ „	...	৭২।৫৪ „
সুরী	...	২৩।৫৪ „	...	৮৭।৩৪ „
সেরপুর	...	২৫। ১ „	...	৯০। ৩ „
সোনামুখী	...	২৩।১৯ „	...	৮৭।২৪ „
সোনারপুর (২৪ পরগনা)		২২।২৬ „	...	৮৮।২৯ „
হয়দরাবাদ (নিজাম)		১৭।২২ „	...	৭৮।৩০ „
„ (সিন্ধু)	...	২৫।২৩ „	...	৬৮।২৪ „
হরিদ্বার	...	২৯।৫৮ „	...	৭৮।১৩ „
হরিনাভি (২৪ পরগণা)		২২।২৫ „	...	৮৮।৩০ „
হস্তিনাপুর	...	২৯। ৯ „	...	৭৮। ৩ „
হাজারিবাগ	...	২৩।৫৯ „	...	৮৫।২৫ „
হাজীপুর (মুজঃফরপুর)		২৬। ৭ „	...	৮৫।২৪ „
হাটরাস্	...	২৭।৩৬ „	...	৭৮। ৬ „
হাওড়া	...	২২।৩৫ „	...	৮৮।২৩ „
হিজলী	...	২১।৫৭ „	...	৮৭।২৭ „
হুগলী	...	২২।৫৫ „	...	৮৮।২৬ „

স্থান	অক্ষাংশাদি		দেশান্তর
হুগলী (সেমাফোর)	২২।১৩ উ	...	৮৮।২৫ পূ

আমি অক্ষাংশাদি লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এই তালিকাতে ত সকল স্থানের নাম নাই। যে স্থানের নাম না পাওয়া যা'বে তা'র অক্ষাদি নিরূপণ কিরূপে হ'বে আর এক বার পরিষ্কার কোরে বুঝিয়ে দিন।"

গুরুদেব।—"সকল মানচিত্রেই পূর্ব্ব পশ্চিমে যে রেখা টানা থাকে সে গুলিকে অক্ষ রেখা বলে, উত্তর দক্ষিণে যে রেখাগুলি আঁকা আছে সে গুলির নাম দেশান্তর রেখা বা দ্রাঘিমা। অক্ষান্তরগুলি নিরক্ষদেশ বা বিষুবতরেখা হ'তে উত্তর বা দক্ষিণে অংশাদি দ্বারা পরিমিত হয়, আর দেশান্তর রেখাগুলি, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া উত্তর দক্ষিণে মধ্য-রেখা কল্পনা ক'রে তা'রি পূর্ব্ব বা পশ্চিমে অংশাদি বা ঘণ্টাদি দ্বারা পরিমিত হয়। কোনও স্থানের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে একটি অক্ষান্তর কল্পনাপূর্ব্বক সেটি বর্দ্ধিত করলে যে বৃত্ত কল্পিত হ'বে তা'র পরিমাণ ৩৬০ অংশ এবং যেহেতু ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টায় ঐ বৃত্তটি একবার আবর্ত্তিত হয়, এইজন্য ৩৬০ অংশকে ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টার সমান বলা যেতে পারে। কাজেই এক অংশ পরিমিত চাপের আবর্ত্তন সময় ১০ পল বা ৪ মিনিট এবং এক কলা পরিমিত চাপের আবর্ত্তন কাল ১০ বিপল বা ৪ সেকেণ্ড, স্বতরাং কোনও স্থানের দেশান্তর অংশাদি জানা থাকলে ঘণ্টাদি বা দণ্ডাদি দেশান্তর নির্ণয় করা কঠিন নয়। এখন একখানি মানচিত্রে তোমার অভিষ্ট স্থানটি, কোন্ স্থানে চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল, স্থির কোরে, সেখানে একটি বিন্দু দাও তার পর একটা ফুট রুল দিয়ে দেখ, ঐ বিন্দুটি তাহার উত্তরস্থ চিহ্নিত অক্ষরেখা হ'তে কত দক্ষিণে এবং দক্ষিণস্থ অক্ষরেখা হোতে কত উত্তরে; এবং পূর্ব্বস্থিত দেশান্তর রেখা হোতে কত পশ্চিমে ও পশ্চিমস্থ রেখা থেকে কত পূর্ব্বে। তার পর মানচিত্রের স্কেলের সাহায্যে উভয় দূরত্ব নির্ণয় পূর্ব্বক. পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মোটামুটি অক্ষাংশ ও দেশান্তরাংশ নির্ণয় কোরে তদ্দ্বারা উদয়াস্তাদি নির্ণয় পূর্ব্বক নির্ভুলভাবে কোষ্ঠী প্রভৃতি গণনা করা যেতে পারে। আমার ও তালিকার অনেক স্থানের অক্ষাংশাদি এই নিয়মেই গণিত হ'য়েচে।

আমি। "অক্ষ নির্ণয়ের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই অক্ষান্তর রেখা থেকে পরিমাণ করতে বল্লেন কেন?"

গুরুদেব। "দু'দিক থেকে পরিমাণ কোরে যে দু'টি ফল লব্ধ হ'বে, সে দু'টি যদি সমান না হয়, তবে সমষ্টির অর্দ্ধেক নিলেই ঠিক হ'বে।"

আমি। "এই বার বেশ বুঝেচি। এখন বলুন দেখি ইতিপূর্ব্বে যে উদয়াস্ত গণনা কোল্লেন, সে কি কলিকাতার?" কলিকাতার ত শুনেছি পঞ্চাঙ্গুল দশব্যঙ্গুল ছায়া।"

গুরুদেব। "পঞ্জিকাতে ঐরূপ লেখে বটে, কারণ শ্রীযুক্ত রাঘবানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বদেশীয় পলভ ঐ পরিমিতই স্থির কোরেছেন। কিন্তু কলিকাতার কোনও স্থানেই ঐ পলভ হ'তে পারে না, এবং তাঁ'র স্বীকৃত দেশান্তরও কলিকাতার নয়। সে সকল কথা এর পর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যা'বে।"

আমি। "কোন স্থানের পলভা নির্ণয়ের উপায় কি?"

গুরুদেব। "উপায় শক্ত। অভীষ্ট দেশে কোনও সমতল স্থানে একটি কাঠি লম্বভাবে পুতে, বারো অঙ্গুল উপরে বাহির ক'রে রাগ্‌লে, যে দিন দিনরাত্রি সমান, সেই দিন মধ্যাহ্নে ঐ কাঠির যত অঙ্গুলাদি ছায়া হ'বে তাই সে দেশের পলভা। কাঠিটি অঙ্গুলীর পরিবর্ত্তে হস্ত বা ফুট দ্বারা পরিমাণ করিয়া বারো হাত বা বারো ফুট উঁচু করিয়া রাখিলে ছায়ার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সহজ হ'তে পারে। যাই হোক আপাততঃ কত অক্ষাংশে কত পলভ হয়, লিখে রাখ। এর পর নির্ণয়ের নানাবিধ উপায় বোলে দিব।

আমি তাঁহার আদেশানুসারে নিম্নলিখিত পলভাসারিণীটিও লিখিয়া লইলাম।

পলভাসারিণী।

অক্ষাংশ			পলভা						
১ অংশ	...	...	০·২	অঙ্গুলী	বা	০	আঙ্গুল	১২	বাঙ্গুল
১০ ,,	...	...	২·১	,,	,,	২	,,	৬	,,
১৫ ,,	...	...	৩·২	,,	,,	৩	,,	১২	,,
১৬ ,,	...	...	৩·৪	,,	,,	৩	,,	২৪	,,
১৭ ,,	...	...	৩·৭	,,	,,	৩	,,	৪২	,,
১৮ ,,	...	...	৩·৯	,,	,,	৩	,,	৫৪	,,
১৯ ,,	...	...	৪·১	,,	,,	৪	,,	৬	,,
২০ ,,	...	...	৪·৪	,,	,,	৪	,,	২৪	,,
২১ ,,	...	...	৪·৬	,,	,,	৪	,,	৩৬	,,
২২ ,,	...	...	৪·৮	,,	,,	৪	,,	৪৮	,,
২৩ ,,	...	...	৫·১	,,	,,	৫	,,	৬	,,
২৪ ,,	...	...	৫·৩	,,	,,	৫	,,	১৮	,,
২৫ ,,	...	...	৫·৫	,,	,,	৫	,,	৩০	,,
২৬ ,,	...	...	৫·৯	,,	,,	৫	,,	৫৪	,,
২৭ ,,	...	...	৬·১	,,	,,	৬	,,	৬	,,
২৮ ,,	...	...	৬·৪	,,	,,	৬	,,	২৪	,,
২৯ ,,	...	...	৬·৬	,,	,,	৬	,,	৩৬	,,
৩০ ,,	...	...	৬·৯	,,	,,	৬	,,	৫৪	,,
৩১ ,,	...	...	৭·২	,,	,,	৭	,,	১২	,,
৩২ ,,	...	...	৭·৪	,,	,,	৭	,,	২৪	,,
৩৩ ,,	...	...	৭·৬	,,	,,	৭	,,	৩৬	,,
৪০ ,,	...	...	১০·১	,,	,,	১০	,,	৬	,,
৫০ ,,	...	...	১৪·৩	,,	,,	১৪	,,	১৮	,,
৬০ ,,	...	...	২০·৮	,,	,,	২০	,,	৪৮	,,

মধ্যবর্ত্তী অংশাদির পলভা অনুপাত দ্বারা নির্ণয় ক'ল্লে বেশী ভুল হ'বে না। যেমন মনে কর যে স্থানের অক্ষাংশাদি বাইস অংশ সাঁইত্রিশ কলা তের বিকলা, সেই স্থানের পলভ নির্ণয় ক'ত্তে হ'বে।

∴ ২২ অংশ = ৪·৮ অঙ্গুলী

এবং ২৩ " = ৫·১ অঙ্গুলী

উভয়ের অন্তর ১ অংশ = ০·৩ অঙ্গুলী

এখন অনুপাত কর ৬০ কলা অক্ষান্তরে যদি ·৩ অঙ্গুলী ছায়া বৃদ্ধি হয়, তবে ৩৭′—১৩″ অক্ষান্তরের জন্য কত বৃদ্ধি হ'বে?

$$৬০' : ৩৭' । ১৩'' :: ·৩ \text{ অঙ্গুলী} : \text{কত?}$$

$$\frac{৩৭\tfrac{১৩}{৬০} \times ·৩}{৬০}$$

$$∴ \frac{৩৭·২.... \times ·৩}{৬০} = ·১৮ \text{ বা } ·২ \text{ অঙ্গুলী বৃদ্ধি হইবে।}$$

∴ ৪·৮ + ·২ = ৫ অঙ্গুলী

সুতরাং আমরা ইতিপূর্ব্বে যে দেশের দিনমান ও উদয়াস্তাদি কসেছি, সে স্থান কলিকাতার অক্ষ অপেক্ষা উত্তরে। পঞ্চাঙ্গুল দশব্যঙ্গুল ছায়াযুক্ত স্থান তার আরও উত্তরে।

আমি। "অংশ থেকে ঘণ্টা মিনিট কর্‌বার একটা টেবিল কোরে রাখ্‌লে হয় না?

গুরুদেব। "কোরে রাখা উচিত। চেম্বার্সের টেবিলে আছে। আমি একটু পরিবর্ত্তিত আকারে আমার খাতায় লিখে রেখেছি। এই দেখ। এইটা লিখে নিতে পার। যদিও উপস্থিতমত ক'সে নেওয়া সহজ, তবু টেবিলে শুদ্ধ কোরে লিখে রাখ্‌লে, ভুল হ'বার কম সম্ভাবনা।"

আমি এ টেবিলটিও লিখিয়া লইলাম।

অংশাদি হইতে ঘণ্টাদি নির্ণয়।

অ	ক	ঘ	মি	দ	প	অ	ক	ঘ	মি	দ	প
ক	বি	মি	সে	প	বি	ক	বি	মি	সে	প	বি
বি	অ	সে	থা	বি	অ	বি	অ	সে	থা	বি	অ
০	১৫	০	১	০	২॥	৬	০	০	২৪	১	০
০	৩০	০	২	০	৫	৭	০	০	২৮	১	১০
০	৪৫	০	৩	০	৭॥	৮	০	০	৩২	১	২০
১	০	০	৪	০	১০	৯	০	০	৩৬	১	৩০
২	০	০	৮	০	২০	১০	০	০	৪০	১	৪০
৩	০	০	১২	০	৩০	১১	০	০	৪৪	১	৫০
৪	০	০	১৬	০	৪০	১২	০	০	৪৮	২	০
৫	০	০	২০	০	৫০	১৩	০	০	৫২	২	১০

অ। ক। বি।	ক। বি। অ।	ঘ। মি। সে।	মি। সে। থা।	দ। প। বি।	প। বি। অ।
১৪	০	০	৫৬	২	২০
১৫	০	০	১	২	৩০
১৬	০	১	৪	২	৪০
১৭	০	১	৮	২	৫০
১৮	০	১	১২	৩	০
১৯	০	১	১৬	৩	১০
২০	০	১	২০	৩	২০
২১	০	১	২৪	৩	৩০
২২	০	১	২৮	৩	৪০
২৩	০	১	৩২	৩	৫০
২৪	০	১	৩৬	৪	০
২৫	০	১	৪০	৪	১০
২৬	০	১	৪৪	৪	২০
২৭	০	১	৪৮	৪	৩০
২৮	০	১	৫২	৪	৪০
২৯	০	১	৫৬	৪	৫০
৩০	০	২	০	৫	০
৩১	০	২	৪	৫	১০
৩২	০	২	৮	৫	২০
৩৩	০	২	১২	৫	৩০
৩৪	০	২	১৬	৫	৪০
৩৫	০	২	২০	৫	৫০
৩৬	০	২	২৪	৬	০
৩৭	০	২	২৮	৬	১০
৩৮	০	২	৩২	৬	২০
৩৯	০	২	৩৬	৬	৩০
৪০	০	২	৪০	৬	৪০
৪১	০	২	৪৪	৬	৫০
৪২	০	২	৪৮	৭	০
৪৩	০	২	৫২	৭	১০
৪৪	০	২	৫৬	৭	২০
৪৫	০	৩	০	৭	৩০
৪৬	০	৩	৪	৭	৪০
৪৭	০	৩	৮	৭	৫০
৪৮	০	৩	১২	৮	০
৪৯	০	৩	১৬	৮	১০
৫০	০	৩	২০	৮	২০
৫১	০	৩	২৪	৮	৩০
৫২	০	৩	২৮	৮	৪০
৫৩	০	৩	৩২	৮	৫০
৫৪	০	৩	৩৬	৯	০
৫৫	০	৩	৪০	৯	১০
৫৬	০	৩	৪৪	৯	২০
৫৭	০	৩	৪৮	৯	৩০
৫৮	০	৩	৫২	৯	৪০
৫৯	০	৩	৫৬	৯	৫০
৬০	০	৪	০	১০	০
৭০	০	৪	৪০	১১	৪০
৮০	০	৫	২০	১৩	২০
৯০	০	৬	০	১৫	০
১০০	০	৬	৪০	১৬	৪০
১১০	০	৭	২০	১৮	২০
১২০	০	৮	০	২০	০
১৩০	০	৮	৪০	২১	৪০
১৪০	০	৯	২০	২৩	২০
১৫০	০	১০	০	২৫	০
১৬০	০	১০	৪০	২৬	৪০
১৭০	০	১১	২০	২৮	২০
১৮০	০	১২	০	৩০	০
২০০	০	১৩	২০	৩৩	২০
৩০০	০	২০	০	৫০	০
৩৬০	০	২৪	০	৬০	০

গুরুদেব।—"এখন এই টেবিলের সাহায্যে গোটা দুই অঙ্ক কস দেখি—আচ্ছা, দং ৫।৩৫।৩৭ বিপলে কত অংশাদি?

আমি। টেবিলে দেখছি ৫ দণ্ড ৩০ পল = ৩৩ অংশ

∴ ৫ পল ৩০ বিপল = ৩৩ কলা

৭ বিপল = ৪২ বিকলা

যোগ করিয়া ৫দণ্ড ৩৫ পল ৩৭ বিপল = ৩৩ অংশ ৩৩ কলা ৪২ বিকলা

গুরুদেব।—"২৮০ অংশ ৩৭ কলা ৫৫ বিকলায় কত দণ্ডাদি ও ঘণ্টাদি ?

আমি।—২০০ অংশ = ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনি = ৩৩ দণ্ড ২০ পল

৮০ অংশ = ৫ „ ২০ „ = ১৩ „ ২০ „

৩৭ কলা = ০ „ ২ „ ২৮সে = ৬ „ ১০ বিপল

৫৫ বিকলা = ০ „ ০ „ ৩।৪০ = ৯।১০ „

২৮০ অংশ ৩৭ কলা ৫৫ বিক = ১৮।৪২।৩১।৪০ = ৪৬।৪৬।১৯।১০

গুরুদেব।—"টেবিলটা আরো বিস্তৃত ক'ল্লে এ ঠিকটাও না কোরে কাজ করা যেতে পার্বে।

আমি।—"আচ্ছা আমি কোরে রাখ্‌বো। * এখন বলুন দেখি মাসগুলির পরিমাণ নির্ণয়ের উপায় কি ? দিনমান নির্ণয় প্রভৃতি ত শিখেছি। এখন কোন মাস ক দিনে শেষ হ'বে সেইটা নির্ণয় কোত্তে শিখ্‌লেই এ দিকটা এক রকম শেষ হয়।"

গুরুদেব। "বাবা, শেষের এখন অনেক বাকী। তুমি নিজে নিজে জমি কতকটা পরিষ্কার কোরে রেখেছিলে, এখন আমি ঢিল ভাঙ্‌চি। এর পর চাস আরম্ভ হ'বে। ফলের কথা পরে। ইংরাজীতে যেমন প্রত্যেক মাসের দিন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমাদের দেশেও সেইরূপ আছে, তবে মতভেদে দণ্ড পলাদির তারতম্য আছে, সে কথা এর পর হ'বে। আপাততঃ সচরাচর যেরূপ পরিমাণ গৃহীত হয়, তাই বলচি শোনো—

মাস	দিন	দণ্ড	পল	মাস	দিন	দণ্ড	পল
বৈশাখ	৩০	৫৬	৪৯	কার্ত্তিক ...	২৯	৫২	৫১
জ্যৈষ্ঠ ...	৩১	২৫	৩৯	অগ্রহায়ণ ...	২৯	২৯	১
আষাঢ় ...	৩১	৩৮	৩৫	পৌষ ...	২৯	১৯	৯
শ্রাবণ ...	৩১	১৭	৫৭	মাঘ ...	২৯	২৭	২৩
ভাদ্র ...	৩১	০	২০	ফাল্গুন ...	২৯	৫০	৪
আশ্বিন ...	৩০	২৫	৪০	চৈত্র ...	৩০	২২	৩
	১৮৬	৫৫	০	+	১৭৮	২০	৩১

= ৩৬৫ । ১৫ । ৩১

সচরাচর বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্য্যন্ত ১৮৭ দিন ধ'রে কার্ত্তিক থেকে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৭৮।১৫।৩১ ধর্‌লে বেশী তফাৎ হয় না। এখন দেখ ১৩১৯ সালের বৈশাখ প্রবৃত্তি শুক্রবার † ৩০এ চৈত্র।

---

* যাঁহারা জ্যোতিষের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা এই সকল টেবিল বিস্তৃতভাবেই ক'রে রাখ্‌বেন। তা'তে ভবিষ্যতে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হ'বে। মুদ্রাঙ্কনের সময় মুদ্রাকরগণের অনুগ্রহে যেরূপ ভ্রম প্রমাদ হয় তাতে আমার বিস্তৃত টেবিল দিতে ভয় হয়।— (লেখক)।

† পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন পঞ্জিকা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তদনুসারে অতঃপর ১৩১৯ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার অঙ্ক গৃহীত হইবে।

বিস্পষ্টেন্দুমুখীং সুভ্রূং পীনশ্রোনিপয়োধরাম্।
বিম্বাধরৌষ্ঠীং তন্বঙ্গীং নীলোৎপলবিলোচনাম্ ॥ ১৭ ॥
রক্ততুঙ্গনখাং শ্যামাং মৃদ্বীং তাম্রকরাঙ্ঘ্রিকাম্।
করভোরুং সুদশনাং নীল-সূক্ষ্ম-স্থিরালকাম্ ॥ ১৮ ॥
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীমনঙ্গাঙ্গলতামিব।
সোঽমন্যৎ পার্থিবসুতস্তাংরসাতলদেবতাম্ ॥ ১৯ ॥
সা চদৃষ্ট্বৈব তং বালা নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজম্।
পীনোরঃস্কন্ধবাহুং তমমংস্ত মদনং শুভা ॥ ২০ ॥
উত্তস্থৌ চ মহাভাগা চিত্তক্ষোভমবাপ সা।
লজ্জা-বিস্ময়-দৈন্যানাং সদ্যস্তন্বী বংশগতা ॥ ২১ ॥
কোঽয়ং দেবোঽথ যক্ষো বা গন্ধর্ব্বোবোরগোঽপি বা।
বিদ্যাধরো বা সম্প্রাপ্তঃ পুণ্য কৃততির্নাপরঃ ॥ ২২ ॥

পূর্ণচন্দ্রমুখী ভুরু-কাম ধনু
পীন শ্রোণি-পয়োধরা,
পক্ব বিম্ব জিনি' অধরোষ্ঠ তা'র
কৃশোদরী মনোহরা।
নীলোৎপল জিনি' নয়ন যুগল
আরক্ত নখর-দল,
শ্যামা সুকোমলা নবনীত-কায়
রক্ত-কর-পদ-তল।
করভোরু শুভা, সুন্দর দশন,
সুনীল অলক-রাজি'
কৃষ্ণ কেশপাশ বদন সহাস
রয়েছে বসিয়া সাজি। ১৭-১৮।
সে চারুসর্ব্বাঙ্গী কামিনীরে দেখি'
অনঙ্গাঙ্গলতা প্রায়,
ভাবে নৃপসুত "পাতাল-দেবতা
আজিকে দেখিনু হায়। ১৯।

সে শুভা কুমারী কুমারে হেরিয়া,
নিরখিয়া রূপ তাঁ'র,
কুঞ্চিত কুন্তল দেহ সুবিমল
পীন-উরু-স্কন্ধ আর,
পীন-ভুজ-দ্বয় সবল সুঠাম
ভাবে বালা মনে মনে,
বুঝিবা মদন কৈলা আগমন
আজি হেথা শুভক্ষণে। ২০।
অভ্যর্থনা আশে সে, কৃশাঙ্গী বালা
দাঁড়াইলা যেই ক্ষণে,
চিত্তক্ষোভ হ'লো লজ্জা, দৈন্য আর,
বিস্ময় আসিল মনে। ২১।
ভাবে বালা মনে কেবা এই জন?
দেবতা, যক্ষ, কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব, উরগ, কিম্বা বিদ্যাধর,
কিম্বা পুণ্যবান নর। ২২।

এবং বিচিন্ত্য বহুধা নিঃশ্বস্য চ মহীতলে।
উপবিশ্য ততো ভেজে সা মূর্চ্ছাং মদিরেক্ষণা ॥ ২৩ ॥
সোঽপি কামশরাঘাতমবাপ্য নৃপতেঃ সুতঃ।
তাং সমাশ্বাসয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্ ॥ ২৪ ॥
সা চ স্ত্রী যা তদা পৃষ্টাপূর্ব্বং তেন মহাত্মনা।
তালবৃন্তমুপদায় পর্য্যবীজয়দাকুলা ॥ ২৫ ॥
সমাশ্বস্তা তদা পৃষ্টা তেন সম্মোহকারণম্।
কিঞ্চিল্লজ্জান্বিতা বালা সর্ব্বং সখ্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৬ ॥
সা চাস্মৈ কথয়ামাস নৃপপুত্রায় বিস্তরাৎ।
মোহস্য কারণং সর্ব্বং তদ্দর্শনসমুদ্ভবম্।
যথা তয়া সমাখ্যাতং তদ্বৃত্তান্তঞ্চ ভামিনী ॥ ২৭ ॥
বিশ্বাবসুরিতি খ্যাতো দিবি গন্ধর্ব্বরাট্ প্রভো।
তস্যেয়মাত্মজা সুভ্রূর্নাম্না খ্যাতা মদালসা ॥ ২৮ ॥

এরূপ ভাবিয়া পড়িল নিঃশ্বাস
জ্ঞান লোপ হলো তা'র,
সে মদিরেক্ষণা মূর্চ্ছিতা হইয়া
পড়ে ভূমে শবাকার। ২৩।
রাজার নন্দন নয়নে হেরিয়া
হইলা ব্যথিত অতি,
"ভয় নাই" বলি' নিকটে তাহার
গেলা অতি দ্রুতগতি। ২৪।
যেই কামিনীরে দেখেছিলা আগে
পথে, নৃপতি-নন্দন,
আসিয়া সে ত্বরা তালবৃন্ত ল'য়ে
করয়ে তাঁ'রে ব্যজন। ২৫।
মূর্চ্ছা-গতে তাঁ'রে আকুলা হেরিয়া
সেইত নৃপ-নন্দন,
বলে,—"দেবি, বল আমারে হেরিয়া
মূর্চ্ছা হৈল কি কারণ?"
লজ্জিতা সে বালা না পারে বলিতে;
কিছুক্ষণ পরে ধীরে,
বলিলা সকল হ'য়ে সচঞ্চল
আপনার সঙ্গিনীরে। ২৬।
সঙ্গিনী তাঁহার রাজার কুমারে
যথাযথ সমুদায়,
মূর্চ্ছার কারণ শুনিল যেমন
বলিল বিস্তারি তায়। ২৭।

নারী বলে ধীরে,—"প্রভো, করহ শ্রবণ
গন্ধর্ব্বগণের পতি বিখ্যাত ভুবন,
বিশ্বাবসু নাম তাঁ'র, এই ত ললনা
তনয়া তাঁহার, রূপে নাহিক তুলনা।
"মদালসা" নাম ধরে এই কৃশোদরী,
ত্রিভুবনে ইহাঁদের কেহ নহে অরি। ২৮।

বজ্রকেতোঃ সুতশ্চোগ্রো দানবোঽরিদারণঃ।
পাতালকেতুর্বিখ্যাতঃ পাতালান্তরসংশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥
তেনেয়মুদ্যানগতা কৃত্বা মায়াং তমোময়ীম্।
অপহৃত্য ময়া হীনা বালা নীতা দুরাত্মনা ॥ ৩০ ॥
আগামিন্যাং ত্রয়োদশ্যামুদ্বক্ষ্যতি কিলাসুরঃ।
স তু নার্হতি চার্ব্বঙ্গীং শূদ্রো বেদশ্রুতিমিব ॥ ৩১ ॥
অতীতে চ দিনে বালামাত্মব্যাপাদনোদ্যতাম্।
সুরভিঃ প্রাহ নায়ং ত্বাং প্রাপ্স্যতে দানবাধমঃ ॥ ৩২ ॥
মর্ত্ত্যলোকমনুপ্রাপ্তং য এনং ভেৎস্যতে শরৈঃ।
স তে ভর্ত্তা মহাভাগে অচিরেণ ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
অহঞ্চাস্যাঃ সখী নাম্না কুণ্ডলেতি মনস্বিনী।
সুতা বিন্ধ্যবতঃ পত্নী বীর-পুষ্করমালিনঃ ॥ ৩৪ ॥

বজ্রকেতু নামে এক দানব দুর্জ্জন,
তাহার তনয় সদা শত্রু-বিদারণ,
নামেতে পাতালকেতু উগ্রমূর্ত্তি অতি,
জগতে সবার সদা ঘটায় দুর্গতি।
এ পাতালতলে সেই সদা করি' বাস,
জগত-জনের মনে উপজয়ে ত্রাস। ২৯।
গন্ধর্ব্বপুরীতে আছে সুরম্য উদ্যান
ক্রীড়া করিতাম তথা শুন মতিমান।
এক দিন আমি তথা করি নি গমন
একা মদালসা ছিল ক্রীড়ায় মগন,
হেনকালে দুরাচার মায়া বিস্তারিয়া
এখানে এনেছে এঁরে হরণ করিয়া। ৩০।
আগামিনী ত্রয়োদশী দিনে দুরাচার
বলিয়াছে পাণিগ্রহ করিবে ইহাঁর।
কিন্তু সে অসুর কভু এঁর যোগ্য নয়
বেদশ্রুতি শূদ্রের অযোগ্য যথা হয়। ৩১।
এই সে কারণে কালি আত্মনাশ তরে,
হইলা উদ্যতা সখী কাতর-অন্তরে।
সুরভি ইহাঁরে হেরি' বলিলা তখন
"আত্ম-নাশ আশা ত্যজ, করহ শ্রবণ,
দানব তোমারে নিতে নারিবে কখন
অচিরে সে দুরাচার ত্যজিবে জীবন। ৩২।
মর্ত্ত্য-লোকে গিয়া সে দানব দুরাচার
নিরন্তর করি'ছে অশেষ অত্যাচার।
যাঁ'র শরে দেহ বিদ্ধ হইবে তাহার,
সেই জন ভর্ত্তা তব কহিলাম সার।
অচিরে তাঁহারে তুমি পাইবে নিশ্চয়
আমার বাক্যেতে কিছু ক'রো না সংশয়। ৩৩।
আমি এঁর সখী, নাম কুণ্ডলা আমার,
বিন্ধ্যবান পুত্রী আমি কহিলাম, সার,
মনস্বিনী সন্ন্যাসিনী হইয়াছি আমি,
শুম্ভ সনে রণে প্রাণ ত্যজেছেন স্বামী।

হতে ভর্ত্তরি শুম্ভেন তীর্থাৎ তীর্থমনুব্রতা।
চরামি দিব্যয়া গত্যা পরলোকার্থমুদ্যতা ॥ ৩৫ ॥
পাতালকেতুর্দুষ্টাত্মা বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
কেনাপি বিদ্ধো বাণেন মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥ ৩৬ ॥
তঞ্চাহং তত্বতোঽন্বিষ্য ত্বরিতা সমুপাগতা।
সত্যমেব স কেনাপি তাড়িতো দানবাধমঃ ॥ ৩৭ ॥
ইয়ঞ্চ মূর্চ্ছামগমদ্যেন তৎ কারণং শৃণু।
ত্বয়ি প্রীতিমতী বালা দর্শনাদেব মানদ ॥ ৩৮ ॥
দেবপুত্ত্রোপমে চারুবাক্যাদিগুণশালিনি।
ভার্য্যাচান্যস্যবিহিতা যেন বিদ্ধঃ স দানবঃ ॥ ৩৯ ॥
এতস্মাৎ কারণান্মোহং মহান্তমিয়মাগতা।
যাবজ্জীবঞ্চ তন্বঙ্গী দুঃখমেবোপভোক্ষ্যতি ॥ ৪০ ॥
তদ্যস্যা হৃদয়ং রাগি ভর্ত্তা চান্যো ভবিষ্যতি।
যাবজ্জীবমতো দুঃখং স্বরভ্যা নান্যথা বচঃ ॥ ৪১ ॥

মনে মানি, শুনেছেন, মম পতি-নাম
বীরেন্দ্র পুষ্করমালী সর্ব্বগুণধাম।
পতির সুগতি-তরে আমি নিরন্তর
দিব্যগতি বলে, তীর্থ-ভ্রমণ-তৎপর। ৩৪-৩৫।
সে দুষ্ট পাতালকেতু বরাহের বেশে,
গিয়েছিল আজি কোনো আশ্রম-প্রদেশে।
মুনিগণ রক্ষাতরে কোনো মহাজন
বিদ্ধিলেন তীক্ষ্ণ বাণে তাহারে এখন। ৩৬।
দেখিলাম, চক্ষে আমি, সে দানবাধম,
বাণবিদ্ধ, আছে পড়ি' নগরাজ সম।
দেখে তাই তাড়াতাড়ি আইলাম হেথা
শুনাইতে সখিরে সে আনন্দের কথা। ৩৭।
এবে বলি, এঁর এই মূর্চ্ছার কারণ,
মন দিয়ে, হে মানদ, করহ শ্রবণ—

হেরি' তব বরবপু ক্ষণেকের তরে
প্রীতিমতী তব প্রতি হইলা অন্তরে; ৩৮।
দেবপুত্র জিনি তব দেহের গঠন
মনোহর বাক্যে তব হরিয়াছে মন,
নানা গুণে গুণবান তুমি মহাশয়
বুঝিয়া প্রাণেতে হৈল প্রীতির উদয়।
কিন্তু যেই বাণে বিদ্ধ করিয়া দানবে
করেছে তাড়িত আজি সম্মুখ আহবে
বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পতি, সে জন ইহাঁর,
অন্য জনে মাল্য দিতে সাধ্য নাহি আর, ৩৯।
এই কথা মনে হ'য়ে কাঁপিল হৃদয়,
দেখিলেন ধরাধাম অন্ধকারময়।
মূর্চ্ছা আসি হরিল চেতনা ইহাঁর
ভাবি' পরে কত দুঃখ হইবে অপার। ৪০।

অহং ত্বস্যাঃ প্রভো প্রীত্যা দুঃখিতাত্র সমাগতা।
যতো বিশেষো নৈবাস্তি স্বসখীনিজদেহয়োঃ ॥ ৪২ ॥
যদ্যেষাভিমতং বীরং পতিমাপ্নোতি শোভনা।
ততস্তপস্ত্বহং কুর্য্যাং নির্ব্যলীকেন চেতসা ॥ ৪৩ ॥
ত্বন্তু কো বা কিমর্থং বা সংপ্রাপ্তোঽত্র মহামতে।
দেবো দৈত্যো নু গন্ধর্ব্বঃ পন্নগঃ কিন্নরোঽপি বা ॥ ৪৪ ॥
ন হ্যত্র মানুষগতির্ন চেদৃঙ্মানুষং বপুঃ।
তত্ত্বমাখ্যাহি কথিতং যথৈবাবিতথং ময়া ॥ ৪৫ ॥

কুবলয়াশ্ব উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি ধর্ম্মজ্ঞে কস্ত্বং কিং বা সমাগতঃ।
তচ্ছৃণুষ্বামলপ্রজ্ঞে কথয়াম্যাদিতস্তব ॥ ৪৬ ॥

প্রাণ মন তব প্রতি করিয়া অর্পণ
অন্য জনে যদি হয় করিতে বরণ।
তবে কত কষ্ট প্রাণে হইবে সহিতে
ভাবিয়া দেখহ বীর, এই অবনীতে।
দুঃখেতে কাটিয়ে যা'বে সমস্ত জীবন,
মনঃকষ্ট মনে মনে রাখিয়া গোপন।
সুরভির বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হ'বে
পররতা হ'লে ভাগ্যে কি হইবে তবে?
এই সব স্মরি' এই সখী যে আমার,
মুর্চ্ছিতা হইলা এই কহিলাম সার। ৪১।
স্নেহবশে আছি আমি নিকটে ইহাঁর
যদি পারি তিলেক, ঘুচা'তে দুঃখভার।
সখি-দেহে নিজ-দেহে ভেদাভেদ নাই
আছি তাই আমি, আসি', নিকটে সদাই। ৪২।
এ শোভনা যদি কভু বীর-পতি পায়
তবেই আমার এই কষ্ট দূরে যায়।
মনোমত পতি সঙ্গে গেলে পতিবাসে,
আমি হবো তপে রত পুণ্যলাভ আশে। ৪৩।
বল ওহে মহামতি, তুমি কোন জন?
কি কারণে হৈল তব হেথা আগমন?
দেব, দৈত্য, কিম্বা তুমি গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কিম্বা সে পন্নগ? কভু না হইবে নর। ৪৪।
মানুষে না পারে কভু আসিতে হেথায়,
মানুষে কি কভু হেন দিব্য-দেহ পায়?
বলিনু যেমন আমি সব বিবরণ,
অবিকল বল সব আমারে এখন। ৪৫।
বলিলেন ঋতধ্বজ, "করহ শ্রবণ,
হে ধর্ম্মজ্ঞে বলি আমি নিজ বিবরণ।
জিজ্ঞাসিলে মোরে দেবি, আমি কোন জন?
কি কারণে হৈল মম হেথা আগমন?
যথার্থ উত্তর আমি তোমার গোচর,
বলিতেছি, স্থির চিত্তে শুন অতঃপর। ৪৬।

রাজ্ঞঃ শত্রুজিতঃ পুত্রঃ পিত্রা সম্প্রেষিতঃ শুভে।
মুনিরক্ষণমুদ্দিশ্য গালবাশ্রমমাগতঃ॥ ৪৭॥
কুর্ব্বতো মম রক্ষাঞ্চ মুনীনাং ধর্ম্মচারিণাম্।
বিঘ্নার্থমাগতঃ কোঽপি শৌকরং রূপমাস্থিতঃ॥ ৪৮॥
ময়া স বিদ্ধো বাণেন চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসা।
অপক্রান্তোঽতিবেগেন তমস্ম্যনুগতো হয়ী॥ ৪৯॥
পপাত সহসা গর্ত্তে স ক্রোড়োঽশ্বশ্চ মামকঃ॥ ৫০॥
সোঽহমশ্বং সমারূঢ়স্তমস্যেকঃ পরিভ্রমন্।
প্রকাশমাসাদিতবান্ দৃষ্টা চ ভবতী ময়া।
পৃষ্ঠয়া চ ন মে কিঞ্চিদুক্তবত্যা দত্তমুত্তমম্॥ ৫১॥
ত্বাঞ্চৈবানুপ্রবিষ্টোঽহমিমং প্রাসাদমুত্তমম্।
ইত্যেতৎ কথিতং সত্যং ন দেবোঽহং ন দানবঃ।
ন পন্নগো ন গন্ধর্ব্বঃ কিন্নরো বা শুচিস্মিতে॥ ৫২॥
সমস্তাঃ পূজ্যপক্ষা বৈ দেবাদ্যা মম কুণ্ডলে।
মনুষ্যোঽস্মি বিশঙ্কা তে ন কর্ত্তব্যাত্র কর্হিচিৎ॥ ৫৩॥

আমি, দেবি, শত্রুজিৎ রাজার নন্দন,
মানব কুলেতে মোর হইল জনন।
মুনিগণ রক্ষা তরে পিতার আদেশে
ছিলাম গালবাশ্রমে সাজি' বীরবেশে। ৪৭।
করিতাম তপোবনে সবার রক্ষণ,
এক দিন ঘটে তথা অদ্ভুত ঘটন।
শূকরের দেহ ধরি' কোনো দুরাচার
বিঘ্ন করিবারে আসে আশ্রম-মাঝার। ৪৮।
আমি বিদ্ধিলাম তা'রে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে
পলাইল সে শূকর ব্যথা পে'য়ে প্রাণে।
দ্রুতগতি অশ্বে মম করি আরোহণ,
আমি তা'র পিছে পিছে কৈনু আগমন। ৪৯।
গর্ত্তমাঝে করিল প্রবেশ, সে শূকর
অশ্ব মোর তা'র পিছে ধায় দ্রুততর।
অন্ধকার গর্ত্তে অশ্ব পশিয়া তখন
মোরে পৃষ্ঠে ল'য়ে বহু করিল ভ্রমণ। ৫০।
অবশেষে দেখিলাম আলোক-প্রকাশ।
দেখি' তোমা, দ্রুত আসিলাম তব পাশ।
জিজ্ঞাসা করিনু কত, না দিলে উত্তর,
চলে এলে এই দিকে হ'য়ে ত্বরা পর। ৫১।
তব পিছে পিছে আমি করি' আগমন
এই ত প্রাসাদোপরে আইনু এখন।
এই ত প্রশ্নের তব দিনু সদুত্তর,
দেব, দৈত্য, নহি, নহি পন্নগ, কিন্নর,
গন্ধর্ব্বের কুলে নহে জনম আমার,
নর আমি, "শুচিস্মিতে, শুন তত্ত্ব সার। ৫২।
দেব আদি সকলেই পূজ্য সে আমার
নর আমি, মোরে শঙ্কা নাহি কিছু আর।" ৫৩।

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ প্রহৃষ্টা সা কন্যা সখীবদনমুত্তমম্।
লজ্জাজড়ং বীক্ষমাণা কিঞ্চিন্নোবাচ ভামিনী ॥ ৫৪ ॥
সা সখী পুনরপ্যেনাং প্রহৃষ্টা প্রত্যুবাচ হ।
যথাবৎ কথিতং তেন সুরভ্যা বচনানুগে ॥ ৫৫ ॥

কুণ্ডলোবাচ।

বীর সত্যমসন্দিগ্ধং ভবতাভিহিতং বচঃ।
নান্যত্র হৃদয়ন্ত্বস্যা দৃষ্ট্বা স্থৈর্য্যং প্রচাস্যতি ॥ ৫৫ ॥
চন্দ্রমেবাধিকা কান্তিঃ সমুপৈতি রবিং প্রভা।
ভূতির্ধন্যং ধৃতির্ধীরং ক্ষান্তিরভ্যেতি চোত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥
ত্বয়ৈব বিদ্ধোঽসন্দিগ্ধং স পাপো দানবাধমঃ।
সুরভিঃ সা গবাং মাতা কথং মিথ্যা বদিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

নাগপুত্রগণ বলিলা তখন—
"শুন, পিতা, অতঃপর,
শুনি এ বচন, আনন্দে মগন
হইল, দুঁহু অন্তর।
লজ্জায় জড়িতা, যেন তড়িল্লতা
সেই কন্যা মদালসা,
সখি-মুখে চায় বাক্য না জুয়ায়
হৃদে রুদ্ধ রহে ভাষা। ৫৪।
সখী হর্ষভরে, তাঁ'র প্রীতি তরে
বলিলেন হাসি' হাসি'—
"দেখ আর কিবা? এলো সুখ-'দিবা
দুঃখ-অন্ধকার নাশি'।
সুরভি-বচন ফলিল এখন
সন্দেহ নাহিক আর,
এত দিন পরে পতি পেলে ঘরে
ঘুচে গেল দুঃখভার।" ৫৫।

রাজপুত্র প্রতি, কহে পরে সতী
কুণ্ডলা গন্ধর্ব্ব-বালা,
"সত্য তব ভাষ সন্দেহের নাশ
হইল, ঘুচিল জ্বালা।
তব দরশনে এ বালার মনে
হ'য়েছে প্রীতি উদয়,
এত ভালবাসা, শুধু তব আশা,
হেন কভু নাহি হয়। ৫৬।
কান্তি শোভে চাঁদে প্রভা রবি বাঁধে
ভূতি লভে ধন্য-জনে,
ধৃতি ধীর সনে ক্ষান্তি শ্রেষ্ঠ জনে
বরে, জানি স্থির মনে। ৫৭।
বিঁধিলে দানবে সম্মুখ-আহবে
সন্দেহ নাহিক তায়,
সুরভির কথা মিলিল সর্ব্বথা,
কহিনু আমি তোমায়।

তদ্ধন্যেয়ং সভাগ্যা চ ত্বৎসম্বন্ধং সমেত্য বৈ।
কুরুষ্ব বীর যৎ কার্য্যং বিধিনৈব সমাহিতম্ ॥ ৫৯ ॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

পরবানহমিত্যাহ রাজপুত্রঃ স তাং পিতুঃ।
তামুদ্বহে কথং বালাং তন্নিযোগাদৃতে ত্বিমাম্ ॥ ৬০ ॥
মা মা বদেদৃক্ সেত্যাহ দেবকন্যেয় মুদ্বহ।
তথেত্যুক্তেন তেনৈব সঙ্গন্যোদ্বাহিকং তদা ॥ ৬১ ॥
সা চ তং চিন্তয়ামাস তুম্বুরুং তৎকুলে গুরুম্।
স চাপি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তঃ প্রগৃহীত সমিৎকুশঃ ॥ ৬২
মদালসায়াঃ সম্প্রীত্যা কুণ্ডলা-গৌরবেণ চ।
প্রজ্বাল্য পাবকং হুত্বা মন্ত্রবিৎ কৃতমঙ্গলাম্ ॥ ৬৩ ॥
বৈবাহিকবিধিং কন্যাং প্রতিপাদ্য যথাগতম্।
জগাম তপসে ধীমান্ স্বমাশ্রমপদং তদা ॥ ৬৪ ॥

গো-গণ-জননী সর্ব্বপূজ্যা যিনি
বাক্য মিথ্যা নহে তাঁ'র
তব দরশনে প্রীতি বড় মনে
হইল এবে আমার। ৫৮।
ধন্য সখী মোর নাহি ভাগ্য-ওর
পেলে আজি হেন ধন,
বিধি যেবা হয় কর এ সময়
কর যেবা লয় মন।" ৫৯।
বলে নাগপুত্র দোঁহে—"করহ শ্রবণ,
কুণ্ডলার বাক্য শুনি' রাজার নন্দন,
বলিলেন—"শুন দেবি, বচন আমার
পিতার অধীন আমি, বিনা আজ্ঞা তাঁ'র
নাহি পারি বদ্ধ হ'তে বিবাহ-বন্ধনে,
অতএব ক্ষমা কর মোরে এই ক্ষণে।" ৬০।
কুণ্ডলা যে কথাগুলি বলিলা তখন
হে বীর না বল, কভু এমন বচন।
দেব কন্যা এই বালা, করিলে গ্রহণ
না হবে অমত, তব পিতার কখন।
অতএব পাণিগ্রহ করহ ইহার
গান্ধর্ব্ব বিবাহে দোষ নাহিক তোমার।
নির্ব্বন্ধ হেরিয়া সেই রাজার নন্দন
"তথাস্তু" বলিয়া কৈলা স্বীকার তখন। ৬১।
রাজ পুত্র ব্যক্যে অতি হর্ষযুতা মন
কুলগুরু তুম্বুরুকে করিলা স্মরণ।
চিন্তামাত্র তুম্বুরু আসিলা সেই স্থান
সমিৎ-কুশা ল'য়ে করিবারে কন্যা দান। ৬২।
কুণ্ডলার পাতিব্রত্য-গৌরব স্মরণ
মদালসা-প্রীতি চক্ষে করিয়া দর্শন।
জ্বালিলেন যজ্ঞানল ঘৃতাহুতি দিয়া
মিলাইলা ঋতধ্বজে, মদালসা ল'য়ে। ৬৩।
মাঙ্গল্য সকল সুখে করি' সমাপন
আপন আশ্রমে পুনঃ করিলা গমন। ৬৪।

ভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ।

India Press, Calcutta.

পুত্রের প্রতি উপদেশ

(১৭৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

একত্র খাইতে বসিয়া একত্র ভোজন শেষ করিবে। ভোজনে হয়ত একজনের কিছু বেশি বিলম্ব হয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া উঠা উচিত নয়। যদি তোমার বিশেষ তাড়াতাড়ি থাকে পৃথক স্থানে আহার করিতে বসিবে। কিন্তু ভাইভগিনীরা সকলে একত্র ভোজনে বসা বড় ভাল। যতটা পার তাহা করিবার চেষ্টা করিবে। খাইতে বসিয়া কোন জিনিস ভাল লাগিল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা পেটুকের লক্ষণ, কিছু অথবা কোন জিনিস খারাপ হইয়াছে বলিয়া বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করাও পেটুকের অপর লক্ষণ। কোন ব্যঞ্জন ভাল পাক হইয়াছে কি কোন আহার্য্য তোমার খুব ভাল লাগিয়াছে বলিয়া আর তাহা চাহিবে না বা এমত ভাব প্রকাশ করিবে না যে সেই বস্তু আর একটু পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও। আহারে সংযম শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সংসারে অনেক বিষয়ে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। তন্মধ্যে আহারে সংযম শিক্ষা প্রধান। আহারের পরিমাণও ঠিক রাখিবে। কোন দিন কম, কোন দিন বেশি খাইবে না। একত্র খাইতে বসিয়া কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া কখন বেশি খাইবে না, অথবা অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে লজ্জা করিয়া কম খাইবে না। আহারের পরিমাণ খুব বেশি হইলেই যে লোক দীর্ঘজীবী হয় তাহা কখন মনে করিবে না। পরিমাণ অভ্যাস সাপেক্ষ। ইহার কোন বিশেষ নিয়ম বা বিধি নাই। একজনের যাহা প্রচুর অপরের হয় ত তাহা কিছুই নয়। সুতরাং তাহার একটা বাঁধা-বাঁধি নিয়ম কিছুই করা যাইতে পারে না। আহার করা একটা ভোগ বা আমোদের বিষয় কখন মনে করিবে না। ইহা জীবন রক্ষার জন্য একটা কর্ত্তব্যপালন মাত্র এই ধারণায় কার্য্য করিবে। তাহা হইলে বুঝিবে যে ইহাতে মনের সুখ বা ইহার অভাবে মনের দুঃখ কিছুই নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আহার সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। তোমাকে সমাজ মধ্যে বাস করিতে হইতেছে। অনেক সময় অপরের গৃহে আহার করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু সেখানে তোমার একটু নিয়ম শিথিল করিতে হইবে। নিতান্ত যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ তাহা ছাড়া অপর কোন জিনিস ত্যাগ করিবে না। ভাল না লাগে খাইবে না, কিন্তু তাহাতে তোমার আপত্তি আছে এ কথা ভ্রম ক্রমেও জানিতে দিবে না। গৃহস্বামী যাহা কিছু আয়োজন করিয়া দিবেন তাহাই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবে। দুষ্পাচ্যাহার অল্প মাত্রায় আহার করিবে, কিন্তু একেবারে ত্যাগ করিবে না। সমাজে বাস করিতে অনেক অনভ্যস্ত ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। ইহা তাহার মধ্যে একটা। কোন জিনিস খাও না বা খাইতে পার বলিয়া কখন বাহাদুরি করিও না। এটা নিতান্ত বালকত্ব। একটা

গল্প বলি। একজন অত্যন্ত গরম আহার করিতে পারেন বলিয়া একস্থানে বাহাদুরি করিতেছিলেন, সেই খানে কোন কার্য্যোপলক্ষে লোক জন খাওয়ান হইবে, কচুরি ভাজা হইতেছিল। একজন উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি যে বড় বাহাদুরি করিতেছ, ঐ যে কচুরি ভাজা হইতেছে খোলা হইতে তোলা মাত্র খাইতে পার? তাহাতে সে ব্যক্তি পাগলের মত রাজি হইল, এবং অগ্রসর হইয়া খোলা হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তোলিত একখণ্ড কচুরি লইয়া যেমন কামড় মারিল, অমনি কচুরি মধ্যস্থ উত্তপ্ত ঘৃত তাহার মুখবিবর দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ফলে তিনি বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া প্রায় সপ্তাহকাল কষ্ট পাইয়া অনেক কষ্টে ও চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেন। এরূপ পাগলামির গল্প অনেক আছে। এরূপ বাহাদুরী যাহারা করে, তাহারা নিতান্ত পাগল। অপর কথা যাহা বলিলাম, কোন জিনিস খাও না বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবে না। অনেক লোক মৎস্য মাংস খান এবং অনেকে খান না। খান না বলিয়া তাঁহাদের বাহাদুরী কিছুই নাই। গবাদি পশুরাও মৎস্য মাংস খায় না। তাহাতে বাহাদুরি কি? ত্যাগে বাহাদুরি করা উচিত নয়। তাহাতে এক দিকে যেমন বস্তুগত ত্যাগ করিলে তেমনি অপর দিকে মানসিক দৌর্ব্বল্যও দেখাইয়া নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিলে। এরূপ বিপরীত ব্যবহার সদাচার বহির্ভূত। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অপর এক কথা বলিয়াছি অস্বাস্থ্যকর জিনিস খাইবে না। কোন্‌টি স্বাস্থ্যকর আর কোন্‌টি নহে, ইহা আমাদের পক্ষে জানা কঠিন নহে। যাহারা শাস্ত্রশাসন মানে, লোকাচার-দেশাচার মানে, তাহাদের পক্ষে খদ্যাখাদ্য বিচার করা সহজ কথা। আমাদের দেশীয় লোকে সাধারণতঃ যাহা অস্বাস্থ্যকর বলেন, যাহা তোমার অভ্যাসানুসারে গ্রহণ করিতে কষ্ট হয় তাহা না খাওয়াই ভাল। এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা একজনের কাছে সুখাদ্য অপরের পক্ষে তাহা ত্যজ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি জিনিসের উল্লেখ করিতেছি। ইংরাজেরা অয়েষ্টার বলিয়া এক প্রকার শম্বুক পনীর প্রভৃতি কয়েকটি জিনিস বড় সুখসেব্য বলিয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু অনভ্যস্ত লোকের নিকট এই সকল বস্তুর গন্ধ অতি পূতিগন্ধময় বলিয়া মনে হয়। পরের কথা কেন আমাদের দেশেরই উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের অনেক ভদ্রপরিবার মধ্যে শুষ্ক মৎস্যের খুব ব্যবহার আছে, কিন্তু উহা আমাদের কাছে কিরূপ দুর্গন্ধময় বোধ হয়? আমাদেরই ভিতর হিঙ্গের গন্ধ পুতিনা শাকের গন্ধ কেহ কেহ সুগন্ধ মনে করেন আবার কেহ কেহ সে গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং গন্ধ দ্বারা কোন্ বস্তু স্বাস্থ্যকর আর কোন্ বস্তু অস্বাস্থ্যকর তাহা বুঝা কঠিন। পর্য্যুসিত বস্তু মাত্রেই পরিত্যজ্য। বাশিপক্ক অন্ন, ব্যঞ্জন আহার করিবে না। তাহা যে একেবারে সকল সময়ে অস্বাস্থ্যকর তাহা বলি না। পাখালভোগ খাইয়া উড়িষ্যার কত শত লোক বাঁচিয়া আছে। আর জিনিস পচিলেই যদি অস্বাস্থ্যকর হইত তাহা হইলে পচামৎস্যপ্রিয় চীন ও ব্রহ্মবাসীগণকে আর কেহ দেখিতে পাইতেন না। সুতরাং বিচার করিয়া স্বাস্থ্যকর কি? আর অস্বাস্থ্যকর

কি ? ঠিক করা কঠিন। আবার এমন অনেক বস্তু আছে, যাহারা স্বতন্ত্রভাবে বড় ভাল জিনিস, উপাদেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে কিন্তু সংযোগে বিষময় ফল প্রসব করে। এই সকল বিষযোগ কিসে কিসে হয় জানা আবশ্যক। ইহা কবিরাজী সুশ্রুতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয় আমাদের দেশীয় ভাবে চালিত পরিবার মধ্যে অনেকেই অনেকটা অবগত আছেন। "মধুসর্পী" একটা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় সকলেই জানেন। দুই-টিই অমৃতবৎ উত্তম পদার্থ অথচ উভয়ের যোগে দারুণ বিষ উৎপন্ন হয়। দুগ্ধের সহিত লবণ সংযোগ, কুলের সহিত মিষ্ট, তাম্রপাত্রে দুগ্ধ, কাংসপাত্রে নারিকেল জল, ইত্যাদি অনেক অনিষ্টকর যোগের কথা অনেক স্ত্রীলোকেও জানেন। এ সকল নিষেধ বাক্য যাহার নিকট শুনিবে অগ্রাহ্য করিবে না। অবিশ্বাস করিয়া ব্যবহার পূর্ব্বক তাহার বিষময় ফল ভোগ করার আশঙ্কা অপেক্ষা বিশ্বাস করিয়া ব্যবহার না করিয়া নিভাবনায় থাকা ভাল নয় কি ? এখন সর্ব্বদাই খাদ্য-বিষ নামক (Ptomain) এক প্রকার ভয়ানক বিষের কথা শুনা যায়। খাদ্যের সহিত এই বিষ উদরস্থ করিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল জিনিসের যোগের ফল অবগত নাই, তাহার যোগসাধন করিয়া অনেক সময় এইরূপ ফল ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম পরিচিত বিষযোগ ত্যাগ করিবে এবং অপরিচিত যোগও পরিত্যাগ করিবে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, শাস্ত্রশাসন, লোকাচার ও দেশাচার মানিয়া চলিলেই সুখে থাকিবে। আহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, এইখানে তাহা বলা ভাল। যেখানে সেখানে খাইবে না। অনেকে মনে করেন একত্র ভোজন না করিলে বন্ধুত্ব গাঢ় হয় না। ভালবাসাটা ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। ইহা বড় ভুল কথা। আমার অনেকগুলি খ্রীষ্টিয়ান ও মুশল-মান বন্ধু আছেন। তাঁহাদের সহিত আমার বন্ধুত্ব যেরূপ বহুদিন ব্যাপী ও হৃদয়স্পর্শী, বোধ হয় এরূপ স্বধর্ম্মীর ভিতরও বড় কম। তাঁহারাও জানেন আমিও জানি যে একত্র ভোজন ক্রিয়া হইবার নহে, উহা একটা অসাধ্যবস্তুর মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং তাঁহারাও তজ্জন্য দুঃখিত নন, আমিও কখন কষ্ট বোধ করি না। ভিন্ন ধর্ম্মীর সহিত যেমন একত্র আহার নিষিদ্ধ, ভিন্ন জাতীয় ও ভ্রষ্টা-চার লোকের সহিত আহারও তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এ সকল নিষেধ মানিতে হইবে। যদিই কোন ক্ষেত্রে তাহাতে বন্ধুত্বের হানি হয়, ধর্ম্মহানি অপেক্ষা সে বন্ধুত্ব হানি কিছু বেশি নয়, তাহা অকাতরে ত্যাগ করিবে। আমা-দের একটা প্রবাদ বাক্য আছে দুর্জ্জনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশত্যাগ করিবে এবং আত্মার যেখানে অনিষ্টাশঙ্কা আছে সে অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করিবে। আমাদের খাদ্যাখাদ্যের উপর ধর্ম্মনির্ভর করে এবং ধর্ম্ম, আত্মার উন্নতিমূলক। আমাদের ধর্ম্মের এই সকল মূল সূত্র বেশ মনে রাখিবে। আমাদের কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ যে আমরা যাহা আহার করি, উহা আমাদের দৈহিক ভক্ষণ কার্য্য নহে, উহা আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মার তর্পণ সাধন মাত্র। ইহা পরমজ্ঞানের কথা ; বয়স বৃদ্ধি সহকারে

সন্ধিস্ফূর্ত্তি হইলে এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে। আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল, এখন এই পর্য্যন্তই ভাল।

আচমন। আহারের পর উত্তমরূপে পরিষ্কৃত জলে আচমন করিবে। আচমন অর্থে কেবল হস্ত ও মুখ প্রক্ষালণ নহে। মুখ ত ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতেই হইবে, তৎসঙ্গে দুই হস্ত এবং পদদ্বয় ও ধৌত করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন বোধ করিলে দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ খড়িকা ব্যবহার করিবে। সেটা দরকার মত। হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালণান্তর শুষ্ক বস্ত্রে মুছিয়া ফেলিবে। পরিধেয় বস্ত্রে হাত মুখ মুছা ভাল নয়। বস্ত্রান্তরে তাহা করা কর্ত্তব্য।

মুখশুদ্ধি। আহারান্তর এ দেশে মুখশুদ্ধি গ্রহণের রীতি আছে। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র আছে কি না জানি না। কিন্তু এ রীতি আমাদের প্রদেশে বহুদিবসাবধি প্রচলিত আছে। তাম্বুল এমন কি দেবতা ও পিতৃলোককে পর্য্যন্ত দিবার ব্যবস্থা আছে। তাম্বুল ব্যবহারের অনেক উপকারিতা আছে বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহারা তাম্বুলের উপকারিতা বুঝিয়া ব্যবহার করেন, কি বিলাসের উপাদান বলিয়া ব্যবহার করেন তাহা তাঁহারাই জানেন। মুখশুদ্ধির অর্থ বুঝি না। ভাল করিয়া আচমন করিলে যে মুখ শুদ্ধ হয় না তাহা আমি বুঝি না। জলে প্রক্ষালণ করিলে সকল জিনিসই শুদ্ধ হয়। হস্ত পদাদি উচ্ছিষ্ট সংযুক্ত হইলে কেবল জল দ্বারা প্রক্ষালণ করিয়া শুদ্ধ করা হয়। বস্ত্রাদি অশুচি হইলে জলে প্রক্ষালণই বিধি। জলের ন্যায় সহজ শোধনদ্রব্য থাকিতে আবার অপর শোধনোপায়ের প্রয়োজন কি? তবে যদি নিতান্তই তাহাতে মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে আমার এক পূজনীয় আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তুসরণ করিতে পার। তিনি উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালণের পর, মন্ত্রোচ্চারণ ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া মুখ শোধন করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ লোকের ইহা বড় প্রশস্ত উপায়। মন্ত্রস্নান আছে আর মুখশুদ্ধি মন্ত্রে হয় না কি? তোমার ইষ্টমন্ত্র হয় নাই, তবে গায়ত্রী দীক্ষা হইয়াছে, নিতান্ত মুখশুদ্ধির আবশ্যক বোধ করিলে, এতদুদ্দেশে একবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এত গেল মানসিক তৃপ্তির কথা। কিন্তু মুখশুদ্ধির ভাণ করিয়া নানা প্রকার সুগন্ধ মশলা বিশিষ্ট খদির চুর্ণক সম্বলিত পর্ণপত্র চর্ব্বণে সুখোপলব্ধিই অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা তাম্বুল ব্যবহার করেন তাঁহারা মানুন বা না মানুন ইহা যে বিলাসিতার উপকরণ তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। বিলাস বিদ্যার্থীর জন্য নহে, ধর্ম্মার্থীর জন্যও নহে, জ্ঞানার্থীরও জন্য নহে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া পান আহারাদি তদনুরূপ ও তৎসাহায্যকারী করা চাই। বিলাসিতা, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধী জিনিস। যিনি বিলাসিতায় মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার বিদ্যা স্থলে অবিদ্যা আসিয়া পড়ে, ধর্ম্ম লাভ হয় না আর বিদ্যা লাভ ও ধর্ম্মসাধন না হইলে জ্ঞান কোথা হইতে হইবে? তাম্বুল চর্ব্বণ কিছু বড় একটা ব্যয়সাধ্য নহে, সেই জন্যই ইহাতে আমার বেশি আশঙ্কা। যে সকল জিনিস ব্যক্তিবিশেষের আপত্তিজনক অথচ অনায়াস না হউক

স্বল্পায়াসলভ্য সেই সকল জিনিসকে আমি বড় ভয় পাই। তরলমতি যুবকের নিকট তাহারা কেমন আস্তে আস্তে প্রবেশ করে। অপ-কারিতা সহসা উপলব্ধি হয় না, ইহা আরও ভয়ের কথা। উৎকট দ্রব্য ব্যবহারের কুফল তৎক্ষণাৎ জানিতে পারা যায়, সুতরাং সকলেই তাহাকে ভয় করে, কিন্তু যাহাদের অপকারিতা অল্পে অল্পে জন্মায় তজ্জন্য কেহ আশঙ্কিত নহে। সেই গুলিই সুতরাং বড় ভয়ানক। ইহারা মিষ্টভাষী শত্রু। বুদ্ধিমান লোকে ইহাদিগকে প্রবল প্রকট শত্রু অপেক্ষা অধিক ভয় করেন। তাম্বুল যদি এত অপ কারী জিনিস এবং ত্যাজ্য তবে দেবতাদের ও পিতৃলোককে দেওয়া হয় কেন? এটা বড় শক্ত কথা। আমরা দেবলোককে, পিতৃ-লোককে এমন অনেক জিনিস দিয়া থাকি যাহা আমরা নিজে ব্যবহার করিতে অসমর্থ। উপরে যে কথা বলিয়াছি তাহা যদি স্মরণ রাখ এবং বুঝিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে উপস্থিত কথার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন হইবে না। তোমার এখন চাই কি? সকলই চাই, চাই বিদ্যা—ধর্ম্ম—জ্ঞান। তুমি তাহার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছ, কত দিন করিবে তাহার স্থিরতা নাই। তুমি যদি কর্ম্মফলে, চেষ্টার গুণে, সাধনার সাহায্যে বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে তাম্বুল কেন, যাহা কিছু বিলাসিতার উপকরণ সমস্তই অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবে। তখন বিলাসিতা তোমার অন্তরায় হইবে না, তাহাতে স্পৃহাও থাকিবে না। এমন প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসী দুই একজন দেখিয়াছি, যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান বলে তাঁহাদের কাছে এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য মাত্র নাই। সকলই তাঁহারা ব্রহ্মময় দেখেন। তখন তাঁহারা যাহা কিছু পান বা ভোজন করেন তাহাতেও সেই ব্রহ্মদর্শন করেন, আপনাকেও ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, এবং পান বা ভোজন করা কেবল ব্রহ্মার্পণ মাত্র বোধ করেন। তাঁহারা নিজে কোন জিনিসের গুণ দোষের উপকারিতা উপলব্ধি করেন না। আমরা এমন অনেক গল্প শুনিয়াছি, এইরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে নাকি কোন লোক অনেক উৎকট সুরাপান করাইয়া দেখিয়াছেন। যে সুরার অল্প পরিমাণ পান মাত্রে মানুষ উন্মত্ত হইয়া উঠে ও অল্পকাল পরে মৃতপ্রায় হয়, তাহাই নাকি প্রচুর পরিমাণে পান করান সত্ত্বেও তাঁহার কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিকবিকার লক্ষিত হয় নাই। এ কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তুমি পুরাণে পরমজ্ঞানী প্রহ্লাদের কথা পড়িয়াছ। তাঁহার পিতা অসুররাজ হিরণ্যকশিপু বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। প্রহ্লাদের অপরাধ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না, মানিতেন না। দুষ্টচিত্ত ভগবদ্দেষ্টা অসুররাজের তাহা অসহ্য, কাজেই নিজ পুত্র হইলে কি হয় প্রহ্লাদকে নিধনের জন্য তিনি কত উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে একটি উপায় করিয়াছিলেন বিষপ্রয়োগে। প্রহ্লাদ অম্লান বদনে ভগবানে তাহা অর্পণ করিয়া নিজ বদনে তাঁহাকে আহুতি দিলেন। কোথায় সে কালকূট? কিছুই করিতে

পারিল না। অপকার করিবে কার যাহার কাছে ভালমন্দের বিলক্ষণ পার্থক্য। আর যাহার কাছে সমস্তই সমান তাহার কাঁছে আর প্রভেদ কি? তবে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে দেবলোককে, পিতৃলোককে আমরা যে বিলাসিতার উপকরণ নিবেদন করি তাহা যদি মন্দ জিনিস তবে দিব কেন? না দেওয়াই ত ভাল? ইহার উত্তরে এক কথা স্মরণ রাখিবে, এই সকল দ্রব্য দেব ও পিতৃলোককে উৎসর্গ করা আমাদের ন্যায় সামাজিক লোকের জন্য ব্যবস্থা। পূর্ণজ্ঞানীর জন্য নহে, অপর কথা বয়োবৃদ্ধ পিতা যাহা যাহা করেন শিশুপুত্র তাহা করিতে সমর্থ নহে। অধিকারভেদে ভোগাদির তারতম্য অবশ্যই হইবে। আমরা মনে মনে বুঝি যে ভাল শয্যায় শয়ন করা বড় সুখপ্রদ, ভাল বস্ত্র পরিধান করা বড় প্রিয়, সুমিষ্ট পানাহার কত তৃপ্তিকর। কিন্তু নিজে আমরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা করি না। সে উদ্দেশ্য বিদ্যা ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ। পাছে তাহাতে অন্তরায় হয় সেই জন্য আমরা বিলাসিতা চাই না। যাহারা তাহা চায় না তাহারা বিলাসিতায় মজিয়া থাকে। তাহার ফলে হয়ত তাহারা কখনও বিদ্যা-ধর্ম্ম-জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। এমনও হইতে পারে তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া বিলাসভোগ করিতেছেন, তখন ভোগ, অভোগ, সুখ, দুঃখ তাঁহাদের কাছে সকলই সমান, সুতরাং তাঁহাদের তাহাতে ক্ষতি নাই। এইরূপ নানারূপ যুক্তিদ্বারা উক্ত প্রথার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। মোট কথা যতদিন তুমি বিদ্যাভ্যাস শেষ না কর, এবং ধর্ম্মচর্য্যা করিয়া জ্ঞান লাভ না কর, ততদিন তাম্বুল সেবন কেন, কোনরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় দিবে না।

অনেক স্থলে মুখশুদ্ধির জন্য যাঁহারা তাম্বুল ব্যবহারে অনিচ্ছুক, তাঁহারা তাহার অনুকল্প স্বরূপ সুপারি কি অন্য প্রকার মশলা, বা কেহ হরিতকী ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদি মুখশুদ্ধির প্রয়োজনই না থাকে তাহা হইলে কিছুই দরকার নাই। মুখশুদ্ধি বলিয়া এই সকল জিনিস ব্যবহার করিয়া মুখবিবরকে অপরিষ্কৃত কতকগুলা আবর্জ্জনাযুক্ত করা হয়। আমার মতে আহারান্তে ভাল করিয়া পরিষ্কৃত জলে মুখ প্রক্ষালণান্তে কোন প্রকার মুখশুদ্ধিরই আবশ্যক নাই। তবে যদি কোন চিকিৎসক আহারান্তে কোন প্রকার বস্তু ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন তাহা রোগের ঔষধ জ্ঞানে ব্যবহার করিবে। কিন্তু সাবধান, যেন কোন একটা জিনিস প্রত্যহ ব্যবহার করায় তাহাতে এমন অভ্যাস না হয় যে তাহা না পাইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা বা কষ্ট হয়।

পরিচ্ছদ। তাহার পর বিদ্যালয়ে যাইবার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিবার আছে। তুমি কখন শয্যাত্যাগ কর, অতি প্রত্যূষে কর কি বিলম্বে কর, সন্ধ্যা পূজাদি কর কি না, আহারাদি কি কর না কর, তাহার সহিত অপরের বড় একটা সম্পর্ক নাই। সমাজের যদিও দেখা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষভাবে তাহা দেখিয়া থাকেন, কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সমাজ প্রত্যক্ষ সমালোচক। সেই জন্য সেক্ষপিয়রের জ্ঞানী বৃদ্ধ পলোনিয়স্ ঠিকই

বলিয়াছেন 'পোষাকেই মানুষ বুঝা যায়। যখন সমাজ পোষাক দেখিয়াই তোমাকে' বুঝিবেন, তখন তৎসম্বন্ধে তোমার খুব বিবেচনা করিয়া চলা আবশ্যক। এখনও তুমি বিদ্যালয়ের ছাত্র, এখন পোষাক সম্বন্ধে বড় একটা কিছু কর্ত্তব্য নহে, তবে এখন হইতে যেরূপ অভ্যাস করিবে, এখন হইতে লোকে পোষাক দ্বারা তোমাকে যেরূপ ধারণা করিবে, চিরদিনই তোমাকে সেই ভাবে দেখিবে। সুতরাং এখন হইতে পোষাক সম্বন্ধে একটু সাবধান হওয়া দরকার। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এমন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যে লোকে কোন প্রকার সমালোচনা করিবার অবসর না পায়। বিশেষ ভাল মন্দ কিছুই বলিবার না থাকে। পোষাক সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল বলিয়া প্রশংসাটাও অপবাদ। যে পোষাক লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল, লোকে অন্ততঃ ভাল বলিয়াও সমালোচনা করিল তাহার আর সরলতা কোথায়, কখন কখন সরলতার ভাণ করিয়া অনেকে আত্মাভিমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেটা বড় ঘৃণার ও লজ্জার কথা। সাবধান যেন, সরলতা দেবমূর্ত্তির অন্তরালে অভিমানের পিচাশমূর্ত্তি অবস্থান না করে। যাহার যেমন অবস্থা, তাঁহার সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাঁহার যে কার্য্য করিতে হয় তদনুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করা আবশ্যক। সেখানে অপর পাঁচজনে যে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যাইতেছেন, তুমিও তাহাই করিবে। সমাজে পাঁচজনের একজন হওয়া চাই। লোকাতীত গুণ ও চরিত্র বড় প্রশংসনীয়, কিন্তু লোকাতীত সাজ সরঞ্জাম বড় ঘৃণিত জিনিস। মনে কর কোন সভায় বা কার্য্যস্থলে সকলকে কোন এক বিশেষ পরিধেয় ধারণ করিয়া যাইতে হইবে, যদি কেহ নিজের বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবে বা ধনাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ পদমর্য্যাদা দেখাইবার জন্য অপর সাধারণ লোকের ন্যায় পরিচ্ছদ গ্রহণ না করিয়াও সেখানে স্থান পান, সেটা সভাস্থ অপর সকলের নিকট তাঁহার আত্মাভিমান প্রকাশ করা নয় কি? তিনি যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন যে তোমরা সকলে যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পোষাক করিয়া আসিয়াছ আমি নিজগুণে বা গৌরবে তাহার বশবর্ত্তী নহি, আমি তোমাদের হইতে পৃথক, উচ্চতর লোক। এ ভাবটা মনে আসে না কি? সমাজকে সর্ব্বদা প্রভূত মান্য করিয়া চলিতে হইবে। সমাজকে তাচ্ছিল্য করা একটা সামাজিক মহাপাপ। পরিধেয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক কিন্তু তাহাতে কোনরূপ জাঁক জমক থাকিবে না এবং সাধারণ হইতে হীনও হইবে না। উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে অবশ্য বুঝিয়াছ যে পরিচ্ছদের হীনতাও স্থানবিশেষে পরিচ্ছদের না হউক মানুষের জাঁক জমক প্রকাশ করে। পাঁচ জনে যেমন পোষাক পরেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেমন ভালবাসেন বা বিদ্যালয়ের যদি কিছু নিয়ম থাকে, তোমার পোষাক ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। ছাত্রজীবনের অনেক আচার ব্যবহার সমস্ত ভবিষ্যত জীবনের উপর কার্য্যকরী হয়। পোষাক সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলা

চাই। যদি বল এখন লেখা পড়া করিবার সময়, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত চিন্তা করিবার অবকাশ কোথায়? তাহার উত্তর বিশেষ কিছু চিন্তা না করিলেই সাধারণ আচারের সহিত তোমার পার্থক্য থাকিবে না, সকলে যাহা করে অন্ততঃ অধিকাংশ লোক যাহা করে, তাহা করিলেই নিশ্চিন্তভাবে নিজের কার্য্য করিতে পার। চিন্তা করিলেই লোকে বিভ্রাট ঘটায়, এ বিষয়ে যত ভাবনা কম থাকিবে ততই সুবিধা। এক শ্রেণীর যুবক আছেন যাঁহারা যাহার যাহা কিছু সৌখিন দেখেন, যাহা কিছু জাঁক জমক, বা চাল চটক দেখেন তাহাই নিজে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের বোধ হয় সেই বিষয়েই সর্ব্বদা চিন্তা আছে যাহার যে বিষয়ে চিন্তা যেরূপ তাহার তাহাতে সিদ্ধিও তদ্রূপই হইয়া থাকে। পোষাকটা অনুকরণ সাপেক্ষ। কিন্তু কাহার অনুকরণ করিবে? সমাজের সাধারণ লোকের অনুকরণ করিবে। পাঁচ-জনের অনুকরণ করিবে। দশজনের ভিতর দুই একজন যাহা করে তাহা অনুকরণীয় নহে, তবে যখন দেখিবে দশ জনের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক লোক অর্থাৎ ছয় সাত জন লোক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা কিছু নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বা করিতে-ছেন তখন তুমি ও তাঁহাদের অনুগামী হইবে। কখন পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অগ্রগামী হইবে না। "মুখরস্তস্ত্রহনাতে" কথাটা পোষাকে যতদূর প্রয়োজ্য এত আর কোথাও নহে। পূর্ব্বে সাধারণতঃ আমাদের দেশে কামিজের এত ব্যবহার ছিল না। যাঁহারা কোট বা চাপ-কান পরিতেন তাঁহারাই কেবল তাহার নীচে কামিজ ব্যবহার করিতেন। তাহাও সকলে নহে। অপর সাধারণ লোকে ধুতি চাদরের সহিত কামিজ ব্যবহার না করিয়া হস্তে বোতাম বিহীন এক রকম জামা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গত ২০।২৫ বৎসরের ভিতর এই শেষোক্ত প্রকার জামা এক প্রকার বিরল প্রচার হইয়াছে। পোষাকের দোকানে সচরাচর এখন আর তাহা পাওয়া যায় না, কাজেই তাহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যখন সাধারণ লোকে ধুতি চাদরের সহিত কামিজ ব্যবহার করিতেছেন তখন সাবেক "পিরাণ" ব্যবহার করিলে অসামাজিক ব্যবহার বলিতে হইবে। একটা নূতন ব্যব-হারের দৃষ্টান্ত ভদ্রলোকের ভিতর রেসমের চাদর ব্যবহার। ১৮৮৪ সালে আমি একজন ভদ্রলোককে প্রথম সূতার ধুতি ও জামার সহিত গরদের চাদর ব্যবহার করিতে দেখি। দেখিয়া একটু নূতন বলিয়া মনে হইল বটে, কিন্তু বড় সুবিধাজনকও মনে হইল। ধনী লোকের পক্ষে না হউক, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সুবিধাজনক বটে। যেমন মূল্য একটু বেশি, তেমন একখানি গরদের চাদর পাঁচ খানি সূতার চাদরের কাজ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে ব্যয় বাহুল্য নয়, অথচ আর এক-দিকে খুব সুবিধা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, M.A., B.L.

প্রেমময়।

(শ্রীহীন-পাগল-লিখিত।)

(১৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাধন-কুঞ্জে।

আমরা দেখিলাম, জীব পুনঃপুনঃ কর্ম্মভোগের পর, জন্ম জন্মান্তরলব্ধ সুকৃতির সাহায্যে পুণ্যলাভ পূর্ব্বক এবার সংসারের মায়া কাটাইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রসাদে, সুকৃতি তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন। সে শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হইয়া, তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হইয়াছে—গুরুদত্ত বীজমন্ত্রে তাহার রুচি হইয়াছে—নিষ্কপটে—নিরপরাধে নাম করিতে করিতে তাহার অন্তরে নামের উদয় হইয়াছে। এখন তাহার আর অসার সংসারবাসনা নাই। সে মনকে সংযত করিয়া, স্বীয় অন্তররাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ম্মকে জ্ঞানে মিলিত করিয়া, নিজে সুকৃতি, নিবৃত্তি, রুচিযুক্ত বৈরাগ্য, এবং বিবেকের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পুণ্যে তাহার আর লালসা নাই, তাই সে পুণ্যকেও শ্রীগুরুদেবের পদে উৎসর্গ করিয়াছে। এখন সে কামনা-শূন্য হইয়া জ্ঞানের সঙ্গে নৈষ্কর্ম্ম্য পথে অগ্রসর।

তাহার অন্তর-রাজ্য এখন প্রশান্ত। তথায় অনন্ত আকাশে আর বিন্দুমাত্রও মেঘ নাই। সে আকাশ অনাহতধ্বনিতে পূর্ণ। সেই মধুর-গম্ভীর ধ্বনি নিরন্তর অপূর্ব্ব তরঙ্গ তুলিয়া দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইতেছে। কোনও দূরতর প্রদেশ হইতে অপূর্ব্ব আলোক-রাশি আসিয়া সে দেশ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সে নির্ম্মল সুনীল আকাশতলে সূর্য্য নাই—চন্দ্র নাই—একটি ক্ষুদ্রতম তারকাও নাই—কেবল সুনীল অম্বর, আর তাহার কোলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত। অদূরস্থিত বিজ্ঞানশৈলশিখরসমূহে অসংখ্য নির্ঝর। তাহা হইতে সুনির্ম্মল বারিধারা ঝরঝরধারে শৈলগাত্রে পতিত হইয়া ধীরে সেই শান্তিকাননের সুশ্যামল ভূমিতে পরস্পর মিলিত হইতেছে এবং ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া কাননের অপর পার্শ্বে অদৃশ্য হইতেছে। জীব সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া জ্ঞানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"দাদা, এ দেশ ত বড় সুন্দর। আকাশ নির্ম্মল অথচ এখানে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদির প্রকাশ নাই; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য না থাকিলেও ত আলোকের অভাব নাই—এমন নয়নতৃপ্তিকর আলোকরাশি আসচে কোথা থেকে?

জ্ঞান। "এ সেই প্রেমময়ের দেহদ্যুতি। জ্ঞানিগণ একেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলেন। পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশে যেমন অসংখ্য তারকারাজী নিষ্প্রভ হয়—আবার সূর্য্যের প্রকাশে সেই

নক্ষত্রগুলি ত অদৃশ্য হয়ই—চন্দ্রও নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়; তেমনি সেই অনন্তজ্যোতির্ম্ময় প্রেমের আধার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গকান্তি-প্রভায় আজ এ অন্তররাজ্যের অনন্ত আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, তারা সকলি ক্ষীণপ্রভ হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়েছে। অনন্ত প্রেমের প্রশান্ত প্রভা প্রভাবে আজ সে সকল অদৃশ্য হ'য়েছে।"

জীব। "আহা! কি সুন্দর কুঞ্জগৃহ. এ কুঞ্জ গৃহটির কি কোনও স্বতন্ত্র নাম আছে?—দেখ্‌লেই ইচ্ছা করে, এর মাঝে ব'সে এক মনে ভগবানের নাম জপ করি।"

জ্ঞান। "এস না একটু জপই করা যা'ক। তা'তে ত কিছু বাধা নাই। যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানে না হয় একটু পরেই যা'ব।—তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলে এ কুঞ্জের নাম আছে কি না? নাম আছে বই কি। এটির নাম সাধনকুঞ্জ। তোমার নিগৃহীত মন এখন এই কুঞ্জেই নিরন্তর আছে। চল দেক্তে পা'বে।"

জীব। "আপনি না বল্‌ছিলেন বাক্য আর মনকে কোথায় পাঠিয়েচেন?"

জ্ঞান। "অনন্তের উদ্দেশে বাক্য আর মনকে পাঠিয়েচি। কিন্তু তা'হ'লে, তা'র এখানে থাকবারও সামর্থ্য আছে। অন্তর রাজ্যের আমরা সব এক হ'য়েও অনেক। তুমি জীব, তুমিও ত তাই। তোমার আজিও এখনও স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি হয় নাই, তাই তুমি নিজ অহংতত্ত্বকে আত্মপদার্থ মনে ক'চ্চো। বস্তুতঃ তুমি ত তা নও। তুমি সেই প্রেমময়ের জীবশক্তি। আপাততঃ পুরুষাভিমান থাক্‌লেও বস্তুতঃ তুমি তাঁ'র পরা প্রকৃতি। তুমি নিত্য ধামে তাঁ'র বামে নিরন্তর বিদ্যমান থেকেও আজ এখানে মায়ার আবরণে আবৃত থেকে আত্মস্বরূপ ভুলে আছ। আর আমরা সবাই তোমার দাসী। আমি বুদ্ধি-স্বরূপিণী অপরার গণের এক জন। এ সব গূঢ় রহস্যানুভবের সময় এখনও তোমার হয় নাই। এখন কেবল সেই প্রাণকৃষ্ণে প্রাণমন সমর্পণ করা'র জন্য যত্নবতী হও।"

জীব। "বড় আশ্চর্য্য কথা! আমি নিশ্চয় জানি-আমি পুরুষ। জগতের সকলেই আমায় পুরুষ ব'লে সম্বোধন করে। এই মাত্র আপনিই আপনার ভগিনী নিবৃত্তিকে আমার পত্নী ব'লে নির্দ্দেশ ক'ল্লেন, আবার এখন ব'ল্‌ছেন আমি পুরুষ নই!"

জ্ঞান। "বিশ্বরঙ্গমঞ্চে সেই মায়াময়ের প্রীতির জন্য মায়া-নাটকের অভিনয় ক'ত্তে পুরুষ সেজেচ ভাই! এখন সেই পুরুষাংশ অভিনয় ক'চ্চো, তাই আমি তোমায় পুরুষ বল্‌চি। এ নাট্য-লীলার পরিসমাপ্তি হ'লে, অথবা তোমার অংশাভিনয় শেষ হ'লে, যখন এ সাজ খুলে নিজের সাজে সাজ্‌বে, তখন তোমার নিজের কথা মনে পড়্‌বে। তুমি পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে "তিনিই যদি সকলকে দেক্‌চেন-রক্ষা ক'চ্চেন, তবে এ সংসারে এত শোক দুঃখ কেন? শোক দুঃখের সৃষ্টি তিনি কল্লেন কেন?"—বস্তুতঃ সুখ আর দুঃখ ব'লে দুটো স্বতন্ত্র জিনিস নেই—ওটা মনের লালসা-বৃত্তির পরিণাম মাত্র। অভ্যাস বশে সংসারী জীবেরা কেউ সুখ বলে কেউ বা দুঃখ বলে।"

জীব। "এক জন যা'কে সুখ বলে আর এক জন তা'কেই দুঃখ বলে?"

জ্ঞান। "বলে বই কি ভাই! মনে ক'রে দেখো দেখি তুমি ত এক সময়ে খুব ধনী ছিলে, নিত্য নিজ সহচরগণের সঙ্গে বিবিধ

সুভোজ্য ভোজন ক'রে তৃপ্ত হ'তে। এক দিন তোমার একজন সহচর অতি উৎকৃষ্ট পলান্ন-প্রস্তুত করেন। সকলেই তৃপ্তির সহিত ভোজন ক'ল্লেন, আর তুমি সে দিন ভোজন ক'ত্তে পাল্লে না কেন? মনে পড়ে কি?"

জীব। "মনে পড়ে বই কি? সে ত অধিক দিনের কথা নয়। আহারে ব'সে, পলাণ্ডুর দুর্গন্ধে বমনোদ্রেক হ'য়েছিল, সে দিন আর আহার ক'ত্তে পারিনি। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দুর্গন্ধটা যেন আমার নাকের মধ্যেই ছিল।"

জ্ঞান। "তুমি পলাণ্ডুভোজনে অভ্যস্ত নও ব'লেই ত ঐ কষ্ট? এখন দেখ্‌লে ত, যাতে অনেক লোক সুখ অনুভব করেছিল, তুমি তাতেই দুঃখ বোধ কল্লে। সুতরাং জড়ীয় সুখ দুঃখ বস্তু-ধর্ম্ম নয়, ওটা মনের কল্পনা বা অভ্যাস যা ইচ্ছে হয় বল্‌তে পার। আবার ভেবে দেখ সংসারের সকল লোকেই সুন্দরী রমণীর সহবাসে তৃপ্তি বোধ করে, তোমার অর্থের অভাব ছিল না—কত লোকে তোমায় কন্যা দান কর্ব্বার জন্য কত সাধ্য সাধনা ক'রেচে। কিন্তু তুমি আজিও বিবাহ কর নাই কেন? নারী সহবাস তোমার তৃপ্তিকর মনে হ'তো না নিশ্চয়। কি বল?

জীব। "আমি বিবাহ করি নি?"

জ্ঞান। "জড় দেহে কর নি। অন্তর্জ্জগতের নাটকে তোমার কিছুরই অপ্রতুল নাই। কিন্তু একবার চেয়ে দেখ দেখি।" এই বলিয়া জ্ঞান জীবের ললাটস্পর্শ করিলেন।

জীব হাসিলেন, বলিলেন "আমার জড় দেহ ব'সে আছে আর আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আপনাকে পা'বার জন্য প্রান্তর পার হ'য়ে এখানে এসেছি। তবে আমি কি?—আমি কে?—আমি কোথায়?"

জ্ঞান। "ভাই আমরা সেই নটচূড়ামণি নটবরের নটী। তাঁ'র ইচ্ছাতেই এ মায়া নাটকের সূচনা। তাঁ'র গুণময়ী দৈবীমায়া এ নাটকের বেশ-রচনা-কারিণী। এ নাটকের অনেক অঙ্ক অভিনীত হ'য়েছে। সকল অঙ্কেই তিনি আমাদিগকে আশ্রয় ক'রে নিরন্তর অপূর্ব্ব অভিনয়ানন্দ উপভোগ ক'চ্চেন। তিনি আমাদের এমনি শিখিয়েচেন, যে আমরা স্বস্ব অংশ অভিনয় কর্ব্বার সময়, কে আমি এ সাজে সেজেচি এ কথাটাও ভুলে গেচি। এ সংসারের সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য সবই অভিনয় মাত্র। তুমি ভাই এর কিছুই কর না। অষ্ট অপরার সঙ্গিনীগণ এই অভিনয়সূত্রে এ সবই ক'ত্তেছে। তুমি যে প্রাণবল্লভের পাশে দাঁড়িয়ে, নিরন্তর তাঁ'রে সেবা-সুখে সুখী ক'চ্চো এই কথাটি যখন বুঝ্‌তে পার্‌বে—তখনই বুঝ্‌বে আমরা এ সুখ দুঃখ অভিনয় ক'চ্চি মাত্র, আর তুমি তাঁ'র সঙ্গে এ অভিনয় দেখে আনন্দ অনুভব ক'চ্চো। এখন এই সাধন-কুঞ্জে একটু বস্‌বে বল্‌ছিলে, বস্‌বে এসো।

জীব। "অতি অদ্ভুত রহস্য, আমি এখনও এর কিছুই বুঝ্‌তে পা'চ্চিনে, এ সব মায়ার অভিনয়?—মানবের পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নি জায়া পুত্র কন্যাদি সকলে কেবল এ নাট্যাভিনয়ের সহচর সহচরী—তবে ত এ সব ভোজবাজীর মত মিথ্যা।"

জ্ঞান। "যতক্ষণ এদের সঙ্গে অভিনয় কর্‌বে ততক্ষণ সত্য। যখন নিজের অংশ শেষ ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে, কেবল দেখ্‌বে,

তখন এ সব মিথ্যা ব'লে বুঝেও অতুল আনন্দ অনুভব কর্ব্বে। এখন এস বসি গিয়ে।"

তৎপরে উভয়ে সাধনকুঞ্জের দ্বারদেশে আসিয়া দেখিলেন, কুঞ্জমধ্যে প্রশস্ত প্রস্তর-বেদিকার এক পার্শ্বে একখানি মৃগচর্ম্ম আস্তৃত করিয়া একটি প্রশান্ত মূর্ত্তি পুরুষ ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট আছেন।

জীব দেখিয়া চমকিলেন, বলিলেন "এযে আমি।"

জ্ঞান। "হাঁ তুমিই! তোমার মন ও বুদ্ধি অহঙ্কারে বিলীন হ'য়ে এখানে পরম পদার্থে আত্ম সমাধান ক'চ্চে। এস আমরা এই পাশে বসি।"

এই বলিয়া উভয়ে সেই বেদীর অপর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মৃদুল পবন কুঞ্জদ্বারে আসিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, দুইটি পুরুষ সেই দ্বারে আসিয়া জ্ঞান-দেবের চরণে প্রণত হইল।

জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে বাক্য, কিহে মন, সম্বাদ কি?

উভয়ে একবাক্যে বলিল "নিষ্ফল হ'লো।"

জ্ঞান। "কেন?"

বাক্য। "আপনার আদেশে আমরা দু'জনে বরাবর গিয়েছিলাম। কতস্থানে যে কত প্রকার দৃশ্য দেখ্লাম তা বল্‌তে পারি না। শেষে সেই মায়া-নদীর তীরে গেলাম। অনেকবার সে নদী দেখেছি বটে, কিন্তু যখনই দেখি তখনই নূতন বোধ হয়।"

জ্ঞান। "তোমরা দুজনেই বড় ক্লান্ত হ'য়েছ একটু বিশ্রাম কর। তার পর শুন্‌বো। আমরাও ততক্ষণ একটু জপ করি।"

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ-কালো।

ও কানাই, নাই হেথা ঠাঁই আস্‌চ কোথায় বনমালী।
(তুমি) নেচে নেচে আস্‌চ ভাল সঙ্গে রাধা রূপের ডালি॥

নাই হৃদয়ে তমাল তরু নাই কো সেথায় বাছুর গরু
নাই কোন গাছ্ ডাকবে কোকিল, উড়্‌চে কেবল ছাই আর বালি॥

হৃদয় আমার মহাশ্মশান, মধুর রসের নয় সেটা স্থান
শিবাগণে গায়, পিশাচে নাচে আর দেয় করতালি॥

সঙ্গে রাধা মুখে হাঁসি (তোমার) এখানে বাজবে না বাঁশী
যাও চোলে, নতুবা বলে প্রবেশিলে দিব গালি॥

নারী-ঘাতক ননীচোরা বাজাও বাঁশী বসাও ছোরা
বাধার ভারে নাই শিরে কেশ কেশব নামটি জাঁকাও খালি॥

বোধানন্দনাথ ভাষে তবে যদি আয়ান আসে
হৃদয় খুলে দিব তখন দেখ্‌ব কেমন চতুরালি॥

শ্রীবোধানন্দনাথ

কৰ্ম্ম।

মানব জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ম্ম লইয়া আসে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম সাধন করিয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপ মানবের বর্ত্তমান জীবন অবধারিত হয় এবং সেই কর্ম্মফল অনুসারে মানব সুখ দুঃখের ভাগী হয়। সৎকর্ম্মের ফলভোগ সৎ অর্থাৎ সুখভোগ, অসৎ কর্ম্মফল অসৎ অর্থাৎ দুঃখ। এই রূপে সুখ-দুঃখ-সমন্বিত এই জীবন, এই পৃথ্বীতলে কিছুদিনের জন্য বাস, ইহাকেই মানব-জীবন বলে। যদি কর্ম্মফল না থাকিত, তাহা হইলে ধরণীতে আজ এত অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হইত না।

আমি দীন দরিদ্র। দু'টি উদরান্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাও উদরপূর্ত্তি করিতে পারি না, আর আমারই চক্ষের সমক্ষে, আমারই প্রতিবেশী চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ আহার্য্য প্রয়োজনের অধিক পাইয়া অরুচি বোধে পথিপার্শ্বে পরিত্যাগ করিতেছে। হয় ত, আমা অপেক্ষাও কোন হতভাগ্য তাহাই লইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। আমি একখানি গাত্রবস্ত্রের অভাবে সারারাত শীতে অগ্নি জ্বালাইয়াও শীত নিবারণ করিতে পারি না, আর ঐ দেখ ধনীর পুত্র আপনার গো অশ্ব প্রভৃতির শীত-বারণের জন্য মূল্যবান বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে।

যদি পক্ষপাতশূন্য দয়াময় বিধাতার এই বিশ্ব রচনা যথার্থ হয়, তবে এ অসামঞ্জস্য কেন? আমিও জীব, ধনাঢ্যও জীব, সেই পরমপিতার সৃষ্ট, তবে এত প্রভেদ কেন? আমি সদ্ব্যয়ের জন্য একটি কপর্দ্দকও পাই না, আর ঐ দেখ ধনীর পুত্র বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্য অনায়াসে অজস্র অর্থ বর্ষণ করিতেছে। আমার পিতৃশ্রাদ্ধের সংস্থান নাই কিন্তু মদ্যপ যুবক ভূরি ভূরি অর্থ আপন পাশব বৃত্তি চরিতার্থের জন্য ব্যয় করিতেছে।

"যদি দয়াময়, ইচ্ছাময়, শক্তিমান হরির এই বিশ্ব, তবে এত দুঃখ কেন? নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেন তিনি বিধান করেন নাই? যিনি দয়াময় দরিদ্রের দুঃখ দেখিলেই তাঁহার দয়াপ উদয় হইবে, নহিলে তিনি কিসের দয়াময়? দয়ার উদয় হইলে সে দুঃখ মোচনের ইচ্ছাও রহিয়াছে, কেন না তিনি ইচ্ছাময়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বিদ্যমান; দয়া, ইচ্ছা, শক্তি, তিন যেখানে একত্রিত, সে জগতে এত দুঃখ কেন?"

কোন পাশ্চত্য দার্শনিক এইরূপ বিচারের দ্বারা ভগবানের দয়া, ইচ্ছা, ও শক্তি পূর্ণমাত্রায় নাই, অথবা থাকিলেও তাহার প্রতিকূলে এমন কোন শক্তি আছে, যাহা তাঁহাকে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে দেয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে বলিয়াছেন, প্রসবের সময় জননীর এত যন্ত্রণার কারণ কি? তবে জগতে দুই শক্তি কার্য্য করিতেছে, একটি সৎ, অন্য অসৎ, এক আকর্ষণ অপরটি প্রতিক্ষেপ, এক সুখ অপরটি দুঃখ। নাস্তিক দার্শনিক আপনার ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা, যে বুদ্ধির উৎপত্তি স্থান সেই পরমকারুণিক পিতার দয়া, এইরূপে ভগবত্তত্ত্ব

উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। পারিয়াছেন কি ?

পাশ্চাত্যদর্শনে যাহাই থাকুক, আমার তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই, এবং আমি অতি মূর্খ, আমার সে শক্তিও নাই। আমার শ্রীগুরুদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই পাঠকের অবগতির জন্য যথাসাধ্য লিখিব। তাহাতে যদি লোকের কোন হিতসাধন হয়, সে তাঁহার কৃপা, যদি কোন ত্রুটি হয়, সে সমস্ত আমার।

স্থূলরূপে ধরিতে গেলে, জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবজীবন কতকগুলি কর্ম্মসমষ্টি বই আর কিছুই নয়। যে কর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া, হরির প্রেমালোকের অমল জ্যোতি হৃদয়ঙ্গম করায়, তাহাই সৎকর্ম্ম ও যাহাতে ইন্দ্রিয় সেবা পূর্ণ মাত্রায় হয় তাহাই অসৎ কর্ম্ম। মানব জন্ম বড় দুর্ল্লভ জন্ম। অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর তবে জীব নরজন্ম পায়। এই জন্মে কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। সে গুলি গৃহস্থ ও সাধকভেদে দ্বিবিধ।

অগ্রে গৃহস্থ-কর্ম্মের কথা বলিব।

মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াই ক্রন্দন করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম-জ্ঞান হৃদয়ে আছে, সেই জ্ঞানে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ক্রন্দন করে। চিত্তাকাশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত কর্ম্মের প্রতিরূপ কর্ম্মক্ষয়ের কাল পর্য্যন্ত আছে ও রহিবে, সেই সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার হইতে মানব পরজন্মের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লয়।

গৃহীর কতকগুলি কর্ম্ম আছে তাহা বাল্য-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সাধন করিতে পারিলে নরজন্ম ধারণ সার্থক হয়।

১ম। জনকজননীর প্রতি কর্ত্তব্য। যে জননী দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া কত দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া, আপনার দেহের প্রতি আ'দৌ লক্ষ্য না করিয়া, সন্তান কিসে ভাল থাকিবে, সততই এই চিন্তা করেন। যখন আমাদের অভাব অভিযোগ বাক্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তখন কে চকিত-মাত্র শিশুর হৃদয়ভাব অবগত হইয়া, তাহা পূরণ করিয়া সেই কোমল দেহ পুষ্ট করেন? কে বক্ষ-রক্তদানে এই রক্তমাংস জড়িত, এই অষ্টধা প্রকৃতি সমন্বিত দেহ রক্ষা করেন? জগতের প্রত্যক্ষ দেবদেবী পিতামাতা। কোন এক ভক্ত, ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গর্ভধারিণী জননীর ধ্যান করিলে কি ভগবান লাভ হয় না?" তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম "ওরে কোথায় প্রত্যক্ষ খুঁজবি, প্রত্যক্ষ দেবতাই ত পিতা-মাতা।" যাঁহাদিগের হইতে এমন নরদেহ পাইয়া দেবত্বলাভের অবসর পাইয়াছি, ভাইরে জগতে এমন কি আছে, যাহা দ্বারা তাঁহাদের অপরিশোধ্য ঋণ কণামাত্রও শোধ করিবার জন্য ত্যাগ করা যায় না। যাঁহাদের দত্ত দেহ দ্বারা নিত্যধন লাভ হয়, কি ধন জগতে আছে, যাহা তাহাদের জন্য উৎসর্গ করা যায় না ?

ছোট ভাই ভগ্নিগুলিকে স্নেহের চক্ষে সকলেই দেখেন, ইহা মানবের প্রকৃতিগত। কিছু দিন পরে ভগ্নি বিবাহিতা হইয়া পরগৃহে চলিয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা গৃহে থাকেন ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন পিতৃত্যক্ত ধনের ন্যায্য অংশ লইতে আসেন, তখন আর

ক্রোধের সীমা থাকে না। ভাইয়ে ভাইয়ে তখন মহাশত্রুর ন্যায় আচরণ আরম্ভ হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা অনিত্য পার্থিব ধনকে উচ্চতম আসন দিয়া হৃদয়ের একটি প্রধান স্মৃতি ভ্রাতৃস্নেহকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করি। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে শ্রীরামচন্দ্র যে ভ্রাতার জন্য শোক করিয়া বলিয়াছিলেন—

"দেশে দেশে কলত্রানি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তদেশং ন পশ্যামি, যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ"।

সেই সহোদর ভ্রাতাকে অনায়াসে হত্যা করিয়াও কণ্টক দূর করিতে পশ্চাৎপদ হই না। আমি হয় ত সুখ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুখসেব্য আহার্য্য সেবনে ঐশ্বর্য্য ভোগের চূড়ান্ত করিতেছি, এক মাতৃস্তন্যে বর্দ্ধিত আমারই ভ্রাতা, আমারই রক্তমাংসের এক অংশ, পথে পথে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। অম্লানবদনে দেখিতেছি, ও মহামায়ার প্রতিরূপা রমণীর কুহকে মত্ত হইয়া হৃদয়কে পাষাণ করিয়া বসিয়া আছি। ক্ষুদ্রত্ব বর্জ্জন করিতে না পারিলে, মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, দেবত্ব ত পরের কথা।

মানব যেখানেই থাকে, সমাজবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। সমাজ বন্ধন না থাকিলে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির উপদ্রবে মনুষ্যের বাস দুরূহ হইত। এক গ্রামে এক ব্যক্তি হয় ত ধনে, মানে, জ্ঞানে, বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, তাহাকে সমাজে উচ্চাসন দিয়া, সেই গ্রামবাসী সকলে সমাজ গঠন করিল, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আজ্ঞায় সে দেশের সব কার্য্য হইবে। এক সমাজভূক্ত, এক গ্রামবাসী ব্যক্তিনিচয়কে প্রতিবেশী কহে। সেই প্রতিবেশীগণ কিসে সুখে থাকিবেন? তাঁহাদের সহিত সখ্যতা সহকারে, ভ্রাতৃভাবে বাস করিলে সমাজে শান্তি বিরাজ করেন। স্নেহ, সখ্য, প্রভৃতি সদ্ভাবসমূহ হৃদয়কে প্রশান্ত করে আর ঘৃণা বা শত্রুতা হৃদয় সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। সঙ্কুচিত হৃদয়ে মহত্ত্ব থাকে না, সুতরাং মনুষ্যত্বও চলিয়া যায়। দেবতারা সহায় হন না। হিংসা ছাড়িয়া "ভাই ভাই" ভাবে জীবনাতিপাত করিতে পারিলে, এই ধরাধামেই স্বর্গসুখ অনুভূত হয়।

বালকের জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতা তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তথায় বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়া মনুষ্যত্ব আনয়ন করাই শিক্ষাগুরুর কার্য্য। তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ নৈতিক জীবনের প্রবর্ত্তক। আমরা জগতে মানুষ নামধারী হইয়া যথার্থ সদ্গুণে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে যাহাতে সমর্থ হই, সেই কল্পেই পিতামাতা সন্তানকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। গুরু যত্ন সহকারে যাহাতে সন্তানটি সদ্গুণভূষিত হইয়া পিতা মাতার হৃদয়ে আনন্দ দান করিতে পারে, সেই চেষ্টাই করেন। আমাদের জীবন-গঠনের প্রধান সহায় শিক্ষাগুরু। ইনিও পিতা মাতার ন্যায় পূজ্য। এই সমস্ত সদ্বৃত্তি আমাদের ভিতর আর প্রায় নাই বলিয়াই আমাদের এত অধোগতি।

ঋষি বলিয়াছেন,—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেক জীবের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। যাহাতে স্বদেশবাসীর এবং স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান হয়, প্রত্যেক মনুষ্যেরই তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট কোন আজ্ঞাই পালন করিতে চাহি না, তাই আমরা সিংহের বংশধর হইয়াও আজ শৃগালতুল্য।

দেশের রাজা বা শাসনকর্ত্তার প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব সময় উক্ত হইয়াছে। রাজা ধন, প্রাণ, মান সমস্তই রক্ষা করেন বলিয়া আমাদের কৃত পুণ্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। এই বিধান আর্য্য ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। রাজার মান ও প্রতাপ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সর্ব্বতোভাবে প্রজার তাহা দেখা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন হইলে রাজার জন্য প্রত্যেক প্রজাই অস্ত্রধারণ করিতে ও প্রাণ দিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। ইহার ব্যতিক্রম হইলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয়। রাজা পিতৃতুল্য হিন্দুর চক্ষে রাজা সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ।

দীক্ষাগুরু ও ভগবানের প্রতি মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। যদি গুরুদেব শক্তি দেন, লিখিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুসন্তান জীবনে এই সমস্ত কর্ত্তব্যসাধন করিতে করিতে ক্রমে শিশুকাল হইতে যৌবনে পদার্পণ করিয়া, গৃহধর্ম্ম আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে, আর্য্য ঋষিগণের সময়ে ব্রহ্মচর্য্য ও পাঠ আদি সমাপন করিয়া তবে গৃহস্থ আশ্রম ও বিবাহাদি, হইত। এখন সমাজশাস্তা নাই, যথেচ্ছাচারের ফলে, যাহার যখন সুবিধা, তিনি তখনই সন্তানাদির বিবাহ দেন বা স্বয়ং সংসার করেন, ও সংযম শিক্ষার অভাবে সংসারের কীট হইয়া পড়েন।

হিন্দু গৃহী অরুণোদয়ের প্রাক্কালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিবেন ও রাত্রিকালের পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধৌত বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। পরে গুরুস্মরণ করিয়া আপনার বিষয় কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিবেন। বিষয় কার্য্য সমাধানান্তে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্নাত হইয়া পূজা অর্চ্চনাদি হইয়া গেলে, গৃহী দেখিবেন যে বাটীর সকলে ভোজন করিয়াছে কি না? অভূক্তের ভোজন হইলে, স্বয়ং আহার করিবার পূর্ব্বে, বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, অত্যুচ্চস্বরে "কে অভূক্ত আছ আমার বাটীতে আইস" বলিয়া তিনবার ডাকিবেন। কেহ অতিথি আসিলে, তাঁহাকে আহার করাইয়া পরে নিজে ও গৃহিণী আহার করিবেন।

পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল বলিয়া, সাধু সন্ন্যাসীগণকে এখনকার মতন ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত না। তাঁহারা জানিতেন যথাসময়ে গৃহী আমার আহার্য্য দিবে, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে জগতের হিতের জন্য তাঁহারা ভগবানকে ডাকিতেন। এখন তাহা নাই, তাই এই অবস্থা।

এইরূপে গৃহী সর্ব্ববিষয়ে সংযম শিক্ষা করিতে করিতে জীবনাতিপাত করিতেন। যৌবনকাল হইতে এইরূপ শিক্ষা করিলে ক্রমে ভোগ স্পৃহা কমিয়া যাইত। তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

ইন্দ্রদ্যুম্ন-চরিত।

দ্বিতীয়াংশ।

শ্রীনৃসিংহের প্রতিষ্ঠার পর রাজর্ষি-ইন্দ্রদ্যুম্ন, দেবর্ষি নারদের পরামর্শানুসারে, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন মানসে সেই পুণ্য ক্ষেত্রে একটি সুপ্রশস্ত সভামণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন। ঐ সভা—

"পাষাণঘটিতা সোচ্চা সুধয়া সাধুলেপিতা।
ক্বচিদ্রত্নময়ী ভূমী ক্বচিৎ কাঞ্চননির্ম্মিতা।
স্ফাটিকী রাজতী চৈব যথাযোগ্যং কৃতা স্থলী।
স্তম্ভৈ রত্নময়ৈঃ প্রোচ্চৈর্দুকূলপরিবেষ্টিতৈঃ।
চারুচন্দ্রাতপাঢ্যা সা গন্ধমাল্যৈঃ সচামরৈঃ।"

নরেশ্বর শুভক্ষণে শুভদিনে সমাগতজনগণকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া, যথোচিত অর্চ্চনা পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সপত্নীক সহস্র অশ্বমেধে দীক্ষিত হইলেন। সেই যজ্ঞগুলি সমাপন করিতে বহুকাল অতীত হইল। যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নানের সপ্তরাত্রি পূর্ব্বে শেষ যামে তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। দেখিলেন—

"প্রত্যক্ষমিব স শ্বেতদ্বীপং স্ফটিকনির্ম্মিতম্।
সমন্তাৎ পরিবার্য্যৈনং তিষ্ঠন্তং ক্ষারসাগরম্।
মহাকল্পদ্রুমৈঃ পুষ্পগন্ধামোদি-দিগন্তরৈঃ।
ফলপল্লববন্ধেষু বহিরন্তশ্চ সর্ব্বতঃ।
শঙ্খচক্রাঙ্কিতৈঃ শুভ্রৈঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতৈঃ।
মহানাঙ্গিষ্ঠবর্ণৈশ্চ মূর্ত্তিভিস্তৈ মুরদ্বিষঃ।
তন্মধ্যে ঘটিতং দিব্য-মণিভির্ম্মণ্ডপোত্তমম্।
মধ্যস্থসূর্য্যবৎভাসি রত্নসিংহাসনোজ্জ্বলম্।
ক্ষীরাব্ধিশীতকল্লোল-মন্দবাত-মনোহরম্।
তন্মধ্যে দদৃশে দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
দক্ষপার্শ্বস্থিতং তস্য অনন্তং ধরণীধরম্।
সব্যে পার্শ্বে স্থিতাং বিষ্ণোর্ল্লক্ষ্মীং তাং শুভলক্ষণাম্
পিতামহঞ্চ দদৃশে পুরতোঽস্য কৃতাঞ্জলিম্।
বামপার্শ্বস্থিতং চক্রং সর্ব্বজ্ঞানময়ং বিভোঃ।
সনকাদিমুনীন্দ্রৈস্তু স্তূয়মানং জগদ্গুরুম্।

এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শনে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি সানন্দে গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে সেই যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নানের দিবসে, সাগরতটে বিল্বেশ্বর শিবের অদূরে, শঙ্খচক্রচিহ্নে চিহ্নিত রক্তবর্ণ এক অপূর্ব্ব বৃক্ষ দৃষ্ট হইল। সেই দৈববৃক্ষে যেরূপে শ্রীমূর্ত্তি-চতুষ্টয় নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে বিবৃত হইয়াছে। অতএব আমরা আর সেই সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিতে বিরত হইলাম; কেবল রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত সুমধুর স্তোত্রটি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম।

শ্রীমূর্ত্তি-চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠাপিত হইলে, ক্ষিতীশ্বর ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই দিব্যমূর্ত্তিনিচয় দর্শন করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ শারীর-চেষ্টা কিয়ৎক্ষণের জন্য লুপ্ত হইল। তিনি দরবিগলিত অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শ্রীমূর্ত্তিসমূহের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেবর্ষি নারদ বলিলেন "রাজর্ষে, এত দিনে আপনার সকল শ্রম সার্থক হইল, এখন প্রাণ ভরিয়া এই কারুণ্য-সাগরের স্তব করিয়া চরণতলে প্রণাম করুন।

ক্ষিতীশ্বর নারদকর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

"ত্বদঙ্ঘ্রিপাথোজযুগং মুরারে-
নোপাসিতং জন্মসু পূর্ব্বজেষু।
তৎকর্ম্মণা দারুণপাকভীতং
দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্॥
ক্ক নির্ম্মলং তচ্চরণাব্জযুগ্মং
বিরিঞ্চিরুদ্রেন্দ্রকিরীটলগ্নম্।
ক্কাহং কুদীনঃ শকৃদস্রমাংস-
মূত্রাস্থিসংঘৈ পিহিতস্ত্বচা বৈ॥
অসারসংসারপরিভ্রমেণ
শ্রমাতুরস্ত্বাং কথমীশ জানে।
জানন্তি তে ত্বাং খলু দেবদেব
যেষাং ভবো দুঃখভব প্রকাশঃ॥
প্রভো ময়া দুঃখমনেকজন্ম-
পাপার্জ্জিতং ভুক্তমনেকভাবম্।
শুভার্জ্জিতো যঃ সুখ-লেশভাবো
নিদর্শনং যৎ মধুপৃক্তভিক্তে॥
যদেব সৌখ্যানুভবায় দেব
কর্ম্মার্জ্জিতো মে বিষয়োপভোগঃ।
স এব দুঃখঃ পরিণামতো মে
ন মদ্বিধো দুঃখিজনোঽস্তি নান্যঃ॥
বিভো যদি ত্বাং মনসাপি পূর্ব্বম্
উপাস্তমন্যদ্বিষয়েক্ষণোঽহম্।
কথং তদা লপ্স্যমনেকজন্ম
পুনঃপুনর্ভোগ্যমশেষদুঃখম্॥
বিভুত্ব-দাসত্ব-পিতৃত্ব-পুত্র-
প্রিয়ত্ব-মাতৃত্ব-ধনিত্বভাবৈঃ।
বন্ধ্যত্ব-হিংস্রত্ব-পতিত্ব-জায়া-
ভাবৈশ্চ তির্য্যক্ত্ব-সুরাদিভাবৈঃ॥
নীচোর্দ্ধভাবঃ বহুশঃ সকৃদ্বা
ভবাঙ্গনেঽস্মিন্ লুঠতানুভূতম্।
ন বা মুরারে তব পাদপদ্ম-
দূরীভবস্ত্যেষ্টফলং হি চৈতৎ॥
কোশং বলং চেদশেষপৃথ্বী-
ধনৈর্বৃতং যৌবনরূপরূপ্যঃ।
মনোঽনুকূলাঃ শতশস্ত্রিয়শ্চ
নিষ্কণ্টকং মে নৃপমণ্ডলঞ্চ॥
সাম্রাজ্যতা চাপি ভারো মহান্মে
ত্বং জ্ঞানহীনস্য পশোরিবায়ং।
ভারাবতারং কুরু মে কৃপাব্ধে
সদৈব তত্রোদিতখেদযোগঃ॥
দীনানুকম্পিন্ করিণো বিমুক্তিঃ
কৃতা বিভো তৎস্মৃতিমাত্রকেণ।
ভ্রান্তং ঘটীযন্ত্রবদত্র নাথ
মাং ত্রাতুমর্হস্যনুকম্পিভাবাৎ॥
ন মে ত্বদন্যঃ খলুবন্ধুরত্র
প্রবাহবিভ্রষ্ট-তরুস্বভাবে।
পাপীয়সী বুদ্ধিরুপেতভাবা
স্নেহানুবন্ধা বিষয়েঽতিভেদ্যা॥
অহর্নিশং মে তব পাদপদ্মা
ন্নাপৈতু মৎপ্রার্থিতমেতদেব।
ত্বাং সচ্চিদানন্দ সুপূর্ণসিন্ধুং
প্রাপ্তাস্ত যে জন্মসহস্রভাগৈঃ॥
কিং তে হি পশ্যন্তি লবৈকসৌখ্যম্
অনেকদুঃখং বিষয়েন্দ্রজালম্।
ক্ক বন্ধনং কর্ম্মভিরিষ্টলেশ
দুঃখাকরগ্রন্থিশতৈরভেদ্যম্॥
অনন্তমাদ্যান্তবিহীনমেকম্
আনন্দদং ত্বৎপদপঙ্কজং ক্ক।
মায়াম্বুধৌ তে মমতাভ্রমৌ চ
কুকর্ম্মনক্রান্বিত গর্ভমধ্যে॥
নিরাশ্রয়ং মে পতিতং বিলাস-
কটাক্ষপাতেন নয়াদ্য তীরম্।
স্বকার্য্যসংসাধনয়াশ্রিতানাং
সম্পাদনায়েষ্টবিধেরজস্রম্॥
ভ্রাম্যন্তমাত্মীয়হিতং বিসৃজ্য
মাং ত্রাহি মূঢ়ং সহজানুকম্পিন্।

ক্ষুদ্রায় কার্যায় বহুভ্রমন্তম্
অপ্রাপ্যমূলং পরমেশ্বরং ত্বাম্।
আয়াসপাত্রং পরমং সুদীনম্
মাং ত্রাহি বিষ্ণো জগদেকবন্দ্য।
বেদান্তবেদ্যাব্যয় বিশ্বনাথ
ত্বমীশিষে হস্তমঘৌঘরাশিন্।
তং ত্বাং পরিত্যজ্য সুখৈকহেতুং
ক্ষুদ্রাশয়ং মাং পরিপাহি বিষ্ণো।
প্রসুপ্ত এষোঽখিলভূতসঙ্ঘ-
শ্চতুর্বিধো যৎ-কৃত-মোহরাত্রৌ।
তজ্জ্ঞানভানূদয়মেত্য চান্তে
প্রবোধ্যতে ত্বাং শরণং প্রপদ্যে।
ত্বমেক এবাখিললোককর্ত্তা
ফণাসহস্রৈঃ পরিণীতমূর্ত্তিঃ।
পর্য্যায়বৃত্ত্যা বলিনং বরিষ্ঠং
ত্বামীশিতারং শরণং প্রপদ্যে।

যয়া সৃজস্যৎসি জগন্তি নাথ
বক্ষঃসরোজাসনয়া স্বশক্ত্যা।
তাং ভদ্ররূপাং জগদাশ্রয়াং তে
দেবারণিং পাদযুগে নতোঽস্মি।
যদংশুজালপ্রতিবিম্বমেতৎ
ব্রহ্মাণ্ডজালং করসঙ্গি নাথ।
সুদর্শনং দৈত্যবলস্য হন্তৃ
চক্রাভিধং তং প্রণতঃ সুদর্শনম্।

এই স্তোত্র পাঠান্তে "ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ডে শ্রীমদিন্দ্রদ্যুম্নচরিতে শ্রীপুরুষোত্তম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।" বলিয়া স্তোত্র শেষ করিতে হয়। এই স্তোত্র পাঠ দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমে অচলা ভক্তির উদয় হয়।

প্রেমানন্দ।

একটি ফুলের প্রতি।

(১)
হেরি তোর দশা ফুল প্রাণ মোর কাঁদে
এইত ফুটিলে তুমি
আলো করি বনভূমি
এর মধ্যে তবে কেন ঝরিছ বিষাদে ?

(২)
এখন ডুবেনি রবি, আকাশের গায়
উঠেনি একটি তারা
কোলাহলে পূর্ণ ধরা,
এখন ফেরেনি পাখী আপন কুলায়।

(৩)
এ মিনতি, থাক ফুল আর কিছুক্ষণ,
দিবা অবসান হ'লে,
আমরাও যা'ব চ'লে,
তব সনে সন্ধ্যাস্তোত্র করি' সমাপন।

(৪)
আমরাও ক্ষণস্থায়ী তোমার মতন,
দেখিতে দেখিতে হায়—
যৌবন কাটিয়া যায়
সত্বর বার্দ্ধক্য আসি' দেয় দরশন।

(৫)
তোমারি মতন শেষে আমা সবাকার
জীবন শুখায়ে যা'বে
কুসরিৎ গ্রীষ্ম যবে
অথবা প্রভাতে যথা নিশার নীহার।

(অনুবাদিত)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু।

পর্য্যটকের পত্র।

(১৬৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

সন্ধ্যার সময় অতি তৃপ্তি সহকারে ব্রাহ্মণীর গৃহ হইতে ভোজন করিয়া আসিলাম। যে দুই এক দিবস কাশীতে থাকিব, বাঙ্গালি যুবকের বাসাতেই থাকিব স্থির করিলাম। বেশ আনন্দে দুইটা দিবস কাটিয়া গেল। বন্ধুবরকে আমার দেশ ভ্রমণের কথা বলিলাম। তিনি আমার উদ্দেশ্যে কোন বাধা দিলেন না বরং সম্মতিই প্রকাশ করিলেন। কাশীধামে এই আমার নূতন আসা নহে পূর্ব্বেও আসিয়াছিলাম সুতরাং দর্শনযোগ্য স্থান সমূহ পূর্ব্বেই দেখা ছিল। এক্ষণে কিরূপে বাহির হই ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। নূতন উদ্যমে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি বটে—কিন্তু মধ্যে মধ্যে হৃদয় দৌর্ব্বল্যও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আমার সদুদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মনকে যথাসম্ভব দৃঢ় করিলাম এবং সংকল্প-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ভগবান যেন আমার কাতর আহ্বান শুনিলেন, হৃদয়ে বল পাইলাম। একটা সমস্যা আসিয়া বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল,—কি বেশে যাত্রা করি? স্থির করিলাম সাধুর বেশ গ্রহণ করি, যখন মনে হইল জ্ঞানার্জ্জন মানসে ভগবৎ-ইচ্ছায় আমি তীর্থ পর্য্যটন করিব তখন ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? এই বেশে তীর্থপর্য্যটন বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। মনে বিরুদ্ধ যুক্তিও অনেক আসিল শেষে যখন তাঁহারই চিন্তায় কালহরণ করিব তখন ইহাতে কোন ত্রুটী হইলে মা অবশ্যই অবোধ সন্তানের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন ইহাই স্থির করিলাম। গৈরিক বস্ত্র, আলখাল্লা পরিধানই স্থির করিলাম। আর অধিক বিলম্ব করা যুক্তি সঙ্গত মনে না করিয়া ২৫ এ পৌষ বৈকালের ট্রেণে হরিদ্বার যাত্রা করিব ঠিক করিলাম। সহর বুকিং আফিস হইতে টিকিট ক্রয় করিয়া আনা গেল। সন্ধ্যার সময়ে একটা ট্রেণ হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করে। বৈকালে কিছু জলযোগ করিয়া এক্কায় ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে রওনা হইলাম। ট্রেণ আসিবার অনেক পূর্ব্বে ষ্টেসনে পঁহুছিয়া প্ল্যাটফরমের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ট্রেণ আসিল তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিলাম। আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম উহাতে অনেক যাত্রী ছিল তথাপি যাত্রীদিগের অনুগ্রহে একটু স্থান পাইলাম? ট্রেণ চলিতে লাগিল আমি জানালার নিকটে বসিয়া হরি-দ্বার পৌঁছিয়া কোথায় উঠিব? কিরূপে আমার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিব চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে মনে বিশ্বাস জন্মিল যাঁহার নাম লইয়া বাহির হইয়াছি তিনিই যথাযথ স্থানে সমস্তই স্থির করিয়া দিবেন, এ বিষয়ে আমার চিন্তা নিস্ফল। অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিলাম, রাত্রি নয়টা হইয়া গেল। আমি কাত্ হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগি-লাম। অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখি গাড়ী লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে থামিয়াছে। কিরূপে

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি ভাবিতে লাগিলাম ক্রমেই বেলা হইতে লাগিল। এক কোটা জল লইয়া গাড়ীতে শৌচাদি সমাপন করিয়া ভগবানের নাম লইতে লাগিলাম। গৈরিক বস্ত্রের প্রভাবে বাহ্যিক শুচি না থাকিলেও চিত্তস্থির করিয়া নৈমিত্তিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় মোরদাবাদ জংসনে পৌঁছিলাম। এই খান হইতে দিল্লী যাইতে হয়। দিল্লীর যাত্রীরা গাড়ি পরিবর্ত্তন করিয়া গন্তব্য স্থানের গাড়ীতে আরোহণ করিল। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হওয়ায় ক্ষুধার বেশ উদ্রেক হইল বটে কিন্তু উপযুক্ত আহার না মেলায় এ পর্য্যন্ত কিছুই আহার হইল না। বেরিলি ষ্টেসনে পৌছান পর্য্যন্ত একরূপ নির্ব্বাক অবস্থায় ছিলাম। এই ষ্টেসনে একজন সুদীর্ঘ পুরুষ আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। ইহাঁর সহিত পরিচয় হইল। কথাবার্ত্তায় জানিলাম ইনি জাতিতে "সোনার," (আমাদের দেশের স্বর্ণকার) স্বর্ণকারের কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইনি কার্য্যোপলক্ষে বেরিলি গিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার বাটী কন্‌খলে ফিরিতেছেন। লোকটির সন্তান সন্ততি নাই সংসারেও আস্থা বিহীন। কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল ব্যবসা কার্য্যে ইহাঁর সেরূপ মনোযোগ নাই। হরিদ্বার ষ্টেসন হইতে এক মাইল কন্‌খল নামক স্থানে ইহাঁর বাসস্থান। এখানে তাঁহার এক সমব্যবসায়ী বন্ধুও বাস করেন, দুই বন্ধুতে ধর্ম্মালাপে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। বন্ধুটি নাকি বড় ধার্ম্মিক, সাধুভক্ত, সুলফা (চরষ) সেবন করিয়া থাকেন ও সাধু সঙ্গ করেন। ইহার কথায় প্রকাশ পাইল "সুলফা" সেবন কার্য্যটি বড়ই গৌরবজনক; বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির ইহা বড়ই শ্লাঘার বিষয়। ইহার ধারণা "সুলফা" সেবন সাধুর অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সাধু অথচ "সুলফা" সেবন করি না দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। বাস্তবিক আমাদিগের তথাকথিত সাধু সম্প্রদায় এইরূপ নেশাখোর জাতিতেই পরিণত হইয়াছে, নেশাটাই সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে সুতরাং অশিক্ষিত জন সাধারণ যে এরূপ বিকৃত ধারণাগ্রস্থ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক লোকটা মন্দ নহে, আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল আমিও সংক্ষেপে যথাযথ উত্তর দিলাম। আমি হরিদ্বার যাইতেছি জানিয়া লোকটি সুখী হইল, এক সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া যাওয়া যাইবে মনে করিল। সন্ধ্যার সময় লুক্সার জংসন পৌছিলাম। এখান হইতে দেরাদুন পর্য্যন্ত একটি লাইন গিয়াছে হরিদ্বার যাত্রীকে এই স্থানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমি বড়ই ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া পড়িয়াছি। পূর্ব্বদিবস বৈকালে যে জলযোগ করিয়াছি তাহার পর জল স্পর্শও হয় নাই। ইচ্ছা হইল যাহা কিছু মেলে এখানে খাইয়া লই কিন্তু এখানেও কিন্তু খাইবার সুবিধা হইল না। পরিচিত "সোনারের" সহিত হরিদ্বারের গাড়ীতে চড়িলাম। লুক্সার জংসন হইতে হরিদ্বার ১৫ মাইল। আমরাও গাড়ী পরিবর্ত্তন করিলাম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমি হরিদ্বার যাইতেছি পথঘাট পরিচিত নহে—সুতরাং সোনারের গৃহেই অদ্য রাত্রি যাপন করিব স্থির করিলাম, সোনারও

এইরূপ প্রস্তাব করিল। আমরা যে সময়ে হরিদ্বার পঁহুছিলাম বৃষ্টি তখনও থামে নাই। সোনার এক্কা ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক্কাওয়ালা দুর্যোগ বুঝিয়া অত্যধিক ভাড়া হাঁকিয়া বসিল। সোনার বলিল, এক্কা ভাড়া করিলেও বৃষ্টিতে ভিজিতে হইবে, তাহার জিনিস পত্রও ভিজিয়া যাইবে অতএব ষ্টেসনের নিকটস্থ সরাইয়ে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে গন্তব্য-স্থানে যাওয়া যাইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমিও তাহাতেই মত দিলাম। সরাইখানায় যাওয়া গেল, সরাইওয়ালা সরাইয়ের ভাড়া এক আনা অগ্রিম প্রত্যেকের নিকট আদায় করিয়া লইল এবং একটা ঘরে আমাদের স্থান দিল। নিকটস্থ দোকানে গিয়া সমস্ত দিন পরে এক পোয়া পুরী কিছু মিষ্টান্ন খাইয়া আসিলাম। দোকানদার বিদেশী দেখিয়া ঠকাইবার ত্রুটি করিল না। জলযোগের পর একখানা চাটাইএর উপর কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। সোনারও কিছু পুরী মিষ্টান্ন খাইয়া আমারই নিকটে আর একটা চাটাইয়ে শুইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়।

আমার প্রবাস।

(সন ১৩১৯ সাল, ২রা বৈশাখ)

বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে জীব চির-প্রবাসী। তাহার নিত্য বাসস্থান সেই বিশ্বেশ্বরের পদপ্রান্তে। সে তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার সেবাই তাহার এক মাত্র কর্ত্তব্য। সে নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে, তাই নিজের স্বরূপ ভুলিয়া আজি সে বদ্ধ—এই ভব-কারাগারের সুকঠিন মায়া-নিগড়ে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধ। কিন্তু সে যে বদ্ধ, এ কথা সে সহজে বুঝে না—শুনিলেও বিশ্বাস করে না। সুনীলাম্বরচারী মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় সে ভবাটবীতে বেশ আনন্দেই আছে। যখন সে মায়া-নদীর তরঙ্গে আনন্দে গা-ভাসাইয়া ইতস্ততঃ খেলা করে, তখন তাহাকে অত্যন্ত সুখী বলিয়াই মনে হয়। সেই নদীতে স্রোতের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে সে একটি দু'টি করিয়া ক্রমে কতকগুলি তৃণের সঙ্গ পায়, এবং তাহাদের সঙ্গে মিসিয়া স্রোতের সঙ্গে ভাসিতে থাকে। সময়ে সময়ে বায়ুর তাড়নে সেই তৃণসমষ্টির দুই এক গাছি স্বতন্ত্র হইয়া দূরে যায়; কখন বা অন্য তৃণের সঙ্গ পায়—আবার কখনও বা একাকীই ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে গন্তব্য পথে গমন করিতে থাকে ভাগ্যক্রমে যখন আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হয়, তখন নিমেষের মধ্যে সে সেই নদীগর্ভে ডুবিয়া যায়; আর কেহ তাহার চিহ্নও দেখিতে পায় না।

আমিও এক গাছি ক্ষুদ্র তৃণ। সেই আবর্ত্তে আশী লক্ষবার ডুবিয়াছি—ভাসিয়াছি। কত বার কত সঙ্গী পাইয়াছি—কত সঙ্গী হারাইয়াছি, সে সমুদায়ের স্মৃতিও আমার নাই।

যখন প্রথম স্থানচ্যুত হইয়া—নিজের শ্রীকৃষ্ণ-দাসত্ব ভুলিয়া মায়ার ফাঁসী গলায় পরিয়াছি, সেই দুর্দ্দিন হইতে কত দিন কাটিয়া গিয়াছে, কে জানে? কৈ কিছুই ত স্মরণ হইতেছে না—আমি এ ভবারণ্যে প্রবাসী কত দিন?—কত দিনে এ ভ্রম-ভ্রমণের পরিসমাপ্তি হইবে? —যত দিনেই হউক, অনন্ত কালের তুলনায় কল্পান্তকালও অতি সামান্য—অনন্তের নিমেষার্দ্ধও নয়; কিন্তু তবু আমরা ক্ষুদ্র বলিয়া, এই অল্পকালই কত সুদীর্ঘ বোধ হইতেছে।

এইবারে এ মায়ানদীতে ভাসিতে ভাসিতে, কয়েক দিনের জন্য পিতা মাতা—ভ্রাতা ভগিনী বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি কতকগুলি তৃণের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বেশ আনন্দেই চলিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে সে তৃণগুচ্ছের দুই এক গাছি, বায়ুর তাড়নে ভাসিয়া গিয়াছে—আর তাহাদের দেখিতে পাই নাই—জানি না তাহারা কোথায়। আজ আবার প্রবল বাত্যার তাড়নে আমি সকলগুলিকে ছাড়িয়া আর এক দিকে ভাসিয়া চলিলাম। জানি না কবে আবার ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইব—কোনও দিন আবার মিলিত হইব কি না তাহাও জানি না।

আমি আজ নববর্ষের প্রারম্ভে স্বদেশ ছাড়িয়া প্রবাসে চলিয়াছি। চির-প্রবাসীর প্রবাস—বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের বিচিত্র রহস্য —মায়াময়ী মহামায়ার অপূর্ব্ব মায়া-খেলা—যিনি আপনার, তাঁহার জন্য কোনও দিন আকুল নই। কিন্তু পান্থশালায় যাহাদের সঙ্গে দু'দিনের পরিচয়—নিশ্চয় দু'দিন পরে চিরদিনের জন্য যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে —তাহাদের জন্যই আকুল হইতেছি। যিনি আমাকে একক্ষণের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই, নিরন্তর পাছে পাছে থাকিয়া, আমায় রক্ষা করিতেছেন—আমার এ খেলা ফুরাইলে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য যিনি চিরদিন প্রস্তুত আছেন—তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবার আমার বিন্দুমাত্রও অবসর নাই, কিন্তু যাহারা আমায় চায় না, শুধু আমার সঙ্গ চায়, তাহাদেরই জন্য আমি আকুল!

আমি কলিকাতা হইতে রাঁচীতে চলিয়াছি। ইচ্ছা না থাকিলেও ভাগ্যচক্র আমায় লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশে আনিয়া ফেলিল। চারিদিকে পর্ব্বতমালা। অগস্ত্য-প্রিয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা। তাহারা বিশাল বিন্ধ্যগিরিমালার তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও আমার চক্ষে অতি বৃহৎ। শুনিয়াছিলাম পর্ব্বত অতি ভীষণ, কিন্তু আমার চক্ষে অতি মনোরম বোধ হইতে লাগিল।

হাওড়াতে ট্রেণে উঠিয়াছিলাম রাত্রি ৯টার পরে—পুরুলিয়ার ষ্টেসনে পৌছিলাম পরদিন বেলা ৯টার পরে। বাঁকুড়া ষ্টেসনেই সূর্য্যোদয় হইয়াছিল।

মনে হইল, ধন্য রজোগুণসাধক ইংরাজ-জাতি। এই বাস্পীয় শকটের প্রচলনের পূর্ব্বে এরূপ দূরদেশের আসিতে হইলে কত সময় অতিবাহিত হইত, কত কষ্ট সহিতে হইত! "তাঁর কাছে যে যা কায়মনে চায়, সে তাহাই পায়।" মহাজনের এ মহাবাক্যের মূল্য কত জানি না; কে জানিত বল, জলজনিত বাস্পের বলে দূরত্ব নৈকট্যে পরিণত হইবে? —কে জানিত বল মানুষের চেষ্টার বলে তড়িচ্ছক্তি আবদ্ধা হইয়া সংবাদ বহন, যান-বহন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্তা হইবেন?

পুরুলিয়ায় নামিয়াই আবার অন্য ট্রেণে উঠিলাম। গাড়ীগুলি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, না জানি এই ৭৩ মাইল পথ যাইতে এ গাড়ী পথে কতবার দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিবে। কিন্তু আমার সে ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা অচিরেই বুঝিতে পারিলাম। গাড়ী বেশ দ্রুতবেগেই চলিতে লাগিল। পথ ক্রমোচ্চ, সুতরাং অতি দ্রুতগতি সম্ভব নয়। দূরে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের গাড়ী দেখিয়া যেন পর্ব্বতগুলি ছুটাছুটি করিতেছে।

৩রা বৈশাখ অপরাহ্ণ দুইটার সময় রাঁচী ষ্টেসনে পৌছিলাম। ষ্টেসনটি দেখিতে বড় সুন্দর। ষ্টেসনে একটি সুন্দর-হৃদয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, একগাছি তৃণ বহু দিন দূরে দূরে ভাসিতেছিল, আজ আবার আসিয়া এই ক্ষুদ্র তৃণে ঠেকিল। শ্রীশ—

প্রেমের গোরা।

জীবের উদ্ধার তরে, আসিয়া নদীয়া-পুরে
অবতীর্ণ হ'লে তুমি প্রেমের ঈশ্বর।
প্রেমের মূরতি ধরি, প্রেমময় গৌরহরি
ভাসা'লে প্রেমের স্রোতে পশু-পাখি-নর।
প্রেমেতে পাগল হ'লে, প্রেমে নাম বিলাইলে
প্রেম-ধারা দুনয়নে বহে অনিবার।
তোমার প্রেমের স্বরে, পাষাণ দ্রবিত করে,
প্রেমানন্দে নাচে সব বনের বানর।
দেখিয়া জীবের দুঃখ, প্রেমভরে সদা ডাক
"দীন দুঃখী পাপী তাপী কে আছ কোথায়।
এনেছি প্রেমের তরি, আয় সবে ত্বরা করি,
পাপী তাপী যেন কেহ না থাকে ধরায়।"
মহাব্যাধিগ্রস্থ জনে, দিয়ে প্রেম আলিঙ্গনে
দেখায়েছ প্রেমময়, প্রেম, ধরা পরে।
ব্যাধি সব গেছে দূরে, ভাসিয়াছে প্রেমনীরে,
দেব দেব তব পদে নমি বারে বারে॥

কাঙ্গাল।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা

স্বাস্থ্য-সমাচার। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্. বি, সম্পাদিত। ৪৫ নং আমহার্ট ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। আমরা ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে গৃহস্থের জ্ঞাতব্য বহুতত্ত্ব ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত এক টাকা।

বুদ্ধমূর্ত্তি—রেঙ্গুন নগরে বুদ্ধদেবের একটি নূতন পিতলের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইতেছে। ব্রহ্মদেশের এই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি শ্বেড্যাগন-প্যাগোডার পশ্চিম পার্শ্বে, টার্টল পুষ্করিণীর সান্নিধ্যে জাড়োয়া নামক স্থানে স্থাপিত হইবে।

(মানভূম)

পদোন্নতি।—মধ্য প্রদেশের দ্বিতীয় সার্কেলের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার জব্বলপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। এরূপ উচ্চপদে এদেশীয়ের নিয়োগ এই প্রথম। রাজেশ্বর বাবুর এই পদোন্নতি লাভে আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। মিত্র মহাশয় যেমনই কর্ম্মাভিজ্ঞ এবং জিতব্রত, তেমনই সদালাপী এবং শিষ্টাচারী। জব্বলপুর অঞ্চলে অনেক লোকহিতকর কর্ম্মেরই তিনি অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

দান—রাজপুতনা-উদয়পুরের মহারাজ প্রস্তাবিত হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(বঙ্গবাসী)

মায়াশক্তি প্রসূত এই বিশ্ব প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়ক্রম বর্ণনা করিতেছেন—শ্রুতি তাঁহারে "**একমেবাদ্বিতীয়ম্**" বলিয়াছেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "অহমেবাসমেবাগ্রে।" যখন আর কিছুই প্রকটাবস্থায় ছিল না তখন তিনিই ছিলেন। "**নেহ নানাস্তি কিঞ্চন**" এই বাক্যের দ্বারা শ্রুতি তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন আবার বাক্যান্তর দ্বারাও "**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার সবিশেষত্বও স্থাপন করিয়াছেন। "ইদং সর্ব্বং" এই সব। চরাচর বিশ্ব মধ্যে যা কিছু দেখিতেছ সবি ব্রহ্ম—সমুদায়ই সেই শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি। যখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিবে, তখন "যাহা যাহা" নেত্র পড়িবে "তাঁহা কৃষ্ণ" স্ফুরিবে। যদি একই তত্ত্বকে শ্রুতি সবিশেষ নির্ব্বিশেষ দুই প্রকারে দেখিলেন, তখন, যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব, সেই ভাবে তাঁহার ধারণা করিবার বৃথা আয়াস অপেক্ষা এই সবিশেষ প্রতীতি আশ্রয়যোগ্য সন্দেহ নাই। অস্মৎ সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন "এক মাত্র পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির বলে, সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চারিভাবে বিভাসিত। যদি লৌকিক উপমা সম্ভব হয়, তবে বলিতে পারি যেন সূর্য্যের অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, তদুদ্ভূত রশ্মি ও প্রতিচ্ছবি। সেই শ্রীভগবানই পরমতত্ত্ব। তিনিই একমাত্র শক্তিমান। ব্রহ্ম-সূত্র বলিতেছেন "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" শক্তিমানকে ছাড়িয়া শক্তি থাকিতে পারেন না। শক্তির প্রকাশ ভিন্ন শক্তিমানের স্বতন্ত্র সত্ত্বা উপলব্ধি অসম্ভব। তাঁহার শক্তির কথা শুনিতে হইলে, শ্রুতির প্রতি ছত্রেই পাওয়া যাইবে। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

জ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে যত দূর জানিতে পার, চেষ্টা করিয়া দেখ, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি অচিন্ত্য অথচ অনেক। যদি নিত্যাভেদ অনিবার্য্যই হইল, তবে কেবলাদ্বৈতবাদ যুক্তি দ্বারা তাহার নিরাস করিতে চাও কেন? তাঁহার সেই **পরাশক্তি** অন্তরঙ্গা, তটস্থা বহিরঙ্গা ভেদে ত্রিবিধা হইয়া নিত্য প্রকাশিতা ইহা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হইতেছেন। এই অন্তরঙ্গ শক্তিই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি। এই শক্তির আশ্রয়ে তিনি সর্ব্ব-কল্যাণ-

গুণাশ্রয় শ্রীভগবানরূপে নিত্য পূর্ণরূপে বিরাজিত। তাহার সেই রূপ নিত্য পূর্ণ লীলাসম্পাদন জন্য আনুকূল্যময়ী স্বরূপ শক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীবৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপে প্রকাশিত। তিনিই আবার তটস্থা শক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক, রশ্মি পরমাণুবৎ চিদেকাত্ম জীবরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; আবার তিনিই বহিরঙ্গা-মায়া-শক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক, প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যবৎ বহিরঙ্গবৈভব জড়াত্ম প্রধানরূপে দৃষ্ট হইতেছেন। এখন ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে এই জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎ স্বরূপ কেমন **অচিন্ত্য** ভেদাভেদ ভাবে একদা বর্ত্তমান। এই ভাবদ্যোতক শ্রুতিবাক্য দুর্লভ নহে। জীবের তদাশ্রয়ত্ব হেতু একত্ব অভেদত্ব হইলেও সিন্ধুতে আর বিন্দুতে যে ভেদ সে ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। জীবে সে ভূমা জ্ঞানের অভাব, সে মহাপাবকের ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র—তপনের একটু ক্ষুদ্রতম রশ্মি কণামাত্র, তাহাতে আবার সে মায়ার বশ। মায়ার বশেই তাহার সংসার দুঃখ। স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধবশে তাহার মায়া দূর হইলেই সংসার দুঃখের অবসান হয়। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

এই মায়ার অন্তর্দ্ধান কিরূপে হয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় প্রপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয় (অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির আশ্রয়) ঘটিলে স্ব-স্বরূপাবস্থিতিরূপ শুভ ভাগোদয়েই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। এখন প্রাপন্নভাব-প্রাপ্তির ক্রম শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ সংসার দুঃখ ভোগের ফলে মায়ামুগ্ধ জীবের ক্রমে সৎপ্রসঙ্গে আনুরক্তি, শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ জন্মে, তাহা হইতেই স্বরূপ-শক্তিহ্লাদিনীর সারবৃত্তি ভক্তিতে অধিকার হয়। শ্রদ্ধার উদয়ে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়রূপ সৎসঙ্গের লাভ হয়, তৎপ্রভাবে তত্ত্ব শ্রবণ ঘটে, শ্রবণ হইতেই কীর্ত্তনে রুচি হয়; তৎপরে চিত্তদর্পণ মার্জ্জন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের অবশ্য-ভাবী ফল লব্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীকীর্ত্তনের এত শক্তি, কিন্তু তাহাতে রুচি জীবের সুকৃতি সাপেক্ষ। তাই তিনি জীবের পক্ষে বলিতেছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

হে ভগবন্, তব কৃপা এতাদৃশী (যৎ পরমকারুণিকেন ভবতা) নাম্নাং (মুখ্যগৌণাদি ভেদন) বহুধা অকারি। নিজ সর্ব্বশক্তিশ্চ তত্র অর্পিতা। স্মরণে কালো ন নিয়মিতঃ। মমাপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং যৎ ইহ অনুরাগঃ ন অজনি। ২।

ওহে ভগবান, করুণা-নিধান,
অপার করুণা তব,
জীবে এত দয়া দিলে পদছায়া
এ দয়া কাহারে কব ?
মুখ্য গৌণ আর নামের তোমার
করেছ অশেষ ভেদ,
কত তব নাম ওহে গুণধাম
সন্ধান না পায় বেদ।
শ্রীকৃষ্ণ কৃপাল গোবিন্দ গোপাল
বহু নাম তব শুনি,
জীবে দয়া করি দিলে নাম-তরি
ভবার্ণবে গুণমণি।

নিজ শক্তি সব ওহে ভবধব
দিয়েছ সে সব নামে,
বারেক স্মরিলে জীব অবহেলে
যেতে পারে তব ধামে।
সে নাম স্মরণে জীবের কারণে
না রেখেছ কালাকাল,
যে ভাবে যে পারে স্মরিলে তোমারে
ঘুচে হে ভব-জঞ্জাল।
কিন্তু ভাগ্যবশে হেন নাম রসে
না মজিল মোর মন,
দুর্দ্দৈব আমায় কেবল ঘুরায়
কি করি বল এখন ?

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের শক্তির কথা বলিয়া, এক্ষণে তাহার ভেদ বলিতেছেন। এই শ্রীকীর্ত্তন নাম-রূপ, গুণ ও লীলা ভেদে চতুর্বিধ। তন্মধ্যে নাম সর্ব্ববিধ আনন্দ লাভের বীজস্বরূপ ; কারণ তাঁহার অনন্ত নামের প্রত্যেকটির উচ্চারণে অন্তরমধ্যে বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গের উদয় হয় ; সেই তরঙ্গ স্বানুরূপ আনন্দের উৎপত্তি করিয়া হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি করিতে থাকে। সেই জন্য নামের বহুত্বাদির বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলা অনেক নামের প্রকার ॥"

যাঁহার যখন যেরূপ প্রয়োজন—যে ভাব অঙ্গী, তিনি তখন সেই নাম বলিয়া থাকেন। তাই শ্রীবৈষ্ণব প্রত্যূষে করতালে তাল দিয়া গান করেন—

"ভাদ্র-কৃষ্ণ-অষ্টমীতে দেবকী-উদরে।
জন্মিলেন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমথুরাপুরে॥
শিশুরূপে আলো করে কারা-অন্ধকারে।
মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব থুইলা নিয়া নন্দঘোষের ঘরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
নন্দঘোষ থুইলা নাম শ্রীনন্দনন্দন।
যশোদা রাখিলেন নাম যাদু-বাছাধন॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর-রাখাল॥
সুবল রাখিলা নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিলা নাম রাখাল রাজা ভাই॥
ননীচোরা নাম রাখেন যতেক গোপিনী।
কেলেসোনা নাম রাখেন রাধা বিনোদিনী॥
কুব্জা রাখিলা নাম পতিতপাবন হরি।
চন্দ্রাবলী থুইলা নাম মোহনবংশীধারী॥
অনন্ত রাখিলা নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখেন গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্ মুনি নাম রাখেন দেবচক্রপাণি।
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজহস্তি নাম রাখে শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥
পুরন্দর নাম রাখেন দেব শ্রীগোবিন্দ।
কুন্তীদেবী নাম রাখে পাণ্ডব-আনন্দ॥
দ্রৌপদী রাখিলেন নাম দেব দীনবন্ধু।
পাপীতাপী রাখে নাম করুণার সিন্ধু॥

সুদামা রাখিলা নাম দারিদ্র্য ভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥
দর্পহারী নাম রাখেন অর্জ্জুন সুধীর।
পশুপতি নাম রাখেন গরুড় মহাবীর ॥
যুধিষ্ঠির নাম রাখেন দেব যদুবর।
বিদুর রাখিলেন নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥
বাসুকি রাখিলেন নাম দেব সৃষ্টিস্থিতি।
ধ্রুবলোকে নাম হৈল ধ্রুবের সারথী ॥
নারদ রাখিলেন নাম ভক্তপ্রাণধন।
ভীষ্মদেব নাম রাখেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
সত্যভামা নাম রাখেন সত্যের সারথী।
জাম্ববতী নাম রাখেন দেব যোদ্ধাপতি ॥
বিশ্বামিত্র রাখেন নাম সংসারের সার।
অহল্যা রাখিলেন নাম পাষাণ উদ্ধার ॥
ভৃগুমুনি নাম রাখেন জগতের হরি।
পঞ্চমুখে রামনাম জপেন ত্রিপুরারী ॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখেন বলি সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিলেন নাম নৃসিংহমুরারি ॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ॥
স্বরূপে সভার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি ॥
রসময় রসিকনাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥

কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু দেন উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ, গো-কোটি কর দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন॥
কৃষ্ণনাম জপ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাহি যম আছে পিছে॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে কৃষ্ণে বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর করি উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলেন রক্ষা দেবনারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলেন বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তর শতনাম যে করে কীর্ত্তন।
অনায়াসে পায় সে রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংসধ্বংশ লঙ্কায় রাবণ॥

বকাসুর বধ কারী কালিয়-দমন।
দ্বিজ হরিদাসে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

এই অনন্ত নাম, মুখ্য গৌণভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণ হরি গোবিন্দ প্রভৃতি মুখ্য নাম। আর স্রষ্টা, পাতা, পরমাত্মা প্রভৃতি গৌণনাম। আবার শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ।
তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয় ॥"

সুতরাং শ্রুতির প্রতি অক্ষরই সেই অক্ষর পুরুষের নাম। আবার স্থানান্তরে দেখি—

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদো সামবেদোপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥"

হরি এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণে ঋগ্বেদাদি চতুর্বেদাধ্যয়নের ফল লব্ধ হয়। হরি নামোচ্চারণে যে সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব অধিগত হয়, তাহার প্রমাণ শ্রীপ্রহ্লাদের চরিত্র সুতরাং শ্রীভগবান যে নিজ নামে সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্র বলেন "নাম চিন্তামণি।" চিন্তামণি যেমন অচিরেই চিন্তিত পদার্থ প্রদান করে, এই অচিন্ত্য-নাম-চিন্তামণি তেমনি চিন্তিতাচিন্তিত সর্ব্বতত্ত্ব প্রদানে সমর্থ।

কেবল নাম করা চাই। কিন্তু সেই নাম করাই ভার। শুনিয়াছিলাম একবার পুত্র মরণোন্মুখ পিতাকে বলিলেন "বাবা, হরে রাম বল।" বাবা বলিলেন "ওরে অত কথা বল্‌তে পার্‌বো না।" আমরা ও তেমনি সকল কথাই বলিতে পারি, কিন্তু গাধা যেমন ভাতের কাটির ভারে শুইয়া পড়ে, তেমনি অতি ক্ষুদ্রতম গুরুদত্ত বীজটি জপ করাই যত ভার বোঝা মনে করিয়া থাকি। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ন দেশ-নিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥"

(শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

যেমন তেমন করিয়া যখন তখন নাম করিলেও ক্রমে শুদ্ধ নামের উদয় হয়। কিন্তু "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" বলাও ঘটে কৈ? তার পর দুর্দ্দৈব। এখানে দুর্দ্দৈব শব্দে নামাপরাধ অর্থ করিয়া কোনও মহাজন বলিয়াছেন নামাপরাধ পরিহার পূর্ব্বক নাম না করিলে নামে রুচি হয় না। সুতরাং এস্থলে নামাপরাধ কয়টির উল্লেখ করা যাইতেছে।

"সতাং নিন্দা ১ নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতি জাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং ২ পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকর।
গুরোরবজ্ঞা ৩ শ্রুতিমাত্রনিন্দনং ৪
তথার্থবাদো হরিনাম্নিকল্পনম্ ৫
নাম্নোবলাৎ যস্য হি পাপ বুদ্ধিঃ ৬
ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥
ধর্ম্মব্রত ত্যাগহুতাদি কর্ম্ম
শুভক্রিয়াসাম্য-৭-মপি প্রমাদঃ ৮।
অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ স নামাপরাধঃ ৯ ॥
শ্রুত্বাপি নাম মাহাত্ম্যং য প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ১০ ॥

নামাপরাধ দশবিধ, তন্মধ্যে সাধু নিন্দা প্রধান—

"সাধু নিন্দা প্রথমাপরাধ বলি জানি।
এই অপরাধে জীবের হয় সর্ব্ব হানি ॥"

শ্রীহরিনামচিন্তামণি।

এই দুই বৃদ্ধোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে "ভাবলগ্নং হোরালগ্নং চ জন্মলগ্নাদ্ গণনীয়ং। হোরালগ্নানয়নে জন্মলগ্নে বিষমে সতি সূর্য্যরাশিতো সমে জন্মলগ্নাদ্ গণনীয়মিতি কারিকাতো নায়াতীতি।" কিন্তু এতদ্ বাক্য যে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য পারাশরী গ্রন্থোদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত কারিকা বাক্যই তাহার প্রমাণ হইলেও আয়ুর্বিচারে স্থানবিশেষে তাহার সার্থকতা দেখা গিয়াছে।

গুলিক লগ্নম্।

গুলিক শনির পুত্র এবং তজ্জন্য তাহাকে মন্দাত্মজ বা মান্দি কহে। রাশিচক্রে এই গুলিকের অবস্থিতি স্থানই গুলিকলগ্ন। গুলিকলগ্ন নির্ণয় করিবার নিয়ম পারাশরীহোরায় এইরূপ লিখিত আছে।

"রবিবারাদি শন্যন্তং গুলিকাদি নিরূপ্যতে।
দিবসান্ অষ্টধা কৃত্বা বারেশাদ্ গণয়েৎ ক্রমাৎ॥
অষ্টমাংশো নিরীশঃ স্যাৎ শন্যংশো গুলিকঃ স্মৃতঃ।
রাত্রিরপ্যষ্টধা ভক্ত্বা বারেশাৎ পঞ্চমাদিতঃ॥
গণয়েদষ্টমঃ খণ্ডো নিষ্পতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শন্যংশো গুলিকঃ প্রোক্তো গুর্ব্বংশো যমঘণ্টকঃ॥
ভৌমাংশো মৃত্যুরাদিষ্টো রব্যংশঃ কালসংজ্ঞকঃ।
সৌম্যাংশোঽর্দ্ধপ্রহরকঃ স্পষ্টকর্ম্মপ্রদেশকঃ॥"

রবি প্রভৃতি সপ্তবার হইতেই গুলিকের নিরূপণ হইয়া থাকে। দিবসে গুলিক-স্ফুট বাহির করিতে হইলে, দিবামানকে এবং রাত্রিতে গুলিক-স্ফুট স্থির করিতে হইলে রাত্রিমানকে অষ্টধা বিভক্ত করিবে। দিবসে তদ্ বারধিপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বারাধিপতি ক্রমে পর পর সপ্তগ্রহ সপ্তযামার্দ্ধের অধিপতি হইবেন। অষ্টম যামার্দ্ধের কোন অধিপতি নাই। রাত্রিতেও অষ্টম যামার্দ্ধ নিরীশ্বর; কিন্তু দিবসের ন্যায় তদ্বারপতি ক্রমে গ্রহগণ সপ্ত যামার্দ্ধের অধিপতি না হইয়া তৎপঞ্চম বারপতি হইতে যথাক্রমে যামার্দ্ধ সপ্তকের অধিপতি জ্ঞাতব্য।

যথা রবিবারে দিবসে প্রথম যামার্দ্ধপতি রবি এবং রাত্রিতে প্রথম যামার্দ্ধপতি বারপতিক্রমে রবির পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতি। অতএব রবিবারে দিবসে রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত এবং রাত্রিতে বৃহস্পতি হইতে বুধপর্য্যন্ত সপ্তগ্রহ যথাক্রমে সপ্ত যামার্দ্ধের অধিপতি। সোমবারে ঐ রূপ দিবসে চন্দ্র হইতে এবং রাত্রিতে শুক্র হইতে যামার্দ্ধপতি গণনা করিতে হয়। রবির যামার্দ্ধকে কাল, মঙ্গলের যামার্দ্ধকে মৃত্যু, বুধের যামার্দ্ধকে অর্দ্ধপ্রহরক, বৃহস্পতির যামার্দ্ধকে যমঘণ্টক এবং শনির যামার্দ্ধকে গুলিক কহা যায়। দিবা ও রাত্রিভেদে যথাক্রমে রবিবারে ৭ম ও ৩য়, সোমবারে ৬ষ্ঠ ও ২য়, মঙ্গল বারে ৫ম ও ১ম, বুধবারে ৪র্থ ও ৭ম, শুক্রবারে ২য় ও ৫ম, এবং শনি বারে ১ম ও ৪র্থ গুলিক যামার্দ্ধ। দিবা ও রাত্রিভেদে যামার্দ্ধ

দণ্ডাদিকে কথিত মত যামার্দ্ধ সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলেই গুলিকদণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সূর্য্যোদয় হইতে যত দণ্ডাদিতে গুলিক যামার্দ্ধ শেষ হইবে সেই দণ্ডাদিকে ইষ্টকাল মনে করিয়া লগ্নস্ফুট বাহির করিলেই গুলিকলগ্ন হইল।

বর্ণদ রাশ্যাদি।

এক্ষণে বর্ণদ রাশ্যাদির বিষয় বলা আবশ্যক। জন্মলগ্ন এবং হোরালগ্নের যোগে বর্ণদ রাশির এবং ভাবলগ্ন ও গুলিকলগ্নের যোগে বর্ণদ-ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এতদুভয়ের সমাধান একই প্রকার। বৃদ্ধকারিকায় লিখিত আছে যে—

"ওজলগ্ন-প্রসূতানাং মেষাদের্গণয়েৎ ক্রমাৎ।
যুগ্মলগ্ন-প্রসূতানাং মীনাদেরপসব্যতঃ॥
মেষমীনাদিতো জন্মলগ্নান্তং গণয়েৎ সুধীঃ।
তথৈব হোরালগ্নান্তং গণয়িত্বা ততঃ পরম্॥
পুংস্ত্রেন স্ত্রীতয়া বৈতে স্বজাতীয়ে উভে যদি।
তর্হি সংখ্যে যোজয়িত বৈজাত্যে তু বিশোধয়েৎ॥
মেষ-মীনাদিতঃ পশ্চাৎ যো রাশিঃ স তু বর্ণদঃ।
এবং দ্বাদশভাবানাং বর্ণদং লগ্নমানয়েৎ॥"

এই গ্রন্থে রাশিদিগের ওজযুগ্মত্বানুসারে ক্রম ও ব্যুৎক্রম গণনা চিরপ্রসিদ্ধ তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে এ স্থলেও তাহার কোন বৈপরীত্য নাই। জন্ম লগ্নাদি ওজ-রাশিগত হইলে মেষাদি ক্রম গণনা অর্থাৎ তাহাদের স্ফুটাংশাদিই গ্রহণ করিবে কিন্তু যুগ্ম-রাশিগত হইলে মীনাদি ব্যুৎক্রম গণনায় তাহাদের দূরত্ব রাশ্যাদি নির্ণেয় অর্থাৎ তাহাদের স্ফুট রাশ্যাদি দ্বাদশ রাশি হইতে বিয়োগ করিলে যে রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই গ্রাহ্য। এক্ষণে লগ্ন এবং হোরা লগ্ন উভয়ই স্বজাতীয় অর্থাৎ ওজ বা সম রাশি গত হইলে পরস্পর যোগ এবং একটি ওজ অপরটি সম রাশি গত হইলে অন্তর অর্থাৎ অধিকাঙ্ক হইতে স্বল্পাঙ্ক বিয়োগ করিবে। এই যোগ বা বিয়োগান্তে যে ফল রাশ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ওজ রাশি সম্বন্ধীয় হইলে তাহাই বর্ণদ লগ্ন রাশি। কিন্তু সমরাশি সম্বন্ধীয় থাকিলে ব্যুৎক্রম গণনা জন্য চক্র শুদ্ধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই গ্রাহ্য।

বর্ণদ লগ্নাদি আনয়ন করিতে পূজ্যপাদ ঋষিগণ কেন যে রাশিদিগের ওজ যুগ্মত্বভেদে ক্রমোৎক্রম গণনা এবং যোগ বিয়োগাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা বুঝা সুকঠিন। গ্রহভাবাদির স্ফুট রাশ্যাদি সর্ব্বত্রই মেষাদি ক্রম গণনাতেই ব্যবহৃত হয়। অঙ্কশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে লগ্নস্ফুট এবং হোরা-লগ্ন-স্ফুটের যোগ সমষ্টিই বর্ণদ রাশি। ওজ-যুগ্মত্বাদি ভেদ বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। তবে যোগফলের রাশি সংখ্যা দ্বাদশাধিক হইলে চক্রশুদ্ধির

আবশ্যক তাহা বলা নিস্প্রয়োজন মাত্র। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে দুইটি বিজাতীয় লগ্ন হোরালগ্ন হইতে বর্ণদ রাশি নির্ণয়ের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যথা—

জন্মলগ্নস্ফুট ৪।১০।১৫ এবং হোরালগ্নস্ফুট ৯।১৫।৪২ এস্থলে ওজলগ্ন সুতরাং ৪।১০।১৫ গ্রাহ্য। সমরাশি গত হোরালগ্ন স্ফুট মীনাদি গণনা অর্থাৎ চক্রশুদ্ধ করিলে ২।১৪।১৫ হয়। লগ্নদ্বয়ের বিজাতীয়ত্ব হেতু ৪।১০।১৫ হইতে ২।১৪।১৫ বিয়োগ করিলে ১।২৬।০ অবশিষ্ট থাকে। এই ১।২৬।০ ওজ রাশি সম্বন্ধীয় সুতরাং উহাই বর্ণদ লগ্ন। সমরাশি গতে হোরা লগ্নের এই ব্যুৎক্রম গণনা পরিত্যাগ করিয়া জন্মলগ্ন এবং হোরা লগ্ন পরস্পর যোগ করিলেই উক্ত ১।২৬।০ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়োদাহরণে জন্মলগ্ন স্ফুট ৬।১২।২৪ এবং হোরালগ্নস্ফুট ৩।২০।২২। সমরাশি গত হোরা লগ্ন চক্রশুদ্ধ করিলে ৮।৯।৩৮ হয়। ৮।৯।৩৮ হইতে ৬।১২।২৪ বিয়োগ করিলে সমরাশি সম্বন্ধীয় ১।২৭।১৪ অবশিষ্ট থাকে। উক্ত ১।২৭।১৪ কে চক্রশুদ্ধ করিলে ল ১০।২।৪৬ বর্ণদ রাশি হইল। লগ্নদ্বয়ের সমষ্টীও তাই।

জন্মলগ্ন অর্থাৎ তনুভাব হইতে যে রূপে বর্ণদ রাশি নির্ণয় করা হইল ধনাদি অপর একাদশ ভাবেরও তদ্রূপ বর্ণদ রাশি নির্ণেয়। এই গ্রন্থোক্ত সমস্ত বিচারই রাশিগত সুতরাং দশমাদি স্ফুট সাধন না করিয়া তনুভাবে এক এক রাশি যোগ করিলেই যথাক্রমে ধনাদি অপর একাদশ ভাব স্ফুট প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। হোরা লগ্নেও উক্ত প্রকারে এক এক রাশি যোগ করিলে হোরালগ্ন হইতে যথাক্রমে দ্বদশ ভাবের উৎপত্তি হইল। তৎপরে পূর্ব্ব প্রক্রিয়া মত জন্ম ধনাদি একাদশ ভাবের সহিত হোরা ধনাদি একাদশ ভাবের যথাক্রমে যোগ করিলেই জন্ম লগ্নাদি দ্বাদশ রাশির বর্ণদ রাশি নির্দ্ধারিত হইল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত প্রথম দৃষ্টান্তে ১।২৬।০ তনু বর্ণদ হইয়াছে। উক্ত তনু বর্ণদ ঘটিত জন্ম লগ্নে এক রাশি এবং হোরা লগ্নে এক রাশি অর্থাৎ তনু বর্ণদে দুই রাশি যোগ করিলেই ৩।২৬।০ ধনবর্ণদ হইল। অতএব-তনু বর্ণদ হইতে দুই দুই রাশি যোগ করিলেই ধন সহজাদি বর্ণদ স্ফুট হইয়া শত্রু বর্ণদে রাশি চক্রের শেষ এবং পুনর্ব্বার তনু বর্ণদে জায়া স্ফুট আরম্ভ হইয়া শত্রু বর্ণদে ব্যয় রাশির পরিসমাপ্তি হইবে। সুতরাং পরস্পর সপ্তম বর্ণদ রাশি স্ফুট সমান।

ভাব বর্ণদ রাশ্যাদি আনয়নের প্রক্রিয়া সমস্তই উক্তরূপ তবে ভাব লগ্নকে জন্মলগ্ন এবং গুলিক স্ফুটকে হোরালগ্ন কল্পনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে এই মাত্র বিশেষ। যথা ভাব লগ্ন স্ফুট ৭।৬।১৩ গুলিক স্ফুট ১০।১৪।২২। স্ফুট দ্বয় যোগ করিলেই ৫।২১।৪৫ বর্ণদ ভাবলগ্ন স্ফুট হইল। ইহার রাশ্যঙ্ক সহ দুই দুই রাশি যোগ করিলেই ধনাদি অপর বর্ণদ ভাব স্ফুট নিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

এক্ষণে রাশি এবং ভাব বর্ণদ রাশ্যাদি আনয়নের প্রক্রিয়া বিলিখিত হইল। পূর্ব্বে যেমন নাথান্তাঃ সমাঃ সূত্র ধরিয়া চর দশা আনয়ন করা হইয়াছে তদ্রূপ পদান্তাঃ সমাঃ সূত্রে পদ দশা, বর্ণদান্তাঃ সমাঃ সূত্র ধরিয়া বর্ণদ দশা প্রভৃতি আনয়ন করা গিয়া থাকে। উপদেশ সূত্র মধ্যে

উক্ত পদদশাদির কোন উল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থান্তরাদিতে প্রাচীনগণ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধকারিকায় লিখিত আছে—

"যৎ সংখ্যো বর্ণদো লগ্নাৎ তত্তৎসংখ্যা ক্রমেণ তু।
ক্রমব্যুৎক্রমতো দেন দশা স্যাৎ পুরুষস্ত্রিয়োঃ॥"

অর্থাৎ তনু ধন প্রভৃতি কোন লগ্ন অর্থাৎ রাশি হইতে ক্রমোৎক্রম গণনায় তৎতৎ বর্ণদ স্থান যত রাশ্যাদি দূরস্থ, তত বর্ষাদি—তৎতৎ রাশির বর্ণদ দশা হইবে। এই বর্ণদাদি দশা পাতের প্রক্রিয়া সমস্তই চর দশার ন্যায়, তবে রাশিদিগের ওজ যুগ্ম পদানুসারে ক্রমোৎক্রম গণনা না হইয়া সামান্য নিয়মানুসারে ওজ রাশিতে ক্রম গণনা এবং সম রাশিতে ব্যুৎক্রম গণনা হইবে এই মাত্র প্রভেদ। কুম্ভ ও বৃশ্চিক রাশির দ্বিনাথত্বও চর দশা ভিন্ন অন্য কোন দশায় গ্রাহ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে লগ্ন ৪।১০।১৫ এবং বর্ণদলগ্ন ১।২৬।০ লিখিত আছে। লগ্ন ওজ রাশি গত সুতরাং ক্রমগণনায় ১।২৬।০ হইতে ৪।১০।১৫ বিয়োগ করিলে ৯।১৫।৪৫ অবশিষ্ট থাকে। উক্ত রাশ্যাদিকে বর্ষাদিতে পরিণত করিলে ৯।৬।৯ হইল। ইহাই চরদশানয়নোক্ত দ্বিতীয় মতানুগ লগ্ন রাশির সাবয়ব বর্ণদ দশা বর্ষাদি। প্রথম মতানুসারে বর্ণদ রাশি ১ হইতে লগ্ন রাশি ৪ বিয়োগ করিলে যুক্তিমত স্থূল বর্ণদ দশা ৯ বর্ষ মাত্র।

যদি দ্বাদশ রাশিরই ক্রম গণনা হইত তাহা হইলে বর্ণদ লগ্ন দশায় এক এক বর্ষ যোগ করিলেই ধনাদি বর্ণদ দশা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু সম রাশির বিপরীত গণনা—বর্ণদ হইতে লগ্ন বাদ না দিয়া লগ্ন হইতে বর্ণদ বাদ দিতে হইবে। অথবা ক্রম গণনায় দশা বর্ষাদি আনয়ন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ হইতে বিয়োগ করিলেই সম রাশির দশা বর্ষাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যথা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে তনুভাব ৪।১০।১৫ এবং তাহার বর্ণদ রাশ্যাদি ১।২৬।০ ছিল। সুতরাং উভয়ে এক এক রাশি যোগ করিলেই ধনভাব ৫।১০।১৫ এবং ধন বর্ণদ ৩।২৬।০ হইল ধন ভাব সম রাশি গত থাকায় তাহা হইতে তাহার বর্ণদ ৩।২৬।০ বিয়োগ করিলে ১।১৪।১৫ অর্থাৎ সাবয়ব বর্ষাদি ১।৫।২১ কিম্বা স্থূল গণনায় ২ বৎসর হয়। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত লগ্ন বর্ণদ দশা সাবয়ব ৯।৬।৯ কিম্বা স্থূল ৯ বৎসর স্থিরীকৃত আছে। উহাতে এক এক বর্ষ যোগ করিলে ক্রম গণনায় ধন বর্ণদ দশা যথাক্রমে ১০।৬।৯ বা ১০ বৎসর হইল। দ্বাদশ হইতে উক্ত বর্ষাদি বিয়োগ করিলে ধন বর্ণদ দশা সাবয়ব ১।৫।২১ বা স্থূল ২ বর্ষ স্থিরীকৃত হইল। এই রূপ সর্ব্বত্র।

এই বর্ণদ রাশির ফল সম্বন্ধে প্রাচীন কারিকার লিখিত আছে যে—

"পাপদৃষ্টিঃ পাপযোগো বর্ণদস্য ত্রিকোণকে।
যদি স্যাৎ তর্হি তদ্রাশি পর্য্যন্তং তস্য জীবনং॥
রুদ্রশূলে তথৈবায়ুর্মরণাদি নিরূপ্যতে।
বর্ণদাৎ সপ্তমাদ্ রাশেঃ কলত্রাদি বিচিন্তয়েৎ॥

একাদশাদগ্রজং তু তৃতীয়াত্তু যবীয়সং।
পঞ্চমে তনুজং বিন্দ্যান্ মাতরং তুর্য্যপঞ্চমে ॥
পিতুস্তু নবমান্মাতুঃ পঞ্চমাদ্ বর্ণদস্য তু।
শূল রাশি দশায়াং বৈ প্রবলায়ামরিষ্টকং ॥"

বর্ণদ লগ্নের ত্রিকোণে অর্থাৎ পঞ্চম বা নবম স্থানে পাপ গ্রহের যোগ দৃষ্টি থাকিলে সেই রাশির দশাকাল পর্য্যন্ত তজ্জাতকের জীবিত কাল নিরূপণ করিবে। রুদ্র শূল দশার বিচার করিয়াও এই বর্ণদ লগ্ন হইতে মরণাদি নিরূপিত হইয়া থাকে। বর্ণদ লগ্নের সপ্তম স্থান হইতে পত্নীর, একাদশ স্থান হইতে অগ্রজাত ভ্রাতার তৃতীয় স্থান হইতে অব্যবহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার, পঞ্চম স্থান হইতে পুত্রের এবং চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান হইতে জননীর বিষয় চিন্তা করা যায়। বর্ণদ লগ্নের পঞ্চম এবং নবম স্থান হইতে প্রবল শূল রাশি দশায়, যথাক্রমে মাতা ও পিতার অরিষ্ট চিন্তা করিবে। ৩১।

ন গ্রহাঃ ॥ ৩২ ॥

(গ্রহাঃ) সবর্ণা একাদিসংখ্যা বোধকাক্ষরগম্যা বর্ণদসহিতা বর্ণদরাশি-যুক্তা বা (ন) ভবন্তি। ৩২ ॥

এই গ্রন্থে গ্রহগণ কোথাও সংখ্যা বোধক শব্দে লিখিত হয় নাই, তাহাদের নাম সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহাদের কোন বর্ণদ রাশ্যাদিও নাই। ৩২ ॥

এই সূত্রে শেষ সিদ্ধান্ত হইল যে গ্রন্থ মধ্যে রাশি ও ভাবের নাম সর্ব্বত্রই কটপয়াদি শব্দ সঙ্কেতে লিখিত হইয়াছে কোথাও তাহার অন্যথা হয় নাই। গ্রহ সম্বন্ধে কিন্তু তাহার বিপরীত অর্থাৎ প্রচলিত শব্দ ভিন্ন তাহাদের নাম কুত্রাপি শব্দ সঙ্কেতে প্রকাশিত হয় ন্যই! ৩২ ॥

যাবদ্বিবেকমাবৃত্তির্ভানাং ॥ ৩৩ ॥

(ভানাং) দ্বাদশরাশীনাং (যাবদ্ বিবেকং) চতুশ্চত্বারিংশদধিকশত-সংখ্যাপর্য্যন্তং (আবৃত্তির্ভ্রমণঃ অন্তর্দ্দশা বা ভবতি ॥ ৩ ॥

বিবেক শব্দে (৪৪১ = ১৪৪ এক শত চুয়াল্লিশ) প্রত্যেক রাশি দশায় দ্বাদশ অন্তর্দ্দশা ধরিয়া দ্বাদশ রাশিতে সর্ব্ব সমেত একশত চুয়াল্লিশটি অন্তর্দ্দশা হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বে চর দশা এবং তদানুসঙ্গিক পদাদি দশার উল্লেখান্তে বর্ত্তমান সূত্রে তাহাদের অন্তর্দ্দশা সূচিত হইয়াছে। চর স্থিরাদি ভিন্ন ভিন্ন দশাগত যে রাশির যত দশামান, তাহাকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তত্তৎ রাশির দ্বাদশ অন্তর্দ্দশা এবং এইরূপে দ্বাদশ রাশিতে এক শত

চুয়াল্লিশটি অন্তর্দ্দশা হইয়া থাকে। নাক্ষত্রিকাদি দশায় যেমন পর পর দশামানের অনুপাতে গ্রহগণের অন্তর্দ্দশাদি নিরূপিত হইয়া থাকে, রাশি দশায় সে রূপ নহে। ইহাতে দশামান সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া, পর পর দ্বাদশ রাশির অন্তর্দ্দশা হয়। এক্ষণে কোন রাশি-দশার পর কোন্ রাশির দশা বা অন্তর্দ্দশা হইবে তাহা জানা আবশ্যক। বৃদ্ধ কারিকায় লিখিত আছে—

"কৃত্বার্কধা রাশিদশাং রাশের্ভুক্তিং ক্রমাদ্বদেৎ।
সা পর্য্যায়দশা লগ্নে যুগ্মে তু ব্যুৎক্রমাদ্ বদেৎ॥"

অর্থাৎ চর স্থিরাদি দশা গণনায় যে রাশির যত দশা মান, তাহাকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগ ক্রমগণনায় তদ্রাশি হইতে যথাক্রমে পর পর দ্বাদশ রাশির অন্তর্দ্দশা হইবে। যেমন মেষ রাশির দশ বর্ষ দশামান স্থলে মেষ বৃষাদি ক্রমে দশ মাস করিয়া প্রত্যেক রাশির অন্তর্দ্দশা হইবে। ইহাকেই পর্য্যায় বা অন্তর্দ্দশা কহে। পরন্তু লগ্ন বিষম রাশি গত হইলেই উক্ত নিয়ম—সম রাশি গত হইলে ক্রম গণনা না হইয়া ব্যুৎক্রম গণনা হইবে, যেমন কর্কট রাশির ৮ বৎসর দশা হইলে কর্কট, মিথুন, বৃষাদি ক্রমে ৮ মাস করিয়া পর পর দ্বাদশ রাশির অন্তর্দ্দশা কাল।

কোন্ রাশির পর কোন্ রাশির দশা বা অন্তর্দ্দশাদি হইবে উক্ত কারিকা বাক্যে তাহা একপ্রকার স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু দশারম্ভ স্থান কোথায়—অর্থাৎ কোন রাশি হইতে প্রথম দশারম্ভ হইবে। সূত্রকার সিদ্ধমন্যৎ বলিয়াই এস্থলে নিস্তব্ধ। পূর্ব্বোক্ত কারিকা বাক্যে লগ্নই দশারম্ভ স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—

যত্তু উপস্থিততয়া দশারম্ভাবধিঃ স্ব স্ব লগ্নমেবেতি তৎ পন্থৈরুক্তং তন্ন,
হোরালগ্নভয়োর্ন্যেয়াঙ্গতুর্ব্বলাদ্ বর্ণদা দশেতি কারিকোক্তত্বাৎ॥

অর্থাৎ লগ্ন এবং হোরালগ্ন এই উভয় রাশির মধ্যে বলবান্ রাশিই বর্ণদ দশার আরম্ভ স্থান এই কারিকা বাক্যানুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্ব স্ব লগ্ন হইতেই যে সর্ব্বত্র দশারম্ভ হইবে এই পন্থোক্তি সমীচীন নহে। কিন্তু এ কথা লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে পন্থবাক্য দশারম্ভ সম্বন্ধে সামান্য বিধি এবং কারিকোক্তি বর্ণদ দশা সম্বন্ধে তাহার প্রতিপ্রসব মাত্র। সুবোধিনী নামক টীকা ছাত্র শিক্ষা সম্বন্ধে অপরিস্ফুট সুতরাং অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই অবশ্য সূত্রপ্রকাশিকার সৃষ্টি। প্রকাশিকাকার এ স্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তদ্‌গ্রন্থ হইতে—যৎতু ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

"তন্ন সমীচীনং। যতঃ কেবলং বর্ষানয়ন একসা রীতিঃ।
তয়া রীত্যা যদ্ বর্ষাদি আয়াতি, সা লগ্নস্য দশা,

ধনভাবস্য দশা নতু হোরালগ্নাদীনাং।
তেন পন্থোক্তমেব সমীচীনং ন নীলকণ্ঠোক্তং।"

অপরের ভ্রম প্রদর্শন করিতে গিয়া প্রকাশিকাকার যে নিজেই ঘোর ভ্রমান্ধকারে পতিত হইয়াছেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার কথা যেন কথার মধ্যেই গণ্য নহে। তিনি বলিয়াছেন যে লগ্ন এবং হোরালগ্নের মধ্যে বল বিচার কেবল দশা বর্ষাদি আনয়নের জন্য। তদনুসারে যে বর্ষাদি আনীত হইবে তাহাই লগ্নাদি ভাবের দশা হোরা লগ্নাদির নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে লগ্নাদি কোন রাশি হইতে তাহার বর্ণদ রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিলে তত্তৎ রাশির বর্ণদ দশা নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাতে তো বলাবলের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। লগ্ন এবং হোরালগ্নের মধ্যে বলবৎ হোরালগ্ন হইতে অনীত দশা কখনই লগ্ন রাশির দশা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এবং তাহা হইলে লগ্ন রাশির দশাই বা কোন্ রাশির ভোগে লাগিবে। ফল কথা উক্ত স্থানে হোরা লগ্ন হইতেই বর্ণদ দশার আরম্ভ হইবে লগ্ন হইতে নহে ইহাই কারিকোক্ত উক্ত বচনের প্রধান তাৎপর্য্য। তিনি প্রকারে সর্ব্বত্রই দশারম্ভ স্থান লগ্ন রাশি এই পন্থোক্ত মত স্বীকার করিয়াও চররাশির দশারম্ভ স্থান কোথায়—স্পষ্টতঃ কিছুই তাহা প্রকাশ করেন নাই। সুবোধিনীকার এতৎসম্বন্ধে "দশারম্ভাবধেরন্যকথ্যাৎ লগ্নমেবাত্র গ্রাহ্যং" বলিয়া লগ্ন রাশি হইতেই দশারম্ভের উপদেশ দিয়াছেন।

কৃত্বার্কধেতি পূর্ব্বোক্ত কারিকাবাক্যের পর টীকাকারগণ "লগ্নং যুগ্মং যদা তর্হি সম্মুখং তস্য চাদিভং" এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া তদ্ ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে, লগ্ন যুগ্ম রাশি গত হইলে (তস্য চাদিভং) তাহার আদি অর্থাৎ পূর্ব্বোদিত রাশি (সম্মুখং) সম্মুখ শব্দে বাচ্য, যেমন বৃষের মেষ, মীনের কুম্ভ সম্মুখ রাশি। কিন্তু কোন রাশি কাহার সম্মুখ বা কাহার কে বিমুখ তাহা তো এস্থলে বলিবার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। বরং (তস্য সম্মুখং) সপ্তমং স্থানং দশারম্ভাবধে (শ্চাদিভং) অর্থ করিলে সকল গোলই চুকিয়া যায়। বাস্তবিক যুগ্ম রাশির সপ্তম স্থানকেই লগ্ন কল্পনা করিয়া তথা হইতে দশারম্ভ করাই শাস্ত্র সঙ্গত। বৃদ্ধ কারিকা বলিতেছেন—

"ওজে লগ্নে দশারম্ভাবধেঃ স্থানং তদুচ্যতে।
লগ্নং যুগ্মং যদা তর্হি সম্মুখং ত্বস্য চাদিভং॥"

পুনশ্চ—

"ওজে লগ্নে তদেব স্যাৎ যুগ্মে তৎ সপ্তমং ভবেৎ।
দশৌজে ক্রমতো জ্ঞেয়া যুগ্মে ব্যুৎক্রমতো মতা॥"

লগ্ন ওজ রাশি হইলে তদ্রাশি এবং যুগ্মলগ্নে তাহার সম্মুখ অর্থাৎ সপ্তম রাশিই দশারম্ভের আদি স্থান বলিয়া গ্রাহ্য। ওজ লগ্নে ক্রমগণনায় এবং যুগ্মে ব্যুৎক্রম গণনায় দশাপাত শাস্ত্র সম্মত। উক্ত বচনদ্বয় কোন্ রাশি দশায় প্রয়োজ্য তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও উহাই

যে দশাপাত প্রণালীর সাধারণ সূত্র তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সুতরাং চরদশায় ওজ লগ্নে লগ্ন এবং যুগ্মলগ্নে তাহার সপ্তম রাশি দশারম্ভ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল কিন্তু ক্রমোৎক্রম গণনা সম্বন্ধে কিছু বিশেযত্ব আছে। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন—পঞ্চমে পদক্রমাৎ প্রাক্ প্রত্যক্ত্বং অর্থাৎ লগ্ন বা দশারম্ভ স্থান হইতে নবম রাশি ওজ পদান্তর্গত হইলে ক্রমগণনা এবং যুগ্মপদান্তর্গত হইলে ব্যুৎক্রম গণনায় দশাপাত আবশ্যক। এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে এই নবম রাশি সম্বন্ধে যুগ্ম লগ্নে ব্যুৎক্রম গণনার কোন আবশ্যকতা নাই, সর্ব্বত্রই ক্রমগণনায় নবম রাশি নির্ণেয়। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি সূত্রের ব্যাখ্যা মধ্যে যে তনু ধনাদি ভাব গণনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে এই দশা লিখন প্রণালীই তাহার কারণ। এই গ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলে লগ্ন শব্দে দশারম্ভ স্থানই সূচিত হইয়াছে। জন্মলগ্ন হইতে দ্বাদশরাশি যেরূপ দ্বাদশভাবের পরিচায়ক, রাশি দশায় দশারম্ভ স্থান হইতেও পর পর দশা তনুধনাদি দ্বাদশ ভাব-দশা নামে পরিচিত, নহিলে স্থানাদি গণনায় কোথাও ব্যুৎক্রম গণনা গ্রাহ্য নহে। এক্ষণে স্থির হইল যে চর দশায় ওজ লগ্নে তদ্রাশি এবং যুগ্মলগ্নে তাহার সপ্তম রাশি হইতে দশারম্ভ এবং সিংহ কুম্ভাদি তিন তিন লগ্নে ক্রম তথা বৃষ বৃশ্চিকাদি তিন তিন লগ্নে ব্যুৎক্রম রীতিতে দশাপাত কার্য্য। এই অন্তর্দ্দশা বিভাগ সম্বন্ধে বৃদ্ধ কারিকা পুনর্ব্বার বলিয়াছেন।—

"একৈকভাবস্যৈকৈকং বর্ষং লগ্নাদি কল্পয়েৎ।
এবমন্তর্দ্দশাদীনি কৃত্বা তেন ফলং বদেৎ॥"

লগ্নাদি প্রতি ভাবে এক এক বৎসর অন্তর্দ্দশা কল্পনা করিয়া তদনুসারে ফল বিচার করিবে। ইহাতে প্রকারান্তরে দ্বাদশাংশ দশা সূচিত হইল। প্রতি রাশিতে এক এক বৎসর অন্তর্দ্দশা ধরিলে অবশ্য প্রতি রাশির মহা দশা দ্বাদশ বৎসর, অন্তর্দ্দশা এক বৎসর, প্রত্যন্তর্দ্দশা এক মাস, সূক্ষ্ম দশা আড়াই দিন এবং প্রাণ দশা বার দণ্ড ত্রিশ পল হইল। এই দশায় দশারম্ভ এবং তাহার লিখন প্রণালী সাধারণ সূত্রানুসারে ধার্য্য। পদানুসারে ক্রমোৎক্রম গণনার আবশ্যক নাই। এই দশার জন্ম কুণ্ডলী দেখিয়া গোচর ফল বিচারে বিশেষ প্রশস্ত। ৩৩।

হোরাদয়ঃ সিদ্ধাঃ॥ ৩৪॥

(হোরাদয়ঃ) হোরাদ্রেক্কাণাদয় (সিদ্ধা) শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধাঃ গ্রাহ্যাঃ। ৩৪॥

হোরাদৃকাণাদি অন্যান্য বিষয় শাস্ত্রান্তরাদি হইতে গ্রাহ্য॥ ৩৪॥

সূত্রকার তদীয় গ্রন্থ মধ্যে হোরাদি অন্যান্য অনুক্ত বিষয় সকল শাস্ত্রান্তরাদি হইতে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিলেও অনেক সময় স্থল বিশেষে বিলক্ষণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। প্রচলিত শাস্ত্রোক্ত হোরাদি কতিপয় বর্গ কুণ্ডলীর সহিত উপদেশ সূত্রের কোন রূপ সামঞ্জস্য নাই। মতদ্বৈধ স্থলে উপদেশ সূত্র সম্বন্ধে অবশ্য কারিকার মতই গ্রাহ্য। তাহাতে লিখিত আছে—

সা চাহ তাং সখীং বালাং কৃতার্থাস্মি বরাননে।
সংযুক্তামমুনা দৃষ্ট্বা ত্বামহং রূপশালিনীম্ ॥ ৬৫ ॥
তপস্তপ্স্যেঽহমতুলং নির্ব্যলীকেন চেতসা।
তীর্থাম্বুধৃতপাপা চ ভবিত্রী নেদৃশী যথা ॥ ৬৬ ॥
তথাহ রাজপুত্রং সা প্রশ্রয়াবনতা তদা।
গন্তুকামা নিজসখী-স্নেহবিক্লবভাষিণী ॥ ৬৭ ॥

কুণ্ডলোবাচ।

পুম্ভিরপ্যমিতপ্রজ্ঞৈর্নোপদেশো ভবদ্বিধে।
দাতব্যঃ কিমুত স্ত্রীভিরতো নোপদিশামি তে ॥ ৬৮ ॥
কিন্তু স্যাস্তনুমধ্যায়াঃ স্নেহাকৃষ্টেন চেতসা।
ত্বয়া বিশ্রম্ভিতা চাস্মি স্মারয়াম্যরিসূদন ॥ ৬৯ ॥
ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী ॥ ৭০ ॥

কুণ্ডলা বলিলা নিজ সখিরে তখন—
"হইলাম প্রিয়সখি, কৃতার্থা এখন।
যেমন রূপসী-শ্রেষ্ঠা তুমি ধরাতলে,
দিলে বরমাল্য মনোমত পতি-গলে। ৬৫।
মোর ভাগ্যে পুন যাহে না ঘটে এমন,
এই হেতু তপস্যায় করিব গমন।
চিত্ত স্থির করি' আমি পরাৎপর-পদে,
তীর্থসেবা করি' ঘুচাইব এ বিপদে!
সাধিব এমন তপ যাহে পুনরায়
জন্মিয়া বিধবা নাহি হই এ ধরায়।" ৬৬।
যেতে হ'বে চির তরে সখিরে ছাড়িয়া,
এই হেতু চঞ্চল হইল তাঁর হিয়া।
সখির স্নেহের বশে হইয়া কাতরা,
প্রশ্রয়াবনতা বালা চক্ষে বহে ধারা,
বলিলেন পরে রাজপুত্রে সম্বোধিয়া,
"সুখে থাক যুবরাজ সখিরে লইয়া। ৬৭।

প্রজ্ঞাবান পুরুষেও তব সম জনে,
উপদেশ দিতে নারে, জানি আমি মনে।
নারী আমি বুদ্ধি-বল বিন্দুমাত্র নাই,
বলিবারে কোনো কথা হৃদয়ে ডরাই। ৬৮।
উপদেশ বাক্য নয়—সখি-স্নেহ তরে,
উঠি'ছে তরঙ্গ বহু আমার অন্তরে,
বলি সেই সব কথা, বাঞ্ছা হয় মনে,
কিন্তু বাক্য নাহি আসে বলিব কেমনে?
দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে সখি-সম্বোধিয়া,
এই হেতু বলি-বলি করিতেছে হিয়া।
সবি তুমি জান মনে, তবু পুনরায়,
সখি-স্নেহে ক'টি কথা বলি, প্রাণ-চায়। ৬৯।
ভরণীয়া ভামিনী সতত পতি-পাশে,
রক্ষণীয়া সদা সতী পতির আবাসে।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-সিদ্ধি-তরে সুনিশ্চয়
ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী—অন্য কেহ নয়। ৭০।

যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গতম্ ॥ ৭১ ॥
কথং ভার্য্যামৃতে ধর্ম্মমর্থম্বা পুরুষঃ প্রভো।
প্রাপ্নোতি কামমথবা তস্যাং ত্রিতয়মাহিতম্ ॥ ৭২ ॥
তথৈব ভর্ত্তারমৃতে ভার্য্যা ধর্ম্মাদিসাধনে।
ন সমর্থা ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৭৩ ॥
দেবতাপিতৃভৃত্যানামতিথীনাঞ্চ পূজনম্।
ন পুম্ভিঃ শক্যতে কর্ত্তুমৃতে ভার্য্যাং নৃপাত্মজ ॥ ৭৪ ॥
প্রাপ্তোঽপি চার্থো মনুজৈরানীতোঽপি নিজং গৃহম্।
ক্ষয়মেতি বিনা ভার্য্যাং কুভার্য্যাসংশ্রয়েঽপি বা ॥ ৭৫ ॥
কামস্তু তস্য নৈবাস্তি প্রত্যক্ষেণোপলক্ষ্যতে।
দম্পত্যোঃ সহধর্ম্মেণ ত্রয়ীধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৬ ॥
পুত্রাণাং যোনিরন্যা বৈ নান্যতো ভার্য্যয়া বিনা।
পিতৄন্ পুত্রৈস্তথৈবান্নসাধনৈরতিথীন্ নরঃ।
পূজাভিরমরাংস্তদ্বৎ সাধ্বীং ভার্য্যাং নরোঽবতি ॥ ৭৭ ॥

ভার্য্যা-ভর্ত্তা দোঁহে বশ হ'লে পরস্পর
এক হ'য়ে যায় তবে দোঁহার অন্তর।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিন বর্গ তরে
উভয়ে সঙ্গত সদা প্রফুল্ল-অন্তরে। ৭১।
ভার্য্যা বিনা পুরুষের ধর্ম্ম অর্থ আর,
কামনা না হয় পূর্ণ কহিলাম সার। ৭২।
ভর্ত্তা বিনা রমণীর নাহি অন্য বল,
ধর্ম্মাদি সাধনে স্বামী নারীর সম্বল।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ নিশ্চয়
দাম্পত্যের অনুসারী কভু মিথ্যা নয়। ৭৩।
দেবপূজা, পিতৃযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার
ভৃত্যাদি পালন, হেন বহু কার্য্য আর,
পুরুষে একাকী নারে করিতে সাধন,
ভার্য্যার সাহায্য বিনা বিফল-যতন। ৭৪।

বহু কষ্টে করে নরে অর্থের অর্জন,
উপার্জ্জন করি' গৃহে করে আনয়ন;
ভার্য্যা না থাকিলে সবি বিফল নিশ্চয়,
কিম্বা সে কুভার্য্যা হ'লে বৃথা হয় ক্ষয়। ৭৫।
ভার্য্যা বিনা কামনার না হয় পূরণ,
এ কথা নিশ্চয় করি' জানে জগ-জন।
তাই বলি, একমাত্র দাম্পত্যের ফলে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন বর্গ ফলে।
বেদের বিহিত ধর্ম্ম ভার্য্যা বিনা ভবে
কেমনে হইবে লাভ বল দেখি তবে? ৭৬।
সাধ্বী সতী পতিরতা পত্নী যা'র হয়,
তা'র ফলে, সবি ফলে, নাহিক সংশয়।
সুপুত্র জনমি' করে পিতৃকুল-ত্রাণ,
অন্নদানে অতিথির করয়ে সম্মান।

স্ত্রিয়াশ্চাপি বিনা ভর্ত্তা ধর্ম্মকামার্থসন্ততিঃ।
নৈব তস্মাৎ ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যমধিগচ্ছতি ॥ ৭৮ ॥
এতন্ময়োক্তং যুবয়োর্গচ্ছামি চ যথেপ্সিতম্।
বর্দ্ধত্বমনয়া সার্দ্ধং ধন-পুত্র-সুখায়ুষা ॥ ৭৯ ॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

ইত্যুক্ত্বা সা পরিষ্বজ্য স্বসখীং তং নমস্য চ।
জগাম দিব্যয়া গত্যা যথাভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥ ৮০ ॥
সোঽপি শত্রুজিতঃ পুত্রস্তামারোপ্য তুরঙ্গমম্।
নির্গন্তুকামঃ পাতালাৎ বিজ্ঞাতো দনুসম্ভবৈঃ ॥ ৮১ ॥
ততস্তৈঃ সহসোৎক্রুষ্টং হ্রিয়তে হ্রিয়তেঽতি বৈ।
কন্যারত্নং যদানীতং দিবঃ পাতালকেতুনা ॥ ৮২ ॥
ততঃ পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-গদা-শূল-শরায়ুধম্।
দানবানাং বলং প্রাপ্তং সহ পাতালকেতুনা ॥ ৮৩ ॥

পূজা করি' দেবতার, তাঁহাদের বরে
অশেষ মঙ্গল আনি' দেয় নিজ ঘরে। ৭৭।
নারী বিনা পুরুষের গার্হস্থ্য বিফল,
নাহি ফলে ধর্ম্মার্থাদি ত্রিবর্গের ফল।
এই হেতু নরগণ এই ত ধরায়
দাম্পত্য-আশ্রয় করি' সর্ব্ব-ফল পায়। ৭৮।
ছিল যাহা বলিবার বলিনু সকল,
এবে যাই ভুঞ্জিবারে নিজ ভাগ্য-ফল,
থাক সুখে দুই জনে এই ত ধরায়,
ইপ্সিত সুফল লাভ করহ ত্বরায়।
পত্নী সনে মনোসুখে হইয়া মিলিত
ধন-পুত্র-সুখ লভি' হও প্রফুল্লিত।
দীর্ঘ-আয়ু লাভ করি' তোমরা দু'জনে
বিশ্ব-হিতে থাক রত এই বাঞ্ছা মনে।" ৭৯।
নাগপুত্র দুইজনে বলে, অতি ফুল্ল-মনে
"শুন, পিতা, অপূর্ব্ব কথন,
কুমারে এ কথা বলি' কুণ্ডলা গেলেন চলি'
বন্দি' সেই কুমার-চরণ।
সখিরে করিয়া বক্ষে বারিধারা বহে চক্ষে
রুদ্ধ কণ্ঠে নাহি স্ফুরে ভাষ,
কাটিয়া মায়ার পাশ যায় সতী যথা আশ
কর্ম্মফল করিবারে নাশ। ৮০।
শত্রুজিৎ-সুত পরে আরোহিয়া অশ্ববরে
ক্রোড়ে ল'য়ে পত্নী আপনার,
বাহিরিলা যেই ক্ষণে আসি' যত দৈত্যগণে
পথরোধ করিল তাঁহার। ৮১।
করিয়া চীৎকার-রব বলে "তোরা আয় সব
দেখ্, এসে দুর্ঘট ঘটন,
সে পাতালকেতু হায়, এনেছিল যে কন্যায়
লয় তা'রে করিয়া হরণ।" ৮২।
এত বলি' দৈত্যগণ ল'য়ে নানা প্রহরণ
পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা আর

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি জল্পন্তস্তে তদা দানবোত্তমাঃ।
শরবর্ষৈস্তথা শূলৈর্ববর্ষুর্নৃপনন্দনম্ ॥ ৮৪ ॥
স চ শক্রজিতঃ পুত্রস্তদস্ত্রাণ্যতিবীর্য্যবান্।
চিচ্ছেদ শরজালেন প্রহসন্নিব লীলয়া ॥ ৮৫ ॥
ক্ষণেন পাতালতলমসিশক্ত্যৃষ্টিসায়কৈঃ।
ছিন্নৈঃ সংছন্নমভবদ্‌ধ্বজশরোৎকরৈঃ ॥ ৮৬ ॥
ততোঽস্ত্রং ত্বাষ্ট্রমাদায় চিক্ষেপ প্রতি দানবান্।
তেন তে দানবাঃ সর্ব্বে সহ পাতালকেতুনা ॥ ৮৭ ॥
জ্বালামালাতিতীব্রেণ স্ফুটদস্থিচয়াস্তদা।
নির্দগ্ধাঃ কাপিলং তেজঃ সমাসাদ্যেব সাগরাঃ ॥ ৮৮ ॥
ততঃ স রাজপুত্রোঽশ্বী নিহত্যাসুরসত্তমান্।
স্ত্রীরত্নেন সমং তেন সমাগচ্ছৎ পিতুঃ পুরম্ ॥ ৮৯ ।
প্রণিপত্য চ তৎ সর্ব্বং স তু পিত্রে ন্যবেদয়ৎ।
পাতালগমনঞ্চৈব কুণ্ডলায়াশ্চ দর্শনম্ ॥ ৯০ ॥

শূল, শর আদি করি নানা অস্ত্র করে ধরি'
দাঁড়াইল সম্মুখে তাঁহার। ৮৩।
বলে যত দৈত্যগণ থাক্, থাক্, করি' রণ
দেখা রে বীরত্ব আপনার।"
এত বলি' শূল, শর, এড়ে অতি ঘোরতর
পথরোধ করিয়া তাঁহার। ৮৪।
শক্রজিৎপুত্র বীর সতত সমরে স্থির
শরজাল করি' বরিষণ,
হাসিতে হাসিতে তবে হেলায় বুঝে আহবে
শরে শর করে নিবারণ। ৮৫।
ঋতধ্বজ, শরাসনে শর যুড়ি' প্রতিক্ষণে
ছিন্ন করে অসি, শক্তি আর
ঋষ্টি, তীক্ষ্ণ-শর-চয় ছাইল পাতালময়
আচ্ছাদিত হৈল চারিধার। ৮৬।

ঋতধ্বজ বীরবর ত্বাষ্ট্র-অস্ত্র-ভয়ঙ্কর
এড়িলেন দানবের প্রতি,
জ্বালামালী অস্ত্রবর উঠে গর্জ্জি' ভয়ঙ্কর,
ব্যোম পথে ধায় দ্রুতগতি;
সে অস্ত্রের হুতাশনে পাতালকেতুর সনে
দগ্ধ হ'য়ে মরে দৈত্যগণ,
কপিলের কোপানলে সগর সন্তানদলে
যেই মত হইল নিধন। ৮৭-৮৮।
সেই রাজপুত্র তবে বিনাশি' যত দানবে
দিব্য-অশ্বে করি' আরোহণ,
স্ত্রীরত্ন লইয়া সঙ্গে পিতৃবাসে আসে রঙ্গে
ঋষিকার্য্য করিয়া সাধন। ৮৯।
প্রণমি' পিতার পায় নিবেদিল সমুদায়
যেইরূপ ঘটিল ঘটন,

তদ্বন্মদালসাপ্রাপ্তিং দানবৈশ্চাপি সঙ্গরম্।
বধশ্চ তেষামস্ত্রেণ পুনরাগমনং তথা॥ ৯১॥
ইতি শ্রুত্বা পিতা তস্য চরিতং চারুচেতসঃ।
প্রীতিমানভবচ্চৈনং পরিষ্বজ্যাহ চাত্মজম্॥ ৯২।
সৎপুত্রেণ ত্বয়া পুত্র তারিতোঽহং মহাত্মনা।
ভয়েভ্যো মুনয়স্ত্রাতা যেন সদ্ধর্ম্মচারিণা॥ ৯৩॥
মৎপূর্ব্বৈঃ খ্যাতিমানীতং ময়া বিস্তারিতং পুনঃ।
পরাক্রমবতা বীর ত্বয়া তদ্বহুলীকৃতম্॥ ৯৪॥
যদুপাত্তং যশঃ পিত্রা ধনং বীর্য্যমথাপি বা।
তন্ন হাপয়তে যস্তু স নরো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥ ৯৫।
তদ্বীর্য্যাদধিকং যস্তু পুনরন্যৎ স্বশক্তিতঃ।
নিষ্পাদয়তি তং প্রাজ্ঞাঃ প্রবদন্তি নরোত্তমম্॥

পাতাল গমন আর বিবরণ কুণ্ডলার
বিবিধ আশ্চর্য্য বিবরণ, ৯০।
মদালসা-দরশন যেরূপে হৈল ঘটন
উভয়ের মিলন যে মতে,
যেরূপে করিয়া রণ নাশিয়া দানবগণ
আসিলা পাতালতল হ'তে। ৯১।
সেই সব বিবরণ শুনি' পুলকিত মন
হইলেন জনক তাঁহার,
চারুচিত্ত নন্দনেরে আনন্দে হৃদয়ে ধ'রে
বহিল অন্তরে প্রীতি-ধার।
উথলে সুখের সিন্ধু পুত্রমুখ পূর্ণইন্দু
একদৃষ্টে করিয় দর্শন,
হর্ষে গদগদ ভায পূরিল মনের আশ
বলিলেন মধুর বচন—৯২।
"শুন, বৎস, বাক্য মোর, বিনাশিয়া বিঘ্ন ঘোর
নির্ভয় করিলে মুনিগণে,
হৈনু সত্য পুত্রবান্, রাখিলে আমার মান,
ধর্ম্ম রক্ষা হৈল এতক্ষণে। ৯৩।
মোর পূর্ব্ব-পিতৃগণ ছিলা খ্যাত সর্ব্বজন
সে খ্যাতি রাখিয়াছিনু আমি,
আজি বৎস, তোমা' হ'তে সেই খ্যাতি বিদিনতে
বাড়িল, যশস্বী আজি তুমি।
ধন্য তব পরাক্রম, হেরি তুষ্ট মন মম
যশে তব ভরিল ভুবন,
দিনে দিনে এই মতে নিজ বাহুবল হ'তে
কীর্ত্তিলাভ কর অগণন। ৯৪।
পিতৃদত্ত ধন আর বাহুবল, যশঃ-সার
যেই জন যত্নে রক্ষা করে,
নষ্ট নাহি করে যেই মধ্যম পুরুষ সেই
রহে সদা আনন্দ অন্তরে। ৯৫।
কিন্তু, ধন্য সেই জন যে জন করি' যতন
বৃদ্ধি করি' বল আপনার

যঃ পিত্রা সমুপাত্তানি ধনবীর্য্যযশাংসি বৈ।
ন্যূনতাং নয়তি প্রাজ্ঞাস্তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ ৯৭ ॥
তন্ময়া ব্রাহ্মণত্রাণং কৃতমাসীদ্‌যথা ত্বয়া।
পাতালগমনং যচ্চ যচ্চাসুরবিনাশনম্।
এতদপ্যধিকং বৎস তেন ত্বং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯৮ ॥
তদ্ধন্যোঽস্ম্যথ বাল ত্বমহমেব গুণাধিকম্।
ত্বাং পুত্রমীদৃশং প্রাপ্য শ্লাঘ্যঃ পুণ্যবতামপি ॥ ৯৯ ॥
ন স পুত্রকৃতাং প্রীতিং মন্যে প্রাপ্নোতি মানবঃ।
পুত্রেণ নাতিশয়িতো যঃ প্রজ্ঞা-দান-বিক্রমৈঃ ॥ ১০০ ॥
ধিগ্‌জন্ম তস্য য পিত্রা লোকে বিজ্ঞায়তে নরঃ।
যঃ পুত্রাৎ খ্যাতিমভ্যেতি তস্য জন্ম সুজন্মনঃ ॥ ১০১ ॥
আত্মনা জ্ঞায়তে ধন্যো মধ্য পিতৃপিতামহৈঃ।
মাতৃপক্ষেণ মাত্রা চ খ্যাতিমেতি নরাধমঃ ॥ ১০২ ॥

স্ব-শক্তিতে যশ পায় নরোত্তম বলি' তায়
প্রাজ্ঞজনে গায় গুণ তা'র। ৯৬।
ভবে পুনঃ যেই জন পিতৃ-উপার্জ্জিত ধন,
যশ, বীর্য্য আদি নষ্ট করে
পুরুষ অধম সেই ইহাতে সন্দেহ নেই
নিন্দা তা'র করে যত নরে। ৯৭।
তুমি বৎস, পুত্র ধন্য, তব বাহু-বল জন্য
মুনিগণ পায় পরিত্রাণ,
পাতালে করি' গমন বিনাশি' দানবগণ
রক্ষা আজি কৈলে মোর মান।
বলী হ'য়ে তব বলে আমি এই ভুমণ্ডলে
ধন্য বলি' গণ্য সুনিশ্চয়,
পুরুষ-উত্তম বলি' সকলে তোমারে, বলী
ঘুষিবেক নাহিক সংশয়। ৯৮।
বালক-বয়সে আজ করিলে তুমি যে কাজ
তুলনা জগতে নাহি তা'র,

বহু পুণ্যে তব সম তনয় জন্মিল মম
আনন্দের নাহি মোর পার। ৯৯।
জ্ঞানে, মানে, বলে আর পুত্র শ্রেষ্ঠ নহে যা'র
তা'র কষ্ট কি বলিব আর,
প্রীতি নাহি তা'র মনে হিয়া পোড়ে প্রতিক্ষণে
তুষানল জলে হৃদে তা'র। ১০০।
যে জন পিতার নামে খ্যাত রহে ধরাধামে
ধিক তা'র জীবনে কি কাজ ?
মরণ মঙ্গল তা'র নিশ্চয় কহিনু সার
লোক মাঝে পায় সদা লাজ।
যে জন পুত্রের বলে খ্যাত হয় ভুমণ্ডলে
সত্য জানি সেই পুত্রবান,
হেন পুত্র হয় যেই জন্মি' ধন্য হৈল সেই
ধন্য সে লভিল যশোমান। ১০১।
নিজ যশে ধন্য যেই এ জগতে ধন্য সেই
পিতৃ-যশে ধন্য সে মধ্যম,

তৎ পুত্র ধনবীর্য্যৈস্ত্বং বিবর্দ্ধস্ব সুখেন চ।
গন্ধর্ব্বতনয়া চেয়ং মা ত্বয়া বৈ বিযুজ্যতাম্ ॥ ১০৩ ॥
ইতি পিত্রা বহুবিধং প্রিয়মুক্তঃ পুনঃ পুনঃ।
পরিষ্বজ্য স্বমাবাসং সভার্য্যঃ স বিসর্জ্জিতঃ ॥ ১০৪ ॥
স তয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং রেমে তত্র পিতুঃ পুরে।
অন্যেষু চ তথোদ্যান-বন-পর্ব্বতসানুষু ॥ ১০৫ ॥
শ্বশ্রু-শ্বশুরয়োঃ পাদৌ প্রণিপত্য চ সা শুভা।
প্রাতঃ প্রাতস্ততস্তেন সহ রেমে সুমধ্যমা ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজচরিতে মদালসা-পরিণয়নং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মাতৃকুল-যশে হায় যশস্বী যে হ'তে চায়
এ জগতে সেই নরাধম। ১০২।
শুন পুত্র, মোর কথা, যতন কর সর্ব্বথা
জ্ঞানে, বীর্য্যে, ধনে বড় হ'তে,
সুখে থাক নিরন্তর আশীষ-বচন ধর
বিপথে যেয়ো না কোন মতে।
গন্ধর্ব্বনন্দিনী এই ইহার তুলনা নেই
যোগ্য সনে যোগ্যের মিলন,
সুখে রেখো সুখে থেকো সতত নিকটে রেখে
বিয়োগ না হৌক কদাচন। ১০৩।
এইরূপে জনক তাঁহার,
আশীর্ব্বাদ করিলা অপার;
স্নেহভরে করি' আলিঙ্গন
হইলেন পুলকিত মন।
পরে বীর নিজ ভার্য্যাসনে
পশিলেন আপন ভবনে। ১০৪।
প্রিয়া পত্নী মদালসা সনে
রহিলেন সদা ফুল্ল মনে,
কভু বা পিতার পুর মাঝে
রঙ্গে দোঁহে সাজি' নানা সাজে।
কভু দোঁহে প্রমোদ-উদ্যানে
করে ক্রীড়া প্রফুল্লিত মনে।
কভু বনে, পর্ব্বত-কন্দরে,
বিহরেন আনন্দ-অন্তরে। ১০৫।
মদালসা প্রভাতে উঠিয়া
শ্বশ্রু-শ্বশুরের পাশে গিয়া,
নিত্য পূজি' দোঁহার চরণ,
পতি সনে করেন ভ্রমণ। ১০৬।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে ঋতধ্বজ চরিতে মদালসা পরিণয় নামক একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ কালে বহুতিথে গতে রাজা পুনঃ সুতম্।
প্রাহ গচ্ছাশু বিপ্রাণাং ত্রাণায় চর মেদিনীম্ ॥ ১ ॥
অশ্বমেনং সমারুহ্য প্রাতঃ প্রাতর্দিনে দিনে।
অবাধা দ্বিজমুখ্যানামন্বেষ্টব্যা সদৈব হি ॥ ২ ॥
দুর্বৃত্তাঃ সন্তি শতশো দানবাঃ পাপযোনয়ঃ।
তেভ্যো ন স্যাদ্‌যথা বাধা মুনীনাং ত্বং তথা কুরু ॥ ৩
স তথোক্তস্ততঃ পিত্রা তথা চক্রে নৃপাত্মজঃ।
পরিক্রম্য মহীং সর্ব্বাং ববন্দে চরণং পিতুঃ ॥ ৪ ॥
অহন্যহন্যনুপ্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে নৃপনন্দনঃ।
ততশ্চ শেষং দিবসং তয়া রেমে সুমধ্যয়া ॥ ৫ ॥
একদা তু চরন্ সোঽথ দদর্শ যমুনাতটে।

নাগপুত্র দুই জনে বলিলা তখন—
"শুন, পিতা, অপূর্ব্ব ব্যাপার অতঃপর,
কিছু কালে পরে রাজা তনয়ে আপন
আনিলা ডাকিয়া কাছে আনন্দ অন্তর।
বলিলেন—"শুন বৎস, বলি যে তোমায়,
সহায়তা কর মোর—ইচ্ছা হেন মনে;
এই হেতু রত হও বিপ্রের রক্ষায়
নিরন্তর ভ্রমি' এই বিশাল ভুবনে। ১।
তব দিব্য অশ্ববরে আরোহণ করি'
প্রতিদিন প্রাতে তুমি করিয়া ভ্রমণ,
অন্বেষণ কর কোথা' ব্রাহ্মণের অরি
ব্রাহ্মণের ব্রত বাধা নাশ অনুক্ষণ। ২।

আছয়ে দুর্বৃত্ত শত দানব দুর্জন,
মুনিজন অহিতে মানস তা'সবার;
যেথায় পাইবে তাহাদের দরশন
বিনাশি' নিবাধা কর এ রাজ্য আমার। ৩
পিতৃআজ্ঞা শিরে ধরি নৃপতি কুমার
প্রতিদিন সেই আজ্ঞা করেন পালন,
প্রদক্ষিণ করি রাজ্য আসিয়া আবার
বন্দনা করেন সুখে পিতার চরণ। ৪।
প্রতিদিন প্রভাতে সানন্দে নৃপসুত
নিত্য কৃত্য সমাপিয়া চড়ি অশ্বোপরে
ভ্রমিয়া সকল দেশ, সদা হর্ষযুত
দিবাশেষে পত্নী সনে রহে নিজ ঘরে। ৫

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

INDIA PRESS, CALCUTTA.

পুত্রের প্রতি উপদেশ।

(২০৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

কাপড় ও চাদর একরূপ পরিষ্কার থাকা সভ্য সমাজোচিত ব্যবহার, কিন্তু ধুতি যত শীঘ্র ময়লা হয় চাদর তত হয় না, আর সাধারণ গৃহস্থ লোক একবার পরিয়া ধুতি চাদর রজক গৃহে প্রেরণ করিতেও সমর্থ নহে সুতরাং তাঁহাদের ধুতি চাদরের সামঞ্জস্য রক্ষা করা বড় কঠিন, কিন্তু রেসমের চাদর ব্যবহার করিলে সেজন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। এইজন্য বলিতেছিলাম ধনী লোকের পক্ষে না হউক গৃহস্থের পক্ষে রেসমের চাদর ব্যবহার করা প্রথাটা মন্দ নয়। তাই বোধ হয় এই গত কয় বৎসরে ইহার ব্যবহার খুব বাড়িয়াছে। এখন যখন ইহার ব্যবহার এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা করিতে কোন দোষ নাই। কিন্তু সেই ১৮৮৪ সালে প্রথম যখন সেই ভদ্রলোককে ইহা ব্যবহার করিতে দেখি, যখন ইহা আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার ন্যায় বোধ হয় অনেকেরই তাঁহার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সেই জন্যই বলিতেছিলাম পোষাক সম্বন্ধে পাঁচজনে যখন যাহা করিবে তখন সেই মতই তুমি করিবে। কিন্তু সেই পাঁচজন, কাহাকে লইয়া গণনা করিতে হইবে, তাহাও বিবেচ্য বিষয়। তোমার সমকক্ষ, একরূপ অবস্থাপন্ন, একরূপ ভাবাপন্ন পাঁচজন হওয়া চাই। পাঁচজন ইংরাজের ছেলে যে পোষাক পরিবেন, সে পোষাক তোমার নহে। হয় ত এই পাঁচজন সাহেবের ছেলে বা সাহেবভাবাপন্ন লোকের ছেলে তোমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। তাঁহারা তোমার সহাধ্যায়ী হইলেও নিশ্চয় তোমার সমভাবাপন্ন নহেন, সুতরাং তাঁহাদের পরিচ্ছদ তোমার অনুকরণীয় নহে। আবার হয় ত তোমার সহধ্যায়ীগণের মধ্যে পাঁচজন ধনী পুত্র থাকিতে পারেন, তাঁহাদের শরীরে যে পোষাক শোভা পায়, তোমার তাহাও অনুকরণীয় নহে। ধনী লোকের অনুকরণ সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের করিতে যাওয়া অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। একজন সামান্য ধনী লোক ছিলেন, তাঁহার কিন্তু ধারণা ছিল তিনি এ প্রদেশের ধনীদের মধ্যে একজন প্রধান লোক। যখন যে দরবার কিম্বা অপর সাধারণ ধনী লোকের গম্য স্থানে যাইতেন, অপরাপর তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর ধনী লোকের পোষাক পরিচ্ছদ ও আসবাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, এবং বাটীতে আসিয়াই কাহারও মত পাগড়ী, কাহারও মত পোষাক, কাহারও মত গাড়ী ঘোড়ার সাজ, কাহারও মত সহিস কোচম্যানের পোষাক প্রস্তুত করাইবার আদেশ হইত। এই করিয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে বিষম ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং যদিও তাঁহার হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু কালে তিনি যে দেনা রাখিয়া যান, তাহাতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া শোধ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ইহাতে দাঁড় কাক ও ময়ুর-পুচ্ছের গল্প মনে পড়ে না

কি? যে যেমন তাহার তেমনি চলা চাই। তাঁহার সম-অবস্থাপন্ন, সমভাবাপন্ন লোকের ন্যায় চাল চলন, পোষাক পরিচ্ছদ করাই বিধেয়।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বাধীনতা কিছু মাত্র নাই। অবস্থাভেদে পোষাক সম্বন্ধে সকলেই বিধি ব্যবস্থার দাস। কোন বিধি ব্যবস্থার দাসত্ব ঘৃণার জিনিস নয়, বরং তাহা না মানা অন্যায় ও ঘৃণার্হ। মধ্যে মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যক্ষ নিয়ম করেন যে তাঁহার বিদ্যালয়ের সকল বিদ্যার্থীকে মোজা ও কোট পরিতে হইবে। তিনি প্রধান শিক্ষক, তাঁহার আদেশ সকলেরই অবশ্য প্রতিপাল্য এবং পালিত হইয়াও আসিতেছে। ছাত্র-জীবনে বরং এ সম্বন্ধে স্বাধীনতার কথা উঠিতে পারে কিন্তু যাহাদের বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পাঁচজনের সহিত একত্র মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদের স্বাধীনতা চলে না। তাহা স্বাধীনতাই নহে, বরং স্বেচ্ছাচারিতা বলিলেই ভাল হয়। বাস্তবিকই অনেক সময়ে অনেক অপরিণত-বুদ্ধি যুবক কোনটা স্বাধীনতা ও কোনটা স্বেচ্ছাচারিতা প্রভেদ করিতে সমর্থ হন না, অনেক সময়েই স্বাধীনতার দেবী-মূর্ত্তির স্থলে ভ্রমক্রমে স্বেচ্ছাচারিতার রাক্ষসী-মূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন। সে বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। নিয়ম বা বিধি-ব্যবস্থার অধীনতা দাসত্ব নহে, বিচ্ছৃঙ্খলভাবই বরং দাসত্বের লক্ষণ, ঠিক দাসত্বের লক্ষণ না হইলেও স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ ত বটেই। নিয়ম ও বিধির অধীন হইয়া কত কত বড় লোককে,—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, পদস্থ, গৌরবান্বিত লোককে—কত সময়ে কত সাজে সাজিতে হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের লজ্জার কথা কিছুই নাই, বরং সে বিধি মান্য করিয়া চলা তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শেষ কথা পরিচ্ছদের উপর কোন একটা স্পৃহা থাকিবে না। পরিচ্ছদ সামাজিক নিয়মানুসারে করিতে হয় বলিয়া করা। ইহা একটা নৈসর্গিক অভাব দূর করিবার জন্য নহে, কেবল সামাজিক নিয়ম পালনের জন্য মাত্র, তাহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। যাঁহারা সামাজিক নহেন, সমাজে বাস করেন না, তাঁহাদিগের কোন পরিচ্ছদেরই আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানীরও নহে, জ্ঞানহীনেরও নহে। অসভ্য বর্ব্বর যাহারা এখনও ভাল করিয়া সমাজ-বদ্ধ হইতে শিখে নাই, যাহাদের ভিতর সামাজিক কোন নিয়ম এখনও বিধিবদ্ধ হয় নাই, তাহারা হয় ত অনেক বিষয়ে উন্নত সমাজের লোক অপেক্ষাও উন্নত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা পরিচ্ছদের আবশ্যকতা বুঝে নাই। আবার এমন জ্ঞানী লোক অনেক আছেন যাঁহাদের বসন থাকা না থাকা সমান। আমরা এমন দুই একজনকেও দেখিয়াছি। ইহাঁদের আমরা সামাজিক নিয়মানুসারে যাহাকে লজ্জানিবারণ করা বলি, ইহাঁরা সে ভাবের ধার ধারেন না। ইহাঁরা সমাজের ভিতর বাস করেন না, সমাজের নিয়মও মানেন না। তবে সামাজিক লোকের সংঘর্ষে আসিলে অগত্যা অন্যের জন্য নিজের আবশ্যকতা না থাকিলেও বসনে অন্ততঃ দেহের কিয়দংশও আবৃত করিতে হয়। এটুকুও তাঁহাদের সামাজিক লোকের সংস্পর্শে

আশা-রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এতদ্বারা যতদূর বুঝা যায় একবারে অজ্ঞান ও পূর্ণজ্ঞানী পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উভয়েরই অবস্থা প্রায় একরূপ। উভয়েই সমাজ জানেন না, বা মানেন না বলিয়া সামাজিক লোকের ন্যায় পরিচ্ছদের আবশ্যকতা অনুধাবন করেন না। পোষাক পরিচ্ছদ যখন সমাজের জন্য, সমাজ শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া যতটুকু না করিলে নয় তত টুকুই আবশ্যক জ্ঞান করিতে হইবে। ভোজন যেমন একটা নৈসর্গিক অভাব দূর করিবার জন্য, বসন ও সেইরূপ একটা সামাজিক নিয়ম পালন জন্য। আহার বিষয়ে যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি-মাত্রই ভোজনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তেমনি সামাজিক নিয়ম পালন করিতে যতটুকু দরকার তত টুকু করা চাই। আহার সম্বন্ধে অভাবের উপর যাহা, তাহাকে যেমন লোলুপতা বা পেটুকতা বলে, পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তেমনি সামাজিক নিয়মাধীনে যাহা করা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক করার নাম বিলাসিতা বা বাবুগিরি বলা যায়। ভাল লোকের পক্ষে আহারে লোলুপতা ও পরিচ্ছদে বিলাসিতা সমানই ঘৃণার্হ ও ত্যজ্য।

বিদ্যালয়। এই ভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবে। সর্ব্বদাই একটু সময় থাকিতে যাইবে। অধ্যাপক আসিবার অন্ততঃ পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে গিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিয়া, পথশ্রান্তি দূর করিবে। পরে অধ্যাপক আসিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই, সে বিষয়ে যথাযথ উপদেশ দিবার ভার অধ্যাপক মহাশয়দের উপর। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা দয়া করিয়া আমার সে ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। সে জন্য তোমার অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। আমার বোধ হয় ছাত্রগণের অভিভাবকগণ সকলেই এইরূপ পুত্রগণের অধ্যাপকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বিদ্যালয়ে গিয়া যেরূপ আচরণ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম কথা শিক্ষকগণের প্রতি ব্যবহার। শিক্ষকগণের প্রতি সর্ব্বদা খুব ভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাঁহারা বৃদ্ধই হউন আর যুবাই হউন, সকলেই পিতৃস্থানীয়। সকলেরই প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমাদের সমাজে গুরুভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ; যাঁহার নিকট কখন কোন একটা ভাল জিনিস শিখিয়াছ বা কোনরূপ সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছ, তিনিই তোমার গুরু। তাঁহার প্রতি কি বিদ্যালয়ে কি বাহিরে সর্ব্বদা গুরুভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহাতে তাঁহার প্রীতি জন্মিবে, তোমারও মঙ্গল হইবে। গুরুশিষ্যে ভক্তি ও স্নেহ না থাকিলে শিক্ষা ফলবতী হয় না। গুরু-বাক্য অলঙ্ঘনীয়, তাঁহারা যাহা যাহা বলিবেন, তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। যদি কখন তাঁহার কোন আদেশ অযথা বলিয়া তোমার বোধ হয়, প্রথমতঃ তোমার সে ধারণা ভ্রমাত্মক, শিক্ষক যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া মান্য করিবে। তবুও যদি শিক্ষকের কোন বাক্যের যাথার্থ্যাবধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে, তাঁহার অবকাশ কালে, অতি বিনীতভাবে গিয়া তাঁহার নিকট

দণ্ডায়মান হইয়া যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপনান্তে সে কথা নিবেদন করিবে। তাহা হইলে তোমার ভ্রম হইয়া থাকে তাহার অপনোদন হইবে, আর যদি দৈবক্রমে তাঁহারই কোন প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনিও তাহা সংশোধনের অবসর পাইবেন। কখনও তাঁহাদের কোন কথার প্রতিবাদ করিবে না, ভ্রম করিতেছেন দেখিলেও তাহাতে তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিবে না। গুরুলোকের দোষ দেখান উচিত নহে। "দোষা বাচ্যা গুরোরপি" কথাটার প্রকৃত অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া অনেক সময় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ইহা কেবল সত্যের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য। সত্য এমনই অভীপ্সিত জিনিস যে শত্রুর গুণ থাকিলেও বলিতে হইবে এবং গুরুর যদি কিছু দোষ থাকে তাহাও গোপন করিয়া সত্যের অপলাপ করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। ইহাতে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে গুরুর দোষোদ্ঘাটন কর্ত্তব্য নহে তবে যেখানে না বলিলে সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় সেই খানে সত্য-পালন জন্য গুরুর দোষ বলা চলে, অন্যত্র নহে। অনেক সময় এমন ঘটে যে গুরুলোকের কোন একটি কথা বা আচরণ অন্যায় বা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পরে বুঝিতে পারা যায় যে সেটা তাঁহাদের দোষ বা ভ্রম নয়। আমার নিজ-জীবনেই এমন ঘটিয়াছে। আমার পিতৃদেব যিনি পূর্ণজ্ঞানী-ছিলেন, তাঁহার দুই একটি ব্যবহারে আমার কেমন একটু খটকা লাগিত, মনে হইত হয় ত তিনি ভ্রম করিতেছেন। তখন তিনি পরিণত বয়স্ক, জ্ঞানবান, আর আমি অপরিণত বয়স্ক ও জ্ঞানহীন। আমি কোন কথা বলিতে বা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতাম না, কিন্তু মনে মনে একটু একটু সন্দেহ থাকিত। পরে যখন আমার বয়োবৃদ্ধি সহকারে ও অপর ন না কারণে জ্ঞান না হউক একটু অভিজ্ঞতা জন্মিল, তখন বুঝিতে পারিলাম তিনি যাহা করিতেন তাহাই অভ্রান্ত, আমি পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। সেই জন্য বলিতেছি যে সহসা গুরুলোকের কার্য্যে বা ব্যবহারে দোষ দর্শন করা বা তাঁহাদের কার্য্য ভ্রম বলিয়া মনে করা যুবকের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতা। তাহাতে অনেক সময় নানারূপ অপকার ঘটিয়া থাকে। সে জন্য সে বিষয়ে তোমাকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল। নিজের অপরিণত বুদ্ধির উপর বড় একটা বেশি নির্ভর বা বিশ্বাস করিবে না।

গুরুর সহিত যখনি সাক্ষাৎ হইবে তখনই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহাকে আমাদের সামাজিক নিয়মানুসারে প্রণাম করা চলে তাঁহাকে প্রণাম করিবে, আর যাঁহার প্রতি তাহা না চলে, তাঁহার সহিত তিনি যাহাতে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন সেই মত ব্যবহার করিতে হইবে। অনেক সময় এমন ঘটে তুমি হয় ত কোন অধ্যাপককে সম্মানাভিবাদন করিলে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন না। তাহাতে বিরক্ত বা দুঃখিত হইবে না। তুমি প্রত্যভিবাদন জন্য তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে না, তুমি তোমার কর্ত্তব্য বোধে তাহা করিবে এবং তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়াছ ইহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে। তিনি প্রত্যভিবাদন

না করার জন্য তোমার অসন্তোষের কোন কারণ নাই। আর এক কথা মানুষ মানুষের হৃদয় দেখিতে পায় না। হয় ত তোমার সম্মান দেখানকালে তোমার শিক্ষক তোমাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, প্রকাশ্যে কোন ভাব প্রকাশ করা হয় ত তাঁহার অভ্যস্ত নহে। তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। তাঁহারও তোমার প্রতি ভালবাসা বাড়িবে। গুরু শিষ্যে সমকক্ষভাব যেন কখন কোনকালে মনে হয় না। গুরু চিরকালই উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, সম্মানিত হইবেন। কখন এক আসনে অথবা সম আসনে বসিবে না। এক পংক্তিতে কোন কারণে থাকিবে না। সর্ব্বদাই পশ্চাতে আসন গ্রহণ করিবে বা দণ্ডায়মান থাকিবে। গুরুর সাক্ষাতে কখন আসন গ্রহণ করিবে না, তবে তিনি যদি নিতান্ত অনুরোধ করেন তাহা হইলে, তাঁহার আদিষ্ট স্থানে বসিবে। এস্থলে একটি প্রবাদবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমরা ব্রহ্মা অপেক্ষা বেদের সম্মান বেশি করি। ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত বেদ, ব্রহ্মা অপেক্ষাও আমাদের সম্মানের জিনিস। সেই রূপ অনেকস্থলে গুরু অপেক্ষা গুরুর আদেশ গুরুতর অর্থাৎ তাঁহার আদেশ সর্ব্বাগ্রে প্রতিপাল্য। তাহাতেই তাঁহাদের প্রীতি। সুতরাং তাহাই করা চাই। গুরুর সম্মুখে কখন প্রগল্‌ভতা না বাক্-চাতুর্য্য দেখাইবে না। বেশি বাক্যপ্রয়োগ করা নম্রতা-সূচক নহে। কোন কথা স্পৃষ্ট হইলে তাহারই উত্তর দিবে, সে উত্তরটা খুব বিনয়ের সহিত দেওয়া চাই। তাহাতে যেন ঔদ্ধত্যের লেশমাত্রও না থাকে। আর অস্পৃষ্ট হইয়া কোন কথাই কহিবে না। যদি গুরু ও শিষ্য কোন সভাস্থলে আহূত হন, গুরুর বিনা আদেশে শিষ্যের কোন কথা বলা উচিত নহে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বলিতে হয় সে কথা পৃথক। গুরু শিক্ষক অধ্যাপক-প্রভৃতি একপর্য্যায় ভুক্ত। যিনি কখনও শিক্ষা দিয়াছেন বা যাঁহার নিকট কখন কোন উপদেশ পাইয়াছ তিনি চিরদিনই তোমার গুরু। এ সম্বন্ধে আমার একজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাশীল শিক্ষকের একটি বড় উপদেশপ্রদ কথা স্মরণ পড়িতেছে। তিনি একদিন, একটি দোকানে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন ভদ্রবংশের অসৎ লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সম্মানে "প্রভু, প্রণাম হই।" বলিয়া প্রণাম করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য। পরিণত বয়স্ক জ্ঞানবান শিক্ষক মহাশয় সেই অপরিণত বয়স্ক বিপথগামী যুবককে এত সম্মান দেখাইলেন কেন? এই যুবক এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাবাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। শিক্ষক মহাশয় সকলকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, উনি যদি প্রভু না হন তবে প্রভু কে, উনি আমাদের শিক্ষাগুরু, মহাপ্রভু, উহাঁর নিকট আমরা কি কার্য্যের কি ফল ইহা শিক্ষালাভ করিলাম, সুতরাং উনি আমার, তোমার ও প্রতিবাসী বর্গের সকলেরই উপদেষ্টা গুরু। উহাঁকে প্রভু বলিয়া প্রণাম না করিলে চলিবে কেন? অপর ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি এক কথা বলিয়াছিলেন তাহা উপস্থিত বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কথাটা ভাল বলিয়া বলিতেছি। তিনি বলিলেন উহাকে

তোমরা ঘৃণা কর কেন? উনি যে অপরাধে অপরাধী সেরূপ অপরাধ কি আর কেহ করে না। সীমার ভিতর অন্বেষণ করিলে অনেকেই জানিতে পারিবে অনেকেই ঐরূপ দোষে দোষী। তবে ঐ ব্যক্তির দোষ প্রকাশ হইয়াছে, প্রমাণ হইয়াছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। ফলে কিন্তু অনেক প্রভেদ, ঐ ব্যক্তি তাহার কৃত দোষের জন্য রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে। উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এক্ষণে উনি নিষ্পাপ। কিন্তু যাহাদের দোষ প্রকাশ হয় নাই, তাহাদের পাপ রহিয়াছে, তাহাদের দণ্ড কবে হইবে বলা যায় না। ক্রমে তাহাদের পাপের ভার বাড়িতে চলিয়াছে, তাহার উপর তাঁহারা সমাজকে, আপনারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করায়, একরূপ প্রতারণাও করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা বিবিধ রকমে সমাজের নিকট দোষী। তাঁহাদের পাপের সীমা নাই। তাঁহাদের সহিত তুলনায় ঐ কারামুক্ত ভদ্রলোকের ছেলে সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ নয় কি? যে কথার জন্য এই গল্পের অবতারণা, তাহা, আমার প্রাচীন শিক্ষক মহাশয়ের কিরূপ গুরুভক্তি। তিনি বড়ই চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী লোক ছিলেন। এ প্রকার সাধারণ লোকে হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় না। অন্ততঃ যাহাকে আমরা সাধারণতঃ শিক্ষা বলি, সেই শিক্ষা যাঁহার যাঁহার নিকট পাইয়াছ, পাইতেছ বা পাইবে, সকলকেই তোমার শিক্ষক বা গুরু জ্ঞান করিবে। তাঁহার নিকট চির দিনই সসম্মান ব্যবহার করিবে। যদি কখন তুমি তাঁহাদের ভিতর কাহারও অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত বা জ্ঞানী হইতে পার, তাহা তাঁহারই প্রাথমিক সংশিক্ষার গুণে ও আশীর্ব্বাদে এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

আজ কয় দিন হইল এক শোকসভায় এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের প্রগল্‌ভতা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। সভাস্থলে যুবকের পিতা, মাতুল, শিক্ষক এবং বহুতর পিতৃবন্ধু ও পিতারও সম্মানিত বিদ্বান, বুদ্ধিমান বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। যুবক স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া মৃত মহাত্মার জীবন ও চরিত্র হইতে আমরা কত সংশিক্ষা পাইতে পারি তাহা বর্ণনা করিয়া সকলকে তাহা অনুকরণ করিতে উপদেশ দিলেন। কথা যে কিছু মন্দ বলিলেন তাহা নহে। তবে যে স্থলে তাঁহার বহুসংখ্যক গুরুলোক সমুপস্থিত যাঁহাদের নিকট তিনি উক্তরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং এখনও ইচ্ছা করিলে বহুকাল করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া, এমন কি তাঁহাদের সাক্ষাতে বক্তা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে উপদেশ দেওয়া একটা বাচালতা ও প্রগল্‌ভতা বলিয়া মনে হইল। এইরূপ গুরুলোকের সাক্ষাতে কখন' কাহারও শিক্ষকের স্থান অধিকার করিবে না।

এই যে শিক্ষক বা অধ্যাপকগণকে এত সম্মান ও ভক্তি করিতে বলিতেছি, মনে করিও না ইহার কোন ভাবী উপকারিতা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও উপাধি গ্রহণ করা এ জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নহে। এই সকল শিক্ষকের নিকট ভাষাতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল পার্থিব বিষয়ের শিক্ষা লাভ কর

তাহা শিক্ষার প্রথম ও অধস্তন স্তর মাত্র। এই সকল শিক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিয়া আমাদের সকলেরই উৎকৃষ্ট বিদ্যা অর্থাৎ যে বিদ্যা বলে আমরা ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারি সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। চিরদিনই আমাদের দেশে তাহাই রীতি ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই-রূপ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা আপনা হইতে হয় না, তাহাতে গুরু চাই। বিনা শিক্ষকের সাহায্যে সহজে যে বিদ্যা লাভ করা যায় না। এই পরা বা ব্রহ্ম-বিদ্যা দাতা গুরুকেই আমরা প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য বলিয়া মনে করি। এই গুরুকে ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তিরূপে ভাবিতে হইবে। গুরুর বাক্যই সত্য আর সমস্তই জগতে অসত্য। এতটা গুরুর উপর নির্ভর না করিলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। কিন্তু হঠাৎ গুরুর প্রতি এ প্রকার একান্ত ভক্তি ও নির্ভরতা কি প্রকারে জন্মিতে পারে? সেই জন্য এই জড় জগতের সামান্য বিষয়ের যাঁহারা শিক্ষা দেন সেই সকল গুরুর প্রতি ভক্তি ও নির্ভরভাব অগ্রে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। সুতরাং এই সকল গুরু শিক্ষক বা অধ্যাপক-গণকে ভক্তি, সম্মান ও নির্ভর করিতে শিক্ষা করা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অর্থাৎ সামান্য কথায় আমাদের জীবনের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্যের উত্তর সাধক। অতএব এই সকল শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করায় তোমার ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ উপকারের সম্ভাবনা। এমন উপায়কে উপেক্ষা করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে একটা প্রবাদবাক্য ছিল, যে তিন প্রকারে বিদ্যা লাভ হয়, তাহার প্রথম ও প্রধান উপায় গুরু শুশ্রূষা, দ্বিতীয় উপায় গুরুকে প্রচুর অর্থ দান করা। তৃতীয় ও শেষ উপায় বিদ্যার বিনিময় সাধন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করা। গুরুশুশ্রূষা আজকাল, একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে, এখন শুশ্রূষার স্থানে যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রচুর অর্থদান কয় জনে করিতে পারেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঁচজনের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাসই এখনকার রীতি হইয়াছে। সুতরাং দুই এক স্থলে পুষ্কল ধন দ্বারা বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা থাকিলেও সাধা-রণতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে না। বিনিময় লব্ধ বিদ্যাতে উভয়েই উভয়ের গুরু। যেখানে বিনিময়ের ভাব সেখানেই যেন ভক্তি শ্রদ্ধার কথা উঠে না। সেখানে ব্যবসাদারের ভাব, গুরু শিষ্যের ভাব নহে। আমাদের দুইজন বন্ধু আছেন, একজন হিন্দু ও অপর মুসলমান। যিনি হিন্দু তিনি মুসলমানকে সংস্কৃত পড়াইতেন এবং মৌলবী সাহেব হিন্দুকে পারশি পড়াইতেন। এইরূপে তাঁহারা বিদ্যার বিনিময় করিতেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের ভিতর গুরুশিষ্য ভাব আদৌ জন্মে নাই, তবে বন্ধুত্ব বেশ জন্মিয়াছে। অর্থাৎ বিনিময়ে সে ভাবের উন্মেষ হয়, সাম্যভাবে উভয়ে উভয়ের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। এই তিন উপায়ে বিদ্যালাভ এক্ষণে সাধারণতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিঞ্চিৎ ধনদান ও বাকি টুকু ভক্তি ও সম্মান দ্বারা পূরণ করিয়া গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করাই এখনকার দিনে সম্ভবপর ও প্রকৃষ্ট উপায়।

সমপাঠিগণের সহিত ব্যবহার। বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষক ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোকের সহিত তোমাদিগকে মিশিতে হয়। ইহাদের সহিত তোমাদের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। ইহারা তোমার সমপাঠী। ইহারা সকলেই ভ্রাতৃস্থানীয়। ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবে। যাহারা তোমার অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সম্মান করিবে ও ভালবাসিবে। যাহারা একত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাদিগকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বোধ করিবে। ইহাদের সহিত সহৃদয়তা সহকারে ব্যবহার করিবে। খুব নিজের লোক বোধ করিবে। লেখা পড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা সত্বেও সর্ব্বদা ইহাদের মঙ্গল কামনা করিবে। ইহাদের আত্মীয়গণকেও আত্মীয় বোধ করিবে। আর যাহারা তোমার অপেক্ষা কম পড়ে তাহাদিগকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভালবাসিবে, তাহাদের যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা করিবে। গোপনে তাহাদিগকে সদুপদেশ দিবে। কখন মনে করিও না যে, যে কয়দিন তোমরা বিদ্যালয়ে আছ, ইহাদের সহিত তোমার সেই কয়দিনের সম্পর্ক মাত্র। এই সম্পর্ক বহুদূর ব্যাপী ও বহুকাল স্থায়ী। বিদ্যালয়ের সমপাঠীদের সহিত শিক্ষাকালে যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহা অনেক সময় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কখন পুরুষ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া থাকে। এই সকল সহাধ্যায়ীগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই যে সকল বিদ্যার্থী তোমরা একত্র একস্থানে অধ্যয়ন করিতেছ কালে সকলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদবীতে উপনীত হইবে। এখন যাহার সহিত এবং সকলের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, প্রত্যেকে চিরদিন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবে। যদি কাহারও সহিত কোন প্রকার মন্দ ব্যবহার কর তাহা হইলে আজীবন তিনি তোমাকে সেই মন্দভাবে স্মরণ করিয়া রাখিবেন। পরে তুমি তাঁহার সহিত, সমাজের সহিত যতই কেন সদ্ব্যবহার কর না, সেই যে কবে তুমি বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলে তাহাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। তিনি চিরদিনই সেই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবেন। হয় ত তোমার কথা পড়িলে তিনি লোকের কাছে সেই কথা গল্প করিবেন। কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলেও তোমার সেই অসদ্ব্যবহারের কথা তিনি কথা উপস্থিত হইলেই বলিবেন। এইরূপে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যখন দশ জন দশ দিকে যাইবে, তখন সেই ধারণা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। তোমার ভবিষ্যতের ব্যবহার যত ভালই হউক না কেন, সেই বিদ্যালয়ের ব্যবহারানুসারেই তাঁহাদের নিকট, তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট, তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদির নিকট পরিচিত হইবে। অতএব এক্ষণে খুব সাবধান যেন কোন প্রকার কুব্যবহার কাহারও সহিত না করা হয়। এই সদ্ব্যবহার কেবল ব্যক্তিগত নহে, সাধারণতঃ সকলের নিকট বিনীত, নম্র, সহৃদয় হওয়া চাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, M.A., B.L.,

প্রেমময়।

(শ্রীহীন-পাগল-লিখিত)

২১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মায়া-নদী।

জ্ঞানদেবের সঙ্গে জীব সেই সাধন-কুঞ্জে নয়ন মুদিত করিয়া জপ করিতেছেন। সম্মুখে বাক্য ও মন নিশ্চল হইয়া উপবিষ্ট। জীবের এতদিনে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ। তিনি নাম ও নামীকে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে অভিন্ন বোধে, প্রাণকে তাঁহার পদে দিয়াছেন। আর তাঁ'র পাপপুণ্য সুখ দুঃখ নাই—এত দিনে চরণকমলচ্যুত সুধাধারা পানে প্রাণ তাঁহার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া সন্তরণ করিতেছে। এইরূপ জপ করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল। নয়নযুগল হইতে দরদরে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার বদন হইতে বাহির হইল "আহা! ওই নবনীত-কোমল সুন্দর চরণ-দু'খানি যে কর্কশ বনভূমির বন্ধুর পথে ক্ষত বিক্ষত হ'বে?"

জ্ঞান বলিলেন "কি বল্‌চো ভাই?"

জীব নিশ্চল। কোনও উত্তর নাই। চক্ষু দু'টি তেমনি মুদিতই আছে। ক্ষণেক পরে বলিলেন "তোমরা ফুল তুলে ঐ বন পথে বেশ ঘন ক'রে ছড়িয়ে দাও না গো। দেখ্‌তে পাচ্চ না কি, কত কাঁকর পথে। ও পথে হাঁটলে যে বড় কষ্ট হ'বে।"

জ্ঞান, জীবের দেহ স্পর্শ করিলেন। জীব চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন "একি? আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।"

জ্ঞান বলিলেন "স্বপ্ন নয়, সত্য দেখ্‌ছিলে, কিন্তু এখানে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিতে। বিলম্ব কর অচিরেই সে দেশে সুকৃতির সাহায্যে যেতে পার্‌বে। এখন এস, এদের দু'জনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনি। বল মন, কি দেখেছ।"

মন। "বাক্য আর আমি শাস্ত্রে যেরূপ পথের পরিচয় পড়েছিলাম, সেই মত পথ অন্বেষণ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে, মায়ানদীর কূলে গেলাম। সেই নদীর অপর পারে একটি অতি উচ্চ পর্ব্বতমালা। জলে তা'র প্রতিবিম্ব বিপরীত ভাবে পড়ে রয়েছে। মনে হ'লো বহুবার এই জীবের সঙ্গে ডুবে, সেই প্রতিবিম্বিত পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর হ'তে বহু শৃঙ্গ তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রেছি তখনও ভ্রাতা বাক্য আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আপনিও ভিন্ন মূর্ত্তিতে ছিলেন।"

জ্ঞান। "আচ্ছা জীব, তোমার কি ভাই সেরূপ কোনও পর্ব্বতের কথা স্মরণ হয়?"

। "যেন স্মরণ হ'চ্চে। আচ্ছা সে পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে পাঁচটি শৃঙ্গ আছে কি ?"

জ্ঞান। "হাঁ!"

জীব। "মনে হয় একবার আমি ভগ্নপদ আপনাকে নিয়ে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর আশ্রমে উপনীত হই। তিনি অন্ধ। আপনাকে পেয়ে বড়ই ব্যাকুলা হ'য়ে সদাব্রতে যা'বার জন্য আপনাকে কোলে নিয়ে আমার হাত ধ'রে সেই নদীকূলে উপনীত হ'য়েছিলেন। তখন এক দুর্দ্দান্ত দস্যু এসে আমায় ঐ নদীতে ফেলে দেয়। আমি অতল জলের তলে গিয়ে সেই পর্ব্বতশিখরে লগ্ন হই। যদিও সেই পর্ব্বত, নদীর অপর তীরস্থ পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব মাত্র, কারণ জলের ভিতর তার মূল ঊর্দ্ধে আর শৃঙ্গগুলি নিম্নে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই নদীর মধ্যে সেই অধঃশির প্রতিবিম্বকে সত্য পর্ব্বতরূপেই দেখ্‌তে পেলাম। ওরই একটি শৃঙ্গে লগ্ন হ'বার পর আমার দৃষ্টিশক্তির বিকাশ হ'লো আর এই মন আমায় সঙ্গে ক'রে ক্রমে অপরাপর শৃঙ্গে নিয়ে যেতে লাগলেন। ইনি বল্‌লেন ঐ শৃঙ্গ পাঁচটির নাম, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদন ও স্পর্শন শৃঙ্গ। ঐ পাঁচটি শৃঙ্গে ভ্রমণের পর আমার ঐ পাঁচটি শক্তি বেশ বর্দ্ধিত হ'লো জলের মধ্যেও দর্শনাদি কার্য্যের কোনও ব্যাঘাত হলো না, এমন কি আমি যে মায়ানদীর মধ্যে ডুবে আছি সে কথাও কয়েক দিনের মধ্যে ভুলে গেলাম। একটি রমণী আমায় বড় যত্নে পালন ক'ত্তে লাগ্‌লেন। মন বলে দিলেন তিনি আমার জননী। কয়েক দিন পরে তিনি আমায় আর এক শৃঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে আমার এই বাক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো এবং একজন মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচয় হ'লো, মাতা আমায় বল্লেন তিনিই আমার পিতা। এই মন ও বাক্য সে কথার পোষকতা কল্লেন। আমি পিতা মাতা পেয়ে পর্ব্বতের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে ভ্রমণ ক'ত্তে লাগ্‌লাম। ক্রমে পর্ব্বতের মূলের দিকে উঠ্‌তে থাক্‌লাম। প্রথমে ভাষণ শৃঙ্গ, ধারণ শৃঙ্গ, ধাবন শৃঙ্গ অতিক্রম ক'রে আপনার দর্শন পেলাম। কিন্তু তখন আর সেই নদীকূলে যে আপনাকে খঞ্জ অবস্থায় বৃদ্ধা ভক্তিদেবীর ক্রোড়ে রেখে এসেছিলাম সে কথা মনে ছিল না। এমন কি আমি কর্ম্মপথে কোনও অভীষ্ট স্থানে যাচ্ছিলাম সে কথাও মনে ছিল না। আপনি আমায় আর এক মহাপুরুষের কাছে নিয়ে গেলেন, বল্লেন বিদ্যাভ্যাস ক'ত্তে হ'বে ইনি তোমার প্রথম গুরু। তিনি আমায় উপনীত করে শ্রুতিশৃঙ্গে নিয়ে গেলেন আমি ঋগাদি বেদত্রয় পেলাম। তা'র পর তাঁ'রই সঙ্গে স্মৃতি-শৃঙ্গে গিয়ে মন্বাদি প্রণীত গ্রন্থনিচয় পেলাম। অবশেষে তিনি অষ্টাদশ পুরাণ শৃঙ্গ ভ্রমণ করিয়ে, আমায় ন্যায়বৈশেষিক নামক এক যুগ্ম-শৃঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর আর এক মহাপুরুষ আসিয়া আমায় সাংখ্য-পাতঞ্জল নামক আর এক যুগ্ম-শৃঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুদিন বাস কর্‌বার পর একদিন রজনীতে এক ভীষণকায় রাক্ষস এসে আমায় গ্রাস করলে আমি তা'র উদরগত হ'য়ে এক অপূর্ব্ব স্থানে গেলাম, সেখানেও আবার সেই মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো। তারপর—বোধ হয় তিনিই আমার গুরুদেব।"

জ্ঞান। হাঁ তিনি তোমার গুরুদেব বটেন আর সেই যে ভীষণকায় রাক্ষস তোমায় গ্রাস করেছিল সে মৃত্যু। সে তোমার তাৎ-কালিক পরিচ্ছদ মাত্র গ্রাস করেছিলো। গুরুদেব অনন্ত জীবের জন্য অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত জগতে অনন্ত বেশে নিরন্তর ভ্রমণ কর্‌চেন ঐ যে পিতামাতা ও শিক্ষক পেয়েছিলে তাঁ'রাও তোমার সেই গুরুদেবই। তবে পরিচ্ছদ স্বতন্ত্র ছিল ব'লে চিন্তে পার নাই। মৃত্যুর উদর মধ্যে যা দেখেছ তা তোমার স্মরণ নাই। পরে কিরূপে অন্য পরিচ্ছদ গ্রহণ করে মায়ানদী দিয়ে বিষয়ারণ্যে গিয়েছিলে তাও বোধ হয় স্মরণ নাই ক্রমে সবই নখদর্পণবৎ দেখ্‌তে পা'বে।"

জীব। "আপনার সে খঞ্জত্ব কিরূপে দূর হ'লো' ?"

জ্ঞান। "আমরা মায়ের কৃপাতরিতে আরোহণ ক'রে প্রেমময়ের সদাব্রতে গিয়েছিলাম। সে দেশে গিয়ে আমার পদ আর আমার ভগ্নীর চক্ষু ও যৌবনশ্রী পুনর্লব্ধ হ'য়েছে।"

জীব। "কিরূপে? একটু বিস্তার ক'রে বলুন।"

জ্ঞান। "আমারা দুজনে নদি কূলে ব'সে ভাব্‌চি, এ জনশূন্য স্থানে কি উপায় হ'বে। আশ্রমে তবু কষ্টে দু একটা ফল কি একটু জল পেতাম। কিন্তু এখানে তা'র কিছুই নাই—মরুভূমি—যদিও মায়া-নদীতে জলের অপ্রতুল ছিল না—কিন্তু আমরা দু'জনেই জানি ও জল বড়ই বিষাক্ত—ওর এক বিন্দু পান কর্‌লেই মৃত্যু নিশ্চয়। দিদি কাঁদতে লাগ্‌লেন—"হা অদৃষ্ট, প্রেমময়ের সদাব্রতে যা'ব ব'লে এলাম—আশা সফল হ'লো না। এখানেই ম'ত্তে হবে?"—তাঁ'র রোদনে পিতা সম্মুখে প্রকাশ হ'য়ে ব'ল্লেন, "কাঁদিস নে মা, এখনই কৃপাতরি আস্‌বে তা'তে উঠে ঐ দক্ষিণদিকে যা'স্। ঐ দিকে যে উচ্চ তরু আছে তা'থেকে একটি লতা জলের উপর ঝুলে পড়েছে। তুই জ্ঞানের কোমর ধরে থাকিস্, জ্ঞান সেই লতা ধ'রে তোরে নিয়ে সেই গাছের সব উপরের ডালে নিয়ে যা'বে, তা'র উপর গেলে আবার তোদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিকাশ হ'বে। তোরা অনায়াসে গাছের ডাল ধ'রে, সেই প্রেমময়ের সদাব্রতে উপনীত হ'তে পার্‌বি।"—তাই হ'লো। এক জ্যোতির্ম্ময় দেশে এক জ্যোতির্ম্ময় অট্টালিকার সম্মুখে উপনীত হ'লাম দ্বারে একটি স্ত্রীলোক,—যুবতি—দেখে সঙ্কোচ হ'লো আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দিদি অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ ক'ল্লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, দেখি আর একটি যুবতি অট্টালিকা হ'তে বাহির হ'য়ে আমার দিকে আস্‌চেন। আমি ভাব্‌চি বুঝি আমায় ডেকে নিয়ে যা'বার জন্য। তিনি আমার কাছে এসে বল্লেন "জ্ঞান, দাদা, আমায় চিন্‌তে পাচ্চিস্ নে ভাই? আমি যে তোর ভক্তি দিদি। আমি প্রেমময়ের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁ'র কৃপায় আমার আবার যৌবন পুনরাগত হ'য়েচে। তিনি বল্লেন "তোমার অন্ধত্ব গেছে, জ্ঞানেরও খঞ্জত্ব গেছে। আর ভয় কি এখন যাও আবার সেই জীবের অন্তর-রাজ্যস্থিত নিজ নিজ আশ্রমে থেকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর গে। যত দিন না সেই জীবকে নিয়ে এখানে আস্‌বে, তত দিন ত এখানে

থাকৃতে পা'বে না।" তাই আবার আমরা এখানে এসে রয়েছি।"

জীব। "এবার বুঝি আমায় নিয়ে যাবেন ?"

জ্ঞান। "তিনিই জানেন। কত দিনে সে শুভ দিন হ'বে ?"

জীব। "আপনি জানেন না ?"

জ্ঞান। "দিদি জানতে পারেন, আমি জানি না। মন, তার পর ?"

মন। "তার পর আমি বাক্যকে ব'ল্লাম, ভাই হে, এখন উপায় কি ? বাক্য বল্লেন, "শুনেচি, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' এ মায়া-নদী উত্তীর্ণ হ'বার উপায় ঐ বই আর কিছু আছে এমন শুনি নাই।" দুজনে সেই বালুকার উপর মা মা ক'রে অনেক কাঁদলাম। দৈববাণী হ'লো। জীবকে নিয়ে না এলে কোনো ফল নাই। তবে যতদূর তোমাদের সাধ্য ততদূর যদি যেতে চাও, তবে যাও মনের পৃষ্ঠে বাক্য আরোহণ কর। মন শূন্য পথে বরাবর যতদূর পার সোজা চলে যাও। তাই করলাম। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে বাক্য বল্লেন আর যা'বার যো নাই। সুপ্রশস্ত নদী। তা'র ও পারে বোধ হ'চ্চে যেন ভয়ঙ্কর অগ্নি জ্বলচে। আর এগুলে দগ্ধ হ'ব ? কাজেই সেখান থেকে ফিরে এলাম।"

জ্ঞান। "কি দেখ্‌লে ?"

মন। "আমি কিছুই দেখিনি। বাক্য বল্লেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ।"

জ্ঞান। "তুমি বুঝি এমনি চোক্ বেঁধেই গিয়েছিলে ?"

মন। "আপনি যখন আদেশ করেন, সে সময় এরা আমার চোক বেঁধে "কানামাছি" খেল্‌ছিলো। আপনি হুকুম ক'ত্তেই ছুটে-গিচি। চোক খোল্‌বার কথা ভুলে গিছি-লাম।"

জ্ঞান। "বেশ বুদ্ধিমান যা'হোক। চোক খোলা থাকলে বুঝতে পা'ত্তে বিরজার কূলে গিয়েছিলে। তা'র ওপারে ও যাওয়া যায়। সে আগুণ নয় সেই অনন্তদেবের অঙ্গ-কান্তির আভা।"

মন। "জীবকে না নিয়ে গেলে ত কিছু হ'বে না।"

জ্ঞান। "এস চোখের বাঁধন খুলে দিই একটু বিশ্রাম কর গে।"

এই বলিয়া জ্ঞান মনের চক্ষু-বন্ধন খুলিয়া দিলেন। মন জীবকে দেখিয়া "এই যে জামাইবাবু," বলিয়া যেমন প্রণাম করিলেন অমনি স্থির নিশ্চল হইলেন। বাক্যও পদ-তলে লুণ্ঠিত হইবামাত্র নিস্পন্দ হইল। জীব তাহাদিগকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহারা তাঁহার দেহে বিলীন হইল।

জ্ঞান। "ভাই জীব, আজ তোমার মনের লয় হইল। বাক্যও সংযত হইল।"

জীব। "হুম্।"

(ক্রমশঃ)

হতাশের ক্রন্দন।

পাষাণে বেঁধেছি হিয়া, সুখ শান্তি বিসর্জ্জিয়া
　　পাষাণ ক'রেছি মম প্রাণ,
দয়া-হীন মায়া-হীন, হইতেছি দিন দিন,
　　ইহা বিনা নাহি পরিত্রাণ।
কাতর ক্রন্দন আর দীর্ঘশ্বাস নিরাশার
　　এবে মোর পশে না শ্রবণে,
ঝটিকা ভীষণতর বহিতেছে নিরন্তর,
　　দেখিতেছি শান্তিহীন মনে।
কেহ কি জানে কখন, এ ঝড়ের অবসান,
　　হ'বে কি না ?—হ'বে কত দিনে ?
নিবে যা'বে দাবানল, ব'বে বায়ু সুশীতল,
　　হায় ! তাহা জানিব কেমনে ?
যত আশা ছিল মনে, হৃদয়ের এক কোণে,
　　এবে তাহা হেরি' লুপ্ত-প্রায়,
কাল মেঘে আবরিল, দশদিক আচ্ছাদিল,
　　অন্ধকার হ'ল সমুদায়।

দেখিয়াছি বারেবারে ভাল নাহি লাগে মোরে
　　আত্মীয় স্বজন—আর—আর,
যখন যে দিকে চাই, শূন্যময় সব ঠাঁই,—
　　নিরাশার ঘোর অন্ধকার।
হায় রে ! মানব-মন, স্বার্থপূর্ণ অনুক্ষণ,—
　　স্বার্থ ছাড়া না থাকে কখন ;
দেখায় কতই প্রীতি, কত ভাব—কত ভক্তি
　　ভালবাসা—স্বার্থ যতক্ষণ।
এই বিশ্ব চরাচরে, সতত স্বার্থের তরে,
　　ভ্রমণ করি'ছে নিরন্তর।
জন-পূর্ণ এ ধরায় কেহ কি নাহিক হায়—
　　স্বার্থহীন যাহার অন্তর ?
কোথা যদি থাক কেহ পর দুঃখে জ্বলে দেহ,
　　দয়া কর এই আকিঞ্চন ;
সংসার-সাগর-নীরে, পড়িয়া বিষম ফেরে,
　　ভাসিতেছি—ডুবিব এখন।

কাঙ্গাল।

ডাকার মত ডাকা।

যুধিষ্ঠির কপট পাশক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বিষাদে মুহ্যমান হইলে, দুষ্টমতি শকুনি উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল "মহারাজ, অক্ষক্রীড়ায় এইরূপ উপর্য্যুপরি পরাজিত হইয়াও হতাশ হইবেন না। এখনও আপনার পণ রাখিবার অনেক জিনিস আছে, এইবার পণে আপনি নিশ্চিতই জয়লাভ করিবেন। সতী দ্রৌপদীকে এইবার পণ রাখুন।" যুধিষ্ঠির ক্রমাগত হারিয়া জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন, দুষ্টবুদ্ধি শকুনির প্ররোচনায় সেইবার সত্য সত্যই দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। এইবার দ্রৌপদী জিত হউক বলিয়া শকুনি পাশ কাটি ফেলিলেন, জিৎ, জিৎ বলিয়া কৌরবপক্ষের কর্ণ, দুঃশাসন, দুর্য্যোধনাদি হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। পামরেরা বুঝিল না যে এই হর্ষ কোলাহল একদিন রোদন নিনাদে পরিণত হইবে। ভীমার্জ্জুন ও নকুল-সহদেব পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির হেটমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। দুঃশাসন বলিল,

"দ্রৌপদীকে যখন আমরা পণে জিতিয়াছি তখন সে আমাদের, তাহাকে এখানে আসিয়া দাসীবৃত্তি করিতে হইবে।" পরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, কুমন্ত্রণার প্রধান সহায় কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিবার জন্য দুর্বৃত্ত দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন। 'একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ,' 'দাদার ভাই' দুঃশাসন আর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক একবস্ত্র পরিহিতা, আলুলায়িত কুন্তলা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিল। ভীমার্জ্জুন পাঞ্চালীর এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া ধর্ম্মপুত্রের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার ভূমিনিক্ষিপ্ত দৃষ্টি উত্তোলিত হইল না। ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহারা যে কোন কাজ করিতে অসমর্থ। অগত্যা অন্তরে দাবাগ্নি প্রদাহ লইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, মহাপরাক্রান্ত স্বামীগণকে হেটমুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া পাঞ্চালী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁহার এই অপমানের কারণ কি?" কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ কেহই তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পাষণ্ড দুঃশাসন তাঁহার বাক্যের উত্তরে বলিল "তোমার স্বামীগণ পাশায় তোমাকে পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তোমার আর রাজরাণীর বেশে থাকা ভাল দেখায় না। তোমার স্বামীগণ তোমাকে সে কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। এমন কি ধর্ম্মরাজ নিজে ও চারি ভ্রাতা সহ পণে হারিয়াছেন; তাঁহারাও এক্ষণে আমাদের দাস। অতএব তোমার পরিধেয় বস্ত্রালঙ্কার এক্ষণে সকলি আমাদের।" এই বলিয়া পামর দুঃশাসন সবলে সভামধ্যে দ্রৌপদীর গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী সভাজন সমক্ষে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু বিনাশের সময় বিপরীত বুদ্ধি ঘটে বলিয়াই কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না, কিম্বা দুঃশাসনের কুকার্য্যের প্রতিবাদ করিল না! তখন কৃষ্ণা কায়মনে করযোড়ে সেই সর্ব্বদুঃখভঞ্জন, অনাথ-পালন, লজ্জানিবারণ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কোথা হে মধুসূদন বিপদভঞ্জন,
দাও হে দেখা চিরসখা রুক্মিণীরঞ্জন।

মরি লাজে সভামাঝে ওগো নারায়ণ,
ত্রাণকর এ বিপদে বিপদবারণ।"

হে সখা! আজ কুরুসভামধ্যে দুষ্টমতি দুঃশাসন তোমার সখীর কি লাঞ্ছনা করিতেছে একবার আসিয়া দেখ। হে দেব! তুমি করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু, তোমাকে বিপদে মধুসূদন বলিয়া ডাকিলে আর বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি সর্ব্বদুঃখহারী। হে দেব! আমার লজ্জানিবারণ কর। হে চিরসখা! আমার এই বিপদ হ'তে পরিত্রাণ কর, তুমি বই আমায় এই বিপদে কে রক্ষা করিবে। তুমি পাণ্ডবগণকে পদে পদে রক্ষা না করিলে এতদিন হয় ত পাণ্ডব নামের অস্তিত্ব লোপ পাইত। হে দেব! আমি যে তোমার সখী বলিয়া সর্ব্বদা গৌরব করিয়া থাকি আমার সেই গৌরব রক্ষা কর। হে দেব! আমার নিজের কোন গুণ নাই, তুমি

নিজগুণে এ অধিনীকে পরিত্রাণ কর। হে শরণাগতপালক! আমি তোমার একান্ত আশ্রিত, তুমি এ বিপদ হইতে মুক্ত না করিলে আমার যে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায় নাই দেব। হে সখা! মদীয় দিকপাল সদৃশ স্বামীগণ আজ অধিনীর কপাল দোষে আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পরাঙ্মুখ, তাই বলিয়া তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে? আমি মৃত্যুতুল্য এ অপমান সহ্য করিতে পারিব না। হে দেব, ত্রিলোকে তোমার দীনদয়াল নামে কলঙ্ক রটিবে ইহাই ভাবিয়া মৃত্যু সময়েও শান্তি পাইব না। দ্রৌপদীর এইরূপ স্তবে দ্বারকায় প্রভুর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিল। প্রভু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছিলেন, রুক্মিণী দেবী পদসেবা করিতেছিলেন, প্রভু উঠিয়া বসিলেন দেখিয়া দেবী রহস্য করিয়া বলিলেন কি ঠাকুর, আবার মনে কি ভাবের উদয় হইল, কাহার কথা মনে পড়িল, কে এমন ভাগ্যবতী, শুনিতে পাই না কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন দেবি, এ রঙ্গের সময় নয়। আমার প্রিয় সখী পাঞ্চালী মহাবিপদে পতিতা, আমি তথায় দ্রুত না গেলে, তাহার প্রাণ বাঁচান দায় হইবে। এই বলিয়া ঠাকুর গরুড়কে স্মরণ করিলে, বিহঙ্গমরাজ তথায় উপস্থিত হইল, তিনি তদুপরি আরোহণ করিয়া ত্বরিত-গমনে কুরুসভামধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে উপনীত হইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্ত্র দিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। পাপমতি দুঃশাসন যত বস্ত্র টানিতে লাগিল ক্রমাগতই নব নব বস্ত্র বাহির হইয়া পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল বস্ত্রের অন্ত নাই। পরিশেষে দুষ্ট দুঃশাসন শ্রান্ত ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিরাশ হইয়া সভামধ্যে উপবেশন করিল। সভাজনে চমৎকৃত হইল। আহা, প্রভুর কি অপরিসীম দয়া, ভক্তের ভগবান ভক্তের ডাকে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন কি? তাঁহাকে যে আসিতেই হইবে। তবে ডাকার মত ডাকা চাই; তন্ময় হইয়া ডাকা চাই। মনপ্রাণ ভরিয়া প্রাণের আবেগে ডাকা চাই। কোন প্রকার কারচুপি তাঁহার কাছে খাটে না। তাঁহার নিকট মেকী চলে না। পাঠক, মনে প্রাণে এইরূপ এক করিয়া ডাকিতে চেষ্টা করুন। ঐকান্তিক ডাকে ভগবান সাড়া না দিয়া, দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবান স্বয়ং নারদকে বলিয়াছেন,—

> "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
> মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

"হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও অবস্থান করি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নামগান করেন, সেখানে আমার অধিষ্ঠান জানিবে।"

শ্রীআশুতোষ রায়।

"শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।"

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাঃ চৈতন্যচরিতামৃতম্॥"

কণ্ঠের হারে মধ্য মণিটি সুন্দর দ্যুতিমান্।
তারকার মাঝে, হেরি গ্রহরাজে, জুড়ায় নয়ন, প্রাণ
সুরপুরে নানা দেবতা বেষ্টিত, শোভে কিবা আখণ্ডল॥
ভূপতির শিরে, হেরি কোহিনূরে, করে তাহা ঝল্‌মল্।
সরিৎ কুলের গরিষ্ঠ গঙ্গা, পতিত পাবনী নাম।
পাদপদ্ম হ'তে, বাহির হইয়ে, পূত করে কত ধাম॥
হিমের আলয়, ধন্য হিমালয়, নাগরাজ বলে ধন্য।
ধীর গম্ভীর পরম যোগীর, প্রকাশে ভাবের চিহ্ন॥
সরোবর নীরে পত্র বেষ্টিত, অফুট কুসুম মাঝে।
সুন্দর বর ফুল্ল কমল আহা মরি কিবা সাজে।
সতী-শিরোমণি সহধর্ম্মিণীর সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু।
ললিত-কুন্তল—কৃষ্ণ-সাগর মথি' উঠে যেন ইন্দু॥
শঙ্কর বুকে, রাতুল চরণ বড়ই মানস লোভা।
সখিগণ মাঝে কিশোরী কিশোর, কি বলিব তার শোভা॥
যোগীবর মাঝে, মহাদেব যোগী, সকল যোগীর মান্য।
"শিবোহহং," "শিবোহহং" রব উঠে ভেদি' শূন্য॥
জ্ঞানী চাহি' আছে, ব্রহ্মের পানে, জ্যোতিঃ হেরি' আত্মহারা।
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে, স্বয়ং ভগবান্ ফেলিতেছে অশ্রুধারা॥
গ্রন্থখানি মাঝে, নানা রত্ন সাজে, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলি কারে?
"চরিত-অমৃত," যেন দুগ্ধ-সার, কে যেন বলিল মোরে॥
ভাব, প্রেম-রস পুষ্ট কলেবর "শ্রীচরিতামৃত"খানি।
তাই, শিরঃ পরশিয়ে, ল'য়েছি হৃদয়ে, মহারত্ন-জ্ঞানে টানি'॥
রাঙ্গা পা দু'খানি মধুর, উজ্জ্বল, হেরিতে যাহার সাধ।
সাধু গুরু কাছে, "চরিতামৃতের" করুক্ সে রসাস্বাদ্॥

দীন-শ্রীরসিকলাল দে।

ব্যায়ামে বিজ্ঞান।

(দ্বিতীয় বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা—১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

১। আত্ম-চালিত বা আভ্যন্তরিক শক্তি প্রয়োগে স্পন্দন।

(ACTIVE MOVEMENTS.)

যে স্পন্দনক্রিয়া গুলি রোগীর নিজ শরীর-স্থিত আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাকে আত্ম-চালিত বা আভ্যন্তরিক অর্থাৎ আত্ম-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা স্পন্দন বলা যায়। ইহা প্রথমতঃ রোগীর ইচ্ছা (will) হইতে উৎপন্ন হয়, এবং স্নায়ুমণ্ডল-দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ পেশীসমূহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদি বাহ্য-ক্রিয়ায় পরিণত হয়, অথবা বাহিরের দিক্ হইতে ধরিলে, যে স্পন্দনটি আমরা বাহিরে প্রকাশ হইতে দেখিতেছি, উহা

চিত্র নং ২
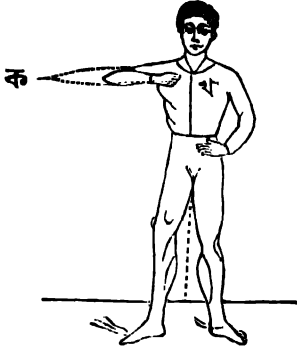
আত্ম-চালিত দক্ষিণ নিম্ন বাহু সঙ্কোচন।

প্রথমে রোগীর ইচ্ছানুযায়ী তাহার শরীরাভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারই ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডল ও পেশী সমূহের সাহায্যে বাহ্য-ক্রিয়ায় পরিণত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহার গতি, প্রকার, এবং সময়াদি নিরূপণও রোগীরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং এই সম্পূর্ণ ক্রিয়াটির মূলে একমাত্র রোগীর ইচ্ছাশক্তি-(will power)-ই প্রবল ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। (২নং চিত্রদেখুন।)

এই চিত্রে আত্ম-চালিত দক্ষিণ নিম্নবাহু সঙ্কোচনের ক্রিয়া দেখান হইয়াছে ইহাতে যে, হস্ত প্রসারণ ও আকুঞ্চন-ক্রিয়াগুলি দেখান হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণরূপে রোগীর ইচ্ছানুযায়ী এবং তাহার আত্ম-শক্তির দ্বারা চালিত বা সম্পাদিত হইতেছে। ইহার ক্রিয়া-কালে স্থানীয় পেশী সমূহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা শিরাগুলির উপর এক প্রকারে চাপ পড়ায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য ও জীবনীশক্তির বৃদ্ধি করে।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে পেশী সমূহ দ্বারাই শরীর বা উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আভ্যন্তরিক সকল প্রকার চেষ্টাই পেশী সাহায্যে সাধিত বা বাহ্যে প্রকাশিত হয়। স্নায়ুমণ্ডল হইতে পেশী ঐ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে পেশীর চালক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরন্তু সর্ব্বমূলে 'ইচ্ছা'—প্রথমে ইচ্ছার উদয় হইবে, পরে সেই ইচ্ছা স্নায়ুমণ্ডল সাহায্যে চালিত হইয়া পেশীতে উপনীত হইলে, পেশী উহা কার্য্যে পরিণত করিবে। ইহাই শারীর-ক্রিয়াতত্ত্বের মূলমন্ত্র।

দ্বিতীয় চিত্রটিতে আরও দেখিবেন যে রোগী সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত সমান্তরাল ও সম্পূর্ণ ঋজু ভাবে বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া (ক) চিহ্নিত স্থান হইতে (খ) চিহ্নিত স্থানে

উপনীত করিতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে অবস্থা-ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইলে ঠিক্ উহার প্রারম্ভাবস্থা হইতে শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতেছে।

কি রূপে কি ভাবে স্পন্দন-ক্রিয়াগুলি করিতে হইবে এবং কতক্ষণ কিরূপে কোন ক্রিয়াটি করিতে হইবে,* তাহা পূর্ব্বেই রোগীকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে রোগী যখন উহা সম্পাদন করিবে তখন তাহাকে আর কোন প্রকার সাহায্য করিবার বা উপদেশ দিবার প্রয়োজন না হয়, তখন যেন সে স্ব-ইচ্ছায় এবং কেবল মাত্র নিজের আভ্যন্তরিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়াগুলি আনুপূর্ব্বিক সম্পন্ন করিতে পারে। এইরূপ ক্রিয়াকেই আত্ম-চালিত বা আভ্যন্তরিক শক্তি প্রয়োগদ্বারা স্পন্দন বলা যায়।

২। পর-চালিত বা বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা স্পন্দন।

(PASSIVE MOVEMENTS)

যখন রোগীর সমস্ত অবয়ব বা তাহার কোন একটি অংশ, কেবল মাত্র বাহ্য-শক্তি দ্বারা স্পন্দিত করা হয়, তখন সেই ক্রিয়াকে পর-চালিত বা বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা স্পন্দন বলা যায়। এই ক্রিয়া রোগীর অভ্যন্তর হইতে কিছু মাত্র প্রকাশ হইবে না, সম্পূর্ণরূপে অপর পক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধকগণ-(gymnasts)-দ্বারা সম্পাদিত হইবে।—রোগী কোনরূপ আত্মচেষ্টা, এমন কি ইচ্ছা পর্য্যন্তও না করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, একেবারে নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকিবে, আর অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ (ক্রিয়াসাধকগণ) তাহার বা তাহাদের স্ব স্ব শক্তি-প্রয়োগ দ্বারা স্পন্দন ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিবে।

প্রথম অর্থাৎ আত্ম-চালিত স্পন্দন ক্রিয়ায় উল্লিখিত প্রধান প্রক্রিয়াগুলি,—যথা, ইচ্ছা-শক্তিতে উহার প্রথম উৎপত্তি ও স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ পেশীসমূহে উহার বাহ্য প্রকাশ ইত্যাদি,—এ স্থলে রোগীর ইচ্ছায় তাহার শরীরাভ্যন্তরে উৎপন্ন না হইয়া ক্রিয়া-সাধকগণের ইচ্ছায় তাহাদেরই অভ্যন্তরে ইহার উৎপত্তি এবং উহারই বাহ্য-ক্রিয়ায় উহার বিকাশ হইতেছে। সুতরাং এখানে এই সম্পূর্ণ স্পন্দন-ক্রিয়াটি রোগীর শরীরের বাহিরে উৎপন্ন হইয়া, পরে তদভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক কার্য্য করিবে—রোগীর সে জন্য নিজের পেশীসমূহের আকুঞ্চন বা প্রসারণ ইত্যাদি ক্রিয়াদ্বারা রক্তচলাচলের সহায়তা বা জীবনী শক্তির উত্তেজনা করিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। ক্রিয়াসাধকগণই ইহার বিধান করিবেন।

বাহ্য-শক্তি প্রয়োগ বিভিন্ন প্রকারে হইতে পারে। মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগ অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্র (electric battery) বা ঔষধাদি প্রয়োগকেও বাহ্য-শক্তি প্রয়োগ বলা যাইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে সে সকলের বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগের সঙ্গে আমাদের কথিত এই ক্রিয়াগুলির বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে,

* কোন্ রোগে কি রূপ স্পন্দনক্রিয়ার আবশ্যক এবং তাহার গতির সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

এবং সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে সকল ক্রিয়াসাধক দ্বারা এই কার্য্য-সাধিত করিতে হইবে, তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে, নতুবা আবশ্যক হইবামাত্র এরূপ ক্রিয়াসাধক খুঁজিয়া আনা বা প্রস্তুত করিয়া লওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। নিয়মিতরূপে কিছুদিন শিক্ষা করিলে তবে এই কার্য্যে পটু হওয়া যায়। দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়াম ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

চিত্র নং ৩
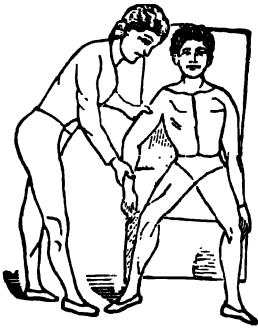
পর-চালিত দক্ষিণ নিম্নবাহু সংকোচনের প্রারম্ভাবস্থা।

তৃতীয় চিত্রটিতে পর-চালিত দক্ষিণ নিম্নবাহু সঙ্কোচনের প্রথম অবস্থাটি দেখান হইয়াছে। পরবর্ত্তী চিত্রে ইহার শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থা দেখিতে পাইবেন। এই চিত্রে দেখিতে পাইবেন যে রোগীকে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রাখিয়া উহার পদদ্বয় পরস্পর পৃথক ভাবে মেজের উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। ফলতঃ উহাকে এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে উহার নিজের ইচ্ছা বা চেষ্টাদ্বারা কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়া উৎপন্ন কিম্বা অপর দ্বারা কৃত সেইরূপ কোন ক্রিয়ার গতিবিধি বা সময় নির্দ্দেশাদি বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করিবে না, অর্থাৎ একবারে নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকিবে।

রোগী যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া এইরূপ নিশ্চেষ্ট জড়বৎ পড়িয়া থাকিবে, সেই সময় শিক্ষিত ক্রিয়াসাধকগণ তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। ক্রিয়াসাধক তাঁহার বামহস্ত দ্বারা রোগীর কফোনি সন্ধির (১) (কনুইয়ের) কিঞ্চিৎ উপরে (উৰ্দ্ধ বাহুতে) এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মণিবন্ধ সন্ধির (২) (কব্জির) কিঞ্চিৎ উপরে (নিম্নবাহুতে) দৃঢ়রূপে ধারণ

চিত্র নং ৪
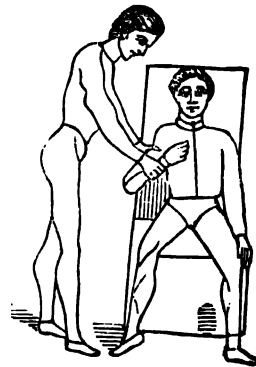
পর-চালিত দক্ষিণ নিম্নবাহু সঙ্কোচন সম্পূর্ণাবস্থা।

করিয়া (চিত্র প্রদর্শিতভাবে) ক্রমশঃ রোগীর নিম্নবাহুকে যতদূর সম্ভব নমিত ও আকুঞ্চিত করিয়া শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইবে। (চিত্র নং ৪ দেখ)।

(১) Elbow joint. (২) Wrist joint

উল্লিখিত ক্রিয়া সম্পাদন কালে রোগী তাহার কফোনি-সন্ধির বহির্ভাগে এক প্রকার টান্ বা আকর্ষণের, এবং অন্তর্ভাগে অর্থাৎ তদ্বিপরীত (ভিতরের) দিকে চাপের ন্যায় ভাব অনুভব করিবে। ইহার ফলে নিম্নবাহুর প্রসারণকারী পেশীসমূহের বল সাধন হয় অর্থাৎ ঐ সকল পেশীতে অধিক পরিমাণ বল সঞ্চারিত হয়। স্পন্দনকালে কফোনি-সন্ধির উভয়পার্শ্বে (উর্দ্ধে ও নিম্নে) ক্রিয়াসাধকের উভয় হস্তের চাপ্ দ্বারা তৎস্থানীয় শিরা সমূহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বন্ধ থাকায়, ছাড়িয়া দিবামাত্র তথায় অধিকতর বেগে সঞ্চালিত হইতে থাকে, ও স্নায়ুমণ্ডলের অতি সূক্ষ্ম স্পর্শবোধক সূত্রগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

দুটি কবিতা।

আহ্বান

এ ভুবন মাঝ আছে বহু কাজ,
উচ্চ লক্ষ্য রহে আশা উচ্চতর,
স্বার্থে অন্ধ হয়ে, রত নিজ লয়ে
তাই অন্য কাজে নাহি অবসর।
নিঃস্বার্থ হৃদয়, বড় সুখময়,
এ জীবনে কভু নাহি পায় দুঃখ।
স্বার্থ পরতায়, দুঃখ বেড়ে যায়,
না পায় জীবনে কেহ এতে সুখ।
আয় আয় রবে, মা যে ডাকে সবে,
এখনো কি হায়, মোহ ঘুম সাজে?
দেহ, প্রাণ, মন, করি অরপণ,
এস! যাই মোরা সবে মা'র কাজে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত

স্মৃতি।

গায়িছে বিহগকুল বৈতালিক সামগান,—
ধ্বনিতেছে সমীরণ, নাদে নদী কুলুতান।
বসন্ত-মালঞ্চ কোলে বিকশিত ফুল চয়,
বাসন্তী ব্রততী জালে আবরি নিকুঞ্জ ময়।
উদয়-অচল-শিরে ভানু রাজে কুতুহলে,
হাসি হাসি, উঠে ভাসি পূর্ব্বাশার কমগলে।
পূত "কর্ণফুলি" জলে লাল-ফুলে হেলে দুলে।
ললিত লোহিত খগ লীলায় খেলিছে কুলে।
মন্দার আলয় জিনি' শোভে আজি এ কানন!
কার স্মৃতি জাগে প্রাণে শরদিন্দুনিভানন!

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস।

পরোপকারী হাতেম্।

প্রথম দৃশ্য।

১

বাদসাহ নোফেল্ হয়ে হৃষ্ট-মন
আসীন সভায়; বেষ্টিয়া তাঁরে,
আছে যথা স্থানে পারিসদগণ,
রাজাদেশ তরে দু'কর-যু'ড়ে ॥

২

নৃপতি তখন ভাবিছেন মনে,
বহুদিন হ'তে করিনু কত!
অতিথি-সৎকার পরম যতনে;
কেহ নাই ভবে আমার মত!!

৩

কত অর্থ আমি করিয়াছি ব্যয়,
দীন দুঃখী তরে, জলকষ্ট হেরি!
রাজ্যে খনাইনু কত জলাশয়!
গেল কত দানে বলিতে নারি ॥

৪

ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসেন তাঁর
চাহি চারিদিকে পার্ষদগণে।
"বল মন্ত্রিগণ! অবনি মাঝার
কোন রাজা বড় হয়েন দানে ॥"

৫

একবাক্যে সব সভাসদগণ
বলে কর-যোড়ে বিনীত ভাবে।
"হাতেমের মত বড় কোন জন
দানেতে রাজন্ না হয় ভবে ॥"

৬

ঈর্ষানল-দগ্ধ ভূপতি তখন
শুনি মন্ত্রি-মুখে এমন কথা।
মনে নিজভাব করিলা গোপন,
—জানিতে না দিলা মনের ব্যথা ॥

৭

নিয়মিত সভা-কার্য্য সম্পাদন
করি গেলা ধীরে বিশ্রাম-ঘরে।
মনে মনে শুধু করিয়া চিন্তন
উপায় হাতেম-বিনাশ তরে ॥

৮

দেখিলা চিন্তিয়া, হাতেম থাকিতে,
তাঁর যশ ভবে কেহ না গাবে।
অতএব তাঁরে হইবে নাশিতে;
দিন রাত শুধু এ'কথা ভাবে ॥

৯

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুদিন পরে,
সসৈন্যে চলিলা লড়িতে ছু'টে।
হাতেমের সনে, মনে আশা ক'রে
বধি' রাজ্য তার আনিবে লু'টে ॥

১০

নৃপতি হাতেম, ধর্ম্মপরায়ণ,—
পর-উপকারী বলিয়া খ্যাতি
ব্যাপ্ত যাঁর ভবে,—গায় সাধুজন
শুন যথা তথা,—চিন্তিত অতি ॥

১১

ভাবিলা মনেতে, হয় যদি রণ,
দুই পক্ষে লোক হইবে হত।
তাই যা'তে রণ না হয় কখন
উচিত তা' করা,—অন্যের হিত ॥

১২

হাতেম এ ভাবি গেলা পলাইয়া
তাড়াতাড়ি এক গভীর বনে।
ফলমূলাহারে রহিলা পড়িয়া;
কোথায় আছেন কেহ না জানে ॥

১৩

এদিকে নোফেল আসি বিনা রণে
করি অধিকার হাতেম-রাজ্য।
আছে বটে, কিন্তু হর্ষ নাই মনে,
হ'ল না বলিয়া বাঞ্ছিত কার্য্য ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

১

করেন নোফেল দামামা পিটিয়া,
ঘোষণা রাজ্যের মাঝে।
হাতেমে যে জন আনিবে ধরিয়া,
পুরস্কার পাবে কাজে॥

২

শতস্বর্ণ মুদ্রা পাইবে নগদ
জায়গির পাইবে জমি।
পুত্র-পৌত্র-ক্রমে করিবারে ভোগ,
হ'লে হৃষ্ট দেশ-স্বামী॥

৩

শত শত লোক ছুটিছে চৌদিকে,
আনিতে হাতেমে ধ'রে।
লোভে গিরিবনে যথা তথা তাঁকে
খুঁজিছে যতন ক'রে॥

৪

কাঠুরে-দম্পতি,—বৃদ্ধ অতিশয়,
কাটিতেছে কাঠ্ বনে।
নিদাঘ সময়,—রৌদ্র জালাময়,
ছট্‌ফট্ করে প্রাণে॥

৫

বৃদ্ধাটি বৃদ্ধকে বলিতেছে ডাকি,
দুঃখেতে আক্ষেপ করি।
"কপালে মোদের এই ছিল নাকি!
দুঃখ যে সহিতে নারি!!"

৬

"দুঃখে দুঃখে কিগো যাইবে জীবন,
নাই কি কপালে সুখ?
ভাগ্যে হাতেমের পে'লে দরশন,
মিটে যা'য় সব দুখ॥"

৭

বৃদ্ধ বলে "আরে কি বলে পাগলা!
সাধটি তোর্ যে ভারি;
কে'টে নেরে কাঠ্, পাগলামি ফেলি,
বাড়ী যে'তে পথ ধরি॥"

৮

"মরিবার কালে এ'বৃদ্ধ বয়সে,
পালঙে শুইতে কিরে
সাধ্ হ'ল তোর? যম শুনে হাসে;
—সুখ পাবে মৃত্যু পরে॥"

৯

"পাব যদি মোরা রাজ-পুরস্কার
কাঠ্ কে কাটিবে বনে।
কে বেচিবে কাঠ্ যেয়ে দ্বারে দ্বারে?
(হায়!) দুঃখ যাবে দেহ সনে!!"

১০

বন অন্তরাল হইতে হাতেম
শুনিয়া তাদের কথা।
আসিয়া দাঁড়ান চকিতে তখন,
মনে পে'য়ে বড় ব্যথা।

১১

নেত্র ছল ছল, দুঃখে আত্মহারা,
বৃদ্ধ-পিঠে দিয়ে কর।
বলে "চল বাবা, নিয়ে মোরে ত্বরা
নৃপকাছে সরাসর॥"

১২

"পাবে পুরস্কার দুঃখ যাবে দূর,
লভিবে বাঞ্ছিত সুখ।
দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তোদের
আসিনু, নাশিতে দুখ॥"

১৩

বলে বৃদ্ধ "নাহি চাহি পুরস্কার,
তব প্রাণ বিনিময়ে।
লোভে প্রাণ প্রভু! না লব তোমার
নোফেলে তোমারে দিয়ে ॥"

১৪

"কেন হ'ব লোভে হেন পাপভাগী
লইয়া তোমার প্রাণ?
আছে ক'টি দিন, বরং দুঃখ ভুগি'
যাব নিয়ে বিভু-নাম ॥"

১৫

শুনিয়া হাতেম কহিলা বৃদ্ধেরে,
ধরি তার দুই কর।
বিনতি করিয়া, দুই চোখ ঝরে,
"মোর এ বচন ধর ॥

১৬

"স্ব-ইচ্ছায় আমি চাহি মরিবারে,
তোমাদের হিত তরে।
কোন পাপ বাবা, হবে না তোমারে;
—মাগি নিজে কর-যোড়ে ॥

১৭

"আমি বিভু-কাছে, যেন দেহ প্রাণ
[illegible] তরে।
নিশ্চয়ে করহ দুঃখ অবসান,
পুরস্কার লাভ ক'রে ॥"

১৮

"যদিবা এ কথা না রাখ আমার,
নিশ্চয় জানিও তবে।
যাইয়া নিকটে নোফেল রাজার
এ হাতেম তাঁরে কবে ॥

১৯

"তোরা দুঃস্থনার দুঃখের কাহিনী
হাতেমে আনিয়া দিল।"
বৃদ্ধ শুনি এই হাতেমের বাণী,
পা জ'ড়ে তাঁর ধ'রিল।

২০

মিনতি বৃদ্ধের হাতেম না শুনে;
—বার বার একি কথা?
ব'লে বৃদ্ধ "বুড়ী হায়! কি করিলি
আপদ! যাই বা কোথা?

১৯

"তুই যত বুড়ি! আপদের মূল;"
কাঁপে ক্রোধে কলেবর।
যত পারে গালি পাড়িছে সকল,
উচ্চ করি তার স্বর ॥

২০

অপর যাহারা খুঁজিতে আছিল
বন মাঝে হাতেমেরে।
শুনি' গোলমাল আসিল সকলে;
চলিল হাতেমে ধ'রে ॥

২১

বৃদ্ধ বৃদ্ধা দৌড়ে সজল নয়নে,
কাঠ্ ও কুঠার ফে'লে।
সকলের পাছে বিষাদিত মনে
রাজদ্বারে ধীরে চলে ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

১

রাজদরবার চুপে এক ধারে,
বৃদ্ধ বৃদ্ধা ম্লান মুখে
দাঁড়াল; অপরে বলে নৃপতিরে
"ধরিয়াছি আমি তাঁকে ॥"

২

"মহারাজ! আমি পাব পুরস্কার;"
সবাই এরূপ কয়।
শুনিয়া নৃপতি করিতে বিচার
হাতেমের সাক্ষ্য লয় ॥

৩

হাতেম তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশে,
বুড়া বুড়ী দুই জনে।
দেখাইয়া দিলা, যারা এক পাশে
দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ॥

৪

বলিলা "উহারা এনেছে আমায়
মহারাজ! দরবারে।
অপর সকলে লোভে মিথ্যা কয়
পুরস্কার লাভ তরে ॥"

৫

শুনিয়া একথা নোফেল তখন
বুড়াকে নিকটে ডে'কে
জিজ্ঞাসিল ;—বুড়া সব বিবরণ
নিবেদিল একে একে ॥

৬

বুড়া বুড়ী যাহা ব'লেছিল বনে,
হাতেম আসিয়া যাহা
ব'লেছিলা তাঁর সজল নয়নে
চকিতে, সকল তাহা ॥

৭

শুনিয়া তাজ্জব হইল নোফেল,
মুখে কথা নাহি সরে।
উঠি তাড়াতাড়ি বলে, নেত্রে জল,
হাতেমের হাত ধ'রে ॥

৮

"সাবাস ! সাবাস ! হাতেম সুজন !
তব মত কেহ নাই !
পর-উপকারী দাতা মহাজন,
ভবে বলিহারি যাই ॥

৯

"মম মত কেহ নাহি পাপী ভবে ;
ক্ষম অপরাধ মোর।"
বলিয়া বসান আলিঙ্গিয়া তবে
রাজসিংহাসনোপর ॥

১০

বলেন "এ'রাজ্য দিলাম ছাড়িয়া ;
তব রাজ্য ভাই ! নিয়ে।
সুখে কর রাজ, আমারে ক্ষমিয়া ;
রহিলাম দাস হয়ে ॥"

১১

শুনিয়া হাতেম বিনীত বচনে
বলিছেন কর-যোড়ে।
"আমি নহে রাজা, রাজা ভগবানে
জানি ; সদা মনে ক'রে ॥"

১২

"ভৃত্যের মতন থাকি সদাকাল,
তাঁরি আজ্ঞা শিরে ধ'রে।
কাজে যশ মান দেখিয়া,' সকল
মালিকের মনে করে ॥"

১৩

এইরূপ নানা আলাপের পর,
নোফেল সসৈন্যে যান
ফিরে নিজ দেশে, দিয়ে পুরস্কার
বুড়াকে জাগির দান ॥

১৪

হাতেমে সভক্তি করি আলিঙ্গন,
মিথ্যাকে দণ্ডিত করি।
অনুতাপ-দগ্ধ, সজল নয়ন,
পরা নীতি হৃদে ধরি ॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

বন্যা নির্দ্দেশক বৃক্ষ।— আমাদের ঝড়বৃষ্টি গণনাকারক শ্রীযুত নারায়ণ বড়ুয়া এক প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন ; উহার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে নদীতে বন্যার গতি নির্দ্দেশ করা যায়। সম্প্রতি ঐ গাছে মুকুল দেখা দিয়াছে, এই জন্য তিনি বলিতেছেন, ২।১ দিনের মধ্যেই বন্যার সম্ভাবনা। আশ্চর্য্য বৃক্ষ বটে !— (রত্নাকর)

বিলাতযাত্রা।— আগামী জুলাই মাসের প্রথমেই লণ্ডন সহরে ব্রিটিশ রাজ্যস্থ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মিলনসভার অধিবেশন হইবে। এই সম্মিলন সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ ডাক্তার পি, সি, রায় গতপূর্ব্ব সপ্তাহে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন,—অন্য প্রতিনিধি অনারেবল মিঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীও গত সপ্তাহে বিলাত গিয়াছেন। এ সম্মিলনসভায় শিক্ষাসংক্রান্ত নানা কথারই আলোচনা হইবার সম্ভাবনা।

(বঙ্গবাসী)

বৈশাখ প্রবৃত্তি ৪৬ দণ্ড ৪৬ সময়ে
সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের পরিমাণ ৩০ দিন ৫৬ দণ্ড ৪৯ পল

∴ বর্ত্তমান বৈশাখের পরিমাণ = ৩১ „ ৪৩ „ ৩৫ „
অর্দ্ধরাত্রের পর চৈত্রসংক্রমণ জন্য চৈত্রে এক দিন — ১

বাদ দিয়া— ৩০ । ৪৩ । ৩৫

অর্থাৎ বৈশাখের পূর্ণ পরিমাণের একদিন চৈত্রের ৩১এ-রূপে গৃহীত হওয়াতে ৩০এ বৈশাখ তেতাল্লিশ দণ্ড পঁয়ত্রিশ পলের সময় জ্যৈষ্ঠ-সংক্রমণ হইবে। ৪ × ৭ = ২৮এ শনিবার, সুতরাং ২৯এ রবিবার, ৩০এ সোমবার সংক্রমণ হইল এবং মাসটিও ত্রিশ দিনে পূর্ণ হইল। সংক্রমণ বার জানা থাক্‌লে, কত দিনে মাস শেষ হ'বে তাও নির্ণীত হ'তে পারে। যথা শুক্রবার চৈত্র সংক্রমণ হওয়াতে ২৮ দিনের দিন শুক্রবার হ'বে। কিন্তু কূট সংক্রান্তিবশে শনিবার ১লা না হইয়া রবিবার ১লা হওয়াতে, শুক্রবার ২৭এ, শনিবার ২৮এ, রবিবার ২৯এ এবং সোমবার ৩০এ মাস শেষ হ'বে। কেমন বুঝ্‌তে পা'ল্লে ?"

আমি। "আপনার কৃপায় বেশ্ বুঝতে পারচি।"

গুরুদেব। "এইবার আরো গোটাকত অঙ্ক দিই।"

তৃতীয় প্রশ্নমালা।

১। নিম্নলিখিত স্থান কয়টির পলভা নির্ণয় কর।

কলিকাতা, ঢাকা, দিল্লী, আগরা, রামপুরহাট, রাঁচি, যশোর, মান্দ্রাজ, ভাগলপুর, বালেশ্বর, বাঁকুড়া, এবং হরিনাভি বা তোমার নিজগ্রাম। তোমার নিজগ্রামের অক্ষাদি নির্ণয় কিরূপে করিলে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। ১৩২০ সালের কোন মাসের পরিমাণ কত দিন, এবং কি বারে বর্ষ সমাপ্তি হইবে ?

৩। ২২°-৩০' স্থিত দেশে ১৩২০ সালের বৈশাখ ও কার্ত্তিকের ১লা তারিখের স্ফুট দিন মাস দণ্ডাদি কত ?

প্রত্যেক অঙ্কের প্রত্যেক অংশ পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালার উত্তর এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট পাওয়া যায় নাই।

আমি। আপনার আদেশ মত উদয়াস্ত কস্‌তে গিয়ে দেখ্‌লাম। কোনও পাঁজিতে কোন গ্রহেরই ক্রান্তি (Declination) দেওয়া নাই। অথচ আপনার টেবিল দেখে কস্‌তে গেলে ক্রান্তি চাই। ক্রান্তি পা'ব কোথা ?"

গুরুদেব। "সায়ন সূর্য্য হ'তে ক্রান্তি নির্ণয়ের একটা টেবিল ত আমার খাতায় লেখা আছে, সেটা তুলে নাও নাই কি ?

আমি। "ও কথ মনে উদয় হয় নাই বলে তোলা হয় নি। এখন নিচ্ছি।" এই বলিয়া ক্রান্তি-সারিণীটি তুলিয়া লইলাম। টেবিলটি উঠাইয়াই একটি অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিলাম।

ক্রান্তি-সারিণী ।

মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত উত্তর-ক্রান্তি এবং তুলা হইতে মীন পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ক্রান্তি । অনুপাত দ্বারা ক্রান্তির ভগ্নাংশ নির্ণীত হইবে ।

স্ফুট রা অ ক	ক্রান্তি অংশ	স্ফুট র অ ক	স্ফুট র অ ক	ক্রান্তি অংশ	স্ফুট রা অ ক
০। ০। ০	০	৬। ০ ।০	৩। ০। ০	২৩।২৭	৯। ০। ০
০। ২।৩১	১	৬। ২।৩১	৩।১০।৫৬	২৩	৯।১০।৫৬
০। ৫। ২	২	৬। ৫। ২	৩।১৯।৪৩	২২	৯।১৯।৪৩
০। ৭।৩৩	৩	৬। ৭।৩৩	৩।২৫।৪৬	২১	৯।২৫।৪৬
০।১০। ৬	৪	৬।১০। ৬	৪। ০।৪৫	২০	১০। ০।৪৫
০।১২।৩৯	৫	৬।১২।৩৯	৪। ৫। ৬	১৯	১০। ৫। ৬
০।১৫।১৪	৬	৬।১৫।১৪	৪। ৯। ৩	১৮	১০। ৯। ৩
০।১৭।৫০	৭	৬।১৭।৫০	৪।১২।৪৩	১৭	১০।১২।৪৩
০।২০।২৮	৮	৬।২০।২৮	৪।১৬। ৯	১৬	১০।১৬। ৯
০।২৩। ৯	৯	৬।২৩। ৯	৪।১৯।২৬	১৫	১০।১৯।২৮
০।২৫।৫২	১০	৬।২৫।৫২	৪ ২২।৩৪	১৪	১০।২২।৩৪
০।২৮।৩৯	১১	৬।২৮.৩৯	৪।২৫।৩৫	১৩	১০।২৫।৩৫
১। ১।৩০	১২	৭। ১।৩৩	৪।২৮।৩০	১২	১০।২৮।৩০
১। ৪।২৫	১৩	৭। ৪।২৫	৫। ১।২১	১১	১১। ১।২১
১। ৭।২৬	১৪	৭। ৭।২৬	৫। ৪। ৮	১০	১১। ৪। ৮
১।১০।৩৪	১৫	৭।১০।৩৪	৫। ৬।৫১	৯	১১। ৬।৫১
১।১৩।৫১	১৬	৭।১৩।৫১	৫। ৯।৩২	৮	১১। ৯।৩২
১।১৭।১৭	১৭	৭।১৭।১৭	৫।১২।১০	৭	১১।১২।১০
১।২০।৫৭	১৮	৭।২০।৫৭	৫।১৪।৪৬	৬	১১।১৪।৪৬
১।২৪।৫৪	১৯	৭।২৪।৫৪	৫।১৭।২১	৫	১১।১৭।২১
১।২৯।১৫	২০	৭।২৯।১৫	৫।১৯।৫৪	৪	১১।১৯।৫৪
২। ৪।১৪	২১	৮। ৪।১৪	৫।২২।২৭	৩	১১।২২।২৭
২।১০।১৭	২২	৮।১০।১৭	৫।২৪।৫৮	২	১১।২৫।৫৮
২।১৯। ৪	২৩	৮।১৯। ৪	৫।২৭।২৯	১	১১।২৭।২৯

বর্ত্তমান ১৩১৯ সালে ১লা বৈশাখ রবিস্ফুট ০।১।১১।৫৪ অয়নাংশ ২১।১২ কলা অতএব সায়ন রবি ০।২২।২৩ টেবিল অনুসারে ০।২০।২৮=৮ অংশ ক্রান্তি

এবং ০।২৩।৯ = ৯ „ „

উভয়ের অন্তর ২।৪৯ = ১ „ „

পুনরায় ০।২৩।৯

এবং ০।২২।২৩-এর

অন্তর ০।০।৪৬ কলা

অতএব ২ অংশ ৪১ কলা বা ১৬১ কলা : ৪৬ কলা : : ৬০ কলা : কত?

অথবা $\frac{৪৬ \times ৬০}{১৬১}$ = ১৭ কলা

অতএব ৯ অংশ – ০।১৭ কলা = ৮ অংশ ৪৩ কলা ক্রান্তি, সূর্য্য মেষ রাশিতে এ জন্য উত্তর-ক্রান্তি।

আমাদের কলিকাতার ২২।৩৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং সূর্য্যের ক্রান্তি উত্তর—৮।৪৩

টেবিলে ৮ ক্রান্তি ২২ অক্ষে = ৬।১৩

৯ ক্রান্তি ২২ অক্ষে ৬।১৫

অতএব ১ অংশে অন্তর ২ মিনিট

৬০ কলায় : ৪৩ কলা : : ২ মি : কত?

অথবা $\frac{৪৩ \times ২}{৬০} = \frac{৮৬}{৬০}$ = ১ মি ২৬ সে

অতএব ৮।৪৩ ক্রান্তি ২২ অক্ষ = ৬।১৪।২৬

এবং ৮ ক্রান্তি ২৩ অক্ষ = ৬।১৪

৯ ক্রান্তি ২৩ অক্ষ = ৬।১৫

১ অংশে ১ মিঃ

অতএব ৪৩ কলা = ৪৩ সে

অতএব ৮।৪৩ ক্রান্তি ২৩ অক্ষ = ৬।১৪।৪৩

এবং „ „ ২২ অক্ষ = ৬।১৪।২৬

১ অংশ অক্ষে ১৭ সে

৬০ কলা : ৩৪ কলা : : ১৭ সে : কত?

অথবা $\frac{৩৪ \times ১৭}{৬০}$ = ৯½ সেকেণ্ড

অতএব ২২।৩৪ অক্ষে ৮।৪৩ ক্রান্তিতে ৬।১৪।৩৫ ঘণ্টাদি পাইলাম। অক্ষ ও ক্রান্তি উভয়ই উত্তর, এজন্য ইহাই অস্তকাল।

এবং ১২ – ৬।১৪।৫৫ = ৫।৪৫।১৫ উদয়কাল। এটা স্ফুটকাল। দেখিলাম পঞ্জিকাতে উদয় ৫।৪৫।৪ কিন্তু অস্ত ৬।১৬।৩৫। জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখুন দেখি, উদয় অনেকটা মিলেচে কিন্তু অস্তে যে অনেক তফাৎ?"

গুরুদেব। "ইংরাজী মতে গণনা কত্তে গেলে স্ফুটটাও ইংরাজীর কাছাকাছি হওয়া চাই। অয়নাংশ চিত্রা হ'তে সমসূত্রে নিতে হ'বে।"

আমি। "কেন রেবতী শেষ হইতেই ত মেষ?

গুরুদেব। তা'হ'লে প্রায় চারি দিন আগে মাস আরম্ভ হ'বে। ও কথাটাও এখন থাক। একবার একমেটেগোছ শিখে তার পর পঞ্জিকাতে কোথায় কি দোষ আছে তা আলোচনা ক'রো। এখন ও সব বুঝতে কষ্ট হ'বে। আপাততঃ স্থূলভাবে চিত্রার সমসূত্রে অয়ন গণনার একটা সঙ্কেত শিখে রাখ। ইংরাজীমতে বার্ষিক অয়নগতি প্রায় ৫০·২৪ বিকলা দৈনিক প্রায় ·১৩৮ বিকলা, এবং ১৮০০ শকের আরম্ভে ঐ মতে অয়নাংশ ২২।৮।৩০। অতএব ৩৪ বৎসরে ঐ হিসাবে ৫০·২৪ × ৩৪ = ২৮ কলা ২৮ বিকলা উহাতে যোগ ক'ল্লে ২২।৩৬।৫৮বা ২২।৩৭ চৈত্র-অয়নাংশ হয়। রবিস্ফুট আছে ০।১।১২ অতএব সায়নরবি (০।১।১২ + ০।২২।৩৭) = ০।২৩।৪৯

টেবিলে	০।২৩। ৯	= ৯	ক্রান্তি
এবং	০।২৫।৫২	= ১০	"
সুতরাং	২।৪৩	= ১	অংশ অন্তর

অতএব ১৬৩ কলা : ৪০ কলা :: ৬০ : ১৫

অতএব মেষের জন্য উত্তর ক্রান্তি ৯।১৫

	২২ অক্ষে	৯ ক্রান্তি	=	৬।১৫
	২৩ "	"	=	৬।১৫
অতএব	২২।৩৪ অক্ষেও	ঐ	=	৬।১৫
এবং	২২ অক্ষে	১০ ক্রান্তি	=	৬।১৬
	২৩ অক্ষে	" "	=	৬।১৭
	১ অক্ষ		=	১ মি

সুতরাং	৩৪ কলা	৩৪ সেকেণ্ড
অতএব	২২।৩৪ অক্ষে	১০ ক্রান্তি = ৬।১৬।৩৪ সেকেণ্ড
এবং	২২।৩৪ "	৯ ক্রান্তি = ৬।১৫। ০ "
সুতরাং		১ অংশ = ১।৩৪ "
অতএব		১৫ কলা = ২৪ সে

সুতরাং ৯।১৫ ক্রান্তিতে ৬।১৫।২৪ ইহাই স্ফুটাস্তকাল এবং বার ঘণ্টা

হইতে উহা অন্তর করিয়া ৫।৪৪।৩৬ ইহাই স্ফুট উদয়কাল। ইহাতে কালসমীকরণ সংস্কার দিলে যে অঙ্ক লব্ধ হ'বে তাই ঘড়ির উদয়াস্ত কাল। পঞ্জিকায় কলিকাতার ২২।৩৪ অক্ষ ধরা হয় নাই, এবং যে অক্ষ স্বীকার করা হ'য়েছে তা ধ'রেও ঐ উদয়াস্ত গণিত হয় নাই ? সুতরাং তাহার সহিত সামান্য অন্তর হ'বে।"

আমি। "হাঁ এই যে (২৩ পৃ গুপ্তপ্রেশ) পঞ্চাঙ্গুল দশ ব্যঙ্গুল ছায়া স্বীকার করা হ'য়েছে। সুতরাং ২৩ অংশের চেয়ে বেশী অক্ষ না হলেত আর ও ছায়া হ'বে না।

গুরুদেব। "তা'র পর আবার সূর্য্যস্ফুটে যত বেশী তারতম্য হ'বে ততই আর মেলাতে পার্‌বে না।'

আমি। "কেন তারতম্য হ'বে।"

গুরুদেব। "সে কথাও এখন থাক্।"

আমি। "সবি এখন থাক্‌বে ?"

গুরুদেব। "আগে একটু মোটামুটি বুঝে নাও তার পর সূক্ষ্ম কর্বে।"

কাল-সমীকরণ-সারিণী।

ডিসে	২৫,	এপ্রে	১৪,	জুন	১৩,	সেপ্টে	১	=	+ ০
,,	২৭,	,,	১১,	,,	১৮,	আগ	২৮	=	+ ১
,,	২৯,	,,	৭,	,,	২২,	,,	২৫	=	+ ২
জানু	১,	,,	৪,	,,	২৭,	,,	২১	=	+ ৩
,,	২,	মার্চ্চ	৩১,	জুন	২,	,,	১৬	=	+ ৪
,,	৪,	,,	২৮,	,,	৭,	,,	৯	=	+ ৫
,,	৬,	,,	২৫,	,,	১৪,	,,	*	=	+ ৬
,,	৯,	,,	২২,	,,	*	,,	*	=	+ ৭
,,	১১,	,,	১৮,	,,	*	,,	*	=	+ ৮
,,	১৩,	,,	১৫,	,,	*	,,	*	=	+ ৯
,,	১৬,	,,	১১,	,,	*	,,	*	=	+১০
,,	১৯,	,,	৭,	,,	*	,,	*	=	+১১
,,	২২,	,,	২,	,,	*	,,	*	=	+১২
,,	২৬,	ফেব	২৫,	,,	*	,,	*	=	+১৩
ফেব্রু	১,	*		,,	*	,,	*	=	+১৪

এপ্রে	১৯,	জুন	৮,	সেপ্ট	৪,	ডিসে	২৩,	=	— ১
,,	২৩,	,,	২,	,,	৭,	,,	২১,	=	- ২
,,	২৮,	মে	২৪,	,,	১০,	,,	১৯,	=	— ৩
,,	*	,,	৭,	,,	১৩,	,,	১৭,	=	— ৪
,,	*	,,	*	,,	১৬,	,,	১৫,	=	— ৫
,,	*	,,	*	,,	১৮,	,,	১৩,	=	— ৬
,,	*	,,	*	,,	২১,	,,	১১,	=	— ৭
,,	*	,,	*	,,	২৪,	,,	৮,	=	— ৮
,,	*	,,	*	,,	২৭,	,,	৬,	=	— ৯
,,	*	,,	*	,,	৩০,	,,	৩,	=	—১০
,,	*	,,	*	অক্টো	৩,	,,	১,	=	—১১
,,	*	,,	*	,,	৬,	নবে	২৮,	=	—১২
,,	*	,,	*	,,	১০,	,,	২৫,	=	—১৩
,,	*	,,	*	,,	১৪,	,,	২১,	=	—১৪
,,	*	,,	*	,,	১৫,	,,	১৫,	=	—১৫
,,	*	,,	*	,,	১৬,	,,	*	—	—১৬

আমি। "কাল-সমীকরণাঙ্ক কি রূপে পা'ব ?"

গুরুদেব। "মোটামুটি একটা ফর্দ্দ ক'রে রাখ্‌তে পার কস্‌বার সঙ্কেত এর পরে ব'লে দিব। এই কাল সমীকরণে অনুপাত করিয়া মিনিট লইবে না, কিন্তু যে তারিখের নাই তাহার পূর্ব্বের তারিখের লইবে।

আমি। "আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে যে কোনও সনের মোটামুটি পঞ্জিকা ক'রে নেবার সঙ্কেত ব'লে দেন তা হ'লে বড় সুবিধা হয় "

গুরুদেব। "আচ্ছা তাই হোক। প্রথমতঃ দেখ পঞ্জিকা জিনিসটা কি ? ইহাতে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ আর করণ, দিবসের এই পঞ্চ অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হয় ব'লেই পঞ্জিকাকে পঞ্চাঙ্গও বলা হয়। এই পঞ্চাঙ্গের মধ্যে বার নির্ণয় তুমি কর্ত্তে শিখেছ কোন্ বছরের কোন্ মাসের কোন তারিখে কি বার ? এ কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে তা নির্ণয় কর্ত্তে আর তোমার কষ্ট হ'বে না। এখন তিথিটা কি ব্যাপার বোঝবার চেষ্টা কর। এ কথাটা জেনে রাখা জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যবসায়িদিগের বড় উচিত। শাস্ত্রকার ব'লে গেছেন,--

"তিথ্যুৎপত্তিং ন জানাতি গ্রহাণাং নৈব সাধনম্।
পর-বাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥"

নক্ষত্রসূচীর ব্যবস্থা অনুসারে কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রতাদি কর্ত্তব্য নয়। যখন চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীর একপার্শ্বে এক জায়গায় থাকেন তখন অমাবস্যা, আর পৃথিবীকে মাঝে রেখে চন্দ্র আর সূর্য্য যখন দু'পাশে থাকেন তখন পূর্ণিমা। সেই সময় চন্দ্র সূর্য্যের অন্তর কত বল্‌তে পার ?"

আমি। "চক্র হিসাবে ১৮০° অন্তর হওয়াই উচিত।"

গুরুদেব। "এই ১৮০° অংশে ক'টা তিথি ?

আমি। "পনরটা। পূর্ণিমার পর থেকে প্রতিপদাদি অমাবস্যা পর্য্যন্ত পনর তিথি এবং অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পনর তিথি।

গুরুদেব। এটাও বোধ হয় জান অমাবস্যার পর প্রতিপদ থেকে ১।২ ক'রে ১৫ পর্য্যন্ত অঙ্ক দ্বারা প্রতিপদাদি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পনর তিথি এবং ১৬।১৭ ইত্যাদি ৩০ পর্য্যন্ত অঙ্কদ্বারা অপর পনর তিথি নির্দ্দেশ করা হয়।"

আমি। "হাঁ তা জানি। পঞ্জিকার পার্শ্বে ঐ রূপেই পঞ্চাঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হয়। কোষ্ঠীতেও জাতাহ, পূর্ব্বাহ ও পরাহের তিথ্যাদি ঐ রূপেই লেখা হয়। যেমন এই ১লা বৈশাখে (গুপ্তপ্রেস ১১৩ পৃ) (১) অর্থে রবিবার তা'র নীচে (২৭) অর্থে কৃষ্ণা দ্বাদশী তা'র নীচে

১	২৪	২৫	২৭ দণ্ড তা'র নীচে ৪১ বিপল মাঝের সারে
২৭	০	৫৪	২৭ শতভিষা নক্ষত্র ০ দণ্ড ২৪ পল ৫৮ বিপল।
২৭	২৪	১৬	সব নীচে ৪ তৈতিল করণ। তা'র পরের সারে
৩৪	৫৮	২৮	২৫ ব্রহ্মযোগ, ৫৪ দণ্ড ১৬ পল ২৮ বিপল সব
৪১	৪	১	শেষ ১লা তারিখ।"

গুরুদেব। "হাঁ ঠিক হ'য়েছে। এখন ভেবে দেখ যদি রবি ও চন্দ্রের ১৮০ অংশ অন্তরে ১৫ তিথি হয় তবে এক এক তিথির পরিমাণ কত ?"

আমি। "বার অংশ বা সাত শ কুড়ি (৭২০) কলা।"

গুরুদেব। "যদি রবি আর চন্দ্রের গতি চিরদিন একরূপ থাকৃতো তা হ'লে এই তিথি নির্ণয় ব্যাপার অতি সহজসাধ্য হ'তো। কিন্তু, এই দুই গ্রহের গতি নিত্য একরূপ নয় কাজেই তিথ্যাদি নির্ণয় অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হ'য়েছে। রব্যাদির স্থানীয় স্ফুট নির্ণয় পূর্ব্বক তাহা হ'তে তিথ্যাদি নির্ণয় করাই উচিত। কোষ্ঠী, বা তিথিকূট সময়ে সেই পন্থাই অবলম্বন শ্রেয়ঃ। কোনও সময়ের রবি ও চন্দ্রের স্ফুটের অন্তরই তিথি। যেমন—

১লা বৈশাখ চন্দ্র স্ফুট ১০।১৯।৫৩
রবি স্ফুট ০। ১।১২
———
১০।১৮।৪১
৩০
———
১২) ৩১৮ (২৬
২৪
———
৭৮
৭২
—
৬

চন্দ্রস্ফুট থেকে রবিস্ফুট বাদ দিয়ে অন্তর পেলাম দশ রাশি আঠার অংশ একচল্লিশ কলা। দশ রাশিকে অংশ ক'রে পেলাম তিন শ আঠার অংশ। ১২ অংশে এক তিথি সুতরাং

বার দিয়ে ভাগ দিয়ে পেলাম ২৬ কৃষ্ণা একাদশী গততিথি, সুতরাং এখন ২৭ বা কৃষ্ণা দ্বাদশী চল্‌তেছে। এই তিথিরও ছয় অংশ আর একচল্লিশ কলা অতীত হ'য়েছে। বার অংশে তিথি সুতরাং তা'র থেকে ৬।৪১ বাদ দিলে বাকি থাকে পাঁচ অংশ উনিশ কলা অর্থাৎ আর ৫।১৯ কলা বা তিনশ উনিশ কলা অতীত হ'লে তবে দ্বাদশী ত্যাগ হ'বে। এখন কি ক'রে ক'স্‌বে বল দেখি?"

১২ রাশি হইতে
৬।৪১ বাদ দিয়া
——
বাকি ৫।১৯
৬০
——
অথবা ৩১৯ কলা

আমি। "কেন? ৭২০ কলা যদি ৬০ দণ্ডে অন্তর হয় তবে ৩১৯ কলা কত ক্ষণে যা'বে?"

গুরুদেব। "কিন্তু ষাইট দণ্ডে অতটা যাচ্চে কই?"

দেখ—

১লা বৈশাখ প্রাতে রবি ০ । ১ । ১২
২রা " " " ০ । ২ । ১০

সুতরাং ৬০ দণ্ডে প্রায় ০ । ০ । ৫৮ কলা গতি।

আবার ১লা বৈশাখ চন্দ্র ১০ । ১৯ । ৫৩
২রা " " ১১ । ২ । ২৪

সুতরাং ৬০ দণ্ডে প্রায় ০ । ১২ । ৩১ কলা গতি।

চন্দ্রের ৬০ দণ্ডে ১২ অংশ ৩১ কলা গতি।
রবির " ০ ৫৮ " "

সুতরাং " ১১ । ৩৩ বা ৬৯২ কলা গত্যন্তর।

এখন অনুপাত কর—

৬৯৩ : ৩১৯ :: ৬০ : কত?

অথবা $\frac{৩১৯ \times ৬০}{৬৯৩} = \frac{১৯১৪০}{৬৯৩}$

```
৬৯৩ ) ১৯১৪০ ( ২৭
      ১৩৮৬
      ─────
       ৫২৮০
       ৪৮৫১
       ─────
        ৪২৯
```

একদা তু চরন্ সোঽথ দদর্শ যমুনাতটে।
পাতালকেতোরনুজং তালকেতুং কৃতাশ্রমম্ ॥ ৬ ॥
মায়াবী দানবঃ সোঽথ মুনিরূপং সমাস্থিতঃ।
স প্রাহ রাজপুত্রং তং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৭ ॥

তালকেতুরুবাচ।

রাজপুত্র ব্রবীমি ত্বাং তং কুরুষ যদীচ্ছসি।
ন চ তে প্রার্থনাভঙ্গঃ কার্য্যঃ সত্য-প্রতিশ্রবঃ ॥ ৮ ॥
যক্ষ্যে যজ্ঞেন ধর্ম্মায় কর্ত্তব্যাশ্চ তথেষ্টয়ঃ।
চিন্তয়ে তত্র কর্ত্তব্যা নাস্তি মে দক্ষিণা যতঃ ॥ ৯।
অতঃ প্রযচ্ছ মে বীর দক্ষিণার্থে স্বভূষণম্।
যদেতৎ কণ্ঠলগ্নং তে রক্ষ চেমং মমাশ্রমম্ ॥ ১০ ॥
যাবদন্তর্জ্জলে দেবং বরুণং যাদসাং পতিম্।
বৈদিকৈর্বারুণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রজানাং পুষ্টিহেতুকৈঃ ॥ ১১ ॥

এক দিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে নানা স্থান
যমুনার কূলে গেলা রাজার নন্দন,
সেই স্থানে দর্শন করিলা মতিমান
অতি মনোরম এক দিব্য তপোবন :

পাতালকেতুর যেই অনুজ দুর্জন,
তালকেতু, মায়াবলে মুনিবেশ ধরি'।
সে আশ্রম মাঝে ছিল হইয়া গোপন;
বলে, রাজপুত্রে এবে পূর্ব্ববৈর স্মরি'। ৬ ৭

"হে রাজকুমার, আমি বলি হে তোমারে
মনের বাসনা যাহা করিয়া প্রকাশ,
পূর্ণ কর, যদি ইচ্ছা হয় হে অন্তরে,
জানি তব কাছে মোর পূর্ণ হ'বে আশ।

সত্য-প্রতিশ্রব তুমি জানে সর্ব্ব জন,
পুরা'তে প্রার্থনা কভু না হও কাতর,
তোমার নিকটে ভিক্ষা করি সে কারণ
কৃপা করি' কর তুষ্ট আমার অন্তর। ৮।

ধর্ম্ম তরে করি যজ্ঞ বাসনা অন্তরে,
ইষ্ট-সিদ্ধি তরে করি' অগ্নির চয়ন,
কিন্তু নাহি পারি শুধু দক্ষিণার তরে
দীন আমি কোথা পাব অযুত কাঞ্চন? ৯।

হে বীর, করিয়া দয়া যদি তুমি মোরে
কণ্ঠস্থিত রত্নহার করহ অর্পণ,
বদ্ধ রব চিরদিন কৃতজ্ঞতা ডোরে,
এই ধনে হ'বে মোর যজ্ঞ-সমাপন।

দিয়ে দান, যদি তুমি ক্ষণেকের তরে
রক্ষা কর পুণ্যময় আশ্রম আমার,
তবে আমি গিয়ে এই জলের ভিতরে,
জলেশ বরুণে পূজি আসি' একবার।

বেদ-উক্ত বারুণ মন্ত্রের জপ করি'
তুষিব তাঁহারে বড় বাঞ্ছা মম মনে
প্রজাগণ পুষ্টি তরে বাঞ্ছা হৃদে ধরি ;
বলিনু বাসনা যাহা তোমারে এক্ষণে।"১০।১১

অভিষ্টূয় ত্বরাযুক্তঃ সমভ্যেমীতিবাদিনম্।
তং প্রণম্য ততঃ প্রাদাৎ স তস্মৈ কণ্ঠভূষণম্ ॥ ১২
প্রাহ চৈনং ভবান্ যাতু নির্ব্যলীকেন চেতসা।
স্থাস্যামি তাবদত্রৈব তবাশ্রমসমীপতঃ।
তবাদেশান্মহাভাগ যাবদাগমনং তব ॥ ১৩ ॥
ন তেঽত্র কশ্চিদাবাধাং করিষ্যতি ময়ি স্থিতে।
বিশ্রব্ধশ্চমুনিশ্রেষ্ঠ কুরুষ্ব ত্বং মনোগতম্ ॥ ১৪ ॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

এবমুক্তস্ততস্তেন স মমজ্জ নদীজলে।
ররক্ষ সোঽপি তস্যৈব মায়াবিহিতমাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥
গত্বা জলাশয়াৎ তস্মাৎ তালকেতুশ্চ তৎপরম্।
মদালসায়াঃ প্রত্যক্ষমন্যেষাঞ্চৈতদুক্তবান্ ॥ ১৬ ॥

মুনির বচন শুনি' রাজার কুমার
প্রণত হইলা তবে তাঁহার চরণে।
কণ্ঠহার খুলি', দিয়া চরণে তাঁহার
বলিলেন "আজ্ঞা তব পালিব যতনে। ১২।

নিশ্চিন্ত হইয়া যাও, ওহে তপোধন,
রক্ষিব যতনে এ আশ্রম আপনার,
যতক্ষণ দেহে মোর রহিবে জীবন
ততক্ষণ বিঘ্ন করে হেন সাধ্য কা'র? ১৩॥

যতক্ষণ নাহি হয় তব আগমন
ততক্ষণ রব আমি এই ত আশ্রমে,
নিশ্চয় জানিও হেথা আসি কোন জন
না পারিবে বিঘ্নকারী হ'তে কোন ক্রমে।১৪।

হে মুনিসত্তম, শুন বচন আমার,
বিশ্বাস করিয়া তুমি যাও অচিরায়
পূর্ণ কর মনে আছে যে আশা তোমার
অচিরে ফলিবে ফল সন্দেহ কি তা'য়? ১৪।

দুই নাগ-সুত সর্ব্বগুণযুত
বলে—"শুন এইবার,
সে অপূর্ব্ব গাথা আছে হৃদে গাঁথা
বলিব পাশে তোমার।
"এই কথা শুনি' যায় চলি' মুনি
পশে সে নদীর জলে;
রাজার কুমার আশ্রম তাহার
রক্ষা করে কুতূহলে। ১৫।

জলে মগ্ন হ'য়ে রত্নহার ল'য়ে—
তালকেতু দুরাচার,
অলক্ষিতে হায় পুরী মাঝে যায়
পুরা'তে বাঞ্ছা তাহার।
যথা মদালসা আছেন বিবশা
পতি-পদ নাহি হেরি',
কাছে সখিগণ করিয়া যতন
মুছায় নয়ন-বারি,
গিয়ে সেই খানে সবা বিদ্যমানে
তালকেতু দুরাচার
বলে যে বচন করহ শ্রবণ
নিকটে বলি তোমার—১৬।

তালকেতুরুবাচঃ।

বীর কুবলয়াশ্বোঽসৌ মমাশ্রমসমীপতঃ।
কেনাপি দুষ্টদৈত্যেন কুর্ব্বন্ রক্ষাং তপস্বিনাম্ ॥ ১৭
যুধ্যমানো যথাশক্তি নিঘ্নন্ ব্রহ্মদ্বিষো যুধি।
মায়ামাশ্রিত্য পাপেন ভিন্নঃ শূলেন বক্ষসি ॥ ১৮ ॥
ম্রিয়মাণেন তেনেদং দত্তং মে কণ্ঠভূষণম্।
প্রাপিতশ্চাগ্নিসংযোগং স বনে শূদ্র-তাপসৈঃ ॥ ১৯ ॥
কৃতার্ত্তহ্রেষাশব্দো বৈ ত্রস্তঃ সাশ্রুবিলোচনঃ।
নীতঃ সোঽশ্বশ্চ তেনৈব দানবেন দুরাত্মনা ॥ ২০।
এতন্ময়া নৃশংসেন দৃষ্টং দুষ্কৃতকারিণা।
যদত্রানন্তরং কৃত্যং কুরুষ্বোত্তরকালিকম্ ॥ ২১ ॥
হৃদয়াশ্বসনঞ্চৈতদ্ গৃহ্য তাং কণ্ঠভূষণম্।
নাস্মাকং হি সুবর্ণেন কৃত্যমস্তি তপস্বিনাম্ ॥ ২২ ॥

তালকেতু বলে— "এই ভূমণ্ডলে
নাহি বীর যাঁ'র সম।
ঋতধ্বজ নাম সর্ব্বগুণধাম
গেলেন আশ্রমে মম।
আশ্রমে আমার দৈত্য দুরাচার
সদা আসি' বিঘ্ন করে,
সেই বিঘ্ন-নাশ মনে করি' আশ
গেলা অস্ত্র করে ধ'রে। ১৭।

ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বহুদৈত্য নাশি'
করি' ঘোরতর রণ
বিদ্ধ হ'য়ে শূলে পড়িলা ভূতলে
হইয়ে হত-চেতন। ১৮।

করি' হাহাকার নিকটে তাঁহার
গেলাম আমরা সবে,
ছিন্ন তরু প্রায়, প'ড়ে আছে হায়,
দেখিনু সেই আহবে। ১৯।
পাইয়া চেতন বলিলা তখন—
"জীবন ফুরায় মোর,
এবে মুনিবর, মোর বাক্য ধর
ঘুচাও যাতনা ঘোর।

এই কণ্ঠহার লহ গো আমার
ল'য়ে যাও রাজপুরে,
গিয়ে সেই খানে মদালসা স্থানে
দিলে হার বাঞ্ছা পুরে।
বলিতে বচন ফুরা'ল জীবন;
মোরা সবে দেহ তাঁ'র
শূদ্রতাপসের সাহায্যে তখন
করিনু অগ্নি-সংকার। ২০।

অশ্রুভরা চক্ষে দুঃখভরা বক্ষে
অশ্ব তাঁ'র সেই খানে
করি'ছে চীৎকার দেখি' দৈত্য আর
ল'য়ে গেল নিজ স্থানে। ২১।

নৃশংস আচার দৈত্য দুরাচার
যে কার্য্য করিল হায়!
দেখিনু সকল, বলিনু সকল,
কর যেবা মনে লয়।
আশ্বাসের তরে দিলা মোর করে
রাজপুত্র যেই হার,
এনেছি, এখন করহ গ্রহণ,
ইথে কি কার্য্য আমার?" ২২।

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

ইত্যুক্ত্বোৎসৃজ্য তদ্ভূমৌ স জগাম যথাগতম।
নিপপাত জনঃ সোঽথ শোকার্ত্তো মূর্চ্ছয়াতুরঃ ॥ ২৩ ॥
তৎক্ষণাৎ চেতনাং প্রাপ্য সর্ব্বাস্তা নৃপযোষিতঃ।
রাজপত্ন্যশ্চ রাজা চ বিলেপুরতিদুঃখিতাঃ ॥ ২৪ ॥
মদালসা তু তদ্দৃষ্ট্বা তদীয়ং কণ্ঠভূষণম্।
তত্যাজাশু প্রিয়ান্ প্রাণান্ শ্রুত্বা চ নিহতং পতিম্ ॥ ২৫ ॥
ততঃপুরে মহাক্রন্দঃ পৌরাণাং ভবনেষ্বভূৎ।
যথৈব তস্য নৃপতেঃ স্বগেহে সমবর্ত্তত ॥ ২৬ ॥
রাজা চ তাং মৃতাং দৃষ্ট্বা বিনা ভর্ত্রা মদালসাম্।
প্রত্যুবাচ জনং সর্ব্বং বিমৃষ্য স্বস্থমানসঃ ॥ ২৭ ॥
ন রোদিতব্যং পশ্যামি ভবতামাত্মনস্তথা।
সর্ব্বেষামেব সঞ্চিন্ত্য সম্বন্ধানামনিত্যতাম্ ॥ ২৮ ॥
কিং নু শোচামি তনয়ং কিং নু শোচাম্যহং স্নুষাম্।
বিমৃষ্য কৃতকৃত্যত্বান্মন্যেঽশোচ্যাবুভাবপি ॥ ২৯ ॥

নাগপুত্র দুইজনে বলিলা তখন—
"তা'র পরে যে ঘটিল করহ শ্রবণ।
এই রূপ বলি' তালকেতু দুরাচার
অবিলম্বে গেল চলি' স্থানে আপনার।
সে কথা শুনিয়া সবে করি' হাহাকার'
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পড়ে সংজ্ঞা নাহি আর। ২৩।

চেতনা পাইয়া যত নৃপাঙ্গনাগণ,
রাজপত্নী রাজা সনে করয়ে রোদন। ২৪।

মদালসা হেরে চক্ষে সেই রত্নহার,
বাজিল কুলিশ বক্ষে সংজ্ঞা নাহি আর,
দেহস্থির নাহি' নীর বর্ষিল নয়ন,
পতিশোকে ত্যজে সতী আপন জীবন। ২৫।

মদালসা-মরণে উঠিল হাহাকার
কেবা শান্ত করে, কেবা তত্ত্ব লয় কা'র ?
রাজপুরে যেইরূপ রোদনের রোল,
সর্ব্বগৃহে সেই মত,—মুখে নাহি বোল।
সভা ছাড়ি' সবে যায় নিজ নিজ বাস
পরিজন সনে মিলে করে হা-হুতাশ। ২৬।

ভর্ত্তৃশোকে মদালসা ত্যাজিলা জীবন,
নয়নে হেরিয়া রাজা বলেন বচন।
রাজা জ্ঞানী, সুস্থ করি' চিত্ত আপনার
বলিলেন জনগণে বচনের সার। ২৭।

"আমার, অথবা আজি, তোমা সবাকার
রোদন উচিত নয়, ভেবে দেখো সার।
সম্বন্ধ অনিত্য ভবে শুন সর্ব্বজন,
এই তত্ত্ব সত্য জানি স্থির কর মন। ২৮।

পুত্র পুত্রবধূ তরে কি হেতু কাঁদিব ?
কাঁদিয়া তা'দের আর কিবা শান্তি দিব ?
দোঁহে কৃতকৃত্য এবে ভেবে দেখ মনে,
তবে সে দোঁহার তরে কাঁদ কি কারণে ?
তা'দের কারণে শোক কভু কার্য্য নয়
ত্রিদিবে গিয়েছে তা'রা, নাহিক সংশয়। ২৯

মচ্ছুশ্রূষুর্মদ্বচনাদ্ দ্বিজরক্ষণতৎপরঃ।
প্রাপ্তো মে যঃ সুতো মৃত্যুং কথং শোচ্য স ধীমতাম্ ॥ ৩০ ॥
অবশ্যং যাতি যদ্দেহং তদ্দ্বিজানাং কৃতে যদি।
মম পুত্রেণ সন্ত্যক্তং নন্বভ্যুদয়কারি তৎ ॥ ৩১ ॥
ইয়ঞ্চ সৎকুলোৎপন্না ভর্ত্তর্য্যেবমনুব্রতা।
কথং তু শোচ্যা নারীণাং ভর্ত্তুরন্যন্ন দৈবতম্।
অস্মাকং বান্ধবানাঞ্চ তথান্যেষাং দয়াবতাম্ ॥ ৩২ ॥
শোচ্যাহ্যেষা ভবেদেবং যদি ভর্ত্তাবিয়োগিনী ॥ ৩৩ ॥
যা তু ভর্ত্তুর্বধং শ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব ভামিনী।
ভর্ত্তারমনুযাতেয়ং ন শোচ্যাতোবিপশ্চিতাম্ ॥ ৩৪ ।
তাঃ শোচ্যা যা বিয়োগিন্যো নশোচ্যা যা মৃতাঃ সহ।
ভর্ত্তুর্বিয়োগস্ত্বনয়া নানুভূতঃ কৃতজ্ঞয়া ॥ ৩৫ ॥
দাতারং সর্ব্বসৌখ্যানামিহ চামুত্র চোভয়োঃ।
লোকয়োঃ কাহি ভর্ত্তারং নারী মন্যেত মানুষম্ ॥ ৩৬ ॥

আমার শুশ্রূষু সেই তনয়-রতন,
আমার বচন শিরে করিয়া ধারণ,
গিয়েছিল তপোবনে দ্বিজ-রক্ষা তরে
সমরে যুঝিয়া, প্রাণ ত্যাজিয়াছে পরে।
হেন মৃত্যু যা'র ভাগ্যে হইল ঘটন,
তা'র তরে নহে কভু উচিত ক্রন্দন। ৩০।

একদিন দেহ যা'বে নাহিক সংশয়,
দ্বিজরক্ষা তরে যায়, ধন্য সুনিশ্চয়।
মম পুত্র ত্যজে প্রাণ দ্বিজে রক্ষিবারে,
ইহার অধিক যশ কি আছে সংসারে? ৩১।

সৎকুলেতে পুত্রবধূ লভিয়া জনম
মম কুলে পাইলেন পতি অনুপম।
সে পতির অনুগামী হইলা এখন
নারী-ভাগ্যে শুভ অন্য আছে কি এমন?
পতি বিনা আশ্রয় কি আছে অবলার?
অনুগামী হৈলা, তাহে শোক কিবা আর? ৩২।

স্বামীর বিয়োগে ভবে যদি কোন নারী
বেঁচে থাকে, কর শোক শুধু তরে তা'রি। ৩৩।

যেই জন শুনি কানে পতির মরণ,
অশ্রু ত্যজিবার আগে ত্যজয়ে জীবন,
তার সম ভাগ্যবতী কেবা ভবে আর?
কিবা কাজ তা'র তরে শোক করিবার?
ভর্ত্তার-বিয়োগ-দুঃখ যেই ক্ষণতরে
না সহিল, স্মর তা'রে কৃতজ্ঞ অন্তরে।
ভর্ত্তার বিয়োগে বাঁচে শোচ্যা সেই হয়,
যে না সহে সে বিয়োগ শোচ্যা সেই নয়। ৩৪-৩৫।

নাসৌ শোচ্যো ন চৈবেয়ং নাহং তজ্জননী ন চ।
ত্যজতা ব্রাহ্মণার্থায় প্রাণান্ সর্ব্বেঽস্ম তারিতাঃ॥ ৩৭॥
বিপ্রাণাং মম ধর্ম্মস্য গতঃ স হি মহামতিঃ।
আনৃণ্যমর্দ্ধভুক্তস্য ত্যাগাদ্দেহস্য মে সুতঃ॥ ৩৮॥
মাতুঃ সতীত্বং সদ্বংশবৈমল্যং শৌর্য্যমাত্মনঃ।
সংগ্রামে সন্ত্যজন্ প্রাণান্ সোবিন্দদ্দ্বিজরক্ষণাৎ॥ ৩৯॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ কুবলয়াশ্বস্য মাতা ভর্ত্তুরনন্তরম্।
শ্রুত্বা পুত্রবধং তাদৃক্ প্রাহ দৃষ্ট্বা তু তং পতিম্॥ ৪০॥
ন মে মাত্রা ন মে স্বস্রা প্রাপ্তা প্রীতির্নৃপেদৃশী।
শ্রুত্বা মুনিপরিত্রাণে হতং পুত্রং যথা ময়া॥ ৪১॥

ইহামুত্র সর্ব্বস্থানে নারী সুনিশ্চয়,
পতি হ'তে সর্ব্বসুখ সদা প্রাপ্ত হয়।
পতিব্রতা, এ হেন পতিরে, এ কারণ
মানুষ বলিয়া মনে না ভাবে কখন। ৩৬।

এই পুত্রবধূ-তরে শোক যোগ্য নয়,
তনয় তরেও শোক অযোগ্য নিশ্চয়,
যেই পুত্র ব্রাহ্মণের উপকার তরে
ত্যজিল আপন প্রাণ অরণ্য ভিতরে,
নিশ্চয় তাহার পুণ্যে মোরা পুণ্যবান,
কে কবে পেয়েছে পুত্র ইহার সমান?
এ হেন পুত্রের তরে পত্নীর আমার
উচিত না হয় বৃথা শোক করা আর। ৩৭।

অর্দ্ধভুক্ত দেহ ত্যাগ করি' পুত্র মম
লভিল বিমল যশ, পূর্ণচন্দ্র সম।
ব্রাহ্মণগণের কাছে—নিকটে আমার
ধর্ম্মের নিকটে ঋণ শোধ হৈল তা'র। ৩৮।

সতীর নন্দন তা'রে বলিবে সবাই,
বংশ-কীর্ত্তি জগজন ঘুষিবে সদাই,
অতুল শৌর্য্যের কথা গাবে জগজন
ধন্য আমি, পেয়েছিনু এ হেন নন্দন।
আমাদের মুখোজ্জ্বল করিল কুমার
সংগ্রামে ত্যজিয়া প্রাণ—কিবা দুঃখ আর?" ৩৯

নাগপুত্র দোঁহে কহে "করহ শ্রবণ,
জননী শুনিলা যবে পুত্রের মরণ।
হৃদয়ে পাইলা ব্যথা কি সন্দেহ তায়,
শুনিয়া পতির বাক্য দুঃখ দূরে যায়। ৪০।

বলে মাতা,—"হে রাজন্, কি বলিব আর?
মুনি-রক্ষা-তরে দেহ ত্যজিল কুমার,
শুধু এই কথা ভাবি' প্রাণে সুখ পাই
তা'র তরে অশ্রু আর ত্যজিতে না চাই।
মাতা, কিম্বা ভগ্নি মোর কখন এমন
অপূর্ব্ব সুখের না পাইলা আস্বাদন। ৪১।

শোচতাং বান্ধবানাং যে নিঃশ্বসন্তোঽতিদুঃখিতাঃ।
ম্রিয়ন্তে ব্যাধিনাক্লিষ্টাস্তেষাং মাতা বৃথাপ্রজা ॥ ৪২ ॥
সংগ্রামে যুধ্যমানা যেঽভীতা গোদ্বিজরক্ষণে।
ক্ষুণ্ণাঃ শস্ত্রৈর্বিপদ্যন্তে ত এব ভুবি মানবাঃ ॥ ৪৩ ॥
অর্থিনাং মিত্রবর্গস্য বিদ্বিষাঞ্চ পরাঙ্মুখঃ।
যো ন যাতি পিতা তেন পুত্রী মাতা চ বীরসূ ॥ ৪৪
গর্ভক্লেশঃ স্ত্রিয়ো মন্যে সাফল্যং ভজতে তদা।
যদারিবিজয়ী বা স্যাৎ সংগ্রামে বা হতঃ সুতঃ ॥ ৪৫

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ স রাজা সংস্কারং পুত্রপত্নীমলম্ভয়ৎ।
নির্গম্য চ বহিঃ স্নাতো দদৌ পুত্রায় চোদকম্ ॥ ৪৬
তালকেতুশ্চ নির্গম্য তথৈব যমুনাজলাৎ।
রাজপুত্রমুবাচেদং প্রণয়ান্মধুরং বচঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাধিক্লিষ্ট হ'য়ে জীব বান্ধব গোচরে,
অশেষ যাতনা সহি', দেহ ত্যাগ করে।
এ হেন পুত্রের মাতা পুত্রবতী নয়,
জন্মিলে এ ভবে মৃত্যু ঘটে সুনিশ্চয়। ৪২।
নির্ভয়-হৃদয়ে পুত্র পশিয়া সমরে
গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা-তরে দেহ ত্যাগ করে,
মৃত সে কি ?—চিরজীবী সেই সুনিশ্চয়—
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
হেন পুত্র জনমিল জঠরে যাহার
পুত্র তরে শোক কভু যোগ্য নহে তা'র। ৪৩।
দীনজন দয়াপ্রার্থী হ'য়ে যা'র পাশে,
আসিয়া নিরাশ হ'য়ে নাহি যায় বাসে,
মিত্র জনে পরাঙ্মুখ নহে যেই জন
শত্রুজনে পরাঙ্মুখ না করে কখন,
হেন পুত্রে পুত্রবান পিতা সুনিশ্চয়
মাতারে তাহার সবে বীরপ্রসূ কয়। ৪৪।

গর্ভধারণের ক্লেশ সফল তাহার
সমরে বিজয়ী সদা হয় পুত্র যা'র,
অথবা সম্মুখ-রণে যদি সে তনয়
ত্যজে প্রাণ—পুত্ররত্ন সেই সুনিশ্চয়।" ৪৫।
নাগপুত্রগণ বলিলা তখন—
"এত বলি' নরনাথ
পুত্রবধূ-কায় লইয়া ত্বরায়
মিলি' জ্ঞাতি-বন্ধু-সাথ,
করিয়া গমন করিলা দাহন
স্নান করি' তা'র পরে,
দেয় জলাঞ্জলি পুত্র-নাম বলি'
শেষে ফিরে আসে ঘরে। ৪৬।
হেথা তালকেতু অধর্ম্মের সেতু
আসি সে যমুনা-জলে,
ধীরে কূলে আসি' বলে সুখে ভাসি'
রাজপুত্রে বাক্য-ছলে। ৪৭।

গচ্ছ ভূপালপুত্র ত্বং কৃতার্থোঽহং কৃতস্ত্বয়া।
কার্য্যং চিরাভিলষিতং ত্বয্যত্রাবিচলে স্থিতে ॥ ৪৮ ॥
বারুণং যজ্ঞকার্য্যঞ্চ জলেশস্য মহাত্মনঃ।
তন্ময়া সাধিতং সর্ব্বং যন্মমাসীদভীপ্সিতম্ ॥ ৪৯ ॥
প্রণিপত্য স তং প্রায়াদ্রাজপুত্রঃ পুরং পিতুঃ।
সমারুহ্যতমেবাশ্বং সুপর্ণানিলবিক্রমম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজ-চরিতে মদালসাবিয়োগোনাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

"হে রাজ-কুমার, মোর উপকার
ক'রেছ অশেষ আজ,
কৃতার্থ এখন হইল জীবন
যাও ঘরে ত্যজি' ব্যাজ।
যে কার্য্যের তরে আকুল-অন্তরে
ছিলাম এ বনমাঝ,
অচঞ্চল হ'য়ে এই স্থানে র'য়ে
পুরাইলে তাহা আজ। ৪৮।

জলেশ উদ্দেশে যে যজ্ঞ-বিশেষে
ব্যাকুল আছিল মন,
সাধিয়াছি তাই অন্য আশা নাই
করহ এবে গমন।" ৪৯।
তাহার চরণে ভক্তিযুতমনে
প্রণমি' তবে কুমার,
পিতৃপুরে যায় অশ্ব দ্রুত ধায়
আশুগতি-গতি যা'র।" ৫০।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে ঋতধ্বজ-চরিতে মদালসা বিয়োগ
নামক দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

স রাজপুত্রঃ সংপ্রাপ্য বেগাদাত্মপুরং ততঃ।
পিত্রোর্ব্বিবন্দিষুঃ পাদৌ দিদৃক্ষুশ্চ মদালসাম্॥ ১॥
দদর্শ জনমুদ্বিগ্নমপ্রহৃষ্টমুখং পুরঃ।
পুনশ্চ বিস্মিতাকারং প্রহৃষ্টবদনং ততঃ॥ ২॥
অন্যমুৎফুল্লনয়নং দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতিবাদিনম্।
পরিষ্বজন্তমন্যোন্যমতিকৌতূহলান্বিতম্॥ ৩॥
চিরং জীবোরুকল্যাণ হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
পিত্রোঃ প্রহ্লাদয় মনস্তথাস্মাকমকণ্টকঃ॥ ৪॥

নাগপুত্রগণ বলেন বচন,
শুন পিতা তা'র পর—
"রাজার নন্দন করেন গমন
হ'য়ে অতি ত্বরাপর।
পিতৃমাতৃপদ যাঁহার সম্পদ
সে জন সে পদ-আশে
দূর-দূরান্তর হ'তে ত্বরাপর
হইয়ে সতত আসে।
দোঁহার চরণ করিতে বন্দন
ধায় দ্রুতগতি অতি,
মদালসা-তরে ভাবি'ছে অন্তরে
হ'য়েছে আকুল-মতি। ১।
পুরেতে পশিয়া সবারে দেখিয়া
ব্যাকুল হইল মন,
যে দিকেতে চায় সুখ নাহি পায়
সবে বিষণ্ণ-বদন।
কিন্তু হেরি' তাঁ'রে সবার আকারে
উপজিল ভাবান্তর,
গেল সে বিষাদ নয়নে আহ্লাদ
উঠে ফুটে পরস্পর। ২।
বিস্ময়ে সকলে "দৈব দৈব" বলে
এ চায় উহার পানে,
করে কোলাকুলি, দেয় হুলাহুলি,
ধায় সবে ফুল্ল প্রাণে। ৩।
আসিয়া সম্মুখে সবে হৃষ্ট-মুখে
বলে—"জয় যুবরাজ,
হে উরু-কল্যাণ পাও দীর্ঘ-প্রাণ
আশীষ করি হে আজ।
হৌক শত্রু-নাশ, হৌক পূর্ণ আশ,
আনন্দে কাটাও কাল;
হেরিয়া নয়নে মোরা সর্ব্ব জনে
সুখে রব চিরকাল।
পিতার মাতার আমাদের আর
প্রাণে সুখ কর দান;
করি' দরশন পেলাম জীবন
ঘরে যাও মতিমান। ৪।

ইত্যেবংবাদিভিঃ পৌরৈঃ পুরঃ পৃষ্ঠে চ সংবৃতঃ।
তৎক্ষণপ্রভবানন্দঃ প্রাবিবেশ পিতুর্গৃহন্॥ ৫॥
পিতা চ তং পরিষ্বজ্য মাতা চান্যে চ বান্ধবাঃ।
চিরং জীবোরুকল্যাণ দত্তুস্তস্মৈ তদাশিষঃ॥ ৬॥
প্রণিপত্য ততঃ সোঽথ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ।
পপ্রচ্ছ পিতরং তাত সোঽস্মৈ সম্যক্ তদুক্তবান্॥ ৭॥
স ভার্য্যাং তাং মৃতাং শ্রুত্বা হৃদয়েষ্টাং মদালসাম্।
পিতরৌ চ পুরো দৃষ্ট্বা লজ্জাশোকাব্ধিমধ্যগঃ॥ ৮॥
চিন্তয়ামাস সা বালা মাং শ্রুত্বা নিধনং গতম্।
তত্যাজ জীবিতং সাধ্বী ধিঙ্মাং নিষ্ঠুরমানসম্॥ ৯॥

আগে পাছে তাঁ'র জয়-জয়-কার
করি' প্রজাগণ ধায়,
আনন্দ-অন্তরে যা'ন পিতৃ ঘরে
কুমার অতি ত্বরায়। ৫।

পিতা মাতা আর বান্ধব সবার
আশীষ লইলা শিরে,
"চিরজীবী হও সদা সুখে রও"
বলে সবে ধীরে ধীরে। ৬।

তাঁ'দের বচন করিয়া শ্রবণ
কুমার ভাবেন মনে,
এ'কি ? কেন হেন ভাবান্তর যেন
হেরি' সবার নয়নে।

করিয়া প্রণাম বলে গুণধাম
"পিতা, কেন হেন হেরি ?"
পিতা তবে তাঁ'য় বলে সমুদায়
ব্যাপার বিস্তার করি'। ৭।

শুনিয়া সকল চক্ষে এলো জল
সম্বরে সে জল, হায়!

মদালসা-হারা দুটি আঁখি-তারা
ধীরে চারিদিকে চায়।
লজ্জা শোক আর দুই দিকে তাঁ'র
টানিয়ে লইতে চায়,
বীরের হৃদয় অত লঘু নয়
চাপিয়ে রাখিল তায়।

পিতা মাতা পাশে লজ্জা ছুটে আসে
শোক রহি' দূরে অতি
হৃদয়-মাঝারে তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধারে
করে ক্ষত দ্রুতগতি। ৮।

ভাবেন কুমার, নিধন আমার
কেবল শুনিয়া কানে,
সাধ্বী মদালসা ত্যজি' সব আশা
হারাইল নিজ প্রাণে।

ধিক্ ধিক্ মোরে, নিঠুর অন্তরে
শুনিনু মরণ কথা,
নিশ্চয় জেনেছি তা'রে হারায়েছি
কই রে হৃদয়-ব্যথা ? ৯।

নৃশংসোঽহমনার্য্যোঽহং বিনা তাং মৃগলোচনাম্।
মৎকৃতে নিধনং প্রাপ্তাং যজ্জীবাম্যতিনির্ঘৃণঃ॥ ১০
পুনঃ স চিন্তয়ামাস পরিসংস্তভ্য মানসম্।
মোহোদ্গমমপাস্যাশু নিঃশ্বস্যোচ্ছ্বস্য চাতুরঃ॥ ১১
মৃতেতি সা মন্নিমিত্তং ত্যজামি যদি জীবিতম্।
কিং ময়োপকৃতং তস্যা শ্লাঘ্যমেতত্তু যোষিতাম্॥ ১
যদি রোদিমি বাদীনো হা প্রিয়েতি বদন্ মুহুঃ।
তথাপ্যশ্লাঘ্যমেতন্নো বয়ং হি পুরুষাঃ কিল॥ ১৩॥
অথ শোকজড়ো দীনো স্রজাহীনোমলান্বিতঃ।
বিপক্ষস্য ভবিষ্যামি ততঃ পরিভবাস্পদম্॥ ১৪॥

সুনৃশংস আমি নাহি যোগ্য স্বামী
অনার্য্য কে মোর সম ?
আমার কারণ সে দিল জীবন
আমি অতি নিরমম!
সে মৃগলোচনা মৃগাঙ্ক-বরণা
জানিত না আমা বিনে,
আমি কিন্তু হায় ভুলে আছি তায়,
রয়েছি সে ধন বিনে।" ১০।
ক্ষণেক ভাবিয়া স্থির করে হিয়া,
ভাবে বীর পুনরায়
মোহ করি' দূর শোক-বজ্র চূর
করে ধৈর্য্য-অস্ত্র-ঘায়। ১১।
ভাবে—"মোর তরে কাতর-অন্তরে
ত্যজিল সে নিজ প্রাণ।
আমি যদি হায়, স্মরিয়া তাহায়
নিজ প্রাণ করি' দান,
তাহে কিবা ত'ার হ'বে উপকার ?
কি পৌরুষ তাহে মোর ?
নারী-যোগ্য কাজ করি' পা'ব লাজ
অপযশ হ'বে ঘোর। ১২।
কাঁদি' যদি হায় স্মরিয়া প্রিয়ায়
"কোথা প্রিয়া গেলে" বলি,
তাও শ্লাঘ্য নয়, নারী-যোগ্য হয়
শোক-দুঃখাদি সকলি,
পুরুষ যে জন ক'রে না রোদন
কর্ত্তব্য আপন করে;
শোক, সুখ আর অন্তরের ত'ার
রাখে সে সদা অন্তরে। ১৩।
শোকে জড় প্রায় হ'য়ে যদি হায়
মাল্য আদি পরিহরি'
বিষাদ-মলিন যেন দীনহীন
হ'য়ে এই দেহ ধরি,
বিপক্ষ হাসিবে ধাইয়ে আসিবে
পরিভব করিবারে,
শোকে ভগ্ন হ'লে এই বাহুবলে
পারিব না জিনিবারে। ১৪।

ময়ারিশাতনং কার্য্যং রাজ্ঞঃ শুশ্রূষণং পিতুঃ।
জীবিতং তস্য চায়ত্তং সন্ত্যাজ্যং তৎ কথং ময়া ॥ ১৫ ॥
কিন্ত্বত্র মন্যে কর্ত্তব্যস্ত্যাগো ভোগস্য যোষিতঃ।
স চাপি নোপকারায় তন্বঙ্গ্যাঃ কিন্তু সর্ব্বথা ॥ ১৬ ॥
ময়া নৃশংস্যং কর্ত্তব্যং নোপকার্য্যাপকারি চ।
যা মদর্থেঽত্যজৎ প্রাণাংস্তদর্থেঽল্পমিদং মম ॥ ১৭ ॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ।

ইতি কৃত্বা মতিং সোঽথনিষ্পাদ্যোদকদানিকম্।
ক্রিয়াশ্চানন্তরং কৃত্বা প্রত্যুবাচ ঋতধ্বজঃ ॥ ১৮ ॥

ঋতধ্বজ উবাচ।

যদি সা মম তন্বঙ্গী ন স্যাদ্ভার্য্যা মদালসা।
অস্মিন্ জন্মনি নান্যা মে ভবিত্রী সহচারিণী ॥ ১৯

পিতৃ-সেবা আর রাজকার্য্যে তাঁ'র
সহায় হইয়া র'ব
শত্রু বিনাশিব, প্রজারে পালিব,
জগত-বাসীর হ'ব।
প্রিয়া সে আমার যতনে সবার
সতত করিত সেবা,
আমি তা'র স্বামী, সেই কাজে আমি
রব রত-নিশি দিবা।
জীবন আমার সম্পত্তি তাহার
ত্যজিব না সুনিশ্চয়,
প্রিয়-কাজে তা'র এ প্রাণ আমার
নিয়োজিতে যোগ্য হয় ; ১৫।
প্রাণ মন তা'র ; অন্য নারী আর
এ দু'টি কভু না পা'বে,
এই সে আমার কর্ত্তব্যের সার
বুঝিতেছি মনোভাবে।
যদিও তাহার ইথে উপকার
কিছুই নাহিক হ'বে,
তবু এই হয় কর্ত্তব্য নিশ্চয়
মম প্রাণ সুখে র'বে। ১৬।
নৃশংস-আচার করি' পরিহার
সবার হইয়া রব,
ত্যজিল সে প্রাণ, দিয়ে মন-প্রাণ
তা'র কাজে রত রব"। ১৭।
বলে নাগপুত্রগণ—"পিতা গো, কর শ্রবণ
অতি অপরূপ ব্যবহার,
দৃঢ় করি' নিজ মতি বীর মদালসা-পতি
চিন্তা-রত রহিল তাহার।
উদক-অঞ্জলি আর যেবা আছে ব্যবহার
করে বীর, ধীর-চিত্ত হ'য়ে,
কার্য্য সম্পাদন করি, হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা ধরি'
বলে যত নিজ জনে ল'য়ে। ১৮।
"মদালসা বিনা আর বনিতা নাহি আমার
সে বিনে না চাহি অন্য জনে,
এ জনমে অন্য নারী পত্নী না হ'বে আমারি,
ইহা স্থির করিয়াছি মনে। ১৯।

তামৃতে মৃগশাবাক্ষীং গন্ধর্ব্বতনয়ামহম্ ।
ন ভোক্ষ্যে যোষিতং কাঞ্চিদিতি সত্যং ময়োদিতং ॥ ২০
সদ্ধর্ম্মচারিণীং পত্নীং তাং মুক্ত্বা গজগামিনীম্ ।
কাঞ্চিন্নাঙ্গীকরিষ্যামীত্যেতৎ সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ২১ ॥

নাগপুত্রাবূচতুঃ ।

পরিত্যজ্য চ স্ত্রীভোগান্ তাত সর্ব্বাংস্তয়া বিনা ।
ক্রীড়ন্নাস্তে সমং তুল্যৈর্বয়স্যৈঃ শীলসম্পদা ॥ ২২
এতৎ তস্য পরং কার্য্যং তাত তৎ কেন শক্যতে ।
কর্ত্তুমত্যর্থদুষ্প্রাপ্যমীশ্বরৈঃ কিমুতে তরৈঃ ॥ ২৩ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ ।

ইতি বাক্যং তয়োঃ শ্রুত্বা বিমর্ষমগমৎ পিতা ।
বিমৃষ্য চাহ তৌ পুত্রৌ নাগরাট্ প্রহসন্নিব ॥ ২৪ ॥

মৃগশিশু-আঁখি সম আঁখি যা'র অনুপম
গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী সেই হায়,
সে বিনে রমণী আর ভোগ্যা না হ'বে আমার
সন্দেহ নাহিক কিছু তায়। ২০।
ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা ছিল সদা পতি-রতা
আমা বিনা ত্যজিল জীবন,
তারে না ভুলিব আমি থাকিব তাহারি স্বামী
তারি প্রতি রবে প্রাণ মন।" ২১।
নাগপুত্র দোঁহে বলে—"করহ শ্রবণ,
নারী-সঙ্গ ত্যজিলেন রাজার নন্দন।
স্বভাব সম্পদে তুল্য প্রিয়সঙ্গী ল'য়ে
সুখেতে কাটান কাল, ক্রীড়াপর হ'য়ে।২২।
অভাব তাঁহার যাহা, করিলে শ্রবণ,
পুরাইতে পারে ভবে কে আছে এমন ?
মনে ভাবি, বিধি, বিষ্ণু কিম্বা পঞ্চানন
পুরাতে তাঁহার বাঞ্ছা কেহ শক্ত নন।২৩।

দ্বিজ পুত্র বলে, "পিতা,
অতীব অপূর্ব্ব কথা
হৃদয়েতে আছে গাথা
করিব বর্ণন।
"পুত্র মুখে শুনি' হেন,
নাগরাজ দুঃখে যেন
বিমর্ষ হইলা—মুখে
না সরে বচন।
কিছুক্ষণ হ'য়ে স্থির
চিন্তা করিলেন ধীর,
পুত্রগণ পানে চাহি'
সহাস্য বদনে,
বলিলা প্রফুল্ল মনে,
চাহি পুত্র দুই জনে
হৃদয়ের কথা কিছু
না রাখি গোপনে। ২৪

নাগরাজোবাচ।

যদ্যশক্যমিতি জ্ঞাত্বা ন করিষ্যন্তি মানবাঃ।
কর্ম্মন্যুদ্যমমুদ্যোগহান্যা হানিস্ততঃপরম্ ॥ ২৫ ॥
অরভেত নরঃ কর্ম্ম স্বপৌরুষমহাপয়ন্।
নিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণো দৈবে পৌরুষে চ ব্যবস্থিতা ॥ ২৬ ॥
তস্মাদহং তথা যত্নং করিষ্যে পুত্রকাবিতঃ।
তপশ্চর্য্যাং সমাস্থায় যথৈতৎ সাধ্যতেঽচিরাৎ ॥ ২৭ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

এবমুক্ত্বা স নাগেন্দ্রঃ প্লক্ষাবতরণংগিরেঃ।
তীর্থং হিমবতো গত্বা তপস্তেপে সুদুশ্চরম্ ॥ ২৮ ॥

নাগরাজ অশ্বতর
বলিলেন অতঃপর
শুন বাপ, এক তত্ত্ব
বলিব এখন,
অশক্য এ কার্য্য মম
সুকঠিন অনুপম
ভাবি' মনে নরে যদি
না করে যতন,
ভবে যত্ন বিনা হায়
সুফল পা'বে কোথায় ?
উদ্যোগের হানি হ'লে
কার্য্য হয় নাশ,
কার্য্য নাশ হয় যদি
নরে তবে নিরবধি
বিফলে কাটায় দিন
নাহি পুরে আশ। ২৫।

তাই বলি, বৎসগণ,
উদ্যোগের প্রয়োজন
আছে সর্ব্ব কাজে ইহা
মনে জানি' সার,
পৌরুষ আশ্রয় করি'
যা'বে কর্ম্ম-পথ ধরি'
দৈব পৌরুষেতে পূরে
মানস-সবার। ২৬।

অতএব পুত্রগণ,
করিব হেন যতন
তপস্যা করিব আমি
করি' প্রাণপণ,
তপের অসাধ্য নাই
মনে জানি, আমি তাই
করিব তপের বলে
বাসনা পূরণ।" ২৭।

দ্বিজপুত্র বলে,—"পিতা করহ শ্রবণ,
এত বলি, নাগরাজ করিলা গমন।
হিমালয়-গিরি-শিরে প্লক্ষাবতরণে,
করিলা দুশ্চর তপ, দৃঢ় করি' মনে। ২৮

তুষ্টাব গীর্ভিশ্চ ততস্তত্র দেবীং সরস্বতীম্।
তন্মনা নিয়তাহারো ভূত্বা ত্রিষবণাপ্লুতঃ ॥ ২৯ ॥

অশ্বতর উবাচ।

জগদ্ধাত্রীমহং দেবীমারিরাধয়িষুঃ শুভাম্।
স্তোষ্যে প্রণম্য শিরসা ব্রহ্মযোনিং সরস্বতীম্ ॥ ৩০ ॥
সদসদ্দেবি যৎ কিঞ্চিৎ মোক্ষবচ্চার্থবৎ পদম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয্যসংযোগং যোগবদ্দেবি সংস্থিতম্।
ত্বমক্ষরং পরং দেবি যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥
অক্ষরং পরমং দেবি সংস্থিতং পরমাণুবৎ।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বিশ্বঞ্চৈতৎ ক্ষরাত্মকম্ ॥ ৩২ ॥
দারুণ্যবস্থিতো বহ্নির্ভৌমাশ্চ পরমাণবঃ।
তথা ত্বয়ি স্থিতং ব্রহ্ম জগচ্চেদমশেষতঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিষবণস্নান করি' মতিমান
নিয়ত-আহারী হ'য়ে
তন্মনস্ক হ'য়ে যতন করিয়ে
বাণীরে স্তব করয়ে। ২৯।

বলে অশ্বতর জুড়ি' দুই কর
আজি আরাধন তরে,
জগদ্ধাত্রী যিনি শুভ-স্বরূপিণী
পূজ্যা যিনি চরাচরে।
দেবী ব্রহ্মযোনী জগত-জননী
সরস্বতী পদ্ম-পদে,
প্রণত হইয়ে মস্তক লুটায়ে
করি স্তব পদে পদে। ৩০।

সদসৎ পদ জীবের সম্পদ
মোক্ষবৎ যেবা হয়,
তোমাতে সকল তুমি সে সকল
হেন মোর মনে লয়।

অসংযুক্ত হ'য়ে সংযুক্তের মত
সম্যক রয়েছে সব,
চরাচরে যত দেখি অবিরত
সকলি আশ্রিত তব। ৩১।

তুমি সে অক্ষর আছ নিরন্তর
অক্ষরের স্থিতি-স্থান,
পরমাণু সম তোমাতে সে সব
সতত বিরাজমান।
পরম অক্ষর ব্রহ্ম পরাৎপর
সতত তোমাতে আছে
ক্ষরাত্মক হায় এ বিশ্ব তোমায়
আশ্রয় ক'রে রয়েছে। ৩২।

দারুদেহ যথা পরমাণু গাঁথা
অনল লুকায়ে তা'য়;
তেমতি তোমাতে এই বিশ্ব ভাতে
ব্রহ্ম আছে গুপ্ত হায়। ৩৩।

ওঙ্কারাক্ষরসংস্থানং যত্তু দেবি স্থিরাস্থিরম্।
তত্রমাত্রাত্রয়ং সর্ব্বমস্তি যদ্দেবি নাস্তি চ ॥ ৩৪ ॥
ত্রয়োলোকাস্ত্রয়ো দেবা স্ত্রৈবিদ্যং পাবকত্রয়ম্।
ত্রীণি জ্যোতীংষি বর্ণাশ্চ ত্রয়োধর্ম্মাগমস্তথা ॥ ৩৫ ॥
ত্রয়োগুণাস্ত্রয়ং শব্দাস্ত্রয়ো বেদাস্তথাশ্রমাঃ।
ত্রয়ঃ কালাস্তথাবস্থা পিতরোঽহর্নিশাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রণব তোমার স্বরূপ আকার
অক্ষর-সংস্থান তুমি;
স্থিরাস্থির যত তোমাতে নিয়ত
আছে এই জানি আমি।
মাত্রাত্রয়-ময় * সে প্রণব হয়;
উদ্ভূত যাহে সকল,
"অস্তি" শব্দে যা'র নির্দ্দেশ, তাহার
নিদান সে শব্দ-বল;
নাস্তি শব্দে যা'র নির্দ্দেশ, তাহার
যদিও সদ্ভাব নাই
তথাপি তোমাতে সেই সব ভাতে
মরীচিকা যথা পাই। ৩৪।

তিন লোক[১] আর তিন দেব[২] সার
তিন বিদ্যা[৩] চরাচরে
পাবক ত্রিতয়[৪] জ্যোতিঃ[৫] তিন হয়
তিন বর্ণ[৬] ধরা ধরে।
তিন ধর্ম্মাগম[৭] সত্ত্ব রজঃ তমঃ
এই তিন গুণ হয়,
শব্দত্রয়[৮] আর তিন বেদ[৯] সার
আর আশ্রম[১০] ত্রিতয়।
তিন রূপ কাল[১১] অবস্থা[১২] ত্রিবিধ
সবি প্রণবের কায়,
পিতৃগণ[১৩] আর অহর্নিশা-আদি
সকলি আশ্রিত তায়। ৩৫-৩৬।

* অ-কার উ-কার ও ম-কার এই তিন মাত্রা।

১। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোক। ২। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেব।

৩। অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই তিন বিদ্যা।

৪। ভৌম (কাষ্ঠাদিসম্ভূত), দিব্য (বিদ্যুতাদি), জাঠর (পাচকাগ্নি) এবং দক্ষিণ, আহবনীয় ও গার্হপত্য এই ত্রিবিধ অগ্নি।

৫। ভৌম, আন্তরীক্ষ ও নাভস এই ত্রিবিধ জ্যোতিঃ।

৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ। ৭। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ধর্ম্মপথত্রয়।

৮। মুখ্যার্থক, লক্ষ্যার্থক ও ব্যঙ্গার্থক। ৯। ঋক্ যজুঃ ও সাম।

১০। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস (বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য)।

১১। অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত (ভবিষ্যৎ)। ১২। বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য।

১৩। অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষৎ, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, কব্যাদ ও সুকালীন।
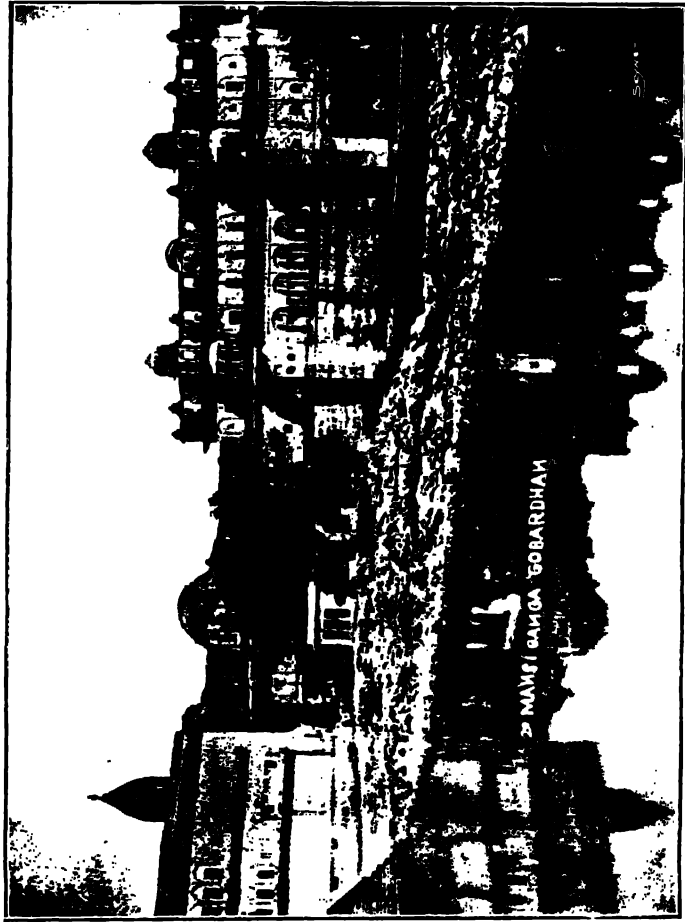
গোবর্দ্ধন—মানস-গঙ্গা ।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।

(৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

সকলের কোন প্রকার তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার না থাকে। স্বভাব চরিত্র-গঠনের সময়ে বিদ্যালয়ে যেরূপ দেখাইবে, তুমি সেই রূপ স্বভাব চরিত্রের লোক বলিয়া পরে সমাজে পরিচিত হইবে। বিদ্যালয়ের যাহারা তোমা অপেক্ষা অধিক পড়েন তাঁহাদের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সুবিধামত পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে সাহায্য গ্রহণ করিবে। এবং যাঁহারা তোমা অপেক্ষা কম পড়েন বা কম বুঝেন তাঁহারা তোমার নিকট বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে যখন যে ভাবে সাহায্যপ্রার্থী হইবেন সেই ভাবে সাহায্য করিবে। তাহাতে নিজের একটু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, সে ক্ষতিকে ক্ষতি বোধ করিবে না, ফলে তাহাতে তোমার মহান্ লাভ হইবে। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে তোমার পার্শ্বস্থ ছাত্র হয় ত স্বল্প-দৃষ্টিমান, অধ্যাপক কৃষ্ণ-বর্ণ কাষ্ঠফলকে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া কোন একটা সূত্র বুঝাইতেছেন, তিনি সে চিত্র দেখিতে না পাওয়ায় ভাল করিয়া বুঝিতেছেন না, সেরূপ অবস্থায় তুমি তাঁহার খাতায় তাঁহাকে সেই চিত্রটি আঁকিয়া দিলে তাঁহার বুঝিবার সুবিধা হইবে, প্রত্যক্ষে তাঁহার একটি উপকার করিলে, আবার পরোক্ষে তুমি তোমার অধ্যাপকের চিত্রের অনুকরণে তৎক্ষণাৎ আর একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোমার শিক্ষার পক্ষেও সুবিধা হইল। হয় ত নূতন একজন ইংরাজ অধ্যাপক আসিয়াছেন, তাঁহার উচ্চারণ তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ কিন্তু তোমার সহাধ্যায়ী কেহ কেহ ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না, অথচ শীলতা রক্ষার জন্য সে কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, সে ক্ষেত্রে অবসর কালে তুমি তোমার বন্ধুসমক্ষে অধ্যাপক মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করিলে তাঁহাদের সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও বিদ্যাভ্যাসের সৌকর্য্য হইবে। এরূপ ভাবে সহাধ্যায়ীগণের সাহায্যকারী হইতে কখন কুণ্ঠিত হইবে না। তোমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, তীব্র-মেধা ছাত্রের প্রতি কখন ঈর্ষা করিবে না। সতীর্থদের ভিতর এই ঈর্ষা ভাবটা বড় ঘৃণিত। ইহা কিন্তু নূতন নহে। উত্তরচরিতে বাসন্তী ও আত্রেয়ী নাম্নী মহর্ষি বাল্মিকীর দুইটি ছাত্রীর মুখে কবি ভবভূতিও লব কুশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তাঁহাদের উভয়ের প্রতি গুরুর পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সেটা নাটককারের লবকুশের চরিত্রোন্মেষ জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, ভবভূতি সৃষ্টি করিয়া ছাত্রীদ্বয়কে একটু খাট করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহাদের পীড়া হইলে সাধ্যমত সেবা করিবে, কোন বিষয়ের অভাব হইলে, তোমার যতদূর সাধ্যায়ত্ত সে অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বে সহাধ্যায়ীগণ মধ্যে সৌহার্দ্দ এত অধিক ছিল, যে সকলেই সকলকে নিজ পরিবার ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। আমার

পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠসোদরপ্রতীম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহাদের পঠদ্দশায় গ্রীষ্মাবকাশে দূরদেশবাসী যে সকল ছাত্র বাটী না গিয়া কলিকাতায় থাকিতেন, তাঁহারা সকলে কিরূপ আনন্দ সহকারে তাঁহাদের কোদালিয়ার বাটীতে গিয়া অবকাশ কাটাইতেন তাহার গল্প করেন ও পূর্ব্বস্মৃতি-জনিত আনন্দ অনুভব করেন। সকলেই তাঁহার জননীকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং অকৃত্রিম মাতৃস্নেহানুভব করিতেন। এরূপ পবিত্র আনন্দ ভোগ করা ছাত্র-জীবনেই সম্ভবপর। ইহা বড় আনন্দপ্রদ পবিত্র ভাব। ইহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে যে পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধ হয়, ভাবী জীবনের দুরূহ সংগ্রামেও তাহা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। পরে হয় ত বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে বিরোধী ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়া উভয়ের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিতে পারে, অন্ততঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেইরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ছাত্র-জীবনে যদি প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া থাকে তাহা হইলে, সেই ঘোর সাংসারিক সংঘর্ষের অন্তস্তলে প্রণয়ের শান্তিময় প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া জীবনকে,—সংসারকে, আনন্দময় করিয়া তুলিবে। এইরূপ সুখ শান্তির বীজ কিন্তু রোপণ করিবার সময় এই ছাত্র-জীবন। এখন না করিলে ইহার পর আর হইবে না। সতীর্থগণের ভিতর কেহ কখন তোমার অসন্তোষজনক কোন কার্য্য করিলে তোমাকে তাহা সহ্য করিতে হইবে, তজ্জন্য তাহার উপর ক্রোধ করিবে না, প্রতিহিংসার কথা কখনও মনে আনিবে না। কেহ তোমার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলে, তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে তিনি সেরূপ আর না করেন, তাহাতেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত না হন, সাধারণ বন্ধু অর্থাৎ তুমি ও তিনি উভয়েরই যিনি বন্ধু এমত লোকের নিকট সে কথা বলিবে, যে তাঁহার মধ্যস্থতায় তোমাদের মনোমালিন্য অপনীত হয়, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হও তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোন কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে কিছু বলিবে না। এইরূপ অভিযোগ করাটা বড় দোষের কথা, ইহাকে আমি বড় ঘৃণা করি। বিদ্যালয়ের এই সামান্য অভিযোগ সংসারের ঘোরতর গোলযোগের অগ্রসূচী মাত্র। সহ্য করিতে, উপেক্ষা করিতে, নত হইতে, অবশেষে ত্যাগস্বীকার করিতে এখন হইতে শিক্ষা করা উচিত। এখন তোমাদের হৃদয় যেমন, অন্তর পবিত্র আছে, এখন যদি ইহা শিক্ষা না কর সংসারের ঘোর স্বার্থপর আবর্ত্তনে পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া যাইবে, তোমার স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি অতলজলে ডুবিয়া যাইবে, অতএব এই ছাত্রজীবনে, বাল্যজীবনের খেলাঘরের মত এই সকল সৎপ্রবৃত্তির যাহাতে উন্মেষ হয় তাহা করা চাই।

সময়ে সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণের ভিতর বিবাদ হইয়া থাকে। তোমাদের বিদ্যালয়ে যে কখন হয় নাই বা হইবে না তাহা সম্ভব নহে। সে ক্ষেত্রে কি করিবে? এরূপ ঘটনা ও শিক্ষার একটি আদর্শ স্থল। পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, শিক্ষক গুরু অভ্রান্ত, তিনি কিছু অন্যায় করিতে পারেন না, ছাত্রগণ তাঁহার অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক

সময় হইতে বিপরীত করিয়া ফেলে। উভয় পক্ষের অভিপ্রায় উভয়কে শান্তভাবে অবকাশ মত বুঝাইয়া দিলে, অনায়াসে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় ধীরভাবে মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিবে, অথচ তুমি দলের এক জনই থাকিবে, সহাধ্যায়ীগণ হইতে আপনাকে পৃথক বিবেচনা করিবে না। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষক মহাশয়ের সদভিপ্রায় বুঝাইয়া দিবে। এরূপ ব্যবহারে উভয়ের সৌহার্দ্দ অবিচলিত থাকে এবং শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি ও তাঁহাদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়ের প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা হইলে তোমার আনন্দানুভূতি হইবে। এই ভাব লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইলে সমাজের যে কত দূর উপকার সাধন করিতে পারিবে, পরে দেখিতে পাইবে। যাহারা সংসারে শান্তির আশা করেন, ভগবান তাঁহাদিগের মঙ্গল করেন।

বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী। বিদ্যালয়ের অপর এক শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে তোমাদিগের সর্ব্বদাই আসিতে হয়। ইঁহারা শিক্ষকও নহেন, সহধ্যায়ীও নহেন। ইঁহারা বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী। ইঁহাদিগকেও যথেষ্ট ভক্তি করিবে। ইঁহারাও তোমার শ্রদ্ধার পাত্র। বিদ্যালয়কে যদি পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে শিখিয়া থাক তাহা হইলে বিদ্যালয়ের যাঁহারা পরিচর্য্যায় নিরত তাঁহাদিগকে অবশ্যই পিতার পুরাতন কর্ম্মচারিদের যে ভাবে ব্যবহার করিতে হয় সেই ভাবে মান্যের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভালবাসার সহিত ব্যবহার করা উচিত নয় কি? বাটীতে কি করিয়া থাক, আমার পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে চিরদিনই তোমরা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া থাক, ভয় কর, ভক্তি কর, ভালবাস। বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীগণকেও সেইরূপ ব্যবহার করিবে। এখনও করিবে চিরদিনই করিবে। এ সম্বন্ধে আমার একটি বাল্যের স্মৃতি মনে আসিতেছে। আমার পিতৃদেবের সহিত সময়ে সময়ে আমি হালিসহরে বেড়াইতে যাইতাম। মধ্যে মধ্যে হালিসহরের একজন তৎকালের প্রাচীন অধিবাসী ৺রামধন গাঙ্গুলি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইত। পিতাঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিতেন আমাকেও প্রণাম করিতে বলিতেন। প্রথমতঃ আমার ধারণা ছিল, গাঙ্গুলি মহাশয় পিতা মহাশয়ের অন্যতম অধ্যাপক, কিন্তু গাঙ্গুলি মহাশয়কে অধ্যাপকের মত কিছুই দেখাইত না। মনে বড় খটকা হইত, কিন্তু সে খটকা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, পরে শুনিলাম তিনি সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব কেরাণী ছিলেন।* কেরাণীর প্রতি এ ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম, তখন হইতে কিন্তু সেই ভাবে আমিও বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীগণের সহিত ব্যবহার করিতে শিখিলাম। কথা প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে উক্ত গাঙ্গুলি মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক বড় বড় পণ্ডিত হালিসহরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় পণ্ডিতবর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যদুনাথ তর্করত্ন,

---

* ৺রামধন গাঙ্গুলি মহাশয় অবসর গ্রহণ করার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীচরণ গাঙ্গুলি মহাশয় বহুদিন উক্ত কার্য্য করেন এবং পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীলাল গাঙ্গুলি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজে কেরাণীগিরি করিতেছেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি কয়েকটি মহোদয় আমাদের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া আমাদের কুঠীর পবিত্র করিয়াছিলেন। এত বড় বড় পণ্ডিত কেবল স্বর্গীয় গাঙ্গুলি মহাশয়ের প্রতি ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই শ্রাদ্ধোপলক্ষে হালিসহরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের বিষয় আলোচ্য নহে।

যে কথা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা চাই। অধ্যয়নকালে অর্থাৎ যতদিন বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিবে, একাগ্রভাবে তাহাতে মনোযোগী হইবে। অনন্যমনা হইয়া কোন কার্য্য না করিলে সে কার্য্যে কখন সফল-মনস্কাম হওয়া যায় না। এই যে শত শত যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই একই অধ্যাপক একই ভাবে সকলকে শিক্ষা দিতেছেন, কেবল চিত্তের একাগ্রতা না থাকায় অনেকে সে শিক্ষার ফল লাভ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বিদ্যাভ্যাসকালে, অন্য কোন বিষয়ে কোন মতে মনোযোগ দিবে না। পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমন কি ধর্ম্মসম্বন্ধেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দিবে না। শিক্ষিতব্য বিষয়ই তোমার একমাত্র পাঠ্য এবং চিন্তার বিষয় হওয়া চাই, তাহার সাহায্যার্থ যে সকল পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে হয় শিক্ষকের উপদেশানুসারে তৎসমুদয় যতদূর সাধ্য অধ্যয়ন ও আয়ত্তাধীন করিবে।

সংবাদপত্রপাঠ। আজকাল অনেক যুবাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইবার অগ্রেই, খবরের কাগজ পড়িতে দেখিতে পাই। উহাতে আমার আপত্তি আছে। সংবাদ পত্র পাঠ করিলে উপস্থিত সময়ের অনেক সংবাদ সংগ্রহ হয় মাত্র, তাহাতে বিদ্যাচর্চ্চা বাড়ে না, শিক্ষিতব্য বিষয়ের কিছুই সহায়তা করে না। বরং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল সাময়িক পত্রিকায় সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকে তাহা পড়িলে উপকার হয়। সংবাদপত্রে যে সকল বিষয় লিখিত ও আলোচিত হয় তাহা ছাত্রজীবনে না জানিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং না জানাই ভাল। মনে কর পৃথিবীর কোন একটি স্থানে বড়ই অন্নকষ্ট হইয়াছে, দলে দলে লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তুমি এখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তোমার এমন কিছু আর্থিক সামর্থ নাই যে তুমি তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পার অথবা তোমার এমন সময় নাই যে তুমি তাহাদের অন্নকষ্ট ও অকাল মৃত্যু নিবারণ জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন ও তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে পার, যদি তাহা করিতে চাও তাহা হইলে তোমার বিদ্যাশিক্ষার বিষয় বিঘ্ন ঘটিবে। লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। সেই জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সংবাদপত্র পাঠ না করেন। যদি বল নিজের জন্য সাময়িক সংবাদ রাখা আবশ্যক; সে ভারটা অভিভাবকের উপর ন্যস্ত করিলে ভাল হয়। ছাত্রগণের কিসে ভাল হইবে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়গণ এবং বাটীতে অভিভাবকগণ দিবানিশি ভাবিতেছেন। তোমাদের অপরিণত বুদ্ধিতে ভাবিয়া তাহার অপেক্ষা বেশি কিছু হইবে না। শিক্ষকগণের উপর এবং অভিভাবকবর্গের উপর এইরূপে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে শিক্ষা

করিতে হইবে। উপস্থিত সংবাদ লইয়া তোমার দরকার কি? বিলাতের মহাসভায় স্থিতিশীল বা উন্নতিশীল কোন দল প্রধান, এখানকার শাসনকর্ত্তাগণ কি প্রণালীতে রাজ্য-শাসন করিতেছেন, সে বিষয়ে এক্ষণে তোমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত না করাই ভাল। সংবাদপত্রে এই সকল রাজনৈতিক বিষয়ে যে ভাবে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিয়া অনেক সময় মন অস্থির হইয়া উঠে, অথচ তাহার কোন উপায় করিতে পারিবে না।

রাজনৈতিক আন্দোলন।

অনর্থক মন চঞ্চল করিয়া নিজ-কর্ত্তব্যের হানি করার আবশ্যক কি? রাজনৈতিক বিষয়ে, কি সংবাদপত্রপাঠে, কি সভা সমিতিতে যোগদান কোন দিকে কোন সংস্পর্শ রাখিবে না। অনর্থক সময় নষ্ট ও মন চঞ্চল করা মাত্র। তাহাতে তোমার পাঠের সমূহ ব্যাঘাত ঘটিবে। উহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। রাজা আছেন, রাজ প্রতিনিধি আছেন, প্রধান শাসনকর্ত্তাগণ আছেন, প্রধান বিচারালয় আছে, শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত আছে, তাহার উপর আমাদের দেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত মহানুভব দেশভক্ত ব্যক্তিগণ আছেন ইহাঁরা সকলে তোমাদের মঙ্গল জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন, তাহাতে তুমি এখন কিছুদিনের জন্য সে ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করিলে, বিদ্যাভাসের সুবিধা হইবে। নচেৎ দুই দিকই নষ্ট হইবে। অনেক অপরিণত বয়স্ক যুবক অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাদের নিজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন ও তদ্বিষয় পাঠ হইতে দূরে থাকিবে। রাজনীতি পাঠে কোন দোষ আছে আমি তাহা বলি না। বিদ্যালয়ে, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা অধ্যয়ন করিয়া তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হইবে তাহা ভাবিকালে কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া অনেক সুফল প্রসব করিবে। আমি রাজনীতি অপরাপর নীতির ন্যায় শিক্ষা সম্বন্ধে বিরোধী নহে। তবে আমার ইচ্ছা যত দিন বিদ্যার্থী থাকিবে দেশের উপস্থিত রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না, আন্দোলন করিবে না। রাজনৈতিক আন্দোলন করা ভাল কি মন্দ তাহা আমি সাধারণভাবে কিছু বলিতেছি না, কেবল ছাত্রদের সম্বন্ধে নিষেধ করিতেছি মাত্র। যখন বিদ্যাভ্যাস শেষ হইবে, নিজে সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, নিজ বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতে শিখিবে, তখন নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিবে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ভাল বলিয়া তখন মনে হয় করিবে। সময় ও অবস্থার উপর সকলই নির্ভর করে। এক সময়ে যাহা নিষিদ্ধ হয়, সময়ান্তরে তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এক অবস্থায় যে নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, অবস্থান্তরে তাহা হয়ত প্রতিপাল্য না হইতে পারে। সংসারের নিয়মই এই।

সামাজিক আন্দোলন।

রাজনৈতিক অপেক্ষা সামাজিক বিষয়ে মনোযোগ দিলে বিদ্যাভ্যাসের পক্ষে আরও ব্যাঘ্যাত ঘটে। এখনও তোমরা সমাজের

লোক নহ। সমাজের সহিত তোমাদের এক্ষণে সাক্ষাৎ পক্ষে কোন সম্বন্ধ হয় নাই। বিদ্যাভ্যাস-রত লোক চিরদিনই অসামাজিক হইয়া থাকেন। "অসামাজিক" আমি কোন মন্দ অর্থে বলিতেছি না। সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিতে গেলে লেখাপড়া হইয়া উঠা কঠিন। সমাজ আছে তোমাদের অভিভাবকগণ আছেন তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই ভাল, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। সামাজিক কথা, রাজনীতি অপেক্ষাও কঠিন। সামাজিক বিষয় ভাবিতে হইলে আর সকল বিষয় জলাঞ্জলী দিতে হইবে, লেখাপড়া ছাড়িতে হইবে। আমাকে একবার এক জন সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন তোমাদের গার্হস্থ্য বড় শক্ত আশ্রম, আমাদের সন্ন্যাসাশ্রমের এক মাত্র চিন্তা, তোমাদের চিন্তা বহু-মুখী, ইহাতে চিত্ত স্থির রাখা বড় কঠিন, যথার্থ স্থিরপ্রকৃতি না হইলে, ভগবানে একান্ত ভক্তি না থাকিলে গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সমাধা করা ভার। গার্হস্থ্যের প্রধান কাঠিন্য নিজ পরিবারের জন কয়েক লইয়া নহে, সমাজরূপ বৃহৎ পরিবার লইয়াই গৃহস্থের মনে সমস্যা। সামাজিক কোন বিশেষ কথা উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে অনেক দেখিতে হয়, অনেক শুনিতে হয়, অনেক ভাবিতে হয়, তাহার জন্য তোমার এক্ষণে সময় কোথায়? সুতরাং সে কথায় এক্ষণে কর্ণপাত না করাই ভাল। আরও এক কথা সামাজিক কোন কথা ভাবিয়া তুমি এক্ষণে এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, কিন্তু তাহাই কি অভ্রান্ত? তোমার এক্ষণে বিদ্যা পুস্তকস্থ, বুদ্ধি অপরিপক্ক, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, সমাজতত্ত্ব পর্য্যালোচনা কর নাই, দেশের লোককে চেন নাই, এখন তুমি যে সিদ্ধান্ত ঠিক করিবে, কালে বুদ্ধি একটু পরিপক্ক হইলে, দূরদৃষ্টি জন্মিলে, অভিজ্ঞতার ফলে তখন ভিন্ন সিদ্ধান্ত হয় ত করিবে। অনেক সময়ে তাহাই ঘটিয়া থাকে। উপস্থিত হয় ত কোন সমাজ সংস্কারকের মনোমোহিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার উদ্দীপনায় মন উত্তেজিত হইয়া তাঁহার যুক্তিগুলির আপাত-সুন্দরতা বুঝিয়া তাঁহার মতানুসারে নিজে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে। কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা যে ঠিক নয় তাহা হয় ত দেখিতে পাইবে। এই সকল সমাজসংস্কারকগণকে, বিশেষতঃ যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়ান তাঁহাদিগকে আমি বড় ভয় করি। তাঁহারা সমাজের অনিষ্ট ছাড়া যে ইষ্ট করিতেছেন আমার সে ধারণা নাই। তাঁহারা এক দেশ-দর্শী বাক্যাবলী দ্বারা অপরিণত বয়স্ক যুবকদিগের মতিভ্রম সহজে উৎপাদন করেন। হয়ত ঠিক কথাই বলিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের উত্তেজনার গুণে তাহার বিপরীত ফল হয়। তাঁহারা বুঝেন না যে সমাজের উপর কাহারও কোন হাত নাই, ক্ষমতা পরিচালন কেহই করিতে পারেন না। সামাজিক যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা আপনা হইতেই হয়। সমাজ তাহা আপনিই করিয়া লন। সময় ও অবস্থা বুঝিয়া সমাজ নিজ পরিবর্ত্তন নিজে করিয়া থাকেন। এই যে আমাদের চাতুর্বর্ণ, এ কে করিল, ইহারও কর্ত্তা সমাজ নিজে, গুণ ও কর্ম্মানুসারে সামাজিক লোক আপনি চারিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, পরে আরও বিভাগ হইয়াছে, তাহাই বা কে করিল,

তাহারও কর্ত্তা সমাজ নিজে। কোন ব্যক্তি-বিশেষে, কোন সময়ে এই বিভাগ সম্পাদন করেন নাই। সমাজের উপর এমন কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। মনে কর ইংরাজ জাতি, যাহারা জাতিভেদ মানে না, একটু ভাল করিয়া তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে তাঁহাদের ভিতর গুণ-কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের ছাঁচ বাঁধিতেছে। আবার সম্প্রদায়ের ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় জন্মিতেছে। সেখানে বণিক (merchant) ও ব্যবসাদার (trader) বিভিন্ন সম্প্রদায়। তবে সামাজিক নিয়মানুসারে বিভিন্নতা রক্ষার ভিন্ন প্রথা মাত্র। যাহা হউক পরের কথায় দরকার নাই। পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম, সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনার কার্য্য কর, যখনকার যে কার্য্য তখন সেই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা কর, তোমার কর্ত্তব্য সাধনে তোমার উপকার হইবে, তুমি যে পরিবারের অন্তর্গত তাহার উপকার হইবে, তুমি যে সমাজের অন্তর্গত তাহার উপকার হইবে, তোমার দেশের উপকার হইবে। সকল কার্য্যই স্থান ও কাল সাপেক্ষ। এক স্থানে বা এক সময়ে এক কথায় যে কার্য্যসিদ্ধ হইবে, অকালে বা স্থানবিচার না করিলে সহস্র কথায় তাহা হইবে না। সুতরাং এক্ষণে অনর্থক সামাজিক কথার আন্দোলনে যোগ দিয়া তোমার কর্ত্তব্য হানি করিবে না।

ধর্ম্মনীতি। রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সামাজিক বিষয়ে যাহা বলিলাম, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বক্তব্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমাদের জীবনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রথম হইতে তাহারই জন্য তোমাদের সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান। তুমি এক্ষণে কর্ত্তব্য সাধনের প্রথম স্তরে আছ। অগ্রে এই স্তরের কার্য্য শেষ কর, পরে যখন ধর্ম্মস্তরে উঠিবে, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিবে, কার্য্য করিবে। এক্ষণে বংশগত জাতিগত নিয়ম রক্ষা করিয়া, তাহাকে ধর্ম্ম বলিতে হয় বল, ততটুকু ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য একাগ্র ভাবে চেষ্টা করিবে। উপরে বলিয়াছি বিদ্যা দুই প্রকার, এক বিদ্যা যাহা তুমি এক্ষণে অভ্যাস করিতেছ, সাহিত্য, নীতি, বস্তুতত্ত্বাদি বিষয় পার্থিব বিদ্যা। অপর বিদ্যা আধ্যাত্মিক বিদ্যা, যাহা দ্বারা অপার্থিব বিষয়ের জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ ভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়। এতদুভয় বিদ্যা শিক্ষার পারম্পর্য্য আছে। প্রথমে তোমরা এক্ষণে যে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ এই পার্থিব অপরা বিদ্যা অর্জ্জন কর। তাহাতে কৃতবিদ্য হইলে অপার্থিব অর্থাৎ পরা বিদ্যাভ্যাস করিবে, এবং তখন দেখিতে পাইবে কেমন করিয়া বিদ্যান্তর হইতে অতর্কিতভাবে মানুষ ধর্ম্মস্তরে উঠে। এখন হইতে ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না। নিজের কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ অনন্যমনা হইয়া অভ্যাস করাই তোমার কর্ত্তব্য, সাধনা, তপস্যা। পূর্ব্বে তোমাকে সেই কাশীতে আমাদের সহিত যে 'ব্রহ্মানন্দ' নামক ব্রহ্মচারীর আলাপ হয় তাঁহার বিষয় কিছু বলিয়াছি তিনি সে সময় ঐ সকল কথা বলেন, সে সময় তুমি তথায় উপস্থিত ছিলে, কিন্তু তখন তুমি অত্যন্ত শিশু তাঁহার বাক্যের

অর্থাবগত হইতে পার নাই। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য যে বিনা বিদ্যায় ধর্ম্মলাভ হয় না। তাঁহার বিদ্যা ছিল না তিনি ধর্ম্ম সাধনার জন্য কত দেশ ভ্রমণ করিলেন, কত সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিলেন কত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে তিনি ৺ কাশীধামে আসিয়া বিদ্যা-ভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এত দিনে বোধ হয় তাঁহার পাঠ সমাপ্তি হইয়াছে, ধর্ম্মচর্য্যায় রত হইয়াছেন। আর এক দিনের কথা তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে, আমরা যেবার পূজার অবকাশে ৺ পুরীধামে সপরিবারে বাস করিতেছিলাম, পরম পবিত্র গোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান কর্ত্তা পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থ স্বামী, যিনি এখন ৺ শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত, তাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতাম। এক দিন অপরাহ্নে আমরা অনেকে বসিয়া-ছিলাম, এমন সময়ে ডাকযোগে তাঁহার একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যের নামে একখানি সংবাদপত্র আসিল, স্বামীজী উন্মোচন করিবামাত্র তদভ্যন্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র অস্ত্র বাহির হইল। অস্ত্র খানি দেখিয়াই স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া শিষ্যকে আহ্বান করিলেন। ইত্যবসরে আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে হটযোগীরা উক্ত যন্ত্র সাহায্যে জিহ্বার নিম্নের শিরা ছেদন করিয়া থাকে তাহাতে জিহ্বা উল্টাইয়া মন্ত্রবলে গলদেশে দিলে যোগাভ্যাস সহজে হয়। শিষ্য আসিবা-মাত্র বলিলেন, তোমার এই যন্ত্র এই পত্র মধ্যে আসিয়াছে গ্রহণ কর কিন্তু আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর ইহা কখনও ব্যবহার করিবে না। প্রথমে বিদ্যাভ্যাস কর যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন কর পরে ধীরে ধীরে যোগাভ্যাস করিবে। আমি তোমার গুরু, আমার আদেশ যে তুমি এ প্রকার প্রক্রিয়া করিবে না, ইহাতে ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হয়, যোগাভ্যাস এত তাড়াতাড়ির জিনিষ নয়, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, কালে, প্রকৃত সময়ে, অবশ্যই অভ্যাস হইবে। ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিলেন। তাহা হইতে বুঝা গেল পরম পণ্ডিত ও পরম যোগশীল স্বামীজীর মতে বিদ্যাভ্যাস অগ্রে প্রয়োজন, পরে যোগাভ্যাস করিতে হয়। ইহাকেই আমি বলিতেছিলাম স্তরে স্তরে উঠা। লম্ফ দিয়া উঠিতে গেলে পদস্খলন হইবার খুব সম্ভাবনা এবং পদস্খলন হইলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইবারও খুব সম্ভাবনা। অতএব আস্তে আস্তে যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতেছ তাহাই কর ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না, তাড়াতাড়ি করিবে না। ধর্ম্ম জিনিষটা ভাল, কিন্তু সকল ভাল জিনিস সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় ভাল হয় না। সময় ও অবস্থাক্রমে ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এদেশে আমা-দের পরম পবিত্র ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের এত খারাপ অবস্থা হইয়াছে কেন? প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে আমরা এত দূরে পড়িয়াছি কেন? যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব ছাড়িয়া ভগবৎতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া আমরা বৃথা বাজে জিনিস লইয়া এত ব্যস্ত রহিয়াছি কেন? ইহার এক মাত্র উত্তর আমাদের হস্তে ধর্ম্ম কর্ম্মের ভার ন্যস্ত হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য ছিল অধ্যয়ন পরে অধ্যাপনা এবং তৎপরে যজন ও যাজন।

ব্রাহ্মণ যে দিন তাহার ব্যতিক্রম করিলেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া যজন যাজনে মন দিলেন, সেই দিন হইতেই আমাদের অধঃপতন। যাজন ত দূরের কথা যজন করিবে কে? তাহার তত্ত্ব স্থির, বিনা-অধ্যয়নে কি রূপে হইবে। গোটাকতক মোটামুটি কথা লিখিয়া লইয়া যজন যাজনা চলে না, চলিলে তাহার যে ফল হইবার তাহাই হইয়াছে। শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করা চাই। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা চাই, তাহার পর ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া অবশেষে যজন ও যাজন। তাহা না করিয়া "সহর্ণের্ম" শেষ করিয়া ভট্টির কয়েকটি শ্লোক, একটু অভিধান বড়জোর অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের একাংশ পড়িয়া তিনি যাজ্যক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ফলে তাঁহার নিজের কোন জ্ঞান জন্মিল না, পরকে কি জ্ঞান দিবেন। নিজেই যজন কাহাকে করিতে হয়, কি রূপে করিতে হয় তাহা শিখিলেন না যাজন করিবেন কি করিয়া? সেই জন্যই এখনকার দিনে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদের সংঘর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিরা ব্রাহ্মণদিগকে আর মানিতে চাহেন না। মান্য করিবার বস্তু না থাকিলে, কেবল অভিজাত্যাভিমানে আর কয় দিন মান্য পাইতে পারা যায়? ব্রাহ্মণ যে জন্য ভারতে এত মান্য, সকলের পূজ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণের সে জ্ঞান এখন কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কি ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিলেই ত ব্রাহ্মণ হয় না। উপনয়ন হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। তিলক যজ্ঞসূত্রাদি ব্রাহ্মণের বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। কিন্তু অন্তরের সে সার-বস্তুটুকু সে ব্রহ্মজ্ঞানটুকু এখন কোথায়? প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইতে হইলে সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মজ্ঞান আপনা হইতে হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, ব্রহ্মবিদ্যা দর্শন-শাস্ত্র সম্যক পর্য্যালোচনা না করিলে হয় না। আবার দর্শন-শাস্ত্র সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ জ্ঞানজনক বস্তুতত্ত্ব ভাষাতত্ত্বাদি শিক্ষা করা চাই। সুতরাং তোমরা এক্ষণে যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ ইহা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার প্রথম সোপান, ইহা উপেক্ষা করিলে একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা বৃথা। এক দিন ৬ বারাণসী-ধামে মহাত্মা ভাস্বরানন্দ স্বামীজীর মুখে একটি বড় পরিহাসের কথা শুনিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, M.A., B.L.,

কর্ম্ম।

(২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্মের অধীন, এই কর্ম্মভূমি সংসারে আসিয়া মানুষ কর্ম্ম না করিয়াই থাকিতে পারে না। যে কর্ম্ম করিবে, বা যে চিন্তা হৃদয়ে উদয় হইবে, তাহার একটি প্রতিরূপ সূক্ষ্মভাবে ভিতরে রহিয়া যায়। সময়ে প্রয়োজন হইলে আবার তাহা দেখা দেয়। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়া আবার মিসাইয়া যায়, সেইরূপ মনোরূপ সমুদ্রে কর্ম্ম বা চিন্তারূপ তরঙ্গ অনবরত উঠিতেছে ও মিসাইতেছে, কিন্তু একেবারে যাইতেছে না ; সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকারে সবই সেখানে রহিয়া যাইতেছে।

মানুষ মরিয়া গেল—দেহ ত্যাগ করিল। মৃত্যু কাহাকে বলে ? বিয়োগ। এই জড় অণুপরমাণুর উপর প্রাণের স্পন্দনে যে দেহ বিকাশ হইয়াছে, অণুপরমাণুর সংযোগে যে দেহ, তাহা বিযুক্ত হইলে দেহের নাশ হয়। দেহের নাশ হইলেও, আভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলি থাকে। দেহ নষ্ট হইবার সময় মনুষ্যের জীবনীশক্তি মনে প্রবেশ করে এবং মন-প্রাণে লয় হইয়া এক আতিবাহিক বায়ব দেহ লইয়া বহির্গত হয়। সেই সূক্ষ্ম দেহে সারাজীবনের সংস্কারগুলি গ্রথিত থাকে। এই সংস্কারগুলিই, মনঃ-সমুদ্রের তরঙ্গ সূক্ষ্মাকারে মনেই নিহিত ছিল; সেই সময় সেই গুলি বহির্গত হয়। সেই সূক্ষ্মদেহে সেই কর্ম্মসংস্কার মৃত্যুকালে উপস্থিত হয় এবং স্থূল দেহের ন্যায় সেই বায়ব দেহেও কার্য্য করে। আত্মা সূক্ষ্মদেহ ও কর্ম্মসংস্কারগুলিতে আবৃত হইয়া, দেহ হইতে বহির্গত হন, এবং এই কর্ম্মফলে তাঁহার গতি নির্ণীত হয়।

যাঁহারা দেহধারণ করিয়া সাধন ভজন লইয়া জীবন কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মা সেই সাধনফলে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে সূর্য্যলোকে যা'ন, তথা হইতে চন্দ্রলোকে এবং তথা হইতে পুনরায় এক জ্যোতির্ম্ময়লোকে গিয়া অন্য এক মুক্ত আত্মার সাহায্যে ব্রহ্মলোকে যান। তথায় এই সব আত্মা প্রায় ঈশ্বরের ন্যায় শক্তিপ্রাপ্ত হয়েন ও সর্ব্বজ্ঞান লাভ করেন এবং অনন্ত কালের জন্য তথায় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। দ্বৈতবাদীরা এই কথা বলেন ও অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে কল্পান্তে তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হয়েন।

যাঁহারা জীবনে সকাম কর্ম্ম করিয়াছেন, যজ্ঞাদি কামনা করিয়া করিয়াছেন, তাঁহাদের গতি সৎ কর্ম্মগুলির ফলে দেহান্তে চন্দ্রলোকে হয়। ভোগের জন্য তথায় অনেক প্রকারের স্বর্গ আছে। তাহাতেই তাঁহারা দেবদেহ ধারণ করিয়া কিছুকাল কৃত সৎকর্ম্মের ফল ভোগ করেন। কালপূর্ণ হইলে———অসৎ-কর্ম্ম-সংস্কারগুলি জাগিয়া উঠিলে আবার পৃথিবীতে আসিতে হয়। বায়ু, মেঘ প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজলের সহিত ধরণীতে পতিত হয়েন এবং কোন শস্যাদিতে লাগিয়া থাকেন। ঘটনাক্রমে সেই শস্য কোন মনুষ্য ভক্ষণ করিলে, তাঁহার ঔরসে পুনর্ব্বার নব দেহ ধারণ করেন।

পাতকীগণ, যাহারা চিরদিন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য জীবনপাত করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুর পর ভূত প্রেত

পিশাচ হইয়া চন্দ্রলোকে ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করে, কেহ কেহ মনুষ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করে, কাহাকেও বা মনুষ্যের সহিত সখ্যতা করিতেও শুনা যায়। সেইখানে কিছু কাল বাসের পর তাহারা পশুজন্ম প্রাপ্ত হয় এবং কিছুকাল পরে আবার নর-জন্ম পায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, যাঁহারা সাধন পথে থাকেন, যাহাদের চিত্ত-শুদ্ধি হইয়াছে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, যাঁহারা স্বর্গ কামনায় সৎকর্ম্ম করেন সেই কর্ম্ম ফল তাহারা দেবদেহ লাভ করিয়া স্বর্গ ভোগ করেন ও ভোগ শেষ হইলে, সঞ্চিত অসৎ কর্ম্ম সংস্কারগুলি জাগিয়া উঠে ও আবার মর্ত্তাভূমে আসিতে হয়, এইরূপে যাহারা পাপী, পাপনিরত হইয়া যাহারা জীবন কাটাইয়াছে, তাহারা কিছুকাল প্রেত-যোনিতে থাকে কিন্তু কর্ম্ম থাকে না, কেবল ভোগ থাকে। সৎ-কর্ম্মের বা অসৎ কর্ম্মের ফলভোগ থাকে কিন্তু নূতন কর্ম্ম আর থাকে না। ফলভোগ শেষ হইলে আবার পূর্ব্ব কর্ম্ম জাগিয়া উঠিলে আবার মর্ত্ত্যভূমে আসিয়া নূতন কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মই সকলের মূল। মোক্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্মাধীন। সেই জন্য শিহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন—

"নমস্যামো দেবান্, নন্থ হতবিধে তেঽপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ, সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।"

মিশ্রপাদ সকল দেখিয়া শুনিয়া, কর্ম্মকেই সকলের নিয়ন্তা বোধে বলিতেছেন দেবগণকে নমস্কার করি,—তাহাই বা কিরূপে হয়? দেবগণও বিধির বাধ্য, তবে বিধিকেই নমস্কার করি। না, বিধিও সর্ব্বদা কর্ম্ম-ফলের বাধ্য সেই ফল আবার কর্ম্মায়ত্ত,—বিধিই করুন আর দেবতাগণই করুন; তবে কর্ম্মকেই নমস্কার করি, যাহার শক্তি বিধিকেও বশীভূত করিয়াছে।"

এই কর্ম্ম সমষ্টিই মনুষ্যজীবন। বারিতরঙ্গের ন্যায় মনে অনবরত চিন্তা ও কার্য্যতরঙ্গ উত্থিত হইয়া বার বার জঠরযন্ত্রণা ভোগের ও কর্ম্মসূত্রের সৃষ্টি করিতেছে। জীবাকারে উৎ-পত্তি, গতি ও পরিণতি যখন এই কর্ম্মসূত্র হইতে, তখন কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম বিচার করা কি কর্ত্তব্য নয়? আমরা কি করি? যথে-চ্ছাচার, যাহা মনে আসে তাহাই করি, এবং তাহার ফলে অশেষ দুর্গতি পাই। একবারও চিন্তা করি না, কি করিব আর কি করিব না। যদি বল, মায়াভ্রান্ত জীব, সকল সময়ে বুঝিতে পারে না, মায়ান্ধ হইয়া বুদ্ধি বিকৃত হয়। তাহারও ত উপায় আছে!

বাল্যকাল হইতে সৎসঙ্গের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, মানবহৃদয়ে কর্ম্ম করিবার যে প্রবৃত্তি জাগরূক হয়, তাহা সৎ বই অসৎ হইতে পারে না ইহা নিশ্চিত। কারণ মনুষ্য প্রকৃতিতে আসঙ্গ লিপ্সা বড় প্রবল বলিয়া, অধিক শক্তি-মান প্রকৃতির সহিত একত্র বাস, সেই প্রকৃতি-গত শক্ত্যাবেশ ক্ষুদ্র শক্তি প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে সাধুসঙ্গ করিবার এত আদেশ। সাধু প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ কর্ম্ম সংযত হয় ও উচ্ছৃঙ্খল কার্য্য তখন আর আসে না।

গৃহী যদি জীবনের প্রাত্যাহিক কর্ম্মগুলিকে ভগবৎ-সেবারূপে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে আরও সুবিধা। "দয়াময়, যাহা কিছু করিতেছি, সব তোমার কার্য্য। এই স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় স্বজন দিয়া আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছ, এ সমস্তই তোমার, আমি নিযুক্ত কর্ম্মচারী। তোমার অনুজ্ঞামত, এই জীবগুলির তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হইয়াছি, দেখ দেব যেন তোমার বিশ্বাস রক্ষা করিয়া যাইতে পারি।"

এইরূপে তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া যদি জীবনের সকল কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, কার্য্যে বিরক্তি থাকে না, পরন্তু কার্য্য করিতে মনে এক বিমল আনন্দ আসে। এই মলমূত্রবাহী, রক্তবসাসমন্বিত নশ্বর দেহের দ্বারা ভগবৎ-কার্য্য সাধিত হইতেছে, মনে হইলে, হৃদয়ে প্রভূত বলের সঞ্চার হয় ও কাম, ক্রোধ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ দুষ্প্রবৃত্তিগুলি সেই বলে সঙ্কুচিত হইয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রভৃতি কোমল ও পবিত্রতর ভাবগুলিকে জাগাইয়া দেয়। কার্য্যে একটা রতি আসে, কার্য্য নিস্কামও হয়। ভগবৎ কার্য্য করিতেছি, ঠিক ঠিক মনে হইলে, তাহাতে আর স্বার্থগন্ধ থাকে না, সুতরাং নিষ্কাম হয় ও প্রাণে বীরত্ব আসে। তাহার বলে মানব অসাধ্য সাধনেও পরাঙ্মুখ হয় না। কোন ক্ষতি হইলে, নিজ ক্ষতি হইল ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। "আমার কি—তোমার!" এই ঠিক ভাব। এ ভাব প্রাণে বদ্ধমূল হইলে, সংসারে শোক, দুঃখ কোন কষ্ট দিতে পারে না বা সুখ ও সম্পদেও আনন্দিত করে না। তখন গীতায় ভগবদ্বাক্য "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ" হইয়া মানব শান্তিলাভ করিতে পারে। তখন মায়া তরঙ্গে জীব অচল অটল ভাবে থাকিতে পারে। মায়া তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না। "দুরত্যয়া, দৈবী, গুণময়ী" মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার এই অতি সহজ উপায়। জীব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, সকল কার্য্যে "আমিত্ব" আনয়ন করিয়া বার বার কষ্ট পায়।

শাস্ত্র বলেন, আমাদের দেহের মধ্যে তেত্রিশ কোটি স্নায়ু আছে। প্রত্যেক স্নায়ুর একজন করিয়া অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। সেই কারণে হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তেত্রিশ কোটি স্নায়ুকে জাগাইতে পারিলে তবে কার্য্য ঠিক হয়। গীতায় ঠাকুর বলিয়াছেন "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম ইহা স্থির করিতে জ্ঞানী ব্যক্তিও বিমোহিত হন, অন্যে পরে কা কথা। তাই এই গুলিকে জাগাইতে পারিলে আর অকর্ম্ম আসে না। ইহার মধ্যে আমরা আবশ্যকমত কতকগুলি জাগাইয়া লইয়াছি। যেমন আহার, বিহার, সন্তানোৎপাদন, কথোপকথন, আহার সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম, এইরূপ নিত্য আবশ্যকীয় কয়টা স্নায়ু জাগাইয়া রাখিয়াছি অবশিষ্ট সবগুলি আমাদের নিদ্রিত।

জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে জ্ঞানী প্রথমে "নেতি নেতি" করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিকাশ অলীক, এইটি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা পান। এইরূপে সমস্ত উড়াইয়া দিতে দিতে একস্থানে উপস্থিত হ'ন, যেখানের বর্ণ আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ভাষায় সে ভাব প্রকাশিত হয় না, তাই আজ ঋষি বলিতেছেন "অপ্রাপ্ত হইয়া যথা হইতে মন বাক্যের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয়।" "সোঽহং" আমি সেই ব্রহ্ম, আমা ব্যতীত বিশ্বে আর কেহ নাই, কিছু নাই, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলই অনিত্য —আমি মাত্র নিত্য।" এই ভাব পরিপক্ক হইলে, জ্ঞানী ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ ধারণ করিতে সক্ষম হন। তখন তিনি যে স্থানে উপস্থিত, তাহার বর্ণনায় মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় মুণ্ডকে ২য় খণ্ডে ১০ম শ্লোকে বলিতেছেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

তখন আপনাপনি জ্ঞানীর সর্ব্বস্নায়ু জাগ্রত হয়। যিনি "ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং" সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বাসুদেবের স্থানে সহস্র'র মস্তিষ্ক-বিন্দুতে জ্ঞানী উপনীত হইলে, এই ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে দেবের দেবতা পরম দেবতা জাগ্রত হ'ন বলিয়া সর্ব্বস্নায়ু জাগিয়া উঠে। দেহমন পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানী তখন সৃষ্ট পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই আত্মবিকাশ বলিয়া অনুভব করেন। তখন তিনি "চিনির পাহাড়" হইয়া যান।

এই মানবদেহে তিনটি রন্ধ্রপথ আছে। "ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না।" ইড়া দক্ষিণ ও পিঙ্গলা বাম নাসারন্ধ্র। যোগী প্রাণায়াম আরম্ভ করিয়া প্রথমে "ইড়া" পথে বায়ু ভিতরে গ্রহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেহের মধ্যে তাহাকে ধারণ পূর্ব্বক আবার "পিঙ্গলা" পথে তাহাকে নির্গত করেন ও আবার পিঙ্গলা পথে গ্রহণ করিয়া ইড়া পথে পূর্ব্বোক্তরূপে নির্গত করেন।

এইরূপ করিলে শ্বাস সংযত হয়। ইহাই প্রাণায়াম। ইহা বহুক্ষণব্যাপী হইলে, ক্রমে কণ্ঠনালির গতি সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ প্রাণায়ামের দ্বারা এই গতি ক্রমশঃ নিম্নগামী হয় এবং গুহ্যদ্বারে, "মূলাধারে" আঘাত করে। ইড়া পিঙ্গলা মধ্যে যেমন রন্ধ্রপথ আছে, সেইরূপ মূলাধার হইতে মেরুদণ্ড মধ্যবর্ত্তী "সুষুম্না" নাম্নী নাড়ীর মধ্যেও একটি অতি সূক্ষ্ম পথ আছে। বাঙ্গলা "৪" যদি আড় করিয়া "∞" এই ভাবে রাখা যায়, তাহা হইলে উহার মধ্যস্থলে যে সংযোগস্থল তাহাই "সুষুম্না" পথ ও দুই পাশে "ইড়া ও পিঙ্গলা।" ইড়া ও পিঙ্গলার ন্যায়, এই পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে না। মূলাধারে আমাদের কুণ্ডলিনী-শক্তি অর্থাৎ অনন্তজীবনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন। প্রাণায়ামের দ্বারা কণ্ঠনালির আধোগামী গতি বা স্পন্দন সেই মূলাধারে প্রহত হইলে, সুষুম্নার সূক্ষ্ম পথ খুলিয়া যায় ও নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তি সেই অতি সূক্ষ্ম পথে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকেন। প্রথম মূলাধার হইতে লিঙ্গমূলে—"স্বাধিষ্ঠান" চক্র ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে নাভি দেশে "মণিপুরা" পরে বক্ষে "অনাহত," কণ্ঠে "বিশুদ্ধ।" ও ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞা।" এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে মস্তিষ্ক-বিন্দুতে উপনীত হইলে যোগী অনন্ত জ্ঞান লাভ করেন ও সর্ব্বস্নায়ু জাগিয়া উঠে।

ভক্ত আপনার ভক্তিবলে, একেবারে নিমেষ মধ্যে সর্ব্বস্নায়ু জাগাইয়া লইতে পারে, তাহার অন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মই মনুষ্যজীবনের স্রষ্টা। সুতরাং সে কর্ম্ম কিরূপ সাধনা করিলে জীবনলাভ সার্থক হয়, তাহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া জগতে বাস করা সকল মানবেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

জ্ঞানী জ্ঞানপথে, যোগী যোগপথে, কর্ম্মী যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা ও ভক্ত ভক্তিবলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হ'ন। কিন্তু কলিযুগে অল্পায়ু ক্ষীণশক্তি মানবের পক্ষে জ্ঞানপথ বা কর্ম্মপথ আশ্রয় করা অতীব অসম্ভব। যেরূপ গুরুলাভে সম্যকরূপে জ্ঞান বা কর্ম্মপথের উপদেশ পাওয়া যায়, সেরূপ সদ্গুরু লাভ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে, হয়ত গুরুলাভে ও শিষ্যের ধারণ করিবার শক্তির অভাবে কার্য্য সুফলদায়ী হয় না। যে সব ব্রতধারণে উক্ত উভয়বিধ পথে নিরাপদে অগ্রসর হওয়া যায়, সেরূপ ধারণাশক্তি হয়ত শিষ্যের নাই। সুতরাং কলিজীবের পক্ষে কি কর্ম্ম? যখন কর্ম্মই করিতে হইবে, জগতে আসিয়া কর্ম্ম ভিন্ন যখন আর কিছু পাইব না, তখন এস ভাই, এমন কর্ম্মে করি যাহার ক্ষয় নাই।

দয়াময় যখন দেখেন যে নরকুল পাপের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইতেছে, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতেছে, তখনই আত্মসৃষ্টি করেন। গীতার সিদ্ধ বাক্য—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতনামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভব্যাত্মমায়য়া॥"
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

"অজ, অব্যয় এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও, আত্ম-মায়ায় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমি অবতার হই। যখনি যখনি ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তখনই আমি আত্মসৃষ্টি করিয়া থাকি।"

যখন মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম এক প্রকার ভারতবর্ষ হইতে মহাপ্রস্থানের আয়োজন করিতেছিলেন, যখন জড়বাদীগণ ন্যায় ও অলঙ্কারের চর্চ্চা লইয়া ভগবত্তত্ত্ব উড়াইয়া দিতে চাহিতেছিল, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষ একজন আছেন এ কথাও যখন বিস্মৃতিগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী অর্ব্বাচীন্‌গণ ভারতভূমে একাধিপত্য করিতেছিল, যখন ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ও ভগবান রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উভয়েই গভীর জলে নিমজ্জিত করিয়া কামাচারী, বামাচারী প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধকগণ ভারতভূমিকে,—দেবতার লীলাক্ষেত্র এই দেবভূমিকে—পিশাচের বিলাসভূমি করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময় ভগবান জীবের দুঃখে করুণার্দ্র হইয়া বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষীণশক্তি কলিজীবের রক্ষার উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন। মিশ্র জগন্নাথ দেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কি করিলে কলিজীবের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসাধন হইবে, উত্তমরূপে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। নামস্রোতে প্লাবিত করিয়া, সেই সুধা সিঞ্চনে মৃতা ভারতকে সঞ্জীবিতা করিয়া গিয়াছেন। "কেবল নাম কর—কেবল হরি বল" এই সাধনা! কেবল মুখে বলা নয়, সমস্ত স্নায়ুকে জাগাইয়া, দেহের অণুপরমাণু সব জাগাইয়া একবার হরি বল। এই কর্ম্ম, এই সাধনা! এই সাধনার বলে "তিনলক্ষপতি" যখন হরিদাস বাইশ বাজারে কোড়া খাইয়া যিশু খ্রীষ্টের ন্যায় বলিয়াছিলেন "প্রভু, আমার প্রহারকারীগণকে

ক্ষমা কর। উহারা জানে না, কাহাকে মারিতেছে।"

"নাম্নস্ত যাদৃশী শক্তি পাপনির্হরণে হরে
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ।"

নামের এত শক্তি, একবার হরিনাম রসনায় উচ্চারণ করিলে, এত পাপ ধ্বংস হয়, যে মানব জীবনে এত পাপ করিয়া উঠিতে পারে না। নাম কিরূপে করিতে হয়, মহাপ্রভু তাহা জগতকে উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। নামধর্ম্ম প্রচার করিয়া দুর্ব্বল আমরা আমাদের উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন এক সময়ে ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঠাকুর, এত বড় বিশ্বখানার রচয়িতা, শুধু কি "কৃষ্ণ" এই দু'টি বাক্যে তাঁহার সকল গুণের পরিচয় দেওয়া হয়?" ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন—

"বীজের ভেতর বটগাছটি আছে যেমন আঁকা।
ওই নামের মধ্যে আছে তেম্‌নি চূড়াধড়াবাঁকা।"

বীজ যেমন মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া তাহাতে জলসেচন প্রভৃতি করিতে করিতে তাহা হইতে অঙ্কুর ও ক্রমে পূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নাম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ভক্তি সহকারে সেই নাম জপ করিতে করিতে হৃদয়ে নামের উদয় হয়। ক্রমে নাম হইতে রূপ। একটি সর্ষপাকার ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্য হইতে অত প্রকাণ্ড প্রশাখাদি সমন্বিত মহাবৃক্ষের বিকাশ হয়। ওই বৃক্ষ সূক্ষ্মাকারে সেই বীজে নিহিত ছিল। তাহাই প্রকৃতির আনুকূল্যে, জল, বায়ু, মৃত্তিকা সংস্পর্শে মহাবৃক্ষে পরিণত হইল। প্রকৃতির সাহায্যে বীজ হইতে রূপ বিকাশ হইয়া মহামহীরুহ সৃষ্টি। সেইরূপ বীজস্বরূপ নাম হইতে রূপ হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়। সংসারে শত সহস্র কার্য্যে নিযুক্ত, সহস্র চিন্তায় উদ্বেলিত চিত্ত জিহ্বায় নাম গ্রহণ করিলেই স্থির, একীভূত হইয়া যায়। বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রশান্ত হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন "যেমন সরিষার পুঁটলি ছিঁড়ে যাওয়া।" যেমন সর্ষপ ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িলে তাহা সহজে কুড়ান যায় না, সেইরূপ সহস্র ব্যাপারে ব্যাপৃত মন সহজে একীভূত করা যায় না! মহাপ্রভুর এমনি কৃপা যে একবার নাম গ্রহণ করিলেই চিত্তস্থির হইয়া যায়।

তাই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, ক্ষীণশক্তি, জ্ঞান-কর্ম্ম-সাধনাশক্ত কলিজীবের উদ্ধারের পথ করিয়া দিয়াছেন। পাঁচজনা মিলিয়া হরিনাম করিলে, সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ, দেহের ও মনের সর্ব্ববাসনা সংযত করিয়া নাম গ্রহণ করিলে, হৃদয়ে শীঘ্র শীঘ্র নাম দৃঢ় হইয়া যায়। প্রত্যহ তার-স্বরে নাম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি আপনি হইয়া আসে ও সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবান আসিয়া উদয় হন।

আমার গুরুদেবকে এক সময়ে একব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল "কি তোমরা প্রত্যহ 'কাতরে কিঙ্করে ডাকে এস হে গৌর,' বলিয়া চীৎকার কর, ওতে লাভ কি?" আমার গুরুদেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন "রোজ ওইরূপ বলিতে বলিতে যদি সত্য সত্যই একদিন কাতরে ডাকিয়া ফেলি, তা' হ'লে ত আর থাকতে পারবেন্ না, আসতেই হবে, তাই অমন চেঁচাই হে!" ওইরূপ একমনে প্রত্যহ ডাকিতে ডাকিতে হৃদয়ে সত্যের উদয় হয়, মন ও মুখ এক হইয়া যায়। তখন সরল হৃদয় মধ্যে "নিরস্ত কুহকং পরং সত্যং" উদয় হন্।

আরও এক কথা সঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই। সঙ্কীর্ত্তন অর্থে তান ও লয় শুদ্ধ বাক্য। তুমি কথা কহিতেছ, তাহার একটা সুর ও তাল আছে। বিহঙ্গমকুল বৃক্ষশাখে কলধ্বনি করে, সেও তান লয়ে বাঁধা, প্রকৃতির গায়ক গায়িকা তাহারা। পশু ডাকে, তাহাও সুরে বাঁধা, ট্রেনে আরোহন করিয়া তাহার শব্দ লক্ষ্য কর, দেখিবে তাহাও সুর লয়ে গঠিত। নদী সমুদ্র উদ্দেশে সশব্দে চলিয়াছে, তাহাও মধুর সুরে গ্রথিত। তুমি পদব্রজে গমন করিতেছ তাহাও সুর-লয়ে গাঁথা। একবার দুই হস্ত পরিমিত, আরবার এক হস্তপরিমিত স্থান কি তুমি গমন করিতে পার? যে কয়পদ চলিবে সমদূরবর্ত্তী হইবে। আকাশে মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ, শিখি ও শিখিনীর নর্ত্তন, সকলই সুরে গঠিত। এইরূপে দেখিতে গেলে দেখা যায়, এই মহান বিশ্ব এক সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপ; প্রকৃতি অসংখ্য স্বরে অহঃরহ এই মহাসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। জগতের অণু পরমাণু হইতে "আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত" সকলেই এই মহাসঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। কেবল জ্ঞানাভিমানী, চৈতন্যভিমানী মানব আমরা, সেই মহাসঙ্কীর্ত্তন অহরহঃ শ্রুতিগোচর হইলেও তাহাতে নির্লিপ্ত আছি।

বিশ্বের ক্ষুদ্র, মহান, সকলেই যখন মহানন্দে এই গীতি গাহিতেছে, তখন সেই অণুপরমাণু মধ্যস্থ, সেই অণু সমবায়ে গঠিত শ্রেষ্ঠ জীব আমরা কেন সে সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিব না? কেন অগ্রে হইতে, সময় থাকিতে, রসনার বল থাকিতে থাকিতে সেই ভবসাগরের কাণ্ডারীর সহিত আলাপ করিয়া রাখিব না? যখন ভীম ভবপারাবারের কূলে দাঁড়াইব, কর্ণধার অগ্রে পরিচিত ব্যক্তিকে যত্ন করিবে, অপরিচিতকে কে কোথায় সমাদর করিয়া থাকে? হয় ত ফিরিয়া চাহিয়াই দেখিবে না। তাই বলি ভাই, সময় থাকিতে, সেই নবনীরদ-শ্যাম মোহনরূপী "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ" ভব-কর্ণধারের শরণাপন্ন হও যে শেষে কূল পাইবে, অকূলে ভাসিতে হইবে না।

ভগবান একসময়ে দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।"

আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীগণের হৃদয় মধ্যেও থাকি না, আমার ভক্তগণ যথায় আমার গুণগান করে আমি সেই খানেই থাকি।

সঙ্কীর্ত্তন করিতে বসিলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ সেই মণ্ডপে উপস্থিত থাকেন যতক্ষণ না সঙ্কীর্ত্তন শেষ হয়। নিষ্কাম প্রেম লইয়া, বাসনাহীন লৌল্য লইয়া নাম করিলেই, সেই ভক্তির বলে স্বয়ং ভগবান তোমার সম্মুখে মোহনবেশে দাঁড়াইয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। ভালবাসার জন্য, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পার না বলিয়া তাঁহাকে ভাল বাস দেখি। প্রতিদান আশা বর্জ্জিত হইয়া, সে আমাকে যত্ন করুক আর না করুক সেই আমার সর্ব্বস্ব! সে আমাকে ভাল না বাসিয়া যদি ভাল থাকে, তাই আমার ভাল, এই ভাব লইয়া ডাক দেখি, দেখিবে নিমেষ মধ্যে অন্ধকারে হৃদয় আলোকিত হইয়া যাইবে। এই নিঃস্বার্থ, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু, এই প্রতিদান আশাশূন্য নির্ম্মল প্রেম, শ্রীমতীতে পরিপুষ্ট।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

প্রেমময়।

(শ্রীহীন-পাগল লিখিত)

(২৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জীব জ্ঞানের সঙ্গে চলিলেন তাঁহার মুখে আর বাক্য নাই—নীরবে, ধীরে ধীরে জ্ঞানের সঙ্গে চলিয়াছেন।

অদূরে একটি সুন্দর তপোবন। বৃক্ষে বৃক্ষে নানা জাতীয় পক্ষিগণ আনন্দে মধুর ধ্বনি করিতেছে, শ্রবণে অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। চারিদিক নিস্তব্ধ—সুমধুর কুসুম গন্ধে চারিদিক আমোদিত—অপূর্ব্ব আলোকে চারিদিক আলোকিত—যেন সে সুন্দর কাননটি বসন্তের চিরনিবাসভূমি।

সেই চিরশান্তিময় মনোহর তপোবন মধ্যে একটি লতামণ্ডপ। চারিটি কুসুমিতা কামিনীকুসুম বৃক্ষের ঘন পত্রাবলীর উপর দিয়া মাধবীলতা সেই স্থানটি আচ্ছাদিত করিয়া স্থানটিকে অতি মনোরম করিয়াছে। মধ্যে একটি প্রস্তর-বেদিকা। সম্মুখে তুলসী-মঞ্চ—মঞ্চের চারিধারে অসংখ্য তুলসী মঞ্জরি-ভূষিতা হইয়া বিরাজিতা—মঞ্চস্থ তুলসীর উপরে একটি সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্র কলস, তাহা হইতে ধীরে ধীরে শীতল-বারিধারা সেই তুলসিশিরে পতিত হইতেছে। বেদীর উপর একখানি আসন পাতা নিকটে পূজার উপকরণসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে।

জ্ঞান বলিলেন "জীব, এই আসনে ব'সে তুলসী দেবীর পূজা কর।"

জীব তুলসী কানন প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, প্রণাম করিয়া সেই আসনে উপবেশন করিলেন, এবং একমনে, শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া সেই তুলসীমঞ্চে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। সহসা শ্রীগুরুদেব সেই মঞ্চসমীপে আবির্ভূত হইয়া সেই পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক তুলসিশিরে অর্পণ করিলেন।

জীব সহসা শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়া ব্যস্ত ভাবে আসন ত্যাগ পূর্ব্বক, তাঁহার চরণ সমীপে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন—বলিলেন—

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোঽস্তুতে॥"

শ্রীগুরুদেব জীবকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন—বলিলেন—"বাপ্, তাঁ'র তত্ত্ব তিনি না জানালে কে জানতে পারে? তাঁ'র তত্ত্ব জান্‌বার জন্য চেষ্টা ক'রেই বা প্রয়োজন কি? তিনি উপাস্য—তাঁ'র উপাসনা কর—তুমি দাস—প্রাণপণে সেবা কর—"

জীব। "কি সেবা করবো নাথ?—বনের ফুল ত বনস্পতিরা চিরদিনই ঐ রাঙ্গাচরণে দিচ্চে—আমি এ দুর্ব্বল হস্তে গাছে থেকে ফুল তুলে দিলে কি আর বেশী দেওয়া হ'বে? সুমধুর ফল—সে ত তোমারই নাথ—তোমার জিনিস তোমায় দিয়ে আমি মাঝে থেকে পূজার ফল চাই না—আমার

নিজের এমন কিছুই নাই যা দিয়ে তোমার পূজা কর্ত্তে পারি। এ দুর্ব্বল দেহ মন প্রাণ এও ত তোমার? আমি কি দিয়ে পূজা কর্‌বো—কি দিয়ে সেবা কর্‌বো? সেবার সম্ভার আমার কিছুই নাই—বস নাথ, এই আসনে, আমি ধীরে ধীরে ঐ রাঙ্গা চরণ দু'খানিতে হাত বুলাই।"

শ্রীগুরুদেব সেই আসনে বসিলেন। জীব তাঁহার অভয় চরণ দু'খানি আপনার ক্রোড়ে লইয়া, ধীরে ধীরে, হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন আর গুরুদেবের সে মূর্ত্তি নাই—

"বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষ্যং কম্বুকণ্ঠং স্মিতমুখসুভগং স্বাধরেন্যস্তবেণুম্
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতঃ বৈজয়ন্ত্যা।"

জীব সেই সুন্দর শ্রীমূর্ত্তির মুখমণ্ডলে ন্যস্ত দৃষ্টি হইয়া চরণসেবা করিতে লাগিলেন। সহসা মনে হইল—পুষ্পপাত্রস্থিত পুষ্পমালা এই কালার গলায় দিই। এই কথা মনে হইবামাত্র, জীব চরণসেবা ছাড়িয়া পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন—নয়নও কিয়ৎক্ষণের জন্য শ্রীমুখ হইতে পুষ্পপাত্রের দিকে পরিবর্ত্তিত হইল। মালা গ্রহণ করিলেন—কিন্তু চাহিয়া দেখেন আসন শূন্য—অমনি বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায়—"হা নাথ! কোথা গেলে" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

এমন সময়ে নবযৌবন সম্পন্না একটি সুন্দরী সেই স্থানে আসিলেন। তিনি তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া সানন্দে বলিলেন "এই যে জ্ঞান জীবকে নিয়ে এখানে এসেছ?—তবে চল এঁকে নিয়ে সেই লীলাময়ের লীলাক্ষেত্রগুলি দেখিয়ে, আনিগে।" তাহার পর জীবের গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলিলেন—"জীব, উঠ ভাই, সে ত লুকিয়েছে, আর ত এখন দেখা দেবে না। চল একবার খুঁজে দেখিগে। লুকা'বে কোথায়?—আবার দেখ্‌তে পা'বে, ভয় কি?"

জীব উঠিলেন "কৈ? সে শ্যামসুন্দর কৈ?"

"গোষ্ঠে গোপগণের সঙ্গে ক্রীড়া ক'চ্চে—মাতা যশোমতীর ক্রোড়ে ব'সে ক্ষীর সর নবনীতাদি ভোজন ক'চ্চে—দ্বারকায় ষোড়শ সহস্র অষ্ট মহিষীর সঙ্গে বিস্রম্ভালাপ ক'চ্চে—যমুনাপুলিনে ব্রজযুবতিগণকে আকর্ষণ করবার জন্য মধুর মুরলী-ধ্বনি ক'র্‌চে—শ্রীরাসমণ্ডলে যুথেশ্বরীগণবেষ্টিতা রাসেশ্বরীর সঙ্গে মহারাসে ব্যাপৃত আছে—আর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হয়ে সখাগণ সঙ্গে শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য ক'চ্চে—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীবেশে জীবোদ্ধারে ব্যাপৃত আছে—এর যে কোন স্থানে অনুসন্ধান ক'ত্তে পা'ল্লেই তা'রে পাওয়া যা'বে।"

জীব কাতর ভাবে বলিলেন—"আবার তাঁ'রে দেখ্‌তে পাব?"

ভক্তি। "পা'বে বই কি ভাই। সে যা'বে কোথায়? একটু খুঁজ্‌লেই পাওয়া যা'বে।"

জীব দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তবে চল। যেখানে নিয়ে যা'বে তোমরা, সেখানেই যা'ব। কিন্তু একবার দেখিও—আমি দূরে থেকে এক বার চোখের দেখা দেখ্‌লেই কৃতার্থ হ'ব।"

ভক্তিদেবী সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন "এস ভাই, তোমরা আমার ক্রোড়ে॥" এই বলিয়া নিজ দক্ষিণ উরুতে জ্ঞানকে এবং

বাম উরুতে জীবকে বসাইলেন! চক্ষের নিমেষে সেই আসন গঙ্গাতীরে উপনীত হইল। তাঁহারা দেখিলেন—গঙ্গাতীরে—

"সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্য দেবম্।"

সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া জীব জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কি সেই?"

ভক্তি বলিলেন "এই সেই—সেই এই।"

তখন সেই অন্তররাজ স্থিত জাহ্নবীতটে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইল। সেই শ্রীঅদ্বৈত্য শ্রীনিত্যানন্দ এবং সকল পরিজন সেই শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে মিলিত হইলেন। নিমেষ মধ্যে শ্রীগৌরমূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন জ্ঞান সেই শ্রীমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর ভক্তি বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। জীব আর একবার সেই ত্রিভঙ্গভঙ্গীর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিল। কিন্তু জীবের চক্ষের পলক আছে—পলক পড়িবামাত্র শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তাহারই শ্রীগুরুমূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। জীব তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন "জীব উঠ। প্রভাতের আর বিলম্ব নাই।

জীব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন "মা ভক্তি, তুমি জ্ঞানে মিলিতা হও।"

ভক্তি জ্ঞানকে বক্ষে ধারণ করিলেন। জ্ঞান ভক্তির অঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

তখন শ্রীগুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বাপ্, আমার একন্যাটিও তুমি আত্মসাৎ কর।" এই বলিয়া শ্রীগুরুদেব ভক্তিকে জীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। জীব সানন্দে ভক্তিকে বক্ষে ধারণ করিবামাত্র, ভক্তি তাঁহার হৃদয়ে বিলীনা হইলেন।

এমন সময়ে একটি রমণী ছয়টি পুরুষের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"নাথ, তুমি বৈরাগ্য অবলম্বন কর্‌লে আমার উপায় কি হ'বে?"

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"তোমার স্বামী ত কামিনি-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী নন। যাও মা তোমার উপপতিগণের সঙ্গে এই গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধ হও। আমি আবার তোমাদের মিলন ক'রে দিচ্ছি।"

শ্রীগুরুদেবের আদেশে প্রবৃত্তি, কাম ক্রোধাদির সহিত সেই জাহ্নবীজলে অবগাহন করিল। সেই পরম পবিত্র সলিলের শক্তিতে তাহাদের পূর্ব্বভাব অপগত হইলে, শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "তোমাদের পাপ অপগত হয়েছে, এক্ষণে আমি পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে অন্য নাম প্রদান করবো প্রবৃত্তি আজ হ'তে মা তোমার নাম হ'লো নিষ্ঠা, কাম তোমার নাম হ'লো প্রেম, ক্রোধ আজ হ'তে তুমি ত্যাগ নামে খ্যাত হও লোভ আজ হ'তে তোমার নাম হউক লালসা, তুমি জীবকে সেই ধন সহজে লাভ করিয়ে দেবে। মদ তুমি আজ হ'তে দয়া হও এবং মাৎসর্য্য আজ হ'তে মর্য্যাদা হ'লে। এখন সকলে নারীরূপে নিষ্ঠার অঙ্গে মিলিত হ'য়ে জীবের সেবায় রত হও। আর তোমাদের ভয় নাই।"

তৎক্ষণাৎ কামাদি ষড়রিপু মিত্ররূপে পরিণত হ'য়ে নিষ্ঠার পদানত হইল, এবং নিষ্ঠার পদে লীন হইলে নিষ্ঠা জীবের পদতলে পতিত হইলেন। জীব নিষ্ঠাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক বিললেন, "নাথ, এখন চিনেছি তুমিই সেই প্রেমময়।"

উপসংহার

দ্বিতীয় বিষাদ

প্রভাত হইয়াছে! বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ ধীর মধুরস্বরে কলরব করিতেছে। পূর্ব্বদিক রক্তাভ। এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। পূর্ব্বাকাশে উর্দ্ধে শুক্রগ্রহ অতি ক্ষীণভাবে বিরাজিত। পশ্চিমাকাশের প্রান্তদেশে বৃহস্পতি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। মানবেরা এখনও অনেকে শয্যা ত্যাগ করে নাই কিন্তু প্রবুদ্ধ জীবগণ আর কেহ নিজবাসে নাই। সকলেই স্বজাতীয় ধ্বনি করিয়া তপনদেবের আবাহান করিবার জন্য মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিতেছে কৃষীবলগণ অনেক পূর্ব্বেই হলস্কন্ধে বৃষদ্বন্দ্ব সঙ্গে ক্ষেত্রে গিয়াছে। গোপগণ গোদোহনান্তে গোবৎসগণকে তৃণাস্বাদন জন্য বাহিরে আনিয়া দিয়াছে। পৃথিবীতে বেশ একটু ব্যস্ততার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

এমন সময়ে একটি বৃহৎ অট্টালিকার ত্রিতলস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে একখানি আসনে একটি স্বরূপ যুবা নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যানমগ্নাবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, সম্মুখে একজন দীর্ঘকেশশ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসী অপর আসনে উপবিষ্ট হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে সেই যুবার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া আছেন।

অল্পক্ষণ পরে যুবার দেহ পুলকে পূর্ণ হইল। দেহ ঈষৎ কম্পিত হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন। একটু বিস্মিতের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন, "গুরো! আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভাই, আমায় গুরু বলিও না। যিনি তোমার গুরু তিনিই আমারও গুরু। আমি তাঁহারি আদেশে তোমায় এখানে ধ্যানস্থ করিয়া সমাধিস্থ করিয়াছি। জন্মান্তরের স্বকৃতি বলে তুমি এজন্মে সম্পত্তিশালী সাধু-ব্যক্তির পুত্র হইয়া জন্মিয়াছ। জান ত ভাই—একার্য্যে প্রারম্ভের নাশ নাই। জন্মান্তরে স্বকৃতিবলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যোগমার্গে উপদিষ্ট হইয়া, কিয়দ্দিন সাধনের পর সে জীর্ণবাস ত্যাগ ক'রে দেহান্তর গ্রহণ করেছ—শ্রীভগবানের উক্তি স্মরণ কর—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্যধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

সেই স্বকৃতির শক্তিতে এত বিলাস আয়োজনের মধ্যেও তোমরা পিতা পুত্রে সেই সন্মার্গ আশ্রয় ক'রে রয়েছ। অচিরেই শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইবে।"

যুবা। "আপনি আমায় সঙ্গে ক'রে লয়ে চলুন। আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ ক'রে আপনার সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের চরণসেবায় জীবন অতিবাহিত ক'র্‌বো।"

সন্ন্যাসী। "পাগলের মত কথা ব'লো না। কর্ম্মক্ষয় না হ'লে কিছুই হ'বে না। যা হ'বে তা'ত সূক্ষ্মদেহে দর্শন ক'রেছ। সেই প্রেমময়কে এই জন্মে নিশ্চয়ই দ্বাদশদলে দর্শন ক'রে কৃতার্থ হ'বে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করো না। এখন স্বকৃতি সহায়ে অন্তররাজ্যের অনন্ততীর্থ সেবা কর। আর তাহার সেই মহাবাক্য স্মরণ রেখো—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচ।"

॥ ওঁ ॥

মনে প্রাণে ডাকা।

দুর্য্যোধন সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে যোড়শোপচারে পরিচর্য্যা করিলে দুর্ব্বাসা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "দুর্য্যোধন আমি তোমার সেবায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। অতএব তোমার অভিলষিত বর গ্রহণ কর।" পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইলে বর দান করিতেন আবার সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইলেই শাপ প্রদান করিতেন। তাঁহারা কথায় কথায় রুষ্ট ও তুষ্ট হইতেন। ঋষিরা বনে ফল মূল আহার করিতেন। কালে কস্মিনে রাজভোগ পাইলে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইতেন। আবার কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইলেই সবংশে নিপাত দিতেন। দুর্ব্বাসা মুনির আবার সুনাম ছিল যে তিনি বেজায় রাগী। এমন সুন্দর স্বভাবসম্পন্ন মুনি যখন বর দিতে চাহিয়াছেন তখন আমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। "এক্ষণে আমার ইচ্ছা আপনি সশিষ্যে এই পথেই অদ্য সন্ধ্যাকালে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করুন, আর আমার কিছুই প্রার্থনা নাই।" দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি বুঝিয়া ঈষৎ স্মিতমুখে "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় হইলেন। দুর্য্যোধন মনে ভাবিয়াছিল অতিথি অভ্যাগতের আহারাদির পর স্বামীগণকে ভোজন করাইয়া পাঞ্চালী নিজে ভোজন সমাপন করেন, তাহার পর কেহ গেলে আর কোন প্রকার আহারীয় প্রদান করা যুধিষ্ঠিরের সাধ্যায়ত্ত নহে।

দ্রৌপদীর আহারের পূর্ব্বে যত লোকই উপস্থিত হউক না কেন তাহাদের সৎকার করা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল। এক্ষণে যদি কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা দ্রৌপদীর আহারের পর যাইয়া যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই পাণ্ডুবংশ নির্ব্বংশ হইবে। কারণ দুর্ব্বাসার উপযুক্ত আতিথেয়তা না হইলে ক্রুদ্ধ মুনি যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয়ই অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, তবেই দুর্য্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্ব হস্তে লাঞ্ছিত ও সপরিবারে বন্দী হইলে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক তাহার বন্ধন মোচন হইলে যুধিষ্ঠির তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দেন। দুর্য্যোধন দেখিল বনবাসেও পাণ্ডুপুত্রগণ ভোগৈশ্বর্য্য এবং শান্তিসুখে কাল কাটাইতেছে। পরশ্রীকাতর লোকের মত পাণ্ডবের সুখ যে তাহার পক্ষে অসহ্য। সে আপন ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আসিয়া পাণ্ডবের অনুগ্রহে জীবন মান পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিতে হইল। ইহা যে তাহার পক্ষে অসহণীয়। অকৃতজ্ঞ লোকের দশাই এই। উপকার পাইয়া উপকারীর অনিষ্ট না করিলে দুষ্টবুদ্ধি লোকের মন কখনই প্রফুল্ল হয় না। দুর্য্যোধনেরও আজ সেই অবস্থা। যুধিষ্ঠির কাম্যবনে ব্রাহ্মণগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পুরাণ কথায় কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় সশিষ্য দুর্ব্বাসা ধূমকেতুর ন্যায় তথায় দেখা দিলেন। যুধিষ্ঠির পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনির অর্চ্চনা করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যদি পাঞ্চালীর ভোজন সমাপন হইয়া গিয়া থাকে তবেইত

সর্ব্বনাশ দেখিতেছি। দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবার জন্য নদীতীরে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই, আজ ত সমূহ বিপদ উপস্থিত। সশিষ্য দুর্ব্বাসা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি। তুমি সত্বর গিয়া পাঞ্চালীর আহার হইয়াছে কি না জানিয়া আইস।" ভীম গিয়া দুর্ব্বাসার আগমনবার্ত্তা দ্রৌপদীকে জ্ঞাপন করিলে দ্রৌপদী বলিলেন "আর্য্যপুত্র, আমার ত আহার সমাধা হইয়া গিয়াছে। আমি আজ অন্নকণা পর্য্যন্ত দিতেও অসমর্থ।" ভীম বলিলেন "ভদ্রে আজ পাণ্ডুবংশ লোপ হইল দেখিতেছি। মুনি যেরূপ রোষপরবশ তাহাতে উপযুক্ত সেবা না পাইলে পাণ্ডবগণকে সবংশে নিপাত না করিয়া আর এস্থান হইতে গমন করিবে না। এখন উপায় কি? এ বিপদে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা না করিলে আর কোন উপায় দেখিতেছি না।" ভীম গিয়া দ্রৌপদীর ভোজনবার্ত্তা যুধিষ্ঠিরকে বলিলে যুধিষ্ঠির চারিভ্রাতা সহ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। এদিকে পতিব্রতা দ্রৌপদী মনেপ্রাণে সেই সর্ব্ববিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, "কোথা হে, বিপদহারী মধুসূদন তুমি একমাত্র পাণ্ডবগণের রক্ষক। আজ অগ্নিশর্ম্মা দুর্ব্বাসামুনি উপযুক্ত সৎকার অভাবে পাণ্ডবকুল ধ্বংশ করিতে বসিয়াছে, একবার আসিয়া দেখ। হে চিরসখা, পাণ্ডবগণ তোমার চির আশ্রিত। আজ ঋষির কোপানলে ভস্মীভূত হয় একবার আসিয়া দেখ। তুমি সঙ্কটমোচন নারায়ণ, তোমার কৃপা ব্যতীত আজ এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। হে চিরগৌরব, তুমিই বার বার বিপদ হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া আমার স্বামিগণের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছ, সেই গৌরব আজ অক্ষুণ্ণ রাখ। আমার স্বামিগণের আসন্ন বিপদ ভাবিয়া আমি ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছি; হে সখা, তোমার প্রদত্ত গৌরবে গৌরবান্বিত দাসীর মুখরক্ষা কর। হে দেব, তুমি বিপদের কাণ্ডারী; আমি বিপদের অকূলপাথারে ভাসিতেছি, আমাকে উদ্ধার কর। হে সখা, তুমি পাণ্ডবগণের বল, বুদ্ধি, ভরসা, আজ তাঁহারা তোমা বিহনে নিরুপায় হইয়া বিষন্নবদনে বিপদের প্রতিক্ষা করিতেছেন; তাঁহাদের মলিন মুখ দেখিয়া আমি জ্ঞানহারা হইয়াছি। হে দেব, তুমি আসিয়া বলবুদ্ধি প্রদান কর। তোমার আশ্রিত পাণ্ডবগণের বিনাশ হইলে জগতে তোমার নামে কলঙ্ক বিঘোষিত হইবে, আমি তাহাই ভাবিয়া নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছি।" দ্রৌপদী কায়মনে এইরূপে অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিলে দ্বারকায় প্রভুর আসন টলিল। তিনি ভোজনে বসিয়াছিলেন, রুক্মিণী দেবী অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ভোজন সমাপন করিয়া আসন ত্যাগ করিলেন দেখিয়া রুক্মিণী দেবী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কাহার কথা স্মরণ হইয়া আহারে ব্যাঘাত হইল জানিতে পারি না কি?" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "দেবি, আমার প্রিয় সখি পাঞ্চালি মহা বিপদে পড়িয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বলিব। আমাকে এখনই তথায় যাইতে হইবে।" প্রভুর স্মরণমাত্রেই

গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বিহঙ্গম রাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিমেষে কাম্যবনে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়া অন্তঃপুরে গিয়া দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখি কোথায় আছ, শীঘ্র আইস, আমার ক্ষুধার জ্বালায় পেট জ্বলিয়া গেল। সত্বর কিছু আহারীয় প্রদান কর।" যাজ্ঞসেনী তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন ক্ষুধিত জনের ন্যায় শ্রীহরি মাথায় হাত দিয়া ভূমির উপর উপবেশন করিয়াছেন। দ্রৌপদী বলিলেন, "দেব, এ রহস্যের সময় নয়। আমার ভোজন সমাপন হইয়া গিয়াছে; দুর্ব্বাসা দ্বারে অতিথি, তজ্জন্যই তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আহারীয় প্রদান করা আমার ক্ষমতাতীত।" ঠাকুর বলিলেন, "সখি, স্থালীর ভিতর দেখ, যাহা কিছু থাকে তাহাই দিলে আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।" পাঞ্চালি বলিলেন, "ঠাকুর আমি তোমার সহিত রহস্য করিতেছি না। এ রঙ্গের সময়ও নয়। আমি স্থালী পরিষ্কার করিয়া উঠাইয়া রাখিয়াছি।" ঠাকুর আবার বলিলেন, "স্থালী আনিয়া না দেখাইলে আমি এমন কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।" দ্রৌপদী তদুত্তরে স্থালী আনিয়া প্রভুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ঠাকুর স্থালী দেখিয়া বলিলেন, "ঐ যে একধারে শাকসংযুক্ত অন্নকণা লাগিয়া আছে, উহাই আমাকে প্রদান কর।" দ্রৌপদী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "ঠাকুর তোমার এ কিরূপ পরীক্ষা। ত্রিলোক যাঁহাকে ষোড়শোপচারে ভোজ্য-প্রদান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আমি আজ কেমন করিয়া এই শাক-কণিকা তাঁহার হস্তে প্রদান করিব। ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হওয়াই যে ছিল ভাল।" ঠাকুর বলিলেন, "সখি তুমি দুঃখিত হইওনা; আমার পক্ষে ভক্তের শাক-কণাই অমৃত তুল্য।" আহা, ভক্তের ঠাকুরের কি অসীম দয়া। এমন না হইলে কি ভক্তাধীন ভগবান দীন দয়াল নামে পরিচিত। দ্রৌপদী তখন বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কম্পিত হস্তে সেই শাকান্ন-কণিকা ত্রিলোকনাথের হস্তে দিলেন। ভগবান তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভক্তের সেই শ্রদ্ধার উপহার মুখমধ্যে ফেলিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া একটী উদ্গার তুলিলেন। তাঁহার সেই উদ্গারে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। ওদিকে সশিষ্য দুর্ব্বাসা সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া দেখিলেন সকলেরই যেন গুরুভোজনে নানারূপ সুখাদ্যের গন্ধ নির্গত হইতেছে; জল স্পর্শ করিবার আর কাহারও প্রবৃত্তি নাই। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে গিয়া ভীমকে সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান করিতে বলিলেন। ভীম গিয়া দুর্ব্বাসাকে আহ্বান করিলে তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কল্য ধর্ম্মপুত্রের আতিথ্য গ্রহণ করিব। আজ আমাদের কাহারও আহারে প্রবৃত্তি নাই।" এই রূপে কৃষ্ণের কৃপায় সে যাত্রা পঞ্চভ্রাতা দুর্ব্বাসার কোপানল হইতে রক্ষা পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মধুর বাক্যে প্রবোধ দিয়া দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। মনে প্রাণে এক করিয়া ডাকায় ভগবান এইরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। ভক্তের ডাকে ভগবান নিশ্চেষ্ট হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। কায়মনে ডাকিলে তাঁহাকে যেমন অবস্থায়ই হউক না কেন, আসিতেই হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা একজনের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া অপরের অনিষ্ট করিতে কেন উদ্যত হইবেন। তাঁহারা সমদর্শী, তাঁহাদের শত্রু, মিত্র, আপন, পর কেহই নাই। দুর্য্যোধনের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া ঋষি যে ধর্ম্মপুত্রের অনিষ্ট করিতে স্বীকৃত হইবেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তজ্জন্যই এবম্বিধ বর চাহিলেই তিনি ঈষৎহাস্য করিলেন। মুনিগণ ত্রিকালদর্শী, তাঁহারা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা তৎক্ষণাৎ যোগবলে দেখিতে পাইতেন। তজ্জন্য দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের এবম্বিধ অন্যায় প্রার্থনা পূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীআশুতোষ রায়।

দুরাশা।

আকাশ কুসুম সম অপরূপ আশা মম
কেন করি?—মনে করি করিব না আর।
মনোগতি নিবারিতে নাহি পারি কোন মতে
অপরূপ আশা তাই করি রে আবার।
আমার অধীন যদি হ'তো মন নিরবধি,
তা' হ'লে কি কুহকিনী আশারে লইয়া
ভ্রমিতাম হায় এত অধীর হইয়া?

হায় রে কুহকী আশা মেটে না কি তোর তৃষা?
পূরে নারে সাধ তোর কভু কি কখন?
মানব-হৃদয়ে এসে কালান্তকরূপে ব'সে
অনুক্ষণ জর্জরিত কর প্রাণ-মন।
তোমা হ'তে কে কোথায় নিস্তার পেয়েছে হায়!
এ হেন মানব কেহ আছে কি ধরায়
আশা-বিষে যা'র কভু জলে নি হৃদয়?

কে আছে শরণ ভবে? কার কাছে গেলে,তবে
দুরাশার দৃঢ় গ্রন্থি ছিন্ন হ'য়ে যা'বে।
রবে না আশার আশা অসারেতে ভালবাসা
অন্তরে অন্তর হ'য়ে ক্রমে লয় পা'বে।
গুরু-চরণ বই এমন আশ্রয় কই?
ওরে মন আয় যাই লুটাই সে পায়
আশা মিটে যা'বে তোর সুধার ধারায়।

কাঙ্গাল।

ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধি।

(রাজসাহী বৈষ্ণব সমিতিতে পঠিত)

দৈহিক ও মানসিক যাবদীয় বৃত্তি নিচয়ের সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্যের ফলেই ইন্দ্রিয় সংযম ঘটে। আবার ইন্দ্রিয়গ্রামকে সম্যক সংযত করিতে পারিলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্মের সার। যাঁহাদিগের আপনাপন ধর্ম্মের প্রতি সবিশেষ আস্থা আছে এবং হৃদয়ের অনুরাগ প্রবল হইতে চলিয়াছে সে জন্য ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে, তাঁহাদিগের এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মের মর্ম্মগত তত্ত্ব আর কিছুই নাই। সাকারের উপাসনাই করুন, আর নিরাকারের উপাসনাই করুন, একেশ্বর বাদীই হউন বা বহু দেবদেবীতে শ্রদ্ধাবানই হউন, প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি না হইলে কোন উপাসনাতেই কোন সুফল ফলিবার নহে। চিত্তশুদ্ধির অভাবেই যে ধর্ম্মের অভাব হইবে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত মত। কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন। অশুদ্ধ-চিত্তের পক্ষে কোন ধর্ম্মই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে। পক্ষান্তরে শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির ধর্ম্মে কোন প্রয়োজনই নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত আছে সকল ধর্ম্মেরই একই উদ্দেশ্য—ভগবৎ-করুণালাভ। নদীগুলি যেমন নানা পর্ব্বত ও হ্রদ প্রভৃতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সোজা ও বাঁকা নানা পথ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া একই সমুদ্রে পতিত হইতেছে; ধর্ম্মও তদ্রূপ হিন্দু, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, ইসলাম, নিরীশ্বর, কোমৎ প্রভৃতি নানারূপ নামে অভিহিত হইয়া নানা প্রকার ঋজু ও কুটিল পথে পরিচালিত হইলেও এক মাত্র ভগবানেই গিয়া মিলিতে বাধ্য হইয়াছে। এই নিমিত্ত মহিম্ন স্তোত্রে উক্তি আছে,—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথ যুসাং,
নৃনামেকো গম্য স্তমসি পয়সামর্ণব ইব।"

চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মাইতে না পারিলে উক্ত কোন ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। সর্ব্বধর্ম্ম মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধি ব্যাপার অতি প্রবল। অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি কখনই হিন্দু পদবী লাভের যোগ্য হইতে পারেন না। হিন্দু সন্তান হাজার বার মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার মতানুসারে আচার ব্যবহার করুন, হাজার বার সন্ধ্যাবন্দনা এবং দেব দেবীর পূজাদিতে ব্যাপৃত থাকুন, সহস্র মুদ্রা দান ও বহু প্রকার সদনুষ্ঠানে নিরত থাকুন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি হিন্দুত্ব লাভ করিতে অধিকারী হইতে পারিবেন না।

চিত্তশুদ্ধির প্রাথমিক অনুষ্ঠানেই ইন্দ্রিয় সংযমের একান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিতে না পারিলে চিত্তশুদ্ধি সম্ভবপর হয় না। ইন্দ্রিয়-সংযম শব্দের অর্থে এ কথা বুঝিতে হইবে না যে, ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া বিলুপ্ত বা ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস সাধন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সংযত রাখিতে হইবে, ইহাই ইন্দ্রিয়-সংযম শব্দের প্রকৃত

অর্থ। উদাহরণ স্থলে এ রূপ বলা যায় যে, আহার এক জাতীয় ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা আহারকে সংযত করা বলিলে এ রূপ বুঝিতে হইবে না যে, উপবাস করিয়াই থাকিতে হইবে; কিম্বা অতি ঘৃণিত বস্তু সকল আহার করিতে হইবে। আহার সংযম বলিলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, দেহ ও মনকে সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত এবং মানসিক সদ্বৃত্তি সমূহের প্রসারের জন্য সাত্ত্বিক গুণবর্দ্ধক হিতকর আহার্য্য পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমের সাহায্য অবশ্যই করিবে। আহার্য্য বিষয়ে অনিবার্য্য স্পৃহাকে হ্রাস করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিলেও ইন্দ্রিয় সংযমের কোন বিঘ্নই ঘটিবে না। এ বিষয়ে গীতাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—

"রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥" ২য়। ৬৪।

অর্থাৎ রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে আত্ম-বশ পূর্ব্বক বিষয় সকল উপভোগের দ্বারা বিধেয়াত্মা ব্যক্তি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ফলতঃ ইন্দ্রিয়সংযম শব্দের সংক্ষেপ অর্থ এই যে ইন্দ্রিয়ে আশক্তির অভাব। ধর্ম্ম এবং ঐশ্বরিক নিয়ম সকল রক্ষার্থ যে পরিমাণ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার প্রয়োজন তাহা করিতেই হইবে। তদতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা যাহার আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্ম-রক্ষার্থ ইন্দ্রিয় পরিচালন করে তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, সুখ নাই, আসক্তি নাই তাহাকেই সংযতেন্দ্রিয় বলা যায়। ইহাই সংযতেন্দ্রিয়ের প্রকৃত লক্ষণ বটে, কিন্তু এমন লোকও অনেক লক্ষিত হয় যে, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে এককালে বিমুখ থাকিয়াও মানসিক মালিন্য বিদূরিত করিতে পারেন নাই লোকসমাজে প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অথবা লোকলজ্জার দায়ে পড়িয়া কিম্বা ঐহিক উন্নতির বাসনায় বা ধার্ম্মিকের সাজ পরিয়া ইন্দ্রিয়সংযমীর ন্যায় বাহ্যিক আচরণ করেন, কিন্তু আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়ের জ্বালা অত্যন্ত প্রবল থাকে তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম বিষয় হইতে বহু দূরে অবস্থিত। যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ব্যাপারে উন্মত্ত তাহাদের সহিত এই শ্রেণীর ধর্ম্মাত্মাদের পার্থক্য অতি অকিঞ্চিৎকর। কারণ উভয়েই সমভাবে ইহলৌকিক নরকার্ণবে নিমজ্জিত।

ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতে করিতে যখন এমন শুভদিন আসিবে যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা ভ্রম ক্রমেও মানস-পটে উদিত হইবে না,—আত্মরক্ষার্থ বা ধর্ম্মরক্ষার্থ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিতে হইলেও বিরক্ত চিত্তে তাহা বিরক্তিকর ভিন্ন কদাচ সুখকর বলিয়া অনুভব হইবে না, তখন বুঝিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়সংযম হইয়াছে। এইরূপে শুদ্ধ-চিত্ত না হইয়া যোগ, তপস্যা বা পূজাদি যত যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইবে সে সকলই প্রাথমিক এবং নিতান্ত নিম্নস্তরীয়। তবে সেরূপ তপস্যা ও পূজাদি যে মন্দের ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে এই সূত্র নিরন্তর স্মরণ রাখিয়া এবং তাহাতেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

চিত্তশুদ্ধি বিহীন যোগ তপস্যাদি যে বিফল সে বিষয়ে হিন্দু পুরাণাদিতে উগ্রতপা ঋষিদের ইতিহাসেও অনেক রহস্যময় উদাহরণ বিবৃত রহিয়াছে। ঋষি যোগে বসিয়া সমাধি করিয়া আছেন, স্বর্গ হইতে অপ্সরাগণ আসিয়া প্রেম সঙ্গীত গাহেন আর তৎক্ষণাৎ মুনির যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়, তিনি আত্মহারা হইয়া পড়েন। ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধি-বিহীন যোগ ও তপস্যায় যে প্রকৃত কার্য্য হয় না, এবং কেবল যোগ ও তপস্যা দ্বারাই যে চিত্তশুদ্ধি হয় না তাহা শাস্ত্রোক্ত উপন্যাস সকলের দ্বারাই আমরা সুন্দর শিক্ষা করিতে পারি। অশুদ্ধচিত্ত লইয়া কঠোর যোগাদি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে বরং শারীরিক ও মানসিক অধঃপতনেরই সম্ভাবনা।

প্রত্যহ তিনবার অহিফেনসেবী রাজদণ্ডে কারারুদ্ধ থাকিয়া অনেক দিন অপ্রাপ্তিবশতঃ অহিফেনের মৌতাত বিস্মৃত হইয়া বলিতে পারে যে আমি অহিফেন ত্যাগ করিয়াছি তেমনি বহুদিন বনে বাস করিয়া প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকা বশতঃ অনেক সাধু সন্নাসীও মনে করিতে পারেন যে, আমি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছি। কিন্তু যে মৃত্তিকা পাত্র অগ্নিতে সংস্কৃত হয় নাই সে যেমন তুচ্ছ স্পর্শাঘাত সহ্য করিতে অক্ষম হয় অসংযতেন্দ্রিয় যোগী সন্নাসীগণও তেমনি বিকারের উপাদান স্পর্শ মাত্রেই আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন। এই সকল কারণেই আর্য্যগণ সংসার ধর্ম্মকে সকলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। সংসার ধর্ম্মই ইন্দ্রিয় সংযমের প্রকৃত স্থল। সংসার অশ্রমে নিরন্তর ইন্দ্রিয় চরিতার্থকর প্রলোভন সকল সম্মুখীন রহিয়াছে তাহাদের সহিত দিবারাত্রি সংসারীর সংগ্রাম চলিতেছে, সংসারী সেই সংগ্রামে কখন বা জয়ী কখন বা বিজিত হইতেছেন, এইরূপ বিকারের হেতু সকলের সম্মুখে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিয়াছে সে-ই ইন্দ্রিয়সংযমী।

"বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ॥"
(কালিদাস)

পৌরাণিক ঋষি বিশ্বামিত্র ও পরাশর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু লক্ষ্মণ ও ভীষ্ম পারিয়াছিলেন। অত্রস্থলে উল্লেখযোগ্য একটি বচন আছে তাহার ভাবার্থ এই যে,—

"বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ বায়ু, জল ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণে দেহ রক্ষা করিয়াও যে ভীষণ ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই, আমরা প্রত্যহ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা প্রভৃতি আহার পূর্ব্বক যদি সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারি, তবে পঙ্গুও সাগর পার হইতে পারে।"

কিন্তু মানসিক বলশালী কর্ম্মবীরের পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম অতীব তুচ্ছ কথা। পরন্তু চিত্তশুদ্ধি সমধিক গুরুতর ব্যাপার। এমন অনেক সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের চিত্ত এখনো নানা কারণে অশুদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখলালসা অনেকটা সংযত করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিয়ত কেবল আমি কিসে ভাল রহিব, আমার লোকজন সকল বিষয়ে ভাল থাকিবে, কিসে ধন বৃদ্ধি হইবে, কিসে মান মর্য্যাদা বাড়িবে, কেমন করিয়া যশঃ সম্পদ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে, কিসে আমি সকলের অপেক্ষা বড় মানুষ বলিয়া গণ্য হইব, আর

আর সকলে আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ছোট থাকিবে এইরূপ চিন্তায় অহরহঃ ব্যস্ত থাকেন, এবং সেই সকল কার্য্যের জন্য অকরণীয় কোন কার্য্যই বোধ করেন না; যাহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ তাহাদের অপেক্ষাও এই সকল লোক নিতান্ত নিকৃষ্ট। এই শ্রেণীর লোকের নিকট ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি কিছুই কিছু নহে। ইঁহারা কেবল আত্ম সুসার লইয়াই ব্যস্ত। পরের দিকে এই শ্রেণীর লোকের দৃকপাত মাত্র নাই।

যখন পরকে ঠিক আপন ভাবিতে শিখিব, যখন আপনার দুঃখ ভুলিয়া পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখিব আপনার দেহ প্রাণ অপেক্ষাও যখন পরকে ভাল বাসিতে শিখিব, ক্রমে যখন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে সর্ব্বময় জ্ঞান করিতে পারিব, যখন আমার আত্মা বিশ্বব্যাপীরূপে অপর সর্ব্বজীব সাধারণের দেহে প্রতিফলিত হইবে তখনি বুঝিব যে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবানচন্দ্র মহাপ্রভু অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক লোক শিক্ষার আদর্শ সাজিয়া কেমন ভাবে পরকে আপন ভাবিতে হয়, আত্মদুঃখ ভুলিয়া গিয়া কেমন করিয়া পরকে উদ্ধার করিতে হয় তাহা জগাইমাধাইএর প্রহৃত রক্তাক্ত কলেবরে তাহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হরিনাম বিতরণ করিয়া প্রকৃত চিত্তশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভৃগুপদাঘাতেও ভৃগুমুনির পদে কষ্ট হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়া বিশুদ্ধচিত্তের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বর্ণসিংহাসনে রত্নরাশি বিভূষিত হইয়াও যে রাজা ভিখারী প্রজাগণের দুঃখে আপনার হৃদয়কে দুঃখিত করিতে পারে, প্রজা বা অতি দীনহীন ব্যক্তির দুঃখে যে মহারাজার হৃদয় নিয়ত ব্যথিত হয়; যে ধনবান আপনার ধনরাশিকে কেবল পরের দুঃখ মোচনের সামগ্রী বলিয়া মনে করিবে ও পরোপকারেই ব্যয় করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে।

প্রাগুক্ত লক্ষণ সকল অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধির অতি গুরুতর লক্ষণ এই যে,—যিনি শুদ্ধির মূল, যিনি শুদ্ধসত্ত্বময় যাঁহার করুণা এবং অনুকম্পা ব্যতিত শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করা আমার দয়াল বিশ্বময়ের প্রাণ যেমন সর্ব্বজীবে সমদর্শী, সর্ব্বজীবে বিশেযতঃ দীনহীনের প্রতি বিশেষ করুণা বলিয়াই দীনবন্ধু নাম। সেইরূপ দীনবন্ধু হইতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। ধনী বন্ধু হইলে তৈল মাথায় তৈল অর্পণে চিত্ত শুদ্ধি হয় না পরকে ভালবাস, বিশেষতঃ দীন হীনের প্রতি দয়ালু হও। পরের উপকারই জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান কর। মনে প্রাণে এই অভ্যাস করিতে পারিলেই চিত্ত শুদ্ধি হইবে।

"নামে রুচি জীবে দয়া" আর হৃদয়ে শান্তি ইহাই চিত্তশুদ্ধির ফল। সুতরাং ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের সার কথা। শ্রীমদ্ভাগবৎ তৃতীয় স্কন্ধে ভক্তি প্রীতিশান্তি লক্ষণাক্রান্ত চিত্তশুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন যথা,—

"লক্ষণং ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্যহ্যুদাহৃতম্,
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥১০॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুতঃ
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥১১॥

অর্থাৎ—মা! নির্গুণ ভক্তিযোগ কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমার গুণ

শ্রবণ মাত্র অন্তর্যামী যে আমি আমারে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান রহিত এবং ভেদ দর্শন বিবর্জ্জিতা মনের গতি রূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ ॥ ১০ ॥

যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস) সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (সমীপবর্ত্তীতা) সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতিরেকেকিছুই গ্রহণ করিতে চাহে না ॥ ১১ ॥

"মদ্ধিষ্ণ্য দর্শন স্পর্শ পূজা স্তুত্যা ভি বন্ধনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বে না সঙ্গমে ন চ কম্পয়া,
মহতাং বহু মানেন দীনানামনুকম্পয়া,
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে,
আর্জ্জবেণার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥" ১৪॥

অর্থাৎ—আমার প্রতিমাদি দর্শন, পূজন, স্তব করণ, বন্ধন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তা করণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মান করণ, দীনজনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা, যম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয়ের দমন, আধ্যাত্মিকবিষয় শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন; সরলতাচরণ, সতের সঙ্গ করন, এবং নিরহঙ্কারিতা প্রদর্শন। ১৪ ॥

"মদ্ধর্ম্মণো গুণেরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥১৫॥

অর্থাৎ ঐ সকল গুণ দ্বারা ভগদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণ মাত্র বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫ ॥

হিন্দুধর্ম্মের বহু গ্রন্থ হইতে চিত্ত শুদ্ধি সম্বন্ধে এমন যথেষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। প্রবন্ধ বাহুল্যে তাহা প্রয়োজন বোধ করিলাম না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত যে কোন সাধন ভজনই হয় না এই কথা বুঝাইবার জন্যই গুলি কথা আলোচনা করিতে বাধ্য এত হইলাম।

তাই এক্ষণে সবিনয়ে মনকে বলি মন! আর কেন? চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুর্ব্বিধ রসাস্বাদন এবং মহামায়ার মোহে মোহিত থাকিয়া ষড়রিপুর সুখ সম্পাদন ও তজ্জনিত দুঃসহ আধিব্যাধি শোক, তাপ, প্রভৃতি ভোগ ত যথেষ্টই করিয়াছ। এখন একটি বার মিনতি রাখ, শান্ত হও, বিশুদ্ধ হও। এতদিন যেমন অহরহঃ শয়নে স্বপনে কেবল বিষয় চিন্তা লইয়াই কাটাইয়াছ, এখন একবার দিন কতক সেইরূপ ভগবানের চিন্তা লইয়া দিন কাটাইয়া দেখ ত পূর্ব্বের দিন অপেক্ষা এ দিন সুখের হয় কি না? তাই বলি, তোমার সর্ব্বাঙ্গের পাপ কালিমাগুলি দূর করিয়া ফেল।

গীত।

মনে মাখা রাখিও না কালী।
সিঞ্চিয়া ভকতিজল　　ধুয়ে মুছে সুবিমল
ক'রে ভজ সেই কৃষ্ণ-কালী।

হৃদয়ে রহিলে মলা　　নিয়তি উদিবে ছলা
করে আসিবে না করতালী;
রসনার নাম গান　　সকলি হইবে ভাণ,
নাম, শ্রবণে লাগিবে কানে-তালী।

বিমল হইবে যদি সরল করিয়া মতি
শ্রীমতী রাধার হ'য়ে আলী, (ওরে মন)
রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, কাম, তোমার তুমিত্ব নাম
সব শ্যাম পদে দাও ডালী।
পরমায়ু হয়ে ক্ষীণ ফুরাইয়ে এল দিন
ক'দিন আর ধন-জন-শালী ?
(র'বে তুমি)
মূঢ়নলিনীর মন সে কমলিনী-রমণ
চরণে পরাণ দাও ঢালি।

বলি মন! তোমার হৃদয়ে, কি ক্ষণকালের জন্যও একবার উদয় হয় না যে, তুমি কে? কোথা হইতে কেমন করিয়া কোন পথ দিয়া এই খানে আগমন করিলে? এবং আবার কেমন করিয়াই বা দৈনিক পরিবর্ত্তনে, শৈশব, বাল্য, কৌশোর, যৌবন, এবং প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া শেষে কোথায়ই বা যাইবে? এবং সেই অন্ধকার ভবিষ্যৎ তোমার ভাগ্যে কি বিধান করিয়াছেন? একটিবার স্থির হইয়া সেই চিন্তাটা কর তাহা হইলেই দেখিবে এবং স্পষ্টই বুঝিবে যে তোমার এই দুর্লভ মানবজীবন লাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তুমি সর্ব্ব জীব হইতে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়াছ, অন্যান্য পশ্বাদি হইতে তোমার প্রভেদ কি, এই সকল সদ্বিষয় কি তোমার চিন্তনীয় নয়?

এবিষয় শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্॥
ধর্ম্মৈব তেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনাদির প্রবৃত্তি যেমন পশুতেও আছে তেমনি মানবেও আছে, কিন্তু কেবল ধর্ম্মজ্ঞান মানব ব্যতীত পশ্বাদিতে নাই। সুতরাং ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বারাই মানব পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। আবার ধর্ম্ম জ্ঞান বিহীন মানব পশুর সমান হইয়া থাকেন।

অতএব মন রে! তোর সাধন ভজনাদির দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার সময় আর নাই। সে সময়টুকু বাল্যে খেলা করিয়া এবং যৌবনে কামিনি-কাঞ্চন লইয়া আর প্রৌঢ়ে নানা ব্যাধি ভোগ করিয়া ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন বৃদ্ধকাল সমাগত এখন অন্যান্য সর্ব্ব দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে কেবল "সর্ব্ব দেবময় হরির" পাদপদ্মে মনঃপ্রাণ অর্পণ কর। তাহা হইলে এখনো তোমার মানব জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন হইবে। সেইরূপ চিন্তাকে কায়মনোবাক্যে করিতে হইবে। কলুষিত মানব-মনে বিশেষ কোন ভাবী বিপদাশঙ্কার উৎপত্তি না হইলে ভগবানে মতি আসে না। এই উদ্দেশ্যেই স্বয়ং ভগবান ছদ্মবেশে রত্নাকর দস্যুকে মরার কথা স্মরণ করাইয়া "মরা মরা" জপ করিতে আদেশ দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন যদিও "মরা মরা" জপে রাম নাম উচ্চারিত হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত অনেকে করেন বটে কিন্তু একটুকুও তলাইয়া বুঝিয়া দেখিলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হইলে যে কাতর প্রাণে ভগবানের স্মরণ লওয়ার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই আইসে তাহা স্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস যে, রত্নাকরও বহুকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া পরে যখন মৃত্যুর কথা মনে করিয়াছিল তখনি তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল এবং কায়মন-বাক্যে ভগবানের পদে মতি গিয়াছিল। তাই

মনকে বলি মন! তোমার শেষের সে দিন যে আগত প্রায় তাহার জন্য কি প্রস্তুত হইয়াছ, তাহার জন্য কি কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছ?

স্বরট মল্লার—তেতালা।

সে দিন যে এল মন, করেছ তার কি উপায়?
যবে তব দেহ বয়ে লবে জাতি বেহারায়!
বহুকাল বাকি বলে রহিয়াছ চিন্তাহীন,
দেখ না যে দিনে দিনে ফুরাল তোমার দিন,
আজই এ বেলা ও বেলা, ভাঙ্গিতেও পারে খেলা
ধরেছ কি কোন ভেলা যাহে পারে যাওয়া যায়?
তোমার জীবন ভ'রে দেখিল কত এমন
দেখিতে দেখিতে হায়! হঠাৎ গেল জীবন,
আগে তারাও ভাবে নাই এত নিকটে মরণ
তাইতে প্রস্তুত তা'রা ছিল না কেহ কখন,
তুমিও সেইরূপ মন! রহিয়াছ অচেতন
কুঠার দিতেছ ধন-জন-মোহে স্বীয় পায়।

বধ্যভূমিতে যথা পশু যবে নীত হয়
বধের কারণে অসি উত্তোলিত যে সময়
এখনি জীবন যাবে বুঝেনা সে কিছু তার
কাম ও লোভের চিহ্ন প্রকাশে সে বারম্বার
কর্ম্ম সূত্রে বেষ্টিত বধ্য ভূমিতে নীত।
তুমিও সেরূপ হায়! মোহিত মোহ মায়ায়।
এ সকল দেখ, শুন, বুঝ তুমি কত বার
তবু অচেতন রও হায়! একি চমৎকার
পরকের যাবে তুমি দেখি সুবোধ উত্তম
আপদ বেলায় হও পশু অপেক্ষা অধম,
যেটুকু সময় আছে, কাঁদিলে হরির কাছে
এখনো পারের তরী পাইবে নলিন-পায়।

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

"বাজ্‌রে

হৃদি বাঁশী, বাজরে "মা মা" বলিয়ে,
ডাক্‌রে মায়েরে, আপনা ভুলিয়ে।
মোহিত জগত, যাঁহার প্রেমেতে,
প্রাণ ভরি ডাক তাঁরে এক চিতে।

ভক্তিময়ী যিনি অনন্ত রূপিণী,
কখন বা সিত, অসিত বরণী,
নিরাকারা শক্তি, শিব সিমন্তিনী,
গা-রে বাঁশী, সেই ভবেশ-ভাবিনী।

"কোথা তারা তারা পাপ তাপ হরা
কোথা মা আমার, স্নেহ প্রেম ভরা"
গাহি বার বার, কাঁপাইয়া ধরা
ভুলে যা এ 'বিশ্ব' হ'য়ে মাতোয়ারা।

বাঁশীরে! মাতিয়ে তাঁর গুণ গানে,
কর তাঁর পূজা, নিবেদি জীবনে।
কোথা "মা, মা" বলি, ভুলিয়া আপনে,
ডাক তাঁরে সুখে, জীবন মরণে॥

শ্রীরামনাথ রায় গুপ্ত।

গোবর্দ্ধন—মানস-গঙ্গা ।

"কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্দ্ধন ।
গোবর্দ্ধন বিনা নাহি শোভে বৃন্দাবন ॥
মথুরা মণ্ডলে সর্ব্বোত্তম বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবন মধ্যে সর্ব্বোত্তম গোবর্দ্ধন ॥
গোবর্দ্ধন দরশনে কৃষ্ণদরশন ।
গোবর্দ্ধন শৈল পূজা কৃষ্ণের পূজন ॥
গোবর্দ্ধন শৈল রূপে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।
ইহাতে কুতর্ক করে যেই অভাজন ॥"

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে এই সকল পদে শ্রীগোবর্দ্ধনের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই গোবর্দ্ধন-শৈলকে বিশেষ ভাবে পূজার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, তিনি শ্রীনন্দ মহারাজকে ইন্দ্র যজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন পূজা করিতে বলিতেছেন।

"তস্মাদবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥

যদি গবাদি বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ করাই শ্রেয় বোধ হয়, তবে ইন্দ্রযাগোদ্দেশে যে দ্রব্যসম্ভার আয়োজন হইয়াছে তদ্দ্বারা এই গোবর্দ্ধন-শৈলের উদ্দেশে যজ্ঞ কর। গো-ব্রাহ্মণ ও এই শৈলই আমাদের পূজ্য। বৃষ্টি জন্য ইন্দ্রের পূজার কোনও প্রয়োজন নাই; কারণ—

"রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুনি সর্ব্বতঃ ।
প্রজাস্তৈরেব সিদ্ধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥"

শ্রীভগবানের রজোগুণ প্রভাবে মেঘগণ আপনি সর্ব্বত্র বৃষ্টি করিবে। মহেন্দ্র কি করিবেন।"

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবাক্যই বেদবাক্য। আজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গোপগণ কর্ম্মত্যাগী হইলেন। ব্রজে ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত হইল। আহৃত দ্রব্যসমুদায় গো-ব্রাহ্মণ ও গোবর্দ্ধন পূজায় প্রযুক্ত হইল। এ যজ্ঞ নিষ্ফল হইল না। কেবল দেবোদ্দেশে বস্তুর উৎসর্গমাত্র হইল না।

"কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভনং গতঃ ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্‌বৃহদ্বপুঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদন জন্য আর এক বৃহৎকায় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমিই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এই কথা বলিয়া, অধিকাংশ উৎসর্গীকৃত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান যখন নিজ মুখেই অঙ্গীকার করিয়াছেন "আমিই গোবর্দ্ধন-গিরি" তখন এই শ্রীগোবর্দ্ধনের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের এবং ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিবার ফল অবশ্যই হইবে।

এই গিরিবর শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বহুলীলা করিয়াছিলেন। এই গোবর্দ্ধনগিরি মথুরা হইতে সাড়ে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীশ্রীহরি দেবের প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির আছে। প্রক্রমণ-প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন ও তথায় স্নানাদি কার্য্য সমাপনান্তে পথিমধ্যে কতিপয় তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক প্রায় দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে এই গিরিতে উপনীত হইতে হয়। প্রথমে মানস গঙ্গাতে স্নান পূর্ব্বক এই গিরি দর্শন করিতে হয়। ইহাঁর অপর নাম শ্রীগোপাল মুকুট। ইহাকে প্রদক্ষিণ করিলেই সেই শ্রীবৃন্দাবনবিহারীকে প্রদক্ষিণ করা হয়। এখানে শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব আছেন এবং ঋণমোচন, পাপমোচন, গোরোচন, ধর্ম্মরোচন, উদ্ধবকুণ্ড, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড আছেন

এ সকল স্থানেই স্নানাদি এবং শ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করা কর্ত্তব্য।

মানসগঙ্গা এই শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে উৎপন্না এবং সপ্তনদীর অন্যতমা। শ্রীভক্তমাল বলিতেছেন—

"কৃষ্ণগঙ্গা, পাতাল-জাহ্নবী, সরস্বতী।
মানসগঙ্গা, অলকানন্দা, যমুনা গোমতী॥
মানস-গঙ্গা যে গোবর্দ্ধন শৃঙ্গ নদী।
যমুনার সহ মিলি বহে নিরবধি॥
অতুল মহিমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া অতি।
নৌকা-খণ্ড-লীলা কৈলা লইয়া যুবতী॥"

একদা শ্রীরাধিকা দধি পসরা লইয়া সঙ্গিনিগণ সঙ্গে এই মানসগঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন নদীতে সেই রসিক-শেখর বই অন্য কাণ্ডারী নাই। শ্রীরাধিকা সঙ্গিনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মানস-সুরধুনী দুকুল পাথার।
কৈছনে সহচরি হোয়ব পার॥
প্রাবৃট্ সময় গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পওয়ন বহই অতি জোর॥"

সেই সময়ে অদূরে শ্যামসুন্দর কর্ণধার হইয়া একখানি তরণী লইয়া এদিকে ওদিকে বাহিতেছিলেন। তিনি রমণীগণকে পরপারে গমনেচ্ছু দর্শন করিয়া বলিলেন—

"চড় সবে পার উতারব হম।"

শ্রীরাধা সঙ্গিনিগণের সঙ্গে সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। আর এদিকে—

"মানস গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নাই কেউ।

এ মানস গঙ্গার ঢেউ যখন তোমার পানে ধায়, তখন কি আর কুল থাকে না কুল-লাজ থাকে?—তখন সংসার-আকাশ নিবিড় জলদ-জালে আচ্ছন্ন হয়—গুরুজন গঞ্জনাদি প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে দিগন্ত কম্পিত হইতে থাকে, তখন ও চরণতরি বই আর গতি কি?—পারে ত যাইতেই হইবে—এ কুল ত্যজিয়া ত ও কুলে যাইতেই হইবে—নহিলে উপায় কি, নাথ?—তখন হৃদয় কাঁপে—কিন্তু সেই "অকূলের কাণ্ডারীকে ধরিয়া কে কবে ডোবে?"

তখন মনে হয়—

"নব লহু লহু হাসি' মরমে মরমে পশি'
নায়ে চড়াইল ওই।
তৈখনে মঝু মন ভেলহি আনছন
বেকত ধরল ফল সোই॥
এ সখি, হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
ইহ নাবিক অতি চঞ্চল চপলমতি
অব যেও তেও পরবোধ॥ ধ্রু॥
গগন হি সঘন বিজুরী ঘন ঝলকই
দিনহি ভেল আন্ধিয়ারা।
খরতর পওয়নে তরণী ঘন ঘুরত
পৈঠত জল অনিবারা॥
দুরজন জানি পড়ল জীউ সঙ্কটে
ইথে জানি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব সব সখী জীয়ব
গোবিন্দদাস কহ সার॥"

মানস-গঙ্গার এই অপূর্ব্ব লীলা। আজ এ কূলে দাঁড়াইয়া একবার কার না সাধ হয়? কার না

"শ্যামং হিরণ্য-পরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্॥"

সেই অকূলের কাণ্ডারীকে দেখিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু শ্রীরাধার কৃপা বই সে সুদিন কবে কার ভাগ্যে ঘটিয়াছে?

অকিঞ্চন।

গৃহীর ধর্ম্ম।

(প্রথমাংশ)

আমরা আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে সনাতন ধর্ম্মে গৃহীর পক্ষে ধর্ম্ম-কর্ম্মের সম্ভাবনা ছিল না, সে সম্ভাবনা প্রথম ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ভারতবাসীকে শিখাইয়াছে যে ধর্ম্মের জন্য বনে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্মার্জ্জন সম্ভব। এ কথা ব্রাহ্ম প্রচারকের বক্তৃতায়, ব্রাহ্ম লেখকগণের লেখায় অহরহঃ কথিত হইয়া থাকে। আমরা অসভ্য হিন্দু এ কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া থাকি, অনেকে হয় তো শুধু এই কথার মোহে পুরাতন হিন্দু-ধর্ম্মকে একটু বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে থাকেন। কিন্তু তাহা যাঁহারা পারেন না তাঁহারা মনে মনে আলোচনা করিতে থাকেন যে সত্যই কি হিন্দুধর্ম্মে গৃহস্থের কোনও উপায় নাই? হিন্দু গৃহস্থ কি কখনও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবার অধিকারী ছিলেন না? এই কথাটার সত্যাসত্যতা অদ্য আমাদের আলোচনীয় বিষয়।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে উপরি লিখিত মতটা আমার স্বকপোল কল্পিত মত নহে, অথবা একটা মত গড়িয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। আমরা এ মত প্রকাশ করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এবং সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের লেখায় প্রকটিত হইতে দেখিয়াছি। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিতে বিরত থাকিলাম।

ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে আর্য্যেতর ধর্ম্মে সন্ন্যাসের যেরূপ অসম্ভাবনা, সনাতন ধর্ম্মে সেরূপ নহে। এই সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী ধর্ম্মে যাহার যাহাতে তৃপ্তি তাহার জন্য সেইরূপই ব্যবস্থা করা আছে; কাহাকেও ইহা বলে না যে তোমাকে ধর্ম্মের এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। যাহার যে পথ ভাল লাগে সে সেই পথেই যাইতে পারে কারণ এ মহাধর্ম্ম জানে যে, যে পথেই চলুক যদি সেই এক গন্তব্য স্থানের প্রতি লক্ষ্য থাকে তো সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইবে। ফলে প্রবৃত্তি সকলের সমান নহে, কাহারও এক উপায়ে, কাহারও বা অন্য উপায়ে ঈশ্বর-চিন্তা ভাল লাগে, এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে অধিকার অনুসারে ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম্মে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই জন্য পথ খোলা আছে, আশ্বাসের কথা আছে; এ ধর্ম্ম কখনও কাহাকেও বলে না যে খবরদার গৈরিক বসন ধারণ করিও না, সন্ন্যাসী হইও না অথবা এমনও কাহাকেও বলে না যে সাবধান গৃহস্থ হইও না তাহা হইলেই তোমার পতন হইবেই হইবে। আবার ইহার অনুশাসন এমনও নয় যে তোমাকে গৃহস্থ হইতেই হইবে, নচেৎ তোমার উদ্ধার নাই, যদি কেহ ইচ্ছা করে, তো, সে চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারে। তবে সনাতন ধর্ম্ম কোনও পথেরই বিপৎ ও বিঘ্নের প্রতি দৃষ্টিহীন হন নাই; এবং সকল পথের

পথিককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, ও তাহাদের আত্মপরিচালনার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সনাতনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ঋষিগণ সূক্ষ্মদর্শী ও পরহিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁহারা কোনও মত স্থাপনের প্রয়াসী অথবা হুজুগ-প্রিয় ছিলেন না। তাই তাঁহারা গৃহীকেও উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্মচারীকেও উপদেশ দিয়াছেন ও সন্ন্যাসীকেও উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ধর্ম্ম জিনিসটা একটা সখের বা খেলার জিনিস ছিল না, এবং তাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষণ করিতেও ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা নিয়ম ভালবাসিতেন, শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন, মনুষ্য হৃদয় ও মনুষ্যের ক্ষমতা ও অধিকার বুঝিতেন এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের ও সংযমের ধর্ম্ম, জগতের অন্য সকল ধর্ম্ম এখন ত্যাগ ও সংযম পরিত্যাগ করিয়া ভোগকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এখন ত্যাগমূলক খ্রীষ্টান-ধর্ম্মও আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ ভুলিয়া গিয়াছে, এখন এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা অর্থ ও ভোগকে ক্রীষ্ট প্রচারিত ত্যাগ ও সংযমের স্থানে বসাইয়া ইহাদেরই পূজা করিতেছে। অতএব ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে যে এই বিকৃত ক্রীষ্টিয়ানীর অনুকরণে যাঁহাদের চিত্ত-বৃত্তি পরিচালিত হয় তাঁহারা সন্ন্যাসের উপর খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রাপ্তি বিষয়ে সন্ন্যাস যে একটা বিশেষ পন্থা তাহা অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র। তবে ইহা যে ঈশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র পথ তাহা হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও নাই, এবং এই কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক তাঁহারা যে হিন্দুধর্ম্মের বিষয় কিছুই অবগত নহেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভগবান্ নিজে শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্ম-সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥"

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ দুইই শুভদায়ক, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ।

অথচ ব্রাহ্মগণ স্বচ্ছন্দে বলিয়া থাকেন যে ঘরে বসিয়া যে ধর্ম্ম হয় তাহা তাঁহারাই প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছেন। অদ্ভুত তথ্য!

আসল কথা এই যে বিলাতী ভোগ পিপাসায় যাঁহারা আত্মাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা ভোগের সঙ্কোচ একেবারে সহ্য করিতে পারেন না। তাই হিন্দু-ধর্ম্মের ভোগ বাসনা হ্রাস করিবার কথাকে তাঁহারা সন্ন্যাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে আত্মবিলোপ, তাঁহারা চাহেন আত্ম-সম্প্রসারণ, হিন্দুধর্ম্ম বলেন "আমি' মলেই বাঁচা যায়" তাঁহাদের কাছে আমিত্বের বহুমান। ধর্ম্মের সারবস্তু যে সংযম ও ত্যাগ—তাহা এখন জগৎ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে তাই ভোগের সহিত বিসম্বাদ না করিয়া যে ধর্ম্ম চলিতে পারে আজকাল সেই ধর্ম্মেরই আদর। আবার ধর্ম্মের জন্য কোনও রূপ কষ্ট করা তো হইতেই পারে না, চলিতেই পারে না। সেই জন্যই এখানকার লোকের কাছে সন্ন্যাস ব্যাপারটা নিতান্ত ভয়াবহ। কিন্তু ইঁহাদের কাছে ভয়াবহ হইলেও ইহা অস্বীকৃত হইবার উপায় নাই যে সংসারের প্রবল মোহেরও নানাবিধ চিত্তবিক্ষেপকর চিন্তা ও ঘটনার

মধ্যে পড়িয়া অধিকাংশ লোকেই ঈশ্বর চিন্তা করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় না। তাই আর্য্যঋষিগণ পুরাকালে মনুষ্য জীবনকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, এ চারি বিভাগ মনুষ্যের চারিটি অবস্থার অনুরূপ। প্রথম বয়সে শিক্ষা, দ্বিতীয় অবস্থায় ভোগ ও পুণ্য-সঞ্চয়, তৃতীয় অবস্থায় সংসার ত্যাগ, চতুর্থ অবস্থায় সন্ন্যাস। একবার ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম-গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই উপ-লব্ধি হইবে, যে আর্য্য ঋষিগণ জীবনকে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ জানিতেন ও সেইরূপ বোধের উপরই মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় শুধু শিক্ষা নহে, যম নিয়মাদি অভ্যাস করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশোপযোগিনী অবস্থা লাভ করিতে হইত, আর্য্যঋষিগণ জানিতেন মনুষ্যের ভোগাভিলাষ আছেই, এই জন্য তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমেও ভোগকেই প্রধান স্থান দান করেন নাই ; এ আশ্রমেও ভোগ খর্ব্ব করিবার উপদেশই দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমীর যে সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছিলেন তাহা হইতেই জানা যায় যে এ আশ্রমেও ত্যাগ ও সংযম এই দ্বয়ের প্রাধান্যই তাঁহারা স্থাপিত করিতে চাহিয়া-ছেন। হিন্দু শাস্ত্র ত্যাগ ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু ধর্ম্মও তাহাই। গৃহস্থ হই-লেই যে আজকালকার মত অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে হইবে তাহা নহে, তখনকার গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ, দম ও শম অভ্যাস অবশ্যকরণীয় ছিল ও তাহাকে যম নিয়মও অভ্যাস করিতে হইত। ইহা দ্বারাই মনুষ্যের নিজের উপর প্রভুত্ব ও ঈশ্বর চিন্তার উপযোগিতা আসিত।

তাহার পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া জীবনের তৃতীয় ভাগ কাটাইতে হইত। বান-প্রস্থ ঠিক সন্ন্যাস নহে, কারণ তখনও স্ত্রী সঙ্গে থাকিতে পারিত, কিন্তু এ অবস্থায় সংসারের চিন্তা না করাই বিধি ছিল। তখন কেবল ঈশ্বর চিন্তা, এবং সেই চিন্তা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হইলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা বিধি ছিল। সংসারাসক্তি নির্ব্বাণ করাই এই সকল আশ্র-মের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেমন আমরা গলিতাঙ্গ পলিতকেশ হইয়াও সংসার কামড়াইয়া পড়িয়া থাকি তখন মানুষের প্রবৃত্তি সেরূপ ছিল না। তখনকার লোকে নিজের ভোগকালের অবসান করিয়া পুত্র পৌত্রাদির হস্তে সংসারভার দিয়া ঈশ্বর চিন্তায় কাটাইতে ভালবাসিতেন। কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গার্হস্থ্য, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস, সকল আশ্র-মেই লোকে ব্রহ্ম-চিন্তার জন্য প্রস্তুত হইতেন এবং ইহাকেই জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন। তখনকার লোকে কখনও পরাধীন ভাবে থাকিতে ভাল বাসি-তেন না, তাই গৃহস্থ যখন দেখিতেন যে তাঁহার গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়াছে, ও কেশের পক্কতা জন্মিয়াছে ও পুত্রেরও পুত্র জন্মিয়াছে, তখন পুত্র ও পৌত্রের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সংসারে থাকা অপেক্ষা বনবাসে ঈশ্বর চিন্তা করা শ্রেয়স্কর ভাবিতেন। এ কার্য্য তখন রাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত অকা-তরে করিতে পারিতেন ; কিন্তু এখন পলিত

কেশ ও গলিতদন্ত বৃদ্ধও ভোগ লালসা ছাড়িতে পারেন না, ঐহিক সুখের আশায় লালায়িত হইয়া বেড়ান, নিজের মান অপমান ও সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাই আর আজকাল তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রম সম্ভবপর নহে। কলিকালে যে এইরূপ ঘটিবে তাহা ঋষিরা জানিতেন তাই কলিকালে তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রম নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন হিন্দুর দুই আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য।

তবে কি আর হিন্দুর উপায় নাই—তাহার কি ধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই? বহুদিন হইতেই বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ হইয়াছে, এতদিন কি হিন্দু গৃহস্থ তাহার ধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই বলিয়া হতাশ হইয়া অধর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়াছেন আজ নূতন করিয়া শিখিতেছেন যে ঘরে বসিয়াও ধর্ম্ম হইতে পারে? কথাটা নিতান্ত অসার। যদিও পূর্ব্বে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল, তথাপি গার্হস্থ্যাশ্রমের মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ম্মই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য এবং সেই কর্ম্ম গার্হস্থ্যাশ্রমেই সম্ভব। হিন্দু ধর্ম্মে সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট অতএব গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্ম্মের পক্ষে সুবিধাজনক বৈ অনিষ্টজনক বলিয়া কখনই বিবেচিত হইত না। বরং চারিটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রম যে শ্রেষ্ঠতম তাহা মনু স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

"যস্মাৎ ত্রয়শ্চাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥
৩য়—৭৮।

যে হেতু অপর তিন আশ্রমীগণ গৃহস্থ কর্ত্তৃক জ্ঞান ও অন্নদ্বারা পরিপালিত হন সেই জন্য গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম এবং তিনি ইহকালে সুখেচ্ছু ও পরকালে স্বর্গপ্রার্থী মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম পালন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্র কহিয়াছেন যে শৌচ মঙ্গলাদি গুণ বিভূষিত গৃহস্থও সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন।

"যশ্চৈতৈর্লক্ষণৈর্যুক্তো গৃহস্থোঽপি ভবেদ্ দ্বিজঃ।
স গচ্ছতি পরং স্থানং জায়তে নেহ বৈ পুনঃ॥
অত্রি সংহিতা—৪২।

এই সকল লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি, গৃহস্থ হইলেও পরম স্থান প্রাপ্ত হন এবং তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।

বিষ্ণু সংহিতায় কথিত হইয়াছে—
"গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপতে তপঃ।
দদাতি চ গৃহস্থস্তু তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥
ঋষয়ঃ পিতরো দেবাভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশালাভ কুটুম্বিভ্যোস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥"
৫৯ অধ্যায় ২৮।২৯।

গৃহস্থই যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই তপস্যা করেন ও দান করেন এই জন্য গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ পিতৃগণ প্রাণিগণ ও অতিথিরা কুটুম্বিগণদ্বারা আশ্বাসিত হন, এইজন্য গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

পুনশ্চ—
গৃহী গৃহস্থস্য সদা হি ধর্ম্মং
কুর্ব্বন্ প্রযত্নাদ্ধরিমেতি যুক্তম্॥
হারীত সংহিতা ৪র্থ ৭৭ শেষাংশ।

গৃহী যত্ন পূর্ব্বক গৃহস্থের সদাচার ধর্ম্ম পালন করিলে নিশ্চয় হরিকে প্রাপ্ত হন।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতৃগণ যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষি উশনাঃ গৃহস্থদিগের জন্য ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন—

"যঃ স্বধর্ম্মপরো নিত্যমীশ্বরার্পিতমানসঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যদুক্তং বেদসম্মিতম্॥"
৭।২৩।

যিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বদা ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত, তিনি বেদ সম্মিত পরমপদ প্রাপ্ত হন। অতএব গৃহস্থও পরমপদ পাইবার অধিকারী তাহা শাস্ত্রেরও মত।

ব্যাস সংহিতাতে, লিখিত আছে—
"গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ
সর্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ॥"৪।২

আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি গৃহাশ্রম অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই, যিনি বিধিমত গৃহস্থাশ্রম পালন করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থফল পান।

"ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহএব বসেন্নরঃ।
তএতস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেদারং সন্নিহিত্য তথৈব চ।
এতানি সর্ব্ব তীর্থানি কৃত্বা পাপৈ প্রমুচ্যতে॥"
৪।১৩।১৪।

ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মনুষ্য গৃহেই বাস করিবেন, তাহা হইলে সেইখানেই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গাদ্বার, কেদার এই তীর্থ সকল উপস্থিত হইবেন ও তিনি এই সকল তীর্থের ফল লাভ করিবেন।

শঙ্খসংহিতার মত—
"গৃহস্থএব যজতে গৃহস্থাস্তপ্যতে তপঃ।
দাতা চৈব গৃহস্থঃ স্যাস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥"৫।৬

গৃহস্থ যজ্ঞ করেন, তপ করেন ও দান করেন, অতএব গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ।

দক্ষসংহিতা বলেন—
"পিতৃদেবমনুষ্যানাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
দেবৈশ্চৈব মনুষ্যৈশ্চ তির্য্যগ্ভিশ্চোপজীব্যতে॥"
৪২।

"গৃহস্থঃপ্রত্যহং যস্মাত্তস্ম জ্যেষ্ঠাশ্রমীগৃহী।
ত্রয়াণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থো যোনিরুচ্যতে॥"৪৩॥
২য় অধ্যায়।

গৃহস্থ প্রত্যহ পিতৃদেবতা অতিথি ও কীটাদিরও তৃপ্তি বিধান করে ও দেবতা পিতৃগণ ও অতিথি-মনুষ্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণের উপজীব্য হয়, এই জন্য গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এবং এই আশ্রমই অপর তিন আশ্রমের সৃষ্টি করে।

বশিষ্ঠও বলিয়াছেন :—
গৃহস্থএব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ
চতুর্ণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থস্তু বিশেষ্যতে॥
যথা নদী নদাঃ সর্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিম্।
এবমাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥"
৮ম অধ্যায়ঃ।

গৃহস্থ যজ্ঞ করেন, তপ করেন ও দান করেন এই জন্য গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ; যেমন নদী সকল সমুদ্রে পড়িয়া স্থির হয় সেইরূপ আর তিন আশ্রম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করে।

গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা যে শুধু স্মৃতিশাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে তাহা নহে, মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ গ্রন্থেও গৃহস্থাশ্রমের বিস্তর প্রশংসা রহিয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে গার্হস্থ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা যে শুধু ধর্ম্মশাস্ত্রেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহা নহে, লোকও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূণ্যজনক মনে করিতেন। মহাভারতাদির ঐতিহাসিকতা এখন স্বীকৃত হইতেছে, অন্ততঃ এটুকু সর্ব্ববাদীসম্মত যে মহাভারতে সে সময়কার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি যথাযথভাবে প্রতিচালিত দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি দেবব্রত ভীষ্ম চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াও

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তিনিই শিক্ষার্থী যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন :—

"ভরণং পুত্রদারাণাং বেদানাং ধারণং তথা।
বসতাগাশ্রমং শ্রেষ্ঠং বদন্তিপরমন্তপঃ ॥
এবং হিযো ব্রাহ্মণো যজ্ঞশীলো।
গার্হস্থ্যমধ্যবসাতে যথাবৎ।
গৃহস্থবৃত্তিং প্রতিশোধ্য সম্যক্
স্বর্গে বিশুদ্ধং ফলমাপ্নতে সঃ ॥"

শান্তি, ৬১।১৫।১৬।

স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ ও বেদগণের ধারণ জন্য গৃহস্থদের আশ্রমকেই মহর্ষিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এইরূপে যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞশীল হইয়া যথাবিহিত গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করেন তিনি গৃহস্থ বৃত্তিমূলক ঋণ পরিশোধ করিয়া স্বর্গে তাহার বিশুদ্ধ ফললাভ করেন।

ভরদ্বাজপ্রশ্নে ভৃগু কহিয়াছেন—

"ত্রিবর্গ গুণনিবৃত্তির্যস্য নিত্যং গৃহাশ্রমে।
স সুখান্যনুভূয়েৎস শিষ্টানাং গতি মাপ্নুয়াৎ ॥
উঞ্ছবৃত্তি গৃহস্থো যঃ স্বধর্ম্মাচরণে রতঃ।
ত্যক্তকাম সুখারম্ভঃ স্বর্গস্তস্য ন দুর্লভঃ ॥"

যাহার গৃহাশ্রমে বাস করিয়াও কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিন রিপুর নিবৃত্তি হইয়াছে তিনি ইহকালে সুখ ভোগ করিয়া পরকালে সাধুদিগের গতি প্রাপ্ত হন।

সকল আশ্রমেই যে মুক্তিলাভ হইতে পারে ইহাই শাস্ত্রের মত। সন্ন্যাসীরা যাহা জ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা লাভ করেন, গৃহস্থেরা তাহাই কর্ম্মদ্বারা লাভ করিতে পারেন। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের কপিল ও স্যূর্য্যরশ্মির কথোপকথনে ইহারও প্রমাণ রহিয়াছে। মহর্ষি কপিল কহিয়াছেন :—"কর্ম্মদ্বারা চিত্ত দোষের পরিপাক এবং শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ। মনুষ্য ঐ সকল গুণ দ্বারাই পরমব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে।"

বলাবাহুল্য যে পুরাণ সকলেও গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রশংসা আছে। বহুবিস্তৃতি ভয়ে সকলগুলি উদ্ধৃত করিলাম না, দুই একটি সুপ্রসিদ্ধ পুরাণের মত সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে ৯ম অধ্যায়ে চতুরাশ্রমধর্ম্মকীর্ত্তন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—"কি ভিক্ষুক কি পরিব্রাজক, কি ব্রহ্মচারী সকলেই গৃহস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকেন, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাস বলিয়াছেন—সন্ধ্যা স্নান ও ব্রহ্মযজ্ঞ-পরায়ণ অনশয়ী মৃদু ও দান্ত গৃহস্থ পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বিষয়, শক্তি, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধানানুসারে সাবিত্রী জপ ও শ্রাদ্ধ করেন তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন।

কূর্ম্মপুরাণ, ধর্ম্মাধ্যায়, ১৫।

যে ব্যক্তি গার্হস্থ্যধর্ম্মানুসারে অনাদিদেব অদ্বিতীয় মহেশ্বরকে নিরন্তর অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত ভূতযোনি প্রকৃতিকে অতিক্রম করে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

ঐ ২৬ অধ্যায়।

স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে গৃহস্থাশ্রম বর্ণন প্রসঙ্গও এই আশ্রমের প্রশংসা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু M.A., B.L.

সংবাদ।

ফুটপাথ। কলিকাতা সহরের রাস্তার ফুটপাথ দিয়াই চলিতে হইবে, মাঝ-রাস্তা দিয়া চলা চলিবে না, কলিকাতার পুলীশ কমিশনর এইরূপ এক বিধি করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছেন। ইহাতে নানারূপ আপত্তি উঠিয়াছে। এ সকল কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সে দিন মিউনিসিপাল সভায় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—"পুলীশ কমিশনর এ সম্বন্ধে আপত্তি শুনিবার জন্য যে সময় দিয়াছেন, সে সময় তাঁহাকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিবার কথা বলা হউক।" প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া পুলীশ কমিশনরের কর্ত্তব্য। এত বড় একটা ব্যাপারে ক্ষিপ্রকারিতা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভারতজাত দ্রব্য। ১৯০৯ সালে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিয়ম হইয়াছিল, ভারতীয় কলকারখানার যে সকল দ্রব্য কার্য্যোপযোগী অথচ মূল্য সুলভ, সে সকল সামগ্রী গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে লইবেন—বিলাত বা বিদেশ হইতে আনা হইবে না। ভারতজাত দ্রব্যে উৎসাহ দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য খুবই ভাল। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং এসোসিয়েশন বলিতেছেন, এ নিয়মে কার্য্যহইতেছে না; অধুনা গবর্ণমেণ্ট, রাজকর্ম্মচারিগণকে এ নিয়মে কার্য্য করিতে উৎসাহ করিতেছেন না। ভারত গবরমেণ্ট এদেশজাত শিল্প দ্রব্যের একটা তালিকা তৈয়ার করিয়াছেন বটে; মূল্যেরও একটা তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন; কিন্তু অধিকাংশ দ্রব্যই এক্ষণে বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে। আরও প্রকাশ—বিলাত হইতে ভারতে যে সব জিনিস আনিবার ফর্দ্দ তৈয়ার হইয়া থাকে, তাহা হইতে ভারতজাত দ্রব্য বাদ দিবার জন্য এক দল লোক নিযুক্ত আছেন। ১৯০৪-৫ সালে ষ্টোর কমিটি লিখিয়াছিলেন,—এই সালে ইউরোপ হইতে যে সকল দ্রব্য গবরমেণ্টের ব্যবহারের জন্য ভারতে আনীত হইয়াছিল, তাহার ভিতর প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য ভারতেই মিলিতে পারিত। আশা করি, এদেশীয় কল কারখানাজাত দ্রব্যের প্রতি অতঃপর ভারত গবরমেণ্টের সবিশেষ দৃষ্টিপাত হইবে; গবরমেণ্ট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া এ দেশী শিল্পের উন্নতিসাধনে পূর্ব্বরূপ প্রয়াসী হউন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। গবরমেণ্ট ত সেদিনও বলিয়াছেন,—টাটার বিস্তৃত লৌহ-কারখানার তৈয়ারি লৌহরেল আপাততঃ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গবরমেণ্ট খরিদ করিবেন এ রেল পছন্দসই এবং মূল্যে সুলভ হইলে ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণেই লইতে পারিবেন,—এ প্রতিশ্রুতি রক্ষায়ও গবরমেণ্ট তিলমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না,—ইহাই আমাদের ধারণা। এদেশী শিল্পের রক্ষায় প্রজা রক্ষা,—আর প্রজা রক্ষায় গবরমেণ্টের যশঃ প্রতিষ্ঠা, এবং রাজ্যেরও মঙ্গল,—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্দ্ধমান-কাটোয়া। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানি বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত রেল তৈয়ার করিবেন। পথ তেত্রিশ মাইল। উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে।

স্মৃতিসভা। গত সপ্তাহের বুধবার ভূতপূর্ব্ব "হিন্দু পেট্রিয়েট" সম্পাদক স্বনাম প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য কলিকাতায় টাউন হলে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এই সভায় কৃষ্ণদাসের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (বঙ্গবাসী)

"রাশেরর্দ্ধং ভবেদ্ধোরা তাশ্চতুর্বিংশতিঃ স্মৃতাঃ।
মেষাদি তাসাং হোরাণাং পরিবৃত্তিদ্বয়ং ভবেৎ ॥
রাশেস্ত্রিভাগা দ্রেক্কাণা স্তে চ ষট্‌ত্রিংশদীরিতাঃ।
পরিবৃত্তিস্ত্রয়ং তেষাং মেষাদেঃ ক্রমশো ভবেৎ ॥
রাশেঃ পাদঃ চতুর্থাংশঃ পরিবৃত্তিশ্চতুষ্টয়ং।
এবং দ্বাদশভাগেষু গ্রহভাবং বিলোকয়েৎ ॥

রাশি চক্র সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে রাশি কহে। প্রতি রাশির অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। সুতরাং ভ-চক্রে সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি হোরা আছে। প্রতি রাশিতে দুই দুই রাশি গণনা করিলে দ্বাদশ রাশির দুইবার পরিবৃত্তি ঘটে। মেষ রাশির প্রথমার্দ্ধ মেষ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ বৃষ। বৃষরাশির প্রথমার্দ্ধ মিথুন এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ কর্কট ইত্যাদি ক্রমে প্রতি রাশির হোরা নির্ণয় করিবে। যে রাশির যে গ্রহ অধিপতি হোরাদি তৎতৎ বর্গেরও সেই গ্রহ অধিপতি। বর্গ শব্দে রাশির বিভাগ মাত্র। কোন রাশি তিন ভাগ করিলে প্রতি ভাগকে দ্রেক্কাণ কহে। এবং প্রতি দ্রেক্কাণে এক এক রাশি কল্পনা করিলে, রাশি চক্রের তিনবার আবর্ত্তনে ষট্‌ত্রিংশৎ দ্রেক্কাণ পূর্ণ হয়। তদ্রূপ প্রতি রাশি চারি ভাগ করিলে চতুর্থাংশ বর্গে রাশি চক্রের চারিবার পরিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। কারিকাকার এইরূপে ক্ষেত্রাদি দ্বাদশ বর্গ কুণ্ডলীতে গ্রহ বিন্যাস করিয়া তাহা হইতে গ্রহবল বিচারের পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাই বিচারানুগত তাজক-শাস্ত্রোক্ত-দ্বাদশ বর্গী বল। স্ব-মিত্রাদি বর্গাধিক্যই এ স্থলে বলের পরিমাণ এবং এই দ্বাদশ-বর্গ-কুণ্ডলী হইতেই পারিজাতাদি দশ বর্গ সাধন সহজ সাধ্য।

এক্ষণে কোন্ রাশির হোরাদি বর্গ নিরূপণে, কোন্ রাশি হইতে তৎতৎ বর্গের গণনা আরম্ভ হইবে তাহা জানা আবশ্যক। ১। জন্মকালে রাশি চক্রস্থ গ্রহ বিন্যাসই ক্ষেত্র-কুণ্ডলী। ইহাকে জন্মকুণ্ডলী বা রাশিকুণ্ডলী কহে। ২। হোরা বা দল কুণ্ডলীতে রাশি সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া একোন করিলেই তদ্রাশির হোরারম্ভ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাশি সংখ্যা দ্বাদশাধিক হইলে সর্ব্বত্রই যে চক্র শুদ্ধির প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যেমন ধনু রাশির সংখ্যা ৯কে দ্বিগুণিত করিয়া তাহাতে চক্র শুদ্ধি পূর্ব্বক ১ বাদ দিলে ৫ অবশিষ্ট থাকে, অতএব উক্ত সংখ্যানুসারে সিংহ ও কন্যা রাশি ধনু রাশির বর্গদ্বয়। ৩। ত্রিভাগ বা দৃকাণ-কুণ্ডলীতে মেষাদি চারি চর-রাশি যথাক্রমে অগ্ন্যাদি চারি ভূত-রাশির বর্গারম্ভ স্থান। যথা মেষাদি অগ্নি-রাশিত্রয়ের আরম্ভ স্থান মেষ। বৃষাদি তিন পৃথ্বী-রাশির আরম্ভ স্থান কর্কট ইত্যাদি। ৪। চতুর্থাংশ কুণ্ডলীর গ্রহ সন্নিবেশ অগ্নি-রাশি হইতে আরম্ভ তন্মধ্যে বিশেষ এই যে রাশির চরাদি সংজ্ঞানুসারে অগ্নি-রাশিরও চরাদি গ্রাহ্য। বৃশ্চিক স্থির-রাশি সুতরাং স্থির-অগ্নি-রাশি সিংহ হইতে তাহার বর্গারম্ভ হইবে। ৫। চর রাশির স্বস্থান

স্থির-রাশির পঞ্চম এবং দ্বি স্বভাব রাশির নবম স্থান হইতে পঞ্চমাংশ-কুণ্ডলীর গ্রহ সন্নিবেশ আবশ্যক। ৬। ষষ্ঠাংশ-কুণ্ডলীতে ওজ রাশির মেষ এবং সমরাশির তুলা বর্গারম্ভ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৭। ওজ-রাশির স্বস্থান এবং যুগ্ম-রাশির সপ্তম হইতে সপ্তাংশ-কুণ্ডলীতে গ্রহ বিন্যাস করিতে হয়। ৮। অষ্টমাংশ কুণ্ডলীতে মেষ ধনু এবং সিংহ রাশি হইতে চরাদি রাশি-ত্রয়ের যথাক্রমে গ্রহ-সন্নিবেশ আবশ্যক। ৯। নবাংশ-কুণ্ডলীতে তত্তৎ রাশির কোণস্থ চর-রাশি হইতে গ্রহ-স্থাপন নিরূপিত আছে। ১০। দশমাংশ কুণ্ডলীতে অগ্ন্যাদি রাশিচতুষ্টয়ের যথাক্রমে প্রথম দশম সপ্তম এবং চতুর্থ রাশি বর্গারম্ভের আদি স্থান। ১১। রুদ্রাংশ-কুণ্ডলীতে ১৪ হইতে রাশি সংখ্যা বিয়োগ করিলেই তত্তৎ রাশির বর্গারম্ভ স্থান পরিস্ফুট হয়। যেমন ১৪ হইতে ৪ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ১০ মকর রাশি হইতে কর্কটের রুদ্রাংশ-বর্গ আরম্ভ হইবে। ১২। দ্বাদশাংশ কুণ্ডলীতে মেষ হইতেই যথাক্রমে প্রত্যেক রাশির দ্বাদশ-বর্গের গণনা অর্থাৎ মেষ হইতেই প্রত্যেক রাশির বর্গারম্ভ নির্দ্দিষ্ট।

কোন রাশির আবশ্যক মত কোন নির্দ্দিষ্ট বর্গ স্থির করিবার সহজ উপায় এই যে, যে রাশির হোরাদি যত সংখ্যক বর্গ আবশ্যক, সেই রাশি সংখ্যাকে উক্ত বর্গ সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া তাহা হইতে একোন বর্গ সংখ্যা বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে আবশ্যক হইলে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভাগশেষ অঙ্কে প্রথম বর্গ-রাশি অর্থাৎ আরম্ভ স্থান স্থিরী-কৃত হইবে। যেমন সিংহ রাশির হোরা স্থির করিতে হইলে সিংহ রাশির সংখ্যা ৫-কে হোরা সংখ্যা ২ দিয়া গুণ করিয়া তাহা হইতে ১ বাদ দিলে ৯ অবশিষ্ট রহিল, অতএব বুঝা গেল যে ৯ অর্থাৎ ধনূ এবং তৎপরস্থিত মকর রাশি সিংহ রাশির হোরাদ্বয়। কোন গ্রহ সিংহ-রাশির প্রথমার্দ্ধে থাকিলে ধনুতে এবং পরার্দ্ধে থাকিলে মকর রাশিতে স্থাপিত হইবে। কন্যা রাশির দ্রেক্কাণ নির্ণয়ে তৎসংখ্যা ৬-কে দ্রেক্কাণের ৩ দিয়া গুণ করিলে ১৮ হয়। তাহা হইতে একোন ৩ অর্থাৎ দুই বাদ দিলে ১৬ এবং তাহার দ্বাদশ ভাগ শেষ ৪ থাকে অতএব ৪ কর্কট সিংহ এবং কন্যা, কন্যা রাশির দৃকাণত্রয়। বৃশ্চিকের সপ্তাংশ স্থির করিতে বৃশ্চিক সংখ্যা ৮-কে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ৬ বাদ দিলে ৫০ অর্থাৎ ২ অবশিষ্ট থাকে। অতএব স্থির হইল যে বৃশ্চিকের সপ্তাংশ বৃষ রাশি হইতে আরম্ভ। ইহাই বর্গকুণ্ডলী মাত্রে গ্রহ স্থাপনের স্বতঃসিদ্ধ রীতি। হিসাব করিয়া গ্রহ স্থাপন করিতে যাঁহাদের অসুবিধা বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে বর্গ-চক্র প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক।

এ স্থলে অসুবিধা বিবেচনায় হোরাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্গ চক্র প্রদান না করিয়া সংক্ষেপে একটি দ্বাদশ বর্গারম্ভ চক্র প্রদত্ত হইল। ইহার প্রথম স্তম্ভে বর্গ সংখ্যা দ্বিতীয়ে বর্গ সংজ্ঞা তৃতীয়ে প্রতি বর্গের অংশাদি পরিমাণ এবং চতুর্থে প্রতি বর্গের রাশিগত আরম্ভ-স্থান মাত্র সন্নিবেশিত রহিল। উক্ত আরম্ভ স্থান হইতে বর্গ সংখ্যা পর্য্যন্ত পর পর রাশি গণনা করিলে প্রতি বর্গস্থ রাশি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। প্রচলিত শাস্ত্রের সহিত বিশেষত্ব রাখিবার জন্য এ স্থলে হোরাদি বর্গের ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু অর্থে কোন পার্থক্য নাই।

দ্বাদশ বর্গারম্ভ চক্র ।

বর্গ সংখ্যা	বর্গ সংখ্যা	অংশাদি পরিমাণ	রাশি সংখ্যা											
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	রূপাংশ	৩০।০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	পক্ষাংশ	১৫।০	১	৩	৫	৭	৯	১১	১	৩	৫	৭	৯	১১
৩	গুণাংশ	১০।০	১	৪	৭	১০	১	৪	৭	১০	১	৪	৭	১০
৪	বেদাংশ	৭।৩০	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯
৫	বাণাংশ	৬।০	১	৬	১১	৪	৯	২	৭	১২	৫	১০	৩	৮
৬	রসাংশ	৫।০	১	৭	১	৭	১	৭	১	৭	১	৭	১	৭
৭	নগাংশ	৪।১৭	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬
৮	গজাংশ	৩।৪৫	১	৯	৫	১	৯	৫	১	৯	৫	১	৯	৫
৯	নন্দাংশ	৩।২০	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪
১০	আশাংশ	৩।০	১	১১	৯	৭	৫	৩	১	১১	৯	৭	৫	৩
১১	রুদ্রাংশ	২।৪৩	১	১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২
১২	মাসাংশ	২।৩০	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

তাজকোক্ত হোরা দ্রেক্কাণ চতুর্থাংশ পঞ্চমাংশ এবং দ্বাদশাংশের সহিত কারিকাখ্যাত তত্তৎ বর্গ-কুণ্ডলীর সাদৃশ্য নাই। দেশ প্রসিদ্ধ হোরা দ্রেক্কাণ এবং ত্রিংশাংশ বর্গ ভিন্ন ভিন্ন ফল বিচারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই তাহাদিগের প্রয়োজন। গ্রহবল-বিচারে কারিকোক্ত মতই গ্রাহ্য এবং প্রশস্ত বলিয়া অনুমান হয়।

বর্ত্তমানে অনেক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্ব স্ব প্রকাশিত গ্রন্থ মধ্যে বর্গাধিপ চক্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন বটে কিন্তু তদ্দ্বারা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ভিন্ন কার্য্যের কোন সুগমতা ঘটে নাই। তদ্দৃষ্টে কোন গ্রহ বা ভাবের, কোন্ বর্গাধিপতি কে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেও বর্গকুণ্ডলী প্রস্তুত করা সুকঠিন, কারণ রবির নবাংশাধিপতি শুক্র বলিলে নবাংশ-কুণ্ডলীতে রবিকে বৃষে না তুলা রাশিতে স্থাপন করিব তাহা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? গ্রহাক্ষরের পরিবর্ত্তে রাশি সংখ্যা লিখিলেই সকল বিষয়ে সুবিধা হইত। মূল-শ্লোক-দৃষ্টে হোরাদি অন্যান্য বর্গে বর্গকুণ্ডলীতে গ্রহ স্থাপনের সদুপায় হইলেও ত্রিংশাংশ-কুণ্ডলীতে কোন সুবিধাই নাই। উক্ত কুণ্ডলী সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই রাশির যুগ্মাযুগ্ম ভেদে কোন্ গ্রহ কত অংশের অধিপতি তাহাই লিখিত মাত্র কিন্তু গ্রহ স্থাপন সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ নাই। ভগবান্ গার্গী বলিয়াছেন—

"ত্রিংশাংশে বিষমে রাশৌ ন্যাসাৎ পূর্ব্বগৃহে গ্রহাণ্।
সমক্ষে'তু পরে ভৌম সৌরীজ্যজ্ঞ সিতালয়ে ॥"

অর্থাৎ ত্রিংশাংশ-কুণ্ডলীতে বিষম-রাশিস্থ গ্রহকে সর্ব্বদা তদীয় ত্রিংশাংশাধিপতির পূর্ব্ব গৃহে এবং সম রাশিস্থ গ্রহকে তদিতর গৃহে স্থাপন করিবে। কোন কোন জ্যোতিষী মেষাদি গণনায় প্রথম-প্রাপ্ত রাশিকে পূর্ব্ব-গৃহ এবং তৎপরস্থিত রাশিকে পর-গৃহ কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ত্রিংশাংশ-কুণ্ডলীতে পাঁচটি তারা গ্রহই বর্গাধিকার রাখে এবং তাহাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া ক্ষেত্র আছে। উক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে মূল ত্রিকোণ গৃহই পূর্ব্ব-গৃহ শব্দে বাচ্য। রাশি-চক্রে চন্দ্র বুধ ভিন্ন অপর গ্রহ-পঞ্চকের মূল-ত্রিকোণ বিষম রাশি, চন্দ্র ও বুধের সম রাশি মাত্র। সুতরাং বিষম রাশিস্থ গ্রহ তদীয় ত্রিংশাংশাধিপতির বিষম গৃহে এবং সম রাশিস্থ গ্রহ সম রাশিতে স্থাপিত হইবে কিন্তু বুধ ত্রিংশাংশাধিপতি হইলে বিপরীত রীতি, কারণ উহার মূল-ত্রিকোণ সমরাশি।

এক্ষণে মিত্রামিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কারিকা বলিতেছেন,—

"সিতাসিতার্ক যুগ্মাশ্চ সূর্য্যস্য রিপুরাশয়ঃ।
মীনালিতৌলিকুম্ভাশ্চ চন্দ্রস্য রিপবস্তথা॥
ঘট-কন্যা-নৃযুক-তৌলি-রাশয়ো ভৌমশত্রবঃ।
কর্কমীনালিকুম্ভাশ্চ বুধস্য রিপবো মতাঃ॥
বৃষ-তৌলি-নৃযুক্-কন্যা-কুম্ভাশ্চ গুরু-শত্রবঃ।
সিংহাজ-কুম্ভ-চাপাশ্চ শত্রবো ভার্গবস্য চ॥
মেষ-সিংহ-ধনুঃ-কৌর্পি-কর্কটা রবিজস্য চ।
শত্রবশ্চাপরে মিত্রা স্তত্রস্থে শুভদা গ্রহাঃ॥"

রাশিচক্রে গ্রহগণ সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করেন না। কোথাও বা তাঁহাদিগের সদর্প স্বাধীন ভাব, কোথাও বা যেন পরাধীন নিষ্প্রভ। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এবং তুঙ্গ স্থানে গ্রহগণ সদর্পে অবস্থান করেন সুতরাং তত্তৎ স্থান তাঁহাদের মিত্র বা হিতরাশি। তদ্ব্যতীত মূল-ত্রিকোণস্থ গ্রহের দ্বির্দ্বাদশ চতুর্থাষ্টম এবং পঞ্চম নবম, হিতরাশি মধ্যে গণ্য। উচ্চ-রাশি এবং স্বক্ষেত্র ব্যতীত অবশিষ্ট তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ গৃহ তাঁহাদিগের বড়ই অবসাদপ্রদ সুতরাং শত্রু-রাশি। শনি ও শুক্রের ক্ষেত্র এবং মিথুন-রাশি রবির অহিতকর সুতরাং শত্রুরাশি মধ্যে গণ্য। তদ্রূপ তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ এবং মীন রাশি চন্দ্রের, মিথুন, কন্যা, তুলা এবং কুম্ভরাশি মঙ্গলের, কর্কট, বৃশ্চিক, কুম্ভ এবং মীন রাশি বুধের, বৃষ, মিথুন, কন্যা এবং তুলা রাশি বৃহস্পতির, মেষ, কর্কট, সিংহ এবং ধনুরাশি শুক্রের, তথা মেষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক এবং ধনু এই পাঁচ রাশি শনির কষ্টপ্রদ শত্রু রাশি। রাশি-দিগের সহিত গ্রহগণের এই শত্রু মিত্রতা নিবন্ধনই গ্রহগণের মধ্যে পরস্পর শত্রু মিত্রতা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। যে গ্রহ কেবল মিত্র-রাশির অধিপতি সেই গ্রহই অপরের মিত্র, কেবল শত্রু স্থানের অধিপতি হইলে শত্রু, এবং শত্রু ও মিত্র উভয় রাশির অধিপতি হইলে

সে গ্রহ সম শব্দে বাচ্য। উক্ত প্রথানুসারেই গ্রহগণ মধ্যে পরস্পর নৈসর্গিক মিত্রামিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কোন গ্রহ শিষ্ট কি দ্বিষ্ট রাশিতে অবস্থিত, তদ্রাশি হইতেই তাহার বিচার আবশ্যক, অধিপতি হইতে নহে। বুধ, রবির সমগ্রহ বলিয়া মিথুন রাশি কখনই রবির পক্ষে নিরপেক্ষ হইতে পারে না। গ্রহদ্বয় কোন হেতু বশতঃ পরস্পর তাৎকালিক শত্রু বা মিত্র হইলেও যে তত্তৎ ক্ষেত্রের ইষ্টানিষ্ট শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইবে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে ক্ষেত্রপতি শত্রু হইয়া তাৎকালিক মিত্র হইলেও কুস্থানেও কতকটা শান্তি লাভ ঘটে কিন্তু শত্রু হইলে বিড়ম্বনার বাহুল্যই চিন্তনীয়। এক্ষণে চর দশার ফল বিচার সম্বন্ধে কতিপয় বৃদ্ধ-বাক্য এ স্থলে উদ্ধৃত করা অযৌক্তিক নহে।

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি চরপর্য্যদশা ফলং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ দৈবজ্ঞো জায়তে নরঃ॥

শুভখেটাচ্ছুভং বিন্দ্যাৎ পাপাচ্চাশুভমুচ্যতে।
শুভক্ষেত্রে শুভং বাচ্যং পাপর্ক্ষে ত্বশুভং ফলং॥

যদা দশাপ্রদো রাশিঃ শুভ খেটযুতো দ্বিজ।
শুভক্ষেত্রে হি তদ্রাশিঃ শুভং তত্র দশাফলং॥

পাপযুক্তে শুভক্ষেত্রে আদৌ দুঃখং সুখোত্তরং।
পাপর্ক্ষে শুভসংযুক্তে সৌখ্যমাদৌ ততোঽন্যথা॥

শুভক্ষেত্রে দশা রাশৌ যুক্তে পাপ শুভৌ যদি।
পূর্ব্বং কষ্টং সুখং পশ্চাৎ নির্ব্বিশঙ্কং বিচিন্তয়েৎ॥

পাপর্ক্ষে শুভ পাপস্থে সৌখ্যমাদৌ ততোঽশুভং।
পাপক্ষেত্রে পাপযুক্তে সা দশা সর্ব্বদুঃখদা॥

পাকে ভোগে চ পাপাঢ্যে দেহপীড়া মনোব্যথা।
নৈরুজ্যং ভোগভাগ্যঞ্চ তত্রস্থে শুভখেচরে॥

দ্বিতীয়ে পঞ্চমে সৌম্যো রাজপ্রীতির্জয়ং ধ্রুবং।
চতুর্থে তু শুভং সৌখ্য মারোগ্যং চাষ্টমে শুভে॥

ধর্ম্মবৃদ্ধি গুর্রুজনাৎ সৌখ্যঞ্চ নবমে শুভে।
বিপরীতে বিপর্য্যাসো মিশ্রে মিশ্রং প্রকীর্ত্তিতং॥

তৃতীয়ে ষষ্ঠভে পাপে শত্রো নিগ্র্হণং জয়ঃ।
শুভখেট যুতে তত্র জায়তেঽপি পরাজয়ঃ॥

সপ্তমে পাকভোগাভ্যাং পাপে দারার্ত্তিরীরিতা।
চতুর্থে স্থানহানিঃ স্যাৎ পঞ্চমে পুত্রপীড়নং॥
দশমে কীর্ত্তিহানিশ্চ নবমে পিতৃপীড়নং।
উক্ত স্থানগতে সৌম্যে তত্তৎ সৌখ্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥
লাভস্থে শুভ পাপে চ লাভো ভবতি নিশ্চিতং।
পাপাদ্ রুদ্রগতে পাপে পীড়া সর্ব্বাপ্যবাধিকা॥
দশা রাশের্যদা বিপ্র রন্ধ্রে বাপি ত্রিকোণভে।
পাপখেট স্থিতো বিন্দ্যাৎ সা দশা দুঃখদায়িকা॥
কেন্দ্রস্থানগতো সৌম্যো লাভদোঽরিজয়প্রদঃ।
ত্রিকোণরন্ধ্রিরিপ্‌ফস্থৈঃ শুভপাপৈঃ শুভাশুভং॥
যস্য রাশিঃ শুভাক্রান্তো যস্য পশ্চাৎ শুভগ্রহাঃ।
তদ্দশা শুভদাঃ প্রোক্তা বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥
জন্মকাল-গ্রহৈঃ স্থিত্যা গোচরাগতকৈরপি।
বিচারিতৈঃ প্রবক্তব্যং তদ্রাশিদশাফলং॥
মেষ-কর্ক-তুলা-নক্র রাশীনাং তু যথাক্রমং।
বাধাস্থানং সমাখ্যাতং কুম্ভ-গো-সিংহ-বৃশ্চিকা॥
পাকে চ চররাশীনাং বাধাস্থানে শুভোত্তরে।
স্থিতে সতি মহাশোকো বন্ধনং ব্যসনাদিকং॥
উচ্চ-স্বক্ষ-গ্রহে তস্মিন্ শুভং সৌখ্যং ধনাগমঃ।
তচ্ছূন্যং চেদসৌখ্যং চ তদ্দশা ন ফলপ্রদাঃ॥
বাধক ব্যয়-ষট্-রন্ধ্রে রাহুযুক্তে মহদ্ভয়ং।
প্রস্থানং বন্ধনং চৈব রাজপীড়া রিপোর্ভয়ং॥
রব্যার-রাহু-মন্দাশ্চ ভুক্তিরাশৌ স্থিতা যদি।
তদ্ভুক্তৌ পতনং বিন্দ্যাৎ রাজকোপান্ মহদ্ ভয়ং॥
ভুক্তিরাশি ত্রিকোণে তু নীচখেটঃ স্থিতো যদি।
তদ্রাশৌ বা যুতে নীচে পাপ মৃত্যুভয়ং বদেৎ॥
ভুক্তিরাশৌ তুঙ্গগৌ চেৎ ত্রিকোণে বাপি তুঙ্গগে।
যদা ভুক্তিদশা প্রাপ্তা তদা সৌখ্যং লভেন্নরঃ॥
যে রাজযোগদা যে চ শুভমধ্যগতা গ্রহাঃ।
তদ্দশায়াং শুভং ক্রয়াৎ রাজযোগাদিসম্ভবং॥

শুভদ্বয়ান্তরস্থোঽপি পাপোঽপি শুভদঃ সদা।
শুভো যস্য ত্রিকোণস্থ স্তদ্দশাপি শুভপ্রদা॥
রাহোর্দ্দশান্তে সর্ব্বস্য নাশো মরণবন্ধনে।
দেশান্নির্ব্বাসনং বা স্যাৎ কষ্টং বা মহদশ্নুতে॥
তত্ত্রিকোণগতে পাপে নিশ্চয়াৎ দুঃখমাদিশেৎ।
এবং শুভাশুভং সর্ব্বং নিশ্চয়েন বদেদ্ বুধঃ॥"

যখন যে রাশির দশা চলিতে থাকে তখন সেই রাশিকে পাক বা দ্বার রাশি কহে। লগ্ন অর্থাৎ দশারম্ভ-স্থান হইতে পাক-স্থান যে কয় রাশি অন্তর, তত দূরবর্ত্তী রাশিকে ভোগ বা বাহ্য রাশি কহে। পূর্ব্বোক্ত বিচার সমস্তই পাক রাশি হইতে জ্ঞাতব্য। ভোগ-রাশি পাকের সহকারীস্বরূপ সুতরাং তাহারও শুভাশুভত্ব বিবেচ্য। ৩৪॥

ইতি উপদেশসূত্রে প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয়পাদঃ।

অথ স্বাংশো গ্রহাণাং ॥ ১ ॥

অথ অনন্তরং রব্যাদীনাং গ্রহাণাং স্বাংশঃ আত্মকারকাদ্যাশ্রিতো যো নবাংশস্তমবলম্ব্য ফলং বিচার্য্যম্। ১ ॥

এক্ষণে আত্মকারকাদি গ্রহ যে যে রাশির নবাংশে অবস্থিত তত্তৎ রাশির ফল লিখিত হইতেছে। গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বত্রই স্ব শব্দ আত্মকারকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মকারকাদ্যা-শ্রিত নবাংশরাশিকে লগ্ন কল্পনা করিয়া জন্মকুণ্ডলী হইতেই ফলাফল বিচার্য্য। জাতকের জন্মকালীন রাশিকুণ্ডলী এবং নবাংশকুণ্ডলী পাশাপাশি রাখিয়া ফল বিচার করাই সুবিধা, কারণ অনেক সময়ে নবাংশকুণ্ডলী হইতেও পরিস্ফুট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরাশরীয়ে লিখিত আছে যে লগ্নের নবাংশপতিস্থিত রাশি হইতেও নিম্নলিখিত ফল সমুদয় বিচার্য্য। যথা—

"স্বাংশঃ কারককুণ্ডল্যাং নবমাংশাধিপোহথবা।
যস্মিন্ রাশৌ স্থিতো বিপ্র তদ্রাশিফলমুচ্যতে ॥"

পঞ্চ মূষিকমার্জ্জারাঃ ॥ ২ ॥

পঞ্চ (৬১ ÷ ১২ = ১) মেষরাশৌশ্চেদাত্মকারকনবাংশস্তদামূষিক-মার্জ্জারা দুঃখদা ভবন্তি ॥ ২ ॥

কারক-গ্রহ মেষ রাশির নবাংশগত থাকিলে জাতক মূষিক ও মার্জ্জার জাতীয় জীবগণ হইতে দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়। সূত্র মধ্যে সুখ দুঃখ বাচক কোন শব্দ নাই। পারাশরী হোরায় লিখিত আছে যে—

"অজাংশে কারকাংশে তু তিষ্ঠন্তি চ যদা গ্রহাঃ।
তদা মুষিকমার্জ্জারৌ দুঃখদৌ ভয়কারকৌ ॥"

এবং এই শ্লোক হইতেই পূর্ব্বে মূষিকাদির দুঃখদাতৃত্ব লিখিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে শুভাশুভ ফল সর্ব্বত্রই বিচার সাপেক্ষ। শুভ গ্রহের দৃষ্টি যোগাদি সত্বে মার্জ্জার, মূষিক মারিয়াই ক্ষান্ত, তদ্বিপরীতে গৃহের দুগ্ধভাণ্ডাদি বিনষ্ট করিয়া থাকে। স্ব শব্দের ন্যায় কেবল কারক শব্দও গ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলে আত্মকারকার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥

ব্যাস-কুণ্ড।

কেন কাঁদ ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—আগামী ১লা কার্ত্তিক গৃহস্থ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে। সহৃদয় গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা আগামী ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্বে চতুর্থ বর্ষের গৃহস্থের মূল্য মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব। যাঁহারা চতুর্থ বর্ষের গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা যেন পূর্ব্বেই এ বিষয় পত্রের দ্বারা আমাদিগকে জানান। যাঁহারা টাকা কিম্বা পত্র কিছুই পাঠাইবেন না, আমরা চতুর্থ বর্ষের ১ম সংখ্যা (অর্থাৎ কার্ত্তিক ১৩১৯ সংখ্যা) তাঁহাদিগকে ভিঃ পিঃ ডাকযোগে পাঠাইতে বাধ্য হইব। গ্রাহক মহোদয়-গণের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, যেন তাঁহারা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া আমা-দিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ এবং কষ্ট না দেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীউমাচরণ দাস,

সহঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।

(২৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ, তোমাদের কলিকাতার অনেক বাবু এখানে আসিয়াই আমার নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরের গাড়ীতে কলিকাতায় ফেরত যাইতে চাহেন।" কথাটা এত পরি-হাস ব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, যে তাহাতে আমারও একটু লজ্জা হইল। কথাটা ঠিক, ব্রহ্মজ্ঞান এত সহজ প্রাপ্য জিনিস নয়, ইহার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হয়, অনেক শিক্ষা করিতে হয়। আবার এই দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধে একদিন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ যোগী বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী বলিয়াছিলেন, যে আজকাল সকলেই বেদান্ত অধ্যয়ন করেন ও অনেকেই বেদান্ত অধ্যাপনা করেন। দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা

আয়ত্ত করিবার জন্য জমী তৈয়ার করিতে হয়, মস্তিষ্ক সে সকল দুরূহ ভাব গ্রহণোপযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। পড়িলেই হয় না, বা পড়ানও বড় সহজ নহে। এই সকল মহাজন বাক্য স্মরণ করিয়াই আমার ধারণা, সহসা এ সকল কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাহাতে সে সকল কঠিন বিষয় আয়ত্তাধীন হয় না; বৃথা শ্রম ও সময় ক্ষেপ মাত্র। তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি যদি স্তরে স্তরে উঠিবার চেষ্টা কর সে সকল কঠিন বিষয় সহজবোধ্য হইবে, ঠিক ভাবগ্রহ হইবে, অধ্যয়ন সফল হইবে এবং পরিণামে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারিবে। পৌরাণিক ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, সনাতনাদি মহাত্মাগণের কথা পৃথক। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতিফলে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, সে প্রকার অসাধারণ মহাত্মাগণ আমাদের হিসাবের বাহির। তাঁহাদের সহিত সাধারণ মানবের তুলনাও চলে না, তাঁহাদের অদৃষ্ট লইয়া কয়জন জন্মিয়াছেন। ভগবান যাঁহাকে বিশেষ কৃপাকটাক্ষ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আমরা সাধারণ মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা আলোচনা করিব মাত্র। ঐ সকল মহাত্মাদের কিসে কি হইল তাহা নির্ণয় করা আমার কর্ম্ম নহে, তাহাতে আমার সামর্থ্যও নাই।

অনেক সময় দেখিয়াছি বিদ্যাভ্যাস কালে অনেক ছাত্র কোন একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া সেই সম্প্রদায়ের আদরণীয় ধর্ম্মপালনে তৎপর হইয়া বিদ্যাশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে কি লাভ হইয়াছে জানি না। সাক্ষাৎ পক্ষে লেখাপড়ার পথে কণ্টক হইয়াছে, তাঁহাদের নিজের সাংসারিক উন্নতির অবরোধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা না নিজের উপকার করিয়াছেন, না তাঁহাদের হইতে সমাজের বা দেশের উপকার সাধিত হইয়াছে। অনেকে চৈতন্যাদি মহাত্মাগণের উদাহরণ দিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে চৈতন্য কিরূপ বিদ্যাশিক্ষার পর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি যে পথে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বলিতেছিলাম চৈতন্যদেবের ঠিক সেই পথে স্তরে স্তরে শিক্ষালাভ হইয়াছিল। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যেরও তাহাই, তবে এই সকল মহানুভবগণের সাধারণ জনগণ অপেক্ষা অল্পদিনে বিদ্যালাভ হইয়াছিল। সেটা তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মাত্র। সকলেই কি সেইরূপ অসাধারণ মেধাবী। একের উদাহরণ অপরে প্রয়োগ করিতে হইলে সকল উপকরণগুলি ঠিক থাকা চাই। তাহা না বুঝিয়া হঠাৎ কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে ঢুকিয়া ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা দ্বারা, না ধর্ম্মের উন্নতি হয়, না সমাজের উপকার হয়। হইবার মধ্যে যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি সংসারে অনন্ত কষ্ট ও অপরিসীম লাঞ্ছনা। এইরূপে কেহ বা বৈষ্ণব দলে কেহ বা থিওসফিষ্ট দলে কেহ বা ব্রাহ্ম সমাজে, কেহ বা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়াছেন। আমি কোন সম্প্রদায় বিশেষ ভাল কি মন্দ তাহা বলিতেছি না। ধর্ম্মসম্প্রদায় কোনটিই মন্দ নহে। সকল সম্প্রদায়ই ভাল। তবে ভাল মন্দ বিচার করিবার

তোমার এখন সময় কোথায়? তুমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার যে ধর্ম্ম, তাহারই তত্ত্ব কতটুকু জান, কেবল ভাসা ভাসা গোটাকত মোটামুটী কথা দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছ মাত্র। যখন তুমি তাহার ভিতর প্রবেশ কর নাই, তাহার ভাল মন্দ জানিতে পার নাই তখন তাহার সহিত অন্য ধর্ম্মের তারতম্য বিচার কেমন করিয়া করিতে পার? এ সকল বিচার করিতে অনেক পড়িতে হয়, অনেক জানিতে হয়। তাহা তুমি এখন পারিয়া উঠিবে না, কাজে কাজেই তাহাতে তোমার এক্ষণে নিরস্ত থাকাই ভাল। যুবক লেখা পড়ার সময় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়াশুনা ত্যাগ করার জন্য অনেক পিতামাতাকে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। সাক্ষাৎ দেবতা পিতামাতার মতের বিরুদ্ধে, তাঁহাদের দুঃখের কারণ স্বরূপ পুত্রের ধর্ম্ম চেষ্টায় যে কি ফল হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ইহাতে ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয় জানি না। ইহা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাই। ধর্ম্মের ন্যায় ভাল জিনিসের অপব্যবহার।

স্বল্প বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত স্থায়ী হয় না। কয়েক দিন বা কয়েক বৎসর পরে আবার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একবার যে ধর্ম্মে একজন বিশেষ আস্থা দেখাইলেন, কিছু দিন পরে জ্ঞানবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বীতরাগ হইয়া আবার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা প্রথমে বংশপরম্পরা ক্রমে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের বন্ধুবর্গের ভিতর এমত লোক আছেন, তবে সুখের বিষয় ও সৌভাগ্যের কথা যে তাহার সংখ্যা বড় অধিক নহে। এটা কেবল অল্পশিক্ষার ফল, তারপর যাঁহারা অধিক শিক্ষালাভ করেন, নিজের ভুল হয় ত নিজেই বুঝিতে পারেন, আর যাঁহারা তাহার পর আর শিক্ষালাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি কর্ম্ম সম্বন্ধে চিরদিনই সকল সমাজের অধোদেশে পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া, সহানুভূতি হয় বটে, শিক্ষালাভ করাও চাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, বোধ হয় এখন আর কিছু বলা আবশ্যক নাই। মোট কথা এখন যাহাতে পাঠে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়, যাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, যাহাতে তোমাকে নিজে বিচার বিবেচনা করিতে হইবে, এমন কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়, এমন বিষয়ে মনোযোগ করিবে না। সংসার, পরিবার, সমাজ, দেশ সমস্তই যেমন চলিতেছে যতদিন শিক্ষা শেষ না হয়, ততদিন তেমনি চলিতে থাকুক, তুমি যে একজন সংসার মধ্যে, পরিবার মধ্যে, সমাজ মধ্যে বা দেশ মধ্যে আছ ইহা কেহ জানিতে না পারে এমন ভাবে সমাজচক্ষুর অন্তরালে, নিজ সময়োচিত কার্য্য অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক, তাহাতে তোমাকে কেহ নির্ব্বোধ বলে, অসামাজিক বলে, এমন কি অধার্ম্মিক বলে তাহাতে দুঃখিত হইবে না। শাস্ত্রগতপ্রাণ মনিষীগণ চিরদিনই এই ভাবে দিন যাপন করিয়াছেন। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের সম্বন্ধে কত কি নির্ব্বুদ্ধিতার গল্প শুনিবে, সেটা তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নহে, তাঁহার শাস্ত্রে একান্ত নিবিষ্টচিত্ততারই চিহ্ন, ইহা লজ্জার কথা নহে, শ্লাঘার

কথা। কেবল এ দেশে কেন সকল দেশেই এমন অনেক মনিষীর কথা শুনা যায়। কিছু দিন হইল সংবাদ পত্রে একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিতের একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি জর্ম্মাণির কোন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তাঁহার এক ভগ্নী ভিন্ন আর সংসারে কেহ ছিল না। ভাই ভগ্নী একত্র বাস করিতেন। বহুকাল একটি বাটীতে বাস করিতেন, কিন্তু সে বাটীর সংখ্যা জানিতেন না। একদিন অধ্যাপনার পর বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময় অত্যন্ত বৃষ্টি আসিল, সম্মুখে এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী যাইতেছিল তাহার চালক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে গাড়ীতে লইয়া কোন রাস্তায় কত সংখ্যক ভবনে লইয়া যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহা বলিতে পারিলেন না। তাহাতে গাড়োয়ান মহাগোলে পড়িল, কোথায় লইয়া যায়, কিছুতেই যখন তিনি নিজ বাটীর ঠিকানা বলিতে পারিলেন না, তখন শকট চালক তাঁহাকে পাগল স্থির করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ সেখানে তাঁহার একজন পল্লীবাসী ছাত্র তাঁহাকে তদবস্থাতে দেখিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া শকট চালককে ঠিকানা বলিয়া দিলেন এবং পাছে পথে আরও কোন গোলযোগ হয় তাই সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বাটীতে পৌছিয়া দিলেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় সম্বন্ধে আরও একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ভগ্নী তাঁহার বেশি পথ চলিতে হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য যে স্থানে তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার নিকটে আবাস গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধ্যাপক এমনই অন্যমনস্ক যে প্রতিদিন তিনি সেই দূরস্থ পুরাতন বাটীতে গিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আবার নূতন আবাসে আসিতেন। যখন তাঁহার ভগ্নী এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এরূপ প্রত্যহই হইতেছে দেখিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতার সাহায্যার্থে সেই দূরস্থ পুরাতন বাটীতেই আবার প্রত্যাগমন করিলেন। সেই জর্ম্মাণ অধ্যাপকই বল, আর আমাদের দেশের চলিত গল্পের নৈয়ায়িকদের কথাই বল, কথাটা এক, যিনি দিবানিশি শাস্ত্রগত প্রাণ তিনি এ সকল সামান্য বিষয় কখন মনে করিতে পারেন না। একটা মন নানা দিকে যায় না। মন এক জিনিসের উপর স্থাপন করিতে না পারিলে তাহাতে কখন সিদ্ধিলাভ হইবার নহে। এ সম্বন্ধে মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার গল্পটি বড় শিক্ষাপ্রদ। দ্রোণাচার্য্য কৌরব ও পাণ্ডবদের সকলকেই অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, পরে কিছুকাল শিক্ষার পর ভীষ্ম মনে করিলেন ইহাদের কাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছে একবার দেখা যাউক। সভা হইল, পরীক্ষার্থী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা একত্রিত হইলেন, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য। পরীক্ষার জন্য দূরস্থ একটি বৃক্ষে একটি কৃত্রিম পক্ষী স্থাপিত হইল। উহার কণ্ঠচ্ছেদ করাই পরীক্ষা। প্রথম যুধিষ্ঠির আহূত হইলেন। যুধিষ্ঠির ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া পক্ষীকে মারিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির

বলিলেন, আমি সকলই দেখিতেছি. আমি সভাস্থ পার্শ্বস্থ সকলকে বৃক্ষ ও বৃক্ষস্থ পক্ষীকে ও আপনাকে ও ধনুর্ব্বাণ সকলি দেখিতেছি। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, তোমার কিছুই শিক্ষা হয় নাই। এইরূপ কেহ বলিলেন কেবল বৃক্ষই দেখিতেছেন, কেহ বলিলেন, কেবল পক্ষী দেখিতেছেন, তাহাদিগকে ঐরূপ তিরস্কার করার পর অর্জ্জুনকে আহ্বান করিলেন এবং ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় অর্জ্জুন বলিলেন আমি ছেদ্য পক্ষীকণ্ঠ ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। তখন দ্রোণাচার্য্য পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমারই শিক্ষা ঠিক হইয়াছে। যে ব্যক্তি লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখে, তাহার শিক্ষা হইল কৈ ? সুতরাং শিক্ষার একমাত্র উপায় একাগ্রতা অন্য কোন দিকে মন দিলে বিদ্যাভ্যাসের বিষম ক্রটী হয়। আজকাল কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও আমাদের মধ্যে অনেক গণ্য মান্য শিক্ষিত বিজ্ঞ মহোদয়গণ ছাত্রদিগের মন তাহাদের শিক্ষণীয় ব্যতীত অপর অনেক দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভাল। ক্রমাগত পাঠ দ্বারা ছাত্রগণের শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার নিরীহ আমোদপ্রদ কার্য্যে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাহাদের শরীর ও মন ভাল থাকিবে, লেখা পড়াও ভাল হইবে। সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য খুব সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রকার ছাত্রদিগের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করায় তাহাদের পড়াশুনার ক্ষতি হয় কি না, ইহা ভাল করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। যুবকদিগকে উচ্চ শিক্ষার সহায়তা জন্য কয়েক জন বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিউট নামক এক সমিতি করিয়াছেন, তাহাতে সুশিক্ষিত বয়োধিক প্রবীণ লোকের সহিত যুবক ছাত্রবৃন্দ একত্র আসীন হইয়া তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া, তাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নানা রূপে উপকৃত হইতেছেন। যুবকগণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য সেখানে নানাবিধ আয়োজন নানা সময়ে হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে আবৃত্তিকে সেকালের টোলের অধ্যাপকগণ বড় আদর করিতেন। তাঁহারা এমন কি আবৃত্তি, বোধ অপেক্ষা পরিপাটী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ততদূর ঠিক না হউক আবৃত্তি যে বিদ্যাভ্যাস পক্ষে সহায়তা করে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহার উপর উচ্চারণ শিক্ষা। ইহাও বড় উপকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমস্তই লিখিয়া হইয়া থাকে। উচ্চারণ পরীক্ষার কোন উপায় নাই। শিক্ষকগণের উচ্চরণাদি পরীক্ষা হইবার নিয়ম হইয়াছে কিন্তু বিদ্যার্থীদের উচ্চারণ শিক্ষা বা পরীক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। ফলে বড় বিষম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমন অনেক কৃতবিদ্য যুবক প্রতিষ্ঠাপত্র গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবৃষ্ট হন যাঁহাদের উচ্চারণ বড়ই কদর্য্য। অনেক সময়ে ইংরাজেরা তাঁহাদের ইংরাজী উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না অপর প্রদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না। উচ্চারণ যে শিক্ষার একটা অঙ্গ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বিশেষ আমাদের দেশে যেখানে মন্ত্রশক্তির প্রভাব সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত এখানে উচ্চারণ বিকার জন্য যে

আমাদের কি ক্ষতি তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য আমি চিরদিনই আমাদের প্রদেশে প্রচলিত সংস্কৃত উচ্চারণের বিরোধী। কাশী অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে ও দ্রাবিড়ে সংস্কৃত যে ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্থানে স্থানে একটু একটু বিকৃত হইলেও আমাদের বঙ্গদেশের সংস্কৃত উচ্চারণ যে প্রকার বিকৃত ও দুষ্ট হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ইহা বাঙ্গালা-দেশের একটা বড় অখ্যাতির কথা। এখানে হ্রস্ব দীর্ঘ যেমন স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না, "ন" ও "ণ" দুইটির উচ্চারণ স্থান বিভিন্ন হইলেও এবং তাহা জানা সত্বেও একরূপই উচ্চারিত হইয়া থাকে। তবে ভারতের অনেক স্থানে "ণ" যে "ড়" রূপে উচ্চারিত হয় তাহাও ঠিক নহে। আমাদের কাছে "য" ও "জ" বিভিন্ন হইলেও একরূপে উচ্চারিত হয়। "শ", "ষ", "স" তিনটির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্য্য কালে আমরা তিনটির একরূপই ব্যবস্থা বা অপব্যবহার করিয়া থাকি। বাঙ্গালার বাহিরে আবার অনেক স্থলে "ষ" কোথাও "খ" কোথাও "ছ" রূপে উচ্চারিত হয়, তাহারও আমি পক্ষপাতী নহে। এইরূপ সংস্কৃতের উচ্চারণ বিভ্রাট যে কত ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। আক্ষেপের বিষয় এই অশুদ্ধ উচ্চারণ ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া অনেকে আবার উহার পক্ষপাতী। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপ অসংস্কৃত উচ্চারণ জন্য পারিতোষিক দিয়া থাকেন। এরূপ উচ্চারণ দোষ যাহাতে শীঘ্র বিলয় প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মণ্ডলীর এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, এবং তোমরা যাহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছ তোমাদের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ইউনিভার্সিটী ইইন্সটিউট এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সদুচ্চারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা দ্বারা অনেক সাহায্য হইতেছে। বিদ্যার্থীর সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত বড় বিরুদ্ধ। সঙ্গীতও একটি বিদ্যা। সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি শাস্ত্র প্রভৃতি অপেক্ষা সঙ্গীত কিছুতেই কম মূল্যবান বা আদরণীয় বিদ্যা নহে। ইহাতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে উপকার হয় বা হইতে পারে তাহা অপর কোন বিদ্যা দ্বারা তত সহজে হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এত বড় সঙ্গীত বিদ্যাকে একটা অপর বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে, ক্রীড়ার জিনিস রূপে ব্যবহার করা সঙ্গীতবিদ্যার অবমাননা। ইহাতে যে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তোমরা চেষ্টা করিতেছ তাহাতে বিঘ্ন হয় এবং সঙ্গীতও শিক্ষা হয় না। এক ত বাঙ্গলা দেশে আসিয়া সঙ্গীতটা প্রায়ই আমোদের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া, এখানে সঙ্গীতের অধঃপতন হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে ছাত্রদের ক্রীড়ার পদার্থ করিয়া দিয়া হেয় করা কেন? যদি কোন ছাত্রের সঙ্গীতের জন্য আগ্রহ থাকে, তিনি উপস্থিত যে বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা করিতেছেন তাহা সমাপ্তি করিয়া সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। ইহাতে মন পবিত্র হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়। সাধনার এমন উপায় আর নাই। সেই জন্যই পশ্চিমাঞ্চলে ইহার এত আদর। আমাদের এখানেও স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, দাওয়ানজী

মহাশয় প্রভৃতি সাধকমণ্ডলী সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। আর সাধারণতঃ আমরা যে সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দানুভব করি তাহা সঙ্গীতই নহে। তাহা একরূপ শব্দ বিদ্যা মাত্র। এ কথা আমি নিজে কিছুই বুঝি না। এক দিবস ইউসিভার্সিটী ইন্‌স্‌টিউটে একজন মান্দ্রাজী সঙ্গীতাধ্যাপক ইহা আমাদের এখানকার সমবেত সঙ্গীতজ্ঞ অনেক মহোদয়ের সাক্ষাতে বিবৃত করেন। সঙ্গীতের ন্যায় গভীর পদার্থকে সামান্য আনন্দ উপভোগের উপকরণ করিয়া তুলিয়া বঙ্গদেশে সঙ্গীতের এই দুরবস্থা হইয়াছে। সেই জন্য আমার ইচ্ছা নয় যে ব্যক্তি সঙ্গীতে সম্যক মনোনিবেশ করিতে না পারিবেন, তিনি ইহাকে এরূপ হেয় আনন্দকর পদার্থরূপে ব্যবহার না করেন। আরও একটু বিবেচ্য কথা এই যে যাহারা একটা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, তাহাদের এত আনন্দানুভবের চেষ্টা কেন? তাহাদের নিজের আরাধ্য বিদ্যাই তাহাদিগকে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিবে। এই সঙ্গে অপর একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনুকরণে আজকাল অনেক সময় আমোদ উপভোগ করিবার জন্য নাটকাভিনয় করিয়া আপনারা আনন্দিত হন, অপরকেও আনন্দিত করেন। ইহারও আমি পক্ষপাতী নহি। ইহা চিত্তসংযম পক্ষে একটা ঘোর অন্তরায়। আপনি আনন্দিত হইতে হইলে নাটক পাঠ করিয়া তাহার চমৎকারিত্ব সম্যক অনুধাবন করিয়াই যথেষ্ট আনন্দানুভব হয়। তাহা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করাটা কেমন মানসিক দৌর্ব্বল্যের অক্ষম বলিয়া মনে হয়। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি একখানি যুদ্ধ সম্বন্ধে পুস্তক (Southey's life of Nelson) পড়াইতে ছিলেন। ভাষার ঠিক অবস্থা ও ভাব প্রকাশ হইল কিনা সন্দেহ করিয়া তিনি প্রত্যেক যুদ্ধের একটি করিয়া মানচিত্র আঁকিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। ভাষায় যাহা চিত্রিত হইয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আবার মানচিত্র কেন? তাহার অভিনয় কেন? ভাষা দ্বারাই যথেষ্ট ভাবগ্রহণ করিয়াই বুদ্ধিমান পাঠক আমোদ লাভ করেন। কবিরও তাহাতে বেশী কৃতিত্ব। অভিনয় করিয়া বা দেখিয়া আমোদানুভব করা তাহা অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর আনন্দ, অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান, অশিক্ষিত লোকের জন্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিদ্যার্থীগণের কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে চিত্তচাঞ্চল্য হয়, বিদ্যাভ্যাসের একাগ্রতা কমিয়া যায়। অন্ততঃ সাময়িকরূপে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

ব্যায়াম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ব্যায়াম অভ্যাস করিতে এখন সকলেই উৎসাহ দিতেছেন। এ সময়ে তাহার প্রতিকূলে বলিতে সাহস হয় না। কেবল যে হাস্যাস্পদ হইব বলিয়া সাহস হয় না, তাহা নহে। পাঁচ জন শিক্ষিত লোকে যাহা ভাল বলেন, তাহা যে আমার মন্দ বোধ হয় সেটা সম্ভবতঃ আমার বুঝিবার ভুল। আমার নিজের মত যে অভ্রান্ত আর সকলেই ভ্রান্ত এ কথা বলিলে বড় নির্ব্বোধের ন্যায় বলা হইবে। তবে এ বিষয়ে আমার মত অপর পাঁচ জন হইতে কেন ভিন্ন তাহা প্রকাশ করিতেছি। ব্যায়ামের উপকারিতা

কি? শরীরের বলাধান করা, পেশিসকলের উন্নতি সাধন করা এবং বিবিধ প্রকারে দৈহিক বলসঞ্চয় করা। ইহা যে ভাল তাহা সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহার পক্ষে ইহা দরকার? যাহারা দৈহিক বলের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে নহে। সেকালের ক্ষত্রিয়গণ মল্লযুদ্ধাদিতে দক্ষ হইবার জন্য ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন এখনও সিপাহী ও পলোয়ানেরা রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা করে। তাহা ছাড়া শ্রমজীবী লোক নিজের জীবিকা অর্জ্জন জন্য বাল্যাবধি অঙ্গচালনা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ রাখে। না করিলে চলে না সেই জন্য তাহাদের উহা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের তাহাতে প্রয়োজন কি? আমাদের যাহাতে দীর্ঘজীবন হয় ও শরীর নীরোগ থাকে তাহা করিলেই যথেষ্ট। শরীরে বল থাকা ও দীর্ঘজীবন বা নীরোগ শরীর একই কথা নহে। বলিষ্ঠ লোককেও স্বল্পায়ু হইতে দেখা যায় আবার বলিষ্ঠ নয় অথচ সুস্থ শরীর লইয়া মানুষ দীর্ঘজীবী হয় তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অশীতিপর বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় এবং শতাধিক বৎসর বয়স্ক ঘোষাল মহাশয়কে তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। ইঁহারা কেহই বলিষ্ঠ নন্, ইঁহাদের শরীর যে কখন বলবান ছিল তাহা বোধ হয় না, অথচ ইঁহাদের শরীরে কোন রোগ নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় ইঁহারা এই ভাবে আরও দীর্ঘজীবি হউন, ইঁহারা আজও নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে প্রতিনিয়ত বাস করেন অথচ তিনি বলেন তাঁহার কখন জ্বর হয় নাই। শরীর সুস্থ রাখিতে পারিলেই ভাল থাকে। তাহাতে বড় বেশী কিছু করিতে হয় না। নিয়মিত ভাবে চলিলেই শরীর ভাল থাকে। এই প্রবন্ধে যে ভাবে চলিবার উপদেশ দিতেছি বোধ হয় এই ভাবে চলিলেই শরীর সুস্থ থাকিতে পারে। দীর্ঘজীবন লাভ করা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তবে মানুষের চেষ্টায় এতটুকু হইতে পারে যে আকস্মিক বিপৎপাতে জীবন নষ্ট না হইলে সুস্থ শরীর থাকিলেই জীবন দীর্ঘ হইতে পারে। সেকালে ব্যায়াম বলিয়া ব্রাহ্মণেরা কিছু জানিতেন না, করিতেন না, অথচ শতায়ু লোকের সংখ্যারও কম ছিল না। এখন বিবেচ্য শরীর বলবান করা দরকার না খালি সুস্থ থাকিলেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে, ধনী বা যশস্বী হইতে হইবে, যাহাদের ধন মান মস্তিষ্ক পরিচালনার দ্বারা উপার্জ্জন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে, দৈহিক বলের দ্বারা নহে, তাঁহাদের কি কেবল সুস্থ শরীর থাকিলেই চলিবে না। তাঁহাদের দৈহিক যাহা পাশব বা আসুরিক বল বলিলে অন্যায় হয় না, সে বলের প্রয়োজন কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য M. A., B. L.

গৃহীর ধর্ম্ম

(দ্বিতীয়াংশ)

২৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌ভাগবত গৃহস্থের কর্ত্তব্যাদি নিরূপণ করিয়া কহিয়াছেন—"হে রাজন্ ভগদ্‌ভক্ত ব্যক্তি উপরি উক্ত ও অন্যান্য বেদবিহিত কার্য্য সাধন পূর্ব্বক গৃহাশ্রমে থাকিয়া ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন।"

এখন আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি কোথাও হতাদর প্রদর্শিত হয় নাই, বরং সর্ব্বত্রই তাহাকে আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে এই গৃহস্থাশ্রম যে এখনকার গৃহস্থাশ্রম নহে তাহাও সত্য। যে গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা শাস্ত্রে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহার আদর্শ অতি উচ্চ, অতি মহান্, অতি পবিত্র। আমাদের মত হীনপ্রাণ গৃহস্থ সে আদর্শ হৃদয়ে ধারণাও করিতে পারে না। সে আদর্শ কর্ম্ম-মূলক হইলেও তাহা নিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগদ্বারা পরিশুদ্ধ ও সংযম কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সর্ব্বোপরি সেই পবিত্র আদর্শ ভগবৎ চিন্তার ও ভগবদ্‌ভক্তির সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ। স্বার্থ ত্যাগ ও গৃহস্থধর্ম্ম পরিপালনের সময়েই পার্থিব বিষয়ের নশ্বরতা বোধের সহিত ইন্দ্রিয় ভোগ সুখের অসারতা উপলব্ধি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূলমন্ত্রস্বরূপ ছিল। এবম্বিধ গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মকে ভগবান্ মনু তপস্যা নাম দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইলে অথবা ইন্দ্রিয়গণ সুসংযত না থাকিলে এই পবিত্র গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা যায় না। এই আশ্রমের মহৎ কর্ত্তব্য সমুদয় পঞ্চ যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং তাহাদের লক্ষ্য সমগ্র বিশ্ববাসী প্রাণীর তৃপ্তিসাধন কেবল আত্মপরিতৃপ্তি মাত্র নহে। কেবল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিলেই গৃহী হয় না—গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তবে তাহাকে গৃহী বলা যায়। ভোগের প্রতি অত্যাসক্তি আজকাল গৃহীর স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, তখন ছিল ঠিক তাহার বিপরীত। মহাত্মা মনুর কঠিন অনুশাসন এই যে যখনই দেখিবে যে চিত্ত কোন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুতে অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িতেছে তখনই মনের বলে চিত্তকে সেই ভোগ্য বস্তু হইতে প্রত্যাহৃত করিতে যত্ন করিবে। গৃহীর এই উচ্চ আদর্শ সত্ত্বেও কি বলিতে হইবে যে আর্য্যধর্ম্মে গৃহীর মুক্তি হইতে পারে না, এবং ঈশ্বরচিন্তার জন্য মনুষ্যকে বনে যাইতেই হইবে, ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের উপদেশ ?

সকলেই জানেন যে কলিকালের জন্য আগমশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে; বৈদিক ক্রিয়াদিতে কলিকালের জীবের অধিকার নাই। এখন এই তন্ত্রশাস্ত্র মতেই ভারতবর্ষে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সাধনা সাধিত হইয়া থাকে। ইহা সকলেই জানেন যে এই তন্ত্রশাস্ত্র মতে গুরুর কাছে দীক্ষা

ভিন্ন ধর্ম্মসাধন হইতেই পারে না। এই গুরু-করণই হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন বিশেষত্ব। আমাদের এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক কি না সে বিষয়ের বিচার করা অনাবশ্যক; কারণ তাহা এতৎ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বহির্ভূত, অতএব এস্থলে অবান্তর স্বরূপ হইবে। আমাদের এ স্থলে দেখিতে হইবে, তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহস্থ সম্বন্ধে মতামত কি। বলা বাহুল্য যে তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যান্য শাস্ত্রেরই মত, সন্ন্যাসাশ্রম নিষেধ করেন না, কিন্তু সন্ন্যাসই যে ধর্ম্ম সাধনের একমাত্র উপায় তাহাও বলেন না। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে সদ্‌গুরুর কাছে সাধন শিক্ষাই চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, এবং গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে এই সকল সাধন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রে গুরুকে মনুষ্যরূপে ভাবনা করা নিষিদ্ধ; তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মত দেখিতে হইবে। এমন যে গুরু—তিনি কি সন্ন্যাসী ভিন্ন গৃহী হইতে পারেন না? না তাহা নহে, অধিকারীতত্ত্বজ্ঞ আর্য্য শাস্ত্রে অধিকারিভেদে সকল প্রকার সুব্যবস্থাই করিয়াছেন। কুলচূড়ামণি তন্ত্রে কথিত হইয়াছে ঃ—

"উদাসীনো উদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনাম্।
যতিনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥"

অর্থাৎ উদাসীনের গুরু উদাসী, বনবাসীর গুরু বনবাসী, যতিদিগের গুরু যতি এবং গৃহস্থের গুরু গৃহস্থ।

কুলার্ণব তন্ত্রেও গুরু কে হইবেন তাহা বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥"
অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা গৃহস্থ গুরুপদ বাচ্য হ'ন।

অন্যত্র (কল্পাখ্য তন্ত্রে)—
"কলত্রপুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
দৈবে পিত্রেহরিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকোভবেৎ॥"

স্ত্রীপুত্রবান্ দয়ালু ও সকলের প্রিয় ব্রাহ্মণ গৃহস্থ দৈব, পৈত্র ও শত্রু মিত্র সম্বন্ধীয় দেবাদি কার্য্যে গুরু হইবেন। কুলচূড়ামণি তন্ত্রে আরও পাওয়া যায় যে পিতা মাতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মীয় তন্ত্র শাস্ত্রে উপদেশ করিবেন তিনিই গুরু।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে তন্ত্র শাস্ত্রই কলির শাস্ত্র, এক্ষণে আর শ্রৌত স্মার্ত্ত বা পৌরাণিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না, এখন সকল সাধককেই তন্ত্রশাস্ত্র মতে সাধনা বা দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। অতএব তন্ত্র শাস্ত্রের প্রামাণিকতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাস্ত্র মতে স্ত্রী শূদ্র সকলেই দীক্ষা পাইতে পারে তবে মন্ত্রে বিশেষ আছে মাত্র। এই শাস্ত্র মতে গুরু ও শিষ্য উভয়েই গৃহী হইতে পারেন।

অতএব এখন আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে ঘরে বসিয়াও যে ধর্ম্ম হয় তাহা ব্রহ্মধর্ম্মের দ্বারা প্রথম প্রচারিত হয় নাই ইহা আর্য্যশাস্ত্র বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। যিনি যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতিও হিন্দুশাস্ত্রে বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, এবং সন্ন্যাসাশ্রম মহিমান্বিত বলিয়া বিবেচিত হয় ইহাও সত্য, কারণ হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শই ত্যাগ ও আত্মসংযম, কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের প্রতি কুত্রাপি অনাদর প্রকাশিত হয় নাই, এবং এই আশ্রমেই যে সিদ্ধি ও মুক্তিলাভ হইতে পারে তাহা বারবার বলা হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত ও দেখ ত্রেতাযুগাবতার শ্রীশ্রীরামচন্দ্র গৃহী; তাঁহার অংশ স্বরূপ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন তিন জনেই গৃহী। হিন্দু শাস্ত্র মতে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" তিনিও গৃহী; তাঁহার মুখকমল বিনিঃসৃত গীতামৃত পানাধিকারী শিষ্য ধনঞ্জয়ও গৃহী। যিনি ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ভগবান্কে আত্মসংযম ও সত্যনিষ্ঠার বলে আপন আত্মীয় করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ, ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা যুধিষ্ঠির গৃহী। অন্যে পরে কা কথা, যিনি দেবাদিদেব মহাদেব জগতে লোকশিক্ষার্থ তিনিও গিরিরাজ সুতান্বিত-বামতনুগৃহী। অনেকে হয় তো বলিবেন যে এ সকল কাল্পনিক উপন্যাস ও আদর্শ, সত্যের রাজ্যে দৃষ্টান্ত অন্যরূপ। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী, শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসী, চৈতন্য সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, ত্রৈলঙ্গী স্বামী সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ ইঁহারাও সন্ন্যাসী। গৃহস্থ সাধক কৈ?

সত্য বটে ইঁহারা সন্ন্যাসী, লোকশিক্ষকদিগকে অনেক সময় সংসার ত্যাগ করিতে হয়, ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে চলে না, কারণ তাহা না হইলে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হয় না। কিন্তু এক শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কেহই উপদেশ দেন নাই। পুরাকালের মুনি ঋষিরা কাননবাসী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন। বুদ্ধদেবের পর হইতে ভারতবর্ষে যথার্থ সন্ন্যাস সৃষ্ট হইয়াছে—সেই গুহাবাসী শ্রমণদিগের ধর্ম্ম দেশ হইতে দূর করিবার জন্য শিবাবতার ভগবান শঙ্করের জন্ম, তিনি আবাল্য সন্ন্যাসী। তাঁহাকে বিকৃত সন্ন্যাস প্লাবিত ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিতে হইয়াছিল, তাহা কি তিনি ঘরে বসিয়া সংসার করিতে করিতে, সাধন করিতে পারিতেন? তিনি কেবল ধর্ম্মসংস্কার করেন নাই - সন্ন্যাসাশ্রমেরও সংস্কার করিয়াছিলেন; সেই আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে ও করিতে হইয়াছিল। একদিকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের কুৎসিৎ আচার অন্যদিকে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডরত আর্য্যধর্ম্মীদের সংসারাসক্তি এই দুই সমূহ অনিষ্ট হইতে দেশ উদ্ধার করিবার তাঁহার ভার ছিল, অতএব তাঁহার সংসারে জড়াইয়া পড়া চলিত না। আর্য্যধর্ম্মের বৈরাগ্যের আদর্শ উদ্ধার করিবার ভার লইয়া তিনি বহির্গত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে জীবশিক্ষার জন্য বলিতে হইয়াছে—"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।" কিন্তু এই আজন্ম সন্ন্যাসীও জননীর স্নেহ ও জননীর দাবী বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। লোকশিক্ষার্থ তাঁহাকে সংসারের কোলাহলের মধ্যেই ঘুরিতে হইয়াছিল। এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া তিনি আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষে আত্মচেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। তাঁহাকেও একদিকে মুসলমান রাজের বিলাস শিক্ষানুপ্রাণিত অপর দিকে আদর্শ-ভ্রষ্ট ক্ষমতালোলুপ তান্ত্রিক ক্রিয়াসক্ত হিন্দুসন্তানগণকে ভগবৎ পথের পথিক করিতে হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া থাকিলে কি এই মহৎ কার্য্য তাঁহার দ্বারা সাধিত হইত? ইহাও দ্রষ্টব্য যে তিনিও শচী মাতার দাবী অবহেলা করিতে পারেন নাই, এবং তিনি ভক্তির উপদেশ দিয়াছিলেন সংসার ত্যাগের নহে

বরঞ্চ তিনি আজন্ম বিরক্ত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে গৃহধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গৃহস্থাশ্রমী করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান—অদ্বৈত গোস্বামী—তিনি গৃহী এবং পরবর্ত্তী আরও অনেক বৈষ্ণব মহাপুরুষ গৃহী ছিলেন তাহাও অবিদিত নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ; শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তপ্রবর ও সাধকোত্তম শ্রীরামানন্দ রায় গৃহী।

পরবর্ত্তী কালেও অনেক গৃহী সাধকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। ভগবান্ সার আর সব অসার এই তত্ত্বটুকু হৃদয়ে ধারণা করিয়া ভগবৎচিন্তা পরায়ণ ও তাঁহাতে একান্ত নির্ভরশীল হইয়া জগতের সকল কর্ম্ম করিয়া যাও, তুমি গৃহী হইলেও মুক্তি বল আর স্বর্গ বল, তোমার হস্তামলকবৎ সুখপ্রাপ্য হইবে, ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব ভারতবর্ষে ভক্ত গৃহীর অভাব নাই। ইদানীন্তন কালেও সেই আদর্শ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, এখনও ভক্ত গৃহী অনেক রহিয়াছেন। যে সকল সন্ন্যাসীর কথা বলিলাম তাঁহারাও গৃহীদের মঙ্গলের জন্য ত্যাগী; আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য—সন্ন্যাসী। একবার রামকৃষ্ণদেবের কথা ভাবিয়া দেখ দেখি। রামকৃষ্ণের ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলেন; আমরা যুগাবতার মানি, এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে সময়ে যে তাঁহার মত জ্ঞান ভক্তি সমন্বয়কারী আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযমের আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার শিক্ষাও এইরূপ সমন্বয়ময় ছিল। তিনি এই জন্য প্রায়ই জনকরাজার দৃষ্টান্ত দিতেন এবং বলিতেন "জ্ঞানী সংসারীরা গাছের নীচের ফল ও উপরের ফল দুই খেতে পারে।" তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী ছিলেন সংসারে অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিজয় ঘোষণা করিবার জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও ধর্ম্মপত্নীকে কাছে রাখিয়াছিলেন; রাখিয়া শিখাইয়াছিলেন যে পত্নী সহধর্ম্মিণী, কামিনী মাত্র নহেন। তিনি কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করেন নাই। ইঁহার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া কত গৃহী গৃহীত্বের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া জীবন চরিতার্থ করিয়াছেন, কত বিষয়া বিষয়স্পৃহা বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মার্থ গৃহধর্ম্ম পালন করিতে শিখিয়াছেন, কত সহস্র লোক ভগবান্‌কে "বকলম" দিয়া সংসার ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত ভাবে বিচরণ করিতে শিখিয়াছেন।

সংসারে যত গোল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লইয়া। লোকে যখন প্রবৃত্তির ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া সুখের জন্য লালায়িত হইয়া ফেরে, তখন তাহাদের "আমার আমার" চিন্তাতে সময় অতিবাহিত হয়, সুখ পায় না, যখন আবার নিবৃত্তির ধর্ম্মে মন নিবিষ্ট হয় তখন বুঝিতে পারে যে, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যতদিন হা হুতাশ করিয়াছে ততদিন কেন সুখের সন্ধান পায় নাই। যতদিন নিজের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় লোকে ততদিন যথার্থ সুখ উপভোগ

করিতে পারে না, যখন নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিতে শেখে তখনই যথার্থ সুখের আস্বাদ পায়। অর্থগৃধ্নু, স্থূলভক্ত ইউরোপখণ্ডেও অনেক মনীষী এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, জীবনের লক্ষ্য যে স্বার্থপরতা নহে তাহা তাঁহারাও অনুভব করিয়াছেন। মহামতি মিল বলিয়াছেন ;—

"Those only are happy (I thought) who have their minds fixed on some object other than their own happiness; on the happiness of others, on the improvement of mankind, even on some art in pursuit followed not as a means, but as itself an ideal end. Aiming thus at something else, they find happiness by the way."

AUTOBIOGRAPHY, P. 81.

"জগতে তাহারাই সুখী যাহারা নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখে এবং তদিতর অন্য বিষয়ে যথা পরের সুখ, জগতের উন্নতি এমন কি কোন শিল্প কলা বা কার্য্য যদি উপায় স্বরূপ না হইয়া আদর্শরূপে গৃহীত হয় এই সকলের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখে। এই রূপে সুখকে না খুঁজিয়া, অন্য কিছুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহারা গৌণভাবে সুখ পাইয়া থাকে।"

ইহাই ভারতবর্ষের গৃহীত্বের আদর্শ। নিস্পৃহ হইয়া গৃহধর্ম্ম আচরণ কর, বৈরাগ্য সঞ্চয় করিয়া গৃহী থাক, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া গৃহে বাস কর—কর্ত্তব্য পালনার্থ—ভোগ করিবার জন্যই নহে—অর্থ সঞ্চয় কর, দানের জন্য কেবল উদর পূরণ ও নিজের অপরিমিত ভোগের জন্য নহে

সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"

তারপর ভগবানের চরণে আত্ম সমর্পণ কর। সংসারে থাকিয়াই এ সব হইতে পারে ; তাই রামকৃষ্ণ বলিতেন—"তোমাদের (গৃহীদের) সব ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় ;—কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে—সব মনটা তার ডিম যেখানে সেই খানে পড়ে থাকে।"

বোধ হয় এতক্ষণ আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি যে হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম সাধনার্থ বনবাস করিতেই হইবে, এমন উপদেশ কোথাও নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মে গৃহীর জন্য যে নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে সেই নিয়ম যদি গৃহীরা পালন করিতে পারে তাহা হইলে সংসার স্বর্গে পরিণত হইবে—অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি বিরাজিত হইবে। বড় দুঃখের বিষয় আমরা ক্রমশঃ সেই আদর্শ হইতে এত দূরে গিয়া পড়িয়াছি যে এখন আমাদিগের হিন্দু গৃহস্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়াই বিড়ম্বনা ; শুধু তাহাই নহে এখন যদি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু গৃহস্থের সম্বন্ধে কোনও বিপরীত মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমাদিগকে নিজেদের চিনিবার জন্য কষ্ট পাইতে হয় নতুবা অজ্ঞতার গভীরতা বশতঃ সেই মতকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া লজ্জিত হইতে হয়।

তাই আমাদের পুরাতন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এবং তদুদ্দেশ্যে পুরাতন শাস্ত্রাদি অন্বেষণ করিয়া দেশ কাল

পাত্র বিচারে যতদূর সম্ভব সেই আদর্শানুসারে জীবন গঠিত করিয়া লওয়ারও আবশ্যক হইয়াছে। হিন্দু গৃহস্থকে যে কোনও বিষয়ে কোনও অংশেই জগতের সমক্ষে নত শির হইতে হয় না তাহা দেখান সেই আদর্শ পুনঃ স্থাপনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় সেই চিন্তা প্রণোদিত হইয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ গ্রথিত করিলাম; এতদ্বারা কাহারও যদি অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই এই অসমর্থ লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

সম্পূর্ণ।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু, M. A., B. L.

তুমি থেকো নিত্য দূরে।

তুমি থেকো নিত্য দূরে,
যেন নিত্য নব আশার আলোকে
নবীন উদ্যমে নবীন পুলকে,
যেতে পারি আগুসারে।
তুমি থেকো নিত্য দূরে।

পিপাসিত-জনে চির-আকাঙ্খিত,
জীবন-মরুর মরীচিকা মত,
রহিও অলভ পড়ে'।
তুমি থেকো নিত্য দূরে।

তুমি তমসা-ঘোরে ভ্রান্ত-পথিকে,
সে দীপ্ত ময়ুখ আলেয়া আলোক,
নিয়ে চল ধীরে ধীরে
তুমি থেকো নিত্য দূরে।

তুমি মাধবী-রাতে পাপিয়া-তান,
তুমি সে মধুমাসে মধুপ-গান,
বিমোহিয়ে থেকো মোরে
তুমি থেকো নিত্য দূরে।

(তুমি) শরতের শশি নির্ম্মল আকাশে,
মৃদু মৃদু হাসে কার অভিলাষে,
ধায় তারি পানে কতই প্রয়াসে—
যেমতি ফুল্ল চকোরে।
তুমি থেকো নিত্য দূরে।

(তুমি) সন্ধ্যার নির্ম্মল ফলটির মত
নিমেষে উঠিও ফুটিয়া,
মলয়ের মত মম পরশনে
আবার পড়িও ঢুলিয়া;
নিশা—অবসানে শিশিরের মত
ছাইও হৃদয় ব্যাপিয়া,
ক্ষণেকের তরে তৃপ্তিদানে
আবার যাইও মুছিয়া;
পাই পাই যেন—পাই না তোমায়
যেও গো কিছু সরিয়া,
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রাখিয়া
তোমাতে লইও টানিয়া।

তুমি সুদূরের পাখী, বহুদূর-বাসী,
আমি দূর-অভিলাষী, সুদূর-প্রয়াসী,
ধাইব সতত তো'রে।
তুমি থেকো নিত্য দূরে॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরকায়া প্রবেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গো-গুহা।

বহু শতাব্দি পূর্ব্বে হিমালয় প্রদেশের কোন নিভৃত স্থানে অতি রমণীয় সুবৃহৎ একটি হ্রদ ছিল। ইহার তিন দিক্ সুদৃশ্য উচ্চনীচ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত, এবং অপর দিকে একটি সুবিস্তীর্ণ দুর্ব্বাদল-সমন্বিত মনমুগ্ধকর সমতল প্রান্তরভূমি থাকায়, সেই স্থানটি তৎকালে এত রমণীয় হইয়াছিল যে, স্বভাবের সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশি যেন তথায় কেহ ঢলিয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হইত। এই হ্রদের পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত মালায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গুহা ছিল। এই গুহাগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দেখিতে অতি সুন্দর। দেখিলে মনে হয় যেন প্রত্যহ কেহ আসিয়া পরিষ্কার করিয়া যায়। বহুতর ভদ্রসন্তান সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে নিত্য তথায় গমন করিতেন, এবং তত্রস্থ সুনির্ম্মল স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনান্তর প্রফুল্লমনে সেই গুহা মধ্যে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম ও পরস্পর নানাবিধ বাক্যালাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন।

হ্রদটি নানাবিধ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মৎস্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। মৎস্য-ব্যবসায়ীদিগের ইহা একটি অতি প্রিয় স্থান ছিল। নিকটবর্ত্তী পল্লিসমূহের বহুতর মৎস্য-ব্যবসায়ীগণ নিত্য এই হ্রদে মৎস্য-আহরণ করিয়া সচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। মৎস্য-শিকার-প্রিয় বহুদূর হইতে তথায় আগমন করিয়া, নানাবিধ মৎস্য শিকার পূর্ব্বক পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি দৈবদুর্ব্বিপাক সময়ে সেই গুহাগুলিই তাঁহাদের আশ্রয় স্থান হইত। আবার গোচারণের উপযোগী সুবিস্তৃত প্রান্তরভূমি থাকায় নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের রাখালগণ নিত্য তথায় গোচারণ করিতে যাইত। মধ্যাহ্নকালে যখন গাভীগণ উদরপূর্ত্তি করিয়া বিশ্রাম করিত, তখন রাখাল বালকগণ সেই সমস্ত গুহামধ্যে যাইয়া বিশ্রাম ও নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি করিয়া সময়ক্ষেপ করিত। ঝড় বৃষ্টির সময়ও সেই গুহাগুলিই তাহাদের ও গোগণের একমাত্র আশ্রয় স্থল ছিল; এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই এই স্থানকে লোকে 'গো-গুহা' বলিত।

'গো-গুহা' হ্রদটি অতি দীর্ঘায়তন এবং ইহার মধ্যে দুই তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপগুলিও এক একটি ক্ষুদ্র জলমগ্ন পর্ব্বত শিখর বলিয়া বোধ হয়। দ্বীপগুলি প্রায় জঙ্গলময় এবং তাহাতে লোকের গতায়াত বড় ছিল না। তাহারই একটি দ্বীপের মধ্যে, একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুঠিরে একটি লোক বাস করিত। চারিদিকেই জঙ্গল-বেষ্টিত থাকায় ঘরখানি বাহির হইতে দেখা যাইত না, এবং অনেকেই এই ঘরের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অবগত ছিলেন না। এই হ্রদমধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা থাকিত। কতকগুলি মৎস্যব্যবসায়ীগণের মাছমারিবার এবং অপরগুলি ধনিসন্তানগণের জলবিহার

করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। জলবিহার-কারী ধনিসন্তানগণের নৌকাগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুগঠিত, এবং প্রত্যেকখানির অঙ্গে তাহাদের স্ব স্ব মালিকগণ প্রদত্ত নাম অঙ্কিত থাকায় নৌকার মালিকত্ব সম্বন্ধে কোন বিবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

জলবিহারী ভদ্রলোক বা মৎস্য-ব্যবসায়ী-গণের ক্ষুদ্র নৌকাগুলি ঝড়তুফানে বা অন্য কোন কারণে বিপদগ্রস্ত হইয়া কখন সেই দ্বীপে গিয়া লাগিলে, কদাচিত কেহ সেই কুটীরবাসী লোকটিকে দেখিতে পাইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র ও ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া কেহই তাঁহার নিকটস্থ হইতে বা তাঁহার সহিত কোন কথা কহিতে সাহস করিতেন না, পরন্তু ভীত হইয়া সত্বর তথা হইতে পালায়ন করিবার উপায় দেখিতেন।

উক্ত 'গো-গুহা' হ্রদের প্রায় এক ক্রোশ দূরে কোন একটি পল্লিতে, ব্যবসা উপলক্ষে আমাকে বহুদিন বাস করিতে হইয়াছিল। তথায় বাস কালে আমিও কখন কখন সেই হ্রদে মৎস্য শিকার করিতে যাইতাম। মৎস্য শিকার করিবার আমার অত্যন্ত সখ ছিল। আমার একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সেই হ্রদে থাকিত এবং সেই নৌকায় চড়িয়া আমি জলবিহার ও সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য-শিকার দুই কার্য্যই করিতাম। আমার ক্ষুদ্র নৌকা-খানির নাম ছিল "রোজেনা"।

আমি যে পল্লিতে বাস করিতাম, সেই পল্লিরই কোন একজন অনুসন্ধিৎসু মৎস্য-ব্যবসায়ীর নিকট উক্ত কিম্ভূতকিমাকার লোকটির কথা আমি শুনিয়াছিলাম। এই মৎস্য-ব্যবসায়ী বড় চতুর ও বুদ্ধিমান লোক ছিল, সে অনেক অনুসন্ধানের পর সেই লোকটির নাম ও কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল। তাহারই নিকট আমি শুনিয়া ছিলাম যে তাঁহার নাম 'রহমন' এবং তিনি পূর্ব্বে কোন জাহাজের একজন নাবিক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর কেহই তাহার কোন সন্ধান জানিত না, এবং আমিও এ পর্য্যন্ত কখন তাঁহার নিকট যাইতে বা তাঁহার বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিতে কোনরূপ চেষ্টা করি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(এ ব্যক্তি কে?)

একদিন অপরাহ্নে আমি সেই হ্রদে মৎস্য শীকার করিতে যাই। অনেকগুলি মৎস্য মারিয়াছি—মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছে—এমন সময় হঠাৎ আকাশে একখানি কাল মেঘ দেখা গেল। সেদিন আমার সঙ্গে আর কেহ ছিল না—সেদিন আমি একাকীই গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া কিনারায় আসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হঠাৎ এত প্রবল বেগে ঝড় উঠিল যে আমি আর নৌকার গতি সাম্‌লাইতে পারিলাম না—ঝড়ের ভীষণ বেগে নৌকাখানি, যে দ্বীপে সেই অদ্ভুত লোকটি বাস করিত, সেই দ্বীপে যাইয়া লাগিল। আমি প্রাণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ এক লাফে নৌকা হইতে অবতরণ

করিলাম, এবং নৌকাখানি গাছের গোড়ায় বেশ করিয়া বাঁধিয়া, গাছের আড়ে দাঁড়াইয়া ঝড়ের অবসানের জন্য সেই নির্জ্জন দ্বীপে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল, ঝড় ক্রমশঃ থামিয়া আসিল, আকাশও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা জলও হইয়া গিয়াছে। আমার পরিধান বস্ত্রাদি সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নৌকার নিকটে গেলাম, দেখিলাম ক্ষুদ্র নৌকা খানি বর্ষার জলে ভরিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আর কিছুক্ষণ বর্ষা না থামিলে, জলের ভারে নৌকা খানি ডুবিয়া যাইত। আমি অতি সন্তর্পণে নৌকার উপর উঠিয়া, মাছগুলি ঠিক্ করিয়া রাখিয়া, আস্তে আস্তে জল ছেঁচিতে আরম্ভ করিলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। আমি নৌকার জল ছেঁচিতেছি আর এক একবার স্বভাব সুন্দরীর সন্ধ্যাকালীন মনোমুগ্ধকর শোভা দর্শন করিয়া মনে কি এক অলৌকিক সুখ অনুভব করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার কানে একটা বিড়ালের কাতরতাব্যঞ্জক 'মেউ মেউ' ধ্বনি আসিল,—বোধ হইল যেন বিড়ালটি নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া অতি কাতরস্বরে—তাহার স্বাভাবিক 'মেউ-মেউ' বুলিতে কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। যে দিক্ হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেই দিকে তাকাইলাম কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন ছোট একখানি 'বোটে' (নৌকা বাহিবার ছোট দাঁড় বিশেষ) হাতে করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম এবং সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখি একটি প্রকাণ্ড কাল বিড়াল, একটি ভীষণ সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাতর স্বরে রোদন করিতেছে। বিড়ালটির আকার সাধারণ বিড়াল অপেক্ষা অনেক বড়, বর্ণ মিস্ কাল, চোখ দু'টি বড় বড়—যেন জ্বলিতেছে। সাপটা তাহার লেজের দ্বারা বিড়ালটিকে বেস্ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে ও ক্রমশঃ মোচড় দিয়া খুব দৃঢ় করিয়া কসিতেছে, আর বেচারা বিড়াল নড়ন-চড়ন-শক্তি রহিত হইয়া কেবল 'মেও' 'মেও' শব্দে চীৎকার করিতেছে।

আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত 'বোটের' দ্বারা সাপের মুখের দিকে অনবরত আঘাত করিতে লাগিলাম। কয়েকবার সজোরে আঘাত করার পর সাপটা মরিয়া গেল, তখন আমি হস্ত দ্বারা বিড়ালের দেহ সেই ভীষণ সর্প-বন্ধন মোচন করিয়া দিলাম।

আমি যখন অনন্যমনস্ক ভাবে এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সময় রহমনও তাঁহার প্রিয় বিড়ালের আর্ত্তনাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি সেই বিড়াল উদ্ধার কার্য্যে এত গাঢ় রূপে নিবিষ্ট ছিলাম, যে রহমনের তথায় আগমন আমি কিছু মাত্র জানিতে পারি নাই। রহমন স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আমার এই কার্য্য দেখিতেছিলেন। তিনি কতক্ষণ এই ভাবে ছিলেন তাহা জানি না। যখন আমার কার্য্য শেষ হইল, তখন

তিনি প্রথমে কথা কহিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আজ আমার বড়ই উপকার করিলেন। আমি এখানে আসা অবধি এই বিড়ালটি আমার নিকট আছে, আমি ইহাকে অতি যত্নের সহিত পালন করিয়া আসিতেছি, এবং পুত্রাপেক্ষাও ইহাকে অধিক স্নেহ করি। আমার যদি পুত্র থাকিত, আর যদি আপনি আমার সেই পুত্রের এইরূপে প্রাণরক্ষা করিতেন, তাহাতে আমি যতদূর সুখী হইতাম, আমার অতি প্রিয় এই বিড়ালটির প্রাণরক্ষা করায়, আমি তদপেক্ষাও অধিক সুখী ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। অতএব আপনি অদ্য হইতে আমার পরম বন্ধু হইলেন।

এই ঘটনার পূর্ব্বে রহমন কখনও কোন লোককে দেখিলে, তাহার সহিত আলাপ করিতেন না, অথবা করিলেও এমন অমানুষিক ভাবে করিতেন যে, কেহ আর তাঁহার অনুগমন করিতে সাহস করিত না। কিন্তু আজ তিনি আমার প্রতি সদয়—বিড়ালটিকে আমি সেই ভয়ঙ্কর বিষধরের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছি দেখিয়া তাঁহার সেই অতি কঠোর পাষাণময় হৃদয়ও গলিয়াছে। আজ তিনি আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া বিনীত ভাবে পুনরায় বলিলেন,—"মহাশয়, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, অতএব আপনি আজ আর বাসায় ফিরিয়া না যাইয়া, আসুন আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।"—আমিও কাতর; কৌতুহল চরিতার্থ জন্য ও কতক ঝড় বৃষ্টিতে ভিজিয়া এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের আশায় তাঁহার প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ সম্মত হইলাম বটে, কিন্তু তথায় রাত্রিবাস করিতে সম্মত হইলাম না।

আমরা দু'জনে নির্জ্জন দ্বীপের জঙ্গল ভেদ করিয়া রহমানের কুটীরাভিমুখে চলিলাম, বিড়ালটিও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিয়দ্দূর যাইয়াই একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘর দেখিতে পাইলাম। রহমন বলিলেন, "এই আমার কুটীর"। আমরা উভয়ে সেই কুটীরে প্রবেশ করিলাম। বৃদ্ধ রহমন একটি ছোট রকম টুল (কাষ্ঠাসন) আনিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি সেই টুল খানির উপর বসিয়া, ঘর খানির এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম, রহমন আমার সম্মুখে আর একখানি অর্দ্ধভগ্ন টুল বা চৌকির উপর সেই বিড়ালটিকে কোলে করিয়া বসিলেন। ঘর খানি অতি ক্ষুদ্র, একজন লোক কোন প্রকারে তাহাতে বাস করিতে পারে মাত্র। চারি দিকে কাঠ দিয়া ঘেরা, উপরেও কাঠের আবরণ। কিন্তু ঘর খানি এরূপ কৌশলে গঠিত যে ঝড় বৃষ্টিতে হঠাৎ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। আস্‌বাব্ বিশেষ কিছুই নাই, কেবল দুইখানি অর্দ্ধভগ্ন কাষ্ঠাশন ও একটি মৃগছালের শয্যা পড়িয়া আছে মাত্র। এতদ্ব্যতীত শিকারোপযোগী দুই একখানি অস্ত্র সেই কাঠের দেওয়ালে টাঙ্গান আছে দেখিলাম।

রহমনের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিও তাঁহার সেই নিভৃত বাসস্থান দেখিয়া আমার মনটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। হটাৎ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া তথায় রাত্রে বাস করিতে কোন

মতেই আমার সাহস হইল না। দ্রুত পদে, যে খানে আমার নৌকাখানি বাঁধা ছিল, সেই দিকে চলিলাম। সত্বর নৌকা খুলিয়া, রহমনের কথা ও সেদিনকার ব্যাপারগুলি ভাবিতে ভাবিতে হ্রদ পার হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সেই দিন হইতেই রহমনের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাঁহার কুটীরে যাইতাম, এবং তিনিও আমাকে পাইলে যেন পরম চরিতার্থতা লাভ করিতেন। যতক্ষণ আমি তথায় থাকিতাম, নানা প্রকার গল্পগুজবে সময় কাটিত, আবার কখন বা দু'জনে শিকার করিতেও যাইতাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে আমি সাহস করি নাই বা তিনিও সেরূপ কোন আলাপ করেন নাই।

এইরূপে যতই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার হাব ভাব—কথাবার্ত্তা—ভাবভঙ্গি ইত্যাদি দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই ইঁহার জীবনের সহিত কোন না কোন একটি অদ্ভুত রহস্য ব্যাপার সংশ্লিষ্ট আছে, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তির জীবন একটি অদ্ভুত ঘটনাবলীর আবরণে আবৃত আছে, নতুবা ইনি নিজের পরিচয় কাহাকেও দেন না কেন? এ ব্যক্তি কে?—মনে মনে স্থির করিলাম, যে উপায়েই হউক ইঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় ও তাঁহারই কৃপায় শীঘ্রই সে সুযোগও উপস্থিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

পর্য্যটকের পত্র।

(২২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

হরিদ্বারে মাঘ মাসের হাড়ভাঙ্গা শীত। গাত্রবস্ত্রের মধ্যে সম্বল একখানা আলোয়ান ও একটা সাধারণ কম্বল। শীতটা কিরূপ অনুভব করিতে লাগিলাম পাঠক পাঠিকাবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। কোনরূপে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম, অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইল, শৌচের জন্য বাহিরে যাইব মনে করিতেছি এমন সময়ে সোনার বলিল, "এত প্রত্যুষে বাহির হইবেন না। বাহিরে কন্‌কনে বাতাস বহিতেছে। ঠাণ্ডায় একবারে জমিয়া যাইবেন। এখানকার লোকেরা সাতটা বেলার পূর্ব্বে কেহ শয্যাত্যাগ করে না।" সোনারের কথায় নিরস্ত হইলাম। প্রাতঃকাল হইয়াছে অথচ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিতে পারিতেছি না। বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। কি করিব উপায়ান্তর না দেখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। সাতটা বাজিয়া গেল অথচ সূর্য্যদেবের দেখা নাই, এখানকার গতিকই এইরূপ। শুনিলাম বেলা আটটার পূর্ব্বে তপনদেবের সহিত ভালরূপ পরিচয় হয় না। যাহা হউক সোনার শৌচে বাহির হইল আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। শৌচাদি শেষ করিয়া আসা গেল। সোনার একা ভাড়া করিল। দুই জনে এক্কা করিয়া কন্‌খল্ অভিমুখে চলিলাম। রাস্তার দুইধার দেখিতে দেখিতে চলিলাম, রাস্তার

দক্ষিণধারে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের হাতা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ক্রমে আমরা কন্‌খলের বাজারে আসিয়া পৌঁছিলাম। সোনার একটা সেক্‌রার দোকানের নিকট এক্কা থামাইল। এই দোকানই সোনারের পূর্ব্বকথিত বন্ধুর দোকান। সোনার জিনিস পত্র নামাইল আমাকেও নামিতে বলিল। সোনারের বন্ধু সাধু দেখিয়া "নমো নারায়ণায়" অভিবাদন করিল। (পঞ্জাব অঞ্চলে গৈরিক-বেশধারী পরমহংস সাধুদিগকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করা হয়, আমাদের দেশের ন্যায় পদধুলি লওয়ার রীতি প্রচলিত নাই। তবে যে একবারেই লওয়া হয় না এরূপ নহে) সোনার তাহার বন্ধুর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিল। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে কুশল প্রশ্ন হইতে লাগিল, বন্ধুবর অবিলম্বে স্থুলফার আয়োজন করিয়া উহার সদ্ব্যবহারের জন্য প্রথমেই আমাকে দিতে আসিল, উক্ত দ্রব্যের সহিত আমার মোটেই পরিচয় নাই জানিয়া কিছু বিস্মিত হইল সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি ভক্তিরও বোধ হয় হ্রাস হইল। এখানে আর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে বিরক্তি বোধ হইল সুতরাং ইহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম ইহারা সম্ভবতঃ মনে করিল আমি সাধুদিগের সহিত মিলিত হইতে চলিলাম। আমি কিন্তু সাধুদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কি রূপে তাহাদের সহিত মিশিব? কোথায় যাইব? কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অবশ্য সাধারণ তথা-কথিত সাধুদিগের সহিত মেশামেশি করিতে প্রবৃত্তিও নাই যে টুকু না মিশিলে নয় সেই টুকুই তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। যে রাস্তায় ষ্টেসন হইতে আসিয়াছি সেই রাস্তা দিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গন্তব্যস্থান ঠিক নাই। মা যে দিকে লইয়া যান সেই দিকেই চলিতেছি। কিছুদূর গিয়া রাস্তার ধারে একটা খুব উচুঁ প্রাচীরওয়ালা পুরাতন মন্দির দেখিতে পাইলাম। একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম এই খানেই দক্ষ, শিবরহিত যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। পৌরাণিক স্থান দেখিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের মধ্যে বৃহৎ একটা বট গাছ আছে, নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা। মন্দিরে নারায়ণের মূর্ত্তি আছে ইহাঁর নিত্য পূজার বন্দোবস্তও আছে। এখানে দুই তিন জন বৈষ্ণব সাধুকে দেখিলাম। ধুনীর নিকটে বসিয়া ইহারা অগ্নির তাপগ্রহণ করিতেছেন অত্যধিক স্থুলফা সেবনে চক্ষুদ্বয় জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে, নেশায় বিভোর হইয়া আছেন—বাহিরের লোককে দেখাইতেছেন যেন তাহারা মহাধ্যানে নিমগ্ন। কাপড় চোপড় একটা স্থানে রাখিয়া মন্দিরটা ঘুরিয়া দেখিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে এখানকার লোকেরা বানরের ভয় দেখাইয়া যেখানে সেখানে কাপড় চোপড় রাখিতে নিষেধ করিল সুতরাং সঙ্গের ভার সঙ্গে লইয়াই ঘুরিতে লাগিলাম। লাঠিটা মাত্র সাধুদিগের নিকটে রাখিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমার যষ্টি হস্তপদ বিশিষ্ট জীবের ন্যায় সশরীরে অন্তর্ধান করিয়াছে। বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে সাধুমহাশয়েরাই বেতের যষ্টির লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শীঘ্রই আমার অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান

পাইলাম, ধূনীর নিকটেই এক কোনে বিরাজ করিতেছেন। সাধুদিগকে তাহাদিগের অযোগ্য ব্যবহারের জন্য যথোচিত তিরস্কার করিয়া এস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। কোথায় যাই এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না, প্রথমে মনে করিয়াছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনে যাইব না কিন্তু অন্য উপায় না দেখিয়া তথায় যাওয়ারই সংকল্প করিয়া পুনরায় ষ্টেসন অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। খানিকটা রাস্তা চলিয়াই গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। সেবাশ্রমের তিনটি পৃথক পৃথক অংশ আছে, এক অংশে ঔষধালয় এক অংশে রোগীদিগের থাকিবার স্থান, অন্য অংশে সন্ন্যাসীরা বাস করেন। সন্ন্যাসীদিগের জন্য পৃথক পৃথক গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে, একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি সাহেব সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। ইহাঁকে বেলুড় মঠে একবার দেখিয়াছিলাম। ইহাঁর জন্মভূমি আমেরিকায়, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রচারকালীন ইনি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা বিশেষ অর্থশালী ব্যক্তি। ইনি ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ভারতবর্ষে, প্রকৃত সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন; ধন্য ত্যাগ। আমেরিকান সন্ন্যাসীর গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আমাকে অভিবাদন করিলেন। এখানকার কর্ত্তা কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে ঔষধালয়ে স্বামী কল্যাণানন্দের নিকট দিয়া আসিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দই এখানকার কর্ত্তা, স্বামী কল্যাণানন্দের সহিত সামান্য কথাবার্ত্তা হইল, স্বামিজী এক্ষণে রোগীদের পরিদর্শনে ব্যস্ত। আমাকে তাঁহাদের আবাসে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই আমার সহিত আলাপ করিবেন। আমিও তাঁহার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিলাম। একজন বাঙ্গালি সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল কথায় কথায় জানিতে পারিলাম আমার একজন বিশেষ বন্ধুও এখানে বাস করিতেছেন। তিনি এক্ষণে রোগীদিগের সেবায় নিযুক্ত। ঔষধালয়ে বাহিরের রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। সুদূর বিদেশে, বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় বন্ধুর নাম শুনিলে মনের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিতে ছুটিলাম। বন্ধু সে সময়ে একটি রোগীর ক্ষতস্থান ধুইতেছিলেন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। অপরিচিত স্থানে কোথায় যাইব কি করিব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না এরূপ সময়ে বন্ধুটিকে দেখিয়া মনে কতদূর শান্তি লাভ করিলাম তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। বন্ধু তাঁহার কার্য্য করিতে লাগিলেন আমিও তাঁহার সহিত গল্প করিতে লাগিলাম। তাঁহার কাজ শেষ হইলে, উভয়ে কল্যাণানন্দের নিকট গিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া, আমরা স্নান করিয়া আসিলাম। যথা সময়ে আহার শেষ হইল। বন্ধুর গৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বৈকালে উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইলাম। গঙ্গার ধার দিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে চলিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম ও শান্তিপ্রদ বোধ হইতে লাগিল। অদূরে পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে। নিম্নে কলুষনাশিনী, নির্ম্মলসলিলা

গঙ্গার প্রবাহ মানব কোলাহলকে তুচ্ছ করিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতেছেন। জীবকে যেন অনিত্য ভোগ বাসনা জনিত দ্বন্দ্ব কোলাহল, উপেক্ষা করিয়া বাধা বিপত্তি সমূহ অতিক্রম পূর্ব্বক সেই সদানন্দময় হরির নিকট অগ্রসর হইতে স্বতঃই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কোথায় সেই কোলাহলপূর্ণা, স্বার্থ দ্বন্দ্বের আবাস ভূমি কলিকাতা মহানগরী, আর কোথায় এই জাহ্নবীজলবিধৌত অত্যুন্নত গিরিমালা শোভিত প্রকৃতির লীলানিকেতন পবিত্র তপোভূমি। আহা কি আশ্চর্য্য স্থানের মাহাত্ম্য! ক্ষনেকের জন্য শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেই যেন যাবতীয় শোকদুঃখ অপসৃত হইয়া হৃদয় এক অপূর্ব্ব পবিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, মনে হয় জীবনের কয়েকটা দিন লীলাময়ের নাম গান করিয়া এই স্থানে কাটাইয়া দিই। অনুক্ষণ জীবন সংগ্রামে মানব হৃদয়ের পবিত্র ভাবগুলি ক্রমে লুপ্ত হইবার উপক্রম হয় সে গুলি পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্যই মুনিঋষিগণ মধ্যে মধ্যে তীর্থপর্য্যটনের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

আমরা ধর্ম্মালাপে বহুদূর অতিক্রম করিয়া আসিলাম। রাস্তার স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী-দিগকে বিচরণ করিতে দেখিলাম। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা আশ্রমের দিকে ফিরিলাম, এবং বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী-কেও স্ব স্ব আশ্রমে ফিরিতে দেখি লাম। এইখানে বলিয়া রাখি, হরিদ্বার ও কনখলে বহু সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট আছে। অসংখ্য ছত্র হইতে নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ প্রস্তুত আহার্য্য বিতরিত হয়। ইহা ব্যতিত দুই, এক দিবস অন্তর যাত্রীদের প্রদত্ত অর্থে সাধুদিগের ভাণ্ডারা (বিশেষ রকমের ভোজ) তো আছেই। এ অঞ্চলে সাধুদিগের যেরূপ আহার বাস-স্থানের সুবিধা বুঝি ভারতবর্ষের অন্য কোথায়ও সেরূপ নাই। তাই এ স্থানে সাধুদিগের এরূপ সমাগম।

সন্ধ্যার সময়ে আমরা আশ্রমে ফিরিলাম, বন্ধুকে আমার এখানে আসার অভিপ্রায় বলিলাম। তিনিও আমার উদ্দেশ্য জানিয়া আহ্লাদিত হইলেন। বন্ধুর নিকট শুনিলাম হৃষীকেশ এখান হইতে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত। উক্তস্থান বেশ নির্জ্জন। তথায় অনেক সাধু গঙ্গাতীরে কুঠীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। বেদান্ত আলোচনার বেশ বন্দোবস্ত আছে। স্থানটিও অতি মনোরম। আমি এই রূপ স্থানই অন্বেষণ করিতেছিলাম সুতরাং শীঘ্রই হৃষীকেশ যাওয়ার সংকল্প করিলাম। আগামী কল্যই হৃষীকেশ রওনা হইব স্থির করিলাম। সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া আহার করা গেল।

এখানকার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে কি রোগী-চর্য্যা, কি সন্ন্যাসীদিগের আহার বাসস্থান সর্ব্ব বিষয়েই অতি সুবন্দোবস্থ আছে। প্রত্যহ সমাগত রোগীদিগকে নিয়মিত সময়ে ঔষধ বিতরণ করা হয়। সাধু রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য উভয়ই দেওয়া হইয়া থাকে। সাধু রোগীদিগের জন্য পৃথক আবাসগৃহও নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণের সেবাশ্রমের উপর এরূপ বিশ্বাস যে হরিদ্বারে সরকারি দাতব্য চিকিৎসা-লয় থাকা সত্ত্বেও এইখানেই সকলে ঔষধ,

ব্যবস্থার জন্য আসিয়া থাকে, না হইবেই বা কেন যাঁহারা দেশবাসীর সেবাকেই—জীবনের ব্রত বলিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের সহিত বেতনভোগী কর্ম্মচারিদিগের পার্থক্য থাকিবেই। রোগী সেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, ভগবান ইঁহাদের উদ্যম সফল করুন।

বন্ধুর সহিত একই গৃহে শয়ন করিলাম। শুনিলাম ২।৩ মাস পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ মিশনের দুই তিন জন যুবক সন্ন্যাসী কনখল হইয়া হৃষীকেশ গিয়াছেন তাঁহারা তথায় নেপালি স্বামী অনন্তানন্দের নিকট বেদান্ত পড়িতেছেন, সুতরাং তথায় বাঙ্গালির সঙ্গ পাওয়া যাইবে। দেরাদুন লাইনের হৃষীকেশ রোড ষ্টেসন হইতে হৃষীকেশ যাইতে হয়, ষ্টেসন হইতে হৃষীকেশ ছয় মাইল। প্রাতে ছয়টার পর একটা ট্রেণ হৃষীকেশের দিকে যায় ঐ ট্রেণে হৃষীকেশ রোড যাইব মনে করিলাম তথা হইতে হাঁটিয়া হৃষীকেশ যাইব। ষ্টেসন হইতে হৃষীকেশ যাইবার জন্য টম্ টম্ সর্ব্বদাই পাওয়া যায়।

রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রাতে উঠিয়া দেখি বৃষ্টি থামে নাই। বৃষ্টির জন্য অদ্য হৃষীকেশ যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইবে। বৈকাল পর্য্যন্ত হইল

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচ সমাপনান্তে গাত্র বস্ত্র জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ষ্টেসনে চলিলাম। টিকিট ক্রয় করিয়া প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কন্‌কনে বাতাসে যেন হাড়গুলা শুদ্ধ কাঁপিতে লাগিল। আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় হৃষিকেশ রোডে পৌছিলাম। রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। দশটার সময়ে হৃষীকেশের অতি নিকটে আসিয়া পৌছিলাম। পর্ব্বত গাত্র দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা দেখিতে পাইলাম। কি চমৎকার দৃশ্য! মনে কেমন এক পবিত্র ভাবের উন্মেষ হইল। হৃষিকেশ পৌছিয়া সাধুরা কোথায় বাস করেন জানিয়া লইলাম। গঙ্গার ধারে ধারে অনেকটা গিয়া ঝাবিতে* পৌছিলাম তথায় অসংখ্য কুটীর শ্রেণী দেখিতে পাইলাম ইহার মধ্য হইতে বাঙ্গালি স্বামীজীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা আমার ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তির সহজ হইবে না বুঝিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা অন্বেষণের পর একজন নেপালি সাধু ছোট ছোট তিনটা কুপ† দেখাইয়া দিল এবং বলিল "এই খানেই বাঙ্গালী সাধুরা বাস করিত এক্ষণে তাহারা এখানে নাই কোথায় গিয়াছে, উক্ত কুপে অন্য সাধুরা বাস করিতেছে; তুমি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া উহাদের উঠাইয়া দিয়া উক্ত স্থানে বাস করিতে পার।" এখানে যে সমস্ত সাধু কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন তাঁহারা ইচ্ছামত অন্যত্র চলিয়া যান তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে অন্য সাধুরা তাঁহাদের কুটীরে তাঁহাদের অনুপস্থিতি কালীন বাস করেন ইহাতে কুটীর স্বামীরা কোন আপত্তি করেন না। নেপালি আমার সহিত হিন্দীতে কথা

* হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে যেখানে সাধুরা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন উহা "ঝারি" কথিত হয়। "পর্য্যটকের পত্রের" "হৃষীকেশ" অংশে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।—লেখক।

† কুপ—সাধুদিগের নির্ম্মিত ছোট কুটীর। "পর্য্যটকের পত্রের" "হৃষীকেশ" অংশে ইহার বিস্তারিত বিষয় বলা হইয়াছে।—লেখক।

কহিলেন বটে কিন্তু তাহার হিন্দী আমি অতি কষ্টে বুঝিতে পারিলাম—একে আমি হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহার উপর নেপালির হিন্দীও তাহার মাতৃভাষা মিশ্রিত সুতরাং তাহার কথা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। কোন রকমে ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। নেপালির পন্থা অনুসরণ করিতে আমার মোটেই প্রবৃত্তি হইল না। যাহা হউক উপয়ান্তর না দেখিয়া কুপগুলার নিকটবর্ত্তী হইয়া কুপস্বামীদিগকে বাঙ্গালী স্বামীজীদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম এবং আমি বাঙ্গালী, তাঁহাদের নিকট আসিয়াছি তাহাও বলিলাম। ইহাঁরা পঞ্জাবি, তিন কুপে তিন জন বাস করিতেছেন, দুই জনের পরিচ্ছদ স্বামিজীদের অনুরূপ নহে উভয়েই আলখাল্লা বা তদ্রূপ কোন বস্ত্র পরিধানে নাই দেখিলাম, উভয়েরই বয়স ৩০।৩৫ হইবে। অন্য সাধুটির বয়স ১৮।১৯ বৎসর পরিধানে গৈরিক আলখাল্লা। ইহাঁরা আমাকে বসিতে বলিলেন এবং নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ইহাঁদের গ্রাম্য পাঞ্জাবি হিন্দী আমি মোটেই বুঝিতে পারিলাম না, ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম আমি আসায় ইহাঁরা কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বোধ হয় মনে করিয়াছেন তাঁহারা বাঙ্গালিদের কুপে বাস করিতেছেন আমিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালী স্বামীজীদের নিকটে আসিয়াছি, তাঁহাদের উঠাইয়া দিতে পারি। আমি কিন্তু মোটেই সেরূপ পন্থা অনুসরণ করিলাম না। অতি বিনয় সহকারে তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলাম এস্থান আমার একেবারেই অপরিচিত। কোথায় যাই কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা যদি আমাকে একটু স্থান দেখাইয়া দিতে পারেন তবে বড়ই উপকৃত বোধ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়।

জন্মাষ্টমী

১

সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত অবনী
কৃষ্ণপক্ষ মহাষ্টমী তিথি সমাগত,
আনকদুন্দুভি, মরি, শিরে কর হানি'
উপবিষ্ট কারাগারে বিষাদ ব্যথিত।

২

প্রিয়তমা দেবকীরে আশ্বাস বচনে
কত আর বুঝাইবে বৃষ্ণিবংশধর,
ছয় পুত্র হারাইয়ে অভাগিনয়নে
বহিছে শোকের অশ্রু সদা ঝর ঝর।

৩

পূনঃ কাল সমাগত, জঠর বিদারি'
আসিবে রে কে অভাগা আজি ধরাতলে
মথুরার অধীশ্বর, পিশাচ আচারী
আছাড়িবে শিলাপটে, কংস অবহেলে।

৪

এ চিন্তায় সে দম্পতী অতীব কাতর
যুগল নয়নে বহে উষ্ণ অশ্রুধার,
নিগড়ে বেঁধেছে দোঁহে দুর্ব্বৃত্তের চর
মৃত্যু বিনা এ বিপদে কে করে উদ্ধার?

৫

বিষন্ন হৃদয়ে দোঁহে করিছে জল্পনা,
কেমনে একটি ধনে রাখিবে হৃদয়ে
এ হেন সময়ে সেথা দেব বাদ্য নানা
উঠিল বাজিয়া যেন উৎসব সময়ে।

৬

অশরীরি দেবগণ পশিয়া আগারে
দেবকীর গর্ভে স্তব করিছে সকলে,
দেখে বসুদেব ব্রহ্মা ইন্দ্র মহেশ্বরে
এসেছে সকলে সেথা নিজ দলবলে।

কেহ বা প্রণমে তথা কেহ গায় গান
কেহ বা উন্মত্তভাবে নাচে কুতূহলে !
পাষণ্ড দলন হেতু জগতের প্রাণ
অবতীর্ণ হবে আজি মথুরা মণ্ডলে।

ক্রমে দিব্যজ্ঞান লাভ করিল উভয়ে
দেখিল আলোক পূর্ণ হইল আগার
পীতাম্বর-ধারী হরি কমল নয়নে
হেরিয়া মুছিল দোঁহে শোক অশ্রুধার।

৯

দেখিল দম্পতী দিব্যজ্ঞান লাভ করি
অবতীর্ণ কারাগারে গোলক ঈশ্বর
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম-ধারী
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষ পীতাম্বর ধর।

১০

মহার্হ বৈদূর্য্য মণি কিরীটে জড়িত
সে কম শ্রবণে দোলে কাঞ্চন কুণ্ডল
স্বর্ণময় সুশোভন অঙ্গদ মণ্ডিত
অবতীর্ণ কারাগারে ভকত বৎসল।

১১

কত স্তব বসুদেব দেবকীর সাথে
করিল সে পুত্ররূপে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে
পুনঃ মহামায়া আসি দাঁড়ালেন পথে
অমনি ভুলিল ভীতি বিজড়িত মনে।

১২

কাঁদিতে লাগিল দোঁহে কেমনে বাঁচিবে
কেমনে লইয়া যাবে নন্দের ভবনে,
কেমনে সে গৃহ হ'তে, হায়, বাহিরিবে
কেমনে বাঁচাবে সেই দুঃখিনীর ধনে ?

১৩

সহসা পড়িল মনে মধুর বচন
বলেছে সে দিব্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া,
অমনি নিরাশ ত্যজি' মুছিল নয়ন
অমনি সে বাহিরিল সন্তান লইয়া।

১৪

অর্গল আবদ্ধ দ্বার আপনি খুলিল
মায়ামুগ্ধ অস্ত্রধারী দ্বারে অচেতন,
মহানন্দে বসুদেব বক্ষেতে চাপিল
ইন্দ্র নীলমণি সম সন্তান রতন।

১৫

পয়োধর মহা গর্জ্জি' অজস্র বর্ষণ
ঢালিতে লাগিল রুষি' ধরণী উপরে,
ফণা ধরি' আবরিল দোঁহে সঙ্কর্ষণ,
উপনীত বসুদেব যমুনার তীরে।

১৬

যমুনার পর পারে নন্দের আলয়
তথায় রাখিবে শিশু আশা মনে মনে
উত্তাল তরঙ্গ দেখি' ভীতির উদয়
হইল পিতার হৃদে গোকুল গমনে।

১৭

মায়ামুগ্ধ বসুদেব নাহিক স্মরণ,
ভবের কাণ্ডারী হরি বক্ষেতে তাঁহার
যাঁহার লীলায় এই আঁধার সৃজন
যাঁহার লীলায় মুগ্ধ বিশ্ব চরাচর।

১৮

যমুনা দিলেন পথ ; আনন্দে পশিল
শিশু সহ তটিনীর তরঙ্গ মাঝারে
যমুনা সৌভাগ্য গণি' স্পর্শে পদতল
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, আহা, বক্ষের উপরে।

১৯

অবশেষে উপনীত নন্দের আগারে
মায়াবলে প্রবেশিল হয়ে অদর্শন
দেখিল কনকলতা ক্রোড়ে যশোদার
কন্যা লয়ে রাখিলেন সন্তান আপন।

২০

ফিরিলেন বসুদেব কংস কারাগারে
জাগিল প্রহরীদল মায়া অবসানে
কন্যার সম্বাদ দিল কংসের গোচরে ;
দুষ্ট ত্বরা উপনীত আরক্তলোচনে।

২১

রোষে বলে "দেরে ওই রাক্ষসী কন্যায়
শিলাপট্টে আছাড়িয়া করিব' সংহার
এই ত অষ্টম গর্ভ বিনাসি ইহায়
নিঃশঙ্ক হইব এবে আর ভয় কার ?

২২

এত বলি পদ ধরি তুলিল কন্যায়
অমনি সে ব্যোমপথে করিল প্রয়াণ,
"সংহর্ত্তা গোকুলে আছে" বলিয়া তাহায়
দুর্গামূর্ত্তি ধরি' মাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু

অন্ধ-বিশ্বাস।

(রাজসাহী বৈষ্ণব সমিতিতে পঠিত)

ভগবৎ-সাধনার যতগুলি পন্থা আছে তাহার মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাসই ভগবৎ প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট ও সহজ উপায়। ইহা শাস্ত্রালোচনার অপেক্ষা করে না, যোগশাস্ত্রের কঠিনতম উপায়গুলির মুখাপেক্ষী নহে, অরণ্যজাত কুসুমের ন্যায় আপনা আপনি হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া স্বকীয় প্রভাবে হৃদয়-কন্দর আলোকিত এবং মানুষকে দেব ভাবাপন্ন করে। মানুষের অপবিত্র হৃদয়েও ভগবানের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, ইহা পূতসলিলা জাহ্নবীর বারির ন্যায় স্বতঃই স্বচ্ছ ও আবিলতাবর্জ্জিত। এই গুণ থাকায় বিশ্বাসীর হৃদয়ফলকে আপনা আপনি ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া উঠে। উহাতে কোন আয়োজনের আবশ্যক নাই কোন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নাই স্বাভাবিকী বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে ভক্তের হৃদয় স্বতই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। ইহা পাষণ্ডের বিশুষ্ক হৃদয় মরুতেও ভক্তি মন্দাকিনীর অনন্ত পবিত্র স্রোত প্রবাহিত করিয়া শ্যামল শস্য পূর্ণ উর্ব্বর ভূমি খণ্ডের ন্যায় সুশোভিত করিয়া তুলে ইহার প্রভাবে বৈজ্ঞানিকের ঘোর গবেষণাপূর্ণ গুরু গম্ভীর নিনাদে ও জ্যোতির্ব্বিদের গভীর চিন্তায় ভক্তের হৃদয় কিছু মাত্র আলোড়িত করিতে সক্ষম হয় না। সুনিপুণ কর্ণধারের ন্যায় সাধক স্থির লক্ষ্যে জীবন তরণী চালিত করিতে থাকে লক্ষ্য ভ্রষ্টের ভয় নাই, প্রবল তরঙ্গাঘাতের আশঙ্কা নাই, ধীরে ধীরে আপন লক্ষ্য স্থানে যাইবেই যাইবে, তাই বলিতেছিলাম অন্ধ-বিশ্বাসই ঈশ্বর সাধনার প্রধান সাধন।

দুধের ছেলে ধ্রুব; একমাত্র মায়ের কোল ব্যতীত আর অন্য আশ্রয় ছিল না। সুখে দুঃখে জননীর কোলই যার আশ্রয় স্থান, সেই অপোগণ্ড শিশু ধ্রুব মায়ের কথায় ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। বিমাতার বাক্যবাণবিদ্ধ সেই সরল প্রাণ শিশু যখন মায়ের নিকট শুনিলেন যে একমাত্র পদ্মপলাশলোচন হরিই তাঁহাদের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ, পদ্মপলাশলোচন যে কে? কি জিনিস? তা সেই সরল শিশু কিছুই জানে না; কেবল স্থির বিশ্বাস বলেই সেই নিরাশ্রয় বালক বন মধ্যে 'কোথায় হে পদ্মপলাশলোচন! আমার দুখিনী মায়ের দুঃখ দূর কর। তুমি ভিন্ন আমাদের দুঃখ নিবারণ করে এমন কেহ নাই।' বলিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সিংহ ব্যাঘ্রের ভয় নাই; হরিপ্রেমে এমনি মাতোয়ারা যে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি তাঁহার নিকট আসিলে 'তুমিই কি আমাদের দুঃখনিবারন পদ্মপলাশলোচন' বলিয়া কোল দিতে ব্যগ্র—পদ্মপলাশলোচন ভ্রমে বিষধর সর্প ধরিতে কুণ্ঠিত নহেন—হরি প্রেমে এমনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য! এ অবস্থায় আর কি সেই কাঙ্গালের ধন দয়াল ঠাকুর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ভক্ত বৎসল ভগবান আর ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারিলেন না তাই ধ্রুবের

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ধ্রুব রে! নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমি তোর পদ্মপলাশ-লোচন, তোর দুঃখ দূর করিবার জন্যই তোর সম্মুখে উপস্থিত।' ধ্রুব নয়ন উন্মীলন মাত্র সেই নবজলধরশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক ধন্য হইলেন। তাঁহার সকল দুঃখ দূরে গেল, প্রাণের চির পিপাসার শান্তি হইল, অধিক কি এই ধ্রুবের জন্য স্বতন্ত্র ধ্রুবলোকের সৃষ্টি হইল।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে বলিলেন, 'আচ্ছা বল দেখি তোর হরি কোথায়?' প্রহ্লাদের স্থির বিশ্বাস সেই সর্ব্বেশ্বর হরি সর্ব্বত্রই বিরাজমান। অকপট দৃঢ় বিশ্বাস বলে বলিলেন, 'হরি সর্ব্বব্যাপী এই ভূমণ্ডল হরিময়।' হিরণ্যকশিপু তখন স্ফটিক স্তম্ভ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই স্তম্ভের ভিতর তোর হরি আছে?' প্রহ্লাদ বলিলেন, 'অবশ্যই আছেন।' তখন সেই দৈত্যরাজ মদগর্ব্বে বলিলেন, 'পাষণ্ড পুত্র! যদি ইহার ভিতরে তোর হরি না থাকে তবে এখনি তোর প্রাণদণ্ড করিব।' প্রহ্লাদের চক্ষে জলধারা পড়িল হরি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। মোহান্ধ দৈত্যরাজ স্ফটিক স্তম্ভে পদাঘাত করিবামাত্র নরসিংহরূপী হরি আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। ভক্তের কথা রক্ষা হইল। দৈত্যকুল পবিত্র হইল।

বালক গয়াসুর তার মাতার কথায় অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক হরিপাদপদ্ম লাভ করিয়া চিরদিনের মত লক্ষ্মীনারায়ণকে ভক্তিপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারই দৃঢ় ভক্তির শক্তিতে জগতের জীবগুলীর উদ্ধারের পন্থাস্বরূপ গয়াক্ষেত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাই সাধারণ কথায় বলে 'বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।'

শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস

কর্ম্ম।

(২৬৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।

এক সময়ে নটরাজ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে ফিরিয়া প্রত্যুষ সময়ে দেখিলেন যে শ্রীমতী তখনও আপন কুঞ্জে বাসকসজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। রাত্রিতে তাঁহার আসিবার কথা ছিল কিন্তু পথ হইতে চন্দ্রাবলী একপ্রকার বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজকুঞ্জে আটক করিয়া ছিলেন।

শ্রীমান্ কম্পিতদেহে, চিন্তাকুলিত হৃদয়ে শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রবেশ করিলে, তাহার বদনে সারানিশার বিলাসের চিহ্ন দেদীপ্যমান দেখিয়া অভিমানে মুখ ফিরাইয়া "শঠ লম্পটকে" কুঞ্জ হইতে চলিয়া যাইতে শ্রীমতী আদেশ করিলেন, শ্রীমানও মানভরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাধা যেদিকে নয়ন ফিরান সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দেখেন। শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম পূর্ণ মাত্রায় শ্রীমতীর হৃদয়পূর্ণ করিয়া রহিল। তিনি অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িলেন। শ্রীমানও

জানিতেন যে শ্রীমতী যেমন তাঁহাকে তাঁহার জন্য ভালবাসেন এমন বিশ্বে আর কেহ নাই, তিনিও অস্থির। শীঘ্র মিলন ঘটিল। তখন শ্রীমতী বলিলেন "চন্দ্রাবলীর উপর কি রাগ করিয়াছি ? তাহার দোষ কি ? সে ঠিক কাজ করিয়াছে। তবে তোমাকে বলি, যে ঐরূপ কামভাব লইয়া তোমাকে চায় তাহার তোমাকে পাওয়া উচিত ছিল না। সে ত চাহিবে, ভূবনমোহন তোমাকে দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে ? সে ত চাহিবে, পাইবে কেন ? তাই তোমার উপর রাগ করিয়াছিলাম।"

ভূবনমোহন আমার প্রাণাধিক তাহাকে কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে ? চন্দ্রাবলীর দোষ নাই। এই নিঃস্বার্থতা ! এই নিঃস্বার্থতা ছিল বলিয়া শ্রীমতী বৈষ্ণব ধর্ম্মের মেরুদণ্ড ! প্রেমের জমাটমূর্ত্তি প্রেমময়ী রাধিকা, জগতে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ !

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই রাধাভাব লইয়া জগতকে শিখাইতে আসিয়াছিলেন কিরূপে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হয় এবং ভক্তি কাহাকে বলে ও প্রেম কি বস্তু ! সহজে ভক্তিলাভের উপায় নামসঙ্কীর্ত্তন ! তাই নাম ভিন্ন কলিতে অন্য উপায় নাই। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ও আমরাও সেই সঙ্গে বলি

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথাঃ।"

কলিতে এই নামই জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ এবং নামই ভক্তিযোগ। জগতে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা জ্ঞান পথ বা যোগ পথ অবলম্বন করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ জীব, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসারে বিব্রত গৃহস্থ নামগ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারেন। নাম করিতে করিতে ভগবানে নির্ভরতা আসে নিজ-কর্ত্তৃত্বাভিমান চলিয়া যায়। তখন সব কার্য্য তাঁহার কার্য্যরূপে সমাধা করিয়া সে শান্তিতে বাস করে। সকল কার্য্যও সুচারুরূপে সমাধা হয়। সংসারের শোক রোগাদি নিজের মনে করিয়া ক্লিষ্ট হইতে হয় না। সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া থাকিবার সুবিধা হয়। কলিতে সব যোগের শ্রেষ্ঠ যোগ নামসঙ্কীর্ত্তন এই জন্য শাস্ত্রকারগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন। কারণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, নাম করিতে করিতে, নামীর উদয় হয়। নাম নামী অভেদ। যথা শাস্ত্রবাক্য :—

"নামচিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতনরসবিগ্রহঃ।
নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ সত্যা ভিন্নত্বান্নাম নামিনঃ।"

এক সময়ে সত্যভামাদেবী পারিজাত হরণের পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শে স্বামী বাসুদেবের উপর একাধিপত্য স্থাপন মানসে, সপত্নীগণ অপেক্ষা উচ্চতর আসন পাইবার আশায় তুলা যজ্ঞের আয়োজন করেন। তুলাদণ্ডের একদিকে স্বামীকে বসাইয়া স্বামীর মূল্যস্বরূপ বহুমূল্য রত্নাদি দ্বারা অন্যদিকে পূর্ণ করতঃ স্বামীর গুরুত্বের সমান করিয়া তাহা বিপ্রগণকে দান করাই এই দানযজ্ঞের বিধি। প্রথমে স্বামীকে দান করিয়া পরে ঐরূপে মূল্য দিয়া কিনিয়া লইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে তুলাদণ্ডের একদিকে বসাইয়া রাজপুরীতে যত ধন রত্নাদি ছিল সব অন্যদিকে দেওয়া হইল, সমান হইল না। ক্রমে গার্হস্থ্য দ্রব্য তাহাও গেল, রাজভাণ্ডারে যাহা কিছু ছিল সব দেওয়াতেও যখন শ্রীকৃষ্ণের সমান

হইল না, তখন দেবর্ষি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সত্যভামা দেবীকে বলিলেন "কৈ মা উপযুক্ত মূল্য পেলাম না, তবে আমার ধন লইয়া যাই।" তখন সত্যভামা দেবীর মস্তকে বজ্র পড়িল। "কন্দর্প-দর্পহা" যাঁহার একটি নাম, তিনি কি কাহারও দর্প সহেন?

এত বড় যজ্ঞ ব্যাপারের বার্ত্তা রুক্মিণী কিছুই জানেন না। তখন সত্যভামা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে সপত্নীর নিকট সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যাপার বুঝিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না সত্যভামা দেবীকে বলিলেন, "তা বোন্, এত বড় যজ্ঞ করচিস্, আমাকে একবারও খবর দিতে নাই, যা'হৌক্, এক কাজ কর শীঘ্র সব জিনিস তুলা হ'তে নামাও।"

তখন রুক্মিণী দেবী একটি তুলসী পত্রে "শ্রীকৃষ্ণ" এই নামটি লিখিয়া তুলাদণ্ডের অপরদিকে স্থাপিত করিলেই, দণ্ড মৃত্তিকা-স্পর্শ করিল।

কত দ্রব্য দেওয়া হইল কিছুই হইল না, আর একটি তুলসী পত্রে নামটি এত ভারী হইল যে একবারে মৃত্তিকা স্পর্শ করিল? তুলার অপর দিকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, কিন্তু নামের সহিত যুগল রহিয়াছেন বলিয়া আজ তুলা এত গুরু হইল।

"কৃষি ভূর্বাচক শব্দঃ ণ যস্ত নিবৃত্তি বাচকঃ।"

বীজস্বরূপ নাম মধ্যে যুগল আছেন বলিয়া আজ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব লইয়া নাম বিলাইয়া গিয়াছেন। নামের অসমূর্ত্তি স্বয়ং বাহ্যরাধা অন্তর্কৃষ্ণ, নামের বীজমূর্ত্তি লইয়া স্বয়ং জগতকে নাম শিখাইয়াছেন। এইরূপে দেখাইয়াছেন, আমি ও আমার নাম অভেদ। পরন্তু নামের সহায় না লইলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। নাম করিতে করিতে রূপের উদয় হয় তাই নাম কীর্ত্তন। তাই নামে মত্ত হইয়া গোরা রায় ভারত-ভূমিকে আদর্শ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহা বই আর গতি নাই। শান্ত জীব আমরা অনন্ত ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইবে, বাক্য মন লইয়া কে "আবাঙ্‌মনসোগোচরম্" বস্তুর কিরূপে নির্দ্দেশ পাইবে, তাই কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্তিমান হইয়া জগত শিক্ষার্থে আসিয়াছিলেন নহিলে আমাদের কি গতি হইত? তাই আমাদের অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করিবার জন্য "হরিপুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ"—নদীয়া ধামে উদয় হইয়া জগতকে শিখাইলেন। তাই আমরা শিখিলাম, শমন ভয়ে দুর্ব্বল কলিজীব, তাই জানিলাম—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

যমুনা।

(১)
কি নাম তোমার নদি ! কহ লো আমায় ?
মৃদু মৃদু বহি তুমি,
শোভিছ ভারত ভূমি,
কহ নরে কিবা নাম দিয়াছে তোমায় ?

(২)
অনুক্ষণ বহিতেছ নাহিক বিরাম,
কি কব তোমার শোভা,
মনোহর মনোলোভা,
কহ ওগো ! কহ মোরে কিবা তব নাম ?

(৩)
নীলবর্ণ জল তব অতি মনোহর
শোভিছে ভারত গলে,
যেমতি গগন ভালে,
শোভে যথা নিশাপতি বিতরিয়া কর।

(৪)
অথবা তারকা মাঝে শুকতারা প্রায়,
যথা প্রতি নিশাশেষে,
শোভে সে উজল বেশে
যখন অপরা তারা আকাশে মিশায়।

(৫)
সেই কি যমুনা তুমি ? একদা যথায়
বাজিত মুরলী ধীরে,
শ্যামল নদীর তীরে,
এখন কি সে বাঁশরী গোকুলে মাতায় ?

(৬)
এখনো তোমার জলে উজান কি বয় ?
এখনো তোমার কোলে,
বিহগ তান কি তোলে ?
এখনো কি সে কাকলী তোমাতে মিশায় ?

(৭)
লো যমুনে।
এখনো কি বহ তুমি গোকুলের কোলে ?
সে দিন আছে কি আর,
তবে কেন অনিবার,
বহিছ ভারত বুকে পূর্ব্বস্মৃতি ভুলে ?

(৮)
ভুলেছ কি লো যমুনে ব্রজের বাঁশরী ?
ভুলেছ কি পিকগণে
গাহিত তুলিয়া তান,
তবে কেন বহ আর তুলিয়া লহরী।

(৯)
একদা আছিল তব সুখের জীবন ;
তখন গো ব্রজাকাশে,
শ্যামচাদ ছিল ভেসে,
ডুবেছে অতল জলে এবে সে রতন।

(১০)
ফিরাইয়া পাবি কি লো ! এবে সে রতন,
আর কি তোমার তীরে,
আর কি গো তব নীরে,
শোভিবে সে রাখালের রাতুল চরণ।

(১১)
পোহায়েছে সুখ নিশা এবে গো তোমার,
স্বপ্ন স্মৃতি লয়ে বুকে,
থাক তুমি মন দুঃখে,
সে সুখ রজনী তব না ফিরিবে আর।

(১২)
অতীতের সুখ স্বপ্ন পড়ে কি গো মনে ?
শ্যামের মোহন বাঁশী
ব্রজের মধুর হাসি,
সে সব কি মনে তব আছে গো যমুনে ?

(১৩)
রেখেছ কি সেই স্মৃতি হিয়ার মাঝারে ?
আর ত উঠেনা তান,
বিহগ গাহেনা গান,
সোণার গোকুল এবে ডুবেছে আঁধারে

(১৪)
সে সব সুখের কাল গিয়াছে গো চলি,
বাঁশী রব নাহি আর,
আছে শুধু আঁখিধার,
সকলে চলিয়া গেছে শুধু তোমা ফেলি।

(১৫)
লো যমুনে !
কি সুখে আছ গো বুকে লইয়া স্বপন,
কি সুখে বহ গো আর,
স্মৃতি লয়ে অনিবার,
লুকাও ভারত বুকে নীরস জীবন।

শ্রী হরিপদ দে

সংবাদ ও সমালোচনা

প্রভাবতী (কাব্য) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। ছাপা ও কাগজ ভাল।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়কার ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাব্য খানি লিখিত হইয়াছে। প্রভাবতী কবির স্ব-কপোল কল্পিত। কিন্তু এই চরিত্র অঙ্কিত করিয়াই কবির বাহাদুরী। এই নবীনা রাণী স্বদেশের জন্য যে ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছেন, তাহা পাঠ কালে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পুস্তকখানি আবেগময়। আশা করি, কবি সাহিত্যসেবা ত্যাগ করিবেন না। ইহাঁকে সাধারণের উৎসাহ দেওয়া উচিত।

শিক্ষাপ্রবেশ—১ম ও ২য় ভাগ। শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস প্রণীত। মূল্য ।৵০ পাচ আনা। গ্রন্থখানি শিক্ষাবিভাগের নব প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারেই লিখিত হইয়াছে। নীরস উপদেশ মাত্র লিপিবদ্ধ করা হয় নাই—ইতিহাসঘটিত মহাপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণন দ্বারা যাহাতে ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি, বিনয়, আত্মসংযম, সত্যানুরাগ, অধ্যবসায় সত্যনিষ্ঠা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি সৎগুণরাশি বালকগণের চিত্তপটে অঙ্কিত হয়, গ্রন্থকার তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্দেশবাসী হিন্দু ও মুসলমান ও প্রবাসী ইংরেজ মহাজনদিগের সংক্ষিপ্ত অথচ শিক্ষাপ্রদ জীবন এবং যে সকল ঘটনা নিত্য আমাদের নয়নপথে পতিত হয়—ভূমিকম্প, জলপ্রপাত, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কার্য্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্রিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বালকগণকে নীতি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত অনেক উচ্চ নীতি সরলভাষায় বিবৃত করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন।

নগরীর প্রতিষ্ঠা। ২২২ বৎসর পূর্ব্বে আগষ্ট মাসের ২৪শে তারিখে ইংরেজদিগের প্রথম রণতরী ভাগীরথীতীরে আগমন করিয়াছিল এবং বিখ্যাত জব্ চার্নক কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। (বসুমতী)

ভারত-গবর্মেণ্টের বাড়ী। কলিকাতার ভারত-গবর্মেণ্টের যে সকল বাড়ী আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতেছেন শুনিতেছি, লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর যখন সিমলা-শৈলে গমন করিবেন, তখন এ সম্পর্কেও নানা কথার আলোচনা করিবেন। (বসুমতী)

যক্ষ্মারোগ। এদেশে ইদানীং যক্ষ্মারোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে। কলিকাতায় এই রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, শীতপ্রধান দেশেই এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে, সে বিশ্বাস সত্য নহে। জনবহুল স্থানে ও রুদ্ধবায়ুপ্রবেশ স্থানে বাস ও জীবন শক্তির হ্রাস এই রোগের প্রবল উত্তেজক কারণ। নানা কারণে বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি প্রবল ব্যাধিই যে কেবল বঙ্গবাসীর জীবনী-শক্তি হ্রাসের কারণ, তাহা নহে, পরন্তু বর্ত্তমান যুগের তীব্র জীবন-সংগ্রাম ও দুশ্চিন্তা বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে। সেই জন্যই এই প্রবল ব্যাধি দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইদানীং য়ুরোপে যক্ষ্মারোগ-চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইতেছে। তদনুসারে এ দেশে অনেকে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণের জন্য সরকারকে পরামর্শও দিতেছেন। আবার

অনেক বিজ্ঞচিকিৎসক বলিতেছেন যে, স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থিতি করিলে এই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, স্বাস্থ্যনিবাসে বসতির ফলে রোগের প্রকোপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় এবং সেই জন্য আয়ু কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্বাস্থ্য-নিবাস হইতে যাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাদের অবশিষ্ট জীবন প্রায়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং কিছু কাল পরে ঐ রোগ পুনরায় আবির্ভূত হয়। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদিগের মত এই যে, মানবদেহ ক্ষয়-রোগের বীজাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মানব-দেহে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে উহার প্রতিষেধক বীজাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহাদের দেহ দুর্ব্বল, অথবা যাহারা রুদ্ধবায়ু-প্রবেশ গৃহে বাস করে, তাহাদের প্রতিষেধক বীজাণু প্রাবল্য লাভ করিতে পারে না। ফলে এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দেহে টিউবারকুলীন্ প্রবিষ্ট করিয়া দিলে প্রতিষেধক বীজাণু প্রাবল্যলাভ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকদিগের বিভিন্ন মত থাকিলেও যাহাতে ঐ রোগ বৃদ্ধি না পায়, তাহার জন্য সাধারণ ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। (বসুমতী)

মৃত্যু। নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের জননী মহারাণী গত সোমবার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মহারাণী গৃহ-বিগ্রহের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।—মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দেব মন্দিরে দেবতার সম্মুখে দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন। তদনুসারে তিনি তথায় নীত হন। আরাধ্য দেবতার সম্মুখে ভক্তিময়ী ইহলোক ত্যাগ করেন।—নাটোরের অধিবাসীরা সংকীর্ত্তন সহকারে শ্মশানে অনুগমন করিয়াছিলেন। দীঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুর শ্মশানে উপস্থিত হইয়া মহারাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। সমগ্র নাটোর মহারাণীর বিয়োগে শোক-মগ্ন।—মহারাণী কর্ম্মানুরূপ লোকে চিরশান্তি-সম্ভোগ করুন।

(বসুমতী)

তুলার খেলা। কলিকাতায় "তুলার খেলা"র আড্ডা এত বাড়িয়াছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই ব্যসনে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত পরিবার পথের ভিখারী হইতেছে, কত হতভাগ্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কত নির্ব্বোধ বঞ্চিত হইতেছে, কত প্রবঞ্চক কুবের হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? দুঃখের বিষয় এই যে, এমন 'সর্ব্বনেশে' মহাপাপের মূলোচ্ছেদের কোনও চেষ্টাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।—বিচারপতি হোমউড তুলার খেলার মামলার আপিলের বিচারে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—পুলিস যদি তুলার খেলাকে Public nuisance' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯০ ও ২৯১ ধারা অনুসারে তুলার খেলার সমস্ত দোকান বন্ধ করিতে পারে।—বিচারপতি হোমউডের এই নির্দ্দেশ অনুসারে পুলিস স্বেচ্ছায় কিছু করুন না করুন, কিন্তু যদি তুলার আড্ডার সন্নিহিত পল্লীর অন্যূন পাঁচ সাত জন ভদ্র-লোক সমবেত হইয়া পুলিসকমিশনরের নিকট এই সকল আড্ডা তুলিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, পুলিস এই সব আড্ডা-গুলি তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারেন। সাধারণ অধিবাসীরা এই পাপের দমনে বদ্ধ-পরিকর হউন।—পুলিসকমিশনর গোপনে ভদ্রলোকের তুলার খেলা সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ করুন।—in camera বিচার হউক। ভদ্রলোকের নাম, ধাম, পরিচয় গুপ্ত থাকুক। নতুবা গুণ্ডার অত্যাচারে তাঁহাদের নির্য্যাতিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। আর অনেকে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহিবে না। পুলিস জনসাধারণকে অভয় দিন,—রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করুন।—সর্ব্বোপরি, গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র পারেন, এই সাংঘাতিক ব্যাপারের মূল উৎপাটন করিবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রবর্ত্তিত করুন। এ বিষয়ে কালক্ষেপ কোনও মতে বাঞ্ছনীয় নহে।

(বসুমতী)

অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতাইশ দণ্ড পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকিবে। এখন বোধ হয় তিথির স্বরূপটা বুঝেছ? এইবার নক্ষত্র। চন্দ্র যে নক্ষত্রে যতক্ষণ থাকেন, তাই পঞ্জিকায় ততক্ষণের নক্ষত্র ব'লে নির্দ্দেশ করা যায়, সুতরাং চন্দ্রস্ফুটকে কলা ক'রে ৮০০ দিয়ে ভাগ দিলেই গতনক্ষত্র নির্ণীত হ'বে; আর অবশিষ্ট হ'তে চন্দ্রের গতির সাহায্যে পূর্ব্বোক্তরূপে নক্ষত্রের ভুক্ত-ভোগ্য দণ্ডাদি বাহির করা যা'বে। তিথির পূর্ব্বার্দ্ধে এক করণ অপরার্দ্ধে আর এক করণ। আর রবি ও চন্দ্রস্ফুটের যোগফল থেকে ঐরূপে যোগ নির্ণীত হয়। নক্ষত্র যেমন সাতাইশটি, যোগও তেমনি সাতাইশটি, সুতরাং এক এক যোগের পরিমাণ ৮০০ কলা। কারণ ২১৬০০ কলায় রাশিচক্র। তা'র ২৭ ভাগের এক ভাগ আট শ কলা।"

আমি। "কিন্তু এ রূপে নির্ণয় করা ব্যতীত কি আর কোনও উপায় নাই?"

গুরুদেব। "আছে বৈ কি। পঞ্চাঙ্গ-সাধন সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে সে গুলির যে কোনও খানির মতে কসিলে সহজেই যে কোনও বর্ষের পঞ্জিকা করা যেতে পারে। কিন্তু অতীত কালের বা ভবিষ্যতের কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনের তিথ্যাদি সাধন ক'ত্তে হ'লে, গ্রহস্ফুটই প্রশস্ত। শীঘ্রই আমি তোমাকে, রবি ও চন্দ্রের, স্ফুট নির্ণয়ের নানা সঙ্কেত দেখিয়ে দিব। যেটা তোমার সুবিধা বোধ হয় অবলম্বন ক'রো। আপাততঃ আমার এই খাতা থেকে এই টেবিল ক'টা তুলে নিও, তার পর এরি সাহায্যে সহজে তিথ্যাদি আনয়নের সঙ্কেত বুঝিয়ে দিব।"

আমি। "এত এগুনি ব'সে ব'সে লিখে নিতে পার্ব্বো না। একটু সময় প্রয়োজন।"

গুরুদেব। "বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লিখ্‌তে পার।"

আমি। "আচ্ছা, তাই ক'র্ব্বো। আজ আপনি অনুগ্রহ ক'রে, ইংরাজী বাঙ্গালা তারিখের মিল করা শিখিয়ে দিন।"

গুরুদেব। "বেশ কথা, ওটা একটা বিশেষ দরকারী বিষয় বটে। তুমি ত যে কোনও বাঙ্গালা তারিখের বার নির্ণয় ক'ত্তে শিখেছ। এখন যে কোনও ইংরাজী তারিখের বার বাহির ক'ত্তে শিখ্‌লেই সামঞ্জস্য করা সহজ হ'য়ে যা'বে। প্রথমতঃ ইংরাজী যে খ্রীষ্টাব্দের যে তারিখের বার নির্ণয় ক'ত্তে চাও সেই খ্রীষ্টাব্দের অঙ্ক রেখে তার নীচে তা'রি চতুর্থাংশ রাখ, তা'র নীচে খ্রীষ্টাব্দের একক আর দশকাঙ্ক মুছে দিলে যে অঙ্ক বাকি থাকে তার চতুর্থাংশ, তার নীচে অভীষ্ট মাস জানুয়ারি হ'লে (০), ফেব্রুয়ারি হ'লে (৩), মার্চ্চ হ'লে (৩), এপ্রেলে (৬), মে হ'লে (১), জুনে (৪), জুলাইয়ে (৬), আগষ্টে (২), সেপ্টেম্বরে (৫), অক্টোবরে (০), নবেম্ব[illegible] এবং ডিসেম্বরে (৫) রাখ, তার নীচে অভীষ্ট দিন সংখ্যা। এই গুলি যোগ ক'রে তাহা হইতে খ্রীষ্টাব্দের একক দশক বাদে যে অঙ্ক তাহা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে যা ভাগ শেষ থাকবে তা'ই রবিবার হতে বার সংখ্যা। চতুর্থাংশের শেষ ল'বে না।"

খ্রীষ্টাব্দের বর্ষ ধ্রুবাঙ্ক চক্র।

	ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত
১৭০০	*	৫৩	৫৪	৫৫	*	*	৫৭	*	*	*	*	৫৬	*	*
	৫৮	৫৯	*	*	৬১	৬২	৬৩	*	*	৬০	*	*	*	*
	*	*	৬৫	৬৬	৬৭	*	*	৬৪	*	*	*	*	৬৮	*
	৬৯	৭০	৭১	*	*	৭৩	৭৪	*	*	*	৭২	*	*	*
	৭৫	*	*	৭৭	৭৮	৭৯	*	*	৭৬	*	*	*	*	৮০
	*	৮১	৮২	৮৩	*	*	৮৫	*	*	*	*	৮৪	*	*
	৮৬	৮৭	*	*	৮৯	৯০	৯১	*	*	৮৮	*	*	*	*
	*	*	৯৩	৯৪	৯৫	*	*	৯২	*	*	*	*	৯৬	*
	৯৭	৯৮	৯৯	০০	০১	০২	০৩	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	০৫	০৬	০৭	*	*	০৪	*	*	*	*	০৮	*
১৮০০	০৯	১০	১১	*	*	১৩	১৪	*	*	*	১২	*	*	*
	১৫	*	*	১৭	১৮	১৯	*	*	১৬	*	*	*	*	২০
	*	২১	২২	২৩	*	*	২৫	*	*	*	*	২৪	*	*
	২৬	২৭	*	*	২৯	৩০	৩১	*	*	২৮	*	*	*	*
	*	*	৩৩	৩৪	৩৫	*	*	৩২	*	*	*	*	৩৬	*
	৩৭	৩৮	৩৯	*	*	৪১	৪২	*	*	*	৪০	*	*	*
	৪৩	*	*	৪৫	৪৬	৪৭	*	*	৪৪	*	*	*	*	৪৮
	*	৪৯	৫০	৫১	*	৫২	৫৩	*	*	*	*	৫২	*	*
	৫৪	৫৫	*	*	৫৭	৫৮	৫৯	*	*	৫৬	*	*	*	*
	*	*	৬১	৬২	৬৩	*	*	৬০	*	*	*	*	৬৪	*
	৬৫	৬৬	৬৭	*	*	৬৯	৭০	*	*	*	৬৮	*	*	*
	৭১	*	*	৭৩	৭৪	৭৫	*	*	৭২	*	*	*	*	৭৬
	*	৭৭	৭৮	৭৯	*	*	৮১	*	*	*	*	৮০	*	*
	৮২	৮৩	*	*	৮৫	৮৬	৮৭	*	*	৮৪	*	*	*	*
	*	*	৮৯	৯০	৯১	*	*	৮৮	*	*	*	*	৯২	*
	৯৩	৯৪	৯৫	*	*	৯৭	৯৮	*	*	*	৯৬	*	*	*
	৯৯	০০	০১	০২	০৩	*	*	*	*	*	*	*	০৪	*
১৯০০	*	০৫	০৬	০৭	*	*	০৯	*	*	*	০৮	*	*	*
	১০	১১	*	*	১৩	১৪	১৫	*	১২	*	*	*	*	১৬
	*	*	১৭	১৮	১৯	*	*	*	*	*	*	২০	*	*
	২১	২২	২৩	*	*	২৫	২৬	*	*	২৪	*	*	*	*
	২৭	*	*	২৯	৩০	৩১	*	২৮	*	*	*	*	৩২	*
	*	৩৩	৩৪	৩৫	*	*	৩৭	*	*	*	৩৬	*	*	*
	৩৮	৩৯	*	*	৪১	৪২	৪৩	*	৪০	*	*	*	*	৪৪
	*	*	৪৫	৪৬	৪৭	*	*	*	*	*	*	৪৮	*	*
	৪৯	৫০	৫১	*	*	৫৩	৫৪	*	*	৫২	*	*	*	*
	৫৫	*	*	৫৭	৫৮	৫৯	*	৫৬	*	*	*	*	৬০	*
	*	৬১	৬২	৬৩	*	*	৬৫	*	*	*	৬৪	*	*	*
	৬৬	৬৭	*	*	৬৯	৭০	৭১	*	৬৮	*	*	*	*	৭২
	*	*	৭৩	৭৪	৭৫	*	*	*	*	*	*	৭৬	*	*
	৭৭	৭৮	৭৯	*	*	৮১	৮২	*	*	৮০	*	*	*	*
	৮৩	*	*	৮৫	৮৬	৮৭	*	৮৪	*	*	*	*	৮৮	*
	*	৮৯	৯০	৯১	*	*	৯৩	*	*	*	৯২	*	*	*
	৯৪	৯৫	*	*	৯৭	৯৮	৯৯	৯৬	*	*	*	*	২০০০	২০০০

আমি। "আচ্ছা, আমি একটা কসি। আঠার শত আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবরের বার নির্ণয় ক'র্ব্বো। আপনি দেখুন ভুল করি কি না? খ্রীষ্টাব্দাঙ্ক রাখ্‌লাম, তা'র নীচে তা'র চতুর্থাংশ চা'র শ চৌষট্টি। শেষ দুই ছেড়ে দিলাম। তা'র পর অব্দের একক দশক বাদে আঠার, তা'র চতুর্থাংশ চা'র।

```
১৮৫৮
 ৪৬৪
   ৪
   ০
  ১৮
----
২৩৪৪
  ১৮
----
২৩২৬
```

তা'র নীচে মাসাঙ্ক ০ ও তারিখ ১৮ মোট তেইশ শ চুয়াল্লিশ। সাত দিয়ে ভাগ দিই?"

গুরুদেব। "না, আগে একক দশক বাদে খ্রীষ্টাব্দের অঙ্কটা অর্থাৎ ১৮ বাদ দাও।"

আমি। "হাঁ, ভুল্‌ছিলাম, আঠার বাদ দিয়ে তেইশ শ ছাব্বিশ হ'লো। সাত দিয়ে ভাগ দিয়ে পেলাম দুই। তবে সোমবার, কি বলেন?"

গুরুদেব। "হাঁ সোমবার।"

আমি। "এ ছাড়া আর নিয়ম নেই?"

গুরুদেব। "আছে। আমার খাতার বার নির্ণয়-সারিণীটা বাহির কর। তা থেকে সহজে বার পা'বে।"

আমি সারিণীটি বাহির করিলাম। সেটি এই—

ধ্রুবাঙ্ক যোগে বার নির্ণয় চক্র।

ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	মাসের তারিখ				
র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ	১	৮	১৫	২২	২৯
সো	ম	বু	বৃ	শু	শ	র	২	৯	১৬	২৩	৩০
ম	বু	বৃ	শু	শ	র	সো	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বু	বৃ	শু	শ	র	সো	ম	৪	১১	১৮	২৫	৩২
বৃ	শু	শ	র	সো	ম	বু	৫	১২	১৯	২৬	*
শু	শ	র	সো	ম	বু	বৃ	৬	১৩	২০	২৭	*
শ	র	সো	ম	বু	বৃ	শু	৭	১৪	২১	২৮	*

সারিণী দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি ব্যবহারের নিয়ম কি?"

গুরুদেব। "প্রথমে যে বর্ষের যে মাসের যে তারিখের বার নির্ণয় ক'র্ত্তে হ'বে, বর্ষধ্রুবাঙ্ক চক্র দৃষ্টে সেই খ্রীষ্টাব্দের ধ্রুবাঙ্ক নির্ণয় কর, যেমন তোমার পূর্ব্ব প্রশ্নে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ধ্রুবাঙ্ক **ছ**, এই ছ-এর সাহায্যে মাস ধ্রুবাঙ্ক চক্রে দেখ অক্টোবরের ধ্রুবাঙ্ক (ছ) এই ছ-এর সাহায্যে বার নির্ণয় চক্রে ১৮ই তারিখের সমসূত্রে ছয়ে নীচে পাইবে সোমবার। পূর্ব্বের অঙ্ক দ্বারাও তাহাই আসিয়াছিল। এখন দেখ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কত শকাব্দা।"

আমি। "১৭৮০ শকাব্দা।"

বর্ষ ধ্রুবাঙ্ক যোগে মাস ধ্রুবাঙ্ক নির্ণয় চক্র।

বর্ষ ধ্রুবাঙ্ক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রেল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
ক	ক	ঘ	ঘ	জ	খ	চ	জ	গ	ছ	ক	ঘ	ছ
খ	খ	চ	চ	ক	গ	ছ	ক	ঘ	জ	খ	চ	জ
গ	গ	ছ	ছ	খ	ঘ	জ	খ	চ	ক	গ	ছ	ক
ঘ	ঘ	জ	জ	গ	চ	ক	গ	ছ	খ	ঘ	জ	খ
চ	চ	ক	ক	ঘ	[illegible]	খ	চ	জ	গ	চ	ক	গ
ছ	ছ	খ	খ	চ	জ	গ	ছ	ক	ঘ	ছ	খ	ঘ
জ	জ	গ	গ	ছ	ক	ঘ	জ	খ	চ	জ	গ	চ
ঝ	ক	ঘ	চ	ক	গ	ছ	ক	ঘ	জ	খ	চ	জ
ট	খ	চ	ছ	খ	ঘ	জ	খ	চ	ক	গ	ছ	ক
ঠ	গ	ছ	জ	গ	চ	ক	গ	ছ	খ	ঘ	জ	খ
ড	ঘ	জ	ক	ঘ	ছ	খ	ঘ	জ	গ	চ	ক	গ
ঢ	চ	ক	খ	চ	জ	গ	চ	ক	ঘ	ছ	খ	ঘ
ণ	ছ	খ	গ	ছ	ক	ঘ	ছ	খ	চ	জ	গ	চ
ত	জ	গ	ঘ	জ	খ	চ	জ	গ	ছ	ক	ঘ	ছ

গুরুদেব। "১৮ই অক্টোবর কি মাস হওয়া উচিত?"

আমি। "কার্ত্তিকের প্রথম।"

গুরুদেব। "কস, ১৭৮০ শকের কার্ত্তিক কি বারে আরম্ভ।"

আমি। "একবার কসে ছিলাম এই দেখুন কার্ত্তিকের ১লা শনিবার ২রা রবিবার (২৩ পৃঃ দেখ)। কাজেই ৩রা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর সোমবার হইবে।"

গুরুদেব। "৩রা কার্ত্তিকই ১৮ই অক্টোবর হ'বে। তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ঐটা ঠিক কর্‌বার জন্য আর একটা সঙ্কেত শিখে রাখ। যে শকের যে মাসের যে তারিখ মিলাইতে হইবে, তাহার সহিত ৭৮।৩।১৩ যোগ করিবে যেমন ১৭৮০।৬।২ দ্বারা ১৭৮০ শক ২রা কার্ত্তিক লিখিয়া তাহার সহিত ঐ ৭৮।৩।১৩ যোগ করিবে এবং মে, জুলাই, আগষ্টের ৩ দিন যোগ দিলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৮ই অক্টোবর পা'বে; ইহারই সন্নিহিত দিনে যে দিন বার মিলিবে সেই দিন ইংরাজী অভীষ্ট তারিখ বুঝিতে হইবে। সুতরাং ১৮ই অভীষ্ট রিখ।"

```
২৭৮০।৬। ২
  ৭৮।৩।১৩
         ৩
-----------
১৮৫৮।৯।১৮
```

আমি "আচ্ছা ইংরাজীর যেমন, টেবিল আছে বাঙ্গালার কি সেরূপ কোনও টেবিল নাই?"

রবির নক্ষত্র-সঞ্চার চক্র।

নক্ষত্র	দিন	দণ্ড	পল	নক্ষত্র	দিন	দণ্ড	পল
বৈশাখ				কার্ত্তিক			
অশ্বিনী	১৩ দিন	৪৫ দণ্ড	১৫ পল	চিত্রার্দ্ধ	৬ দিন	৩৮ দণ্ড	২৫ পল
ভরনী	১৩ „	৫৪ „	১৫ „	স্বাতী	১৩ „	১৬ „	৪৯ „
কৃত্তিকা	৩ „	২৬ „	১৯ „	বিশাখা-ত্রিপাদ	৯ „	৫৭ „	৩৭ „
জ্যৈষ্ঠ				অগ্রহায়ণ			
কৃত্তিকা	১০ দিন	২৮ দণ্ড	৩৩ পল	বিশাখাপাদ	৩ দিন	১৬ দণ্ড	৩৩ পল
রোহিণী	১৩ „	৫৮ „	৪ „	অনুরাধা	১৩ „	৬ „	১৪ „
মৃগশিরার্দ্ধ	৬ „	৫৯ „	২ „	জ্যেষ্ঠা	১৩ „	৬ „	১৪ „
আষাঢ়				পৌষ			
মৃগশিরার্দ্ধ	৭ দিন	১ দণ্ড	৫৪ পল	মূলা	১৩ দিন	১ দণ্ড	৫১ পল
আর্দ্রা	১৪ „	৩ „	৪৯ „	পূর্ব্বাষাঢ়া	১৩ „	১ „	৫১ „
পুনর্বসুত্রিপাদ	১০ „	৩২ „	৫২ „	উত্তরাপাদ	৩ „	১৫ „	২৭ „
শ্রাবণ				মাঘ			
পুনর্ব্বসু ১ পাদ	৩ দিন	২৯ দণ্ড	৪৭ পল	উত্তরা-ত্রিপাদ	৯ দিন	৪৯ দণ্ড	৮ পল
পুষ্যা	১৩ „	৫৯ „	৫ „	শ্রবণা	১৩ „	৫ „	৩০ „
অশ্লেষা	১৩ „	৫৯ „	৫ „	ধনিষ্ঠার্দ্ধ	৬ „	৩২ „	৪৫ „
ভাদ্র				ফাল্গুন			
মঘা	১৩ দিন	৪৬ দণ্ড	৪৯ পল	ধনিষ্ঠার্দ্ধ	৬ দিন	৩৭ দণ্ড	৪৮ পল
পূর্ব্ব ফাল্গুনী	১৩ „	৪৬ „	৪৯ „	শতভিষা	১৩ „	১৫ „	৩৫ „
উত্তরা ১ পাদ	৩ „	২৬ „	৪২ „	পূর্ব্বভাদ্র-ত্রিপাদ	৯ „	৫৬ „	৪১ „
আশ্বিন				চৈত্র			
উত্তরা ত্রিপাদ	১০ দিন	৮ দণ্ড	৩৩ পল	পূর্ব্বভাদ্রপাদ	৩ দিন	২২ দণ্ড	২৭ পল
হস্তা	১৩ „	৩১ „	২৫ „	উত্তরভাদ্র	১৩ „	২৯ „	৪৮ „
চিত্রার্দ্ধ	৬ „	৪৫ „	৪২ „	রেবতী	১৩ „	২৯ „	৪৮ „

গুরুদেব। "বাঙ্গালার সেরূপ টেবিল হওয়া সম্ভব নয়। তবে ইংরাজী বাঙ্গালায় সামঞ্জস্য ক'রে একটা টেবিল আমার খাতায় আছে, সেটা অত্যন্ত বিস্তৃত সময় মত সেটা তুলে নিও *।"

---

* জ্যোতিষ প্রসঙ্গ যদি ভগবদীচ্ছায় সম্পূর্ণ করিতে পারি তবে পরিশিষ্টে আমার সংগৃহীত সমস্ত টেবিল এ[illegible]ন দিবার ইচ্ছা আছে। এখানে সে সকল টেবিল দিলাম না।

আমি। "আমিত সে টেবিল ও তিথ্যাদির টেবিল তুলে ল'ব। এখন স্থূলভাবে যে কোনও দিনের রবি ও চন্দ্রের স্ফুট নির্ণয়ের কোনও উপায় ব'লে দিন, তারি সাহায্যেই তিথ্যাদি নির্ণয় করে নেওয়া যাবে।"

গুরুদেব। "পরিশ্রমের লাঘব ক'ত্তে গেলেই, ভ্রমের পরিমাণ বেড়ে যা'বে। এলেন লিও (Alan Leo) প্রণীত Casting the Horoscope গ্রন্থ একখানি সংগ্রহ ক'রে নিও তাতে তুমি প্রায় ষাইট বৎসরের গ্রহস্ফুট পা'বে তা'রি সাহায্য, নিরয়ণ রবিচন্দ্র নির্ণয় ক'রে তা থেকে তিথি প্রভৃতি ক'সে নিও। যদি একান্তই স্থূল ভাবে রবিচন্দ্র নির্ণয়ের সঙ্কেত চাও তবে শুন। বৈশাখ সংক্রমণ অর্থাৎ মহাবিষুব সংক্রমণ সময়ে রবি মেষের প্রথমাংশের প্রারম্ভে থাকেন। তখন স্ফুট ০।০।০, তারপর এই টেবিল অনুসারে রবির নক্ষত্র সঞ্চার নির্ণয় ক'রে, নক্ষত্র দ্বারা, স্থূল স্ফুট নির্ণয় ক'রো। একটা দৃষ্টান্ত দিই মনে কর ১৩১৯ সালে রবি হস্তানক্ষত্রে ক'বে যা'বেন স্থির ক'ত্তে হ'বে। প্রথমতঃ জান হস্তাতে আশ্বিন মাসে যা'বেন। এখন এই আশ্বিন সংক্রমণ কত দণ্ডের সময় হ'য়েছে স্থির কর।

পাওয়া গেল আশ্বিন প্রবৃত্তি দণ্ড	০ । ১৫ । ৫৭
তাহার সহিত উত্তরা ত্রিপাদ	১০ । ৮ । ৩৩
যোগ করিয়া হস্তাপ্রবেশ	১০ । ২৪ । ৩০

অর্থাৎ হস্তায় রবি আশ্বিনের ১০ই ২৪ দণ্ড ৩০ পলে প্রবেশ করিবেন। সুতরাং ঐ সময়ে রবি ৮০০ × ১২ = ৯৬০০ কলা বা ৫ রাশি ১০ অংশ। ইহা স্থূল হিসাব। সূক্ষ্ম হিসাবে একটু তারতম্য হইবে। তার পর চন্দ্রের জন্যও একটা সঙ্কেত বলি, আমার এই খাতায়, ১৮৫০ থেকে ১৮৬২ পর্য্যন্ত এই সায়ন চন্দ্রস্ফুট লেখা রয়েছে। এই গুলা তুলে নিও। তা'র পর যে বৎসরের যে মাসের চন্দ্রস্ফুট প্রয়োজন সেই বৎসরের থেকে যতবার বার বাদ দিলে এই ক'টি বৎসরের কোনও বৎসর বাহির হ'বে, সেই বৎসরের উক্ত তারিখ হইতে যে কয়বার বারো বাদ দিয়াছি, ৫৭ দিন কে তত গুণ ক'রে তারিখে যোগ কর, তাহা হ'লে যে তারিখ পাওয়া যা'বে সেই তারিখের চন্দ্রের সায়নস্ফুটে বা ৪।১।১০ রাশ্যাদিকে তত গুণ ক'রে যোগ ক'ল্লে যত রাশ্যাদি হ'বে তাই অভীষ্ট মধ্যাহ্নে চন্দ্রস্ফুট। এটা অবশ্য স্থূল। সুতরাং যত অধিক বার বিয়োগ ক'ত্তে হ'বে ততই স্ফুটে কিছু অন্তর হ'বে। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। এই দেখ ১৯০৯ এর পাঁজি আছে সুতরাং এই সূত্রের সাহায্যে ১৯০৯ এর ১লা জানুয়ারি চন্দ্র নির্ণয় করা যাক।

অভীষ্টকাল খ্রী ১৯০৯ । ০ । ১ । ০ দণ্ড

ইহা হইতে (১২ × ৪) = ৪৮ বর্ষ বাদ দিয়া—

পাওয়া গেল ১৮৬১ । ০ । ১ । ০

ইহাতে (৪ × ৫৭) = ২২৮ দিন যোগ করিয়া

১৮৬১।০।২২৯।০

বা জানুয়ারি হইতে জুলাই ২১২ দিন

১৮৬১।৭।১৭।০ হইল

ঐ দিনে সায়ন চন্দ্রস্ফূট ৯।১৮।১৫
তাহার সহিত ৪।১।১০ × ৪ চক্র বাদ দিয়া ৪। ৪।৪০ যোগ করিয়া
চক্র বাদ দিয়া ১।২২।৫৫ হইল।

অর্থাৎ বৃষ রাশির অংশ ৫৫ কলা পঞ্জিকায় দেখ ২২ অংশ ৫৩ কলা। সুতরাং চারি বর্গে দুই কলামাত্র তফাৎ—হয়ত উভয় পঞ্জিকায় বিকলা পর্য্যন্ত থাক্‌লে তফাৎ আরও কম হ'তো। ঐ যে স্থূল পঞ্চাঙ্গ সারিণী ওটা তুলে নিলে আমি তার পর তোমায় প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিব। আজ তোমায় আর গোটাকত সঙ্কেত বলে দিই এ গুলাও স্থূল। বাঁকুড়ার শ্রীশ্রীহরি ভট্টাচার্য্য নামে একজন পণ্ডিত চির পঞ্জিকা ব'লে একখানি ক্ষুদ্র পঞ্জিকা প্রচার ক'রে ছিলেন; বোধ হয় ঐ বই আর বাজারে পাওয়া যায় না, এজন্য তাঁ'র সূত্র গুলি লিখে নাও—

"স্বপাদযুক্ত শাকাব্দো মাসাঙ্কদিন সংযুতঃ।
দ্বি-যুক্তঃ সপ্তভিহীনো বারো ভবতি নান্যথা॥
০ ৩ ৬ ৩ ০ ৩ ৫ ০
খ-নয়ন-বস-নেত্রং নৃত্য-নেত্রেষু-শূন্যম।
১ ২ ৪ ৬
বিধু-কর-যুগ-ষট্‌কং মাসিকং স্যাদ্ধ্রুবাঙ্ক॥
যুগহরণ সমাপ্তৌ বৎসরে সিংহ আশ্বে।
৬ ২
ধ্রুবমৃতু করমিষ্টং শ্রীহরের্বার বোধ॥

অর্থাৎ স্বপাদযুক্ত শকাব্দাঙ্কে মাসাঙ্ক ও ইষ্টদিন ও অতিরিক্ত ২ যোগ করিয়া সাত দিয়া ভাগ করিলে নিশ্চয় বারাঙ্ক পাওয়া যাইবে। বৈশাখাদি ক্রমে ০, ৩, ৬, ৩, ০, ৩, ৫, ০, ১, ২, ৪, ৬ মাসিক ধ্রুবাঙ্ক. কিন্তু কোন শকে চারিদ্বারা ভাগ দিয়া বাকি না থাকিলে সিংহ (ভাদ্র) ও আশ্বিনে যথাক্রমে ৬ ও ২ ধ্রুবাঙ্ক গ্রহণ করিবে, শ্রীহরি কৃত বার বোধের এই সূত্র। এখন দেখ্‌তে পাচ্চো এই ধ্রুবাঙ্ক গুলিই তোমায় পূর্ব্বে মাসিক ধ্রুবাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। এ সূত্র দিয়েও কসে দেখো। তার পর তিথির সূত্র—

"ঊনবিংশাবশিষ্টংহি শাকং রুদ্রেণ পূরয়েৎ।
ষড়্‌যুতো দিন মাসাঙ্কস্ত্রিংশদ্ধীনস্তিথির্ভবেৎ॥
০ ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ১০ ১০ ৯ ৯
খ-বিধু-দৃগিষুবাব্ধিঃ খেট্‌-দিগ্‌-দিগ্‌ গ্রহাঙ্কং
১০ ১০
দশ-দশ চ তিথিজ্ঞামাধ্রুবং শ্রীহরীষ্টম্‌।

---

* আমরা ঐ স্ফুট এখন দিলাম না। পরিশিষ্টে, গ্রহস্ফুট তালিকা দিবার ইচ্ছা রহিল। তার পর ভগবদীচ্ছা। সিদ্ধান্ত রহস্যানুমত গ্রহস্ফুট প্রণালীর প্রতি গ্রহের কথা বলিবার সময় অন্যান্য মত আলোচিত হইবে।

অর্থাৎ শকাব্দা সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা ভাগ দিলে যা অবশেষ থাকবে তা'কে ১১ দিয়া গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহাতে মাসাঙ্ক ও দিনাঙ্ক এবং ছয় যোগ করিয়া ৩০ দিয়া ভাগ দিলে অবশিষ্টই তিথি হইবে। এই তিথি গণনায় মাসাঙ্ক বৈশাখাদিক্রমে ০, ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১০, ১০, ৯, ৯, ১০, ১০ গ্রহণ করিতে হইবে। একটা উদাহরণ দেখ ১৮৩৪ শক ১৯ দিয়া ভাগ দিলে বাকী ১০ দশ তাহাকে এগার দিয়া গুণ ক'রে হলো একশদশ তা'তে জ্যৈষ্টের অঙ্ক ১ এক তারিখের সংখ্যা ২৫ এবং ৬ যোগ হ'লো ১৪২ তা'কে ৩০ দিয়া ভাগ দিয়ে বাকী পেলাম ২২ কৃষ্ণা সপ্তমী। তার পর নক্ষত্রের সূত্র—

১ ৩ ৫ ৭ ১০ ১২
"ক্ষিতি-ত্রি-বাণশ্ব-হরিদ্-দিনেশং

১৩ ১৫ ১৯
চতুর্দ্দশং পঞ্চদশোনবিংশং।

২১ ২৩ ২৫
তথৈকবিংশং ত্রয়-পঞ্চবিংশং

চান্দ্রং ধ্রুবাঙ্কং তিথিযুক্তমৃক্ষম্॥"

অগ্রে তিথি নির্ণয় করে সেই অঙ্কে বৈশাখাদিক্রমে ১, ৩, ৫, ৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২১ ২৩, ২৫, মাসাঙ্ক যোগ কোরে যদি সাতাশের কম হয় তবে তাই নক্ষত্র নহিলে ২৭ অন্তর ক'ল্লে নক্ষত্রাঙ্ক পাওয়া যা'বে। যেমন পূর্ব্বপ্রাপ্ত জ্যৈষ্টের কৃষ্ণ সপ্তমী ২২এ জ্যৈষ্ঠ মাসিকাঙ্ক ৩ যোগ কোল্লে ২৫ হ'বে এই পঁচিশ অর্থাৎ পূর্ব্বভাদ্রপদ ঐ দিনের নক্ষত্র। নক্ষকে ৪ গুণ করে নয় দিয়ে ভাগ দিলে যদি ভাগশেষ না থাকে তবে ভাগ ফলই রাশি নহিলে তাহাতে এক যোগ করিলে রাশি (চন্দ্র ভোগ্য) পাওয়া যায় যেমন ২৫ × ৪ ÷ ৯ = ১১ রাশি পূর্ব্বার্দ্ধে ১২ রাশি শেষার্দ্ধে। এই সূত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট তিথ্যাদি দিবারাত্রির কোনও সময় থাকিবে, এইমাত্র। সুতরাং ইহা দ্বারা বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তুমি যা কিছু সূত্র শিখ্‌চো, প্রত্যেক সূত্রেরই দু পাঁচটা কোরে অঙ্ক কল্পনা কোরে কোসো, তা না হলে সূত্র গুলো ভাল কোরে আয়ত্ব হ'বে না।"

আমি। যে আজ্ঞা, আমি তাই করে থাকি, আপনি যে অঙ্ক নির্দ্দেশ কোরে দিয়েছেন, তার চেয়ে আরও অনেক কসেছি।

গুরুদেব। আমি নির্দ্দেশ কোরে আর দিব না, তুমিই নিজে নিজে কোসো।

_ আমরা ইতঃপর আর প্রশ্ন দিব না। মনে করিয়াছিলাম, যাঁহারা অভ্যাস করিতেছেন তাঁহারা ঐ গুলি কসিবেন। কিন্তু আমাদের জানার মধ্যে তিন চারিজন জ্যোতিষ-প্রসঙ্গের সাহায্যে জ্যোতিষ অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু কেবল একটি পাঠিকা বই আর কেহই ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর করেন নাই। জানিলাম, এই পাঠিকাটিও গৃহস্থ গ্রহণ করেন না। কোন আত্মীয়ের কাছে পাইয়া তাহা হইতে জ্যোতিষাংশ কাপী করিয়া লইয়া অভ্যাস করিতেছেন। সুতরাং আমাদের প্রশ্নও যথা সময়ে তাঁহার হস্তগত হয় না। উত্তরও যথা সময়ে দিতে পারেন না। সুতরাং প্রশ্ন দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

এতন্মাত্রাত্রয়ং দেবি তব রূপং সরস্বতি।
বিভিন্নদর্শিনামাদ্যা ব্রহ্মণো হি সনাতনাঃ ॥ ৩৭ ॥
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাশ্চ সপ্ত যাঃ।
তাস্ত্বদুচ্চারণাদ্দেবি ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥
অনির্দ্দেশ্যং তথা চান্যদর্দ্ধমাত্রা*ন্বিতং পরম্।
অবিকার্য্যক্ষয়ং দিব্যং পরিণামবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৯ ॥
তবৈব চ পরং রূপং যন্ন শক্যং ময়েরিতুম্।
ন চাস্যেন ন তজ্জিহ্বা-তাল্বোষ্ঠাদিভিরুচ্যতে ॥ ৪০ ॥
ইন্দ্রোঽপি বসবো ব্রহ্মা চন্দ্রার্কৌ জ্যোতিরেব চ।
বিশ্বাবাসং বিশ্বরূপং বিশ্বেশং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪১ ॥

প্রণবের এই তিন মাত্রা দেবি
তব রূপ সুনিশ্চয়,
ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন মতে
ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়।
তাঁ'দের কারণে ব্রহ্মবাদিগণে
অভেদ বিচার করি'
সোমসংস্থ আর হবিঃসংস্থ সার
পাকসংস্থ ভেদ ধরি',
সপ্ত সনাতন ব্যাহৃতির গণ
করিলেন নিরূপণ।
সে সব তোমাতে তুমি সে সবাতে
জানি করে উচ্চারণ। ৩৭-৩৮।
অনির্দ্দেশ্য-রূপ অতি অপরূপ
যোগে হয় দরশন,
অর্দ্ধমাত্রান্বিত* শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-স্থিত
অবিকার্য্য সনাতন;

অক্ষয় চিন্ময় দিব্যরূপ হয়
পরিণাম নাহি যার
তোমার সেরূপ অতি অপরূপ
বর্ণে বর্ণে সাধ্য কা'র? ৩৯।
তব সেইরূপ সর্ব্বতত্ত্বরূপ
বর্ণিতে আমি না পারি,
আস্য জিহ্বা আর বর্ণনে তাহার
ওষ্ঠ তালু যায় হারি'। ৪০।
ইন্দ্র, বসুগণ, ব্রহ্মা সনাতন,
চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোতিঃ আর
বিশ্বের আবাস বিশ্ব-পরকাশ
স্বরূপ জানি তাহার।
বিশ্বের স্বরূপ বিশ্বের ঈশ্বর
যিনি সে পরমেশ্বর,
যেবা যেই ভাবে তাঁ'রে ভবে ভাবে
কেহ নহে অন্য পর। ৪১।

* প্রণবের ৮ অর্দ্ধমাত্রা নামে কথিতা হয়েন, অনির্দ্দেশ্যরূপ বাক্যে বুঝান যায় না। দহরাকাশে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়েন।

সাংখ্যবেদান্তবেদোক্তং বহুশাখাস্থিরীকৃতম্।
অনাদিমধ্যনিধনং সদসন্ন সদেব তু ॥ ৪২ ॥
একং ত্বনেকং নাপ্যেকং ভবভেদসমাশ্রিতম্।
অনাখ্যং ষড়্ গুণাখ্যঞ্চ ষট্কাখ্যং ত্রিগুণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
নানাশক্তিমতামেকং শক্তিবৈভাবিকং পরম্।
সুখাসুখং মহৎসৌখ্যংরূপং তব বিভাব্যতে ॥ ৪৪ ॥
এবং দেবি ত্বয়া ব্যাপ্তং সকলং নিষ্কলঞ্চ যৎ।
অদ্বৈতাবস্থিতং ব্রহ্ম যচ্চ দ্বৈতে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥
যেঽর্থা নিত্যা যে বিনশ্যন্তি চান্যে
যে বা স্থূলা যে চ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাঃ।
যে বা ভূমৌ যেঽন্তরীক্ষেঽন্যতো বা
তেষাং সত্যং ত্বত্ত এবোপলব্ধিঃ ॥ ৪৬ ॥

বেদের যে মত সাংখ্যের যে মত
বেদান্তের মত যাহা,
বেদশাখাচয় যেই তত্ত্ব কয়
প্রণব স্বরূপ তাহা।
আদি মধ্য অন্ত না পাই, অনন্ত
সদা সবে বলে যাঁ'রে,
সদসৎ নয় করি'ছে নিশ্চয়
ব্রহ্মবাদিগণ তাঁ'রে। ৪২।
ভব ভেদময় এই হেতু হয়
নানা ভেদ জ্ঞান তাঁ'র,
তিনি মাত্র এক তথাপি অনেক
ভেদাভেদ তত্ত্ব যাঁ'র।
আখ্যা যাঁ'র নাই গুণ, বর্গ তাই
আখ্যা বলি' সবে কয়,
কিন্তু হ'লে জ্ঞান পায় ত প্রমাণ
তিনি ত্রি-গুণ আশ্রয়। ৪৩।
প্রণব-স্বরূপ অতি অপরূপ
এক তাহা সুনিশ্চয়,

নানা শক্তিমান্ এক করে জ্ঞান
শ্রেষ্ঠ শক্তি সেই হয়।
সুখ কি অসুখ কিম্বা মহাসুখ
সকলি তোমাতে আছে,
এই সে কারণে আশা করি' মনে
এ'সেছি তোমার কাছে। ৪৪।
দেবি, তব পায় সবি শোভা পায়,
তুমি ব্যাপ্ত চরাচরে,
স-ফল নিষ্ফল জগতে সকল
তোমারে আশ্রয় ক'রে।
অদ্বৈতাবস্থিত কিম্বা দ্বৈতে স্থিত
ব্রহ্ম বলি' যাঁ'রে কয়
সেই তত্ত্ব হয় তোমাতে বিলয়
জেনেছি আমি নিশ্চয়। ৪৫।
যেই তত্ত্ব নিত্য যে সব অনিত্য
স্থূল সূক্ষ্ম আদি আর,
ভৌম, আন্তরীক্ষ, কিম্বা সে অন্যত্র
সবারি তুমি আধার। ৪৬।

যচ্চামূর্ত্তং যচ্চ মূর্ত্তং সমস্তং
যদ্বা ভূতেষ্বেকমেকঞ্চ কিঞ্চিৎ।
যদ্দিব্যেস্তি ক্ষ্মাতলে খেঽন্যতো বা
ত্বৎ সম্বন্ধং ত্বৎ স্বরৈর্ব্যঞ্জনৈশ্চ ॥ ৪৭ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জিহ্বা সরস্বতী।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং নাগমশ্বতরং ততঃ ॥ ৪৮ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

বরং তে কম্বলভ্রাতঃ প্রযচ্ছাম্যুরগাধিপঃ।
তদুচ্যতাং প্রদাস্যামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৯ ॥

অশ্বতর উবাচ।

সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্ব্বং কম্বলমেব মে।
সমস্ত-স্বরসম্বন্ধমুভয়োঃ সম্প্রযচ্ছ চ ॥ ৫০ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

সপ্ত স্বরা গ্রামরাগাঃ সপ্তপন্নগসত্তম।
গীতকানি চ সপ্তৈব তাবতীশ্চাপি মূর্চ্ছনাঃ ॥ ৫১ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্ত আর সমস্তে তোমার
বিকাশ দেখিতে পাই,
সর্ব্বভূতে সত্বা তব শক্তিমত্বা
ইহাতে সংশয় নাই।
স্বর্গে ধরাতলে কিম্বা রসাতলে
অন্যত্র সর্ব্বত্র তুমি,
তব স্বর আর, ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনে
বুঝি সেই সব আমি।" ৪৭।
দ্বিজপুত্র বলে "এ স্তবের বলে
বিষ্ণু-জিহ্বা সরস্বতী
আসিয়া সত্বরে নাগ অশ্বতরে
বলিলা হেন ভারতী। ৪৮।
"শুনহ কম্বল ভ্রাতা," বলিলেন বাণী,
"উরগ-ঈশ্বর, শুন আমার এ বাণী,
কিবা বর চাহ এবে বলহ আমায়,
তব আশা পূর্ণ হ'বে কি সন্দেহ তায় ?" ৪৯।
অশ্বতর বলে—"দেবি, করহ শ্রবণ
কম্বলে সহায় মোর করহ অর্পণ;
এই মোর আদ্য বাঞ্ছা; কহি পুনঃ আর
সমস্ত স্বরসম্বন্ধ সঙ্গীতের সার,
আমাদের দুই জনে করহ অর্পণ,
তবেই হইবে মোর কামনা পূরণ।" ৫০।
বলিলেন সরস্বতী—"শুন বাছাধন,
তোমার এ বাঞ্ছা আমি করিনু পূরণ।
সপ্তস্বর তিন গ্রাম রাগ ছয় আর,
সপ্তবিধ এই বিশ্বে গীতের যে সার,
সপ্তবিধ মূর্চ্ছনা যে আমার কৃপায়
তোমাতে স্ফুরিত হ'বে সন্দেহ কি তা'য় ? ৫১

তালাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ভবান্ গাতা কম্বলশ্চ তথানঘ ॥ ৫২ ॥
জ্ঞাস্যসে মৎপ্রসাদেন ভুজগেন্দ্রাপরং তথা।
চতুর্ব্বিধং পদং তালং ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্ ॥ ৫৩ ॥
যতিত্রয়ং তথা তোদ্যং ময়া দত্তং চতুর্ব্বিধম্।
এতদ্ভবান্ মৎপ্রসাদাৎ পন্নগেন্দ্রাপরঞ্চ যৎ ॥ ৫৪ ॥
অস্যান্তর্গতমায়ত্তং স্বরব্যঞ্জনসম্মিতম্।
তদশেষং ময়া দত্তং ভবতঃ কম্বলস্য চ ॥ ৫৫ ॥
তথা নান্যস্য ভূর্লোকে পাতালে চাপি পন্নগ।
প্রণেতারৌ ভবন্তৌ চ সর্ব্বস্যাস্য ভবিষ্যতঃ।
পাতালে দেবলোকে চ ভূর্লোকে চৈব পন্নগৌ ॥ ৫৬ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী সর্ব্বজিহ্বা সরস্বতী।
জগামাদর্শনং সদ্যো নাগস্য কমলেক্ষণা ॥ ৫৭ ॥
তয়োশ্চ তদ্‌যথাবৃত্তং ভ্রাত্রোঃ সর্ব্বমজায়ত।
বিজ্ঞানমুভয়োরগ্র্যং পদতালস্বরাদিকম্ ॥ ৫৮ ॥

একোনপঞ্চাশ তাল গ্রামত্রয় আর
তোমরা দু'জনে পেলে সন্দেহ কি তা'র।৫২।
আমার প্রসাদে তুমি ভুজগ-রাজন্
পাইলে অপর সব তত্ত্ব অগণন।
চতুর্ব্বিধ পদ আর তাল ত্রিপ্রকার,
ত্রিবিধ সে লয় স্ফূর্ত্তি হউক তোমার।৫৩।
ত্রিবিধ যতির তত্ত্ব, তোদ্য-তত্ত্ব চারি
দিলাম, সকলি পেলে কৃপায় আমারি।
আমার কৃপায় তুমি পন্নগ-রাজন্
পাইলে রহস্য সহ তত্ত্ব অগণন।৫৪।
এ সব তত্ত্বের মাঝে আছে বহুতর
স্বর-ব্যঞ্জনাদি তত্ত্ব অন্য-অগোচর;
তোমারে, কম্বলে আর, সেই সমুদয়
দিলাম সম্যক্ ভাবে কহিনু নিশ্চয়।৫৫।

শুন সর্পরাজ আমি বলি যে তোমায়
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালে আছয়ে যা যথায়
সকলি জানিয়ে দোঁহে এবে একমাত্র,
প্রণেতা হইলে, বৎস, মোর কৃপাপাত্র।
তোমাদের তুল্য কেহ না রহিবে আর
নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি কহিলাম সার।" ৫৬।
দ্বিজপুত্র বলে "পিতা, করহ শ্রবণ,
এত বলি দেবী কৈলা স্বধামে গমন।
কমলনয়না সর্ব্ব-জিহ্বা সরস্বতী
অন্তরীক্ষে অদর্শন হৈলা দিব্যগতি।৫৭।
তাঁহার বরেতে তবে ভ্রাতা দু'জনার,
সঙ্গীত-বিজ্ঞানে জ্ঞান জন্মে সর্ব্বসার।
পদ, তাল, স্বর আদি আছে যে সকল
সে সবেতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লভে অবিকল।৫৮

ততঃ কৈলাসশৈলেন্দ্রশিখরস্থিতমীশ্বরম্।
গীতকৈঃ সপ্তভির্নাগৌ তন্ত্রীলয়সমন্বিতৌ ॥ ৫৯ ॥
আরিরাধয়িষূ দেবমনঙ্গাঙ্গহরং হরম্।
প্রচক্রতুঃ পরং যত্নমুভৌ সংহতবাক্কলৌ।
প্রাতর্নিশায়াং মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োশ্চাপি তৎপরৌ ॥ ৬০
তয়োঃ কালেন মহতা স্তূয়মানো বৃষধ্বজঃ।
তুতোষ গীতকৈস্তৌ চ প্রাহেশো গৃহ্যতাং বরঃ ॥ ৬১ ॥
ততঃ প্রণম্যাশ্বতরঃ কম্বলেন সমং তদা।
বিজ্ঞাপয়ন্মহাদেবং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্ ॥ ৬২ ॥

অশ্বতর উবাচ।

যদি নৌ ভগবন্ প্রীতো দেবদেব ত্রিলোচন।
ততো যথাভিলষিতং বরমেনং প্রযচ্ছ নৌ ॥ ৬৩ ॥
মৃতা কুবলয়াশ্বস্য পত্নী দেব মদালসা।
তেনৈব বয়সা সদ্যো দুহিতৃত্বং প্রয়াতু মে ॥ ৬৪ ॥

তার পরে দুই ভাই তন্ত্রী-লয় সনে
সপ্তস্বরালাপ করি চলিলা গগনে;
কৈলাস-শৈলেন্দ্র শিরে রম্য উপবন,
বিরাজিত যথায় ঈশ্বর-পঞ্চানন, ৫৯।

অনঙ্গের অঙ্গহর হর আশুতোষ
যায় দোঁহে পূজি' তাঁ'র করিতে সন্তোষ;
সংযত করিয়া বাক্য-ইন্দ্রিয়নিচয়
করে যত্ন দুই জনে প্রফুল্ল-হৃদয়।
প্রভাতে নিশায় আর মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়,
স্তব করে বৃষধ্বজে মিলি' দুজনায়। ৬০।

স্তবে তুষ্ট হইলেন কালে মহেশ্বর,
উভয়ের গীতে ফুল্ল হইল অন্তর;
প্রীত হ'য়ে বলিলেন আসি' দুই জনে
তুষ্ট আমি, লহ বর যেবা বাঞ্ছা মনে।"৬১।

তবে নাগ অশ্বতর কম্বলের সনে
গললগ্নীকৃতবাসে পড়িলা চরণে।
মনের বাসনা যাহা কাতর-অন্তরে
একে একে জানাইল দেব মহেশ্বরে। ৬২।

ব'লে অশ্বতর "জগত-ঈশ্বর
দেব দেব ত্রিলোচন,
সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার সমান
ভবে আর কোন্ জন?
যদি তুষ্ট হ'য়ে করুণা করিয়ে
দিবে বর দয়াময়,
অভিলাষ মনে আছে যা এক্ষণে
দাও হয়ে কৃপাময়। ৬৩।
"কুবলয়াশ্বের পত্নী মদালসা
পতি তরে দিলা প্রাণ।
সেই মদালসা কন্যা হ'বে মম
এই বাঞ্ছা করে প্রাণ।
যেমন বয়সে ত্যজিলা জীবন
যেমন আকৃতি তা'র
ছিল সে সময়, সেই সমুদয়
হো'ক বাসনা আমার। ৬৪।

জাতিস্মরা যথাপূর্ব্বং তদ্বৎকান্তিসমন্বিতা।
যোগিনী যোগমাতা চ মদ্গেহে জায়তাং ভব॥ ৬৫॥

মহাদেবউবাচ।

যথোক্তং পন্নগশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং শৃণু চেদং ভুজঙ্গম॥ ৬৬॥
শ্রাদ্ধাবসানে যুক্তঃসন্ মধ্যমং পিণ্ডমাত্মনা।
ভক্ষয়েথা ফণিশ্রেষ্ঠ শুচিঃ প্রয়তমানসঃ॥ ৬৭॥
ভক্ষিতে তু ততস্তস্মিন্ ভবতো মধ্যমাৎ ফণাৎ।
সমুৎপৎস্যতি কল্যাণী তথারূপা যথা মৃতা॥ ৬৮॥
কামঞ্চেমমভিধ্যায় কুরুত্বং পিতৃতর্পণম্।
তৎক্ষণাদেব সা সুভ্রূঃ শ্বসতো মধ্যমাৎ ফণাৎ।
সমুৎপৎস্যতি কল্যাণী তথারূপা যথা মৃতা॥ ৬৯॥
এতচ্ছ্রুত্বা ততস্তৌ তু প্রণিপত্য মহেশ্বরম্।
রসাতলং পুনঃ প্রাপ্তৌ পরিতোষসমন্বিতৌ॥ ৭০॥
তথা চ কৃতবান্ শ্রাদ্ধং স নাগঃ কম্বলানুজঃ।
পিণ্ডঞ্চ মধ্যমং তদ্বদ্যথাবদুপভুক্তবান্॥ ৭১॥

জাতিস্মরা হ'য়ে সেই কান্তি ল'য়ে
জন্মিবে ভবনে মম,
যোগের জননী তেমতি যোগিনী
হইবে পূর্ব্বের সম।" ৬৫।

বলে মহেশ্বর "পন্নগ ঈশ্বর
আশা পূর্ণ হবে তব,
আমার প্রসাদে নাশিবে বিষাদে
অধিক কি আর কব? ৬৬।

শ্রাদ্ধ কাল পেয়ে সুসংযত হ'য়ে
শ্রাদ্ধ কর সমাপন,
মধ্য ফণা দিয়ে মধ্য পিণ্ড ল'য়ে
যতনে কর ভোজন। ৬৭।

করিলে ভক্ষণ দেখিবে তখন
সে মধ্যম ফণা হ'তে,
জন্মিবে সে বালা তেমতি নির্ম্মলা
রূপসী খ্যাতা জগতে। ৬৮।

মরণ সময়ে যে দেহ ত্যজিয়ে
গেল বালা যোগ্য-ধামে
তেমতি বয়স হইবে তাহার
খ্যাতা রবে সেই নামে। ৬৯।

শুনি সে বচন দোঁহে হৃষ্ট মন
প্রণমিয়ে মহেশ্বরে,
যায় রসাতলে ভাসি' সুখজলে
সন্তুষ্ট হ'য়ে অন্তরে। ৭০।

করে শ্রাদ্ধ তবে কম্বল-অনুজ
পেয়ে উপযুক্ত কাল,
মধ্যম সে পিণ্ড করিল ভোজন
কহে যথা মহাকাল। ৭১।

তস্যাপি ধ্যায়তঃ কামং ততঃ স তনুমধ্যমা।
জজ্ঞে নিশ্বসতঃ সদ্যস্তদ্রূপা মধ্যমাৎ ফণাৎ ॥ ৭২।

ন চাপি কথয়ামাস কস্যচিৎ স ভুজঙ্গমঃ।
অন্তর্গৃহে তাং সুদতীং স্ত্রীভির্গুপ্তামধারয়ৎ ॥ ৭৩ ॥

তৌচানুদিনমাগম্য পুত্রৌ নাগপতেঃ সুখম্।
ঋতধ্বজেন সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব ॥ ৭৪ ॥

একদা তু সুতৌ প্রাহ নাগরাজো মুদান্বিতঃ।
যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তস্তু ক্রিয়তে কিং ন তত্তথা ॥ ৭৫ ॥

স রাজপুত্রো যুবয়োরুপকারী মমান্তিকম্।
কস্মান্নানীয়তে বৎসাবুপকারায় মানদঃ ॥ ৭৬ ॥

এবমুক্তৌ ততস্তেন পিত্রা স্নেহবতা তু তৌ।
গত্বা তস্য পুরং সখ্যু রেমাতে তেন ধীমতা ॥ ৭৭ ॥

করিতে ধেয়ান মদালসা বালা
মধ্য ফণা হ'তে তাঁ'র,
হইলা প্রকাশ পূর্ণ হলো আশ
ঘুচিয়ে গেল আঁধার। ৭২।

এ কথা কা'রেও না বলিলা তিনি
অন্তর্গৃহ মাঝে তাঁ'রে,
রাখিলা যতনে নারিগণসনে
তুষিয়া-সুধা আহারে। ৭৩।

নাগপুত্রগণ করেন গমন
প্রতিদিন ধরাধামে,
ঋতধ্বজ সনে রঙ্গে ফুল্লমনে
এ সব কথা না জানে। ৭৪।

একদা নাগেন্দ্র আনন্দিত মনে
পুত্র দুই জনে কয়,—
"শুনহ বচন ভাই দুই জন
ভুলেছ কি সমুদয়?

যেই কথা দোঁহে বলিলাম আমি
সে কথা কি মনে নাই?
আজো কি কারণে না কর দু'জনে
যেই কাজ আমি চাই। ৭৫।

রাজার কুমার সুহৃৎ দোঁহার
উপকারী অতিশয়,
তাঁ'রে পূজা করা আনি এ ভবনে
অতি উপযুক্ত হয়।

কেন একবার নিকটে আমার
নাহি আন সমাদরে?
উচিত এমন করিতে যতন
আনিয়ে আপন ঘরে।" ৭৬।

পিতৃবাক্য শুনে ভাই দুইজনে
পুনঃ রাজ-পুরে যায়,
খেলে নানা খেলা রাজপুত্র সনে
আনন্দে কাল কাটায়। ৭৭।

ততঃ কুবলয়াশ্বং তৌ কৃত্বা কিঞ্চিৎ কথান্তরম্।
অব্রুতাং প্রণয়োপেতং স্বগেহগমনং প্রতি ॥ ৭৮ ॥

তাবাহ রাজপুত্রোঽসৌ নন্বিদং ভবতো গৃহম্।
ধনবাহনবস্ত্রাদি যন্মদীয়ং তদেব বাম্ ॥ ৭৯ ॥

যত্তু বাং বাঞ্ছিতং দাতুং ধনং রত্নমথাপি বা।
তদ্দীয়তাং দ্বিজসুতৌ যদি বাং প্রণয়ো ময়ি ॥ ৮০ ॥

এতাবতাহং দৈবেন বঞ্চিতোঽস্মি দুরাত্মনা।
যদ্ভবদ্ভ্যাং মমত্বং নো মদীয়ে ক্রিয়তাং গৃহে ॥ ৮১ ॥

যদি বাং মৎপ্রিয়ং কার্য্যমনুগ্রাহ্যোঽস্মি বা যদি।
তদ্ধনে মম গেহে চ মমত্বমনুকল্প্যতাম্ ॥ ৮২ ॥

যুবয়োর্যন্মদীয়ং তন্মামকং যুবয়োঃ স্বকম্।
এতৎ সত্যং বিজানীতং যুবাং প্রাণাবহিশ্চরাঃ ॥ ৮৩ ॥

কথার প্রসঙ্গে কুবলয়াশ্বেরে
বসিলা প্রণয়-ভরে,
অতীব যতনে মধুর বচনে
আসিতে তাঁদের ঘরে। ৭৮।
রাজপুত্র বলে, ধরি বাক্য ছলে
"এ গৃহ কি তব নয়?
ধন বস্ত্র আর বসন সম্ভার
তোমাদের সুনিশ্চয়।
যা কিছু হেথায় তোমাদেরি সব
ভিন্ন ভাব কি কারণে?
যথা ইচ্ছা যারে দাও অকাতরে
অন্যথা ভেব না মনে। ৭৯।
কিম্বা প্রীতি ভরে যদি বা অন্তরে
হয়ে থাকে অভিলাষ
ধন রত্ন কিছু অর্পিতে কাহারে
পূরাও সে মন-আশ। ৮০।

দৈববশে আজো বঞ্চিত রয়েছি
তোমাদের প্রীতি হ'তে,
তাই এই ক্ষনে তোমাদের মনে
আসে ভাব হেন মতে। ৮১।
যদি ভালবাস আমারে দু'জনে
তবে এই গৃহে—ধনে,
আত্ম-ভাব কর, তবে মোর আশা
পূর্ণ হ'বে সেই ক্ষণে। ৮২।
তোমাদের যাহা সকলি আমার
আমার যা তব হয়
এই সত্য আজি বলি, দোঁহে মম
বহিঃপ্রাণ সুনিশ্চয়।
পুন হেন আর ভিন্ন ভাব মনে
যেন কভু নাহি হয়
বড় ব্যথা পা'ব শুনিলে এমন
কহিনু ইহা নিশ্চয়। ৮৩।

মহামাতা ৺ কামাখ্যাদেবীর মন্দির

INDIA PRESS, CALCUTTA.
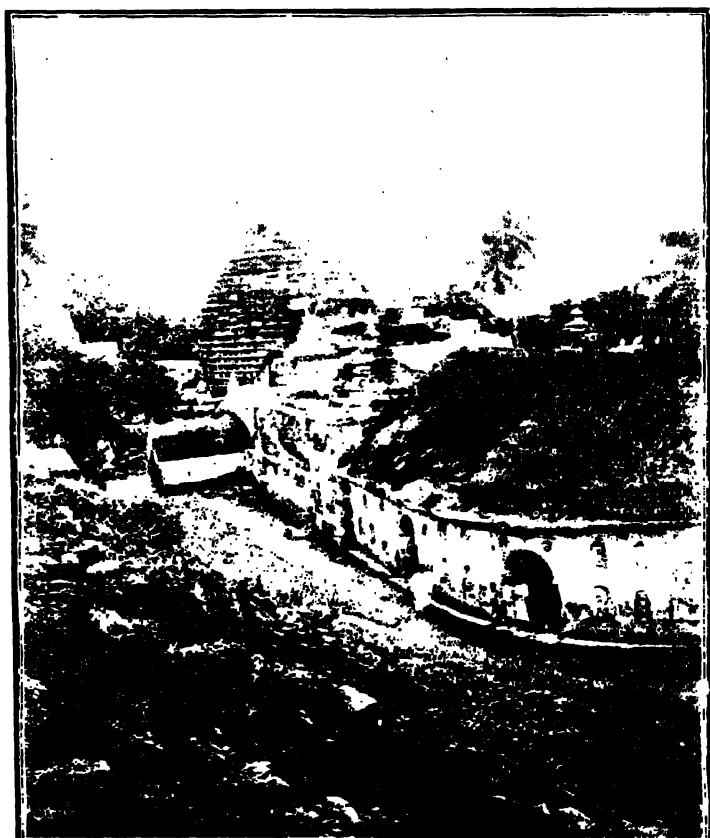
মহাপূজা।

(উপরূপক)

(একটি পুরাতন গল্প অবলম্বনে)

(অকিঞ্চন লিখিত)

প্রথম দৃশ্য।

আরণ্য পথ।

গান গাহিতে গাহিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ।—

ভৈরবী—মধ্যমান।

আমায় ভুলিস্‌নে মা, ওমা, ও পাষাণের মেয়ে।
নিদয়া হ'য়ো না শিবে এ দীনে দুঃখে ভাসা'য়ে।
আশা বড় আমার প্রাণে　পূজ্‌বো চরণ জবা দানে,
বিল্বদলে গঙ্গাজলে তোর রাঙ্গা চরণ সাজাইয়ে।
কুটিরে আনিব তোরে　সাজা'ব মা যতন কোরে
দেখ্‌বো শোভা নয়ন ভরে, পদে এ প্রাণ লুটাইয়ে।

(গানটি গাহিতে গাহিতে শ্রান্তক্লান্ত ভাবে একটি বিটপী মূলে উপবেশন পূর্ব্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা, অদৃষ্ট! এ বারে কি দীনের কুটিরে দীনদয়াময়ীর শুভ আগমন হ'বে না? নবমীতে যে সংকল্প কোরে কল্পারম্ভ কোরেছি? প্রতিদিনই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে নিয়মিত পূজাও কোচ্চি—কাল যে ষষ্ঠি এখনো ত মহাপূজার কিছুই আয়োজন কোত্তে পার্‌লাম না। প্রতি বারে প্রতিমা আনি, এ বারে অর্থাভাবে আজিও প্রতিমা আন্তে পারি নি। ঘটেই মায়ের পূজা কর্‌বো মনে করেছি—কিন্তু প্রাণ কেমন করে—মায়ের মূর্ত্তিখানি সম্মুখে থাক্‌বে—আমি রক্তচন্দনে জবা মাখিয়ে চরণ দু'খানি সাজা'ব। সে সাধ ত আর এবার পূরলো না?—ব্রাহ্মণী বল্‌ছিলেন প্রতিমাখানি না হোলে ঘরখানি যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়—ঠিক কথা! কিন্তু উপায় কি? যা'র অর্থবল নাই, তা'র প্রতিমায় পূজার সাধ বিড়ম্বনা বই আর কি বল্‌বো?—প্রতিমা দেকে যখন দীন দুঃখী ভক্তগণ আসবেন, তখন তাঁ'দের হাতে কি দিব? সেইটিই ত ভাবনার বিষয়। তাই ত প্রতিমার কথা বলি নি। এখন আর ভেবে বা কি কর্‌বো? যে দিন মা জোটাবেন সে দিন তাই ভোগ দিব—গাছের ফল আর গঙ্গার জল আছে। জন্মান্তরের কর্ম্মফলে দরিদ্র হ'য়েছি—সকল সাধ মিট্‌বে কেন?—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—কিন্তু! একখানি প্রতিমা না হ'লে, এ মহাপূজার সময়, বাড়ী যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখায়!—এখন ত আর সময় নেই—

চারিজন লোকের প্রবেশ।

একজন।—(ব্রাহ্মণকে প্রণাম পূর্ব্বক)—দাদা ঠাকুর, মায়ের প্রতিমা দিয়ে এলুম। আপনার বাড়ীতে ত পূজা ফাঁক যা'বে না, তাই, আপুনি না বল্লেও গড়েছিলুন। মনে করেছিলুম, আপনি ভিক্ষেয় ব্যস্ত আছেন আস্‌তে পারেন নি। মাকে নিয়ে যেতে,

দিদিঠাক্‌রোণের যে আমোদ! তিনি শাঁক বাজ্‌য়ে, জলের ধারা দিয়ে, মাকে তুলেছে. আমি বছর বছর যেমন বারোটা ঝুনো নার্‌কেল দিই তাও দিয়ে এসিচি। আর ক্ষেতে যা তরকারী পাই তা রোজ রোজ নিয়ে যা'ব। আমাদের ত তিন দিন পেসাদ পাবার নেমতন্ন আছেই। এখন আসি।

[প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ।—(এতক্ষণ আনন্দে নির্ব্বাক ছিলেন, বহুক্ষণ পরে আনন্দ গদ্‌গদ কণ্ঠে)—মা, তোমার কাজ তুমিই কর। আমি কে? ক্ষুদ্র কীট! অহঙ্কার বশে অন্ধের মত অর্থের জন্যে লোকের দোরে দোরে ঘুর্‌ছিলাম। মনে কর্‌ছিলাম চেষ্টা কোরে কিছু অর্থ না হ'লে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হ'বে না। অবোধ আমি, ভুলে গিয়েছিলাম মা—তোর পূজার জিনিস ত বাহিরে খুঁজ্‌তে হয় না মা!

শ্রীরাগ।

কি দিয়ে পূজিবি কিবা আছে তোর
সকলি ত ভবে তাঁ'র রে?
কাননেরি ফুলে সাজা রে চরণ
নেই ত ভূষণ সার রে।

হৃদয়-কানন করি' অন্বেষণ
তোল্‌ কুসুম সম্ভার রে!
ত্রিস্রোতার জলে ধোয়া রে চরণ
কমল-আসন তাঁ'র রে।

দশভূজা বেশে দেখিতে বাসনা
করে যদি কভু প্রাণ রে—
অনুরাগ-সিংহে দে রে সাজাইয়ে
তা'রি পিঠে তাঁ'র স্থান রে।

কামরূপী যেই মহিষ দুর্জ্জন
মায়ের চরণে তার রে,
ঘুচে যা'বে সেই ভীষণ মূরতি
সে দেহ না র'বে আর রে।

একান্তে দাঁড়ায়ে জুড়ি দুই কর
কর দরশন তাঁ'য় রে,
এই অকিঞ্চন মন রবে পিছে পিছে
লুটাইবে রাঙ্গা পায় রে।

[গানটি গাইতে গাইতে ব্রাহ্মণের দ্রুতপদে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ব্রাহ্মণের বহির্বাটী।

একটি ভগ্নচালায় মৃন্ময়ভূষণ-ভূষিতা দশভূজা প্রতিমা।

ব্রাহ্মণী।—(নির্নিমেষ নয়নে প্রতিমার পানে চাহিয়া আছেন, তাঁহার চক্ষে দর দর ধারে বারিধারা ঝরিতেছে। আনন্দ অন্তরে স্বগত) —আহা! মায়ের কি অপার করুণা? তিনি বল্‌ছিলেন, এবার ভিক্ষা কোরে কারো কাছে কিছু পাচ্চেন না, এবার আর মায়ের প্রতিমা আন্‌বেন না। আমার প্রাণটা সে কথা শুনে বড়ই কাতর হ'য়েছিল। কিন্তু মায়ের এমনি কৃপা—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় কেষ্টোদাস আপনিই প্রতিমা দিয়ে গেল।—(সানন্দে প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া)—মা নাকি দুখিনী মেয়েকে ভুলে থাকৃতে পারেন? —আপনিই এসেছেন। সন্তান দরিদ্র হোলে কি মায়ে তা'রে ভোলে? মায়ের কাছে আরো অক্ষম সন্তানেরই দরদ বেশী।—(কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিয়া)—তিনি বলেন, পূজো কি দিয়ে কর্‌বো? কেন? এই ত কেষ্টোদাস প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে বারটা নারকেল দিয়ে গেল, গয়লা দিদির ছেলে দু' কলসী একো গুড় দিয়ে গেছে, গাছের নারকেলগুলিও তোলা

আছে। এতেই অনেকগুলি লাড়্ হ'বে এখন। এইতিই কি মায়ের পূজো হ'তে পারে না? মা আমায় যেমন জুটিয়ে দেবেন তেমনি ভোগ দেবো। মা আমার তা'তেই সন্তুষ্ট হ'বেন। মায়ের ভক্তেরা তা'তেই কত আনন্দ কর্‌বেন। ওঁর যেমন এক কথা? টাকা না হ'লে প্রতিমা আন্‌তে নাই?—কেন?—কাঙ্গাল গরীবের কি পূজো ক'ত্তে নেই?—(কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে প্রতিমাদর্শন।—এ কি? এমন হলো কেন? অপরাধ নিও না মা—আর ত এখানে থাকা উচিত নয়। (প্রাঙ্গনে আসিয়া)—মা, এবার আমার হাতের রান্না খাবিনি। তবে রাঁধবে কে মা?—তোর খেলা তুই জানিস্।

ব্যস্তভাবে ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ।—(আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত-নেত্রে)—

যে দিকেতে চাই
দেখিবারে পাই শুধু তোমারি মহিমা।
ইচ্ছাময়ি, কি যে ইচ্ছা তব,
কে পারে বুঝিতে?—
কলের পুতলি মোরা,
যেমন নাচা'বে, নাচিব তেমনি।
তোমার ইচ্ছায় দিবানিশি হয়;
চন্দ্র সূর্য্য ঘুরে নভোপথে।
অনন্ত তারকারাজি শোভিত অম্বর—
সে ত নীলাম্বর তব গায়! মহামায়া,
মায়া খেলা খেলিচ মা কত!
ক্ষীণ বুদ্ধি কি বুঝিব আমি?
আবার বরষ পরে
এসেছ এ দীনের কুটীরে
জবা, বিল্বদল, গঙ্গাজল বই আর কিছু নাই
হৃদি শুষ্ক দারিদ্রের তাপে,
ভক্তিফুল ফুটে না তথায়,
কি দিব মা রাঙ্গা পায় তোর?

ব্রাহ্মণী।—যা আছে তা'তেই পূজো হ'বে। কিন্তু এ দিকে এক বিভ্রাট উপস্থিত। আমি পূজার কোন জিনিস ছুঁতে পার্‌বো না! তা'র কি উপায় হ'বে বল দেখি?

ব্রাহ্মণ।—হ'বে আর কি? যখন মা এসেছেন, তখন সবি হ'বে। আমাকে নিজেই সব ক'ত্তে হ'বে। তা' হ'য়ে যা'বে। সে জন্যে আট্‌কাবে না।

ব্রাহ্মণী।—তার চেয়ে এক কাজ কর; বেহাই বাড়ী যাও, মা অন্নদাকে আন।

ব্রাহ্মণ।—তারা পাঠা'বে কেন? তারা বড় মানুষ। আমরা গরীব। সেই বের ক'নে নিয়ে গেছে। কত বার গিচি একটি দিনের তরে পাঠায় নি। কেন মিছে মান খোয়াতে যাব?

ব্রাহ্মণী।—আমরা গরীব। তাতে আর অপমান কি?—আমাদের এই বিপদের কথা বেহাইকে বুঝিয়ে বল্লে, বোধ হয় তিনি অমত করবেন না।

ব্রাহ্মণ।—কেবল মার্‌তে বাকি রাখ্‌বে। তা'র বাড়িতে পূজো। আমাদের মত পূজো নয়। কত ঘটার পূজো। এক মাস আগে নবত বসেছে। যাত্রা হ'বে, নাচ হ'বে, কত লোক জন খাবে। দূরদূরন্তর থেকে কত কুটুম্ব এসেছে। সে নাকি অন্নদাকে পাঠাবে? তুমি বল্‌চো,—কি করি বলো। বৎসরকার দিনে যাই, তার গাল খেয়ে আসি।

ব্রাহ্মণী।—গালই যদি দেয়, তা'তে তুমি প'চে যাবে না।

ব্রাহ্মণ।—জগদম্বার মনে যা আছে হ'বে। যাই তবে। [প্রস্থান।

ব্রাহ্মণী। এসো।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঠাকুর দালান।

মধ্যস্থলে প্রতিমা বহুমূল্য সাজে সজ্জিতা।

বহু লোক প্রতিমা দেখিতেছে। ঠাকুর দালানের রোয়াকে চাটুকারগণ বেষ্টিত কর্ত্তা উপবিষ্ট। ধীরে ধীরে দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রবেশ ও তাঁহার চরণে প্রণাম।

কর্ত্তা।—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। একি বেহাই যে হে? কি মনে কোরে?

ব্রাহ্মণ।—এই আপনার চরণ দর্শন কোত্তে।

কর্ত্তা।—শুধু দর্শন?

ব্রাহ্মণ।—একটা নিবেদন আছে।

কর্ত্তা।—বল।

ব্রাহ্মণ।—ব্রাহ্মণী পূজার দ্রব্য স্পর্শ ক'ত্তে পার্‌বেন না, তাই আপনার কাছে ভিক্ষা ক'ত্তে এলাম, যদি অন্নদাকে কেবল এই চারিটি দিনের জন্যে পাঠান।

কর্ত্তা।—(সহাস্যে)—গাড়ী এনেছো নাকি?

ব্রাহ্মণ।—গাড়ী কোথা পাব, দাদা?

কর্ত্তা।—(হাসিতে হাসিতে)—আমার বাড়ীতেও পূজা। কি ক'রে পাঠাই বল?

ব্রাহ্মণ।—আপনার এখানে তার জন্য কিছুই আট্‌কাবে না।

কর্ত্তা।—আট্‌কাবে না ব্‌লচো কেন? সম্পূর্ণ আট্‌কাবে। একটি পুত্রবধু। সকলের আদরের। সেটি বাড়ীতে না থাক্‌লে গিন্নি বড় কষ্ট বোধ কর্‌বেন। কাজে কাজেই তাকে পাঠান কোন মতেই হ'তে পারে না।

ব্রাহ্মণ।—আমার উপায়?

কর্ত্তা।—আমি কি কর্‌বো বলো। যার লোক বল নেই, তার দুর্গোৎসবের ব্যাপারে হাত দেওয়াই অন্যায়।

চাটুকার।—অন্যায় বলে অন্যায়—নিতান্ত আহাম্মুখের কাজ। দেখো মুখুজ্যে, তুমি কর্ত্তা মশাইয়ের বেহাই। তুমি যে এমন বেহায়া তা আমি জানতুম না। ইনি রাজা তুল্য। এঁর পুত্রবধু রাজকুলবধু। তাঁ'রে এসেছ কি না তোমার বাড়িতে রাধুনী করবার জন্যে নিতে। সরে পড়, সরে পড়। কথায় কথা বাড়্‌বে। শেষ কেন অপমান হ'বে বল।

ব্রাহ্মণ।—(কাতরভাবে প্রতিমার পানে চাহিয়া) মা! ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। একাই সব পারবো।

চাটুকার।—সেই কথাই ভাল।

ব্রাহ্মণ। তবে আসি, প্রণাম।

[প্রস্থান।

চাটুকার।—প্রতিমার ত এখনো প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি।—এই বেলা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে, তুই স্ত্রী পুরুষে এই পূজা বাড়ীতে এসো।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

বিষণ্ণ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ।—(স্বগত)—

আশার ছলনে ভুলে,
কেন হেথা সেথা, করি ছুটোছুটি?
এতক্ষণ বসিয়া সম্মুখে তোর
যদি গো মা ডাকিতাম তোরে
হতো কাজ।
মায়াডোর ছুটে যেতো মোর।

এসেছিস নিজে তুই দীনের কুটিরে—
বাসনা হ'য়েছে পূর্ণ
মহাশক্তি, তোর শক্তিবলে,
দেহ পাবে অযুত হস্তীর বল।
একাই সকল কার্য্য পারিব সাধিতে।
অভয়ে, চরণ তোর পেয়েছি দেখিতে—
কোন ভয়, নাহিক অন্তরে আর মোর।
ভবভয় ঘুচে গেছে;
আর কারে ভয়?—
তোর পদে আছি শুয়ে—
কারো কথা কানে নাহি আসে—
শুনি শুধু প্রাণে শ্রীমুখে অভয়-বাণী।

ভৈরবী—মধ্যমান।

অভয়ে অভয় পদে সঁপেছি মা দেহ মন।
আমি, ডরিনে শমনে তারা, পেয়েছি রাঙ্গা চরণ॥
তুমি যারে করে দয়া দাও মা রাঙ্গাচরণছায়া
সেকি মা বিপদ ভয়ে ভাবে আর অকারণ॥

(নেপথ্যে)—"বাবা দাঁড়াও।"

ব্রাহ্মণ—(সচকিতে পশ্চাতে চাহিয়া)—একি মা অন্নদা! ওদের অমতে তুমি এমন ক'রে এলে কেন মা?

অন্নদা।— আমি তাঁর মত নিয়ে তবে এসেছি; তিনি স্বেচ্ছায় আস্‌তে বলেছেন তবে এসেছি। তিনি বলেছেন, "তুমি যাও, আমি সব ঠিক করবো।" বাবা, তুমি যখন ছলছল চোকে প্রতিমার দিকে চেয়ে কাঁদ্‌ছিলে। আমি দেখেছিলাম। তিনিও সেখানে ছিলেন। তোমায় দেখে তাঁর বড় কষ্ট হলো। তাই, আমায় আস্‌তে দিলেন। এখন চলো বাবা, মা না জানি কত ভাব্‌চেন। বাবা, যার মন আছে, তা'র কি ধনের অভাব হয়?

ব্রাহ্মণ।—ঠিক বলেছিস্ মা। এখন আয় মা। তো'রে এমন কে'রে হাঁটিয়ে নে যাচ্চি দেখ্‌লে কত লোকে কত কথা বল্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

পুত্রের প্রতি উপদেশ

(২৯৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

কোন ব্যক্তি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, কেহ বা অশ্বদ্বয় যোজিত শকট টানিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেহ বা একাকী দশ জন আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পদক্ষিপ্ত বর্ত্তুল ক্রীড়া বা মল্লযুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা অনেক সময় শুনা যায় এবং শুনিয়া সকলে বড় আনন্দিত হইয়া থাকেন। সমাজে সে শ্রেণীর লোক থাকাও দরকার। কিন্তু তাহা বলিয়া কি সকলকেই সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে? সকলকেই কি দৈহিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। চিন্তাশীল লোকের যাহাতে বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হয়, মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজের মধ্যে অধুনাতন কালে অনেক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনিষী আছেন যাঁহারা বাল্যে বা যৌবনে ব্যায়াম করেন নাই। তাঁহাদের বাল্যকালে বা যৌবনে ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কথাই বোধ হয় উঠে নাই।

অথচ তাঁহারা এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্বীকার করিতেই হইবে এবং তাঁহারা চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রতিনিয়তই দিতেছেন তাহাই আমার পক্ষে উপস্থিত কথার যথেষ্ট প্রমাণ। এ সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া আমি কোথায় বলবান চিন্তাশীল বৃদ্ধ খুঁজিয়া বেড়াইব। আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি তিনি ৯১ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি একজন স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি তিনি কোন গ্রন্থ না দেখিয়া স্মৃতি শাস্ত্রের কোথায় কি আছে, নখ দর্পণের ন্যায় বলিতে পারিতেন, কেবল তাহাই নহে, কোন্ গ্রন্থের কোন্ টীকায় কে কি বলিয়াছেন তাহা পুস্তকাদির বিনা সাহায্যে বলিতে পারিতেন, আর তাঁহার পুরাণ আবৃত্তির ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। এ সকল লোক কখন ব্যায়াম অভ্যাস করিয়াছিলেন কি? আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি—না। শারীরিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির হ্রাস হয় কি না? বুদ্ধি ও শারীরিক বলের ভিতর কেমন যেন একটা বিপরীত অনুপাত (inverse ratio) আছে বলিয়া মনে হয়। শারীরিক বল না থাকিলেও মানুষ বুদ্ধিমান হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিপরীতটা সত্য নহে যে শারীরিক বল না থাকিলেই বুদ্ধিমান হইতে পারে, অথবা বুদ্ধিমান হইলেই তাহাকে হীন বল হইতে হইবে। সুস্থ শরীরে যাহার যতটুকু বল থাকা সম্ভব ততটুকু বল থাকা চাই, তাহার কম হইলে তাহাকে দুর্ব্বল বলিতে হইবে, ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। ব্যয়াম সম্বন্ধে এত কথা বলিতাম না, তবে যখন এক দিকে দেখিতেছি যে ব্যায়াম করিতে গিয়া অনেকের অনেক বিপৎপাত ও অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, যখন দেখিতেছি ব্যায়ামকারী যুবক প্রৌঢ় ব্যায়াম ছাড়িয়া দিয়া নানারূপে রোগক্লিষ্ট হইতেছেন, অথচ বিনা ব্যায়ামে নিয়মিতরূপে চলিলে শরীর বেশ সুস্থ থাকে, তখন ব্যায়ামের পক্ষপাতী কেমন করিয়া হইতে পারি। আমরা যখন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতাম ১৮৭২ কি ৭৩ সালে, যখন সার জর্জ্জ কেম্বল সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট, তিনি হুগলি কলেজে ডেপুটী ও সব-ডেপুটী গিরির উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করিবার জন্য "সিবিল সার্ব্বিস্ ক্লাস" নাম দিয়া কয়েকজন ছাত্রকে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত করান। সেই শিক্ষার নানা অঙ্গ ছিল, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম শিক্ষণীয় ও পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। যাঁহারা মফঃস্বলে এই সকল কার্য্যের প্রয়াসী হইতেন তাঁহাদিগকে উক্ত সমস্ত কার্য্যে পটুতা দেখান প্রয়োজন বলিয়াই তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুর ব্যায়াম ও তাহার অপরাপর অঙ্গের সৃষ্টি করেন। এখনও যাঁহারা ঐরূপ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল কার্য্য দরকার হইতে পারে। শুনিয়াছি বেশ বলিষ্ঠ শরীর না হইলে শান্তি রক্ষা (Police) বিভাগে নাকি চাকরি মিলে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন জন্য শারীরিক বল আবশ্যক তাঁহারা তাহার চেষ্টা করুন, ব্যায়াম করুন, ঘোড়ায় চড়ুন, আরও কত কি করিতে হয় করুন। কিন্তু তাহা সকলের জন্য নহে। ব্রাহ্মণের জন্য নহে! ব্রাহ্মণের উপযুক্ত উপজীবিকা অর্থাৎ কেবল

বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা যাহাদিগকে জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে তাহাদের শরীরে বলেরও আবশ্যক নাই, ব্যায়ামেরও দরকার নাই। আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবিকার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য নহে, ইহা সামান্য সাময়িক প্রয়োজন মাত্র। পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি আবার বলি ব্রাহ্মণ চান কি? ব্রাহ্মণ চান বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান এবং জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল মোক্ষ। ক্রমে ছোট হইতে বড় কথা হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য বোধ হয় স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, ব্যায়াম তোমার পক্ষে আবশ্যক নহে সুতরাং তাহা কর্ত্তব্য নহে, তবে যদি বিদ্যালয়ের শাসনাধীনে কিছু করিতে হয়, তাহা অবশ্য করিবে, কারণ নিয়ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য, নিয়ম লঙ্ঘনটা মহা দোষ।

গৃহপ্রত্যাগমন। বিদ্যালয় হইতে বাটী ফিরিয়া আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া তোমার জননী যাহা কিছু খাইতে দেন তাহা আহার করিয়া অল্প কিছুকাল বিশ্রাম স্বরূপ তোমার ছোট ছোট ভাই ভগ্নী বা ভাগিনেয় প্রভৃতি যাহারা বাটীতে আছে, তাহাদের লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে। সমস্ত দিন নিজের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে যাহারা স্নেহ ও যত্নের পাত্র, যাহারা তোমার নিকট স্নেহ ও যত্ন পাইলে সুখ বোধ করিবে, তাহারা মনোক্ষুণ্ণ হইতে পারে এবং এইরূপ ক্রমাগত বেশি দিন ধরিয়া হইলে পর, তোমার স্নেহ ও যত্নের সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিপরীত ভাবের উদ্রেক হইতে পারে, তাহাতে ক্রমশঃ আত্মীয়গণের বিষয় মনের ভাব বা সাময়িক অবস্থা না বুঝিয়া ভালবাসা কমিয়া যাইতে পারে। এই এক কথা, সর্ব্বদা পড়া শুনা করিয়া মন সময়ে সময়ে যাহাতে একটু আনন্দ হয় অথচ মন বেশি আকৃষ্ট বা যুক্ত না থাকে এমন একটা কার্য্য অন্বেষণ করে সে সময় এই সকল সরলতার মূর্ত্তিস্বরূপ ছোট ছোট বালক বালিকাগণ লইয়া তাহাদের মত হইয়া, সেইরূপ সরল শৈশব ভাবে কিছু সময় কাটান বড় ভাল। খেলার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অকপট ব্যবহার দেখিয়া যে সরলতা পরে সংসারে প্রবেশ করিয়া বড় বেশি খুঁজিয়া পাইবে না তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পার। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে। আরও এক কথা, যে ব্যায়াম সম্বন্ধে উপরে এত কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্যও কিয়ং পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। তুমি মধ্যে মধ্যে আমোদ করিয়া ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের যেরূপ স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে করিয়া দৌড়াদৌড়ি কর তাহাতে তোমার ও তাহাদের যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমোদও হয়। তাহারা তোমার সঙ্গেও আদর পাইয়া তুমি তাহাদের আমোদে খুব আনন্দ এইরূপে তুমি যখন তাহাদের লইয়া খেলা কর এবং তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আনন্দ ধ্বনি করে, শুনিলে সকলেরই আনন্দ হয়। এরূপ ক্রীড়া সকলের পক্ষে মঙ্গলকর। এইরূপ ক্ষণকাল ক্রীড়া কৌতুক উপভোগ করিয়া যদি সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব থাকে সে সময়টা কিছু কিছু পড়া শুনা করিবে।

সায়ংকৃত্য। পর সন্ধ্যার সময় সায়ং সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। সায়ং সন্ধ্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের গ্রাম হালিসহর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। আমরা বাল্যে দেখিতাম, গ্রামের যত ব্রাহ্মণ

বাঁধা ঘাটের ধারে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক বাঁধা ঘাটে অনেক ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা করিতে দেখা যাইত। ৺ কাশীধামে দশাশ্বমেধ ও তৎপার্শ্বস্থ অহল্যা বাইয়ের ঘাটের ও মুন্সীঘাটের সান্ধ্যদৃশ্যও তদ্রূপ। প্রত্যেক ঘাটে কত কত ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতেছেন। এইরূপ গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করা প্রথা পূর্ব্বে ছিল। প্রথাটি বড় ভাল। সমস্ত দিনের নানারূপ কার্য্য করিয়া সন্ধ্যাকালে পবিত্র মনে গঙ্গার নির্ম্মল বায়ু সেবন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার পবিত্র জলে সন্ধ্যা ক্রিয়া সমাপন করাতে দেহ মন উভয়ই পবিত্র হয়, কেমন একটা শান্তি, শরীর ও মনে ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া একত্র অনেক বর্ষীয়ান্, প্রৌঢ়, যুবা ও বালকের এক সাধু উদ্দেশ্যে একত্র সমাবেশ একটা বড় মঙ্গলকর অনুষ্ঠান। ইহাতে পরস্পর এক মতাবলম্বী অনেক লোকের ভিতর বেশ একটু সহানুভূতি হয়, স্নেহ ভালবাসা জন্মে। বিভিন্ন বয়সের লোকের ভিতর ঐরূপ সদ্ভাব উভয়ের পক্ষেই হিতকর। এই সকল ভাবিয়া মনে হয় যদি প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে গিয়া গঙ্গার জলে সন্ধ্যা করিয়া আসিতে পার ভাল হয়। ইহাতে গঙ্গাতীরে যাতায়াতজনিত একটু পরিশ্রম হয়, তাহাতে এখনকার কালের নিরুদ্দেশ্যে বা সান্ধ্যোদ্দেশ্যে সান্ধ্য ভ্রমণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, অথচ তোমার একটি প্রাত্যহিক কার্য্য নিয়মিতভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। অনেক ব্রাহ্মণ আজকাল সন্ধ্যার সময় মাঠে ও পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সায়ং-সন্ধ্যার কাল অকারণ অতিক্রম করিয়া বাটীতে আসিয়া সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ঘাটে গিয়া সন্ধ্যা করিয়া আসেন তাঁহাদের বেড়ানও হয়, যথাকালে গঙ্গার পবিত্র জলে, গঙ্গার সুবিমল, সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে সন্ধ্যাও করিতে পারেন। এরূপ ভাবে সায়ং-সন্ধ্যা সমাপন করিলে সকল দিকই রক্ষা হইতে পারে।

সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে পাঠাভ্যাস করিবে। অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করা স্বাস্থ্যহানিকর, তাহা কখন করিবে না। ঠিক নিয়মিত এক সময়ে সন্ধ্যার পর আহার করিবে। আহার সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তৎসমস্ত স্মরণ রাখিবে। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত কম খাওয়া কর্ত্তব্য এবং গুরুপাক জিনিস যত কম আহার হয় ততই ভাল। আহারান্তে যদি পড়াশুনা করার অভ্যাস থাকে তাহা করিবে, তবে কখন রাত্রি দশটার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িবে না। দশটার সময় শয়ন করিবার চেষ্টা করিবে। তবে এক কথা মনে রাখিবে, নিদ্রার চেষ্টা না হইলে, শয্যা গ্রহণ করিবে না। যেমন আহারের পূর্ব্বে ক্ষুধা হওয়া চাই, পানের পূর্ব্বে তৃষ্ণা হওয়া চাই, সেইরূপ শয়নের পূর্ব্বেই নিদ্রালু হওয়া চাই। নিদ্রা হইতেছে না, অথচ শয্যায় পড়িয়া ছটফট করার মত স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ আর কিছুই নাই। নিদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে শয্যা সম্বন্ধে দুই একটি বলা আবশ্যক। শয্যার পারিপাট্য বিলাসের লক্ষণ। শয্যা যত কম হইবে যত সামান্য হইবে ততই ভাল। বিদ্যার্থীর পক্ষে পরিষ্কার শুষ্ক ভূমির উপর যাহা কিছু হয় একটা আস্তরণ ও একটা বালিস হইলেই

শয্যা মনে করা চাই। যদি ভূমি বেশ পরিষ্কার ও শুষ্ক না হয় তাহা হইলে খাট কি তক্তাপোষের উপর শয্যা করা কর্ত্তব্য। ভূমি পরিষ্কার ও শুষ্ক কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। অপরিষ্কৃত বা সজল বা সরস ভূমিতে শয্যা করিলে শীঘ্রই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। শয্যার পারিপাট্য বিলাসের লক্ষণ বলিয়াছি। কিন্তু পরিষ্কার শয্যা পরিপাট্যের লক্ষণ নয়। নিতান্ত কোমল শয্যায় প্রতিনিয়ত শয়ন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ তোমাদের পক্ষে। আহারের যেমন স্থালীর বিষয় কম বিবেচ্য। স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রেই খাও আর কাংস্য বা পিত্তল পাত্রেই খাও অথবা কলাপাতায় বা শালপাতাতেই খাও, ক্ষুধা না থাকিলে যাহাতেই আহার কর মিষ্ট লাগে না, আর ক্ষুধিতাবস্থায় যে কোন পাত্রে খাও সমান মিষ্টই লাগে, শয্যা সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যদি নিদ্রালু হইয়া থাক যে কোন শয্যায় শুইলেই সুনিদ্রা হইবে, নচেৎ যেমন অনেক নিষ্কর্ম্মা বিলাসী ধনীলোকের হইয়া থাকে, দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। চিকিৎসকদের নিকট শুনিয়াছি নাকি শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস থাকিলে অনেক পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। তাহা হউক বা না হউক শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাসটা বড় উপকারী এ সম্বন্ধে এই সময়ে জীবনের এক দিনের একটি গল্প বলিতেছি। আমি কয়েকজন বন্ধুসহ একবার শীত কালে মফস্বলের একটি বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিতে গিয়াছিলাম। আমরা অনেকে গিয়াছিলাম তন্মধ্যে একজন কেবল জীবিত নাই, তিনি সুবিখ্যাত লেখক ৺ পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, অপর যে কয় জন গিয়াছিলেন সকলেই জীবিত আছেন। আমাদের সকলেরই উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের প্রশস্ত বৈঠকখানায় রাত্রি যাপন করিবার আয়োজন হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আগাগোড়া তক্তাপোষ পাতা তাহার উপর শতরঞ্চ এবং তদুপরে পরিষ্কার চাদর বিস্তৃত। শয়নের জন্য গৃহস্বামী আমাদের দশ বার জনকে এক একটি করিয়া বালিশ ও লেপ দিয়াছিলেন। আমি কিছু কাল নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া দেখি আমার পার্শ্বে আমার একজন বন্ধু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন ও জাগিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম তিনি মোটেই নিদ্রা যান নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যে কোন বিছানা পাতা না থাকায় শক্ত শয্যায় তাঁহার নিদ্রা হয় না। আমার লেপটি তাঁহাকে পাতিবার জন্য দিতে চাহিলাম। কারণ বাকি যে টুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল, গাত্র-বস্ত্র যাহা ছিল তাহাতেই যথেষ্ট শীত নিবারণ হইত। তিনি কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে তাহা লইলেন না, কিন্তু তাঁহার মোটেই নিদ্রা হইল না। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অভ্যাসের জন্য মানুষের একই অবস্থায় কি রূপ সুখ দুঃখের তারতম্য হয় দেখিলাম। যাঁহারা শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদের কোমল শয্যায় শয়নে কখন কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু বিপরীত অভ্যাসাপন্ন লোকের অবস্থান্তর হইলে কি বিষম কষ্ট। সেই জন্য সাংসারিক ভাবে দেখিলেও শক্ত শয্যায় শয়নাভ্যাস করা বড় ভাল। নিদ্রা হেয়

জিনিস নয়! ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি মানুষের নৈসর্গিক বৃত্তি। ইহা অপকৃষ্ট বৃত্তি নহে। কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে চিরদিনই সাবধানে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও লোভ লালসার প্রভেদ বুঝিতে পারা চাই। যতটুকু পানাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ জন্য ঠিক তাহাই ব্যবহার করা চাই। তদতিরিক্ত যাহা আহার বা পান করা যায় তাহা লোভলালসার বশবর্ত্তী হইয়া করিতে হয়, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিক সুমিষ্ট উপকরণের উপরোধে অধিক আহার করা বা সুমিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত পেয় বলিয়া অধিক পরিমাণে পান করা তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য নহে, ইহা লোভলালসার পরিচয় মাত্র। আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি যৌবনে একটি নিয়ম করিয়া আহার করিতে বসিতেন। ভোজনের সময় তাঁহাকে যাহা কিছু দেয় সমস্ত এককালে দিতে হইত। তিনি অগ্রে সমস্ত ব্যঞ্জনাদি আহার করিতেন, পরে কেবল মাত্র লবণোপকরণে ভাত খাইতেন। তিনি বলিতেন ইহাতে ঠিক ক্ষুধার পরিমাণ মত আহার করা হয়। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ আচরণ জন্য অনেকে অনেকরূপ ব্যঙ্গ করিতেন, কেহ কেহ পাগল বলিয়া শ্লেষ করিতেও ক্রটী করিতেন না। আমি এরূপ করিতে কাহাকেও বলি না, তবে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিরিক্ত পানাহার যে দোষযুক্ত তাহাই বলিতেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণানুযায়ী পানাহার যেমন প্রয়োজন, নিদ্রার পরিমাণানুসারে শয়নও তদ্রূপ আবশ্যক। চেষ্টা করিয়া অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইবার প্রয়াসকে জাড্য বা আলস্য বলা যাইতে পারে, ইহা ব্যসন মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু তাহা নিদ্রা নহে। শয্যা গ্রহণ কালে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিদ্রা যাইবে। নিদ্রার কাল ছয় ঘণ্টা হইলেই চলিবে। ইহা আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত। রীতিমত সকল কালেই রাত্রি দশটার সময় হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট শ্রান্তি দূর হয়। ইহা অপেক্ষা কম করা উচিত নয়। অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় অধিক রাত্রি জাগরণ করেন। সেটা তাঁহাদের বড় অন্যায় তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। যদি প্রতিনিয়ত ছয় ঘণ্টা করিয়া নিদ্রা যাওয়া হয় এবং অবশিষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে অধিক রাত্রি জাগিয়া স্বাস্থ্যহানি করিতে হয় না। অধিক রাত্রিতে পাঠ করিয়া বিশেষ যে কিছু ফল হয়, তাহা বোধ হয় না। যখন পৃথিবী বাহিরে তমসাচ্ছন্ন থাকে, তখন মানুষের বুদ্ধিও কেমন যেন এক রকম তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ভাল ভাবের স্ফূর্তি হয় না, বরং অনেক অসৎ ভাবের উদ্রেক হয়। সূর্য্যের সহিত আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির কি যেন একটা সম্বন্ধ আছে। সেই জন্যই বোধ হয় আমরা সূর্য্যোদয় হইতেই সূর্য্যের উপাসনা আরম্ভ করি। সূর্য্যের সহিত শরীরের যে বিশেষ নিকট সম্বন্ধ তাহা যিনি যে কোন পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন তিনিই বুঝিবেন, সকল পীড়ার আতিশয্যই রাত্রিতে। যত কিছু যন্ত্রণা রাত্রিতে উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দেবদেবীর পূজা বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন রাত্রিতে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে আমাদের বুদ্ধি বাহিরে পৃথিবীর ন্যায় তমসাচ্ছন্ন থাকে। সদ্বৃত্তির উদ্রেকের উপযুক্ত সময় নয় বলিয়াই, বোধ হয় সৎকর্ম্মের

নিষেধ বিধি হইয়াছে। সেই জন্য বলিতেছি যখন সংবুদ্ধির উন্মেষ না হইবারই কথা সে সময় বিদ্যা বুদ্ধির কাজ না করাই ভাল। সে সময় নিদ্রা যাইয়া শরীরের সমস্ত দিনের ক্লান্তিদূর করাই কর্ত্তব্য। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম। ইহা জানিয়া চলাই ভাল।

সাধারণতঃ শয্যাত্যাগ হইতে পুনঃ শয্যাগ্রহণ কাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য স্থূলভাবে তাহা বলা হইল; কিন্তু একটা বিষয় এখনও বলিতে বাকি আছে তাহা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিবার ইচ্ছা। উপরে যাহা বলিলাম যখন বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে অর্থাৎ যে দিন অবকাশ না থাকিবে সেই সকল দিনের জন্য, রবিবার ও অপরাপর অবকাশের দিনে কি কার্য্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে সময় তোমার অবকাশ থাকিবে কেবল এক গ্রীষ্মাবকাশ ছাড়া প্রায় সেই সময়ে আমারও অবকাশ থাকে। আহারান্তে অবকাশের দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যানুশীল করিবে। নূতন ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণের রচনা পাঠ করিবে। তাহা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ গুলিও যথাসাধ্য পাঠ করিবে, ইহাদের অধিকাংশই বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, বাস্তবিক ৺ কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ৺ হেম চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণ প্রভৃতি অনুবাদ অতি চমৎকার ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল পুরাণাদি পাঠ ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ও হইতেছে, সময়ে সময়ে যত্ন পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবে। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিবে।

যে কোন ভাল ভাব সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা আয়ত্তাধীন হইল কিনা বুঝিবার জন্য বাঙ্গালা প্রবন্ধাকারে তাহা লিখিবে। এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়া তোমার অধ্যাপকগণ মধ্যে যাঁহার যখন অবকাশ থাকে, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিবার জন্য বলিবে। আমার বন্ধুবর্গের ভিতর অনেক গুলি খ্যাতনামা বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ মনিষী আছেন, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহারা দয়া করিয়া তোমার প্রবন্ধগুলি সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার জনৈক হিতৈষী সাহেব বন্ধু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহা স্মরণ করাইতেছি। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় মান্য করিতেন বলিয়া উপদেশ দেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত যথেষ্ট জানেন, অনেক পড়িয়াছেন, এখন "ইংরাজী পড়ুন ও বাঙ্গালা লিখুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহাই করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি প্রভূত পরিমাণে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে কি তিনি যেরূপ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন কয় জন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ইংরাজীওয়ালা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক তাহ পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি লিখিতেন বাঙ্গালা। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই অনুবাদ। সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের ভাব, সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা। বাঙ্গালা ভাষায় কি সুন্দর রূপেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশের মাহাত্ম্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যেই তাঁহাকে

চিরজীবী করিয়া রাখিবে। তাঁহার অসাধারণ দানশীলতা, সহৃদয়তা, পরোপকার-স্পৃহা, তাঁহার যে জগৎজোড়া ভালবাসা, তাঁহার সে অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, স্বাধীন-চিত্ত, নির্ভিক নির্লোভ হৃদয়, সকলই কালে মানুষ ভুলিয়া যাইবে, তাঁহার জীবনচরিত-লেখকগণের প্রভূত প্রয়াস সত্ত্বেও, তৈল চিত্রের ছবি ও প্রস্তরের বিকৃতাকৃতি প্রতিমূর্ত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু যাঁহারা বঙ্গসাহিত্য পাঠ করিবেন, বঙ্গভাষা যতদিন সজীব থাকিবে, ততদিন, সেই উদার উপদেশের বলে, সেই "ইংরাজী অধ্যয়ন ও বাঙ্গালা রচনার" গুণে তিনি চিরজীবী থাকিবেন। আমিও তোমাকে সেই মহৎ উপদেশের অনুকরণে বলি, সংস্কৃত ও ইংরাজী অধ্যয়ন কর এবং যেটি যেখানে ভাল ভাব দেখিবে, যেমন সুপুত্র দেশ ভ্রমণে গিয়া যেখানে যেটি ভাল জিনিস পায় পিতামাতার জন্য বাটীতে আনয়ন করে, তুমি সেইরূপ বঙ্গভাষা-জননীর হস্তে আনিয়া দিবে। এখন হইতে এই দিকে লক্ষ্য থাকিলে ভবিষ্যতে অনেক কার্য্য করিতে পারিবে। এইরূপ অবকাশকালে বঙ্গসাহিত্যের দ্বিবিধ পরিচর্য্যা করিবে। সময় পাইলে অবকাশকালে যখন আমারও অবকাশ থাকিবে, আমার নিকট উপস্থিত থাকিবে, তাহাতে আমার নিকট যাঁহারা সর্ব্বদা আইসেন,. আমাকে যাঁহারা দয়া করেন, ভালবাসেন, তাঁহাদের সহিত তোমার পরিচয় হইতে পারিবে। আমার বন্ধুগণকে তোমার জানা আবশ্যক। কিন্তু বন্ধুগণ সকলেই পিতৃস্থানীয়, পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাঁহারাও তাহা হইলে তোমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিবেন, তোমার মঙ্গল কামনায় নিরত থাকিবেন। তাঁহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদই তোমার জীবনে সুখ সচ্ছন্দের প্রধান কারণ জানিবে।

গ্রীষ্মাবকাশ অতি দীর্ঘ। এই সময় তুমি হালিসহরের বাটীতে অপরাপর পরিবারবর্গের সহিত বাস করিবে। সেখানে কিন্তু তোমার নিয়মিত ক্রিয়া উপরে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ঠিক রাখা চাই। অধিকন্তু অপরাহ্নে যে সময় তোমাকে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছোট ছোট ভাই ভগিনী প্রভৃতি লইয়া নির্দ্দোষভাবে ক্রীড়া করিতে বলিয়াছি, সেইটির একটু অধিক পরিসর করিয়া দিবে। সেখানে গিয়া নিজ পরিবার ছাড়া পল্লিস্থ সকল বালক বালিকা লইয়া ক্রীড়া করিবে। ক্রীড়াটা অবস্থানুসারে যাহা সকলের মনোমত হয় সেইরূপ করিবে। পাড়ার আগাছা জঙ্গল কাটা, মাটী খুঁড়িয়া বাগান করা, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করা প্রভৃতি সাধারণ উপকার জনক কার্য্যে সকলে আমোদ বোধ করিলে তাহাই করিবে। আর মধ্যে মধ্যে বন-ভোজন কখনও ভুলিবে না।

পরিবারটা একটু বিস্তৃত মনে করিয়া তাহাদের সকলকেই সহোদর সহোদরা জ্ঞানে সকলের সঙ্গে হৃদয়ের সহিত মিশিবে ও সকলকে ভালবাসিবে; সকলকে লইয়া আমোদ করিবে। তোমার সহিত পল্লীবাসী বালক বালিকার যে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইবে তাহা অনেক সময়ে বড় সুখপ্রদ। পরস্পর সেই ভালবাসাটুকু যাহাতে চিরস্থায়ী

হয় তাহা করিবে। ক্রমশঃ এই ভালবাসাটুকু নিজ পল্লী ছাড়াইয়া গ্রামময় বিস্তার করিবে আবার সময়ে উহা স্বগ্রামে আবদ্ধ না রাখিয়া স্বদেশের উপর, স্বজাতির উপর অর্পণ করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিবে।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, M. A., B, L

রাধা-শ্যাম।

ও কে ঘোর তমাল-কাননে।
কাল কুচ কুচে ছেলে চিন্তে পারিনে॥

কাঁকলে পীত ধড়া মাথায় মোহন চূড়া
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ নূপুর বাজে রাঙা চরণে॥
পিঠে তার দোলাই দোলে নাকে মুকুতা ঝোলে
বগলে পাচন বাড়ি বাঁশী বদনে॥
সাথে কে রাধা-শশী তুলনায় নাই রূপসী
মেঘে বিজলী যেন খেলে গগনে॥
এসেছে অভিসারে বুঝি তা ব্যবহারে
নীল-বাস পরিধান রবে গোপনে॥
দুজনে হাতাহাতি মুখে মুখ মাতামাতি
নাচিছে কাননরাজি তাদের নাচনে॥
গলাটি ধরাধরি কিবা রূপ মরি মরি
আমি তুমি রয় না রে রূপ ভাবিলে মনে॥
দেখিলেই নয়ন ভোলে পড়ে পায় মনটা ঢোলে
সাধ যায় কোলে তুলে রাখি দুজনে॥
কেন বা কাননমাঝে দেখে সুখ মরি লাজে
উহাদের স্থান দিতে কেউ নাই কি ভুবনে॥
বোধানন্দনাথ বলে দিব স্থান হৃদকমলে
মাকে জিজ্ঞাসা আগে করি গোপনে॥

প্রার্থনা।

দয়াময়, কি বলিয়া তোমায় ডাকিব? ডাকিব, ডাকিব মনে করি, কিন্তু ডাকিতে গিয়া ভাষায় এমন কথা খুঁজিয়া পাই না, যাহা প্রয়োগ করিয়া তোমাকে ডাকিলে হৃদয় জুড়ায়। সংসারের তাপে,—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, ত্রিতাপে—অহরহঃ প্রাণ জ্বলিতেছে, কিসে এ জ্বালা জুড়ায়? তোমার সুধাময় নাম করিলে কি এই তীব্র বিষজ্বালা জুড়ায়? শুনিয়াছি, শাস্ত্রে বলে তোমায় যতক্ষণ লোকে ডাকে, ততক্ষণ তার আয়ু ক্ষয় হয় না। তোমার মধুরতাময় নামটি জিহ্বায় গ্রহণ করিবামাত্র কাল পলাইয়া যায়। তপনের কার্য্য জীবের আয়ু হরণ করা। একদিন কাটিল, সূর্য্যদেবের উদয় কাল হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত সময় চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তোমার নাম যে করে, শুনিয়াছি তাহার উপর কালের অধিকার নাই, শাস্ত্রকার বলেন,—

"সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তি সা চ বিক্রিয়া,
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ।"
মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

জানি, সব জানি, জানিয়া শুনিয়াও তোমাকে ডাকি না। ডাকিতে জানি না। কোন্ ডাক যে তোমার নিকট পঁহুছিবে তাহা জানি না তাই ডাকিতে পারি না।

জানি,

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" গীতা।

যেখানে যে অবস্থায় যেরূপ স্বরে তোমায় ডাকি না কেন, সে ডাক তোমার শ্রবণে নিশ্চয় পশিবে, কেন না তুমি "সর্ব্বত শ্রুতিমৎ" তবুও তোমায় ডাকিতে পারি না। কে যেন আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়ায়। কে সে? যেন চিনি, চিনি, চিনি না। পথ আগুলিয়া অসার অনিত্য বস্তুতে নিত্যত্ব আরোপ করাইয়া তাহাতেই মজাইয়া রাখে। কে সে? সেই কি "দুরত্যয়া" দেবী? যাঁহার বিশ্ববিমোহিনী শক্তিতে বিশ্ব মুগ্ধ, সেই যোগমায়ারূপী আদ্যাপ্রকৃতি মহামায়া অবিদ্যারূপ মদিরা পান করাইয়া সদাই বিভোর, জ্ঞানহারা করিয়া রাখেন, কি যে হয় কিছুই বুঝিতে দেন না। তাই তোমায় ডাকি না, ডাকিতে জানিলেও ডাকি না। ক্রমে অনভ্যাসবশতঃ তোমায় যে ডাকিতে হয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। কি হইবে? নাথ, কে আবার শিখাইবে? শিশুর বাক্যালাপের প্রথম উদ্যমের ন্যায় এই ডাকা শিক্ষা কে দিবে? শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া জননী স্তন্যপান করাইতে করাইতে কত কথা শিখান, "মা, দাদা।" ইত্যাদি। আমাদের জননী, বিশ্বজননী, বিশ্ববিমোহিনী এমনি কঠিনা, আমাদের ভুলাইয়া দিয়া আর উপায় দেখাইয়া দেন না। তবে কেমন করিয়া জানিব, কি করিয়া ডাকিতে হয়। নির্জ্জন কাননে গিয়া বসিলাম, মনে হইল সংসার কোলাহলশূন্য নির্জ্জন বনস্থলী, বুঝি উদ্বেলিত হৃদয় স্থির হইবে, তোমায় ডাকিব। বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখে কলস্বনে নিজসুস্বরলহরী বিকীর্ণ করিয়া, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি জাগাইল, জিজ্ঞাসা করিলাম

"পাখি, কারে ডেকে তোর এত আনন্দ? কাকে ডাকবার জন্য এত উল্লসিতচিত্তে বনস্থলী কাঁপাইতেছিস্? আমায় শিখাইবি? আমি জ্ঞানহীন, অথচ আত্মাভিমানে স্ফীত দুর্ভাগা মানব! প্রকৃতির সহচরী তোরা প্রকৃতির ঈশ্বরকে কিরূপে ডাকিতে হয় শিখাইবি?" পাখী শুনিলও না। আপন প্রাণের আবেগে আপনি বিমোহিতচিত্তে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে সুস্বর প্লাবিত করিয়া চলিয়া গেল। আমি নিরাশ হৃদয়ে বসিয়া রহিলাম।

মনে হইল, ভাগীরথী তীরে যাই। দেবী ভাগীরথী নাথের পাদোদ্ভবা। তিনি হয় ত দয়া করিয়া উপায় বলিয়া দিবেন। তখনি মনে হইল মা গঙ্গা একসময়ে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তিনি কি আমায় বলিয়া দিতে পারিবেন?

ধরার অগণ্য পাপীর অবগাহন হেতু পাপভারে পরিক্লিষ্টা হইয়া যখন পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন গঙ্গাদেবী দেখিলেন প্রহরী হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু সেখানে আছেন সকলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ নারায়ণ। মহাবিপদে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নারদ ঠাকুর তাঁহার উপায় বিধান করিয়া দিলেন। সেই গঙ্গাদেবী স্বীয় জনক, যাঁহার পাদোদ্ভবা তিনি, তাঁহাকেই চিনিতে পারিলেন না, তবে কেমন করিয়া তিনি আমায় শিখাইবেন?

থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যাকালে নৈশগগনে অন্ধকাররাজী যখন অল্পে অল্পে অধিকার বিস্তার করিতেছিল, এক নির্জ্জন স্থানে গঙ্গাতটে গিয়া উপবিষ্ট হইলাম। মা কল কল শব্দে ছুটিয়াছেন। এই কি ভাষা? সেই কল কল শব্দের সহিত সুর মিলাইয়া তার স্বরে ডাকিলাম,

"হবেমুরারে মধুকৈটভারে"

বারিতরঙ্গ গর্জ্জনে আমার ক্ষীণ কণ্ঠের ক্ষীণতর ডাক ডুবিয়া গেল—ডাকা হইল না।

কে শিখাইবে? কেমন করিয়া ডাকিতে হয় কে বলিয়া দিবে? কোন্ ডাক তোমার নিকট পঁহুছিবে কে বলিয়া দিবে?

কোথা গুরুদেব! শিখাও, দীন সন্তানকে বলিয়া দাও, আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের অবলম্বন সেই প্রাণধনকে কি বলিয়া, কোন্ ভাষায় ডাকিলে, আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া উদয় হইবেন? আমার গরল জর্জ্জরিত প্রাণে সুধাস্রোত বহাইবেন? কেন এরূপে দীন সন্তানকে ফেলিয়া পলাইলে? কে শিখাইবে? কে পথ দেখাইবে? কাহার পদাঙ্কানুসরণে জননমরণভীতি নষ্ট হইবে? গুরু, পিতা, চতুর্দ্দিক শূন্যময়, ঘোর তমোরাশি যেন চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। কি রূপে দেখিব, কি রূপে ডাকিব? বুঝি ডাকা হইল না। এই ত্রিতাপের বোঝা বহিতে বহিতে বুঝি এই সংসার সমুদ্রে ডুবিতে হইল।

তোমায় ডাকিব। তুমি শোন আর না শোন তোমায় ডাকিব। যখন ডাকিব বলিয়া মনে করিয়াছি, তখন ডাকিব। তুমি শোন আর না শোন। তোমায় না ডাকিলে যে থাকিতে পারি না। তাই ডাকি। কিন্তু ডাকের সফলতা চাই না। নিরাশ হৃদয়ে চিরকাল ডাকিব, ডাকিতে ডাকিতে অন্তঃকালে যেন তোমায় ডাকিতে পারি, এইরূপে ডাকিব। তাহা হইলে গতায়াত ঘুচিবে।

"সদাতদ্ভাবভাবিতঃ" হইলে নাকি আর এখানে, রোগ শোক পাপতাপ পূর্ণ ধরায় আসিতে হয় না। তাই ডাকিব। চির-দিনের জন্য তোমার পদতলে স্থান পাইতে তোমায় ডাকিব।

যে তোমায় ডাকে, অনন্য উপায় হইয়া যে তোমায় ডাকে, তাহার ভার নাকি তুমি বহন কর। তোমার প্রতিজ্ঞা বাক্য

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"
গীতা।

মনে করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া যা' মনে আসে তাই বলিয়া তোমায় ডাকিব। দেখা কি দিবে না? অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান চাহি না। নাথ! পরমাত্মরূপী তোমায় দেখিতে পারিব না দেব! এস, এস, দীনের হৃদয় আলোকিত করিতে তোমার মাধুর্য্যময় দীনবৎসলরূপে আমার হৃদয়ে উদয় হও। দেখিয়া নয়ন সার্থক করি, সেই

"বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডং, কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত সুভগমুখং স্বাধার ন্যস্ত বেণুং। শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যাঃ, বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপাল বেশং।"

সেই মনোমোহনরূপে, সেই ব্রজদেবীগণ পরিবৃত মনোহর মুরলীধর মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর। বিরহ-কাতরা গোপীগণকে যেরূপে শান্ত করিয়াছিলে সেই—

"তাসামিভির্ভূচ্ছৌরিঃ স্বয়মান মুখাম্বুজঃ
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।"
শ্রীমদ্ভাগবত। ১০। ৩২।

সেই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে—সেই কন্দর্পের দর্পহারীরূপে আমার অন্ধকারময় হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া উদয় হও। নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চকোরের ন্যায় সুধাপানে মত্ত হই ও গোপীগণের সঙ্গে বলি

"সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্,
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেহধরামৃতমম্।"
শ্রীমদ্ভাগবত—গোপীগীতা।

তোমার নাম করিতে করিতে তোমাতে স্মরতি হইবে, তখন ব্রজদেবীগণের ন্যায় সব ভুলিয়া, এমন দেহ যে এত প্রিয়তম বস্তু, তাহাও ভুলিয়া তোমাতে মগ্ন হইব। সে দিন কি হইবে? বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুধাতরঙ্গ ছুটিবে? সেই তরঙ্গে জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, অণু, পরমাণু সব ডুবিয়া যাইবে ও এই বিরাট বিকাশ হইতে ভক্তমনোহর দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি বিকশিত হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিবে? দীনের ভাগ্যে সে শুভদিন কি হ'বে? যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে, যতক্ষণ জিহ্বায় বাক্য উচ্চারণের শক্তি আছে,—যেন তোমায় ডাকিতে পারি। যেন ডাকার মত ডাকিতে পারি। সকল স্নায়ু জাগাইয়া, আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত উদ্বোধিত করিয়া তোমায় ডাকিতে পারি—এই চাই। আর কিছুই চাই না।

দিবে কি? এ দীনকে শক্তি দিবে কি? মনে মুখে এক করিয়া একবার তোমায় ডাকিবার শক্তি দিবে কি? আঁধারময় কলুষিত জীবন নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের কৌমুদীস্নাত করিয়া পূত করিয়া লইবে কি? সংসারের শত শত প্রলোভনের দাস, দীন অভক্তকে তোমার

মতন করিয়া লইবে কি? শুনিয়াছি উৎসৃষ্ট, বা অপকৃষ্ট দ্রব্যে বিগ্রহ-সেবা হয় না। সংসারের শত সহস্র দ্রব্যে উৎসর্গীকৃত এই শতধা মন কিরূপে তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করিব? এই "আধখানা" প্রাণ কি তুমি গ্রহণ করিবে? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বিষয়, অর্থ, মান এইরূপ শত সহস্র ব্যাপারে লিপ্ত এই ক্ষুদ্র মন কি রূপে তোমার "নৈবেদ্য" হইবে? কেমন করিয়া তোমার মতন হইব? কি করিলে তোমার গ্রহণীয় হইব? পুরুষত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া প্রকৃতি হইব? কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমতীর চরণে লোটাইয়া পড়িয়া কি তাঁহার সেবাদাসী হইব? তাহা হইলে কি তোমায় পাইব? বল, বল নাথ, তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, আমার মনের কথা সব জান, বল বল হরি, কি করিলে তুমি আমায় গ্রহণ করিবে। আর কিছু চাই না। শুধু তোমার শান্তিময় পদতলে বসিব, আর তোমার প্রেম আনন দেখিতে দেখিতে বিশ্ব সংসার বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া দ্রবীভূত হইয়া তোমায় পাদপদ্মের কোরক মধ্যে স্থান পাইব। এ সাধ আমার পুরা'তে হবে। দীনহীন কাঙ্গালের, বামনের চন্দ্রধারণের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় এই দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হ'বে। তুমি মনে করিলে কি না হয়—

"যস্য প্রভা প্রভাবতো জগদণ্ডকোটিঃ।"

তোমার ইচ্ছায় যখন সর্ব্ব বিকাশ, আর দীনের চিরমুদিত হৃদয়-পদ্ম তোমার প্রেম সূর্য্যোদয়ে কি প্রস্ফুটিত হইবে না? চিরকাল কি এই "মমত্বগর্ত্তেহতি মহান্ধকারে"—নিমজ্জিত থাকিব? তোমায় ভূলিয়া রহিব? সোনা ফেলিয়া শূন্য অঞ্চলে কি চিরকাল গ্রন্থী দিব? উপায় বলিয়া দাও।

গুরুরূপে আমার হৃদয়ের নিভৃতস্থানে উপবিষ্ট হইয়া আমায় উপদেশ দাও, কেমন করিয়া, কোন্ পথে তোমার উদ্দেশে ছুটিব? কণ্টকাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথ হইলই বা! তোমার নামে কণ্টক কুসুম হইবে, বিপদ সম্পদ হইবে। এরূপ হয় আমি জানি। প্রহ্লাদকে মারিবার জন্য পিতা অসুর হিরণ্যকশিপু কি না করিয়াছিল? বালক পুত্র হিমাদ্রি শৃঙ্গের ন্যায় অচল অটলভাবে তোমার নামবলে বলীয়ান হইয়া সকল উপেক্ষা করিয়াছিল। বহ্নি চন্দন হইয়াছিল, বিষ সুধা হইয়াছিল, সমুদ্রে শিলা ভাসিয়াছিল—তোমার নামের বলে।

দাও, দয়াময় বলিয়া দাও, কোন ডাকে তুমি কর্ণ দিবে, কোন পথে তোমার নিকট যাইব? তোমার কৃপা না হইলে কে তোমায় পায়? তুমি দেখা না দিলে কে দেখিতে পায়? তুমি অশব্দ, অস্পর্শ্য, অরূপ, অব্যয় অথচ শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ তোমারই বিকাশ। জ্ঞানী জ্ঞান মার্গে যে ব্রহ্মজ্যোতি ধারণা করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন সে তোমারই অঙ্গকান্তি। যোগী পরমাত্ম রূপে ষড়চক্রভেদ দ্বারা সহস্রারে যাঁহাকে দেখেন, তাহাও তোমার শক্ত্যাবেশ। অণুপরমাণু, ত্রাসরেণু হইতে বিরাটব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই তোমার বিকাশ। তুমি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, আর দীনভক্তের—ভগবান—প্রাণারাম আত্মারাম! তাই আজ আকুলি বিকুলি করিয়া তোমার পদতলে স্থান পাইবার আশায় তোমায় ডাকিতেছি। যে লালসা, "লৌল্যমেবমূল্যমেকলং" যে লৌল্য হইলে তোমার দয়া হয়, তাহা আমার নাই। আমায় দাও, সেই উৎকণ্ঠা, যে উৎকণ্ঠায় শ্রীমতী সারানিশি

পিঞ্জরাবদ্ধ বনবিহঙ্গীর ন্যায় বিচঞ্চল হইতেন, সেই উৎকণ্ঠা আমায় দাও, তাহা হইলে তোমায় পাইব। তোমার প্রেমাঙ্কে স্থান পাইব। দয়াময়, আর কিছু চাহি না। দীনের এ ভিক্ষা পূর্ণ কর। নাথ, হৃদয়ধন, পুরুষত্ব কেমন করিয়া বর্জ্জন করিব, কিরূপে প্রকৃতি হইব? ব্রজদেবিগণের মধ্যে কি রূপে স্থান পাইব? "তবাঙ্ঘ্রিরেণু স্পর্শাধিকারঃ" কিরূপে পাইব? যাহা পাইবার জন্য --

"* * * শ্রীর্ললনা চরন্তে যেয়
বিহার কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতাঃ ॥" শ্রীমদ্ভাগবত

কি রূপে পাইব? দয়া কর দেব! দীনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ কর। তোমার প্রেমাস্বাদনের শক্তি আমায় দাও। যেন রাসমণ্ডলের একটি ক্ষুদ্র কীট বা পতঙ্গ হইয়া স্থান পাই। জীবন ধারণ পূর্ণ হউক। পুনঃ পুনঃ গতায়াত ঘুচিয়া যাউক। জঠরযন্ত্রণা আর ভোগ করিতে পারি না। সংসারের বিষের জ্বালা আর সহে না। বিষয়ান্ধকারে হৃদয় মন আচ্ছন্ন করিয়াছে—তোমার অমল জ্যোতি দর্শনে অন্ধকার দূরে যাক্, হৃদয়ে কুমুদ প্রস্ফুটিত হউক। তাহা তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হই ও কাঁদিয়া বলি—

"নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে ॥"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

আবাহন।

এস মা আনন্দময়ি, দরিদ্র কুটীরে
পূজিব ও রাঙাপদ হয়েছে বাসনা,
পূজিব জননি, তোরে কোন্ উপচারে?
সম্বল কিছুই নাই অশ্রুজল বিনা।

দরিদ্র সন্তান তোর, ভগ্ন এ কুটীর
তাই বলে দয়া মাতা হ'বে না কি দীনে?
উথলিত অহরহঃ দুঃখসিন্ধুনীর;
মোক্ষময়ি, শ্রীচরণ পূজিব কেমনে?

কতই সন্তান তোর কত আয়োজন
করিছে আনন্দ মনে বৎসরেক পরে,
কোথায় কি পাবে দীন তাই আহরণ
করিবে অকৃতি সুত পদে অর্পিবারে?

সুবর্ণ মাণিক্য কত পূজার কারণ
দিতেছে ধনাঢ্যসুত তোমার চরণে
জবা বিল্বদল আর আরক্ত চন্দন,
উষ্ণ অশ্রুজল আছে যুগল নয়নে,

তাই নিবেদিব পদে আর কিছু নাই,
লইবে কি এ দাসের ক্ষুদ্র উপহার?
অমূল্য বসন ভূষা কোথা মাতা পাই?
সমর্পিব শ্রীচরণে যা' আছে আমার।

ভক্তি জবা, আঁখিজল হ'বে গঙ্গাবারি,
নিবেদিব তোরে মাতা করেছি মনন।
যোগ্য কি হইবে তব, শ্রীহস্ত প্রসারি'
লইবে, সফল হ'বে দরিদ্র পূজন?

লও আর নাহি লও, দিনু সমর্পিয়া
যা' আছে সম্বল মাগো এই পৃথ্বিতলে,
পাষাণতনয়া বলে পাষাণের হিয়া
হ'ওনা ভাসায়ে সুতে নয়নের জলে।

এই পূজা, এই মম ক্ষুদ্র উপচার
বড় আশা ক'রে আজি এনেছি চরণে
দয়া করি কর দেবি, আশার সুসার
পাই যেন অঙ্কে স্থান শেষের সে দিনে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

মহামাতা ৺কামাখ্যা দেবী

দক্ষ যজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে, দেবাদিদেব ভোলানাথ, মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন; বিষ্ণু সেই দেহ তদীয় চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া একান্ন অংশে বিভক্ত করেন। ছেদিত অংশ যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানকে পীঠস্থান কহে। কামরূপে দেবীর মহামুদ্রা পতিত হইয়াছিল। তন্ত্র মধ্যে দেবীর যন্ত্র-পীঠের যেরূপ মাহাত্ম্য দেখা যায়, তাহাতে এই পীঠস্থান যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাই মহাপীঠ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থকেন। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু মহামাতার যন্ত্র-পীঠ দর্শন মানসে প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিতেছেন। কিন্তু এই মহাপীঠে দর্শন করিবার কিছুই নাই। মন্দিরাভ্যন্তরে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিতস্তি পরিমাণে বিস্তৃত একটি গহ্বর। গহ্বরের চতুর্দ্দিক প্রস্তর মণ্ডিত। ঐ গহ্বরই কামাখ্যা দেবী। উহা সর্ব্বদা স্বর্ণ টোপরে আচ্ছাদিত থাকে। দেবী দর্শন না হইলেও ঐ গহ্বর দর্শনেই যাত্রীগণ প্রভূত পুণ্য রাশি সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

মহামাতা ৺কামাখ্যা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, তৎপূর্ব্বে কুচবিহারের রাজ-বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নে তাহাই বিবৃত করা গেল।

কোচ জাতির মধ্যে হাজো নামক এক ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতাবলে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার হীরা জীরা নাম্নী দুইটি কন্যা ছিল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে উক্ত কন্যাদ্বয় কুমারী অবস্থায়ই দুইটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। কোচেরা শিশুদ্বয়কে শিবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেই হইতে কোচ জাতিকে শিববংশ বলা হয়। হাজো দৌহিত্র দ্বয়ের নাম শিশু এবং বিশু রাখিয়াছিলেন।

কালক্রমে শিশু ও বিশু অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন এবং কোচ সৈন্য গঠন করিয়া কাছাড় পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ইঁহারা মহারাজ উপাধি ধারণ করেন। অতঃপর শিশু মহারাজ শিব সিংহ এবং বিশু মহারাজ বিশ্বসিংহ নামে অভিহিত হন। এই বিশু সিংহই কুচবিহার রাজবংশের আদি পুরুষ এবং ইঁহার উপরই মহামায়ার দয়া হইয়াছিল।

মহারাজ বিশ্বসিংহ অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি যন্ত্রপীঠের মাহাত্ম্য পাঠ কালে তন্ত্র মধ্যে জানিতে পারেন, তাঁহার রাজ্যের কোন শৈলশিখরে এই মহাপীঠ সংস্থিত। কিন্তু কোন্ শৈলশিখরের কোন্ স্থানে মহাদেবীর যন্ত্র-পীঠ তাহা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, মহারাজ বিশ্বসিংহ যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আহার নিদ্রা এবং রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহামায়ার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এতাদৃশ ভক্তের প্রতি দয়াময়ীর দয়া হইল। তিনি মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি ব্রহ্মপুত্র নদের তটস্থ পর্ব্বত শিখরে বিরাজ করিতেছি।"

রাজা স্বপ্ন দর্শনে ব্যাকুল হৃদয়ে যন্ত্রপীঠ উদ্দেশে যাত্রা করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অনাহার ও অনিদ্রায় ভ্রমণে রাজার শরীর শীর্ণ বিবর্ণ এবং কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট রহিল। তিনি পর্ব্বত নিবাসী অসভ্য লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই মহামাতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু তাহারা কামাখ্যা দেবীর সন্ধান বলিতে পারিত না। রাজা ক্ষোভে ও দুঃখে ভূতাবিষ্টের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিতেন।

একদা একদল অসভ্যকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—"মহারাজ! আমরা কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি; তবে এই মাত্র জানিবে আমাদের মধ্যে কাহার কোন পীড়া বা বিপদ উপস্থিত হইলে ঐ স্থানে যে একটি জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐকান্তিক

মনে জানাইলে রোগ বা বিপদ হইতে মুক্তি লাভ হয়। রাজা ইহাতেও কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন জননী ভক্তের কাতর ক্রন্দনে পুনরায় স্বপ্ন দ্বারা আদেশ করিলেন, "বৎস! অসভ্যেরা যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। আমি ঐ স্থানেই অধিষ্ঠিত আছি। তুমি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দাও।"

রাজা জগজ্জননীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে ভক্তি গদ গদ ও পুলক পূর্ণ হৃদয়ে সেই স্থানে সমাগত হইয়া সেই ক্ষুদ্র গহ্বরটি দেখিতে পাইলেন। তাহার সন্নিধানেই একটি জলধারা* উদ্‌গত হইয়া, ঐ স্থানকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রাজা এই সমস্ত দর্শন করিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৪৮৪ শকে ঐ বংশীয় রাজা মল্লধ্বজ এবং ১৪৮৭ শকে তদীয় ভ্রাতা রাজা শুক্লধ্বজ ঐ ভগ্ন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই মন্দির একটি বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং ইহা তিন অংশে বিভক্ত। মন্দির মধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং অন্ধকার। আলো ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। প্রবেশ দ্বারে জয় ঘণ্টা লম্বমান রহিয়াছে। অনেক যাত্রী প্রবেশ ও নির্গমন সময় ঘণ্টাধ্বনি করিয়া থাকেন। ঐ ঘণ্টাধ্বনিও মহামাতার একটি প্রীতিকর কার্য্য।

পূর্ব্বে মহামাতার সম্মুখে বরাহ বলি হইত। ইহাতে বোধ হয়, সে সময় বরাহ ভোজী অসভ্যের সংখ্যা অধিক থাকায় তাহাদের প্রীতিকর দ্রব্য মাতাকে বলি দেওয়া হইত। পরে অসভ্যের হ্রাস ও সভ্যের সমাগমেও ঐ নিয়ম চলিতেছিল। "দেবী বরাহেই সন্তুষ্ট" এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদা প্রধান পুরোহিতের উপর স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল যে—"আর বরাহ বধ না হয়।" তদবধি উহা বন্ধ হইয়া পাঁঠা, মহিষ ও পারাবত বলি হইতেছে।

প্রতিনিয়তই মহামাতা ৺ কামাখ্যা দেবীর উৎসব হইতেছে; তন্মধ্যে দুর্গোৎসব, অম্বুবাচী ও পুংসবন প্রধান। হরগৌরীর বিবাহকে পুংসবন বলে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে অতি সমারোহের সহিত দেব দেবীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"অম্বুবাচী সময় দেবী রজঃস্বলা থাকেন" এইরূপ কুসংস্কার অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। স্মৃতিতে দেখা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবস সূর্য্য যে বারে ও যে সময় মিথুন রাশিতে গমন করেন, তাহার পরের সেই বারে ও সেই সময় পৃথিবী স্ত্রীধর্ম্মিনী হন; ইহাই অম্বুবাচী।

শ্রীউমাচরণ দাস।

পরকায়া-প্রবেশ।

(৬০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

একদিন অপরাহ্নে আমাদের পল্লির নিকটবর্ত্তী ময়দানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ রহমনকে দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম একি!—রহমন এখানে কেন?—রহমন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র দ্বীপটির বাহিরে কখন যাইতেন না, সুতরাং দুই একজন মৎস্য ব্যবসায়ী, অথবা যাহারা আমার ন্যায় বিপদগ্রস্থ কখন সেই দ্বীপে গিয়া পড়িয়াছে, এরূপ লোক

* অধুনা ঐ ক্ষুদ্র জলধারাটি "পাতাল গঙ্গা" নামে পরিচিত

ব্যতীত, লোকালয়ে আর কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই। ময়দানের সমস্ত লোকই তাঁহার অদ্ভুত আকৃতি ও বেশভূষা দেখিয়া কতক ভীত কতক বা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে, কিন্তু রহমনের সে দিকে ভ্রূক্ষেপে নাই—আপন মনে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন। যে ব্যক্তি মনুষ্য মাত্রকেই ঘৃণা করিত বা তদ্রূপ ভাব প্রকাশ করিত, মানুষ দেখিলে তাহার সহিত মানুষের মত আলাপও করিত না, লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন নিবিড় জঙ্গলময় ক্ষুদ্রদ্বীপে, কেবল শিকারলব্ধ মৎস্য বা মাংসাদি মাত্র আহার করিয়া কাল যাপন করাই যাহার জীবনের শেষ সংকল্প, আজ কোন্ অপরিজ্ঞেয় শক্তি তাহাকে সেই নিভৃত কুটীর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, এই লোকালয়ে আনিয়াছে—আজ কাহার জন্য সে পাগলের ন্যায় ধাবিত!—জানিলাম সে আর কেহ নহে—সে আমিই—আমিই তাঁহার লক্ষ্য—আমারই জন্য তিনি আজ তাঁহার জীবনের গুপ্ত অভিপ্রায় ভুলিয়া পাগলের ন্যায় দৌড়িয়া বাহির হইয়াছেন।

প্রণয়ের শক্তি অপরিমেয়—প্রণয়ে না করিতে পারে এমন কাজ নাই—প্রণয় মানুষকে পাগল করিয়া দেয়। প্রণয় যে কেবল স্ত্রীপুরুষেই হয় তাহা নহে, প্রণয় সকলের সঙ্গেই হইতে পারে। প্রণয়ের ফল অনুরাগ ও অনুরাগের চরম প্রেম—প্রেমে প্রেমময় **শ্রীহরিকেও** পাওয়া যায়। উর্ব্বরা ভূমি বহুকাল অকর্ষিত ও অযত্নকৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে যেমন উহা কণ্টকময় বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হইলেও উহার উর্ব্বরা শক্তি একেবারে লোপ পায় না, কেবল গুপ্তভাবে থাকে মাত্র, পরন্তু উহাকে বর্ষণ ও বারিসিঞ্চন ইত্যাদি দ্বারা আবাদ করিলে পুনরায় দ্বিগুণ উর্ব্বরা ও ফলপ্রদ হয়, বহুকাল যাবৎ মনুষ্য সংসর্গ রহিত হইয়া পশুবৎ নির্জ্জন বনমধ্যে বাস করায়, রহমনের মনও কতকটা সেইরূপ অনুর্ব্বরা হইয়া পড়িয়াছিল। এখন হঠাৎ মনুষ্য সঙ্গলাভ ও বহুবিধ সদালাপে কর্ষিত ও বারিসিঞ্চিত হইয়া দ্বিগুণ উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে। মনের ভাবগুলি গোপন করিয়া রাখিয়া এতদিন যেখানে কেবল কণ্টকময় বনজঙ্গলের আবাসভূমি করিয়া তুলিয়াছিল, আজ হঠাৎ তাহা সদালাপ কর্ষিত ও অনুরাগ-বারি সিঞ্চিত হওয়ায় দ্বিগুণ উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে, মনের সেই আবেগ আর ধারণ করিতে না পারিয়া, রহমন আজ উহা উদ্গীরণ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সেই বহুকালের পতিতভূমি যিনি আজ এত কষ্ট করিয়া আবাদ করিয়াছেন, ফলও তাঁহারই প্রাপ্য, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, তাই রহমন আজ সেই ফল তাঁহারই সেবায় উৎসর্গ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া, সেই একমাত্র প্রাণের লোক আমারই অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে—তাহার গতি আর কে রোধ করিতে পারে?

আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি দ্রুত-পদে আমার দিকে ছুটিলেন, আমিও আদরের সহিত তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম। তাঁহার হঠাৎ এরূপ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমি আপনার জন্যই আসিয়াছি, অদ্য রাত্রে আপনাকে দরিদ্রের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে—করিবেন, বলুন?"—কথা কয়টি তিনি এত দীন ভাবে বলিলেন যে আমি আর তাহাতে অমত প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমি বলিলাম, "অবশ্য করিব।" রহমন হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন, আমিও প্রস্তুত হইবার জন্য বাসার দিকে ফিরিলাম। পথে যাইতে যাইতে কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহাজডুবি—রহমনের পূর্ব্বপরিচয়।

যখন রহমনের কুটীরে উপস্থিত হইলাম, তখনও অল্প অল্প দিন আছে। তিনি আমাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে, এখনও একটু দিন আছে, চলুন যাই কিছু শিকার করিয়া আনি।"

শিকারে আমার বড়ই আমোদ। আমিও বলিলাম, "বেশতো, চলুন।" রহমন বলিলেন, "চলুন, আজ বড়যা দিয়া মাছ শিকার করা আপনাকে দেখাইব।" উভয়ে শিকার করিতে বাহির হইলাম।

আমার সেই ছোট নৌকাখানি খুলিয়া আমরা দুজনে হ্রদ মধ্যে মাছ ধরিতে চলিলাম। রহমনের শিকার কৌশল দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। বড়যা দ্বারা মৎস্য শিকার করা আমি আর পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। অনেকগুলি মাছ ধরা হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে এক একটা গল্প গুজবও চলিতেছে। তথাকার জল বায়ুর কথা বলিতে বলিতে রহমন বলিলেন, "ঝড় তুফানটা এখানকার একরকম নিত্য ব্যাপার—আবার এমনও হয়, যে কোথায়ও ঝড় নাই, কেবল গো-গুহা হ্রদে ভীষণ ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাৎ চলিতেছে—ইহার অর্থও আছে"

রহমনের কথা শেষ হইতে না হইতে সত্যসত্যই হঠাৎ কোথা হইতে প্রবলবেগে ঝড় আসিয়া আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরস্পর কথোপকথনে আমরা এত নিমগ্ন ছিলাম যে ঝড় উঠিতেছে বা উঠিয়াছে, এতক্ষণ আমরা তাহার কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারি নাই। যখন ঝড় আসিয়া একেবারে আমাদের ঘাড়ে পড়িল, তখন আমাদের চৈতন্য হইল। তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া দ্বীপে যাইলাম ও কুটীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

ঝড় ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ও মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে লাগিল। গাছপালা ভাঙ্গিয়া মেচ্মার হইতে লাগিল। হ্রদের জল উথলিয়া উঠিতেছে বোধ হইতে লাগিল যেন এই মুহুর্ত্তেই এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আমরা দুজনে সেই নিভৃত কুটীর মধ্যে, নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই ক্ষুদ্র কুটীর খানি উড়িয়া যাইবার আশঙ্কা করিতেছিলাম। এক একবার ঘরের মধ্যে বায়ু প্রবল বেগে প্রবেশ করিয়া জিনিস পত্রগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিতেছিল—আমরা কিন্তু একই অচল অটল ভাবে বসিয়া এক একবার পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে ভীত চিত্তে তাকাইতেছি, কাহারও মুখে কথা নাই।

রহমনের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে তিনিও অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। কেবল ভয়ও নহে, যেন কোন এক অদ্ভুত চিন্তা তাঁহার মনকে দলিত করিতেছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি ভীত ত্রস্ত হইয়া একবার ঘর একবার বাহির করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ না ঝড় থামিল, ততক্ষণ তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমারও মন ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। চিন্তার পর চিন্তার স্রোত আসিয়া মনকে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। যত সময় যাইতেছে, ততই নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া চিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। একবার ভাবিলাম রহমন কি পাগল! আবার ভাবিলাম, না হয়তো যাদুকর হবে। ভাবিলাম আমি একাকী এবং নিরস্ত্র, রহমন যাই হোক, আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দয়ার অধীন। যতক্ষণ না ঝড় থামিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিল। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া আমাকে নিরন্তর ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, তখন ঝড়ের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। আকাশে আর তখন মেঘ নাই, বজ্রের গভীর গর্জ্জন নাই, বায়ুর সে গোঁ গোঁ শব্দ নাই সমস্তই নিরব নিস্তব্ধ. কেবল চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন তরুলতাগণ রতি-অন্তে আলুথালু কেশা, বিপর্য্যস্ত বসনা, বিবস-শরীরা রমণীর ন্যায়, পরিণামের বিষম বিষাদ ফলের সাক্ষ্য দিতেছে মাত্র।—রহমন এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, সে রাত্র আর বাসায় ফিরিয়া যাইবার আশা ত্যাগ করিয়া আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে, একটু বিশ্রামের যোগাড় দেখিতেছি, এমন সময়ে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,—

"দেখ গোবিন্দ, আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি। তুমি ভীত হইও না। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। এই দুঃখময় জগতে যদি কিছু আমার প্রিয় থাকে, তবে সে তুমিই। তুমি বোধ হয় জান না যে আমার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, আমি লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারি। দেশ ভ্রমণ কালে আমি এক মহাত্মা ফকিরের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি অনেকদিন হইতেই তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি যাহা মনে মনে ভাবিয়াছ তাহা সত্য। আমার জীবনে এমন একটি গূঢ় ঘটনা আছে যাহা মনুষ্য কখন শুনে নাই। বহুকাল যাবৎ আমি উহা আমার হৃদয় মধ্যে গোপন রাখিয়াছি, কিন্তু আর আমি রাখিতে পারিতেছি না—কিন্তু কাহাকে আমি সে কাহিনী বলিব, আর কেই বা আমার সেই ভীষণ দুঃখের কথা শুনিবে বা শুনিয়া বিশ্বাস করিবে?—তুমি ভিন্ন আর তো জগতে আমার কেহ প্রিয় নাই, তাই আজ তোমার কাছে আমার সেই অদ্ভুত জীবন কাহিনী বলিয়া হৃদয়ের ভার নামাইব মনে করিয়াই তোমার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম। ভগবান দয়া করিয়া আজ সে সুযোগও দিয়াছেন। আমি তোমাকে আমার পরম বন্ধু বলিয়া জানি, আশা করি তুমি আমার দুঃখের সমবেদনা করিবে—পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে না।"

রহমন এই কথাগুলি এমন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ও তাহার চক্ষুদু'টি তখন এত উজ্জ্বল ও উত্তেজনাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, যে তাঁহার কথাগুলি আমার অস্থি-ভেদ করিয়া মজ্জা স্পর্শ এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ অথচ করুণ দৃষ্টি আমার হৃদয় ভেদ করিয়া অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছিল। এতদিন রহমন আমাকে বারবার 'আপনি' সম্বোধন করিয়া আসিতেছিলেন, আজ প্রথম তিনি আমাকে 'বন্ধু' সম্বোধন করিলেন এবং সে সময় তাঁহার মনের অবস্থা এতই আবেগ-পূর্ণ হইয়াছিল যে তিনি ভদ্রতার খাতির ভুলিয়া আমাকে নিতান্ত আত্মীয় জ্ঞানে 'তুমি' সম্বোধন করিয়া ফেলিলেন, পরন্তু পরে আবার কতকটা সে ভাব সামলাইয়া কখন বা 'তুমি' এবং কখন বা 'আপনি' বলিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ আত্মীয়তার প্রথম সূচনা এইরূপই হইয়া থাকে।

কথাগুলি বলিতে বলিতে রহমনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আবেগে তাঁহার শরীর মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ করপুটে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নীরবে রোদন করিলেন, পরে অনেক কষ্টে চিত্ত স্থির করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"এই ভারতবর্ষের অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর করাচি সহরে আমার জন্ম। আমার পিতা সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। তিনি মৎস্য ব্যবসায় দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আমি পিতার এক মাত্র পুত্র ছিলাম। বাল্য-কাল হইতেই পিতার সহিত মৎস্য মারিতে যাইতাম, এবং ক্রমশঃ মৎস্য শিকারে আমি বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার যখন বয়স ১৬ বৎসর তখন আমি মৎস্য

ব্যবসায়ী কোন সওদাগরের জাহাজে নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত হই। তথায় প্রায় চারি বৎসর চাকরী করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসি। সেই সময়ে আমার বিবাহ হয়। যে বালিকাকে আমি বিবাহ করি, তিনি আমার বাল্য-সঙ্গিনী, বাল্যকাল হইতেই আমরা এক সঙ্গে খেলা ধুলা করিতাম ও এক সঙ্গে বহু দিন পর্য্যন্ত লেখা পড়াও শিখিয়াছিলাম। বালিকা আমার অপেক্ষা প্রায় চারি পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল, কিন্তু কি জানি কেন সে আমার প্রতি এত অনুরক্ত ছিল যে এক দণ্ডও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। ফলতঃ আমিও তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতাম। ভগবানের কৃপায় আমার সেই পরম রূপবতী বাল্য সঙ্গিনীকে পত্নিরূপে পাইয়া আমি পরম সুখানুভব করিতে লাগিলাম। আমার সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা পত্নিকে ছাড়িয়া বিদেশে চাকরী করিতে যাইতে মন সরিল না। বাড়ীতে থাকিয়াই আমাদের পৈত্রিক ব্যবসায় চালাইতে লাগিলাম। পাঁচ বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকটি সন্তান সন্ততিও জন্মিল।"

"আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই আমার পিতা পরলোক গমন করেন। এতদিন কোন প্রকারে আমি সংসারাদি চালাইতেছিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ অর্থের নিতান্ত টানাটানি পড়িয়া গেল, তখন আমি পুনরায় চাকরী করিতে বিদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। অল্প দিন মধ্যেই একটি চাকরীও জুটিল, আমি এক সওদাগরের জাহাজে আবার নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সিংহল দেশে যাত্রা করিলাম। অহোঃ কি অশুভক্ষণেই আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম! পথিমধ্যে প্রচণ্ড বায়ুর বেগে আমাদের জাহাজখানি পথভ্রষ্ট হইয়া একটি জলমগ্ন পর্ব্বতে যাইয়া ধাক্কা খাইল ও জাহাজ ভগ্ন হইয়া সমস্ত যাত্রি ও মালসহ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ এই ঘটনা হওয়ায় মাল পত্র বা লোকজন কিছুই রক্ষা হইল না, সমস্তই জলমগ্ন হইল। জাহাজ ভাঙ্গার একটা চড়চড়ানি শব্দ ও পরমুহুর্ত্তেই সমুদ্র মধ্যে পতন ভিন্ন তৎপরবর্ত্তী ঘটনার কথা আর আমি কিছুই জানি না, সম্ভবতঃ পতনকালীন ভীষণ আঘাতে আমার চৈতন্য লোপ হইয়াছিল। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল তাহা জানি না! যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন আমি দেখিলাম যে আমার আত্মা আমার স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ বুঝিলাম যে আমার মৃত্যু হইয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

সংবাদ ও সমালোচনা।

দ্রুত লিখন বাহাদুরী। ইংরাজী ভাষা এক প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা অতি দ্রুত বেগে লিখিতে পারা যায়। ঐ প্রকার লিখন প্রণালীকে "সর্টহ্যাণ্ড রাইটিং" বলে। যাঁহারা এই প্রকার লিখনে বিশেষ পারদর্শী, তাঁহারা এক মিনিটে প্রায় দেড় শত শব্দ লিখিতে পারেন। সংপ্রতি আমেরিকার নিউইয়র্কে এই লিখন প্রণালীর এক প্রতিযোগী পরীক্ষা হইয়াছিল। ২০ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের কর্ম্মচারী মিঃ ন্যাথান বেরিন এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি পাঁচ মিনিটে গড়ে ২৮১টি শব্দ লিখিয়াছিলেন। মোটের উপর তাঁহার ১৭টি ভুল হইয়াছিল (হিতবাদী)

এখানে সাধু শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"দয়ালু সহিষ্ণু সম দ্রোহশূন্যব্রত ।
সত্যসার বিশুদ্ধাত্মা পরহিতে রত ।
কামে অক্ষুভিতবুদ্ধি দান্ত অকিঞ্চন ।
মৃদু শুচি পরিমিতভোজী শান্ত-মন ॥
অনীহ ধৃতিমান স্থির কৃষ্ণৈকশরণ ।
অপ্রমত্ত সুগভীর বিজিত-ষড়্গুণ ॥
অমানী মানদ দক্ষ অবঞ্চক জ্ঞানী ।
এই সব লক্ষণেতে সাধু বলি' জানি ॥"

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।

এই সমস্ত গুণের মধ্যে—

"কৃষ্ণৈকশরণ হয় স্বরূপ লক্ষণ ।
তটস্থ লক্ষণে অন্য গুণের গণন ॥"

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।

পুনশ্চ—

"বর্ণাশ্রমচিহ্ন নানা বেশের রচনা ।
সাধুর লক্ষণে কভু না হয় গণনা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগতি সাধুর লক্ষণ ।
তাঁর মুখে হয় কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন ॥"

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।

শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে বলিতেছেন —

"স্থির হৈঞা গৃহে যাও না হও বাতুল ।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড় লোক দেখাইঞা ।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার ।
অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥"

এরূপ সাধুকে যে নিন্দা করে, তাহার নামে রুচি হয় না, প্রত্যুত বিপদ তাহাকে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত করে। তার পর দ্বিতীয় অপরাধী—

"শিবাদি দেবতাগণ পৃথক ঈশ্বর।
মানিলে নামাপরাধ হয় ভয়ঙ্কর॥"

শ্রীহরিনামচিন্তামণি।

তাহার পর তৃতীয় অপরাধ গুর্ব্ববজ্ঞা—

"দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু দুঁহে কৃষ্ণদাস।
দুঁহে ব্রজ জন কৃষ্ণ-শক্তির প্রকাশ॥
গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণ-প্রেষ্ট নিত্য-প্রভু॥
এই বুদ্ধি সহ সদা কৃষ্ণ-ভক্তি করে।
সেই গুরু-ভক্তি বলে সংসারেতে তরে॥
গুরুতে অবজ্ঞা যার তার অপরাধ।
সেই অপরাধে তার হয় ভক্তি-বাধ॥"

এতদ্ব্যতীত (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দন, (৫) হরিনামে অর্থবাদকল্পনা, (৬) নামের বলে পাপে বুদ্ধি, (৭) নামের সহিত অন্য শুভকার্য্যের সমতা জ্ঞান, (৮) শ্রদ্ধাহীন বিমুখ জনে উপদেশ এবং

"নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণকর্ত্তা বলেন প্রমাদ (৯)॥
নামের মাহাত্ম্য জানে তবু নাহি ভজে।
অহং-মম-আসক্তিতে সংসারেতে মজে (১০)॥"

শ্রীহরিনামচিন্তামণি।

বস্তুতঃ উল্লিখিত দোষযুক্ত ব্যক্তি কোন দিনই সাধনের অধিকারী হইতে পারেন না; এজন্য এই অপরাধগুলি বর্জনে সতত যত্নবান হইবে। এই নাম-অপরাধ সমূহ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় অহরহ নাম করা। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাধিকারীর লক্ষণ বলিতেছেন -

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥"

তৃণাদপি সুনীচেন অমানিনা তরোরিব সহিষ্ণুনা মানদেন হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়। ৩।

শ্রীহরির নাম করিতে কীর্ত্তন
মনেতে বাসনা যা'র,
তৃণের চেয়েও সুনীচ হইয়া
থাকাই সুযুক্তি তা'র।
মিথ্যা-অভিমান করি' পরিহার
ধুলায় মিশিয়ে যাও।
ক্ষুদ্র তৃণ যথা জীব পদতলে
তেমনি সদা লুটাও।

ছেদনকারীরে ছায়া দান করি'
তরু যথা তুষ্ট করে
তুমিও তেমনি নিজ শত্রু জনে
মান দাও, তুষ্টি তরে।
এরূপে তোমার মলিনতা যাবে
প্রশান্ত হইবে প্রাণ,
পাইবে আনন্দ ঘুচে যাবে দ্বন্দ্ব
করি হরি-নাম-গান। ৩।

নিরপরাধে নিরন্তর নাম করিতে করিতে, জীবের সৌভাগ্য উদয় হইতে থাকে, তখন তাঁহাতে বিষয়বিরক্তিজনিত দৈন্য, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, নির্ম্মৎসরতা, সর্ব্বত্র দয়া, ও যথাযোগ্য সম্মাননা এই সমস্ত সুলক্ষণের উদয় হয়।

"জীবগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যদাস, নিরন্তর তাঁহার তুষ্টির জন্যই কার্য্য করা তাহার নিত্য কর্ত্তব্য।" নিত্য নিরপরাধে নাম করিতে করিতে তাঁহার যখন এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয়; তখন তিনি সেই চিদ্রস ব্যতীত অন্য রসে সহজেই বিরক্ত হন। তখন ভাবেন—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিছুরি' মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
হে মাধব, হম পরিণাম-নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা ॥

তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন, সেই জগত্তারণ দীনবন্ধুর চরণাশ্রয় ব্যতীত, তাঁহার আর অন্য উপায় নাই। অথচ বুঝিতে পারেন, যে, যাঁহার চরণে প্রাণমন সমর্পণ করা তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য, দুর্ব্বার মনকে ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার দিকে লইয়া যাওয়া অতি অসাধ্য ব্যাপার। মন বিষয় বিষই চায়, অমৃত চায় না। তখন ভক্তগণের অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া তাঁহার মনে হয়, বুঝি এ জগতে আর তাঁহার মত হীন কেহ নাই। মনে হয়, হায়! আমি ভক্তগণের স্পর্শযোগ্যও নই, যদি ঐ তৃণমূলস্থ ধূলার সঙ্গে মিশিতে পারি, তবে তাঁহাদের চরণধূলির স্পর্শে, বোধ হয় কোন দিন মনের এ মলা কাটিলেও কাটিতে পারে। আপাততঃ আর কি করি, সেই প্রাণকৃষ্ণের দেওয়া বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেই হইবে। তাঁহার দেওয়া এ সবই—এ সকল আমার ছাড়িবার অধিকার কৈ? এ সংসারের শোক, সুখ, দুঃখ, যা কিছু সবই তাঁহার দেওয়া, এ সবই আমায় স্বীকার করিতে হইবে। আমায় যা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দোষ কিছুই নাই, জন্মজন্মান্তরে যেমন করিয়াছি, তেমনই পাইয়াছি, এখন তাঁহার নাম আর তাঁহার ভক্তের চরণসেবা বই আমার আর গত্যন্তর নাই। যখন মনের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন আর পরকৃত অপকারের প্রতিহিংসা-বাসনা থাকে না। তরু যেমন ছেদনকর্ত্তাকেও ছায়া দানে শীতল করে, তিনিও তেমনি শত্রুকৃত অপকারাদি তাঁহার নিজ কর্ম্মফলে সেই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইতেছে জানিয়া, সেই শত্রুকেও শ্রীকৃষ্ণের জানিয়া, তাহার সেবাই কর্ত্তব্য মনে করেন—তাহাকে উপযুক্ত সম্মাননাই অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন আর নিজে নিরন্তর ভাবেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অহরহঃ ভাবেন—

"আধ জনম হম নিঁদে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা॥"

আবার কখনও বলেন—

"হে মাধব, বহুত মিনতি তোহে।

হম দেই তুলসি-তিল দেহ সমর্পিনু

দয়া জানি ছোড়বি মোহে॥

গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি

যব তুহুঁ করবি বিচার।

তুহু জগন্নাথ জগমে কহায়সি

জগ বাহির নহি মুই ছার॥"

কখন বলেন—

"কিয়ে মানুখ পশু পাখি যে জনমিয়ে

অথবা কীট পতঙ্গে।

করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন

মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে।"

কখন বা করজোড়ে সেই শ্যামসুন্দরের সুন্দর মুখচন্দ্র দেখিতে দেখিতে বলেন—

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।

তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

কখন বা বহির্ম্মুখ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিতে থাকে, আর তিনি ভাবিতে থাকেন "হায়, নাথ, কবে জগতের সকল জীব তোমার নামামৃত পানে তৃপ্ত হইবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জীবের যে ভাব হয়, তাহা শ্রীগৌরচন্দ্রের বদনপঙ্কজ হইতে তৎপরস্থিত শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত হইতেছে—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪॥"

হে জগদীশ, ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং (ন) বা কবিতাং অহং কাময়ে (কিন্তু) ঈশ্বরে ত্বয়ি জন্মনি জন্মনি মম অহৈতুকী ভক্তি ভবতাদিতি (কাময়ে)। ৪।

বর্ণাশ্রমে থাকি' কাম্যকর্ম্ম করি'
যেই পুণ্য-ধন হয়,
কিম্বা সে সংসারে করিলে যতন
লভি' অর্থ-ধন চয়,
ইন্দ্রিয়-তর্পক কাম-ধন যত
লভয়ে সংসারিজন
সারূপ্যাদি যত মোক্ষ-ধন আছে
নাহি চায় মোর মন।

দারা, সুত আর, মিত্র, দাস, দাসী,
কিছুরই প্রয়াসী নই,
তব গুণ-গাথা বিনা কাব্য-কথা
শুনে তৃপ্ত নাহি হই।
তাই বলি, নাথ, জন্মে জন্মে যেন
অহৈতুকী ভক্তি হয়,
তোমার চরণে মন ভৃঙ্গ সম
সদা যেন লগ্ন রয়। ৪।

এইরূপে জীবে দাস্যভাব ক্রমে জাগিতে থাকে। তখন সে অহর্নিশি বলে—

"অয়ি নন্দ-তনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥" ৫ ॥

অয়ি নন্দতনুজ, বিষমে ভবাম্বুধৌ পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়। ৫।

হে নন্দ তনুজ আমি
বিষম ভবাব্ধি মাঝে
পড়ে সদা হাবুডুবু খাই;
তব কৃপা বিনে নাথ
না দেখি উপায় আর
কাতরেতে ডাকিতেছি তাই।

ও পঙ্কজ-পদতলে
ধূলির সমান মোরে
কৃপা ক'রে লও মাখাইয়া,
তা'হ'লে ঘুচিবে মোর
এ ভব-যাতনা ঘোর
রব নাথ চরণে মিশিয়া। ৫।

আমাদের পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ, জীবকে কিরূপে ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা দেখাইতেছেন। এই শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক দ্বারা নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন বুঝাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ যে শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন কলির জীবের এক মাত্র সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সেই "নাম সংকীর্ত্তনে কি হয়?" তাহা জীবকে বুঝাইলেন,—তার পর সেই "নাম-সঙ্কীর্ত্তনে রুচির প্রয়োজন" এক কথা বুঝাইবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় শ্লোক। সেই রুচির উদয়েই জীব প্রকৃত অধিকারী হন। তাঁহার অবস্থা তৃতীয় শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। এই অধিকারী, নাম করিতে করিতে ক্রমেই

সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃই বাহির হয়—"ন ধনং ন জনং" ইত্যাদি—নাথ, আমি ধন জন চাই না। তুমিই আমার ধন জন, সহায়, সম্পদ—সংসারের কোন জড় সুখ আর চাই না—এ সুখ আস্বাদন করে যে ইন্দ্রিয়গ্রাম—তাহাদিগকে এখন তোমার মাধুরী অনুভব করাও—আমার প্রাণে ভক্তি দাও—" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এই সময়েই সাধকের, ভগবানকে সেবা করিবার লালসা হয়, তখন তিনি আপনাকে নিতান্ত অসহায় বোধ করিয়া "অয়ি নন্দতনুজাদি" বাক্যের ন্যায় কাতর বাক্যে তাঁহার পদপ্রান্তে নিজের মনোভিলাস প্রকাশ করিতে থাকেন। এখন তিনি দাস্যাভিলাষী। একটু স্থিরভাবে চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই দাস্যভাবের কথা দূরে থাকুক, শান্তভাবের অধিকারীও নিতান্ত সুলভ নহেন। কেবল নিষ্ঠাময় অবস্থাপন্ন সাধকই শান্ত সাধক। শ্রীবৈষ্ণবগণ তাঁহাকেই **প্রবর্ত্ত-সাধক** বলেন। উপাস্য পদার্থে সুনিশ্চিত সুদৃঢ় সবিশেষ বুদ্ধিকে **শম** বলা যায়। এই অবস্থা যে সাধকের হৃদয়ে দৃঢ় হইয়াছে—তিনিই **শান্ত-সাধক**। তাহার ভাবের নাম **শান্ত-রতি**। ইহাই রস-সাধনের প্রথমাবস্থা। তখন তাঁহাদের প্রাণের ভাব যেরূপ হয় তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশিত আছে—

"কদা শৈলদ্রোণ্যাং পৃথুলবিটপীক্রোড়বসতি
বসানঃ কৌপীনং রচিতফলকন্দাশনরুচিঃ।
হৃদি ধ্যায়ং ধ্যায়ং মুহুরিহ মুকুন্দাভিধমহঃ
চিদানন্দং জ্যোতিঃ ক্ষণমিব নেষ্যামি রজনী॥"

"কবে শৈল-দ্রোণী মাঝে নিবিড় কাননে
জন-সঙ্গ পরিহরি যাপিব জীবন?
সম্বল কৌপীন-মাত্র হইবে আমার
কন্দ মূল ফল জলে দেহের রক্ষণ।
চিদানন্দ-জ্যোতির্ম্ময় মুকুন্দে হৃদয়ে—
নিরন্তর ধ্যান করি', কেটে যা'বে কাল,
বিভাবরী ক্ষণ সম কেটে যা'বে হায়
অন্তর মাঝারে মোর না রবে জঞ্জাল॥"

এই শান্তভাবের সাধকগণের চিহ্ন এইরূপ ঃ—

"নাসাগ্রন্যস্তনেত্রত্বমবধূতবিচেষ্টিতম্‌।
যুগমাত্রেক্ষিতগতি জ্ঞানমুদ্রাপ্রদর্শনম্‌॥
হরেদ্বেষ্যেঽপি ন দ্বেষো নাতিভক্তি প্রিয়েষপি।
সিদ্ধতায়াস্তথা জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা॥
নৈরপেক্ষং নির্ম্মমতা নিরহঙ্কারিতা তথা।
মৌনমিত্যাদ্যয়ঃ শীতাঃ স্যুরসাধারণ ক্রিয়া॥

নাসাগ্রে * সতত ন্যস্ত দৃষ্টিরেখা,
অবধূত ভাব সব,
চারি হাত দূর করি দরশন
গমন সদা নীরব।

জ্ঞানমুদ্রা + সদা দক্ষিণ করেতে,
মন শান্ত অতিশয়,
হরিদ্বেষীজনে নাহি দ্বেষভাব
ভক্তে মান্য অতি নয়।

সিদ্ধভাবে আর জীবন্মুক্তভাবে
অত্যন্ত আদর তাঁর,
নৈরপেক্ষ আর নির্ম্মমতা তাঁ'র
সদা হৃদয়ের হার।

অহংকারশূন্য তথা সদা মৌন
এই ভাব সমুদয়
শান্ত সাধকের অঙ্গী ভাব বলি'
জানিবে সদা নিশ্চয়।"

* নাসাগ্রে শব্দে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ বুঝিতে হইবে + অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সংযোগরূপ মুদ্রা।

শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থ-রত্নাবলী—প্রথম মালিকা।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রবদনারবিন্দবিগলিতং

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্।

কেনচিদকিঞ্চনেনানূদিতং ব্যাখ্যাতঞ্চ।

ইন্টালি মিডিল রোড চতুর্বিংশতি সংখ্যকভবনস্থিত-

ইণ্ডিয়া প্রেসাখ্য

মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রনাথ বসুনা মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ।

এই রসে, মমতার অভাব থাকায়, ইহা শ্রীবৈষ্ণবের প্রার্থনীয় নহে। এই শান্ত রসিকের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ সত্য-সার শম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কার্য্যদক্ষ মৌনী ॥
অসৎসঙ্গত্যাগী এই বৈষ্ণব আচার
স্ত্রীসঙ্গী * এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"

সঙ্গে সঙ্গে অসাধু বর্জ্জনের জন্য অসাধুর লক্ষণ লিখিলেন। শান্ত-সাধকের হর্ষরোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, কিন্তু চরম সাত্ত্বিক ভাবের + বিকাশ হয় না।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গস্ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্তমাসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥"
"সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।"
"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥"

ইহা দ্বারা গৃহী শ্রীবৈষ্ণবের শাস্ত্রানুগত পত্নি-সহবাস নিষিদ্ধ হয় নাই, কেবল ব্যভিচারই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যভিচার শব্দটি বিশেষ ভাবে ধারণা করা কর্ত্তব্য। বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর সহিতও ব্যভিচার অসম্ভব নয়।

\+ "তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥"

শিক্ষার যেমন ক্রমোন্নতি আছে। সাধনেরও তেমনি ক্রমোন্নতি আছে। সেই মুকুন্দ-(মুক্তিদাতা)-চরণে মন একান্ত ন্যস্ত হইলে, ক্রমেই সাধকের গোবিন্দাদি স্বরূপও উপলব্ধি হয়, এবং কালে মমতার উদয় হয়। ক্রমে ক্রমে প্রপন্ন ভাব আসিয়া হৃদয়টি অধিকার করে। তখন ধীরে সাধ্য-পদার্থে সম্ভ্রমের উদয় হইতে থাকে, এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেবাভিলাষেরও উদয় হয়। তখন, "অয়ি নন্দতনুজ, কিঙ্করং মাং" বলিয়া কাঁদিয়া সেই শ্রীনন্দনন্দনের চরণ-তলে লুটাইতে বাসনা হয়। বিবিধ সেবায় তাঁহাকে সুখী করিতে বাসনা জন্মিতে থাকে, কিন্তু তিনি বড়—আমি ছোট এ জ্ঞানটাও সঙ্গে সঙ্গে থাকে এই সম্ভ্রমময় প্রীতির ভাবকেই **দাস্য-রতি** বলে। তখন নাম ও নামীতে লৌল্যাদির উদয় হয়।—নামগ্রহণে ও নামশ্রবণে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতে থাকে, অথচ মনে হয়, কৈ আমার প্রাণ গলিল কৈ ? তখন সাধকের প্রাণের ভাব কিরূপ হয়। তাহাই আমাদের প্রাণের গোরাচাঁদের ষষ্ঠশ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

"কদা তব-নাম-গ্রহণে গলদশ্রু ধারয়া নয়নং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা বদনং তথা বপুঃ পুলকৈঃ নিচিতং ভবিষ্যতি। ৬।

কবে তব নাম করিতে গ্রহণ
নয়নে ঝরিবে বারি অনিবার ?
রুদ্ধ কণ্ঠে হ'বে বলিতে ও নাম
গদ্গদ ভাষ আসিবে না আর

অহো নাথ, কবে শুনিয়েও নাম
এ পাষাণ দেহ পুলকে পুরিবে
হায় ভাগ্যে মম এমন সুদিন
দীনসখা, বল কভু কি আসিবে ? ৬।

তখন সাধক নিরন্তর প্রাণে প্রাণে জানাইতে থাকেন--"কৈ নাথ! কত জিনিসের জন্যে ত কত সময় কত কাঁদি ; কিন্তু তোমায় পা'বার জন্য কাঁদি কৈ ? পার্থিব জড় সুখে ত কত আনন্দ অনুভব করি, কিন্তু ও নাম-সুধা-সেবনের সুখে সুখী হইতে পারিলাম কৈ ?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন মনে লালসা

আসিতে থাকে, তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্বাস প্রাণে আসে—সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মমতার অত্যাধিক্য ঘটে, তখন প্রাণ বুঝে—"তিনি আমার। আমায় নিদয় হ'তে পারেন না।" এইরূপ বিশ্বাসের ভাব হইতেই ক্রমে সঙ্কোচ ভাবের অভাব ঘটিতে থাকে। নিরন্তর বেণুরব শ্রবণে বাসনা হয়—সেই নবীননীরদ-নিন্দিত সুনীলকান্তি দর্শনের জন্য সদা মন ব্যাকুল হয়। প্রভাত হইয়াছে, ব্রজের বালকগণ নিদ্রাভঙ্গে মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া, চূড়াধড়া পরিয়া শিঙ্গা বেণু বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নন্দনন্দনকে আনিবার জন্য নন্দভবন পানে ধাইয়াছেন—সখ্য রসের সাধকও সেই সখাগণের কাহাকেও আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎগামী—কেন?—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন—না দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়! কিন্তু এখনও শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আসেন নাই।—সখাগণের মনে রাগ হইতেছে—আমরা মা বাপ ফেলে এলাম—সে এখনও মায়ের কোলে বসে রইল?—অমনি একজন বলিল—

"গোপাল, তুই যাবি কি না যাবি আজ মাঠে
এক বোল বলিলে আমরা চলিয়ে যাই
শ্যামলী ধবলী গেল গোঠে॥"

তোর এত বিলম্ব কেন? আজ কি যাবি না?—যদি গোষ্ঠে না যাস্ তাও খুলে বল—আমরা আর দাঁড়া'তে পারি না।

কেহ বা বলিতেছে—

"হারে রে কানাই সকলেই মোরা
আহিরী-গোপ-ছাওয়াল।
তুই ত নহিস্ ঠাকুরের পুত
তব কাহে ঠাকুরাল।"

যদি বল, "তবে এত পথ এলে কেন?—বাড়ী থেকেই ত একা একা গরুবাছুর লইয়া গোষ্ঠে যাইতে পারিতে?"—তা পারি না। পারি না বলিয়াই আসি—

"যদি বা এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই,—
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কি বা গুণ-জ্ঞান জান সদাই অন্তরে টান
এক তিল না দেখিলে মরি॥"

বলচি বটে, যদি না যা'স্, ত বল, আমরা যাই—কিন্তু কৈ পা যে ওঠে না ভাই—মন যে শোনে না ভাই—আঁখি যে ঐ মদনমোহন রূপ না দেখলে থাকতে পারে না ভাই? তুই যে এই ব্রজবালকগণের জীবন। ব্রজের সর্ব্বত্রেই এই ভাব—রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া গোষ্ঠে যাইতে পারেন না। আবার মাতা যশোমতীও তাঁর প্রাণের নীলমণিকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। রাণীতে সে সেবা যত্ন, সে নিষ্ঠার, সে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে "আমার গোপাল" বলিয়া মমতার মাত্রাটুকু কিছু বেশী—তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে জগত অন্ধকার দেখেন—আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়—গোপাল বনে গেলে, না জানি তা'র কত কষ্ট হ'বে, ক্ষুধার সময় কে খেতে দিবে?—এই বাৎসল্য। —আর শ্রীমতী আর তাঁর সঙ্গিণীগণ—তাঁদের কথা বলে, এ অকিঞ্চনের এমন সামর্থ্য নাই—কিন্তু সবারি—

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥" ৭॥

গোবিন্দবিরহেন মে নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষ প্রাবৃষায়িতং সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং (প্রতিভাতি)। ৭।

গোবিন্দ বিরহে প্রাণ নাহি রহে
নিমেষ যুগের প্রায়—
বরিষার ধারা ঝরি'ছে নয়নে
অন্ধকার হেরি তায়।

জগৎ সংসার সবি শূন্যাকার
না জানি কোথায় যাই—
কে বলিবে হায় কোথা গেলে তায়
তিলেক দেখিতে পাই? ৭।

হায়! হায়! কালো ভালবেসে আমার এ কি হ'ল? হায়—

"সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিহি ভেল নিদারুণ তাহে পুন ঐছন
অব কঁহা রহল মুরারী॥"

আমার হৃদয় মন প্রাণ সব হরণ করিয়া এখন সে কোথায় আছে? দেখ সখি, দেখ প্রভাতের ত আর বিলম্ব নাই, আজ বুঝি সে আর এলো না? এমন সময় বৃক্ষ হইতে শিশির বিন্দু শুষ্ক পত্রে পতিত হইল। মনে হইল, ঐ

ঐ বুঝি সেই কেলেসোনা আসিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে সে ভ্রম গেল। তখন নিশ্চয় বোধ হইল শ্যাম আজ আর আসিলেন না—তবে কি হবে?

"ফুলেরি এ মালা ফুলেরি এ ডালা
শেজ বিছায়নু ফুলে।
সব হ'লো বাসী আর কেন সখি
ভাসাগে যমুনার জলে।
কুঙ্কুম কস্তুরী চুবক চন্দন
বাজিছে' গরল সম,
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণি
দংশিছে মরমে মম।
এ সব লইয়ে যমুনায় ডার
আর ত না যায় দেখা,
ললাটের সিন্দুর মুছে কর দূর
নয়নের কাজর-রেখা।

দেখ যা'র জন্য এ সব সজ্জা, সে যদি না এলো তবে এ সব রেখে আর কি হ'বে? কেহ হয় ত বলিলেন "যে এমন নিষ্ঠুর তাহার মুখ আর দেখো না।" শ্যাম-সোহাগিনীর কি সে কথা সহ্য হয়? তিনি সেই দারুণ দুঃখের সময়েও স্মিতস্বরে বলিলেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্‌
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥" ৮॥

পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য পিনষ্টু বা, অদর্শনাৎ বা মর্ম্মহতাং করোতু, লম্পটো যথা তথা বা বিদধাতু স তু মৎপ্রাণনাথ এব ন অপরঃ। ৮।

পদতলে তার সদা আছি আমি
যেবা তার ইচ্ছা হয়
আদরে হৃদয়ে ধরে বা আমারে
দলে পদে নিরদয়।
কিম্বা অদর্শনে বাড়ায় যাতনা
মর্ম্মহতা ক'রে মোরে
যাহে সুখী হয় করে যেন তাই,
ভুলিব না মনোচোরে।
সে লম্পট শঠ, তাহে ক্ষতি কিবা ?
মোর সুখ তরে নয়—

তারি সুখ তরে জীবন যৌবন
দিছি আমি সমুদয়।
ত্যজি' কুললাজ গৃহ-ধর্ম্ম-কাজ
বিকায়েছি রাঙ্গা পায়,
গুরুগঞ্জনার নাহি ধারি ধার
করুক যা মনে ভায়।
সে ত প্রাণনাথ নিশ্চয় আমার
কভু নয় অন্য পর।
তারি সুখে সুখ দুঃখে তার দুখ
সতত ভাবে অন্তর। ৮।

আহা! কবে জীব এমনি করিয়া সেই প্রাণবল্লভের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে শিখিবে ?

শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই অষ্ট শ্লোকে এই রূপে জীবকে চরম সাধন পর্য্যন্ত শিখাইয়াছেন। এ অকিঞ্চন সে রহস্য ব্যাখ্যা করিবার সম্পূর্ণ অনধিকারী। সাধু শ্রীবৈষ্ণবের কৃপায় যাহা পাইয়াছে তাহার কিয়দংশ জড়ভাষার সাহায্যে জড় লেখনীতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিল। সেই অবাঙ্মনসগোচর পরম তত্ত্বের চরম রহস্য ব্যাখ্যা করিবার শক্তি বা ভাষা তাহার নাই। অতএব এই চরম-শ্লোকদ্বয়ের রহস্য পাঠক শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সাধনসম্পদে সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর অন্তরে উপভোগ করুন।

ইতি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র-প্রেমাম্বুধি-মথনোদ্ভূত শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকাখ্যং রত্নাষ্টকম্।

॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

———

পুনর্নৈবং বিভিন্নার্থং বক্তব্যং দ্বিজসত্তমৌ ।
মৎপ্রসাদপরৌ প্রীত্যা শাপিতৌ হৃদয়েন মে ॥ ৮৪ ॥
ততঃ স্নেহার্দ্রবদনৌ তাবুভৌ নাগনন্দনৌ ।
ঊচতুর্নৃপতেঃ পুত্রং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপিতৌ ॥ ৮৫ ॥
ঋতধ্বজ ন সন্দেহো যথৈবাহ ভবানিদম্ ।
তথৈব চাস্মন্মনসি নাত্র চিন্ত্যমতোঽন্যথা ॥ ৮৬ ॥
কিন্ত্বাবয়োঃ স্বয়ং পিত্রা প্রোক্তমেতন্মহাত্মনা ।
দ্রষ্টুং কুবলয়াশ্বং তমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৭ ॥
ততঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ সমুত্থায় বরাসনাৎ ।
যথাহ তাতেতি বদন্ প্রণামমকরোদ্ভুবি ॥ ৮৮ ॥

কুবলয়াশ্ব উবাচ ।

ধন্যোঽহমতিপুণ্যোঽহং কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যত্তাতো মামভিদ্রষ্টুং করোতি প্রবণং মনঃ ॥ ৮৯ ॥
তদুত্তিষ্ঠত গচ্ছামস্তাতাজ্ঞাং ক্ষণমপ্যহম্ ।
নাতিক্রান্তুমিহেচ্ছামি পদ্ভ্যাং তস্য শপাম্যলম্ ॥ ৯০ ॥

পুনর্ব্বার যদি শুনি হেন কথা
বড় ব্যথা পা'ব প্রাণে ।
কহি সত্য করি' দোঁহে হৃদে ধরি'
আছি সদা ফুল্ল প্রাণে।" ৮৪ ।
শুনি তাঁ'র কথা স্নেহার্দ্র বচনে
প্রণয়কুপিত স্বরে—
নাগপুত্র দোঁহে রাজপুত্রে কহে
"জানি তা দোঁহে অন্তরে । ৮৫ ।
শুন ঋতধ্বজ, এ বাক্যে তোমার
সন্দেহ না করি মোরা,
তোমারো যেমন মোদেরো তেমন
প্রাণ মন প্রীতি-ভোরা । ৮৬ ।
কিন্তু এক কথা আমাদের পিতা
বলিলেন করে ধরি'
ঋতধ্বজে মোর দেখিতে বাসনা
এনো তাঁরে যত্ন করি' ।
পুনঃপুনঃ তিনি বলিলা এ কথা
এই সে কারণে আজ,
বলিনু এমন নাহি অন্য মন
বুঝি' কর যেবা কাজ ।" ৮৭ ।
শুনি' সে বচন, তবে ঋতধ্বজ
বরাসন পরিহরি'
"আদেশ পিতার অবশ্য পালিব ;"
বলে ভূমে নতি করি' । ৮৮ ।
বলিলা কুবলয়াশ্ব—"ধন্য আমি আজ
পুণ্যবান মম সম কেবা বিশ্বমাঝ ?
তাত মোরে দেখিবারে করিলা মনন,
এত দিনে ধন্য বলি' মানিনু জীবন । ৮৯ ।
উঠ ভাই, চল যাই পিতৃদরশনে,
ক্ষণেক বিলম্ব নহে উচিত এক্ষণে ।
তাঁ'র আজ্ঞা উপেক্ষা ক্ষণেক যোগ্য নয়
অঙ্গীকার পদে তাঁর লুটা'ব নিশ্চয় ।" ৯০ ।

দ্বিজপুত্র উবাচ ।

এবমুক্ত্বা যযৌ সোঽথ সহ তাভ্যাং নৃপাত্মজঃ ।
প্রাপ্তশ্চ গোমতীং পুণ্যাং নির্গম্য নগরাদ্বহিঃ ॥ ৯১ ॥
তন্মধ্যেন যযুস্তে চ নাগেন্দ্রনৃপনন্দনাঃ ।
মেনে চ রাজপুত্রোঽসৌ পারে তস্যাস্তয়োর্গৃহম্ ॥ ৯২ ॥
ততশ্চাকৃষ্য পাতালং তাভ্যাং নীতো নৃপাত্মজঃ ।
পাতালে দদৃশে চোভৌ স পন্নগ-কুমারকৌ ।
ফণামণিকৃতদ্যোতৌ ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৌ ॥ ৯৩ ॥
বিলোক্য তৌ সুরূপাঙ্গৌ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ।
বিহস্য চাব্রবীৎ প্রেম্ণা সাধু ভো দ্বিজসত্তমৌ ॥ ৯৪ ॥
কথয়ামাসতুস্তৌ চ পিতরং পন্নগেশ্বরম্ ।
শান্তমশ্বতরং নাগং মাননীয়ং দিবৌকসাম্ ॥ ৯৫ ॥
রমণীয়ং ততোঽপশ্যৎ পাতালং স নৃপাত্মজঃ ।
কুমারৈস্তরুণৈর্বৃদ্ধৈরুরগৈরুপশোভিতম্ ॥ ৯৬ ॥

দ্বিজপুত্র বলে "পিতা, করহ শ্রবণ,—
এত বলি, যায় চলি রাজার নন্দন,
দুই ভাই পিছে তাঁ'র দ্রুত গতি ধায়,
নগর ত্যজিয়া সবে নদী-তীর পায় ।
পুণ্যবতী গোমতী নদীর তীরে সবে,
ফুল্ল-মনে উপনীত হইলেন তবে । ৯১ ।

নদিজলে কুতূহলে নামে তিন জনে,
জলপথে চলে সবে আনন্দিত মনে;
ভাবে নৃপাত্মজ বুঝি এ নদীর পারে,
সন্তরণে চলিয়াছি সখার আগারে ? ৯২ ।

কিছুদূরে গিয়ে, দোঁহে করি' আকর্ষণ,
কুমারে লইয়া গেল পাতাল-ভবন ।
আসিয়া পাতালে হেরে রাজার কুমার
দুই সখা এবে তাঁ'র পন্নগ-আকার ।
ফণার মণিতে দিক্ হ'য়েছে উজ্জ্বল,
সে আলোকে নাগ-দেহ করে ঝলমল ।
স্বস্তিক লক্ষণ ব্যক্ত হ'য়েছে এখন,
এত দিনে হৈল তাঁ'র ভ্রমের ভঞ্জন । ৯৩ ।

তাঁ'দের সুরূপ দেহ করি' দরশন,
বিস্ময়ে উৎফুল্ল-নেত্র রাজার নন্দন,
মৃদু হাসি' কাছে আসি' বলিলা দোঁহায়,
"সাধু সখা, বিপ্র-বেশে ভুলালে আমায় ! ৯৪ ।

তবে দোঁহে বলে,—"শুন রাজার কুমার,
পন্নগ-ঈশ্বর পিতা আমা দোহাকার ।
দেবপূজ্য শান্তচিত্ত নাগ অশ্বতর,
চল এবে ল'য়ে যাব তাঁহার গোচর ।" ৯৫ ।

রাজার নন্দন করে দরশন
পাতাল-ভুবন রম্য অতিশয়,
শিশু, যুবা আর বৃদ্ধ দেহ-ভার
কাতারে কাতার শোভে নাগচয় । ৯৬ ।

তত্রৈব নাগকন্যাভিঃ ক্রীড়ন্তীভিরিতস্ততঃ।
চারু-কুণ্ডল-হারাভিস্তারাভির্গগনং যথা ॥ ৯৭ ॥
গীতশব্দৈস্তথান্যত্র বীণাবেণুস্বনানুগৈঃ।
মৃদঙ্গপণবাতোদ্যং হারিবেশ্মশতাকুলম্ ॥ ৯৮ ॥
বীক্ষমাণঃ স পাতালং যযৌ শত্রুজিতঃ সুতঃ।
সহ তাভ্যামভীষ্টাভ্যাং পন্নগাভ্যামরিন্দমঃ ॥ ৯৯
ততঃ প্রবিশ্য তে সর্ব্বে নাগরাজনিবেশনম্।
দদৃশুস্তে মহাত্মানমুরগাধিপতিং স্থিতম্ ॥ ১০০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং মণিকুণ্ডলভূষণম্।
স্বচ্ছমুক্তাফললতাহারিহারোপশোভিতম্ ॥ ১০১ ।
কেয়ূরিণং মহাভাগমাসনে সর্ব্বকাঞ্চনে।
মণিবিদ্রুমবৈদূর্য্যজালান্তরিতরূপকে ॥ ১০২ ॥

নাগকন্যাগণ প্রফুল্লিত-মন
করে বিচরণ ক্রীড়া-পরা হ'য়ে,
সুচারু কুণ্ডল করে ঝল মল
ফিরে অবিরল নিজদল লয়ে,
সুচিকণ হার গলে সবাকার
যেন তারা-হার আকাশের গায়,
সে শোভা তুলনা মিলে না মিলে না
বচনে বর্ণনা শোভা নাহি পায়। ৯৭।

কোথা গীতধ্বনি অবিরল শুনি
বীণাবেণু-বাণী উঠি'ছে অদূরে।
মৃদঙ্গ-পণব আতোদ্যের রব
পূরি' দিক সব ধ্বনি'ছে স্ব-স্বরে।
গৃহমনোহর প্রশস্ত চত্বর
শোভে পরেপর স্নিগ্ধ দরশন,
কত শত হেন জ্যোৎস্না ধৌত যেন
সুশুভ্র বরণ কে করে গণন। ৯৮।

দেখিতে দেখিতে সে পাতাল-তলে
নৃপসুত সুখে করেন গমন;
দুই সখা সঙ্গে চলে, নানা রঙ্গে
অন্তর তাঁহার বিস্ময়ে মগন। ৯৯।
পরে তিন জনে প্রফুল্লিত মনে
নাগরাজ-পুরে করিলা প্রবেশ,
নাগরাজে সবে করেন দর্শন
আছেন বসিয়া উজলিয়া দেশ। ১০০।

দিব্যমাল্যাম্বর শোভিতেছে অঙ্গে
সু-মণিকুণ্ডল কর্ণে শোভা পায়
নানা আভরণে সুশোভিত অঙ্গ
স্বচ্ছ-মুক্তা-হার শোভিতেছে তায়। ১০১।
কেয়ূর যুগল করে নিরমল
কাঞ্চন-আসনে আছেন বসিয়া,
বিদ্রুম বৈদূর্য্য মণি অগণন
সে আসন অঙ্গ আছে আবরিয়া। ১০২।

স তাভ্যাং দর্শিতস্তস্য তাতোঽস্মাকমসাবিতি ।
বীরঃ কুবলয়াশ্বোঽয়ং পিত্রে চাসৌ নিবেদিতঃ ॥ ১০৩ ॥
ততো ননাম চরণৌ নাগেন্দ্রস্য ঋতধ্বজঃ ।
তমুত্থাপ্য বলাদ্গাঢ়ং নাগেন্দ্রঃ পরিষস্বজে ॥ ১০৪ ॥
মূর্দ্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় চিরং জীবেত্যুবাচ সঃ ।
নিহতামিত্রবর্গশ্চ পিত্রোঃ শুশ্রূষণং কুরু ॥ ১০৫ ॥
বৎস ধন্যস্য কথ্যন্তে পরোক্ষস্যাপি তে গুণাঃ ।
ভবতো মম পুত্রাভ্যামসামান্যা নিবেদিতাঃ ॥ ১০৬ ॥
ত্বমেবানেন বর্দ্ধেথা মনোবাক্কায়চেষ্টিতৈঃ ।
জীবিতং গুণিনঃ শ্লাঘ্যং জীবন্নেব মৃতোঽগুণঃ ॥ ১০৭ ॥
গুণবান্ নির্বৃতিং পিত্রোঃ শত্রুণাং হৃদয়জ্বরম্ ।
করোত্যাত্মহিতং কুর্ব্বন্ বিশ্বাসঞ্চ মহাজনে ॥ ১০৮ ॥

নাগপুত্র দোঁহে হ'য়ে অগ্রসর
বলে "সখা এই পিতা মো সবার,
পিতৃ পানে চাহি বলে পিতা এই
এই সেই বীর রাজার কুমার,
কুবলয়-অশ্ব নাম যে ইঁহার,
ইঁহার তুলনা খুঁজিয়া না পাই,
এই সে কারণে মোরা দুই জনে
সখাভাবে পাশে আছি গো সদাই ।১০৩
ঋতধ্বজ শুনি' পরিচয় তাঁ'র
লুটায়ে পড়িলা পদতলে তাঁ'র ।
সসব্যস্তে উঠি' ধীর অশ্বতর
তুলি' নিলা বীরে হৃদে আপনার ।১০৪।
মস্তক আঘ্রাণ করি পরে তাঁ'র
বলিলেন বৎস, চিরজীবী হও,
থাক সদা সুখে শত্রু হৌক ক্ষয়,
পিতৃপদ সেবি' ফুল্ল মনে রও । ১০৫ ।

পুত্রদের মুখে শুনি নিরন্তর
অসমক্ষে তব গুণের কাহিনী
অসামান্য তুমি জেনেছিনু মনে
যদিও স্বচক্ষে কখন দেখিনি । ১০৬ ।
পুণ্য-ফলে, বৎস, বৃদ্ধি হ'বে তব,
মনোবাক্য-কায়-চেষ্টা সমুদয়;
গুণবান জন সুশ্লাঘ্য জীবন
গুণহীন মৃত নাহিক সংশয় । ১০৭ ।
গুণবান, সদা জনক জননী
আর নিজজন-প্রাণ সুখী করে,
শত্রুর হৃদয়ে দেয় সদা তাপ
নিজ হিত করি' এ সংসারে তরে ।
মহাজনগণ সতত তাঁহারে
বিশ্বাসের চক্ষে করেন দর্শন,
হেন গুণবান যে-জন ধরায়
ধন্য তাঁর ভবে জীবন-ধারণ । ১০৮ ।

দেবতাঃ পিতরো বিপ্রা মিত্রার্থিবিকলাদয়ঃ।
বান্ধবাশ্চ তথেচ্ছন্তি জীবিতং গুণিনশ্চিরম্ ॥ ১০৯ ॥
পরিবাদনিবৃত্তানাং দুর্গতেষু দয়াবতাম্।
গুণিনাং সফলং জন্ম সংশ্রিতানাং বিপদ্গতৈঃ ॥ ১১০

দ্বিজপুত্র উবাচ।

এবমুক্ত্বা স তং বীরং পুত্রাবিদমথাব্রবীৎ।
পূজাং কুবলয়াশ্বস্য কর্ত্তুকামো ভুজঙ্গমঃ ॥ ১১১ ॥
স্নানাদিকক্রমং কৃত্বা সর্ব্বমেব যথাক্রমম্।
মধুপানাদিসম্ভোগমাহারঞ্চ যথেপ্সিতম্ ॥ ১১২ ॥
ততঃ কুবলয়াশ্বেন হৃদয়োৎসবভূতয়া।
কথয়া স্বল্পকং কালং স্থাস্যামো হৃষ্টচেতসঃ ॥ ১১৩ ॥
অনুমেনে চ তন্মৌনী বচঃ শত্রুজিতঃ সুতঃ।
তথা চকার নৃপতিঃ পন্নগানামুদারধীঃ ॥ ১১৪ ॥

দেবগণ আর পিতৃগণ তাঁ'র
বন্ধুগণ আর যত বিপ্রগণ,
অর্থী, বিকলাঙ্গ, বান্ধব-নিচয়
ইচ্ছে সদা তাঁ'র সুদীর্ঘ জীবন। ১০৯।

গুণিজন কভু কারো পরিবাদে
কর্ণ আর মন না করে অর্পণ,
দুর্গত জনেরে বিপদ-সাগরে
কাণ্ডারী হইয়া করেন রক্ষণ।

হেন গুণিজন ধন্য এ ধরায়
সফল জনম তাঁহার নিশ্চয়,
বিপন্নের সদা আশ্রয়ের স্থল
সদা সুখে থাকে নাহিক সংশয়।" ১১০।

দ্বিজপুত্র বলে—"পিতা করহ শ্রবণ,
অশ্বতর, রাজপুত্রে বলিয়া এমন,
পুত্রগণ পানে চাহি' বলিলা বচন
কুবলয়াশ্বেরে যোগ্য করিতে পূজন—১১১।
"এস সবে মিলি মোরা করি' গিয়া স্নান,
পরে সবে এক সঙ্গে করি' মধুপান,
ভোজন আনন্দ সবে ভুঞ্জি' তার পরে,
বিশ্রাম করিব সবে আনন্দ-অন্তরে। ১১২।
হৃদয়-উৎসবকারী কথা আলাপনে
রত রব কিছুক্ষণ করিয়াছি মনে। ১১৩।
ঋতধ্বজ মৌনভাবে শুনিলা সকল
হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত বহে অবিরল।
মৌনেতে সম্মতি জানি' পন্নগরাজন,
সেই মত কার্য্য তবে করিলা সাধন। ১১৪।

সমেত্য তৈরাত্মজভূপনন্দনৈঃ
মহোরগাণামধিপঃ স সত্যবাক্।
মুদান্বিতোঽন্নানি মধূনি চাত্মবান্
যথোপযোগং বুভুজে স ভোগভুক্ ॥ ১১৫ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজ-চরিতে
মদালসোপাখ্যানে পাতালপ্রবেশো নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সত্যবাদী, ধীর, পন্নগ ঈশ্বর
রাজার নন্দনে ল'য়ে তার পর,
আত্মজের সনে আনন্দিত মনে
স্নান পান আর আনন্দ-ভোজনে
রত হ'য়ে সুখে, কাটাইলা বেলা।
নাগরাজপুরে আনন্দের মেলা। ১১৫।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদালসা উপাখ্যানে
পাতাল-প্রবেশ নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বিজপুত্র উবাচ ।

কৃতাগারং মহাত্মানমধিপং পবনাশিনঃ ।
উপাসাঞ্চক্রিরে পুত্রৌ ভূপালতনয়স্তথা ॥ ১ ॥
কথাভিরনুরূপাভিঃ স মহাত্মা ভুজঙ্গমঃ ।
প্রীতিং সঞ্জনয়ামাস পুত্রসখ্যুরুবাচ চ ॥ ২ ॥
তব ভদ্র সুখং ব্রুহি গেহমভ্যাগতস্য যৎ ।
কর্ত্তব্যমুৎসৃজাশঙ্কাং পিতরীব সুতো ময়ি ॥ ৩ ॥
রজতং বা সুবর্ণম্বা বস্ত্রং বাহনমাসনম্ ।
যদ্বাভিমতমত্যর্থং দুর্লভং তদ্বৃণুষ্ব মাম্ ॥ ৪ ॥

কুবলয়াশ্ব উবাচ ।

ভবৎপ্রসাদাদ্ভগবন্ সুবর্ণাদি গৃহে মম ।
পিতুরস্তি মমাদ্যাপি ন কিঞ্চিৎ কার্য্যমীদৃশৈঃ ॥ ৫ ॥
তাতে বর্ষসহস্রাণি শাসতীমাং বসুন্ধরাম্ ।
তথৈব ত্বয়ি পাতালং ন মে বাহ্যোন্মুখং মনঃ ॥ ৬ ॥

বিপ্রপুত্র বলে—"পিতা, করহ শ্রবণ,
অশ্বতর নাগেশ্বর করিয়া ভোজন,
বসিলেন আসি' যবে বিশ্রামের তরে
পুত্রদ্বয় আসি তথা মিলিলা সত্বরে,
সখাগণ সনে তবে রাজার নন্দন
নিকটে বসিয়া তাঁ'র করে উপাসন। ১।
অনুরূপ বাক্যে তবে ভুজঙ্গ-ঈশ্বর
রাজপুত্রে প্রীতিদান করে অতঃপর।
পুত্র-সখা প্রতি তিনি অতীব সাদরে,
বলিতে লাগিলা হেন প্রফুল্ল অন্তরে—২।
"হে ভদ্র, এসেছ তুমি আমার ভবনে
কিসে সুখী হ'বে বল অকপট মনে।
পিতার নিকটে পুত্র নিঃশঙ্কে যেমন
মনোভাব বলে, তুমি বলহ তেমন। ৩।
রজত, সুবর্ণ, বস্ত্র, বাহন, আসন
অথবা দুর্লভ কিছু চায় তব মন,
অতীব দুর্লভ যদি হয় সেই ধন
যতনে সংগ্রহ করি' করিব অর্পণ।" ৪।
বলিলা কুবলয়াশ্ব তবে—"ভগবন্,
পিতৃগৃহে আছে মোর ধন অগণন।
সেই হেতু বলি পদে ধন-রত্নে আর
এ জগতে নাহি দেখি কোন উপকার। ৫
সহস্র বৎসর ভবে জনক আমার
শাসি'ছেন বসুন্ধরা কিবা ইচ্ছা আর ?

তে স্বর্গ্যাশ্চ সুপুণ্যাশ্চ যেষাং পিতরি জীবতি ।
তৃণকোটিসমং বিত্তং তারুণ্যং বিত্তকোটিষু ॥ ৭ ॥
মিত্রাণি তুল্যশিষ্টানি তদ্বদ্দেহমনাময়ম্ ।
জনিতা ধ্রিয়তে বিত্তং যৌবনং কিন্নু নাস্তি মে ॥ ৮ ॥
অসত্যর্থে নৃণাং যাচ্ঞাপ্রবণং জায়তে মনঃ ।
সত্যশেষে কথং যাচ্ঞাং মম জিহ্বা করিষ্যতি ॥ ৯ ॥
যৈর্ন চিন্ত্যং ধনং কিঞ্চিন্মম গেহেঽস্তি নাস্তি বা ।
পিতৃবাহুতরুচ্ছায়াং সংশ্রিতাঃ সুখিনো হি তে ॥ ১০ ॥
যে তু বাল্যাৎ প্রভৃত্যেব বিনা পিত্রা কুটুম্বিনঃ ।
তে সুখাস্বাদবিভ্রংসান্মন্যে ধাত্রৈব বঞ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
তদ্বয়ং তৎপ্রসাদেন ধনরত্নাদিসঞ্চয়ান্ ।
পিতৃযুক্তান্ প্রযচ্ছামঃ কামতো নিত্যমর্থিনাম্ ॥ ১২ ॥
তৎ সর্ব্বমিহ সম্প্রাপ্তং যদঙ্ঘ্রিযুগলং তব ।
মচ্চূড়ামণিনা স্পৃষ্টং যচ্চাঙ্গস্পর্শমাপ্তবান্ ॥ ১৩ ॥

আপনি আছেন মম এ পাতাল পুরে
ধন-রত্ন-অভিলাষ ত্যজিয়াছি দূরে । ৬ ।
জীবিত যাহার পিতা কি অভাব তা'র ?
মহাপুণ্যবান সেই—কি সন্দেহ আর ?
তরুণ বয়সে সেই, তৃণের সমান
কোটি কোটি বিত্ত ত্যজে—সদা ফুল্লপ্রাণ । ৭
দেখুন ভাবিয়া মনে, এখন আমার
ভবদীয় আশীর্ব্বাদে ভাবনা কি আর ?
তুল্য রূপগুণযুক্ত বহু মিত্র মোর,
তাঁহাদের সঙ্গে নাহি আনন্দের ওর ।
পিতার ভাণ্ডারে ধন আছে অগণন
অর্থীগণে অনায়াসে করি বিতরণ ।
নিরাময় দেহ, তাত, পেয়েছি যখন
তখনি জেনেছি মোর আছে সর্ব্বধন ! ৮ ।
অভাব থাকিলে তবে যাচ্ঞা ইচ্ছা হয়
আছে ঘরে—তাই, মন ধনে ল[illegible]

অভাবের কথা যারে ভাবিতে না হয়,—
পিতৃবাহুতরুছায়ে সেই সুখে রয়,—
তাহার সুখের কিছু নাহিক অভাব,
সর্ব্বত্র সকলে সেই নেহারে সদ্ভাব । ১০ ।
বাল্যকাল হ'তে যা'রা পিতৃ-বন্ধু-হীন
এ ভবে অসুখে তারা কাটায় কু-দিন ;
কর্ম্মফলে তারা সদা বিধির [illegible]
বঞ্চিত হইয়া আছে কি সন্দেহ তায় ? ১১ ।
আপনার আশীর্ব্বাদে ধন রত্নে আর,
কিছু মাত্র অভিলাষ নাহিক আমার ।
পিতৃদত্ত নানাধন সদা দুঃখী জনে
অহরহঃ দিতে পারি সদা ফুল্লমনে । ১২ ।
আপনার পাদপদ্ম করিনু দর্শন
ইহাই পরম লাভ আমার এখন ।
পদ স্পর্শিয়াছে যবে চূড়ামণি মোর
বক্ষঃস্পর্শে ঘুচিয়াছে ঘোর মোহ-ঘোর ।" ১৩ ।